বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম: অতীত ও বর্তমান
(বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস পরিক্রমা)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ)

Dhaka University Library
403788

গবেষক
জগন্নাথ বড়ুয়া
এম.ফিল. গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রভাষক, পালি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৪, বাংলাদেশ।

403788
GIFT

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
সংস্কৃত ও পালি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃত ও পালি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

এপ্রিল ২০০৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **'বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম : অতীত ও বর্তমান'** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণালব্ধ কর্ম। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালি বিভাগের পালি বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য লিখিত হয়েছে। বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আমি কাজটি আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্যকেউ গবেষণা করেননি। আমি আমার এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

403788

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(জগন্নাথ বড়ুয়া)
এম. ফিল. গবেষক
রেজি নং-৫৬/২০০০-২০০১
সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
প্রভাষক, পালি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

SUKOMAL BARUA
, Ph. D (Banaras)
IRMAN (Ex.)
ARTMENT OF SANSKRIT & PALI
ERSITY OF DHAKA
A-1000, BANGLADESH
: 9661920-59/6240 (Off.)
8622897 (Res.)
: 880-2-8615583

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ সুকোমল বড়ুয়া
এম. এ., পি-এইচ. ডি (বানারস)
চেয়ারম্যান (সাবেক)
সংস্কৃত ও পালি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৯৬৬১৯২০-৫৯/৬২৪০ (অ
৮৬২২৮৯৭ (বাসা)
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩

..............................200

....

তারিখ ২৬.০২.০৮

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জগন্নাথ বড়ুয়া (রেজি নং-৫৬/২০০০-২০০১) আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধীনে তাঁর এম. ফিল. ডিগ্রীর গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করেছে। সে ব্যক্তিজীবনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিষয়ের প্রভাষক। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয় **'বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম : অতীত ও বর্তমান'** শীর্ষক- এ অভিসন্দর্ভে তাঁর মননশীল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়টি অত্যন্ত বিশদ ও বিস্তৃতমণ্ডিত হলেও গবেষণার প্রেক্ষিত ও উপযোগিতার নিরিখে আলোচনার বিস্তারন সীমিত করা হয়েছে। এতে গবেষকের বীক্ষণ এবং উপযুক্ত তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। তাই অভিসন্দর্ভটি একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব লাভ করেছে। এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গবেষক অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি। অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালি বিভাগে পালি বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা করা হল।

403788

আমি তাঁর সার্বিক মঙ্গল কামনা করি এবং প্রস্তাবিত ডিগ্রী অর্জিত হোক এ প্রত্যাশা করি।

২৬.০২.০৮

(প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
এবং
সংস্কৃত ও পালি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কিংবা সাম্প্রতিক কালে বৌদ্ধদের অনেক মূল্যবান ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার উপাদান এদেশের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালি জাতির ইতিহাসের গোড়াপত্তন বৌদ্ধদের সুমহান অবদানে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধ পুরাকীর্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহ আজো বাংলার কালজয়ী গৌরবকীর্তির ইতিহাসে দেদীপ্যমান। বুদ্ধের সমকালীন এবং খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীতে মহামতি সম্রাট অশোক পূর্ব ও উত্তরকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসার লাভ করে। অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশত বছর বৌদ্ধপাল রাজাগণ এদেশ শাসন করেন। এ সময় বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয়, শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল পণ্ডিত বিহার, ময়নামতির শালবন বিহার, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, জগদ্দল বিহার, রামকোট বিহার, বিক্রমপুরী বিহার ইত্যাদি, পাণ্ডিত্যে বিশ্ববিশ্রুত ছিলেন পণ্ডিত প্রজ্ঞাভদ্র, আচার্য শীলভদ্র, পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র, আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ। উনবিংশ শতাব্দী ছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে নবজাগৃতির যুগ। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ সারমিত্র মহাথের (১৮০১-১৮৮১), ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ ও জাতির উৎকর্ষ মেধার চিন্তামণি। আধুনিক কাল থেকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় অনেক অগ্রসরমান। দেশ-কাল-সময়ে অতীতের তুলনায় বৌদ্ধরা আজ সর্বক্ষেত্রে উৎকর্ষের পথিকৃৎ।

বাংলাদেশে নানা ধর্ম, বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর প্রাচীন আবাসভূমি। বৌদ্ধরা এদেশের আদি ও প্রাচীন অধিবাসী। প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহাসিক পীঠভূমি হিসেবে গৌরবোজ্জ্বল। এখানকার বৌদ্ধদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা মানুষের গৌরবের বিষয়। বৌদ্ধদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে প্রতিভাত বাংলাদেশের স্বর্ণযুগের ইতিহাস। বৌদ্ধদের গৌরবময় অতীতই বাংলার ইতিহাস রচনার মূল উৎস। বাংলার বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধদের চিন্তার স্বকীয়তা, মানস স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলুপ্ত নয়; গৌরবের। স্বীয় গৌরব ও স্বজাত্যবোধে বৌদ্ধরা মহান।

এ অভিসন্দর্ভে বৌদ্ধধর্মের আদি বিকাশধারা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সামগ্রিক ইতিহাস, বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন, ওরাঁওসহ আদিবাসী বৌদ্ধদের জীবনধারা, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে প্রতিভাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ	২-৫
প্রথম অধ্যায়	
বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস বিচার	৬-২৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস	২৭-৫৫
তৃতীয় অধ্যায়	
প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিবর্তন ও পুনরুত্থান	৫৬ - ১৭০
চতুর্থ অধ্যায়	
বৌদ্ধ জাতিসত্তার প্রাচীন ইতিহাস ও জীবনধারা	১৭১ - ২৯১
পঞ্চম অধ্যায়	
বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও বৌদ্ধমেলা	২৯২ - ৩৩৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মদর্শন ও সাহিত্যচর্চারধারা	৩৩৯ - ৩৯৪
সপ্তম অধ্যায়	
বাংলাদেশে বৌদ্ধদের শিক্ষা-সমাজ-সংগঠন	৩৯৫ - ৪৭৪
অষ্টম অধ্যায়	
উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান	৪৭৫ - ৫২৯
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	৫৩০ - ৫৪৭
পরিশিষ্ট : আলোকচিত্র	

Dhaka University Institutional Repository

প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ

আমার এ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, স্বাভাবিক পরিস্থিতি, সময়কাল, নানামুখী দৃষ্টিভঙ্গি, সহিষ্ণুতা ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ও অভিজ্ঞতাকে বিচার বিবেচনা করে মত প্রকাশের সচেষ্ট হয়েছি। আমি প্রত্যাশা করছি ইতিবাচক ধারণাগুলো জনমানসে ধর্মপ্রাণতা, আত্মসচেতনতা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হোক।

আধুনিককালে বৌদ্ধদের চিন্তা-চেতনা ও সমাজদর্শন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে জাতীয় ও আঞ্চলিক অনৈক্যবোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে। সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ঐক্য, নৈতিকতা, যৌক্তিকতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মতা, সততা, সমতা ও দায়িত্ববোধে সদ্ভাব ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। আঞ্চলিক এবং জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী। বাংলার সর্বত্র প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সভ্যতার নিদর্শনবাহী অজস্র ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে; অযত্ন, অবহেলায় পড়ে আছে। বন্যা, ভূমিকম্প ও ঝড় ঝাপ্টাসহ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপেক্ষা করে যুগযুগ ধরে এগুলোর টিকে থাকাটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। অবশ্য বৌদ্ধ নিদর্শনগুলোর অনেকখানিই আজ চিরতরে ধ্বংস ও হারিয়ে গেছে। ক্ষেত্র বিশেষে বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধমূর্তি, প্রত্নবস্তু ও সাহিত্য নিদর্শন থাকলেও বেশির ভাগেই দীর্ঘ যুগ পরিক্রমায় হারিয়ে গেছে।

হারানো যুগের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আজ পর্যন্ত টিকে থাকা অমূল্য কীর্তিসমূহ বৌদ্ধ গৌরবের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের অতুলনীয় গৌরবের উত্তরাধিকারী বৌদ্ধজাতি। ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের প্রাচীন কীর্তিসমৃদ্ধ স্থানগুলো থেকে উদ্ধার করা নিদর্শনসমূহ ঢাকার জাতীয় যাদুঘর, মহাস্থান, পাহাড়পুর, ময়নামতি, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর বরেন্দ্র যাদুঘরসহ অন্যান্য যাদুঘর ও বিহারে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও অনেক নিদর্শনই ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মায়ানমার ও তিব্বত যাদুঘরসমূহে সংরক্ষিত আছে। কালজয়ী বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস সুপ্রাচীন কালের। তাই বর্তমান এই অভিসন্দর্ভের ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির কারণে বিষয় বিন্যাস ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে বেগ পেতে হয়েছে। **'বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম: অতীত ও বর্তমান'** তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র এত ব্যাপক এবং এর কালপরিধির বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের। বাংলাদেশের সমগ্র বৌদ্ধ ইতিহাস বিষয়ে এ পর্যন্ত মৌলিক কোন গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস সম্পৃক্ত তথ্য, উপাত্ত এবং উপাদানগুলো বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের নিয়ে আজো কোন প্রামাণ্য মূল্যবান গ্রন্থ এখনও নেই। মানব জাতির স্বরূপ ও বিকাশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির চিন্তা ও সংস্কৃতির অর্ন্তনিহিত ঐক্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কার সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই প্রয়াসী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় আমি উপলব্ধি করেছি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করব। কারণ গবেষণা ও পড়তে গিয়ে গবেষণামূলক পূর্ণাঙ্গ তথ্যবহুল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস বিষয়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে কিছু তথ্য ও রেফারেন্স থাকলেও প্রাচীন ও আধুনিক বাংলাদেশের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ, বিশ্লেষণধর্মী ও ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি।

তাই আমি **'বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম:অতীত ও বর্তমান'**(বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস পরিক্রমা), শিরোনামে গবেষণা করার আগ্রহী হই। প্রথমে বিষয়টি সহজ মনে হলেও পরে কাজ করতে গিয়ে খুব কঠিন মনে হয়েছে। কারণ তথ্যসূত্র, উপাত্ত সংগ্রহে ও বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়নে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হতো। আমি বরাবরই সজাগ ছিলাম যে বিভিন্ন গ্রন্থে যেসব বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরব। আজ বৌদ্ধ ইতিহাসের মূল্যবান ঘটনা ও উপাদানগুলো নানাভাবে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে রয়েছে। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, সময় এবং অধ্যয়নের ব্যাপ্তি আর শ্রমলব্ধ প্রচেষ্টা সহায়ক হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ রচনার শুরুতেই হতাশা আর অপ্রাপ্তির যোগ ছিল। বাংলার ব্যাপক বিস্তৃত ইতিহাস থেকে অতীত ও বর্তমানের বৌদ্ধ ইতিহাসের নির্যাস খুঁজে বের করা, রচনাকরা, যোজনা করা এবং পূর্ণাঙ্গ ভিত্তিতে উপস্থাপন করা খুবই দুরূহ কাজ। মোটের উপর আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়টির মূল ক্ষেত্র, সীমা-পরিসীমা অত্যন্ত বিরাট ও ব্যাপক। বিষয়টি বিরাটত্বের কারণে এতে প্রতিটি বিষয়ের মর্মবস্তুকে তোলে আনার সম্যক চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভ অতীত বর্তমান কাল পর্বের বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিকের ইতিহাস রচনার একটি বিনীত প্রয়াস। এতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির জীবনধারা, ধর্মদর্শন, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে বেশ কয়েকটি দিকের মৌলিক সমীক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির জীবনধারা নতুন আঙ্গিকে ও তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এতে বৌদ্ধ জাতিসত্তার প্রাচীন ইতিহাসের ধারণার পাশাপাশি সমকালীন উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, পরিবর্তন, অগ্রসরতা, ভাব ও চিন্তা-চেতনার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুদীর্ঘ কাল থেকে বৌদ্ধরা নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কাল পরিক্রমায় বৌদ্ধরা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা অদ্ভুত ও নিয়ন্ত্রণহীন সমস্যার মুখোমুখি হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচুর উপাত্ত ও তথ্য যোজনার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। অসংখ্য বই-পুস্তক, জার্নাল-পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অনেক বইয়ের উদ্ধৃতি সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি রেফারেন্সর ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলির উল্লেখ ও তথ্য নির্দেশ বাহুল্য মনে হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এর ভেতরে প্রদত্ত উদ্ধৃতি থেকে সূত্র ও তথ্য নির্দেশ পাবেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধচর্চা বর্তমানে নেই বললেই অত্যুক্তি হয় না। অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ ঐতিহাসিক, ইতিহাসবিদ, পণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও গবেষক বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস চর্চা কালে ভদ্রে করে থাকেন। কোন কোন ঐতিহাসিকদের জ্ঞানগর্ব চর্চায় অল্প বিস্তর যা কিছু শুনা যায়, তথ্য উপাত্ত ও সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়, তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও প্রহেলিকাপূর্ণ। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস এখনো গভীর অন্ধকারে ও রহস্যজালে আবৃত। প্রায়ই ইতিহাসবিদ ও ঐতিহাসিকগণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বৌদ্ধ ইতিহাসকে এড়িয়ে গেছেন কিংবা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে পর্যাপ্ত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে। কারণ সুদীর্ঘ সময়কালের ইতিহাস সম্পর্কে কেবলমাত্র কাঠামোগত ধারণা লাভ, কিংবদন্তিসূত্র, জনশ্রুতি, প্রাচীন সাহিত্যসূত্র এবং প্রত্নতত্ত্বের রেফারেন্স উল্লেখযোগ্য উৎস। প্রথমেই মনে একটি প্রশ্ন জাগে বাংলার বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস কি? এর উৎস, ভিত্তি এবং স্বয়ংবর উপাদান কি? একটি শক্ত জটিল বিষয়। বাংলার ইতিহাস, বৌদ্ধ ইতিহাস এবং বাঙালির ইতিহাস এ ত্রয়ীধারা সুদীর্ঘ যুগে দেশ-কাল ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য, পরিপূরক, মানসগঠন, জীবনবোধ নানামাত্রিকতায় জাতিগঠন এক রৈখিকভাবে নির্দেশ করা যায়।

প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ ও উপসংহার ছাড়া অভিসন্দর্ভটি সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়সমূহ- প্রথম অধ্যায়: বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস বিচার, দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস, তৃতীয় অধ্যায়: প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবির্তন ও পুনরুত্থান, চতুর্থ অধ্যায়:বৌদ্ধ জাতিসত্তার প্রাচীন ইতিহাস ও জীবনধারা, পঞ্চম অধ্যায়: বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও বৌদ্ধমেলা, ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মদর্শন ও সাহিত্যচর্চারধারা, সপ্তম অধ্যায়: বাংলাদেশে বৌদ্ধদের শিক্ষা-সমাজ-সংগঠন,অষ্টম অধ্যায়: উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান। আলোচ্য গবেষণার মূল পরিসর অনেকটা আপেক্ষিক বলা চলে। নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত ও কাল-পর্বে বিভক্ত না থাকায় বিষয়ের ব্যাপ্তি কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম: অতীত ও বর্তমান' (বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস পরিক্রমা) বিষয়ে আমাকে প্রথম আগ্রহান্বিত করেন আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া। তাঁর নিরন্তন প্রেরণা ও উৎসাহে আমি এ এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হই এবং তাঁর আন্তরিক পরামর্শ, সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সম্পন্ন করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এম.ফিল. ফেলোশীপ প্রদান করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি আমার গবেষণা কাজ করতে গিয়ে শিক্ষক, গবেষক, বিহার, প্রতিষ্ঠান, সুধীজন এবং বৌদ্ধসমাজের নানাজনের সাহায্য ও পরামর্শ নিয়েছি। বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ সকল সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আমাকে সাহায্য প্রদান করেছে। বিশেষ করে অভিসন্দর্ভের বিষয় পরিধি, বই পুস্তক এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সবসময় সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়েছি বিভাগীয় শিক্ষক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার কাছ থেকে। এ অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন, পাঠপরিকল্পনা, পরিমার্জন, পরিশীলন, সংশোধন ও শ্রেণী বিভাগের জন্য সংস্কৃত ও পালি বিভাগের শিক্ষকগণ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ নিয়েছি এবং গবেষণা সমৃদ্ধকরণে সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট লাইব্রেরি, আরকাইভস্‌সহ বিভিন্ন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি আমি ব্যবহার করেছি। এ ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমি ঋণী। সর্বশেষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় প্রাইম কম্পিটারের সত্ত্বাধিকারী জনাব মো. ইদ্রিস আলী এবং কম্পিউটার অপারেটর মো. কাকন ও হামিদুল ইসলামকে। তাঁরা নিরলসভাবে অভিসন্দর্ভ তৈরিতে সহায়তা করেছে। এ ছাড়া অভিসন্দর্ভ রচনায় যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা দিয়ে উপকৃত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

আশা করি অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্তে গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপকৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

জগন্নাথ বড়ুয়া
প্রভাষক, পালি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস বিচার

১.১ মহামানব বুদ্ধের জীবন ও বাণী

১.২ ইতিহাসের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

১.৩ ভৌগোলিক ইতিহাস গবেষণার ঐতিহাসিক পটভূমি

১.৪ প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার উৎস ও উপাদান

১.৫ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস বিচার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস বিচার

১.১ মহামানব বুদ্ধের জীবন ও ধর্মবাণী

জ্যোতির্ময় বুদ্ধ জন্ম জন্মান্তর পারমীসমূহ পূর্ণ করে মানবের দুঃখ মুক্তির জন্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থ খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে[১] নেপালের অন্তর্গত শাক্যরাজ্যে কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে রাজা শুদ্ধোধন ও রাণী মহামায়ার ঔরসে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। কুমার সিদ্ধার্থ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন জগতে আমিই জ্যেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ, এটাই আমার শেষ জন্ম। পূর্ণিমা তিথিতে কাঙ্খিত রাজপুত্রের আবির্ভাবে সকলের মন বাসনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। কুমারের জন্ম সংবাদ শুনে ঋষি অসিত ও পণ্ডিতগণ ভবিষ্যৎ বাণী করেন-

(ক) সিদ্ধার্থ যদি গৃহত্যাগ করেন তা হলে বুদ্ধত্ব লাভ করে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।

(খ) আর যদি সংসারী হন তাহলে জগৎশ্রেষ্ঠ চক্রবর্তী রাজা হবেন।

সিদ্ধার্থ জন্মের সপ্তাহ পরে তাঁর মাতা মায়াদেবী মৃত্যু বরণ করলে রাজ কুমারকে লালন পালন করেন তাঁর মাসী বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। গৌতমী কর্তৃক প্রতিপালিত বলে সিদ্ধাথের্র অপর নাম গৌতম। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত হন।[২] যথাসময়ে রাজকুমার সিদ্ধান্ত নানাবিধ বিষয়ে বিদ্যা শিক্ষা আয়ত্ব করেন। বিশ্বমিত্র ছিলেন কুমারের শিক্ষা গুরু। সিদ্ধার্থ দিন দিন সংসারের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেখে অনীহা ভাব পোষণ করেন। রাজা শুদ্ধোধন পুত্রকে সংসারী করার জন্য ষোড়শ বর্ষে দণ্ডপানির কন্যা যশোধরার (গোপা) সাথে বিবাহ দেন। পুত্রের জন্য সকল ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা করেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা তিন ঋতুতে বাস উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। কিন্তু রাজপুত্র ছিলেন সর্বদা সংসারের ক্ষনস্থায়ী ভোগ বিলাস ও ঐশ্বর্য্যে উদাসীন এবং চিন্তায় নিমগ্ন। একদিন দেবদত্তের তীরবিদ্ধ হংসের ব্যাথায় আরো ব্যথিত ও চিন্তিত হলেন। এরপর সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বের হয়ে বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ, ব্যাধিগ্রস্থ, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী-এ চারিদৃশ্য দর্শন করে জানতে পারলেন জন্ম-জরা-মৃত্যু থেকে কারো রক্ষা নাই। জীব মাত্রেই এসবের অধীন। সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ ছাড়া কোন মুক্তি নেই। তাই গৌতমের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হল। ইতোমধ্যে সিদ্ধার্থের স্ত্রী গোপার এক পুত্র সন্তান জন্ম হলে 'রাহুলজাত বন্ধনজাত' বলে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।[৩] তিনি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তমা স্ত্রী-পুত্রের মায়ার বন্ধন, রাজসিংহাসন ও ভোগ-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে উনত্রিশ বছর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার জোৎস্না ভরা রাতে সারথী ছন্দক কন্টক অশ্ব নিয়ে গৃহত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থ বৈশালীতে আরাড় কালাম, শ্রাবস্তীতে রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রমে ধ্যান সাধনা করেন। এর পর আরো উচ্চতর ধ্যান শিক্ষার জন্য উরুবিল্বের নির্জন অরণ্যে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যসহ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধার্থ গভীর ধ্যান তপস্যায় মগ্ন হন। গৌতম উপলব্ধি করলেন কঠোর কৃচ্ছসাধনে সিদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। কঠোর তপস্যায় দেহ সুস্থ সবল থাকে না, চিত্তে ধৈর্য্য ও স্মৃতিশক্তি থাকে না। তাই তিনি মধ্যম পথ অবলম্বনের সংকল্প করলেন। একদিন পিন্ডাচরণে এসে গৌতম সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করে বুদ্ধগয়ার নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে পায়সন্ন ভোজন করে বোধি লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে গভীর ধ্যানেরত হয়ে বুদ্ধত্বজ্ঞান লাভ করেন। বুদ্ধ সর্বপ্রথম বারানসীর সারানাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের কাছে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। তিনি জাতিস্মর জ্ঞানে মানবের জন্মরহস্য চারি আর্য সত্য (The four Noble Truths) উদ্ভাবন করলেন।[৪]

ক) দুঃখ-জগত দুঃখে বিদ্যমান-এটা সম্যক উপলব্ধি করা। মূলত পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ।

খ) দুঃখ সমুদয়- দুঃখ উৎপত্তিধর্মী, দুঃখ প্রতিনিয়ত উৎপন্ন হয়। লোভ লালসার শিকার হয়ে মানুষ নিত্য নব নব দুঃখ সৃষ্টি করে।

গ) দুঃখ নিরোধ-দুঃখ নিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ দুঃখ ধ্বংস শীল। এ দুঃখের ধ্বংস সাধনে মুক্তিলাভ সম্ভব।

ঘ) দুঃখ নিরোধে উপায়-দুঃখ ধ্বংসকারী সম্যক পথ-আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। (যথা সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। তিনি আরো উপলব্ধি করলেন পৃথিবীর সকল দুঃখ উৎপত্তির মূল জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে অবিদ্যা প্রতিরোধই মানুষের দুঃখরূপ জীবন চক্রের পূর্ণ পরিসমাপ্তি সম্ভব। তথাগত বুদ্ধ ছয় বৎসর ধ্যান সমাধি করে খ্রিষ্ট পূর্ব ৫৮৮ অব্দে ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধত্ব বা সম্বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সম্বোধিজ্ঞান লাভের পর মহাকারুনিক বুদ্ধ সুদীর্ঘ জীবনে ৪৫ বছর মানবের কল্যাণ সাধনে ধর্ম প্রচার করেন। তপসসু ও ভল্লিক এ দু'জন ছিলেন বুদ্ধের প্রথম দ্বৈবার্চিক উপাসক। বুদ্ধের প্রধান সেবক ছিলেন আনন্দ এবং ধর্মসেনাপতি ছিলেন সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন। অবশেষে বুদ্ধ সশিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে কুশীনগরে মল্লদের শালবনে বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত আলোয় অন্তিম শয্যায় শায়িত হন।

সকলকে শোকাভিভূত দেখে বুদ্ধ বললেন, উৎপন্ন সংস্কার মাত্রেই ধ্বংস অনিবার্য। অপ্রমত্তভাবে কুশল কর্ম সম্পাদন করবে। নির্বাণ সাধনায় উদ্যমশীল হও। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ব্যতিত কোন শরণ নেই। নিজেই নিজের প্রদীপ হও, নিজেই শরণ গ্রহণ করো।

অতপর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে[৫] বিশ্ববরেণ্য জগজ্জ্যোতি বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের বছর বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে বুদ্ধাব্দ সালের প্রচলন হয়। তথাগত বুদ্ধ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানবের কল্যাণে নির্বেদিত ছিলেন। মানুষ তথা সকল প্রাণীর প্রতি এরূপ মৈত্রী, করুণা, মহানুভবতা, মমত্ববোধের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যি বিরল। তাই বুদ্ধকে মহাকারুণিক বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক (Tripitak)। পালিশাস্ত্র ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্রতম ধর্ম গ্রন্থ। ত্রিপিটকের বুদ্ধের বাণী ও অনুশাসনসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। ত্রিপিটক প্রধানত তিনটিভাগে

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্ত। যথা: ১। সূত্র পিটক (Buddha's advice and discuss) ২। বিনয় পিটক (Buddhist law) ৩। অভিধর্ম পিটক (Buddhist philosophy & Psychology). ত্রিপিটকের সারসংক্ষেপ ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম। বোধিপক্ষীয় ধর্মকে সংক্ষেপ করলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। চারি আর্যসত্য এবং চারি আর্যসত্যকে সংক্ষেপ করলে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞায় পরিণত হয়। এ তিনটিকে সংক্ষেপ করলে একমাত্র প্রজ্ঞা এ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানই বৌদ্ধধর্ম। ধর্মবাণী প্রচারে গৌতম বুদ্ধের উদার আহ্বান ছিল এহিপস্সিক ধম্ম অর্থাৎ এসো, দেখো, যাচাই করো, গ্রহণীয় হলে গ্রহণ করো; নতুবা বর্জন করো। বিশ্বের ধর্ম প্রচারের ইতিহাসে এ যেন এক নতুন আহবান। বুদ্ধের বিশ্বজনীন শিক্ষাপদ হল পঞ্চশীল। সাধারণভাবে বুদ্ধের পঞ্চনীতি হল- ১। প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি, ২। চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরতি, ৩। মিথ্যা বলা থেকে বিরতি, ৪। কাম-ব্যভিচার থেকে বিরতি, ৫। মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরতি।

বৌদ্ধধর্মের পরম লক্ষ্য হল নির্বাণ (নি+বান=নিবার্ণ) লাভ করা। ইহা চিরশাশ্বত, কল্যাণকর, শান্তি প্রদ ও সুখের নিদান। জন্ম-মৃত্যু, ভব-দুঃখ-যন্ত্রনা থেকে চিরমুক্তি লাভের পথ নির্বাণ। তৃষ্ণা বিনাশই নির্বাণ।মানুষ তৃষ্ণাক্ষর করে আর্যমার্গ অনুসরণ করে চরম ও পরম শান্তি নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।[৬]

বৌদ্ধধর্ম মানুষকে শান্তি, সম্প্রীতি, মৈত্রী, করুণা, মানবতা, সাম্য, অহিংসা ও ত্যাগের শিক্ষা দেয়। অহিংসা ও কল্যাণই বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি। বৌদ্ধধর্ম কর্মবাদী ধর্ম। সকল প্রাণী কর্মের অধীন। স্বস্ব কর্মই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। কর্মফলের তারতম্য অনুসারে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে। মানুষের জীবন প্রবাহ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধ জড় চেতনার সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের সকল কর্ম কায় বাক্য ও মনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। বুদ্ধের দর্শনের মূলকথা হল ত্রিলক্ষণ অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা। জগতে সমস্ত কিছু অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনশীল; নিত্য কিছুই নেই। বৌদ্ধধর্মে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপনের জন্য ব্রহ্মবিহার ভাবনা-মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা একান্ত আবশ্যক। বৌদ্ধধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ। মানব মুক্তির পথ প্রদর্শক, বর্ণবৈষম্য জাতিভেদ প্রথা দূরকারী, বিশ্ব শান্তির প্রবক্তা বুদ্ধের জীবন দর্শন ও বাণী মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর আলোকবর্তিকা।[৭]

১.২ ইতিহাসের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ (Definition of History and analisiys)

ইতিহাস মানুষের অতীত কার্যাবলীর বা সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম এবং সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ। ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের মানবগোষ্ঠির কার্যাবলী বা তাদের সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করে। সেজন্য সময়ানুক্রম ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ইতিহাসের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে সময় ও স্থান বিবেচনায় রাখতে হয়। সে কারণে সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপটে মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারা বা ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণই হল ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ইতিহাস শব্দটি এসেছে 'ইতিহ' শব্দ থেকে যার অর্থ ঐতিহ্য। ইতিহাস কথাটির প্রত্যয় ও বিভক্তি করলে এর রূপ দাঁড়ায় ইতিআস। যার অর্থ হল এমনটিই ঘটেছিল। ইংরেজী History শব্দটি গ্রীকশব্দ Historia শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হল অনুসন্ধান বা গবেষণা। জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাংকে ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-'প্রকৃত পক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও বিবরণকে ইতিহাস বলে।' ইতিহাসের সর্বজন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন কারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও পরিধি বহুমাত্রিক; তাই এর সংজ্ঞাও বহুমাত্রিক হতে বাধ্য।

ক্ষীরস্বামী ইতিহাস শব্দের অর্থ লিখেছেন, 'ইতি হ আসীদ্যত্রে তিহাস, ইতিরেবমর্থে হঃ কিলার্থে।' এই রূপই ঘটেছিল (ইতি-হ-আস) যেখানে অর্থাৎ যাতে অতীত ঘটনার বৃত্তান্ত থাকে, তা ইতিহাস পুরাবৃত্ত বা পূর্বচরিতই ইতিহাস। অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ যে ইতিহাসের বিষয় তা, 'ইতি'র সাথে 'ই' র যোগে সূচিত। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত ভাবে 'ইতিহাস' শব্দটি History শব্দের প্রতিশব্দ রূপে গণ্য করা যায়।[৮]

রবার্ট ডি ডেনিয়েলস লিখেছেন- The record of history is far more than a chronicle of events. It not noly records what people have done but what they have field to do the motive and goals that impelled then to strive for something better. History is a repository of human values and aspirations, the accumulation of efforts experience hopes and achievements that have gradually civilised humanity.[৯] অর্থাৎ ইতিহাস ঘটনাবলীর ধারবাহিক বিবৃতি মাত্র নয়, এতে মানুষ কি করেছে সে কথাই লেখা থাকে না; তারা কি করতে চেয়েছে এবং কি মনোভাব ও লক্ষ্য তাদের আরো ভাল কিছু করতে অনুপ্রাণীত করেছে তাও লেখা থাকে। ইতিহাস মানুষের মূল্যবোধ ও আশা আকাঙ্খার একটি ভান্ডার, এতে জমা আছে তার প্রচেষ্টা, অভিজ্ঞতা, আশা এবং সাফল্যসমূহ যা ধীরে ধীরে মানুষকে সভ্য করে তুলছে।

অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধানে ইতিহাসের সংজ্ঞা এরূপ-That branch of knowledge which deals with past events, as recorded in writing or otherwise ascertained, the formal record of the past especially of human affairs or actions, the study of the formation and growth of countries and nations. অর্থাৎ ইতিহাস মানব জ্ঞানের ঐ শাখা যা অতীত ঘটনাবলী নিয়ে চর্চা করে, ঐসব ঘটনাবলী হয় লিখিত থাকে অথবা অন্য কোনভাবে সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। ইহা অতীতের আনুষ্ঠানিক রেকর্ড যা মানুষের কাজ ও বিষয়াবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কিভাবে বিভিন্ন দেশ ও জাতি গঠিত ও বিকশিত হয়েছে ইহা তারই বিবরণ। ইতিহাস মানব বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের সৃষ্টির সাথে সাথে প্রশ্ন আসে ইতিহাসের। ইংরেজী History এর বাংলা প্রতিশব্দ হল ইতিহাস। গ্রিক শব্দ istoria হতে

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী History শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। istoria র অর্থ হচ্ছে অনুসন্ধান ও বিশেষভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করে সত্য খুঁজে বের করা এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আধুনিক সিদ্ধান্তে মানুষ হল ইতিহাসের উপাদান। তাই অতীত ও বর্তমানে মানুষের কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বিনির্মিত হচ্ছে ইতিহাস। আধুনিক পণ্ডিত, গবেষক ও ইতিহাসবেত্তারা বিশেষ করে প্রতীচ্যবিদ তিনটি শব্দের দ্বারা ইতিহাসের পুরো ধারণা ব্যক্ত করে থাকেন এবং তাহল Man + Time + Place বা মানুষ + কাল + স্থান। ইংরেজিতে স্পষ্ট করে বলা যায় যে, History is the record of the activities of mankind in relation to Society. সমাজের সাথে দায়বদ্ধ হিসেবে মানবজাতির ক্রিয়াকলাপের খতিয়ান হল ইতিহাস। মানবজাতির যাবতীয় কার্যকলাপ ইতিহাসের অন্ত র্ভুক্ত।[১০] 'History is a Science no less & no more' ইতিহাস বিজ্ঞান বৈকি আর কিছু নয়- এটাই ইতিহাস চিন্তনের প্রধান ধারা। ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসচর্চা ও পঠন-পাঠন অভিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে। মানুষের সুকুমার বৃত্তির লালন কর্ষনে জন্য প্রয়োজন ইতিহাস সচেতনতার। কারণ অতীত ও সমসাময়িক মানুষের জীবনধারা ও কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে রচিত হয় ইতিহাস। যে জাতির ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই, সে জাতির ভবিষ্যত কর্মপন্থার দিক নির্দেশনা তমসাবৃত। জাতির সংরক্ষিত ইতিহাসই পরবর্তী প্রজন্মের অনুসরণীয় হয়ে থাকে। তাই জাতির সাথে ইতিহাসের পঠন ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুস্বীকার্য। কিন্তু আখ্যান- উপাখ্যান, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি ইতিহাসের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে প্রকৃত তথ্য, উপাত্ত ও ইতিহাসকে বিকৃত ও বাধা সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক সকল তথ্য ও বিষয়ের নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজন ইতিহাসচর্চার (Historiography)। তাই ইতিহাসচর্চা সকলের জীবনে অত্যাবশ্যক। ড. মনতাজুর রহমান তরফদার বলেছেন, 'History is a movement in time', সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। ইতিহাস মানব জীবনকে স্রোত আলেখ্য। একটি জাতির বিবর্তন ও বিকাশের ইতিহাসে তার অতীত ঐতিহ্য অন্বেষণও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই ইতিহাস রচনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হল লিখিত বিবরণ (Textual narratives) বা পাথুরে প্রমাণ। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কীত চিন্তা-চেতনা বহুদিন পর্যন্ত একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনেকে এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নয়। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি মূল্যবান বিষয়।

ই, এইচ, কা'র হোয়াই ইজ হিস্ট্রি রচনায় বলেছেন, 'ইতিহাসবিদদের কর্তব্য অতীতকে ভালবাসা নয়, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও নয়, বরং বর্তমানকে বোঝার জন্য প্রয়োজন তা জানা এবং বোঝা। মহৎ ইতিহাস তখনই লেখা সম্ভব যখন ইতিহাসকার এর অতীত দৃষ্টি বর্তমানের সমস্যাবলীর গভীরতায় আলোকোজ্জ্বল হয়।'

ডি ডি কোসাম্বি 'দ্য কালচার এন্ড সিভিলাইজেসন অব এ্যানসিয়েন্ ইন্ডিয়া ইন হিস্টোরিক্যাল আউট লাইন' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ইতিহাস হল উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্কের ক্রমপরিবর্তন কালানুসারে উপস্থাপন।" অঙ্গুলি পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

মুনতাসীর মামুন বলেছেন, "ইতিহাস বলিতে অনেকে রাজ বংশাবলী ও তাহাদের যুদ্ধ বিহারের বিবরণ বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিক্ষণীয় ইতিহাস কেবল তাহা নহে। ইতিহাস বংশ বিশেষের বিবরণ নহে, জাতি বিশেষের বৃত্তান্ত। তাহাদের উৎপত্তি ও বিকাশ, তাহাদের শাসননীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি, তাহাদের সাহিত্য, শিক্ষা ও বাণিজ্য, এই সকল আলোচনীয় বিষয় ....।"[১১]

মানব সভ্যতার অগ্রগতিরক্ষেত্রে যুগের পর যুগ কিভাবে অগ্রসর হয়েছে তার ধারাবাহিক বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক ই.এইচ.কার (E. H. Carr) এর মতে, ' ইতিহাস হল বর্তমান ও অতীতের মধ্যে অন্তহীন সংলাপ।' মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড সমাজ রাষ্ট্র, সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতির ধারাবাহিক আলোচনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মোটকথা ইতিহাস মানুষের অতীত কার্যাবলীর দর্পণ।

এদেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে বৌদ্ধ ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে উপলব্ধি করা যায়। আমরা এই ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণকে আমাদের অপরিহার্য অঙ্গ ও অস্তিত্ব বলে দাবি করতে চাই; তখন বিশেষ বিশেষ কারণে আমরা একটি ঘোরতর অসুবিধার সম্মুখীন হই। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সমগ্রকে আমাদের ঐতিহ্য চেতনার মধ্যে স্থান দিতে পারি না। শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেন আমল যেন আমাদের কাছে কোন দূরশ্রুত প্রতিধ্বনির মতো। তাই এই সুদীর্ঘ কালের সভ্যতা, ঐতিহ্য ও শিল্পকর্মের সঙ্গে আমাদের মানসিক যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ।'[১২] ঐতিহ্য প্রবহমান নদীস্রোতের মতো। ঐতিহ্যের ধারা বাধা পেতে পারে, কিন্তু তা ছিন্ন সূত্র হয়ে আকস্মিক ভাবে মাঝ পথে হারিয়ে যেতে পারে না। বৌদ্ধ যুগের সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামগ্রিক অবদান বাংলার নিজস্ব, পাহাড়পুর, মহাস্থান ও ময়নামতির প্রাচীন পুরাকীর্তি আমাদের গর্ব। বৌদ্ধ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সাহিত্য অবদান কালেকালে বাংলাদেশকে ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছে। বৌদ্ধরা এদেশে আদিজাতিসত্তা। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস শুধু বাংলাদেশের নয় সমগ্র উপমহাদেশে ব্যাপকতা লাভ করেছিল।

এদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক একান্ত বিজড়িত। এককথায় বৌদ্ধ সমগ্রতা বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। 'পাল রাজাদের মতো পূর্ববঙ্গের খড়গ ও চন্দ্রবংশীয় শাসকগণ ছিলেন বৌদ্ধ। পূর্ব-ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এবং বাংলা ভাষার উদ্ভবের মূলে এবং সংস্কৃত তান্ত্রিক সাহিত্যের বিকাশের মূলে বৌদ্ধ দর্শন যে অন্তত অনেকাংশ সক্রিয় ছিল, সে কথা বোধ হয় দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।'[১৩]

'Frederick M. Asher Zuvi The Art of Eastern India নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মৌর্য/শুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য শৈলীর এবং পাল-সেন যুগের ভাস্কর্য শৈলীর ও রীতির মধ্যে প্রবহমানতা বা ধারবাহিকতা রয়েছে।' তবু পাল যুগের শিল্পকলা ও ভাস্কর্য অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাল

Dhaka University Institutional Repository

আমলে যে বাঙালি লোকগোষ্ঠী গঠনের সূচনা হয়েছিল খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ পনের শতকে এসে তার একটি পরিণত রূপে সাক্ষাৎ মিলছে। পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সক্রিয় পৃষ্টপোষকতায় সমতট অঞ্চলে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে ও মহাস্থানে তথা সমগ্র বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মনতাজুর রহমান তরফদার বলেন, 'পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে সপ্তম শতকের মধ্যে লেখা চীনা বিবরণগুলি এবং পরবর্তীকালে পাহাড়পুর, মহাস্থান, ময়নামতি, সীতাকোট প্রভৃতি স্থানে নির্মিত বহু বিহার-সংঘারাম দেখে বুঝতে পারা যায় যে, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, পৌণ্ড্রবর্ধন এবং আরো কতগুলি অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রবল ছিল।'[১৪]

অজানাকে জানার মত নিয়েই মানুষ ইতিহাস লেখায় প্রবৃত্ত হয়। ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা হয়। ইতিহাস একটি ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। ইতিহাস হলো মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড (Action of human beings that have been one in the past). মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের পরিধি খুবই ব্যাপক বিষয়। এ ব্যাপক বিষয়ের সাক্ষ্য বা প্রামানিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণীত হয় এবং ইতিহাস লেখা হয়। বিভিন্ন দলিল, দস্তাবেজ লিপিমালা ও অনেক রকম উৎসে ঐতিহাসিকের জন্য মানবীয় কর্মকাণ্ড সংরক্ষিত থাকে। বর্তমান তথ্যের ব্যাপকতা ও বিভিন্নতা ইতিহাস গবেষণাকে সঠিক, অর্থবহ ও বিভিন্নমুখী করে তুলেছে। আত্মপোলব্ধি, চিন্তা ও ভাব জগতে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাস বর্তমান ধারায় উপনীত হয়। ইতিহাস পঠন-পাঠন ও লিখনে বিষয়টি নিজস্ব নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি বর্তমান। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত ইতিহাসচর্চা নিজস্ব গবেষণা ও লিখার পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে বলা হয় সাক্ষাৎ বা প্রামাণিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। ইতিহাস উৎস ভিত্তিক, উৎস ছাড়া ইতিহাস হয়না। উৎসও আবার নানা ধরণের ক) পুরানির্দশন যেমন জীবাশ্ম, হাড়গোড়, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, শস্ত্র, আসবাবপত্র, সৌধমালা প্রভৃতি খ) মৌলিকভাবে হস্তান্তরিত বিশ্বাস বা প্রথা যেমন অতিকথন, রূপকথা, কাহিনীমালা, পালাগান ইত্যাদি গ) ছবি ভিত্তিক উপাত্ত যেমন নক্সা, মানচিত্র প্রভৃতি (ঘ) লিখিত বিবরণ এর মধ্যে অতিপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ করে সকল সন্ধি, চুক্তি, দিনলিপি, মুদ্রিত পুস্তক, আজ সকালের খবরের কাগজও অন্তর্ভূক্ত আছে। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার একটি প্রাসঙ্গিক উপাদান হতে পারে। যেমন-উৎস-বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও সংশ্লেষণ।

ইতিহাসচর্চার মূল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্যকারণ উদঘাটন করা। ইতিহাসতত্ত্ব বলতে ইতিহাস রচনার পদ্ধতির সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুন ও ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধানের কলাকৌশলকে বুঝায়। প্রাক-আধুনিক যুগের বহু সমাজে ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য বিকাশ লাভ করে।[১৫]

ইতিহাস তত্ত্বের সুদীর্ঘ উত্তরণ কালে ইতিহাস লিখন ও পঠন পঠনের ধ্যান-ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এর প্রথমটির আবির্ভাব ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। তখন ইতিহাস বিজ্ঞান বা সময়ে

অনুসন্ধান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্যদিকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ধর্মের যুগান্ত কারী প্রভাবের ফলে ইতিহাস চিন্তা, পুর্নগঠিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রধান পরিবর্তনের সূচনা করে। পরিশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসতাত্ত্বিকেরা খ্রিষ্টান ইতিহাসতত্ত্বের ধারণাকে পরিহার করে। এর স্থলে তারা ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। এ ধারা এখনও অধ্যাহত আছে। গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ সমৃদ্ধ ভবিষ্যত বিনিময়ে সহায়ক হলেই শ্রমের সার্থকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে মানব জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ, বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যা, জীবন পদ্ধতি ও প্রথা, সামাজিক-সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সংগঠন সমূহের উৎস ও প্রকৃতি, স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়। এককথায় মানুষের যাবতীয় শর্তাবলীর বিশ্লেষণই ইতিহাস চর্চার মূল বিষয়বস্তু। সমাজ সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, ধর্মীয় ধারণা, ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং বিধি বিধান সমূহের সামগ্রিক আলোচনা। বিশ্বে ধর্ম ভিত্তিক জাতি গঠিত হয়। এ ধর্মই আবার জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সভ্যতা তৈরি করে। ধর্মই জীবনের নিয়ামক শক্তি। ধর্ম মানুষের একটা আশ্রয়।

বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পুরাতত্ত্ব বা Archaology বিষয়ে সম্যক আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্নবস্তু বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্নতত্ত্ব বলতে সাধারণত বোঝায় উৎখননাদি দ্বারা প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন আবিষ্কার এবং তার পরীক্ষা ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে মনুষ্য সভ্যতা বিষয়ক জ্ঞানের পরিধি বিস্তার সম্পর্কেও গবেষণা। কিন্তু উৎখননের ফলে অথবা সাধারণভাবে যে শিলা লেখ ও মুদ্রাদি আবিস্কৃত হয়, সেগুলি পড়ে প্রধানত ঐতিহাসিক গবেষণার পর্যায়ে, প্রত্নতত্ত্ব বিষয় গবেষণার পর্যায়ে নয়। আমাদের দেশে শিলালেখ, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার অন্তর্গত।[১৬] বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস বিলুপ্ত। সেই লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারকার্যে অনেক ক্ষেত্রে প্রত্নবস্তু, অভিলেখ, শিলালিপি এবং মুদ্রাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমাদের প্রাচীন যুগের স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের আলোচনাকেও পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত ধরা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে বাংলায় প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও উৎখননের কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রাচীন ঐতিহাসিক সভ্যতাগুলোর মূল স্থানে পর্যবেক্ষণ ও উৎখনন কাজ পরিচালনা করে যাচ্ছে। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর ভিত্তিতে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা ও বৌদ্ধ জনপদের সন্ধান পাওয়া যায়।

১.৩ ভৌগোলিক ইতিহাস গবেষণার ঐতিহাসিক পটভূমি

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে। তবে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই এদেশে স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠেছিল। ক্রমশ ঐতিহাসিক ভাবে এদেশের প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এদেশের মূলভিত্তি পৃথিবীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনতম যুগে। এদেশের দৃশ্যমান উপবিভাগের ভূ-উপাদানের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে যে বিস্তীর্ণ নিম্ন সমতল ভূমি রয়েছে তার গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মাত্র ২০-২৫ হাজার বছর আগে।

দৃশ্যমান ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে টারশিয়ারী পর্বত অঞ্চল। এ অঞ্চল প্রধানত উত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিস্তৃত। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে কয়েকটি স্থানের চত্বররূপী পুরাভূমি এলাকা। এলাকাগুলো হচ্ছে মধুপুরগড়. রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্র ভূমি. কুমিল্লার লালমাই পাহাড়।

তৃতীয় ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলকে নব্যভূমি নামে অভিহিত করা হয়। এ অঞ্চল দেশের বৃহত্তম অঞ্চল এবং অধিকাংশই বিস্তীর্ন নিম্ন প্লাবন ভূমি। ভূতাত্ত্বিক ভাবে বাংলাদেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূতাত্ত্বিক অঞ্চল। ভূতত্ত্বের ভাষায় বাংলাদেশ ভূখন্ডটি বঙ্গখাতের বৃহত্তম অংশ।[১৭] বাংলার ইতিহাসের ভূতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় জানা যায় ভূমিকর্ষণ নিয়ে সূচনা হয়েছিল সভ্যতা। চট্টগ্রাম-নোয়াখালী অঞ্চলে, ১৯৬৩ সালে ফেনীর ছাগলনাইয়া ও সীতাকুন্ড অঞ্চলে পুরানো পাথর যুগের বসতির চিহ্ন, শিলীভূত কাঠ এর একটি হাতকুড়াল এবং হাতিয়ার পাতি পাওয়া গেছে। মোটামুটি আট দশ হাজার বছর আগে থেকে শুরু নবোপলীয় যুগের মেগালিথ, পাথর এবং নানা ষ্টাকচার সিলেটের জৈন্তিয়াপুর অঞ্চলে দেখা যায়। পুরোপলীর এবং নবোপলীয় যুগের সূচনা হয় তিন থেকে দু'হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।[১৮]

বর্তমান বগুড়ার মহাস্থান ও দিনাজপুরের সীতাকোট প্রাচীন নির্দশনে বেশ কিছু চিহ্ন পাওয়া গেছে। মহাস্থানে সবচেয়ে প্রাচীন চিহ্ন পাঞ্চ মার্কড অর্থাৎ ঢালাই তামা মুদ্রা পাওয়া যায়। নরসিংদির ওয়ারি বটেশ্বর এ মৌর্যযুগের প্রচুর ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে।[১৯]

ভূতাত্ত্বিক হিসেবে হলোসেন যুগের শুরু থেকেই বাংলা অঞ্চলে মানুষ বসতি গড়ে ওঠে।

প্রত্নতত্ত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় ও ভূখন্ডে (Time and space) বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের জীবনের সাথে জড়িত সবধরণের সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদির (Cultural traits) আলোচনা। ইতিহাস যেখানে নিবার্ক, প্রত্নতত্ত্ব সেখানেই হয়ে উঠে সবাক।

প্রাচীন কালের প্রত্নতত্ত্বের নিদশর্ন লিখিত ও অলিখিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সবধরণের বিষয়ের মূল্যায়ণ একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বিবেচিত হতে পারে।

ইংরেজী Archaeology শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রত্নতত্ত্ব। সংস্কৃত প্র+ত্ন (ত্নপ) = প্রত্ন = পুরাতন এবং তৎ+ত্ব (তত্ত্ব)-জ্ঞান বা বিজ্ঞান থেকে আধুনিক কালে প্রত্নতত্ত্ব শব্দটি জন্ম লাভ করেছে। অপরদিকে গ্রিক শব্দ Archaia এবং Logos শব্দদ্বয় থেকে Archaeology শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ প্রাচীন দ্রব্যাদি ও জ্ঞান বা বিজ্ঞান। এ বিশ্লেষণ থেকে প্রত্নতত্ত্বের অর্থ হয়, পুরাতন দ্রব্যাদি সর্ম্পকিত জ্ঞান। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্নতত্ত্ব আরও ব্যাপক অর্থ বহন করছে। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী বিস্মৃত মানুষের জীবনধারা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ নির্ধারিত

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনার কাজে নিয়োজিত জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাটিই প্রত্নতত্ত্ব।[২০]

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন সাহিত্য, পুঁথিপত্র, বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণী বণিকদের লেখনী, ভূতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবরণ, প্রচলিত কিংবদন্তি ও লোককাহিনী, ঐতিহাসিক প্রমাণ ও বিবরণ এর উপর ভিত্তি করে বাংলার বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিলীপ কে চক্রবর্তীর এনসিয়েন্ট বাংলাদেশ: এ স্টাডি অব দ্য আর্কিওলজিক্যাল সোর্সেস বর্তমান বাংলাদেশের প্রত্নইতিহাসের ওপর তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

পূর্বেই বলেছি, প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজো রচিত হয়নি। বহু মূল্যবান তথ্য ও উপাদান কালগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ তথা বাঙালি সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-সাহিত্য ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় মেলে না। বাঙালির ইতিহাস সচেতনতার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছেন, "বাঙালির ইতিহাস নেই। কে লিখবে এই ইতিহাস? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালি তাহাকেই লিখিতে হইবে।"[২১]

বাংলাদেশের মাটিতে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা প্রথম কবে বসবাস শুরু করেছিল আর কবেই বা তারা সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার মতো উপকরণ আজো আমাদের হাতে আসেনি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রস্তর যুগের (চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে ও রাণীগঞ্জে) ও তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে। (পাণ্ডুরাজার টিবি)। খনন কার্যের ফলে বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। খননে একাধিক পর্বের নির্দশন মিলেছে। আমাদের এ পূর্বপুরুষেরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে কোন বর্গের লোক তা নির্ণয় করতে গিয়ে মানুষের নৃতাত্ত্বিক বিভাগ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি।

তাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। বাঙালি জাতি মূলত অনার্য বংশ উদ্ভূত। ভাষাবিচারে বাংলা ভাষা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট চীনীয় এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সঙ্গে বেশি সম্পক যুক্ত। 'বাংলা ভাষা লেখা হয় বাংলা লিপিতে। এ লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকে এসেছে। ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম নির্দশন পাওয়া গেছে পিপরাওয়া স্তূপে প্রাপ্ত একটি কারুকার্য সমন্বিত পাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিতে। এর সময়কাল অশোক অনুশাসনের পূর্ববর্তী।'[২২]

ব্রাহ্মী লিপির পরবর্তী নির্দশন পাওয়া যায় অশোকের অনুশাসনে। একমাত্র উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ছাড়া অশোকের আর সব অনুশাসনের লিপি ব্রাহ্মী। (উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লিপি খরোষ্ঠী)। কালক্রমে তা পরিবর্তন হয়ে গুপ্ত আমলে পূর্বাঞ্চলে এ ব্রাহ্মীলিপি যে রূপ পায় তাকে কুটিল লিপি বলে। এ কুটিল লিপি পরিবর্তন হয়ে বাংলা বর্ণমালা উৎপত্তি হয়। সমাচার দেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনে বাংলা বর্ণমালার প্রথম নির্দশন পাওয়া যায়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলা অক্ষরে লিখিত প্রথম সাহিত্যকীর্তি, চর্যাপদের ভাষা বাংলা হলেও নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত। বাংলাদেশে বাঙালি সংকলিত বা রচিত কোন প্রাকৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। মৌর্য বংশীয় রাজার একটি প্রাকৃতে রচিত অনুশাসন লিপি পাওয়া গেছে পুণ্ড্রবর্ধন এলাকায় মহাস্থান গড়ে তাও বাঙালির রচনা না হওয়ারই কথা। কারণ কখনো বাঙালি আর্যভাষায় পটু হয়ে ওঠেনি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৌদ্ধরা বাঙলার ও বাঙালির শাস্ত্র, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবহমান রেখেছিলেন, যাঁরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাদের মধ্যে পণ্ডিত শীলভদ্র, শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর, শান্তিদেব (ভুসুকু) শান্তরক্ষিত, অনিরুদ্ধ, সর্বানন্দ, লুইপা, হাড়িপা, প্রজ্ঞাভদ্র, শান্তিপাদ, আর্যদেব, নাগার্জুন প্রমুখ।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার উপাদান (Sources of Ancient Bengal History) প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ মিলিয়ে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক এই তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

বাঙালি একটি শক্তিশালী জাতি। বাঙালি আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ গঠিত হয়ে ছিল প্লাত্তসিন যুগে। পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয় প্লাইস্টোসিন যুগ। এই যুগেই মানুষের আর্বিভাব ঘটে। ভূতত্ত্ববিদদের মতানুসারে বর্তমান পৃথিবীর বিশালভূখন্ড বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে তিনটি যুগ পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ১) টারসিয়ার যুগ (Tarsier era)। ২) প্লেইসটোসিন যুগ (Pleistocene era)। ৩) হলোসিন যুগ (Holocene era)। আবার টারসিয়ারী যুগের তিনটি উপবিভাগ রয়েছে। ১) ইওসিন যুগ (Eocene era)। ২) ওলিগোসিন যুগ (Oligocene era)। ৩) প্লাইওসিন যুগ (Pliocene era)।[২৪]

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্যগণের রচিত পঞ্চাশটি সঙ্গীতই প্রাচীনতম বাঙলা সাহিত্যের নির্দশন। জানা গেছে চর্যাপদ ও দোহাগুলি এবং অনেক বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের রচয়িতা বাঙালী ছিলেন। বাঙলায় পাল রাজত্বকালে খ্রী. অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা বর্তমান ছিলেন। সিদ্ধাচার্যগণের প্রথম স্থানীয় লুইপা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহায়তায় 'অভিসময় বিভঙ্গ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। চর্যাপদকর্তা কাহ্নপা ও ভুসুক সেরা ছিলেন।

আচার্য দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন; লুইপা তাঁর চেয়ে বড়ো ছিলেন। সুতরাং অনুমিত হয় যে, লুইপা দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। হেবজ্র পঞ্জিকা নামে হেবজ্রতন্ত্রের টীকাটি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দ পালের রাজত্বকালে পণ্ডিতাচার্য শ্রী কাহ্নপদ কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল। ড. সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- চর্যাপদ ও দোহাগুলির রচয়িতা খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুধর্মের পটভূমিকা বৌদ্ধধর্মের লুপ্ত বিশেষ স্থানীয় অনুষ্ঠান ও ইসলামিক বিশ্বাসের সমন্বয়ে অপর একটি লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এরা ধর্ম উপাসক নামে অভিহিত। এদের প্রধান দেবতা ধর্ম ঠাকুর। ধর্ম উপাসক হাড়ি, ডোম, যোগী, বাগদী, মৎস্যজীবি, সূত্রধর প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকের মধ্যেই প্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গের বা রাঢ়ের কয়েকটি স্থানে ধর্ম পূজার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নামে পরিচিত এই সকল পরস্পর বিরোধী আচার অনুষ্ঠানে অবিমিশ্র বৌদ্ধ। যেমন ধর্মঠাকুর ও শীতলার (তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের হারিতী)।[২৬]

দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের লুপ্তাবশেষ বর্তমান ছিল। বাঙলায় সেনরাজত্ব কাল থেকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধধর্মের অবসান সূচিত হয়। বৌদ্ধ বিহার ও ধর্মকেন্দ্রগুলি শত্রু দূর্গরূপে কল্পিত হয়ে মুসলমানগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়। কিন্তু বহিরাগত কোন সংঘাতই কোন দেশের চিত্তলোক হতে দীর্ঘকাল পোষিত কোন ধর্ম সংস্কারকে অপসারিত করতে পারে না। তাই তৎকালীন তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে আত্মগোপন করতে থাকে। ধর্ম উপাসনাও এইরূপ একটি লৌকিক ধর্ম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত।[২৭]

'মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে লোপ হইতেছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ দর্শন একেবারে শেষ হয় কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, সেখানে বৌদ্ধধর্ম কিছু কিছু ছিল, ইংরেজরা যেরূপ সমস্ত দেশ একেবারে দখল করেন, মুসলমানের সেরূপ পারেন নাই। ....পূর্ববাংলায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। বাংলা অক্ষরে লেখা একখানা পঞ্চরক্ষা'র পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথিখানি ১২১১ শতাব্দে বা ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা। পঞ্চরক্ষার পুঁথিখানি বৌদ্ধ, পাঁচখানি পুঁথি আরম্ভ হয় 'এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান' ইত্যাদি। লেখক বলেন, এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন আমাদের রাজা।[২৮] মধুসেন পাল রাজা ছিলেন। কারো কারো মতে, সেন বংশের অধিপতি বলে অনুমিত। তিনি ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁর দেশে অনেক বৌদ্ধ বাস করতো। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি চৌদ্দ শতকের শেষ দিকে তাঁর স্মৃতিগ্রন্থ 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক' এ 'নগ্নাঃ বৌদ্ধাদয়ঃ' কথা উল্লেখ আছে। এ সময় বিক্রম সংবর্তের ১৪৯২ অব্দে (১৪৩৬ খ্রিঃ) আচার্য শান্তিদেব বাংলা অক্ষরে বোধিচর্যাবতার মহাযান দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন। (অষ্টম শতেক)।

ইতিহাসচর্চায় ধারাবাহিকতার প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সময় ও প্রেক্ষাপট, সমাজ ও জীবনকে জানতে প্রয়োজন এর প্রাচীনতম উৎসের সন্ধান করা। ক্রমোন্নয়নের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ধারাহিকতা, সময়, কাল, ধর্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুর্ণমূল্যায়ন প্রয়োজন। তাই বলা হয় ইতিহাসচর্চা জীবন্ত জাতির পরিচায়ক। এ অর্থে ইতিহাসকে বলা হয় স্মৃতির দর্পণ, অতীত ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা। সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ জাতিকে আশার আলো জ্বেলে উদ্দীপিত করে তুলতে পারে অতীতের বৌদ্ধ ঐতিহ্যসমূহ।[২৯] সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ইতিহাস বর্তমান বিস্তৃত ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক কালে যে ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে উপস্থিত তা খণ্ডিত বিকৃত এবং বহুধা বিভক্ত। তাই বৌদ্ধ জাতির গৌরবোজ্জল প্রাচীন ইতিহাসসমগ্র সংগ্রহ ও রচনা একান্ত প্রয়োজন।

উত্থান, বিকাশ, পতন-সভ্যতার ইতিহাসের একটি অবধারিত সূত্র। কখন, কিভাবে, কোথায় প্রথম বাংলায় জনবসতি গড়ে ওঠে এ ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণ আজো সম্যক কোন তথ্য দিতে সক্ষম হয়নি। ইতিহাসের যুগ বিভাজনে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে এ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতি আর বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতি অভিন্ন। 'ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালে বাংলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, প্রথমভাগটি ছিল উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্রভূমি বা পুণ্ড্রবর্ধন), দ্বিতীয়ভাগ পশ্চিম বঙ্গ (রাঢ়দেশ) এবং তৃতীয়ভাগ ছিল পূর্ববঙ্গ (বঙ্গ)।'[৩০] বঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীর বা তার পূর্বেই রচিত পালি মহাবংশ ও মহানিদ্দেশ, (১,১৫,১৭৪) এবং প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের গ্রন্থ মিলিন্দ পঞহ (৬.২১.৩৬০) বঙ্গের সঙ্গে অনেক অঞ্চলের সামুদ্রিক পথ মারফৎ বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইঙ্গিত করে। মোটামুটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে লিখিত জৈন উপাঙ্গ পন্নবনা অনুযায়ী তাম্রলিপ্তি ছিল এই বঙ্গের অন্তর্গত।[৩১] Periodization বা যুগ বিভাজন ইতিহাস রচনায় আবশ্যক অঙ্গ। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই ত্রিবিধ স্তরে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসের যুগ বিভাগ (Periodization) বলা হয়। বৌদ্ধ-হিন্দু যুগকে প্রাচীন যুগ, পাঠান-মোঘল আমলকে মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিভাগোত্তর স্বাধীনতোত্তর সময়কে আধুনিক যুগ রূপে গণ্য করে দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের রচিত হয়েছে।[৩২]

ইতিহাস বলে, 'জীবনযাত্রায় প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের সত্যাসত্য চিনে নেওয়া আবশ্যক হয়। রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতি এ কথা জেনে কোন লাভ না হতেও পারে, কিন্তু রাজা অশোকের হস্তি সংখ্যা ঠিক জানতে হলে যে মানসিক কসরতের আবশ্যক, সে কসরত যে বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর এ কর্তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করতে পারবেন না। মানব বিজ্ঞান ইতিহাস আলোচনায় অর্থাৎ আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি, কেমন করে এমন হয়েছি, আমাদের সংস্কার, আমাদের আচার কিভাবে অঙ্কুরিত হয়ে কি কারণে বর্তমান আকারে পরিণত হয়েছে ইত্যাদি জেনে কি কিছুই লাভ নাই? আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে সভ্যতা লাভ করেছি তার কোন অংশ আমাদের জাতিগত বা বংশগত (Depends Upon Racial inheritance), কোন অংশ দেশের মাটির এবং জলবায়ু গুণে পরিণত কোন অংশ শিক্ষা-দীক্ষা ফল তা জানায় কি কোনই উপকারিতা নেই? ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপকরণ অর্থাৎ প্রাচীন কালের দলিল-দস্তাবেজ আমাদের হাতে খুব কম আছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসের উপকরণ আমাদের যাতে যথেষ্ট আছে।'[৩৩] বাংলার ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে মানব বিজ্ঞান অনুশীলন এত উপকরণ, তথ্য উপাত্ত, দলিল-দস্তাবেজ এত কিছু থাকা

Dhaka University Institutional Repository

সত্ত্বেও বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত, এ সম্পর্কে উদাসীন, এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। যার বাড়ীতে চৌদ্দ মাদল, সে বলতে নারে হরিবোল।

রিসলি সাহেব সিদ্ধান্ত করে গেছেন, পাঠান এবং বেলুচগণ তুরস্ক ইরনীর সঙ্কর অর্থাৎ বেলুচগণের মধ্যে প্রশস্তকরোটির ভেজাল আছে তা তুরস্ক জাতীয় এবং মারাঠাগণ শক-দ্রাবিড় সঙ্কর, অর্থাৎ গুজরাতী এবং মারাঠাগণের মধ্যে যে প্রশস্ত করোটির ভেজাল আছে তা শক জাতীয়, উড়িয়া এবং বাঙালী মোঙ্গল দ্রাবিড় সঙ্কর, অর্থাৎ উড়িয়াদের এবং বাঙ্গালীর মধ্যে যে প্রশস্ত করোটির ভেজাল আছে তা মোঙ্গালীয় জাতীয়।[৩৪] মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত খোটান এবং কুচার নামক জনপদদ্বয়ের নিকটে, বালুকা স্তুপ হতে অপরিচিত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অনেক কাগজপত্র এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে।

খোটান প্রদেশে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ও গ্রন্থের ভাষা এবং কুচার প্রদেশে প্রাপ্ত কাগজপত্র ভাষা, ঠিক একরূপ নয়। লেভি স্টাউট বলেছেন, ইরানে বা ভারতবর্ষে প্রচলিত আর্য ভাষা সমূহের সাথে কুচীয় ভাষায় কোন সম্বন্ধ নেই; কুচীয় ভাষার সাথে ইউরোপের পশ্চিমে প্রচলিত আর্য ভাষা নিচয়ের, বিশেষত ইটালীয় ও ক্লেট ভাষার সম্বন্ধ। কোচগণ, যে বিশুদ্ধ শোণিত বাঙালী নহে তা তাদের ইতিহাস, আকার এবং আচার প্রমাণ করতেছে। তারপর রয়েছে বাঙ্গালীর প্রশস্ত বা মধ্যম করোটি। প্রশস্ত করোটি মোঙ্গলীয় জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। 'Eccanthropas or Pithecanthropas হতে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অভ্যুদয় পর্যন্ত মানবের সর্বাঙ্গীন পরিণতির বিবরণ মানব বিজ্ঞানের বিষয়। তন্মোধ্যে মানবাকৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির বিবরণ আকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়। মানব বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগ Prehistaric Archaeology বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভাগ বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবরণ। মানব বিজ্ঞানে দুটি প্রধান বিভাগ সভ্যতার ইতিহাস এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। নৃবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, দলিল-দস্তাবেজ ইতিহাস বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার মূল উপাদান ও তথ্যের উৎস।

১.৪ প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার উৎস বা উপাদান

বাংলা বা বাংলাদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাচীনকালে রচিত হয়নি। একারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই বাছাই করে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। যে সব তথ্য সূত্রের ভিত্তিতে ইতিহাস রচিত হয় তাই ইতিহাসের উৎস। যেমন- প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য ভাস্কর্য, ভ্রমণ এ সূত্র গুলোই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনা করা যায়। কাহিনী ইত্যাদি সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেও ইতিহাস তৈরী করা যায়। সুতরাং এ সূত্রগুলোই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস বা উপাদান।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদানগুলোর চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ, স্থান-কাল, পরিবেশ পরিচিতি এবং সময়কালীন প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের প্রয়াস সমক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পণ্ডিতগণ ইতিহাসের উপাদানকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন- ১) বৈদিক সাহিত্য ২) মহাকাব্য ৩) পুরাণ ৪) বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য ৫) সংস্কৃত ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্য ৬) ঐতিহাসিক গ্রন্থ ৭) প্রাচীন বংশাবলী ৮) জীবন চরিত ৯) মুদ্রা ১০) লিপি ১১) প্রত্নবস্তু ১২) বিদেশীদের বিবরণী।[৩৫]

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস বা উপাদানগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

(১) প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস এবং

(২) সাহিত্যিক উৎস

(১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (Archaeological Sources)

ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বলতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি বুঝায় অতীত বা প্রাচীন মানুষের সৃষ্ট, ব্যবহৃত বা প্রভাবিত দ্রব্যাদির চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণ বা প্রত্নবস্তু বলে। যেমনঃ প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, স্থাপনা ও অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নিদর্শন। এসব নিদর্শনের আলোকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনা করা যায়। এজন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনাদি প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস বা উপাদান প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায় ব্যবহৃত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) লিপি (Inscriptions)

খ) মুদ্রা (Coins)

গ) তাম্রশাসন (Copper plate)

ঘ) স্থাপনা (Structures)

ঙ) চারু ও কারুশিল্প (Arts & Crafts)

চ) বিবিধ প্রত্ননিদর্শন (Miscellaneous Objects)

(বাংলার ইতিহাস, মোঃ আইয়ুব খান, মৌসুমী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১)

নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলঃ

ক) লিপি (Inscriptions): প্রাচীন বাংলা তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার জন্য লিপি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। লিপিগুলি পাথর, সোনা, রূপা, তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর উপর খোদাই করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। যেমন- শিলালিপি, স্তম্ভলিপি ও তাম্রলিপি। এ সকল লিপি আবার প্রধানত তিন প্রকারেরঃ ১) রাজ প্রশস্তি ২) শাসন সংক্রান্ত ঘোষণা, অনুশাসন, দানপত্র প্রভৃতি ৩) বেসরকারী ব্যক্তিগত দানপত্র, উৎসর্গপত্র।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

খ) মুদ্রা (Coins): প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উৎস হিসেবে মুদ্রা বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। প্রাচীন বাংলার শাসকগণ বহু মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। প্রাচীন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হাজার হাজার মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। এসব মুদ্রাসমুহ মৌর্য, চন্দ্র, কুশান, গুপ্ত, পাল ও দেব আমলে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ভি.এ. স্মিথ মুদ্রার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন-The numismatic evidence as a whole is more accessible that the epigraphic. Many classes of Indian coins have been discussed in special treatises and compelled to yield their contributions to history.[৩৭]

গ) তাম্রশাসন (Copper plate): বাংলার ইতিহাসে তাম্রশাসন ইতিহাসের উৎস ও উপাত্ত সংগ্রহে বেশ গুরুত্ব বহন করে। প্রাচীন রাজন্যবর্গের ভূমিদান ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলই তাম্রশাসন। এতে বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার সূত্র ও উপাত্ত রয়েছে।

ঘ) স্থাপনা (Structures):বাংলার বহু প্রত্নস্থলে প্রাচীনকালের স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এসব স্থাপনার মধ্যে বৌদ্ধ বিহার, দুর্গ, মন্দির, স্তূপ অন্তর্ভূক্ত। এসব স্থাপনা সমূহ বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাস্তব সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য। বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র জায়গায় বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত স্থাপনা ছিল।

ঙ) চারু ও কারুশিল্প (Arts & Crafts): প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে বাংলার প্রাচীনকালের বহু চারু ও কারুশিল্প নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। এসব শিল্প নিদর্শনের মধ্যে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, ধাতব শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধরা চারুকারু শিল্প শৈলীর দ্বারা বৌদ্ধ ভাবধারা তোলে ধরেছে।

চ) বিবিধ প্রত্ননিদর্শন (Miscellaneous Objects): বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সংস্কৃতি রচনা ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন এবং জানার জন্য বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলাদেশে এ যাবৎকাল প্রাপ্ত আবিস্কৃত প্রত্নবস্তু ও নির্দশনগুলো বেশির ভাগই বৌদ্ধধর্মীয় বিষয় সম্পৃক্ত এবং বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের অবদান। এ অমূল্য প্রত্ন উপাদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে অতীত বর্তমানে বৌদ্ধ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব।

(২) প্রাচীন সাহিত্য উপাদান (Literary Evidence) :

প্রাচীন সাহিত্য হতে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস রচনার উপরোক্ত উপাদান সংগ্রহ করা যায়। বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস রচানার জন্য দেশী-বিদেশী নানা সাহিত্যিক উপাদান হয়ে থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অতীতের ইতিহাস রচনায় বৈদিক সাহিত্য, বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু সাহিত্য, ত্রিপিটকের গ্রন্থাবলী, ঐতিহাসিক ইতিহাস গ্রন্থ দীর্ঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুক্তনিকায় অঙ্গুত্তরনিকায়, জাতক, অপাদান, কথাবত্থু, দীপবংশ, মহাবংশ, মিলিন্দপ্রশ্ন প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্য এবং পরিশিষ্ট বা ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে যথেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে। এছাড়াও স্মৃতিশাস্ত্র,

Dhaka University Institutional Repository

জৈন জীবনচরিত, তামিল, তিব্বত, বর্মী সাহিত্য এবং গ্রীক, রোমান, চীনা, আরবী, জাপানী সাহিত্য এবং বিদেশী ও বহিভারতীয় সাহিত্যিক উপাদান ও পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণী। পতঞ্জলী ও পানিনির ব্যাকরণ, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ভাণভট্টের হর্ষ চরিত, রাজমালা, বাকপতি রাজের গৌড়বহো, কলহনের রাজতরঙ্গিনী, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, বিদেশীদের বর্ণনায় ইতিহাস রচনার মূলসূত্র খোঁজে পাওয়া যায় যেমন- টলেমির ভূগোল বিবরণ, চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন, ইৎ সিং, হিউয়েন সাং এবং মেগাস্থিনিস সহ বিভিন্ন পর্যটক এবং ভ্রমণ কাহিনী বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের সামগ্রিক প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য আকর।

১.৫ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ইতিহাস বিচার

বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মীয়, জাতীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জেলা বা অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস চর্চার গুরুত্ব জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্মীয় ও জাতির জাতীয় ইতিহাস পুনর্গঠনের ও সংকলনের গুরুত্ব ও সচেতনতা বহুলাংশে বেড়েছে।

একটি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও তুলে ধরা অত্যন্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি, বিষযবস্তু নির্ধারণ এবং তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। বাংলার বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস বিষয়টি আলোচনা ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসের পর্যাবৃত্তায়ণের সূত্রে অনুসৃত। সেই সূত্রানুসারে বৌদ্ধ ধর্ম ও জাতির ইতিহাসের কাল বিভাজন করা হয় এবং

সে কারণে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস বিকাশের ধারায় কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। ইতিহাস রচনায় Historiography-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিতে রয়েছে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি, প্রমাণপঞ্জি ও দলিল দস্তাবেজের সমালোচনা সংক্রান্ত মতবাদ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ সম্পর্কিত সমস্যা, কার্যকারণ ও থিওরী সম্বন্ধীয় প্রভৃতির বিশারদ আলোচনা। আধুনিককালে ঐতিহাসিকদের আত্মসচেতনতায় সাম্প্রতিক সময়ে ইতিহাস দর্শন, ইতিহাস বিদ্যা, ইতিহাস বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করেছে।

মূলত: ইতিহাস অনুসন্ধানের পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিদ্যার সঙ্গে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হলে অতীতের ঘটনা প্রবাহের বিবরণ বা বিশ্লেষণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যুক্তিভিত্তিক পূর্বধারণার অন্যনামই হচ্ছে ইতিহাস দর্শন।'[৩৮]

প্রাচীনকালে রাজা সম্রাটগণ প্রায়শই সভাপণ্ডিতদের দ্বারা তাদের কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করাতেন। তাম্রশাসন বা প্রস্তর ফলকে রাজ্যশাসন, বিজয়ের কৃতিত্ব, ধর্মীয় অনুশাসন, প্রশাসনিক বিধি নিষেধ, সন, তারিখ প্রভৃতি উৎকীর্ণ করাতেন। রাজা ও ধর্ম নেতাদের জীবনীগ্রন্থও লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে স্বভাবতই ইতিহাসের ঘটনাসমূহ সংযুক্ত হত। তবে এসব রচনা বা উপাত্তকে পরিপূর্ণভাবে ইতিহাস বলা যায় না। কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের তথ্য নির্দেশক বলা যায়।[৩৯]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের কথা কাহিনী পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদদের সংগ্রহ করতে হয়েছে নানা উপাদানের ভেতর থেকে। এ উপাদানসমূহকে চিহ্নিত করা ইতিহাস পাঠ শুরুর পূর্বে সবচেয়ে বেশি জরুরী। ইতিহাসের উপাদানকে গুরুত্বের বিবেচনায় দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি প্রাথমিক সূত্র (Primary source) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় দ্বিতীয় পর্যায়ভূক্ত সূত্র (Secondary source)। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রাথমিক সূত্র ও দ্বিতীয় পর্যায়ভূক্ত সূত্র উভয়ের অনুসন্ধান জরুরী। ইতিহাস রচনা মৌলিক উপাদান হিসেবে দু'ধরনের উপাদানকে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রথমটি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং দ্বিতীয়টি সাহিত্যিক উপাদান।

ক) **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান** ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অঙ্গীভূত বিষয়গুলো হচ্ছে বাংলায় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু, স্থাপত্য ভাস্কর্য, শিলালেখ, তাম্রশাসন এবং মুদ্রা।

খ) **সাহিত্যিক উপাদান** ঃ বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস রচনায় সাহিত্যের উপাদানের দুটো ধারা রয়েছে। একটি ভারতীয় সাহিত্য, অন্যটি বিদেশি সাহিত্য ও ভ্রমণ বিবরণী।

ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহ খুব কঠিন কাজ ও সময় সাপেক্ষ। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস রচনাও একটি কঠিন কাজ। প্রাচীনকালে বাংলায় এমন কোন সামগ্রিক ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত হয়নি যে তার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস রচনা সহজ হবে। বাংলার কোন খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ প্রাচীন বাংলা বৌদ্ধ ইতিহাস লিখে রাখেনি। আধুনিক কালে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাস রচনা করতে হলে ইতিহাসবেত্তা ও গবেষকদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ইতিহাস, পর্যটকদের ভ্রমণ বিবরণী, তিব্বতী সাহিত্য বাংলার প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

"প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ গুপ্ত যুগ হতে প্রকৃত ইতিহাস ও সাহিত্যের প্রাচুর্য না থাকলেও স্থানীয় রাজাদের বংশাবলী ও জীবনচরিতে ইতিহাস রচনার প্রচুর উপাদান রয়েছে। পানিনি ও পতঞ্জলির ব্যাকরণ, মৌর্য যুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাণভট্টের হর্ষচরিত, বাকপতিরাজের গৌড়বহো, কবি বিল্হন চাণক্যরাজের বিক্রমাঙ্কচরিত, পালবংশীয় রাজা রামপালের সময়ের সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, কাশ্মীরের কবি কল্হন এর রাজতরঙ্গিণী (এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত ভারতের সর্ব প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ) জয় সিংহের কুমার পালচরিত, পদ্মগুপ্তের নব সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইতিহাস রচনার অসংখ্য তথ্য ও উপাদান পাওয়া যায়।"[৪০] এছাড়াও বাংলার ইতিহাস রচনায় চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, ফা-হিয়েন ও তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের রচনা হতেও অনেক তথ্যাদি পাওয়া যায়। বিদেশীদের বর্ণনা এককভাবে তেমন নির্ভরযোগ্য না হলেও বাংলার প্রাচীন তথ্যের সাথে মিল করে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ বাংলার ইতিহাস রচনায় অপরিহার্য অঙ্গ। "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম (কলিকাতা) অধিবেশনের ইতিহাস শাখায় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছিলেন, বাঙ্গালার ইতিহাস সেবকগণকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যেতে পারে, এক শ্রেণী পৌরাণিক আর এক শ্রেণী ঐতিহাসিক।"[৪১]

বুদ্ধকালীন এবং বুদ্ধোত্তর যুগে প্রবলভাবে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম প্রধান ধর্মদর্শন হিসেবে বিরাজমান ছিল।(বুদ্ধযুগ খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পালযুগ খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত)। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি গোষ্ঠির ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনাচার, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সমগ্রতা। এই ইতিহাস কেন, কি কারণে, রচিত হয়নি তা ভাবতে অবাক লাগে। এ বৌদ্ধজাতির ইতহাস সমগ্র রচনা হওয়া বৌদ্ধজাতি তথা বাঙালির ইতিহাসে একান্ত প্রয়োজন। কেননা এই ইতিহাস বাংলার অনন্য অবদানের অত্যুজ্জ্বল সোনালী গৌরবের ইতিহাস। এ ইতিহাস পরিচিতি অত্যন্ত প্রয়োজন এবং মূল্যবান মাইলফলক হিসেবে সাধুকরণীয়।

আধুনিককালের (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে) প্রথম পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির কিছু আনু-পূর্বিক ইতিহাস রচনায় কোন কোন পণ্ডিত, ঐতিহাসিক গবেষক, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ সতত প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাতেও বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অতীত বর্তমানের ধারাবাহিক তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক আলোচনা অদ্যাবধি তেমন হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. History and Culture of Bengal, Dr. A.K. Sur, Best Books, Calcutta, 1992, P. 19

২. What Buddhists Belive, K.Sri Dhammananda, Taiwan, 1993, P. 3

৩. বৌদ্ধ ভারত, বিমল চন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃষ্ঠা-১১

৪. মহাবর্গ, প্রজ্ঞানন্দ মহাথের, থাইল্যান্ড, পৃষ্ঠা-২৭

৫. বৌদ্ধ গ্রন্থ কোষ, ১ম খন্ড, ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০০, পৃষ্ঠা-৫০

৬. মহাসতিপট্ঠান সুত্ত অট্ঠকথা, প্রজ্ঞাবংশ মহাথের (অনু), রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, পৃষ্ঠা-১০২

৭. দৈনিক সংবাদ, ২২ মে, ২০০৫

৮. ইতিহাসে বাঙালি, রমাপ্রসাদ চন্দ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৫

৯. দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস প্রাচীন কাল থেকে ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, মো. রমজান আলী, আকন্দ প্রকাশনী, বগুড়া, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫

১০. ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী ও ড. রুহুল কুদ্দুস মো. সালেহ, মুসলমানদের ইতিহাসচর্চা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৬ পৃষ্ঠা-২

১১. উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র, ৭ম খণ্ড, মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১১

১২. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৩১৩

১৩. প্রাগুক্ত, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, পৃষ্ঠা-৩১৮

১৪. প্রাগুক্ত, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, পৃষ্ঠা-৭

১৫. প্রাগুক্ত, ইতিহাসতত্ত্ব, পৃষ্ঠা-৪০

১৬. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯, পৃষ্ঠা-১৯৩

১৭. বাংলাদেশ প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশ, মাহবুব হাসান/মোঃ আব্দুল মতিন আকন্দ/ মোঃ ইখতিয়াক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৮

১৮. বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস সৈয়দ, আমীরুল ইসলাম, প্যাপিরাস, ১৯৯৬, ঢাকা, ২১

১৯. দ্য. মিউজিয়াম ইন বাংলাদেশ, ফিরোজ মাহমুদ ও হাবিবুর রহমান, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৭; মহাস্থান ময়নামতী পাহাড়পুর, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৯-২২

২০. প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, মোঃ মোশারফ হোসেন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৭

Dhaka University Institutional Repository

২১. বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৩৩৬

২২. শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-১২২

২৩. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৮০-১৮১

২৪. বৌদ্ধযুগের লালমাই, অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের, সৌগত, ২০০৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৩

২৫. বাংলা সাহিত্যে পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্ম সাধনা, বাংলা সাহিত্যে গুহ্য সাধনার ধারা, শ্রী শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৯

২৬. প্রাগুক্ত, বাংলা সাহিত্যে পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্ম সাধনা, বাংলা সাহিত্যে গুহ্য সাধনার ধারা, পৃষ্ঠা-৯৭

২৭. প্রাগুক্ত, বাংলা সাহিত্যে পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্ম সাধনা, পৃষ্ঠা-৯৮

২৮. বিষয়ঃ বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পা), কারুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৬৮/ প্রাগুক্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯১

২৯. বিশ্বসভ্যতা (প্রাচীন), এ কে এম শাহানাওয়াজ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ভূমিকা

৩০. বিশ্বসভ্যতা (মধ্যযুগ), এ.কে.এম শাহনাওয়াজ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২২৭

৩১. বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪

৩২. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ওয়াকিল আহমদ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৯

৩৩. প্রাগুক্ত, ইতিহাসে বাঙ্গালী, রমাপ্রসাদ চন্দ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৪

৩৪. প্রাগুক্ত, ইতিহাসে বাঙ্গালী, রমাপ্রসাদ চন্দ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১৯

৩৫. প্রাগুক্ত, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, মো. রমজান আলী, পৃষ্ঠা-২০-২৮

৩৬. পূর্বোক্ত, ভারতের ইতিহাস, কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৮

৩৭. Ibid, V.A. Smith, The Early History of India, P. 18

৩৮. ইতিহাসের দর্শন, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৬-৭

৩৯. বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২

৪০. ভারতের ইতিহাস কথা, ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৬

৪১. ইতিহাসে বাঙ্গালী, রমাপ্রসাদ চন্দ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস

২.১ নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও নরগোষ্ঠির উদ্ভব

২.২ বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ

২.৩ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাজন

২.৪ বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির স্রোতধারা

২.৫ বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস

(The Anthropological Classification of the Buddists in Bangaldesh)

কোন দেশের ইতিহাস লিখতে হলে সেই দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা দরকার। বাঙালির ইতিহাস না জানলে যেমন বাংলার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়, তেমনি বলা যায় বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রাচীন ইতিহাস না জানলে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়না। যে সকল জাতি বা জনগোষ্ঠী আজ হীন, বর্বর, অসভ্য, ম্বেচ্ছ, অন্ত্যজ বলে পরিচিত, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যেই কোন কোন শ্রেণী একদিন শ্রেষ্ঠ, সমুন্নত ও সুসভ্য জাতি হিসাবে সমাদৃত ছিল। তাঁরা বাংলা, বাঙালি জাতিসত্তার রূপকার; এরাই একদিন বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। 'বাংলার প্রাচীন জাতির আলোচনায় প্রমাণিত হইয়া পড়িবে বাঙালি কত জাতির পূজাপদ্ধতি, সামাজিক আচার প্রভৃতি আপনার নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। বাঙালী কোন জাতির বাঙালী কোন জাত তাহা জানিতে হইলে এই সমস্ত জাতির আলোচনা পরিহার করিলে চলিবে না। ...... করিলে বাঙালির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে'।[১]

২.১ নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ও নরগোষ্ঠির উদ্ভব

ইংরেজী Anthropology শব্দের বাংলা অর্থ নৃবিজ্ঞান কিংবা মানববিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব। শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। গ্রীক শব্দ Anthropos অর্থ নৃ (মানুষ) এবং Logia অর্থ পাঠ বা বিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞান তাই মানব বিষয়ক বিজ্ঞান। বিজ্ঞানভিত্তিক মানুষের পাঠই নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এর একটি শাখা অবশ্য মানুষের দৈহিক গড়ন প্রকৃতি ও দৈহিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। মূলত নৃবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক সত্তার পাঠ।[২] আবার নৃবিজ্ঞান অর্থ হলো সকল কালের সকল সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও চর্চা। প্রকৃতভাবে নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো মানব প্রকৃতির ইতিহাস, মানব গবেষণাই নৃবিজ্ঞানের মূলকথা। মানব সমাজ সম্পর্কে পূর্বে (ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড) এর আদি নাম ছিল Ethnology বা জাতিতত্ত্ব যার প্রধান লক্ষ্য ছিল মানব সংস্কৃতির ইতিহাসের চর্চা। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশ লাভ করে।[৩] আর তাই নৃতত্ত্ব ও নৃতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে যাঁরা গবেষণা, চর্চা বা আলোচনা করেন তাঁদেরকে নৃবিজ্ঞানী বা নৃতত্ত্ববিদ বলা হয়।

আধুনিক কালে দেহের গঠন প্রণালী, গায়ের রং, কেশ বিন্যাস প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা মানুষের জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে। নরগোষ্ঠির বৈশিষ্ট্য বস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তায়। নরগোষ্ঠির রূপান্তরে ভৌগোলিক অবস্থা, উপাদান, প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা, আত্মকর্মসংস্থান, কালবিবর্তন অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করে।

অনেকে বলেন, Race শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ জাতি (Nation) বা বর্ণ (Colour) প্রজাতি (Species) কিন্তু তা সঠিক নয়। Race এর বাংলা অর্থ করা খুবই কঠিন। তবে নরগোষ্ঠি হলে স্পষ্ট হয়। জাতি গঠনে যেসব উপাদান মূখ্যত দায়ী Race তার মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান মাত্র। জাতিগঠনে সাধারণ ভাষা, ধর্মীয় ঐক্য, পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্য সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা, সাধারণ জৈব ও শরীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-সংহিতা, জাতীয়তাবোধ, ঐক্যের অনুভূতি ইত্যাদি প্রধান। কি করে নরগোষ্ঠির সমূহের উদ্ভব হয়েছে তা অদ্যাবধি স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হয়নি। বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে বিভিন্ন নরগোষ্ঠিসমূহ স্বরূপ পরিগ্রহ করেছে। Heredity বলেন মানব জাতি সর্বকালে এমনকি আজও সংকর জাতিই বটে।[৪] যেসব জৈব শরীরবৃত্তীয় উপাদানের ওপর ভিত্তি করে নরগোষ্ঠির শ্রেণীবিভাগ করা হয় সেগুলো হলোঃ মানুষের মাথা, দেহ, মুখ, নাক, চুল, লোমের রং ঘনত্ব ও গঠন প্রকৃতি, দেহের উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি। এসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমগ্র মানব প্রজাতিকে কয়েকটি নরগোষ্ঠিতে ভাগ করে দেখানো হয়।[৫] যেমন ককেশয়েড, মঙ্গোলয়েড, নিগ্রয়েড ও অস্ট্রালয়েড। এগুলোর আবার প্রত্যেকটির উপরিভাগ রয়েছে।

২.২ বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ

বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠির লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের বলা হয় আদি অস্ত্রাল। এটি বলার কারণ হলো অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের ও দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য আছে। আদি অস্ত্রাল জাতির লোকের খর্বাকৃতি ও তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চাওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রং কাল ও মাথার চুল ঢেউ খেলানো।[৬] এই অস্ট্রিক জাতিই বাঙালিকে দিয়েছে তার প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হ্রস্ব কপাল (Brachycephalic)[৭] প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নিষাদ জাতির উল্লেখ আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে, তারা অনার্য, তাদের গায়ের রং কাল, আচার ব্যবহার ও ভাষা অদ্ভূত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যে নিষাদরাই যে আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠির অর্ন্তভূক্ত কোন উপজাতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাঙালার আদিম অধিবাসীরা এই গোষ্ঠির লোক। এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আগন্তুক দ্রাবিড় ভাষাভাষী কোন কোন উপজাতি। দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আলপীয়দের আসরে আসে। এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে। এদের আকৃতি মধ্যাকার এবং মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও গায়ের রং কালো। আবার আদি মিশরীয়দের সঙ্গেও এ জাতির মিল আছে।

সুতরাং আদি অস্ত্রাল ও ভূমধ্য নরগোষ্ঠির লোকদের সংমিশ্রণেই বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গঠিত হয়েছিল। এরা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। আদি অস্ত্রালরা সে ভাষায় কথা বলত সেই

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাকে বলা হয় অস্ট্রিক। এই 'অস্ট্রিক' ভাষাই বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। কারণ বাংলা ভাষায় অনেক অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার শব্দ রয়েছে। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় অস্ট্রিক প্রভাব খুব বেশী। বস্তুত অস্ট্রিক জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালির জীবনচর্যার বুনিয়াদ। ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, এদেশের ভেড্ডা প্রতিম (আদি অস্ট্রেলিয়) অধিবাসীরোই তাদের সাক্ষাৎ বংশধর। পরে কালক্রমে, নানা অবস্থায় তারা কম বেশি মাত্রায় পশ্চিম ইন্দোআর্য ও শক পামিরী উপাদান এবং পূর্বের মঙ্গোলীয় পারোইয়ান ও মালয় ইন্দোনেশীয় এসে মিশেছে।[৮] বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর হচ্ছে বাংলার উপজাতি সমূহ এবং প্রাচীন সমাজের 'অন্ত্যজ' শ্রেণীর লোক। (বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-২৪) পরবর্তী কালে এদেরকে, অনুন্নত উপজাতি বা তফসীলভূক্ত উপজাতি বলা হত বিভিন্ন সাহিত্যে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের অনার্য জাতি বলা হয়েছে। অনার্য জাতিদের বিভিন্ন নামে ডাকা হতো, যেমনঃ যবন, হুন, অন্ত্র, ম্লেচ্ছ, অসুর, দস্যু, পুলিন্দ, আভির, কিরাত, পাপ প্রভৃতি।

কোন কোন ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, বাংলার একটি অংশে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠির রক্তধারা প্রবাহমান। মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের মাথা গোল, ঘন ও ঈষৎ পিঙ্গল গায়ের রং, ভ্রু অনুচ্চ, মুখের পরিধি ছোট ও চিবুকের হাড় বেশি উঁচু, নাকের গড়ন মাঝারি ও চ্যাপ্টা; এদের মুখে ও গায়ে অল্প লোম, চোখের খোল বাঁকা, দেহের দৈর্ঘ্য মাঝারি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বাংলাভাষীর এ বাংলাদেশ চিরকালই বিভাষী-বিদেশী, বিজাতি বিজিত দেশ। অধিবাসীরাও মোটামুটি বিভিন্ন তরঙ্গে ও কালে আসা নানা গোত্রের ও অঞ্চলের বহিরাগত। এদেশে এসেছে অস্ট্রিক, নিষাদ, এসেছে আলপাইনীয় আর্য, এসেছে দ্রাবিড়, ভেড্ডিড কৃষিজীবি, এসেছে মঙ্গোল কিরাত, তারপর ঐতিহাসিক যুগে বিজেতা হিসেবে এসেছে মগধ থেকে নন্দ-মৌর্য-শুঙ্গ-কর্ম্ব-গুপ্ত-পাল-সেন,পূর্ববঙ্গে এসেছে চন্দ্র-বর্মন-দেব-খড়্গ প্রভৃতি বর্হিবঙ্গীয় শাসকগোষ্ঠি। বুনো বর্বর যুগের কথা আমরা কিছুই জানিনা, কেবল কালের মানুষের অবস্থা ও অবস্থান কিছু কিছু অনুমান করতে পারি মাত্র পরোক্ষ লক্ষ্যে ও প্রাতিবেশিক প্রমাণে।

এ অঞ্চলে নানা দেশের বহুগোত্রীয় মানুষের রক্তসাঙ্কর্য ঘটেছিল গোড়া থেকে। বস্তুত মধ্য ভারতের বিন্ধ পর্বতকে সীমা ধরে হিসেব করলে পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব প্রান্ত অবধি সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন রক্তের, বর্ণে ও অবয়বের মানুষের যত মিশ্রণ ঘটেছে এমনটি সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি।[৯] বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক সত্তা গঠনে এসকল নরগোষ্ঠির মিশ্রিত রক্তস্রোত প্রবাহমান। এ জনগোষ্ঠির রক্তের সংমিশ্রণে বর্ণ সংকর মিশ্র বাঙালি জাতির উৎপত্তি ও নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির, ধর্ম ও সংস্কৃতি বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতার জন্য ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন, বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে জাতি গোষ্ঠির নানা বৈচিত্র্য ও বসবাসের ফলে নৃতত্ত্বের বৈচিত্রতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের আদি অধিবাসী অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আলপীয়রা আর্যভাষী ভূমধ্য নরগোষ্ঠির লোক। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক গঠনে বৈদিক আর্যভাষী নর্ডিকদের রক্তও যুক্ত হয়। মঙ্গোলয়েড

Dhaka University Institutional Repository

মহাজাতির মধ্য এশিয়া, ভোট-ব্রহ্ম, ভোট-চৈনিক প্রভৃতি শাখার নরগোষ্ঠির লোকেরাও বাংলাদেশে এসেছে। বাংলার উত্তরপূর্ব অংশের রাজবংশী, কোচ এবং দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের চাকমা প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা এদেরকে বংশধর। মঙ্গোলয়েড় মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহ (যেমন সোজা চুল, পীতবর্ণ গায়ের রং, চিকন চেরা চোখ, উর্ধ্ব অক্ষিপুটে প্রকট ভাঁজ, বিস্তৃত শিরস্ক মাথা, চ্যাপ্টা মুখ, পাতলা ঠোঁট, অনুচ্চ নাক ইত্যাদি এদের মধ্যে বিদ্যমান।[১০] পরবর্তীকালে শক প্রভৃতি যে সব নরগোষ্ঠির লোকেরা ভারতবর্ষে এসেছে তাদের রক্তও বাঙালির রক্তের সঙ্গে মিশেছে।[১১] এইসব অন্যান্য নরগোষ্ঠির রক্তের সংমিশ্রণ থাকলেও নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি মূলত আদি অস্ত্রাল।[১২] আদি অস্ত্রালরা এদেশের সর্বপ্রাচীন অধিবাসী, তাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠির ভাষা; বাঙালি জাতি মূলত অনার্য বংশ উদ্ভূত। মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠির লোক বার্মা (মায়ানমার) হয়ে আরাকান, কক্সবাজারসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে অস্ট্রো এশীয় এবং ভোট চীন গোত্রীয় জনগোষ্ঠিই আরাকানের খ্রিস্টপূর্ব যুগের আদি অধিবাসী বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠির প্রাচীন খাসী, কুকী, চাকমা, মারমা, চীনা অর্থাৎ অস্ট্রো নেগ্রিটো দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় আলপাই-নর্ডিস মিশ্রণে গঠিত বলে স্বীকৃত। এ অঞ্চলের অধিবাসীরাও ছিল বৌদ্ধ। এ নরগোষ্ঠির রক্তস্রোত ধারা বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠির মধ্যে বর্তমান।

২.৩ বাঙালির নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাজন

বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় রয়েছে। বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠি, ধর্ম, সমাজ, জীবনবোধ, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বহুমাত্রিক এবং বহুধা বিভক্ত। বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের মতে, যেমন বিচিত্র সংকর জনগোষ্ঠি বাঙালি আর তেমনি বিচিত্র বাঙালির ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে নানা বর্ণ গোষ্ঠি এবং জাতির মিশ্রণ ও মিলনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জাতিতত্ত্ব নিরূপণ করা বর্তমানে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এখানে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

'প্রাচীন বাংলার সুবিস্তৃত জনপদভূমি সেই অতিদূর অতীতে যে সকল আদিম জনজাতিগোষ্ঠির নিবিড় পদচারণায় একদা মুখর হয়ে উঠেছিল এবং বাংলার বা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে অন্য যেসব জাতিগোষ্ঠী এসে তার আদিম সভ্যতা কৃষ্টির সঙ্গে মিশে একটা মিশ্র, নতুন ও সমৃদ্ধ তথা বাঙালি সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। ভারতের সব রকম নৃগোষ্ঠিগত উপাদান... ককেশীয়, দ্রাবিড়, আর্য, নেগ্রিটো, মোঙ্গোলয়েড, অস্ট্রো-এশিয়াটিক...সব ধরণের রক্ত আর নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বাঙালির মধ্যে আছে, কোথাও কম, কোথাও বেশি।'[১৩] নৃতাত্ত্বিক জাতিতত্ত্ব নিরূপণের জন্য প্রধানতঃ তিনটি[১৪] বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়-

১) প্রাচীনতম মানবের কঙ্কালাস্থি।

Dhaka University Institutional Repository

২) জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক নজির।

৩) বর্তমানে দৃষ্ট জাতিগুলি নৃতত্ত্বমূলক বৈজ্ঞানিক পরিমান।

১৯০১ সালে ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট ও ভারতীয় জাতিতত্ত্ব সঙ্কলন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ Sir Herbert Hope Risley ভারতীয় জনসমষ্টিকে ৭টি শ্রেণীতে বিভাজন করেছেন-১) মোঙ্গোলীয় ২) ইন্দো-আর্য ৩) দ্রাবিড়ীয় ৪) মোঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয় ৫) আর্য-দ্রাবিড়ীয় ৬) শক-দ্রাবিড়ীয় ও ৭) তুর্কো-ইরানীয়। এই শ্রেণীবিভাগ সর্বজন গ্রহণীয় হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৩২-৩৩ খ্রি. নৃতত্ত্ববিদ J.H. Hutton ভারতীয় নৃগোষ্ঠিকে ৮টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক ড. বিরজা শঙ্কর গুহ এতদঞ্চলের মানব সমাজকে ৬টি প্রধান শ্রেণীতে নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালয়েড়, মোঙ্গলয়েড, মেডিটারেনিয়ান, নর্ডিস ও ওয়েস্টার্ণ- ব্র্যাকিসিফেলাস এবং এদের আবার ৯টি উপবিভাগে পুর্নবিন্যাস করেছেন। উল্লেখ্য তাঁর এই শ্রেণীকরণ আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[১৫] জার্মান লাইপৎসিগস্যাক্সন ইনস্টিটিউটের প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Von Eickstedt ভারতীয় নৃগোষ্ঠিকে ৪টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর শ্রেণীকরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে একদেশদর্শী হলেও আধুনিক বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-[১৬]

মূল শাখা বা শ্রেণী	উপশাখা	নমুনা
ভেড্ডিড বা ভেড্ডা প্রতিম (Veddid)	গোন্ডিড	মধ্যভারতের 'গোন্ড' বা গোন্দ জাতীয়গণ।
	মেলিড	দক্ষিণ ভারতীয় আদি কোন জনগোষ্ঠী বা আদি অস্ত্রাল।
মেলানিড (Melanid)	মেলানিড	দক্ষিণ ভারতীয় অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতির ধারক-বাহক তামিলভাষী জনগোষ্ঠী।
	কোলিড	মধ্যভারতীয় নাহুল আলোচিত কোল-মুণ্ডাভাষী নৃগোষ্ঠি।
ইণ্ডিড (Indid)	প্রকৃত ইণ্ডিড	মূলত নর্ডিক জনগোষ্ঠি
	উত্তর ইণ্ডিড	ইন্দো-ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত দীর্ঘশিরস্ক জাতি যেমন- টোডা প্রভৃতি।
	ব্র্যাকিড (একে তিনটি ভাবে বিভক্ত করা হয়)	ইন্দো-ভূমধ্যীয় বা ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত বিস্তৃত ও মধ্যম শিরস্ক জাতি, যেমন- আলপাইন, দিনারিক প্রভৃতি।
মোঙ্গোলয়েড (Palaeo-Mongoloid)	মূলত মঙ্গোলীয় জনজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নৃগোষ্ঠি।	

Dhaka University Institutional Repository

এই সমস্ত নরগোষ্ঠির আদিবাসীদের ভাষাকেই তিনটি গোষ্ঠিতে বিভক্ত করা হয়- অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠি।[১৭] উক্ত আলোচনায় মোটামুটি ভারতীয় জনগোষ্ঠিকে ৫টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ ১) নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু ২) অস্ট্রিক অস্ট্রো-এশিয়াটিক তথা 'নিষাদ' ৩) দ্রাবিড়ভাষী ৪) মোঙ্গোলীয় তথা কিরাত এবং ৫) আর্য নর্ডিক, আলপীয়, দিনারিক প্রভৃতি।

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক বিষয়ে অনুসন্ধান এখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বাংলার কোথাও কোথাও প্রাচীন উপমানব ও মানবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া গেছে। তবুও সর্বপ্রথম বাংলায় কোথায়, কবে, কখন, কিভাবে, কারা মানববসতি শুরু করেছিল, তা আজো নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হয়নি।[১৮] কালে কালে বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় যে ধারণাটি বর্তমান তা হলো বাঙালিরা রক্ত সংকর জাতি, একক কোন মৌলিক জাতি নয়। জাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্য জাতির বংশোদ্ভুত নন। গবেষণা ও পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞগণ বাংলা অনার্য জাতির আদি বাসস্থান বলে ধারণা করেন, কিন্তু এটি সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ নয়। কারণ অনেকে মনে করেন যে, 'মঙ্গোল জাতির সংমিশ্রণ বাঙালি জাতির সৃষ্টি।'[১৯] দ্রাবিড় ও আর্য ভাষা ভিত্তি নাম, কোন মানব গোষ্ঠি নয়। অনেকে বলেন, বঙ্গ ও পুণ্ড্র নামে আদিম অধিবাসী। আবার অনেকে বলেন কোল, ভীল, শবর, নাগ, ডোম, চণ্ডাল। আবার কেউ কেউ বলেন, বাংলার আদিম অধিবাসীগণ অস্ট্রিক: যা নিষাদ জাতি নামে অধিক পরিচিত, অভিহিত।

বাংলাদেশের প্রাচীন ভূভাগে কারা আদিম জনজাতিগোষ্ঠি এই অনুসন্ধিৎসায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দেশ-বিদেশী বিভিন্ন লেখক, ঐতিহাসিক, গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বাংলার স্থানে প্রত্ন খনন, বিভিন্ন পুরাবস্তুর আবিষ্কার, প্রাচীন মানবের বিশেষত এ অঞ্চলের একদা বসবাসরত মানুষের খুলি ও কঙ্কালাস্থি বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জীবিত মানুষের দৈহিক অবকাঠাকামোর পরিমাপ এবং নানাদিক পর্যবেক্ষণ করে এ জনপদে যেসকল জাতিগোষ্ঠির অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করেন তাতে প্রধানত ৪টি গোষ্ঠির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা:

ক) অস্ট্রিক ভাষী জনজাতিগোষ্ঠি, খ) দ্রাবিড় ভাষী জনজাতিগোষ্ঠি, গ) আর্য ভাষী জনজাতিগোষ্ঠি, ঘ) মোঙ্গোলীয় জনজাতিগোষ্ঠি। বাঙালি জাতি বলতে আমরা তাঁদের বুঝি, যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে একটা বিশিষ্ট জীবনযাত্রা, প্রণালী, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। নৃতাত্ত্বিক পর্যায় (Race) বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝায় যাঁদের সকলের মধ্যেই জীনকণা (Genes) ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ভিত্তিক কতকগুলি বিশিষ্ট অবয়বগত সাদৃশ্য আছে। অবয়বগত কোন কোন সাদৃশ্য থাকলে, আমরা কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করব, সে সম্বন্ধে সুধীজনের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণ[২০] সুধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে-

১। মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং
২। গায়ের রং

Dhaka University Institutional Repository

৩। চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য
৪। দেহের দীর্ঘতা
৫। মাথার আকার
৬। মুখের গঠন
৭। নাকের আকার ধরণ
৮। শোণিতবর্গ বা Blood Groups

নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাজন ও গঠন বিন্যাস এবং নৃগোষ্ঠির বৈশিষ্ট্য বিচার বা চিহ্নিতকরণ একটি জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়। এই লক্ষণগুলোর মধ্যে মাথার চুল, চেহারা ও দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্য ও রং অন্যতম। যেমন-

প্রথমতঃ ঋজু বা সোজা চুল (Straight hair) এবং চেহারা চ্যাপটা ও দেহের দীর্ঘতা, দীর্ঘ শিরস্ক (Dolichoceplialic) মঙ্গোলিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ।

দ্বিতীয়তঃ কুঞ্চিত বা কোঁকড়া চুল (Woolly hair) দীর্ঘ দেহ, গায়ের রং কালো ও পীত, মুখ ও নাকের গঠন লম্বা এবং নাতিদীর্ঘ শিরস্ক (Mesaticephalic) নিগ্রোজাতির লক্ষণ।

তৃতীয়তঃ তরঙ্গায়িত বা ঢেউ খেলানো চুল (Smooth, Wavy or curly hair) দেহের গঠন মধ্যমাকৃতি বা খর্বাকৃতি, গায়ের রং গৌরবর্ণ ও ফর্সা, দীর্ঘ নাসিকা, এবং বিস্তৃত শিরস্ক (Brachycephalic), এটা বৈদিক আর্য ও দ্রাবিড় জাতির লক্ষণ এবং পৃথিবীর অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ।

মানব জাতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সোজা, কোঁকড়া ও তরঙ্গারিতয় তিন শ্রেণীর চুল, গায়ের রং অনুযায়ী মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-ফর্সা, কাল ও পীত রং। দেহের দীর্ঘতা অনুযায়ী মানুষকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-বামন, খর্বাকৃতি, মধ্যমাকৃতি, দীর্ঘ, অতিদীর্ঘ। মানুষের মাথার আকার বা শিরসূচকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-দীর্ঘ শিরস্ক, মাঝারি শিরস্ক ও বিস্তৃত শিরস্ক। নাকের আকারের দিক থেকে তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভূক্ত করা হয়- লম্বা সরু নাক, মাঝারি নাক, চওড়া নাক।

বাঙালির উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হার্বাট রিজলী বাংলার অধিবাসীদেরকে মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, চট্টগ্রামের রাজবংশী, মগ, বাকুঁড়া ও মেদিনীপুরের মাল এবং জল পাইগুড়ি ও রংপুরের কোচ ও পোদ জাতিগণকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত বলে ধরে নেন এবং যেহেতু বিস্তৃত শিরস্কতা ও বিস্তৃত নাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড় জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য এবং এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালি ব্যতীত উপরি উক্ত অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়।[২১] কিন্তু এই মতবাদের সপক্ষে কোনই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই।

এটা সত্য যে বাংলার উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত। এই জাতিসমূহ বিস্তৃত শিরস্ক তথাপি উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে দীর্ঘ শিরস্কতারই প্রাধান্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও পূর্ব সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘ শিরস্ক, পূর্ব বাংলার বাঙালিরা কিন্তু বিস্তৃত শিরস্ক। ড. অতুল সুর বলেন, বাঙালি যে মঙ্গোলীয় জাতি সম্ভূত নয় তার অনেক প্রমাণ আছে। দ্রাবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশি রক্ত সম্বন্ধ নেই। রিজলির সময়ে দ্রাবিড় জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত এবং সেজন্যই তিনি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক গঠনে দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙালির মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ প্রাক দ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা আদি অস্ত্রাল (Proto-Australaid) জাতির রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে উচ্চশ্রেণীর বাঙালি যে আলপাইন (Alpine) পর্যায়ভূক্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, আলপীয়রা ছিল বাঙলার আগন্তুক জাতি। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর ভলগা থেকে গঙ্গা গ্রন্থে বলেন যে, আর্য জাতির আগমনের বহুপূর্বে এদেশে অনার্য জাতির বসবাস ছিল এবং তারা একটি সভ্যতা গড়ে তোলে। এ সমস্ত অনার্য জাতির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য কিরাত, দামিল ও নিষাদ জাতি।[২২] আবার ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বাংলায় নিষাদ জাতি থেকে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে। কিরাত, দামিল ও নিষাদ জাতি ছাড়াও পুণ্ড্র নামে আর এক অনার্য জাতি উল্লেখ আছে। কিরাত জাতি মোঙ্গোলীয় ও ভোট-চীনা (ভুটান) গোষ্ঠি থেকে উদ্ভূত। অনেকে মনে করেন চাকমা, গারো, সাঁওতাল, ওরাঁও, মেচ ও কোচ উপজাতিগণ কিরাত জাতির বংশধর। আদিম অনার্যদের মধ্যে অপর এক জাতি ছিল দামিল। বাংলায় অনার্য জাতিদের বিভিন্ন নামে ডাকা হতো যেমন যবন, হুন, অন্ধ্র, ম্লেচ্ছ, অসুর, দস্যু, পুলিন্দ, আভির, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি। বাঙালিরা রক্ত সংকর বলেই নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতীব জটিল। ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, বাঙালি জাতি হচ্ছে মিশ্র অনার্য জাতি, আর্যভাষা আর আর্য সভ্যতা নিয়েছে মাত্র, তাও খুব প্রাচীন কালে নয়।..... প্রাগৈতিহাসিক কালে বাঙ্গালার অধিবাসীরা কী প্রকারের মানুষ ছিল তাহা জানা অসম্ভব; তবে অনুমান করা হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতেই বাংলাদেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব-পুরুষেরাই বাস করে আসতেছে। ..... বাংলাদেশে আর্য ভাষা আসার পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলত। তিনি আরো বলেন, পাঁচটি জাতি বা ভাষার লোকের মিশ্রণে উত্তরভারতের নানা জনগণের উদ্ভব হয়েছে। যথা: ১) নিগ্রোরূপ বা নেগ্রিটো ২) অস্ট্রিক ৩) দ্রাবিড় ৪) আর্য ৫) ভোট-চীন। ...... এই রূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য ... এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল।[২৩]

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই জাতি লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মূলগত ঐক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সমুদয় জাতিই একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠির বংশধর। এই মানবগোষ্ঠিকে। অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অস্ট্রিক; কিন্তু কেউ কেউ একে নিষাদ জাতি আখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

দিয়াছেন।....নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। ইহাদের একটির ভাষা দ্রাবিড় এবং আর একটির ভাষা ব্রহ্ম-তিব্বতীয়।'[২৪] তবে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। বাংলার বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুদের পূর্বপুরুষ। এরা বৈদিক আর্য থেকে পৃথক। এর প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত পণ্ডিত ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ রমা প্রসাদ চন্দ, ইন্দো-এরিয়ান দেশ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পামির ও টাকলামা খনি অঞ্চলের অধিবাসী হোম-আল-পাইনাস নামে অভিহিত এবং এ জাতির লোকই বাঙালির আদিপুরুষ। এরা প্রথমে মধ্য এবং পরে বঙ্গদেশে আসে। অবশ্য প্রখ্যাত পণ্ডিত বিরজা শংকর গুহ বলেন, বাঙালির পূর্বপুরুষেরা পারস্য ও বেলুচিস্তান অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে এসেছিল। [২৫] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদ ড. অতুল সুর বলেন, বাঙালীকে মিশ্রজাতি বলা হয়। ... পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা যেমন মিশ্রজাতি, বাঙালিও তাই। বাঙালীর আবয়বিক নৃতাত্ত্বিক গঠনে যেসব জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তারা হচ্ছে অস্ট্রিক ভাষাভাষী বাংলার আদিম অধিবাসী ও আগন্তুক দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠি ও আর্যভাষা-ভাষী আলপীয় (বা দিনারিক) জাতিসমূহ তবে অস্ট্রিক ভাষাভাষী বাংলার আদিম অধিবাসী ও আলপীয় (বা দিনারিক) রক্তই প্রধান। এই শেষোক্ত জাতিই বাঙালীকে দিয়েছে তার প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য .... প্রশস্ত (হ্রস্ব) কপাল (Brachycephalic)। এখানেই উত্তর-ভারতের দীর্ঘ কপাল (Dolichocephallic) জাতিসমূহ থেকে বাঙালির পার্থক্য। নৃতাত্ত্বিক, ভাষাবিদ, পণ্ডিত, গবেষক ঐতিহাসিকদের মতে, বাংলার আদিম অধিবাসী নিষাদ, বঙ্গ ও পুণ্ড্র জাতি। আবার অনেকের ধারণা কোল, ভীল, মুণ্ডা, শবর, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি বাংলার আদিম বাসিন্দা বা জাতিগোষ্ঠি। বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কিংবা পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আধুনিক কালের দু'জন প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক সর্বজন শ্রদ্ধেয় ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. আহমদ শরীফ তাঁদের সাহিত্য রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার প্রাচীন বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তাদের মত পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করা হলো।

ড. সুনীতি কুমার, চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' গ্রন্থে লিখেছেন, [২৬] বাঙালি জাতির সৃষ্টিতে এই কয়টি বিভিন্ন মূল জাতির উপাদান সমূহ বিদ্যমান:

(১) লম্বা আর উচু-মাথা-ওয়ালা একটা জাতি...North Indian'Aryan' Longheads: এই জাতিটিই হচ্ছে আর্য ভাষী জাতি, এই হল অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদদের মত...পাঞ্জাবে, রাজস্থানে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটি খুববেশী পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের এইরূপ লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক বেশি মেলে না, অতি অল্প-স্বল্প যা কিছু পাওয়া যায়।

(২) লম্বা আর নীচু-মাথা-ওয়ালা একটি জাতি...South Indian or Dravido-Munda Longheads: আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড় ভাষীরা আর কোল জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাংলাদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

(৩) গোল-মাথা-ওয়ালা একটি জাতি... Alpine Shortheads: এদের সরল নাক, মুখে দাঁড়ি-গোফের প্রাচুর্য; সিন্ধু প্রদেশে, গুজরাটে, মধ্য ভারতে কর্ণাট ও অন্ধ্রে এদের বাস ছিল...এইরূপ মস্ত কাকৃতির লোক ওই দেশে এখনও বেশী করে দেখা যায়; বাংলাদেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচর্য বেশি, বিশেষ করে ভদ্রজাতির মধ্যে; সাধারণ বাঙালি গোল-মাথা-ওয়ালা পাঞ্জাবীদের মত লম্বা-মাথা-ওয়ালা নয়।

(৪) গোল-মাথা-ওয়ালা আর একটি জাতি...Mongolian shortheads: এরা মোঙ্গোল জাতীয় লোক, নাক চ্যাপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোফ দাঁড়ি কম, উত্তর আর পূর্ববঙ্গের বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী করে পাওয়া যায়।

এই চার জাতির মিশ্রণে আধুনিক বাঙালি।

ড. আহমদ শরীফ তার 'বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-২৪-২৬) বাঙালির জাতিতত্ত্বে এই বিষয়টি মোটামুটি স্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন:

"বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এখন এরূপ: আদি অস্ট্রিকরাই (আদি অস্ত্রাল) এ দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা। এরা সম্ভবত জলপথে বাংলায় প্রবেশ করে। অথবা স্থল পথে দক্ষিণ উপকূলে হয়ে এসে বাংলায় ওড়িশায় এবং ছোটনাগপুর অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। পরে ভূমধ্যসাগরীয় আর একদল উপকূলীয় স্থলপথে বা জলপথে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ ও বসবাস করে। তারাই দ্রাবিড় (ভেড্ডিড) নামে পরিচিত। তাদের ও কিছু লোক অস্ট্রিকদের সঙ্গে বাস করে। এবং কালে উভয়ের রক্তমিশ্রণ ঘটে। ফলে তাদের অবয়বে ঘুচে যায় এবং মানসে মুছে যায় তাদের গোত্রীয় স্বাতন্ত্র। এরপরে আসে হ্রস্বশির আলপাইনীয় আর্যভাষী জনগোষ্ঠী। তাই বিহারের উত্তরে এদের কোনো নিদর্শন মেলে না। এরা সমসময়ে বা আরো আগে হিমালয় ও লুসাই পবর্তের মালভূমি অধিত্যকা অঞ্চলে নেমে আসে বিভিন্ন গোত্রের মঙ্গোল জনগোষ্ঠি। তাদের রক্তও মিশ্রিত হয়েছে এ অঞ্চলে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় আলপীয় নরগোষ্ঠীর রক্তের সঙ্গে। পরে আর সেসব বিজেতা, ব্যবসায়ী বা যাযাবর এসেছে, তাদের রক্ত ও এদেশী মানুষের মধ্যে রয়েছে বটে, তবে তা সামান্য ও বিরল, তাই দুর্লক্ষ্য। অবশ্য নিগ্রোরক্তের মিশ্রণের কিছু লক্ষণ ও কিছু পরিচয়ে তারা পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি গোষ্ঠি নামে অভিহিত হয়।

এভাবেই আজকের অসমীয়া বাঙালি ওড়িয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। ---চোখ-চুল-চোয়াল ও নাক-মুখ-মাথার গড়ন আর দেহের বর্ণ, রক্ত এবং আকার ধরেই নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী ও পর্যায় নির্ধারণ করা হয়।

(১) অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিল রয়েছে বলেই নৃতত্ত্বের পরিভাষায় আমাদের 'অস্ট্রিক' (Proto-Australoid) বলা হয়। আদি অস্ট্রিকদের দেহ খর্বাকার, মাথা লম্বা ও মাঝারি,

Dhaka University Institutional Repository

নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, দেহ বর্ণ কালো, মাথার চুল ঢেউ খেলানো কোঁকড়া। কোল, ভীল, মুণ্ডা, শবর, ওরাঁও, পুলিন্দ, সাওতাল, কোরওয়া, জুয়াঙ, কোরবু প্রভৃতি প্রায় বিশুদ্ধ অস্ট্রিক এবং এরা আমাদের নিকট জ্ঞাতি। মুণ্ডা বা মুণ্ডারী ভাষাই আদি অস্ট্রিক ভাষার বিবর্তিত রূপ। অস্ট্রিকরাও মূলত ভূমধ্য সাগরীয় বর্ণের নরগোষ্ঠী।

(২) ভূমধ্যসাগরীয় অপরবর্গের নরগোষ্ঠী হল দ্রাবিড়রা। এরা 'ভেড্ডিড' নামেও পরিচিত। এরা সম্ভবত স্থলপথে উপকূল ধরে দক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে। এরা দেহে মধ্যমাকার, এদের মাথা লম্বা, নাক ছোট, দেহবর্ণ শ্যামল।

(৩) আলপাইনীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষী ইরান-ভারতের (ইন্দো-ইরানী) নরগোষ্ঠী একই ভাষী বটে, কিন্তু নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় গোত্রে পৃথক। মূলত আলপাইনীয় বা আলপীয় ও ইন্দো-ইরানী-ইউরোপীয় আর্যভাষীরা এশিয়ার উরাল মালভূমি এবং দক্ষিণের সমতলভূমি থেকে দানিয়ুব নদীর উপত্যকা অবধি ছড়িয়ে বাস করত, তাদের মধ্যে তাই স্থানিক ভাষায় সাদৃশ্য রয়েছে। বিদ্বানদের মতে 'আর্য' নামটি তাই ভাষা জ্ঞাপক-'জ্ঞাতি' বাচক নয়। আলপস পার্বত্য অঞ্চলে যে দল ছড়িয়ে পড়ে তারা আলপীয়; আর যারা পশ্চিম ইউরোপে মধ্য এশিয়ার, ইরানে ও ভারতে প্রবেশ করে তারা সম্ভবত অভিন্ন-বর্গের নরগোষ্ঠী। তারা 'নর্ডিক'বর্গের নরগোষ্ঠী বলে পরিচিত। আলপীয়রা ছিল কৃষিজীবি আর নর্ডিকরা বহুকাল ধরেছিল যাযাবর এবং পশুজীবি। আলপীয় আর্যরা হ্রস্বশির, মধ্যমাকার, মাথার খুলি ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখগোল, দেহবর্ণ গৌর। আলপীয়রা পরে এশিয়া মাইনর হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা অঞ্চলে এবং পূর্ব উপকূল ধরে বাঙলা-ওড়িশায় বাস করে।

(৪) মঙ্গোলীয় বর্গের লোকেরা সাধারণভাবে লেপচা, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, কিরাত, রাজবংশী, কোচ, মেচ, হাজং, মুরং, মঘ, খাসিয়া, ত্রিপুরা, মিজো, মারমা, আরাকানী প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রীয় নামে পরিচিত। দুনিয়ায় এককভাবে মঙ্গোলীয়বর্গের লোকের সংখ্যাই অধিক। জাপান থেকে মধ্য এশিয়া ও রাশিয়া অঞ্চলে এদের বাস। রক্ত মিশ্রণের ফলে নৃতত্ত্বের একক মাপে অবশ্য এখন তাদের চিহ্নিত করা যায় না। সাধারণ ভাবে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী মাথা গোল, চুল কালো ও ঋজু, মাথার খুলির পিছনের অংশ স্ফীত, গাত্র বর্ণ পীত, ঈষৎ ও ঘন পিঙ্গল, ভ্রূ অনুচ্চ, মুখাবয়ব ছোট বা স্বল্প পরিসর, চিবুকের হাড় উঁচু, নাকের গড়ন মাঝারি এবং চ্যাপ্টা, মুখে ও দেহে লোম স্বল্প, চোখের খোল বাঁকা এবং দেহ মধ্যমাকার।

(৫) নর্ডিস আর্যরা সাধারণভাবে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ (লম্বা) ও সরু নাসা, দীর্ঘ (লম্বা) শির বা দীর্ঘকপাল, দেহদীর্ঘ এবং বলিষ্ঠ। নর্ডিস আর্যরা প্রাচীনকালে গ্রীস, ইরান ও ভারতে এবং এ যুগে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানে- দর্শনে-সাহিত্যে ও কৃৎকৌশলে প্রাধান্য পাওয়ায় দুনিয়ার তাবৎ জাতির ঈর্ষার পাত্র। ... প্রাচীন বাঙালার নিষাদরা অস্ট্রিক দ্রাবিড় আর কিরাতরা ছিল মঙ্গোল। বাংলার দেশজ মুসলমানরা এবং তথাকথিত নিম্নবর্গের লোকগুলি (তফসিলী) অস্ট্রিক দ্রাবিড়। আর সম্ভবত উচ্চবর্ণের হিন্দুর

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে আলপীর রক্ত বেশি। নর্ডিস আর্য রক্তের মানুষ বাঙলায়, বিরল-- নেই বললেই চলে। নর্ডিস আর্যরক্ত বাংলায় বিরল বটে, তবে নর্ডিস আর্যশাখার বৈদিক আর্যদের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি (জৈন-বৌদ্ধসহ) দু'হাজার বছর ধরে বাঙালির মন-মনন ও জীবন জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে।[২৭] ড. রংগলাল সেন বলেছেন, বাংলার আদিবাসীরা ছিল প্রাক-দ্রাবিড় বা আদি অস্ট্রেলিয় নরগোষ্ঠির লোক। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। এরপরে বাংলায় আসে দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক, তারপরে আসে আর্যগোষ্ঠির লোক। বাঙালির জাতিতাত্ত্বিক বিকাশে এক পর্বে মঙ্গোলিয় রক্তধারারও সংমিশ্রণ হয়।[২৮]

"সারা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ আধুনিক কালে প্রচলিত ভাষাগুলোর বিচারে, চারটি ভাগে বিভক্ত। ১) অস্ট্রিক, যাকে বাংলায় অনেকে নিষাদ, কোল, ভীল, মুণ্ডা ভাষী হিসেবে চিহ্নিত করেন ২) দ্রাবিড়, যাকে বাংলায় অনেকে দাস, দস্যু, শুদ্র ৩) ইন্দো-মঙ্গোলিয় কিংবা তিব্বতী চীনীয় বা কিরাত এবং ৪) ইন্দো-ইউরোপীয় বা ইন্দো-আর্য অর্থাৎ আর্য।[২৯] উল্লেখ যে, অস্ট্রিক ভাষাভাষীর মানুষজন আসলে আদিতে নিগ্রোমহাজাতিরই অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, নেগ্রিটো মানুষ ভারতসহ বাংলা অঞ্চলের আদি মানুষ ছিল।[৩০]

২.৪ বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর স্রোতধারা

বাংলার প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমিত হয় যে, কালপরিক্রমায় এদেশে নানা নৃগোষ্ঠির রক্তস্রোতধারা এসে মিশেছে। উল্লেখযোগ্য নৃগোষ্ঠী বা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে হলো:

ক) অস্ট্রিক (Austric)

খ) দ্রাবিড় (Dravidian)

গ) আর্য (Aryan) বা নর্ডিস-আলপাইন (Nordic-Alpine)

ঘ) মোঙ্গোলীয় (Mongoloid)

বাংলাদেশের জাতিগঠনে যে সকল নরগোষ্ঠীর প্রভাব প্রকটভাবে বিদ্যমান নিম্নে সেসব য় বিভিন্ন নরগোষ্ঠির পরিচয়, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

ক. অস্ট্রিক বা আদি অস্ত্রাল (Proto-Austroloid)

নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, বহুকথিত 'দ্রাবিড়' পূর্ব বাংলার আদিম অধিবাসী ছিল 'অস্ট্রিক' ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠির লোকেরা। এদের সঙ্গেই বর্তমান বাঙালির সবচেয়ে আদি ও নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, নিম্নবর্ণের বাঙালির এবং বাঙলার আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ত্ববিদেরা তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Austroloid)'।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

'অস্ট্রিক' শব্দটি লাতিন 'Auster' বা অাউস্তের যার অর্থ দক্ষিণ প্রান্ত---তা থেকে উদ্ভূত। এ হিসেবে এদেরকে। দক্ষিণদেশীয় বা দক্ষিণ বা দক্ষিণীয়ও বলা হয়। এদের বসবাস ও চলাচল তথা বিস্তৃতি ছিল পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ঈস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিক Sir George Abraham Grierson এর Lingustic Survey of India গ্রন্থে উল্লেখ করেন:

The Austric Family: Its speakers are found scattered over Nearer and further India, and form the native population of Indonesia, melanesia, and polynesia, including Madagascar and New Zealand. It extends from Madagascar, off the coast of Africa, to Easter Island which is less than forty degrees from the coast of south America. In the North, traces of it were discovered in Kanawar in the Punjab, and its southern limit included New Zealand. West of Easter Island it covers the whole pacific Ocean, except Australia (Including Tasmania) and a part of New Guinea.[৩২]

এদেরকে প্রোটো বা আদি অস্ত্রাল বলার কারণ হলো অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠির মিল রয়েছে। দৈহিক গঠন ছাড়াও আদিবাসী অস্ট্রেলিয়দের সঙ্গে এদের রক্তের শ্রেণীগত সাদৃশ্যও বর্তমান। বর্তমানে তারা প্রোটো ও আদি শব্দ দুটি ছাড়া অস্ট্রিক নামে পরিচিত অস্টিক ভাষাভাষীগণ মূলত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ১) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও ২) অস্ট্রোনেশীয়।[৩৩] ভারতবর্ষে যে সকল অস্ট্রিক ভাষা প্রচলিত ছিল ও আছে, সেগুলি অস্ট্রো-এশিয়াটিক, শাখার অন্ত র্গত। যেমন- মুণ্ডা বা কোল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির লোক। ভাষাতাত্ত্বিক গ্রিয়ারসন এ জাতির বিভিন্ন উপভাষাগুলিকে খেরওয়ারি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, অতীতে হিমালয় অঞ্চল অবধি অস্ট্রিকগণের কোল, ভীল, মুণ্ডা ভাষা প্রচলিত ছিল।[৩৪]

'অস্ট্রিক' ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা খর্বাকৃতি, মাথার খুলি দীর্ঘ বা লম্বা থেকে মধ্যমাকার, নাক চ্যাপ্টা ও চওড়া, গায়ের রং কালো এবং চুল ঢেউ-খেলানো। এদের আবয়বিক গঠন ও বিস্তার সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন রায় বলেন, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিম অধিবাসীরা যে খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাক, তাম্রকেশ, চ্যাপ্টা মুখ এই আদি অস্ট্রেলীয়দের বংশধর এতে কোনও সন্দেহ নেই। বর্তমান বাংলাদেশের বিশেষ করে, রাঢ় ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের সাঁওতাল, গারো, শবর, ভূমিজ, মুণ্ডা, কোল, ভীল, বাঁশফোঁর, নিষাদ, পোদ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আদি অস্ট্রাল নৃগোষ্ঠির লোক।[৩৫] আধুনিক ঐতিহাসিকদের ধারণা, সম্ভবত অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠির পূর্ব পুরুষেরা প্রথম উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল। তারপর সেখান থেকে তারা সিংহল (শ্রীলংকা), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপে ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, অনুমান হয়, উত্তর ভারতে---গঙ্গাতটে, বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, এবং

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটা মধ্য ভারতে---অষ্টিক ভাষী লোকদের বসবাস বেশি ছিল।[৩৬] ড. সুকুমার সেন বলেছেন, অতি প্রাচীন যুগ থেকে বৃহত্তর বাংলায় কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ করে বিহার, ছোট নাগপুর, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও সিলেট অঞ্চলে এবং উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় ক্রমশ এরা বিস্তৃত হয়েছিল। ঐতিহাসিক কালে সমগ্র বাংলায় তাদের বিচরণ ছিল না। তবে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, এদের সংস্কৃতি সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত ছিল।[৩৭] মোটকথা বাঙালির জীবনে অস্ট্রিক প্রভাব অত্যন্ত গভীর, তীব্র, প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী। বৌদ্ধযুগে বাংলায় উত্তরবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে ব্যাপক কার্পাস চাষ হতো। কার্পাস, কম্বল, মসলিন, কৃষি চাষ সম্পৃক্ত অনেক শব্দ অস্ট্রিক শব্দ। বাংলার আদি এবং প্রাচীন ধর্ম বৌদ্ধধর্ম। এ ধর্ম শব্দটি অস্ট্রিক। বৌদ্ধ জাতির সমাজিক সাংস্কৃতিক আচারানুষ্ঠান ও উপাচার এবং ধর্ম বিশ্বাস অস্ট্রিকদেরই অনুরূপ আচারনুষ্ঠান । নীহাররঞ্জন রায় বলেন, বস্তুত আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার আচরণ এই আদিম অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন,... আমাদের তান্ত্রিক বৌদ্ধ, নাথপন্থ, ধর্মঠাকুরের পূজা, জীবনধারা, আচার আচরণ, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-সংসারের --- সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অস্ট্রিক জাতির পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।[৩৮] প্রোটো অস্টালয়েড এর সাধারণ লক্ষণ বেঁটে শরীর, কালো রং, লম্বা মাথা, চাওড়া নাক, তামাটে কোকঁড়ানো চুল।[৩৯]

খ. দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী (Dravidian Race)

অস্ট্রিক ভাষার নিষাদ জাতির পরে আগমন ঘটেছিল 'দ্রাবিড়' ভাষী জনগোষ্ঠীর। ড. সুনীতি কুমার সেন এর মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ এর আগে তারা ভারতে এসেছিল। এদের আদিনিবাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের দু'টি মত রয়েছে। একদল মনে করেন, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে দ্রাবিড় জাতিরা এসেছে, মূলত ভূমধ্যসাগরবর্তী কোন অঞ্চল থেকে; অন্যদলের মতে ভারতই তাদের আদিবাসভূমি। ইহাদের জাতীয় নাম ছিল সম্ভবত Drmil 'দৃমিল' অথবা Drmmizh 'দৃম্মিঝ' অথবা Trmmili 'তৃম্মিলি'। এই জাতির লোকেরাই কোনও সময়ে, আর্যদের আগমনের বহু পূর্বে ইরাক, ইরান ও বেলুচিস্থান, আফগানিস্থান হইয়া, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে উপনিবিষ্ট হয়; এবং সেখান হইতে রাজপুতানা মহারাষ্ট্র হইয়া এই জাতি, ইহাদের ভাষা ও সভ্যতা লইয়া, দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়,...ইহারা গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও বাস করিতে থাকে।[৪০] বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক হারাণ চন্দ্র চাকলাদার। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ড. অতুল সুর, ড. সত্যনারায়ণ দাস, ড. রামেশ্বর শা প্রমুখ অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। অন্যদিকে প্রত্নবিদ্যাবিশারদ সুপণ্ডিত Harry Reginald Holland Hall মনে করেন, ভারতবর্ষই দ্রাবিড় জাতির প্রাচীন আবাসভূমি।

এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত মতই অধিক গ্রহণযোগ্য । আধুনিক ঐতিহাসিকগণ 'দ্রাবিড়' ভাষী জাতি গোষ্ঠিকে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর লোক (Mediterranean people) বলে অভিহিত করেছেন।[৪১] দ্রাবিড়ীয় প্রধান ভাষা ৪টি; যথা ১) তামিল ২) তেলেগু ৩) কণ্নড় বা কর্ণাটক ৪) মালয়ালী। ভাষাগতভাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ দ্রাবিড়

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার প্রমাণ ব্যাখ্যা করেছেন। দ্রাবিড় ভাষী লোকদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে Sir Herbert Hope Risley বলেছেন, 'In the Dravidian type the form of the head usually inclines to be dolichocephalic, but all other characters present a marked contrast to the Aryan. The nose is thick and broad, and the formula expressing its proportionate dimension is higher than in any known race, except the Negro. The facial angle is comparatively low; the lips are thick; the face wide and fleshy; the features coarse and irregular. The average stature ranges in a long series of tribes from 156.2 to 162.1 centimeters; the figure is squat, and the limbs strudy. The colour of the skin varies from very dark brown to a shade closely approaching black.'[৪২] পরবর্তীতে অনেক নৃতত্ত্ববিদ, গবেষক, ঐতিহাসিকগণ রিজলির অভিমত 'বর্তমান বাঙালি জাতি দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন' এ ধারা সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেন। দ্রাবিড় জাতি গোষ্ঠির দৈহিক বৈশিষ্ট্যে দেখা যায় এরা মধ্যম দেহী, কম বিস্তৃত নাক বিশিষ্ট, দীর্ঘ শিরস্ক, সরু নাক এবং গায়ের রং হালকা বাদামী ও কালো। বাংলায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব বাঙালি জনের ভাষা, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের দৈনন্দিন আচারানুষ্ঠান, সমাজ, সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে প্রতীয়মান হয়। নব্যপ্রস্তর যুগের দ্রাবিড় ভাষাভাষী দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর লোকেরাই ভারতবর্ষের নগর- সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা। অনেকে মনে করেন যে, পাঞ্জাবের বিশ্ববিশ্রুত হরপ্পা ও সিন্ধু নদের অববাহিকার তাম্রপ্রস্তর যুগীয় মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা-সংস্কৃতি এই দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠিরই অবিস্মরণীয় কীর্তি।[৪৩]

গ. আর্য (Aryan) বা আলপীয়-নর্ডিক জনগোষ্ঠি

ভারতবর্ষে গোলমুণ্ড, উন্নতনাসা লোকজনের রক্তধারাই আলপাইন (Alpine), নর্ডিক (Nordic) জনগোষ্ঠির সংমিশ্রণ। ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'বস্তুত বাংলাদেশের যে জন (People) ও সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে তার প্রায় সমগ্র মূল রূপায়নই প্রধানত আলপাইন ও আদি অস্ট্রেলিয়, এই দুই জনজাতির কীর্তি।'[৪৪] আদি নর্ডিক জনই বৈদিক আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টিকর্তা; জন্মদাতা। উত্তর ইউরোপের নর্ডিক জাতির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পরবর্তী কালে আগত আর্য ভাষাভাষী আদি নর্ডিক নরগোষ্ঠির রক্তপ্রবাহ ও সংস্কৃতি তার উপরের স্ত রের একটি ক্ষীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাঙালীর জীবন ও সমাজবিন্যাসের উচ্চতর স্তরেই আবদ্ধ; ইহার ধারা বাঙালী জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হতে পারেনি।

ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, আদি নর্ডিক আর্যভাষী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কালে বহুশতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সঞ্চারিত হয়ে পূর্বতন (অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়) সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙালীর রক্ত ও

Dhaka University Institutional Repository

দেহগঠনে এই আদি নর্ডিক জনের রক্ত ও দেহগঠন বৈশিষ্ট্যের দান অত্যন্ত অল্প। ভারতবর্ষে ইহাদের সুপ্রাচীন কোনও কঙ্কালাবশেষ আবিস্কৃত হয় নাই; তবে, তক্ষশীলার ধর্মরাজিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে কয়টি নরকঙ্কাল সংকীর্ণ ও সুউন্নত, মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ হলেও গোলের দিকে ঝোঁক সুস্পষ্ট এবং নিচের দিকে চোয়াল দৃঢ়। মাথার খুলি এবং মুখাবয়ব হতে মনে হয়, ইহাদের দেহ ছিল খুব বলিষ্ঠ ও দৃঢ় সংবদ্ধ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, হিন্দুকুশ পর্বতের কাফীর প্রভৃতি কোমের লোকেরা, পাঞ্জাব ও রাজপুতনার উচ্চশ্রেণীর ও বর্ণের লোকেরা ইহাদেরই বংশধর।[৪৫]

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভারতবর্ষে অনার্য ও আর্যদের মধ্যে বিরোধ হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতায় আর্য অপেক্ষা অনার্যদের দান অনেক বেশি। উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য অনার্য জাতির সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ বাংলাদেশে আসে। তখন গঠিত হয় এক জাতি; এক সংস্কৃতি। তবে মৌর্য রাজগণ কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে, বাংলাদেশে আর্য-ভাষা ও আনুষাঙ্গিক উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার সভ্যতার বিস্তার ঘটেনি বলে অনুমান হয়।[৪৬] বাংলার অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী জনগণ নিজ অনার্য ভাষা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে আর্য ভাষা.... অর্থাৎ মগধের প্রাকৃত (পালি) গ্রহণ করে; উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সভ্যতা ও ঐতিহ্য এবং আর্য-অনার্যের ইতিহাস ও পুরাণ বঙ্গদেশের অধিবাসীগণ গ্রহণ করিল; বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ আসল এবং তাও বাঙ্গলায় গৃহীত হলো। এইরূপে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল।

রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যত অনার্য ছিল। যেটুকু আর্য রক্ত বাঙ্গালী জাতির গঠনে আসিয়াছিল, সেটুকু আবার উত্তর ভারতেই অনার্য মিশ্র হইয়া গিয়াছিল।[৪৭] নর্ডিক নরগোষ্ঠির দেহের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘশিরস্ক, দীর্ঘদেহী, লম্বা কপাল ও মুণ্ডাকৃতি, গৌরবর্ণ অত্যন্ত শ্বেতকায়, চুল ঘন বাদামী থেকে ঘন কৃষ্ণ, দেহ বলিষ্ঠ ও সুঠাম, এদের নাক লম্বা, উচুঁ ও সুচালো।[৪৮] এদের সম্বন্ধে Proffesser Nesturkh বলেছেন-"Many racists regard only the tall, blue eyed blonds of modern North Europe as being 'true Aryans'---these peoples have been given the name of the nordic race."

আলপাইন নরগোষ্ঠির দেহের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো, গোলমুণ্ড, হ্রস্বকপাল আকৃতি মাঝারি গোছের, মাথার খুলি ছোট ও চাওড়া এবং পেছনের অংশ গোল, লম্বা নাক ও গোল মুখ, চোখ কালো এবং গায়ের রং ফর্সা।[৪৯] বাংলায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠির পরে আর্যদের আগমন ঘটেছিল। আজকাল মোটামুটি সবাই স্বীকার করে যে, উরাল পর্বত ও দানিয়ুব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে আর্য-ভাষী মানুষের ছিল আদিনিবাস।[৫০] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বাঙালীর দেহে আর্য রক্ত নেই বললেই চলে। আর্য শব্দটি জাতি বাচক শব্দ নয়। এটা ভাষা বাচক শব্দ। যে সকল জাতি বা নরগোষ্ঠি এই ভাষায় কথা বলত তাদেরকে আর্য বলা হতো। নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা যায়, নর্ডিস গোষ্ঠি ও আলপীয় গোষ্ঠি আর্য ভাষায় কথা বলত। আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে ঋগ্বেদ সংহিতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতত্ত্বে ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, রুশ দেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডই আর্যজাতির আদি বাসস্থান ছিল। তারা পরবর্তীতে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে ইরান থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। এরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়, এদের একটি দল পূর্ব উপকূল ধরে বাংলা ও ওড়িশায় আসে।[৫১] অধ্যাপক মোল্টনের মতে, আর্যগণের অর্থাৎ যারা আর্যভাষার আদি গুরু, তাদের আদি নিবাসক্ষেত্র ইউরোপে।[৬৩] জার্মান পণ্ডিত ফিস্ট (Feist) সিদ্ধান্ত করেছেন-তুর্কিস্থান আর্যগণের আদি নিবাস ক্ষেত্র এই পুরাতন মতই সমীচিন।[৫২] আর্য শব্দ ও জাতির প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋ+ঘ্যণ+র্তৃ=আর্য। ঋ বা আর ধাতু থেকে আর্য (ইংরেজী Aryan) শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত অর্থে গমন করা, লাতিন (Areare) অর্থ চাষকরা, স্লাভিক arati অর্থ চাষ করা। এ হিসেবে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কৃষকও ধরা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক এর বহুবিধ অর্থ করেছেন, প্রভু, পূজ্য, অভিজাতবংশোদ্ভূত, সম্ভ্রান্ত, জ্ঞানশীল, পণ্ডিত, সদ্বংশজাত, মহান, মুক্ত, আত্মীয়, সঙ্গী ইত্যাদি। আর্য বলতে সাধারণত আমরা একটি সভ্য, বিশিষ্ট ও উন্নত জাতিগোষ্ঠিকে বুঝে থাকি। ক্ষেত্র বিশেষে আর্য বলতে প্রাচীন ভাষা গোষ্ঠিকেও বুঝায়। 'বাংলার ভূখণ্ডে সর্বশেষ যে জাতি বিস্তার লাভ করে তারা আর্য নামে পরিচিত। এই জাতির চেহারার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের দেহের বলিষ্ঠ গঠন, গৌড়বর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, লম্বা মাথা, সরু নাক, কটা চোখ এবং সোনালী কেশ। ইন্দো-আর্যরা দীর্ঘদেহী, দীর্ঘশিরস্ক, ফর্সা, দীঘল সরু নাক বিশিষ্ট এবং ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারী। আর্য জাতির উৎপত্তিস্থল পোল্যান্ড। পরে ইউরোপ থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ভারতবর্ষ এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করে। এই আর্য জাতি ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে অনার্য ও আর্য জাতির সংমিশ্রণেই বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়'।[৫৩]

(ঘ) মোঙ্গলীয় (Mongoliod)

মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে। এই সব মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে নানা সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই জন প্রবাহ আসাম, উত্তরে হিমালয়শায়ী নেপাল ভুটান এবং পূর্বপ্রান্তে ব্রহ্মদেশের প্রত্যন্ত জনপদ ও অরণ্যবাসী লোকদের ছাড়া মধ্যে বিস্তার ঘটে।[৫৪] এছাড়া উত্তরে হিমালয়সানু দেশবাসী লিম্বু, লেপচা, রংপা প্রভৃতি কোমের লোকদের মধ্যে এ রক্তধারা সুস্পষ্ট। ইহাদের দেহাকৃতি মধ্যম হতে দীর্ঘ, মুখ বা মুণ্ডাকৃতি গোল, গণ্ডাস্থি উন্নত, চোখ ছোট এবং নাসিকাকৃতি দীর্ঘ ও চ্যাপ্টা।[৫৫]

নীহার রঞ্জন রায় মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠি সম্বন্ধে বলেছেন,

"আমাদের উত্তর পূর্ব প্রান্তশায়ী পার্বত দেশগুলিতে মোঙ্গোলীয় রক্তধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা যে মোঙ্গোলীয় তার প্রমাণ ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ এবং অক্ষিপুট সম্মুখীন, চ্যাপ্টা নাক, উন্নত গণ্ডাস্থি, বঙ্কিম চক্ষু, উদ্দণ্ডকেশ, কেশবিহীন খর্বদেহ ও মুখমণ্ডল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হতে ইহারা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল: পথে উত্তর পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পালিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকদের মধ্যে এ ধারা প্রবাহ পড়ে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকে পড়ে এবং রংপুর, কোচ বিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে মোঙ্গলীয়, প্রভাব আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু তা সাধারণ সমাজের নিম্নস্তরে।'[৫৬] ভোট-চীনীয় ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠির আদি বাসস্থান ছিল ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর উৎপত্তিস্থলে বা গোড়ার দিকে।[৫৭] এদের ৩টি মূলশাখায় বিভক্ত করা যায়। (১) ভোট-বর্মী বা তিব্বতী-বর্মী (২) চীনা থাই বা শ্যাম-চৈনিক (৩) ইয়েনিসি বা য়েনিসি। ব্রহ্মদেশের যে মোঙ্গোলীয় খর্বদেহ ও গোলমুণ্ড জনজাতি তাদের সঙ্গে সমগোত্রীয়তা আছে ত্রিপুরার চাকমাদের, টিপরাদের, আরাকানে এবং চট্টগ্রামাঞ্চলের মগদের।

ফণ আইকস্টেডট বলেন যে, 'দক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিমাংশের কোনও কোনও অধিবাসীদের ভিতর আদি মোঙ্গোলীয় রক্তপ্রবাহ সুস্পষ্ট এবং তা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোল ভাষী লোকদের রক্তধারা দ্বারা সৃষ্ট।'[৫৮] ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, 'Of the various... Mongoloid group, (1) the Palaeo-Mongoloids, Sub-divided into two types; (i) (a) with a peculiar head form resembing dolichocephal, Occurring, 'as the more anient stratum of population' and forming' a dominant element in the tribes living in Assam and the Indo Burmese frontiers' and (i) (b) with round round heads, found among the less primitive tribes in Burma and in the chittagong Hills, appear to represent a less developed group of this race. The (ii)Tibeto Mongoloids are aore pronounced and advanced Mongoloid type, and they are found in Sikkim and Bhutan, and must have infiltrated from Tibet in comparatively latertimes.'[৫৯]

মোঙ্গোলীয় ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব প্রাচীন অথবা বর্তমান বাংলায় প্রায় নাই বললে খুব অযৌক্তিক হয়না। নরতত্ত্বের দিক হতে মোঙ্গোলীয় রক্ত প্রবাহ বাঙালীর মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও শীর্ণ; মোঙ্গোলীয় ভাষা প্রভাবও তাই। তবে উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের মোঙ্গোল স্পষ্ট লোকদের ভিতর কিছু ভোট-ব্রহ্ম শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন-নদীর নাম দিস্তাং (তিস্তা), লিচু (চীনা লিচি) স্বেচ্ছা সিন্দুর (ভোট চীনীয়) লুঙ্গি (বর্মী লোংজী) ফুঙ্গি (বর্মী ফোং)। বংগ, গংগা, দামোদাক, কবোদাক (কপোতাক্ষ) প্রভৃতি মঙ্গোল ভাষার শব্দ।[৬০] ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গঠনে তথা তার জাতিসত্তা বিনির্মাণে এদের আদৌ কোন প্রভাব নেই। রমেশ চন্দ্র মুজমদার বলেন, কোন কোন মোঙ্গোলীয় পার্বত্য জাতি বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে বসতি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত বাঙালী জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা এক প্রকার সর্ববাদী

Dhaka University Institutional Repository

সম্মত।[৬১] এখন পর্যন্ত যতদূর জানা যায় বা ঐতিহাসিকগণ মনে করেন তাতে প্রতীয়মান হয় যে, আদি ভোট-চীনীয়দের একটি শাখা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হিমালয়ের পাদদেশ পারে হয়ে উত্তর-পূর্বদিক দিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল।[৬২]

কালক্রমে এরা ভারতের আসাম, বার্মা, (মায়ানমার), তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ছিল এবং এদের কিছু জন বসতির প্রসার ঘটেছিল বাংলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত ঘেষাঁ ভূখণ্ডে। এরা নেপাল, সিকিম, ভুটান ও পূর্ব হিমালয়ের পার্বত্য ভূমি এবং অবিভক্ত বাংলার আসাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে মোঙ্গোলয়েডদের সাধারণভাবে অবস্থিতি।

ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, মঙ্গোলয়েডদের গাত্র রং নানা প্রকার। তবে হলদে বাদামীর প্রবণতা বেশি। চুল খাড়া-সোজা থেকে ঢেউ খেলানো। চুলের রং কাল। এদের মাথার ও গায়ের চুল, পশম অন্যান্য নরগোষ্ঠির চেয়ে বেশ কম। এদের ঠোঁট মাঝারী ধরণের, এরা বেশি মোটাও নয়, পাতলাও নয়।[৬৩] সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দেখা যায়, মঙ্গোলীদের দেহ মধ্যম, নাক চ্যাপ্টা, গালের হার উঁচু, চোখ ও ভ্রু টানা, দেহে লোম ও দাঁড়ি গোঁফ কম।

২.৫ বাংলাদেশের বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (The anthropological Identity of the Buddists in Bangladesh)

বাঙালি বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় তথা আদি অবস্থা নির্ণয় করা অনেকটা সহজ আবার অতি জটিলও। বাঙালির আদি ও প্রাচীন নৃতাত্ত্বিক জাতিতত্ত্ব ও শ্রেণীবিন্যাস আদি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির মূল স্রোতধারা এক ও অভিন্ন। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, গবেষক ও নৃতাত্ত্বিক বিদগণ সবিস্তৃত আলোচনা প্রবিষ্ট হলেও বাংলায় বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বা আদি শেকড় কি, কোনটি এবং কোথায় এ বিষয়ে আজো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি।

তবে বাঙালি তথা বৌদ্ধরা এদেশে রক্ত সাঙ্কর্য বেশি হওয়ায় নৃতাত্ত্বিকভাবে গবেষণার সঠিক তথ্য নির্ণয় সম্ভব হয়নি। আনুমানিক তেরো শতকে সংকলিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাঙালিকে বর্ণভেদে ছত্রিশ জাতে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভাজন নৃতাত্ত্বিক নয় বৃত্তিসংপৃক্ত সমাজভিত্তিক। এ ছাড়া আধুনিক কালে রিজলি, হাটন, আইক স্টেডট, লেভি স্টাউট, ড. গ্রিয়ার্সন, রমা প্রসাদ চন্দ, হারাণচন্দ্র, ড. অতুল সুর, নীহাররঞ্জন রায়, শ্রী অমূল্য চরণ, বিরজা শঙ্কর গুহ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. আহমদ শরীফ প্রমুখ অনেকেই বাঙালির (বৌদ্ধদের) উৎপত্তি ও নৃতাত্ত্বিকগত আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বিচার করেছেন ও করছেন। মাথা-কপাল-নাক-ঠোঁট, চোখ-চুল-চামড়া এ পরীক্ষার অবলম্বন। কিন্তু প্রায় তিন হাজার বছরের সাঙ্কর্য কারুর কোন লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি।[৬৪] মোটামুটিভাবে বলা চলে নেগ্রিটো, আদি অস্ট্রেলিয়, (ভেড্ডিড) ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠিরই সংমিশ্রণ বাঙালির মধ্যে ঘটেছে বেশি। সে কারণে বাঙালিরা

Dhaka University Institutional Repository

রক্তসংকর জাতি। এই রক্তসঙ্কর মানুষের স্বভাব চরিত্র, গোত্র ও বিকাশমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বৌদ্ধদের মধ্যে প্রতিবিম্ব। এদেশে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে তা আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাঙালিরা এদেশে শুরু রক্তসংকর জাতি নয়; মিশ্র সভ্যতা সংস্কৃতির মানুষও। আমাদের শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য সবটাই বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মী থেকে পাওয়া। তা সত্ত্বেও বাঙালি তার মৌলিক স্বাতন্ত্র্য হারায় নি। সাংখ্য যোগ তন্ত্র ও লৌকিক সংস্কার পুষ্ট মননে ও জীবনে তার স্বকীয়তা স্বাতন্ত্র্য সযত্নে রক্ষা করেছে।[৬৫] এদেশে বৌদ্ধরা ছিল গৌরবোজ্জ্বল জাতি। উদ্যমশীলতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, নিষ্ঠা, সততা, প্রয়াস, মানস সংস্কৃতিতে বৌদ্ধরা মহিয়ান, কালের ইতিহাস বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস কালজয়ী, যারা উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী তারা ধ্যানে জ্ঞানে মননে বিদ্যা বুদ্ধি সৃজনে সর্বোপরি আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তব ক্ষেত্রে বাঞ্ছাসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে।

ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করে যে, সুপ্রাচীন কাল হতে এই ভূখন্ডে বৌদ্ধদের আদিনিবাস। আদিকাল থেকে বাংলাদেশে নানা বর্ণের ও গোত্রের লোকের বাস। পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি যে গোত্র বাচক শব্দ গোত্রের বিশ্বাস করার কারণ আছে। গ্রীক, শক, হুন, চন্দ্র, মৌর্য, কুষাণ, পাল, তুর্কী, মুঘল, ইংরেজ জাতির আগমন ও বসবাস ঐতিহাসিক ব্যাপার। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, নিগ্রো, আর্য ও মঙ্গোলীয় জাতির পরিচয় মেলে। মোটকথা প্রাচীন জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল। তাই বৌদ্ধরা বাংলার আদি অধিবাসী, বাঙালিরা রক্ত সাঙ্কর্য বর্ণসংকর জাতি। ভাষা, সংস্কৃতি ও নরগোষ্ঠির দিক থেকে বাঙালি একটি মিশ্রসংকর জাতি হিসেবে গণ্য। সঙ্কর জাতি উদ্ভব ও সৃষ্টি প্রক্রিয়া বৌদ্ধধর্মীয় মতার্দশের মাধ্যমে হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণাশ্রম প্রথা কিংবা উচু নিচু গোত্রের মানুষের শ্রেণীর ছিলনা। ফলে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথা অর্থাৎ উচ্চবর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের নারী পুরুষের বিবাহ অবাধ ছিল। এরই ফলে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি।

সূচনায় বাংলায় সমাজ সংগঠন আর্য-সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ বাংলাদেশে খুব বিলম্বে ঘটেছিল। সেজন্য বাংলায় চাতুবর্ণ সমাজ ছিলনা। ছিল কৌম সমাজ ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠির সমাজ। এ সমাজে জাতিভেদ ও পদাধিকার ঘটিত বৃত্তিভেদ ছিল না। প্রথমে একটি কৌম গোষ্ঠি বঙ্গ এবং পরে বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র ও রাঢ় এ চারটি কৌম নিয়ে বাংলার জনপদ গঠিত।[৬৬]

পাল যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বৃত্তিধারী জাতি নির্বিশেষে বৈবাহিক আদান-প্রদান হতে থাকে। তখনই বাংলার জাতিসমূহে সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। পাল রাজাদের পরে সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠা ঘটে; এ সময় বাংলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এ বাংলার সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়। তবে এ সময় তাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথা: ১) উত্তম সংকর ২) মধ্যম সংকর ও ৩) অন্ত্যজ সংকর।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর জাতি আছে। ১) তফসিলভূক্ত জাতি ও ২) হিন্দু জাতি। মোট ৬৩টি তফসিলভূক্ত জাতি। (এরা নীচু, অনগ্রসর জাতি)।[৬৭] ড. আহমদ শরীফ বলেন, বাঙালিরা রক্ত সংকর জাতি। বিভিন্ন গোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার এখনো অনির্ণিত। তবু প্রমাণে-অনুমানে বলা চলে শতকরা সত্তর ভাগ অস্ট্রিক, বিশ ভাগ ভোট-চীনা, পাঁচ ভাগ নিগ্রো এবং বাকী পাঁচ ভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালির ধমনীতে।[৬৮]

বাংলাদেশের (বাংলা অঞ্চলে) মাটিতে আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রথম কবে বসবাস শুরু করেছিল আর কবেই বা তারা সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার মতো উপকরণ আজো আমাদের হাতে আসেনি। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রস্তর যুগের (চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল) ও তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও রাণীগঞ্জ। খনন কার্যের ফলে বহু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। খনন কার্যের একাধিক পর্বের নিদর্শন মিলেছে। বাংলায় বৌদ্ধদের পূর্ব পুরুষেরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে কোন বর্গের লোক তা নির্ণয় করতে গিয়ে মানুষের নৃতাত্ত্বিক বিভাগ বিশেষণে প্রয়াসী হয়েছি। সাধারণত মানুষের চুলের রং ও রূপ, গায়ের রং, চোখের রং ও বৈশিষ্টা, মাথার আকার ও প্রকৃতি, মুখের গঠন এবং নাকের আকার প্রভৃতি দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে নৃতত্ত্ববিদরা ঠিক করে কোন জনসমষ্টি কোন নৃতাত্ত্বিক বর্গের অর্ন্তভূক্ত।[৬৯] মানুষের চুল রূপের দিক থেকে তিন ধরণের হয়। সোজা, কোঁকড়া এবং তরঙ্গায়িত। মঙ্গোলয়েড মহাজাতির লোকদের চুল সোজা বা ঋজু। নিগ্রোলয়েড় মহাজাতির লোকদের চুল কুঞ্চিত বা কোঁকড়া। আর ইউরোয়েড মহাজাতির লোকদের চুল তরঙ্গায়িত। আচার কারো চুল কালো, কারো চুল বাদামী। গায়ের রঙে সাদা, কালো এবং পীত তিন ধরনের মানুষ। উচ্চতা অনুযায়ী মানুষকে বামন, বেটে, মাঝারি, দীর্ঘ ও অতিদীর্ঘ এই পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

নৃতাত্ত্বিকবর্গ নির্ধারণে মানুষের মাথা ও নাকের আকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাথা লম্বা, মাঝারি ও গোল তিন প্রকৃতি শিরসূচক সংখ্যা বিভক্ত। নাকের আকার সরু, মাঝারি, চাওড়া, চ্যাপ্টা, তলদেশ থেকে নাকের মাথার দৈর্ঘ্য ও অনুপাত, মুখের গঠন এবং ঠোটের আকৃতিও মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে সাহায্য করে। বাংলায় বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এখানে পর্যন্ত হয়নি। বর্তমানে এখনো পর্যন্ত যা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী ছিল আদি অস্ত্রালয়েড বা প্রোটো-অস্ত্রালয়েড।

বাংলার এই আদি অধিবাসীদের চুল ছিল কালো ও কোঁকড়ানো, গায়ের রং মিশমিশে কালো, চোখ কালো, উচ্চতা খর্বাকৃতি ও মধ্যমাকৃতি, মাথার আকার লম্বা থেকে মাঝারি, ঠোট পুরু এবং নাক চাওড়া ও চ্যাপ্টা। প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে নিষাদ জাতি ও কিরাত জাতির লোকদের যে বর্ণনা আছে তার মতো। এদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক।[৭০] বাংলাদেশের আদি অধিবাসী অস্ট্রিক দ্রাবিড় আলপীয়রা আর্যভাষী ভূমধ্য নরগোষ্ঠির লোক।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর বর্ধমান আলপীয় নরগোষ্ঠির ছিলেন।[৭১] বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে, গৌতম বুদ্ধ বাংলায় ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন, আজীবিক ভিক্ষুকরাও ছিলেন।[৭২]

ড. আহমদ শরীফ বলেন, গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তু এখানকার অনার্য অধ্যুষিত নেপালের তরাই অঞ্চল। তিনি মঙ্গোল রক্ত সম্ভূত, তিব্বতী ভোট-চীন লিচ্ছবীরা তাঁর মাতৃকুল; পিতৃকুল শাক বা শাক্য। তারাও আর্য বা অস্ট্রিক নয়। গৌতম গৃহত্যাগ করে নেমে আসেন সমতলে। সাধনা করে গয়া বারানসীতে। তাঁর সাধনালব্ধ সত্যধর্ম তিনি প্রচার করেন উত্তর ভারত আধুনিক বিহারেরই নানা অঞ্চলে।[৭৩] এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির উত্তরপুরুষ।

বৌদ্ধধর্মের আদি কি? বৌদ্ধধর্ম কোথায় হতে আসল? বুদ্ধ কে? বৌদ্ধ কাকে বলে? বৌদ্ধ দর্শন কিভাবে সৃষ্টি হলো? বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল? এ কথা নিয়ে বহুকাল হতে জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে তর্ক-বিতর্ক ও বাদ বিসংবাদ চলে আসছে। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত; এখানো কিছুই ঠিক হয়নি। এটি ছাড়াও বাংলাদেশের (বাংলায়) বুদ্ধ এসেছিলেন কিনা এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল কিনা এ বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যিক, গবেষণ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য ও সংশয় বিদ্যমান।

ইতিহাসে দেখা যায় বুদ্ধ শাক্য বংশে জন্মে ছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, শাক্য শব্দ শক শব্দ হতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। বুদ্ধ শাক্য বংশের লোক বলে শাক্য জাতিরা গৌরব করেন।[৭৪] বুদ্ধ আর্য ছিলেন না। তিনি ইক্ষাকুবংশে জন্মান, ইক্ষাকু বংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁদের গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিল মুণি শাক্য বংশের আদি গুরু। গৌতমের নাম হতে শাক্য সিংহকে গৌতম বলে ডাকা হয়।

উত্তর ভারতীয় আর্য ভাষা গৃহীত হওয়ার আগে বাংলাদেশে মঙ্গোল কিরাতরা ছিল তিব্বত চীনাভাষী। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবাস্তুর শাক্যবংশীয়; বারাণসী অঞ্চলের জন উদ্ভূত গুপ্ত রাজারা ছিলেন মঙ্গোল লিচ্ছবীদের দৌহিত্র বংশীয়; বজ্জিদের সঙ্গে ছিল শাক্যদের সামাজিক ও শাস্ত্রিক সম্পর্ক। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোচ, মেচ, রাজবংশী, গারো প্রভৃতির বুলি ছিল তিব্বতী-চীনীয় ভাষারই উপভাষাজাত; বুড়িচঙ্গ, বানিয়াচঙ্গ প্রভৃতি গ্রাম নাম এখনো এর সাক্ষ্য বহন করে। আর অরণ্য অঞ্চলে ওরাঁও, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতির ভাষায় প্রাচীন নিষাদ অস্ট্রিকের ভাষায় নিদর্শনতো আছেই। রাজমহলের মালপাহাড়ীদের ভাষায় রয়েছে কানাডি নামের দ্রাবিড় ভাষার লেশ ও রেশ।[৭৫] বাংলার বৌদ্ধদের জাত বর্ণ গোত্রের উৎস নৃতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করা আজ অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। যুগে যুগে, কালে কালে বিভিন্ন জাত, গোত্র, ধর্ম, সংস্কৃতি, বর্ণবিন্যাস, শাস্ত্রীয় আচার-সংহিতা ও বিধিবিধান প্রাচীন জাতি মৌলিক ভিত্তিগুলো প্রত্যাহিক জীবনে পরিবর্তিত। বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের মানুষের বর্ণ ও রক্ত স্বাতন্ত্র্য এবং দৈহিক অবয়বে বৌদ্ধদের পরিচয় নৃতাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

ও ঐতিহাসিকগণ এ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। বর্তমান হিন্দু ও মুসলিম সমাজের বৃহৎ অংশে বাংলার আদি বৌদ্ধদের রক্তধারা বহমান।

বৈদিক সাহিত্যে, ব্রাহ্মণ্য বিভিন্ন গ্রন্থে, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে বারংবার বাংলার প্রাচীন অধিবাসী (বৌদ্ধদের) পুণ্ড্র, বঙ্গ, বগধ, চের, পোদ, মল্ল, শবর, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি জাতিকে দাস, দস্যু, অসুর, পক্ষী, ম্লেচ্ছা, পাপ প্রভৃতি বলে নিন্দা, হেয় পতিপন্ন, ছোট, ঘৃণা করে অন্ত্যজ জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলায় অনার্য-আর্য সংমিশ্রণে সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন নতুনভাবে গড়ে উঠে। আমাদের দেশে আর্য ছাড়া আর সব গোত্রীয় মানুষই অনার্য এই সাধারণ নামে পরিচিত। বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে বাংলার আদি অধিবাসী বৌদ্ধ এবং গৌতম বুদ্ধের মতাবলম্বী প্রাচীন কালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল সর্বত্র। অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল রাজারা বাংলা অঞ্চল শাসন করেন।

পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং প্রাচীন ইতিহাস ও পুঁথিপত্রে পোদ জাতির নাম পাওয়া যায়। ইতিহাসে উল্লেখ আছে এই বাংলায় পোদরা খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি ছিল। এই পোদ জাতির বাস ছিল প্রাচীন বাংলার উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে। পোদরা ছিলেন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বংশজাত। প্রাচীন বরেন্দ্র জনপদে পৌণ্ড্ররা পোদ জাতি নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক পুণ্ড্রনগরের প্রাগৈতিহাসিক পোদ জাতিগোষ্ঠি সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুষ্টিমেয় ধীবর পোদরা আজও বরেন্দ্র ভূমির কতক (শেতক) স্থানে বসবাস করে। তাদের দেহ প্রলক্ষণে প্রোটো অস্ট্রালয়েড ধারার প্রাধান্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে, কাল পরিক্রমায় পোদ জাতিগোষ্ঠির নাম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পোদ> পুঁড়া> পৌণ্ড্র> পুণ্ড্র প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে।[৭৬] এই পৌণ্ড্র জাতি থেকে বাংলার সর্বপ্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ পৌণ্ড্র নগর (আজকের মহাস্থান ও তার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমের অর্ধবৃত্তাকার নাতিবৃহৎ অঞ্চল) নামকরণ করা হয়। এই পোদ বা পৌণ্ড্র জাতির বাংলার আদি অধিবাসী। এরাই রচনা করেছে বাংলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ। উল্লেখ্য যে পোদ জাতির সাথে বাংলার মুসলমানদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ নেই। বিস্তৃত শিরস্কতা আলপীয় নরগোষ্ঠির লোক বাংলার পূর্বপুরুষ। তবে এরাও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। এদের সংমিশ্রণ ঘটে ছিল কিছু পরিমাণে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে। চিরায়ত বরেন্দ্র ভূমিতে পোদের মতো আদিম শবর জাতিগোষ্ঠিও অন্যতম। পোদদের ন্যায় শবরও প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠির মানুষ। ঐতিহাসিক কালে রচিত বিভিন্ন প্রাচীনগ্রন্থ এবং চর্যাগীতিকা ও বৌদ্ধগানে শবরদের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনধারার নানা দিকের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিকদের মতে, আদি বৌদ্ধ মতাদর্শী পোদদের, ন্যায় শবর জনগোষ্ঠিও বৌদ্ধিক চেতনা প্রসূত। নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাংলায় বাঙালী ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করে। বাংলার অভিন্ন সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

কোল, ভীল, মুণ্ডা, পোদ, বাগদী, মল্ল (মাল) শবর, পৌণ্ড্র, সদগোপ এই প্রাচীন জাতির বাস উত্তরবঙ্গে। এসব জাতিরা সকলে ছিলেন বৌদ্ধ। তাদের, ক্রিয়াকর্ম, ইতিহাস প্রত্ন উপাদান ও সাহিত্যাবদান তা প্রমাণ করে। প্রাচীন ইতিহাস মতে, পাল ও গুর বংশীয় রাজারা এ বংশ জাত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য শাসনামলে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে তারা বর্ণ, গোত্র এবং জাতিভেদ বৈষম্যের স্বীকার হয়ে পরিণত হয় নিম্নশ্রেণীর তফসীল সম্প্রদায় ও অন্ত্যজ জাতিতে। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম শাসনামলে ইসলাম কবলিত ও ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে। ফলে, তারা প্রাচীনত্ব, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সবই হারায়।

ঐতিহাসিক কারণে বড়ুয়া এবং সমপর্যায়ের সমতলে বসবাসকারী বৌদ্ধরা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কয়েক হাজার বছর ব্যাপি বিবর্তনে বাঙালি জনগোষ্ঠির অভ্যুদয় ঘটেছে, বাঙালি বৌদ্ধরা সে জনগোষ্ঠির অংশ।[৭৭] নৃতাত্ত্বিক বিচারে সমতলী বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে আদি অস্ত্রালয়েড় নরগোষ্ঠির প্রভাব এবং আদিবাসী পাহাড়ী বৌদ্ধদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড় নরগোষ্ঠির রক্ত সংমিশ্রণের ধারা বিদ্যামন। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সমতলীয় অঞ্চল, কক্সবাজার, পটুয়াখালীতে বসবাসকারী উপজাতীয় বৌদ্ধরা নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় মঙ্গোলীয় আরাকানী বংশোদ্ভূত। 'এদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক কম-বেশি চ্যাপ্টা, চুল সোজা এবং কালো, চোখের মনির রং কালো, ওষ্ঠ পাতলা, গায়ের রং ঈষৎ হলদেটে ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।' [৭৮] বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে বাংলার আদি অধিবাসী বৌদ্ধ নরগোষ্ঠির ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির উপর নৃতাত্ত্বিক বিষয়ক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এতে জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়, ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, জীবনচর্যা, সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চা, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও রীতিনীতি, শ্রেণীবিন্যাস, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, জীবনধারণ পদ্ধতি, সংগঠন ব্যবস্থা (পরিবার, গোষ্ঠী, জন্ম-বিয়ে-মৃত্যু, পেশা, শিক্ষা, উত্তরাধিকার প্রথা ও বিশ্বাস), সমাজ কাঠামো, আচরণ বিধি, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, গৃহী ও ভিক্ষুদের জীবনবোধ ইত্যাদির পরিচয় ও আলোচনা প্রতিভাত হবে।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বসবাসরত আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের নৃতাত্ত্বিক বিচারে দ্রাবিড় কিংবা অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী অন্তর্ভূক্ত। ওরাঁওদের দৈহিক গঠন বৈশিষ্ঠ্য দ্রাবিড় জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর রক্তধারার প্রভাব বিদ্যমান। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলার বৌদ্ধরা রক্ত সংকর প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৩, উদ্ধৃত, প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫৪

২. The study of mankind as a whole, Hoeble, Arthropology, 3rd Edition, 1966, p.4, উদ্ধৃত, নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা, ড. মু. হাবিবুর রহমান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৪

৩. নৃবিজ্ঞান, আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সাইফুর রশীদ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১

৪. Race and Society, Heredity, New York, 1952, P-115

৫. নৃ-বিজ্ঞানের রূপরেখা, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৫৬

৬. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, কলকাতা, ১৯৭৯,পৃষ্ঠা-২৩

৭. বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ড. অতুল সুর, কলিকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৯

৮. বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩০

৯. বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, আহমদ শরীফ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৪-৫

১০. বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্ক, ড. নজরুল ইসলাম, কলকাতা, ১৪০১, পৃষ্ঠা-১২

১১. বাঙালীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৪

১২. বাঙালির ইতিহাস, কমল মজুমদার, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা-৪

১৩. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫৪

১৪. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১

১৫. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮

১৬. See, The Ethnology of India, Dr. Aloke K. Kalla, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1994, Calcutta, P.70-94. আরো দেখুন, বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব, নীহার রঞ্জন রায়, পৃষ্ঠা-৩২-৩৬

১৭. ভাষাতত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার, নয়াপ্রকাশ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৮০

Dhaka University Institutional Repository

১৮. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলকাতা, ১৩৫২, পৃষ্ঠা-১০/-
বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. মো. আবদুর রহিম ও অন্যান্য, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৫

১৯. বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত), ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৯

২০. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪

২১. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৬

২২. বাংলার ইতিহাস, প্রাচীন থেকে ১৭৬৫ পর্যন্ত, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩০

২৩. প্রাচীন বাংলার জনপদ জনজাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৬৩

২৪. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, ১৩৫২, পৃষ্ঠা-১১

২৫. দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস, মোঃ রমজান আলী আকন্দ, আকন্দ প্রকাশনী, বগুড়া, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৬৬

২৬. বাংলা ও বাঙ্গালির বিবর্তন, ড. অতুল সুর, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯

২৭. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৭

২৮. বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, ড. রংগলাল সেন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৩

২৯. Early Historical prospective of North Bengal, B.N, Mukharjee & P.K Bhattachayya (ed.), Darjiling, 1987, P. 31-39, উদ্ধৃত বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬৪

৩০. বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৩৯০, বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-২

৩১. Lingustic Survery of India, Sir G.A Grierson, Vol. 1, Part 1 (Introductory), Calcutta, 1903, P. 32

৩২. Ibid, Linguistic survery of India, Vol-1, Part-1, P-32

৩৩. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠী, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৭০/The Origin and Development of the Bengali Language, Dr, Sunit Kamar chatterji, Rupa &.Co., New Delhi, 2002, P-28-29)

৩৪. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবিলিশিং, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৩১

৩৫. ভারত সংস্কৃতি, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-১৭, উদ্ধৃত, প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতি গোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৭০

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. বাংলায় লোক সংস্কৃতি, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ভারত, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৬

৩৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৩১

৩৮. ভাষাতত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার, নয়াপ্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৮০

৩৯. ভারত সংস্কৃতি, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা-২১-২২

৪০. Introducing India, K.N. Bagchi & W.G. Griffiths (ed.), The Asiatic Society Calcutta, 1990,P-20/বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ড. অতুল সুর, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪২

৪১. The Tribes and Castes of Bengal, Vol.-1, Sir Herbert Hope Risely, Calcutta, 1891, P. xxxii

৪২. বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা-৫০

৪৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিকেশন প্রা. লি., কলিকাতা, ২৪০০, পৃষ্ঠা-৩৩

৪৪. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিকেশন প্রা. লি., কলিকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৩৩

৪৫. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠির, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৯৯

৪৬. ভারত সংস্কৃতি, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা-৭১

৪৭. ভাষাতত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার, নয়া প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৮১

৪৮. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২১০

৪৯. বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা, আহমদ শরীফ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৭, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩

৫০. হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, ড. অতুল সুর, সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২২

৫১. Encyclopoedia of Religion and Ethics, Vol.- VII. P-418

৫২. ইতিহাসে বাঙালি, রমা প্রসাদ চন্দ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা-২৩

৫৩. বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৩

৫৪. বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, ড. নীহার রঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৩৪

৫৫. ভাষাতত্ত্ব, অতীন্দ্র মজুমদার, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৮০

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. প্রাগুক্ত, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৩৪

৫৭. Lingusitc Survery of India, Sir G.A. Grierson, Vol.I, Part-I, Calcutta, 1903, P-41

৫৮. Race-Movements and Prehistoric Culture, in The vedic age, P.145, উদ্ধৃতি, প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৯৫

৫৯. Race-Movements and Prehistoric Culture, in The vedic age, P.145, উদ্ধৃতি, প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জন জাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৯৫

৬০. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ, প্রথম খণ্ড, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৩

৬১. বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীনযুগ, প্রথম খণ্ড, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, জেনারেল, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৩

৬২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, ড. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী লি., কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৩৩

৬৩. নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৬২

৬৪. বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, ড. আহমদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪

৬৫. বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য, ড. আহমদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৬

৬৬. বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, ড. রংগলাল সেন, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৩

৬৭. বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৫৭

৬৮. বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য, ড. আহমদ শরীফ, বাংলাদেশে দর্শনঃ ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৩০

৬৯. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ড. অতুল সুর, কলকাতা ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪-৬

৭০. বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, ড. নজরুল ইসলাম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৪০১, পৃষ্ঠা-১১

৭১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-১০

৭২. বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা-৪৯২-৯৫

৭৩. বাঙালী ও বাঙালা সাহিত্য, ড. আহমদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৭৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৮৭

৭৫. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী, পৃষ্ঠা-১০০

৭৬. অনোমা, সম্পাদক, বাদল বরণ বড়ুয়া, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৯৪

৭৭. অনোমা, ১৯৯৯, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৯৫

৭৮. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

🕮 *প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তন ও পুনরুত্থান*

৩.১ *গৌতম বুদ্ধের সমকালীন বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ*

৩.২ *বাংলার আদি বৌদ্ধ বসতি*

৩.৩ *বাংলার মৌল ধর্ম কি?*

৩.৪ *বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের আগমন ও ধর্ম প্রচার*

৩.৫ *বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস*

৩.৬ *বৌদ্ধ রাজবংশ ও রাজন্যবর্গের অবদান এবং বৌদ্ধ দলন-নিপিড়ন পর্ব*

৩.৭ *প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তন: ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতা*

৩.৮ *বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বৌদ্ধ পুরাবৃত্ত*

৩.৯ *বৌদ্ধ জাতির গৌরবকীর্তি*

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তন ও পুনরুত্থান

৩.১ গৌতম বুদ্ধের সমকালীন বাংলা অঞ্চলের (বাংলাদেশ) ভৌগোলিক, রাজনৈতিক পরিবেশ

মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী (খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে)। বুদ্ধের সমকালীন সময় হতে বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং সামগ্রিক জীবন প্রবাহে যেসব ঘটনা, ব্যাপ্তী, কার্যকারণ, বিবরণ, ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও অধিক কালের সঠিক অবস্থার প্রেক্ষাপট থেকে আধুনিক কালের ইতিহাস নির্ণয় করা একটি কঠিন কাজ। সুদীর্ঘ কালের প্রেক্ষিতে সভ্যতার ইতিহাসে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ও অবস্থা সব সময় পরিবর্তনশীল, উত্থান-পতন নানা আবর্তনের মাধ্যমে আর্বতিত। বাংলাদেশে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালের সামগ্রিক ঐতিহাসিক পটভূমি এবং পরিবেশ পরিস্থিতির বিবরণ সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

ভৌগোলিক অবস্থা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশ সর্বদা পরিবর্তনশীল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ছিল বিচিত্র সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, পাহাড়, পর্বত, উচ্চভূমি ও সমভূমি অঞ্চল। স্থলভাগের চেয়ে সমুদ্র অনেক অনেক ভাগ বেশি ছিল। কালের প্রবাহে সমুদ্র ভরাট হয়ে স্থল ভাগে পরিণত হয়েছে। বর্তমান কুমিল্লা, প্রাচীন সমতটের কর্মান্ত বা বড়কামতা, চট্টগ্রাম প্রাচীন সুন্ম, রাজশাহী প্রাচীন সোমপুর, ঢাকা প্রাচীন বিক্রমপুর, বগুড়া প্রাচীন পুণ্ড্র, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ প্রাচীন বঙ্গ। বরিশাল খুলনা প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ, যশোর (নবদ্বীপের অংশ)। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা পাহাড়, উচ্চভূমি ব্যতীত নিম্ন সমতল ভাগ প্রায়ই সমুদ্র ছিল। খুলনা, যশোর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও রাজশাহী সমুদ্র ছিল। ক্রমেক্রমে ভরাট হয়ে পলি গঠিত উর্বর সমভূমিতে পরিণত হয়েছে।[১] ইহিতাসে উল্লেখ আছে a. In the Rajshahi division which from one of great rice producing plains of Bengal, the ground is allurival. b. In the Dhaka division, the soil generally allurial and deposited by the streams. (History of Bengal, Vol.-1, J. N. Sarker, Dhaka University, Dhaka- P.13)

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞদের অভিমত, গঙ্গা নদীর দুইটি ধারা ভাগীরথী ও পদ্মা(প্রাচীন গঙ্গা) এবং মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, কর্ণফুলি, সুরমা, গোমতী, বুড়িগঙ্গা নদী, উপনদী, পরবর্তীতে সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এ দেশ পাহাড় ও উচ্চ সমতল ভূমি, সমুদ্র উপকূলবর্তী বহু দ্বীপ, উপদ্বীপ ও বদ্বীপ সমন্বয়ে গঠিত ছিল। যেমন- নবদ্বীপ যশোরের পশ্চিমাংশ, চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল চরণদ্বীপ, খরণদ্বীপ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণাংশ, রণবীর দ্বীপ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর উত্তরাংশ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, নোয়াখালী (নূতন খালী), হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, পটুয়াখালী আরও বহু এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এগুলো সবই সমুদ্রবক্ষ থেকে জেগে উঠেছে। এ সময়ে সমুদ্রপথে লোকের যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন ছিল নৌকা ও ডিঙ্গা। উচ্চ সমতল ভূমি ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বন্দর। ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।[২] মোটামুটি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ আছে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবী দ্বিসহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পরিবেষ্টিত চারি মহাদ্বীপে বিভক্ত ছিল। তা হল জম্বুদ্বীপ, উত্তর কুরু, পূর্ব বিদেহ, অপর গোয়ান। আমাদের ভারত, পাকিস্তান, বাংলা উপমহাদেশের আদি নাম জম্বুদ্বীপ।

ত্রিপিটকের বিনয় পিটকের অন্তর্ভূক্ত মহাবর্গ গ্রন্থে ভারতবর্ষকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভাজন করে দেখানো হয়েছে। এগুলো হল মজ্ঝিম দেস (মধ্যদেশ), উত্তরাপথ, অপরান্ত প্রাচ্য ও দক্ষিণাপথ।[৩] ভৌগোলিক সীমারেখার বিচারে অনেক পণ্ডিত প্রাচীন জনপদ কজঙ্গল (বাংলাদেশের দিনাজপুর, বর্তমান কাকজোল গ্রামই), সুহ্ম (রাঢ়), উৎকল (উড়িষ্যা বা বার্মা বা আফগানিস্তান) প্রভৃতি অঞ্চল প্রাচীন বাংলার সীমাভূক্ত এবং মজ্ঝিমদেশের পূর্বসীমা পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এরূপ ধারনা পোষন করে বুদ্ধের সময়কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করে থাকেন।[৪]

রাজনৈতিক পরিবেশ

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গৌতম বুদ্ধের সমকালীন সময়ে এদেশের রাজনৈতিক পটভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখন এদেশে ছোট ছোট বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো বঙ্গ, সুহ্ম, সমতট, রাঢ়, পুণ্ড্র, হরিকেল, কর্ণসুবর্ণ, বিক্রমপুর, সোমপুর, রামাবতী, গৌড়, কোটিবর্ষ, গঙ্গাঋদ্ধি, দণ্ডভূক্তি, বরেন্দ্র, তাম্রলিপ্ত, পট্টিকেরা, কজঙ্গল, চন্দ্রদ্বীপ, কমান্ত, নবদ্বীপ প্রভৃতি। একনায়কত্ব, বংশগত রাজতন্ত্র, মনোনীত রাজতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র সব রকম রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।[৫] বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি, প্রচার প্রতিষ্ঠা ও উত্থান পতনের কালকে প্রধানত তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই সাড়ে পাঁচ শত বৎসর প্রথম যুগ। এই যুগের বৌদ্ধধর্ম থেরবাদ, আদি বা মৌলিক বৌদ্ধধর্ম নামে কথিত। ইহার ধর্মশাস্ত্র পালি বা মাগধি ভাষায় লিপিবদ্ধ। এ সময় ছিল বুদ্ধকালীন

Dhaka University Institutional Repository

ও বুদ্ধোত্তর যুগের সোনালী অধ্যায়। দ্বিতীয় যুগ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সাত শত বৎসর ব্যাপী যে বৌদ্ধ ধর্ম তা মহাযান বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত। এই ধর্ম শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। এই সময় সম্রাট অশোকোত্তর সম্রাট কনিষ্ক যুগ ছিল যা বৌদ্ধধর্মের আর এক গৌরবময় প্রেক্ষাপট।

তৃতীয় যুগে বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, সহজযান, কালচক্রযান ইত্যাদি নামে অভিহিত। এ সময় হীনযান ১২টি ভাগে এবং মহাযান ৬টি ভাগে বিভক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্ম সর্বমোট অষ্টাদশ নিকায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। ইহার সময়কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। ইহার শাখা প্রশাখার ধর্ম গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় রচিত।[৬] তৃতীয় পর্বে বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাসের যুগনায়ক ছিল বৌদ্ধ পাল রাজাদের ভূমিকা। এ সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা নবজাগরণ বাংলার ইতিহাসে চিরন্তন। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে দেখা যায়, মধ্যযুগ অর্থাৎ মহাযান যুগেই বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি প্রভাব ব্যাপক প্রচার প্রসার, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তার লাভ হয়েছিল। ইতিহাস জাতীয় জীবনের ঘটনা প্রবাহের ইতিবৃত্তান্ত। কালের গতিশীলতার সাথে সাথে ইতিহাস ও গতিশীল হয়। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে যদি বাঙ্গালীর কিছু গৌরব করবার থাকে তবে সে ইতিহাস রচিত হয়েছে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগে। বাঙালির রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, শিল্প সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, এককথায় বাঙালির জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে ও প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ যুগের অনন্য শ্বাশ্বত অবদান অবিসংবাদিত। তৃতীয় বৌদ্ধ যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অবদান ও গৌরব কীর্তি আরো বেশি। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ, বিশ্ববিশ্রুত মহাপণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ভিক্ষু শীলভদ্র (৬ষ্ঠ-৭ম শতক, কলাইন, গ্রাম, কচুয়া উপজেলা, কুমিল্লা প্রাচীন সমতট), নালন্দার বিখ্যাত মনীষী অন্যতম আচার্য শান্তরক্ষিত (৮ম শতক, জাহোর গ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা), বিশ্ববিখ্যাত, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহাপণ্ডিত বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (দশম শতক, বজ্রযোগিনী বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা) প্রভৃতি মনীষীগণের জন্ম এসময় বাংলাদেশে।

কাজেই পূর্বোক্ত তৃতীয় যুগ ৭ম-৮ম হতে ১১শ-১২শ শতক পর্যন্ত দেশ বিদেশে প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধধর্মের বাঙালি বৌদ্ধ সাধকদের অবদানই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম আড়াই হাজারের বিবর্তনে এগিয়েছে। বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর গতিশীল ধর্মগুলির অন্যতম। বৌদ্ধিক-চিন্তন ও ধর্মাদর্শন ভারত বাংলা থেকে বেরিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম রূপলাভ করেছে। বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞান ও পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য, ব্যাপৃত হয়েছে বৌদ্ধ চিন্ত াধারা; লাভ করেছে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সর্বজনীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস চিরঞ্জীব। বাঙালীর জীবনে ও সৃষ্টিতে রয়েছে সহিষ্ণু মনোভাব। বাঙালির অস্থি মননের সঙ্গে মিশে আছে বৌদ্ধভাব ও সংস্কৃতি। যে বিদ্রোহের ভাবে, গৌরবে, ঐতিহ্যে এবং শিক্ষা সাহিত্যে বাঙালী উদ্বুদ্ধ তা বৌদ্ধ মননের পরিচায়ক। তাই বঙ্গভূমির আর এক নাম বৌদ্ধভূমি।[৭]

৩.২ বাংলার আদি বৌদ্ধ বসতি

বাঙালির আত্মপরিচয়ের বিষয়টিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করি যায়, (ক) তার নৃতাত্ত্বিক দিক ও (খ) তার জাতিগত দিক। পৃথিবীতে মানব জাতির উদ্ভব বিষয়ে পণ্ডিতগণ এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ভূমির বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন জীবাশ্ম আবিষ্কার হচ্ছে। পণ্ডিতগণও তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ডারউইন জীবদেহের বিবর্তনের কথা বলেছেন। বানর জাতীয় প্রাণী হতে বর্তমান মানব জাতির উদ্ভব। বাংলাদেশে মনুষ্য বসতি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা বিভিন্নমত পোষণ করেন। তবে এখন পর্যন্ত সকলেই ধারণা করেন যে দুটি সময়ে এখানে মানব বসতি গড়ে ওঠে। প্রথমত সম্ভবত প্যালিওলেথিক তুষার যুগে। দ্বিতীয়ত, আর্যরা ভারত উপমাহদেশের উত্তর অঞ্চলে প্রবেশ করলে, অর্থাৎ লৌহযুগে।[৮]

'ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে, প্লাওসিন যুগেই (দশ থেকে পঁচিশ লাখ বছর পূর্বে) বাংলার ভূভাগ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার ভূমিতে এ পর্যন্ত প্লাইস্টোসিন যুগের নরকংকাল পাওয়া যায়নি। তবে সে যুগের মানুষ কর্তৃক নির্মিত এবং ব্যবহৃত প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। পাথরের তৈরি এসব অস্ত্রকে প্রত্নপ্রস্তর যুগের অস্ত্র বলা হয়। এখন থেকে অনুমান দশ হাজার বছর পূর্বে প্রত্নপলী যুগের অবসান হয়। পরবর্তী যুগকে বলা হয় নব্য প্রস্তর বা নবপলীয় যুগ। তার অবসানে শুরু হয় তাম্রাশ্ম যুগ। তামার ব্যবহার জানার সময়েই মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটে'।[৮]

বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় অস্ট্রিক প্রভাব খুব বেশী। বস্তুত অস্ট্রিক জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালীর জীবনচর্যার বুনিয়াদ। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ' আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থে বাংলাদেশের ভাষাকে 'অসুর' জাতির ভাষা বলা হয়েছে। (অসুবানাম্ ভবেৎ বাচ গৌড্রপুণ্ড্রোদ্ভব সদা)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, অসুরগণের সঙ্গে দেবগণের (আর্যদের) লড়াই চলছিল। প্রতিবারেই অসুরা আর্যদের পরাহত করছিল। তখন দেবগণ বলল, অসুরদের মত আমাদের রাজা নেই। সেই কারণেই আমরা হেরে যাচ্ছি। অতএব আমাদের একজন রাজা নির্বাচন করা হউক। (রাজানম্ করবমহ ইতি তথেতি)।[৯] প্রাচ্যদেশেই প্রথম সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সার্বভৌম নৃপতি মৌর্য সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত। মৌর্যরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সময়কাল পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান ছিল। ড. দীনেশ সেন

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, বঙ্গদেশে এক সময় বৌদ্ধধর্ম প্রবল পরাক্রমের সাথে রাজত্ব করিতেছিল (৭৫০-১১৫০) সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিউয়েন সঙ্গে মুঙ্গের এবং সমুদ্রের অর্ন্তবর্তী প্রদেশ সমূহে ১১,৫০০ ভিক্ষু পুরোহিত দেখিয়া গিয়াছিলেন।....পাল রাজাদের সময়েও বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে প্রবল ছিল। মগধের রাজধানী ওদন্তপুরীতে মুসলমানগণ বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, উহা খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটিয়াছিল। এই সময়ের পরেও বৌদ্ধধর্মের বিলয়োমুখ নিদর্শন বঙ্গদেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।[১০] ' মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও সমতট রাজ্যে (কুমিল্লা, নোয়াখালী) বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করে। হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা মতে, স্বয়ং বুদ্ধ সমতট রাজ্যে আগমন করেন এবং সমতটের রাজধানীতে সাত দিন ধর্ম প্রচার করেন। উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধপীঠস্থান ও অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার এবং সমতট রাজ্যের রাজধানী বড়কাম্যতায় (বর্তমান কুমিল্লা জেলার চান্দিনায়) হিউয়েং সাঙ একটি অশোকস্তম্ভ ও চারটি বুদ্ধমূর্তি সেখানে লক্ষ্য করেন।[১১] হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধনে এসে (আনুমানিক ৬৩৮-৬৪৫খ্রি.) ভাসু বিহারে (Po-shi-po) অবস্থান করে পাঠ গ্রহণ করেন। এই বিহারের নির্মাতা মৌর্য সম্রাট অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৮-২৩২) খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক।[১২] চৈনিক পরিব্রাজক সেংচি সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমতট পরিভ্রমণে আসেন। তিনি সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রধান ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্যাবর্তের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পুণ্ড্রদের 'দস্যু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের মুঙ্গেরের পূর্বে পুণ্ড্রদের অবস্থান বলে ইঙ্গিত রয়েছে। পুরাণসমূহে পূর্বদেশে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যেই পুণ্ড্রদের উল্লেখ রয়েছে। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায়ও পুণ্ড্রদের পূর্বদেশীয় বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুণ্ড্রদের আবাসস্থলই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মিলিপিতে উল্লেখিত 'পুডনগল' (পুণ্ড্রনগর) ও বগুড়া জেলার মহাস্থান যে অভিন্ন এবং পুণ্ড্রনগর যে পুণ্ড্রদের আবাসস্থল পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র সে সম্পর্কে এখন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মহাস্থানে ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তুপের পাশে বর্তমানে করতোয়ার ক্ষীণ প্রবাহ যে এককালে পুণ্ড্রনগরের পাশ দিয়ে প্রবল বিক্রমে প্রবাহিত হতো তা একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর করতোয়া মাহাত্ম্য গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৩]

পুণ্ড্রনগরকে কেন্দ্র করে উত্তর বাংলা মৌর্য শাসনভূক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে। গুপ্তযুগে যে উত্তর বাংলা গুপ্ত শাসনের সুফল ভোগ করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে উত্তর বাংলায় বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত বেশ কয়েকটি তাম্রলিপিতে। এই লিপি প্রমাণ থেকে গুপ্ত শাসনাধীনে পুণ্ড্রবর্ধন ভূক্তির সমৃদ্ধশালী অবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্ত পরবর্তী যুগে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং মগধকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছিলেন গৌড়রাজ্য, যার কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণে। শশাঙ্কোত্তর

Dhaka University Institutional Repository

কালে হিউয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রি.) এসেছিলেন উত্তর বাংলায় এবং তাঁর বর্ণনা সমসাময়িক উত্তর বাংলার ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে কি-চু-যু-খি-লো (কজঙ্গল = কাঁকজোল, রাজমহলের ১৬ মাইল দক্ষিণ থেকে পূর্বদিকে, গঙ্গা নদী পার হয়ে, প্রায় ৬০০ লি (প্রায় একশত মাইল) অতিক্রম করে আমরা এসেছিলাম পুন-ন-ফ-তন-ন (পুণ্ড্রবর্ধন) রাজ্যে। এই রাজ্যের পরিধি প্রায় ৩০ লি। ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চল এখানকার ভূমি সমতল ও মাটি দো-আঁশ এবং সবরকম শস্য উৎপাদন হয়।[১৪]

এখানে প্রায় ২০টি সংঘরাম আছে যেখানে প্রায় ৩০০০ পুরোহিত বাস করে। এতে হীনযান ও মহাযান উভয় মতবাদই শিক্ষা করে। প্রায় শতাধিক দেব মন্দির রয়েছে, যেখানে বিভিন্ন মতাদর্শীরা উপাসনা করে। অসংখ্য উলঙ্গ নিগ্রন্থ রয়েছে। রাজধানী শহরের ৩০ লি পশ্চিমে 'পো-শি-পো' সংঘরাম। এর প্রাঙ্গন প্রশস্ত এর স্তম্ভসমূহ বেশ উঁচু। প্রায় ৭০০ পুরোহিত এখানে বাস করে এবং মহাযান মতবাদ অধ্যয়ন করে। পূর্ব ভারতের বহু খ্যাতিমান পুরোহিত এখানে বাস করে। এর অদূরেই অশোকরাজ নির্মিত স্তুপ। এখানে তথাগত বুদ্ধ তিনমাস কাল ধর্ম প্রচার করেছিলেন। মাঝে মধ্যে বিশেষ করে উপবাসের দিন, এখানে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়। এর পাশেই রয়েছে ঐ স্থান যেখানে চারজন অতীত বুদ্ধ পদচারণা করেছিলেন, যার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। এর অদূরেই রয়েছে একটি বিহার, যার মধ্যে কোয়ান, তা-সাই বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তি আছে। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাইরে কিছুই নেই, দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর কাছে প্রার্থনা নিয়ে আসে।

এখান থেকে পূর্ব দিকে ৯০০ লি পথ অতিক্রম করে এবং পথে একটি বিশাল নদী পার হয়ে আমরা যাই কিয়া মো-লো-পো (কামরূপ) দেশে। প্রত্নতত্ত্ববিদ আলোকজান্ডার কানিংহাম অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন যে 'পুণ্ড-ন-ফ-তন-ন' (পুণ্ড্রবর্ধন) ও মহাস্থান অভিন্ন এবং মহাস্থানের ৪ মাইল পশ্চিমে 'ভাসু বিহার'ই হিউয়েন সাং এর 'পো-শি-পো' বিহার। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে ভাসু বিহারের ধ্বংসাবশেষ উৎঘাটন করা হয়েছে এবং কানিংহামের সনাক্তকরণ এখন নিঃসন্দেহ। হিউয়েন সাং এর সমসময়িক আরো অনেক চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতেও বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের সমৃদ্ধির কথা জানাযায়। তা-চিং-তেঙ্গ, তাও-লিন, ইৎসিং প্রসিদ্ধি। হিউয়েন সাং হতে ইৎসিং এর সময় কাল পর্যন্ত আরো ৫৪ জন চৈনিক পরিব্রাজক বাংলা পরিভ্রমণে আসেন।[১৫]

৬৫০ থেকে ৭৫০ পর্যন্ত সময়কাল বাংলার ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়াম' কাল। এই সময়কালে বারংবার বিদেশী আক্রমণে উত্তরবঙ্গ আক্রান্ত হয়েছিল। চৈনিকও তিব্বতীদের অভিযান এবং শেষের দিকে কনৌজরাজ যশোবর্মন ও কাশ্মিররাজ ললিতাদিত্যের আক্রমণের ফলে উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় যে বিধ্বস্ত অবস্থা বিরাজমান ছিল তার প্রমাণ বৈরাগী ভিটার প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পাওয়া যায়।[১৩]

মাৎস্যন্যায়মের অবসান ঘটিয়ে গোপাল কর্তৃক পাল সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পালদের শাসন প্রায় চার শতাব্দী কাল ধরে অব্যাহত ছিল। রামচরিত কাব্যে বরেন্দ্র পালদের জনকভূ বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং মহিপালের বাণগড় লিপিতে বরেন্দ্রই 'রাজ্যম পিত্র্যাম' বলে উল্লেখিত হয়েছে। পাল যুগে পুণ্ড্রবর্ধন ভূক্তি যে চরম উন্নতি লাভ করেছিল এবং পাল সাম্রাজ্যে এই অঞ্চলের একটি বিশেষ স্থান ছিল তার প্রমাণ স্পষ্টভাবে রয়েছে প্রাপ্ত পাল লিপিমালায়। পালদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার। জনশ্রুতিতে শিল্পী ধীমান ও তার ছেলে বিৎপাল কর্তৃক ভাষ্কর্য শিল্পে উৎকর্ষ অর্জনের কথা পাওয়া যায়। পাল যুগের ভাষ্কর্য শিল্পের উত্তর বাংলার শিল্পীদের অবদানের কথাই প্রমাণ করে এই জনশ্রুতি।

সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন গৌড় মগধে পরবর্তী গুপ্তবংশীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, দক্ষিণ পূর্ব বাংলা তখন খড়্গ রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। কুমিল্লা অঞ্চল তাদের শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং বঙ্গ সমতট অঞ্চলে তাদের আধিপত্য ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সমতট অঞ্চলে দেব রাজবংশের অস্তিত্ব এখন প্রমাণিত সত্য। শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব ও ভবদেব নামে চারজন রাজার শাসনের প্রমাণ তাম্রলিপিসমূহে পাওয়া যায়। তাছাড়া ময়নামতির খননোৎঘাটিত প্রত্ননিদর্শনাদিতে এই বৌদ্ধ রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই অঞ্চলে বিরাজমান বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৌদ্ধ রাজশক্তি চন্দ্র বংশের শাসন। ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, কল্যাণচন্দ্র, লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের শাসন সমতট বঙ্গব্যাপী বিস্তারলাভ করেছিল এবং তার জয়স্কন্ধধবার ছিল বিক্রমপুরে। দেব ও চন্দ্রদের শাসনের মধ্যবর্তী সময়ে সমতটের পূর্ব প্রান্তে হরিকেল রাজাদের শাসনেরও প্রমাণ রয়েছে। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্মন রাজবংশের শাসন এবং এই বর্মন বংশের শাসনের অবসান ঘটিয়েই দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেন সম্রাট বিজয় সেন বাংলার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে শাসন বিস্তার করেন এবং সেনদের অধীনেই কিছুকালের জন্য পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলা একক রাজনৈতিকসত্তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চারশত বর্ষব্যাপী পাল শাসনের বিস্তৃতি কোনদিন দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ঘটেছিল কিনা আজ তা বাংলার ইতিহাসে একটি প্রশ্ন। দক্ষিণ পূর্ব বাংলার রাজবংশসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণাদি আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে (অর্থাৎ আজ থেকে দুই-তিন দশক আগে) এই বিষয়টি ছিল প্রশ্নাতীত। সেই সময়ে মনে করা হত

Dhaka University Institutional Repository

আর অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ যারা ছিল তারা নিজেরা পালিয়ে এবং গোপনে ধর্মচর্চা করে যান। তখন তারা মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হতে নির্যাতিত হয়। এভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধরা অল্প সংখ্যক বাংলায় টিকে আছে। তারা আপনার মত করে নামমাত্র বৌদ্ধধর্ম পালন করে আসছে।[১৯] প্রাচীন লেখমালা অর্থাৎ শিলালেখ তাম্রশাসনে'র বিষয়বস্তুতে বিশেষ করে চারটি দিক প্রতিভাত হয়। সমাজ, আর্থিকঅবস্থা, ধর্মজীবন এবং তৎকালীন সাহিত্য। এছাড়া এসব লেখমালায় বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজাদেশ ও সমকালীন সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়ে থাকলেও এর অনেক অংশ পরবর্তী কালের রচনা এবং প্রক্ষিপ্ত। প্রাচীন ধারার প্রবর্তন এর বিবরণ অনেকাংশ আদর্শমূলক ও বাচনিক (Theoretical), গতানুগতিক এবং স্থান-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের ইতিহাস রচনা অত্যন্ত দুরুহ কাজ। এখানে সভতার বিভিন্ন স্ত রবর্তী নানা জাতি ও জনপদের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বসবাস পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত/দ্বন্দ্ব-বিরোধ কোথায়, কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার গ্রন্থের কাল এবং রচনা স্থান নির্ণীত হয়নি। সুতরাং জাতি, ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির স্থান কাল পাত্র নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু, বাংলার তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধজাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে রচনা করতে হলে বিভিন্ন সময়ে রচিত বাংলার ইতিহাস, সাহিত্যের অগণিত গ্রন্থ, অসংখ্য রাজকীয় বা রাজন্যবর্গের ইতিহাস, দেশী-বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং অন্যান্য লেখমালা ও শিলালিপি বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলার ইতিহাস সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা কম নয় কিন্তু বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধজাতির ইতিহাস বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আজো কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাই ঐরূপ ঐতিহাসিক উপাদান ও বৌদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থের স্বল্পতা রয়েছে।

চীনাদূত মাহুয়ান পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় আসেন। তিনি লিখেছেন, "সু-মেন-তা-লা (সুমাত্রা) রাজ্য হতে জাহাজ যোগে পাংগ-কোলা (বাঙ্গালা) রাজ্যে যেতে হয়: জাহাজ প্রথমে চেহ-তি-গাঁ (চাটিগাঁও) বন্দর পৌঁছে। এরপর নৌকাযোগে নদী পথে ৫০০ লি (১৬৭ মাইল) যাওয়ার পর সোনা-উরহ-কংবা (সোনারগাঁও) অবতরণ করতে হয়।"[২০]

মূরদেশীয় পর্যটক ইবন বতুতা চাটগাঁওকে সাদকায়ান বলেছেন। তিনি ১৩৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। 'ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ (Ralph Fitche) ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেন যে, শ্রীপুর হতে গঙ্গানদী পথে সন্দ্বীপ ও পোর্টোগ্রাণ্ডি (Porto Grande) বা চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পেগু যান।'[২১]

বাংলাদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ ও বাঙ্গাল হতে এর অধিবাসীদের বাঙাল বা বাঙালী নাম হয়েছে। বঙ্গ ও পুণ্ড্র ইহার আদিম অধিবাসী ছিল। ইহারা দ্রাবিড় ও আর্যদের থেকে পৃথক ছিল

Dhaka University Institutional Repository

এবং ভারতের অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের ন্যায় ইহারা বর্তমানে কোল, ভীল, শবর, প্রভৃতি লোকদের আদি পুরুষ ছিল। পণ্ডিতরা বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকে অষ্ট্রো-এশিয়াটিক বা অষ্ট্রিক নামে অভিহিত করেছেন। ইহাদেরকে নিষাদ জাতিও বলা হয়। এর পরে মোঙ্গল, দ্রাবিড়, হোমো আলপাইনাস, আর্য প্রভৃতি জাতির লোক বাংলায় আসে। মুসলমান শাসনকালে বহু তুর্কী, আরব ইরানী, হাবসী, আফগান ও মুঘল বাংলায় বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সুফী ও আলেমরা এদেশের ব্যাপক ভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজ করেন। এর ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসনের পর মুসলমানরা সাড়ে সাতশ বৎসর বাংলাদেশ শাসন করেন।

গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে বাংলার সংকটকাল বা অন্ধকার যুগ। গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়কাল পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের আমলেই বাংলায় প্রথম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থ সমূহ থেকে আমরা বাংলার প্রাক বৌদ্ধ যুগের দুই রাষ্ট্রের নাম পাই। একটি হচ্ছে শিবি রাজ্য এবং অপরটি হচ্ছে চেত রাজ্য। এ দুইটি রাষ্ট্র গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। বর্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে শিবি রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে। এর দক্ষিণে ছিল চেত রাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেত নগরীতে। পালি সাহিত্যের পিটক বর্হিভূত বংশ সাহিত্যের সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ দীপবংশ ও মহাবংশ গ্রন্থ দুটিতে উল্লেখ আছে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে এক রাজার বিজয় সিংহ নামে এক পুত্র দুর্বিনীত আচারের জন্য সাতশত অনুচরসহ বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সিংহলে গমন করেন এবং সেখানে কুবেণী নাম্নী এক যক্ষিণীকে বিবাহ করে সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

সব ধরণের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন সঙ্গে নিয়ে বর্তমানের দুরন্ত জীবনযাত্রার একটা সমস্যা হলো যে কিছু দীর্ঘ স্থায়ী প্রবণতার প্রতি আমাদের চিন্তা-চৈতন্য হারিয়ে যায়; এই প্রবনতা যুগ যুগ ধরে বৌদ্ধদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা, সমাজ, সংগঠন ও জাতির উন্নয়নে অভিঘাত করছে। যে কোন সমাজের উন্নতি সমৃদ্ধি, ঐক্য, সংহতি সমাজস্থ মানুষের মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে। এই মূল্যবোধ আসলে তাদের ধর্মবিশ্বাস যা তাদের প্রভাবিত করে; পরিচালিত করে। হিন্দুধর্ম (যার বৈজ্ঞানিক নাম ব্রাহ্মণ ধর্ম) বহু ধর্মকে (বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শৈবধর্ম) গ্রাস করেছে। এই হিন্দুধর্ম বিশ্বের সর্বাপেক্ষ উদার বৌদ্ধধর্মসহ সকল প্রতিবাদী আন্দোলনগুলিকে গ্রাস করেছে। বৌদ্ধধর্মকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারত থেকে উৎখাত এবং ধ্বংস করা হয়েছে। শংকরাচার্যের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণরা সমস্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের আক্ষরিক অর্থে নিধন করে ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে আজো বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি বিদ্যমান, কিন্তু ভারতে এর কোন অস্তিত্ব নেই; একমাত্র ব্যতিক্রম ড. বি.আর, আম্বেদকর। অন্ত্যজদের ত্রাতা এবং ভারতের এক নতুন উদীয়মান তারকা

Dhaka University Institutional Repository

ড. আম্বেদকার লক্ষ লক্ষ অন্ত্যজদের সঙ্গে নিজেও তাঁর জীবনের শেষ পর্ব বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ছিলেন।

ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন বুদ্ধ এবং অন্ত্যজরা একে গণ চরিত্রে দান করে ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বস্তরের মানুষ বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়ে যায়। পরবর্তীতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংঘর্ষে বৌদ্ধরা পরাজিত হয় এবং তাদের নির্বিচারে হত্যা ও বিতাড়িত করে। বৌদ্ধধর্মের শত্রু উগ্রবাদী ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করে এই ধর্মের বিরুদ্ধে অন্তঘাত চালানোর কূট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অভ্যান্তরিক এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই এরা বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। ভারতের বহু অংশে আদি শঙ্কর নিজে বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করেন। বৌদ্ধরা পরাজিত হলে আর্যরা এই পরাজিত বৌদ্ধদের ওপর অস্পৃশ্যতা চাপিয়ে দিল। প্রাচীন কালে বৌদ্ধোত্তর যুগে বৌদ্ধ রা ক্রমে অন্ত্যজ শ্রেণীতে পরিনত হয়। তখন বাংলায় অন্ত্যজরা জাত বিদ্বেষের চরম বৈষম্যের কদর্যতার শীকার হয়। ফলে তারা বাধ্য হয় ধর্মান্তর করতে নয়তো দেশ ত্যাগ করতে। জাত-শ্রেণী বৈষম্যে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক নিন্মবর্ণ ও অন্ত্যজরা। বাংলায় অন্ত্যজ শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যাপক শোরগোল তুলেছিল। অন্ত্যজ এবং আদিবাসীরা জন্ম বিপ্লবী।[২২] যেকোন জনগোষ্ঠি দুই প্রকারের চরিত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কারা যায়; বস্তুগত এবং মনস্তাত্ত্বিক। বস্তুগত চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকৃতিগত ভাবে প্রদত্ত, অপরিবর্তন শীল, মোটামুটি ভাবে পরিদৃশ্যমান। বস্তুগত ভিত্তিগুলো ক্লিকোর্হ গিয়াৎস ছটা ভাগে ভাগ করেছেন-১। অনুমিত রক্তের সম্পর্ক ২। আধিজাতি বা রেস ৩। ভাষা ৪। অঞ্চল ৫। ধর্ম ও ৬। প্রচলিত রীতিনীতি।

বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থল বুদ্ধগয়া বা মগধ থেকে বেশি দূরে নয়. সেজন্য অনুমান করা হয় বুদ্ধের জীবতকালে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু প্রাচীন পালি সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার বিষয়ক কোন তথ্য পাওয় যায়না বুদ্ধের মহাপরিনিবার্ণের পর যে সমস্ত দেশ জনপদ বুদ্ধের পবিত্র ধাতু বা দেহ ভঙ্গের অংশ লাভ করেছিল তাদের মধ্যে বঙ্গ বা বাংলাদেশের উল্লেখ দেখা যায় না।[২৩]

ভগবান বুদ্ধের দাহক্রিয়া উৎসবে ও বাংলাদেশীয় কোন ভিক্ষু বা গৃহী উপস্থিত ছিল বলে সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন উল্লেখ নেই। এসব কারণে নলিনীনাথ দাসগুপ্ত মনে করেন পরবর্তী কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সাহিত্যিক প্রমাণহলো একেবারে অবিশ্বাস্য।[২৪] সিংহলী কিংবদন্তী অনুসারে বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় (Lalfha) দেশের রাজপুত্র বিজয় সিংহ বুদ্ধ পরিনির্বারে দিনেই সসৈন্যে লংকাদ্বীপে অবতরণ করেছিলেন । এতে আরো বলা হয়েছে যে, বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বারে পূর্বমূহুর্তে তথায় উপস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রকে নির্দেশ দেন, লংকাদ্বীপে বাঙ্গলার

Dhaka University Institutional Repository

রাজকুমার বিজয় সিংহকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি ইহাও বলেন যে, বিজয় সিংহের দ্বারা তাঁর নবধর্ম লঙ্কায় প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।[২৫]

অশোকাবদানে রক্ষিত আর একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী জানা যায় পুন্ড্রবর্ধনের কোন এক বৌদ্ধ বিদ্বেষী জৈন উপাসক (নিগ্রন্থ) পায়ের নীচে মাড়িয়ে বুদ্ধের প্রতিকৃতি অঙ্কির করেছিল। এ সংবাদ অশোকের কাছে আসলে সঙ্গেসঙ্গে তিনি পুন্ড্রবর্ধনের ১৮,০০০ আজীবিককে হত্যা করবার নিদের্শ দেন।[২৬] প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খ্রীস্টজন্মের বহু পূবেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এসময় দুটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছবগ্গীয় এবং দেবদত্তের অনুসারীরা সম্ভবত বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। মহাস্থান শিলালিপি বিশ্লেষণে ড. বেনীমাধব বড়ুয়া মনে করেন, ছবগ্গীয় সম্পদায় মৌর্য যুগের প্রথম দিকে রাজধানী পুন্ড্রনগরে বাস করতেন। পরবর্তী কালে হিউয়েনসং এ বিষয় বিবরণ থেকে জানা যায়, কর্ণসুবর্ণে তিনটি সংঘারাম ছিল, ইহার ভিক্ষুরা ছিল দেবদত্তের অনুসারী[২৭] প্রবোধ চন্দ্র বাগচী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, বৌদ্ধধর্মের উপর শশাঙ্কের এই নির্যাতন এত বেশি কঠোর হতে পারে না যেহেতু তাঁর সময়েই বৌদ্ধধর্ম বেশ সমৃদ্ধ ছিল

এই কিংবদন্তী অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে মনে করা হয় যে, অশোকের পূবেই বাংলাদেশের উত্তরভাগে বৌদ্ধ ধর্মের ঢেউ গিয়ে পৌছে ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন (Fa-Hien)[২৮] খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে ভারতে ভ্রমণ এসেছিলেন। তাঁর বিবরণে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বিবরণ মতে, তাম্রলিপ্তিতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার, সমতটের রাজধানীতে ৩০টি বৌদ্ধ বিহার এবং ২০০০ এর অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন।

ফাহিয়েনের বিবরণে বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রানুশাসন (৫০৬ অথবা ৫০৭ খ্রীস্টোব্দর) থেকে জানা যায় যে, মহারাজ বৈন্য গুপ্ত মহাযান সম্প্রদায়ের বৈবর্তিক সংঘের উদ্দেশ্যে কয়েক একর ভূমি দান করে ছিলেন। এ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শান্তিদেব নিকটবর্তী আশ্রম বিহারে বাস করতেন। রুদ্রদত্ত নামক কোন এক উপাসক আর্য অবলোকিতেশ্বরের উদ্দেশ্যে ঐ বিহার নির্মাণ করান।[২৯] এতে প্রাপ্ত এই প্রত্নলিপি মতে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

" খ্রীস্ট্রীয় ৬৭৩ অব্দে ইৎসিং তাম্রলিপ্তে পর্দাপণ করেন। এখানে তিনি কিছু দিন অবস্থান করে সংস্কৃত ও শব্দ বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তিনি নার্গাজুনের 'বোধিসত্ত্বে সুবৃহৎ লেখ' নামক গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।"[৩০] "শেঙ ছি (Shengehia) নামক আর একজন চৈনিক পরিব্রাজক ইং সিং এর সমসাময়িক কালে সমতট রাজ্যে পর্দাপণ করে ছিলেন। তাঁর বিবরণে সমতটে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে

Dhaka University Institutional Repository

দেশের তদানীন্তন রাজা ছিলেন রাজভট্ট। তিনি প্রত্যেকদিন একলক্ষ মৃত্তিকা নির্মিত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করান এবং মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা, সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করতেন। তিনি ভগবান বুদ্ধের সম্মানার্থে বৃহৎ শোভাবাত্রার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে নগরের মধ্যে চার হাজারের অধিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী অবস্থান করতেন।"[৩১]

প্রাচীন বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে আর্য উপনিবেশ স্থাপন মৌর্যযুগে প্রতিবেশী মগধাঞ্চল থেকে প্রথম বঙ্গদেশে জৈন মতাবলম্বীদের প্রথম আগমন। জৈনদের পর আগমন বৌদ্ধদের, তারপর গুপ্ত শাসনামলে ব্রাক্ষণ্যবাদীদের। আর্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন বরেন্দ্রভূমিতে।[৩২]

রাজভট্ট ছিলেন খড়গ বংশীয় নৃপতি। খড়্গ বংশীয় রাজারা খ্রীষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর শেষে দিকে সমতটে রাজত্ব করতেন। তাঁরা সাত্ত্বিক বৌদ্ধ ছিলেন। নালন্দা তখন বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাংলার রাজন্যবর্গ ও পণ্ডিত সমাজ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে নালন্দার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যথেষ্ট অবদান রাখেন। তখন নালন্দা মহাবিহারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন সমতটের মহাপণ্ডিত শীলভদ্র। তিনি হিউয়েন সাং এর শিক্ষাগুরু ছিলেন।

'আধুনিককালে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল যা বঙ্গদেশ বা আকবরের সুরে বাংলা' নামে পরিচিতি হয়ে ওঠে তা বঙ্গদেশ নামে পুরাকালে পরিচিতি ছিল না, এতদ অঞ্চলের জনগণ এক ভাষাভাষী ও প্রায় একই সাংস্কৃতিক বাহক হয়েও বাঙালী নামে অতীতে পরিচিত ছিল না। বঙ্গ অববাহিকা তখন বিভিন্ন জনপদে ছিল বিভক্ত, আর জনপদবাসীরা স্বস্বজনপদের নামেই পরিচিত হত। কিন্তু বঙ্গভূমি অতি প্রাচীন কালেই একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক একক এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রসত্তা হিসেবে গড়ে উঠেছিল।[৩৪]

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত জনৈক কান্তিদের নামক নপৃতি প্রদত্ত তাম্রশাসনে হারিকেল (হরিকেলা বা হরিকেলি) মণ্ডলের নাম পাওয়া যায়। তাই ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, খ্রিষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম সন্নিহিত দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের অঞ্চলে একটি রাজবংশ রাজত্ব করতেন । ইৎসিঙের বর্ণনা মতে, তিনি শ্রীলঙ্কা থেকে সমুদ্র পথে পূর্বাভারত এসেছিলেন, হরিকেল হল পূর্ব ভারতের প্রাচ্যতম সীমা এবং জম্বুদ্বীপের অংশ বিশেষ। সুতরাং মনে করা যায় যে, চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত সমুদ্রোপকূল এলাকা নিয়েই বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমান্তে গড়ে উঠেছিল আদি হরিকেল। চৈনিক পরিব্রাজক, বৌদ্ধচর্যাদের রচনা থেকে সমুদ্রকূলবর্তী জনপদ ও সুবৃহৎ বন্দর নগরী তাম্রলিপির সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। শুধু বাণিজ্য নয়; শিক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবেও তাম্রলিপি সেকালে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

ইউ-এন-সাঙ সমতট থেকে তাম্রলিপ্তির হয়ে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে গিয়ে ছিলেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী কর্ণসুবর্ণের অবস্থান তাম্রলিপ্তির থেকে ১৪০ মাইল উত্তর পশ্চিমে। রাজ্যটির পরিসীমা ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

মাইল ও রাজধানীর পরিধি আকারে ৪ মাইল। এখানে কমপক্ষে ১০টি সংঘারাস বা বিহার ছিল, যেখানে ২০০০ আচার্য বসবাস করতেন। এই সংঘারাম ছিল রাজ্যের খ্যাতনাম বিদ্বান ও পণ্ডিত্যের শাস্ত্রলোচনা ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান।[৩৫]

বর্তমান মুর্শিদাবাদ বীরভূমের উত্তরাঞ্চল ও মালদহের কিছু অংশ নিয়ে ছিল কর্ণসুবর্ণ রাজ্যেত্ব বিস্তৃতি। ইউ এন চ্যাং এর মতে রাজা শশা ছিলেন কর্ণসুবর্ণের সম্রাট। হর্ষচরিতে শশাঙ্ক বর্ণিত হয়েছে গৌড়েশ্বর রূপে। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগর এবং সন্নিকটস্থ রক্তমত্তিকা বিহার বর্তমানে নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কর্ণসুবর্ণ রাজ্য যে অন্তত খ্রিষ্ট্রিয় দ্বিতীয় শতকেই প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল টলেমির রচিত ভূগোল বৃত্তান্তে জানা যায়।

গৌড়ের প্রাচীনত্ব এবং সর্মাধিক খ্যাতি সপ্তম শতক থেকে শুরু হয়। রাজা শশাঙ্কের আমলে সমগ্র উত্তর বঙ্গ, প্রাচীন গৌড় বা কর্ণসুবর্ণ দক্ষিণাবঙ্গ, উৎকল দক্ষিণে তাম্রলিপ্তি ও উপকূলসহ দন্ডভূক্তির সবই গৌড় রাজ্যের অর্ন্তভূক্তি ঘটে। "শুধু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য, শাস্ত্র ও ধর্ম গ্রন্থাদি, খোদিত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে ও চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বিবরণীতেই নয়, গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীদের বিবরণেও পুর্বভারত ও বঙ্গদেশের প্রাচীন জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রিষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই যে ভারত বর্ষের পূর্বাঞ্চলে স্বতন্ত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এর নিঃসংশয় তথ্য গ্রীক বীর আলোকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ সংক্রান্ত ঘটনার গ্রীক ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়। আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের শেষপাদে পাবে তিস্তা নদীর তীরে উপনীত হয়েছিলেন। সমসাময়িককালে গঙ্গাতীরবর্তী বর্তমান বিহার, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গকে নিয়ে প্রাসী (প্রাচী) ও গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ়ি রাষ্ট্র নিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গড়ে ওঠেছিল। এই যুক্তরাজ্য ব্যবস্থার নৃপতি ছিলেন মহাপদ্ম নন্দের পুত্র উগ্রসেন।

প্রাচীন সদুক্তি কর্ণমৃত (১২০৬) গ্রন্থে বঙ্গাল কবির উল্লেখ আছে। সুলতান শ্যামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহই প্রথম (১৩৫২ খ্রি) তিনটি অঞ্চলকে (লখনৌতি বা লক্ষণাবতী, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও) একত্রিত করে নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসেবে ঘোষণার মধ্য দিয়েই বাঙালী বা বাঙ্গালা নামের প্রতিষ্ঠা করেন। তারীখ ই-ফিরুজশাহীর গ্রন্থে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে শাহ-ই - বঙ্গালা নামে অভিহিত করা হয়। সুকুমার সেন বলেছেন বঙ্গ জাতি হতে দেশ বাতক বঙ্গ নামের উৎপত্তি বাঙ্গালা বা বাঙালহ'র নাম সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম শাসনামলে। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাঙালা বা বাঙ্গালী শব্দের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন-প্রাচীন বঙ্গ শব্দের সাথে আল শব্দ যুক্ত হয়ে গঠিত হয় বঙ্গালা বা বাঙ্গালা। বঙ্গ+আল=বঙ্গাল আল শব্দের অর্থ হলো জলরোধ বা আটকানোর জন্য ছোট বা বড় বাঁধ । সুতরাং আমরা বলতে পরি, পৌন্ড্র-বরেন্দ্র, গৌড়-কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি, বঙ্গ-সমতট-হরিকল

এই সব জনপদ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল অতীতের বঙ্গভূমি।

Dhaka University Institutional Repository

এই বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র জনপদ ইলিয়াস শাহী অঞ্চলে বাঙ্গালা, মোঘল আমলে আকবরের কালে এই প্রাচীন গৌড় বঙ্গ বা সুবে বাঙ্গালা, পতুগীজদের আমলে বেঙ্গালা, ইংরেজদের হাতে শেষ পর্যন্ত বঙ্গ পরিনত হয়েছে বেঙ্গল।

আর্য সভ্যতা নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা পরিসীমা নেই। অথচ আর্যরা যা দিয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সম্পদ হল ভাষা ও লিপি।[৩৬] আর্যরা বাংলাদেশে যাদের 'নিষাদ' বলে নিন্দা করেছেন তারাই বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সত্যিকার স্রষ্টা। এদের সমাজ ছিল সাম্যবাদী ধরনের, যা আর্যপ্রবর্তিত জাতি বর্ণ ব্যবস্থায় নিম্নমানের শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৩৭] Custom Dies hard, প্রথা বা সংস্কার সহজে লোপ পায় না। তাই আদিম সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলে বর্তমানে আমাদের বয়ে নিয়ে চলা সংস্কার বা প্রথাকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

রাঢ় অঞ্চলে সম্পর্কে লিখিত প্রাচীন ইতিহাস সামান্য যা পাওয়া যায় তা হল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিবরণ ও পরবর্তীকালে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ। এই দুই যুগের আবিস্কৃত মূর্তি ও শিলালিপি ও কিছু সাক্ষ্য বহন করছে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণবতার ভাব বন্যায় তান্ত্রিকতা ম্লান হয়ে গেছে।

বৌদ্ধধর্মকে অপসারণের উদ্দেশ্যে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা কি রকম চেষ্টিত হয়েছিল তা লৌকিক দেবদেবীর পূজাপাঠগুলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেক জায়গার মাটির নীচে বুদ্ধমূর্তি গুলিকে পুঁতে ফেলে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাতেও ক্ষান্ত হননি তান্ত্রিক সাধকরা। জনমনে বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রামায়ন মহাভারতের যাবতীয় উপাখ্যান স্থান বিশেষের উপর আরোপ করে গেছেন। সবগুলো জড়ো করলে মনে হবে রামায়ন-মহাভারতের কাহিনী এখানেই ঘটেছে এবং হিন্দু পুরাণের তাবৎ ঘটনার পুণ্যক্ষেত্র এই রাঢ় অঞ্চল তথা পশ্চিমবঙ্গ। (প্রাগুক্ত, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৬) বৌদ্ধ রাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য, উচ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সম্মানের আসন স্বীকৃত হয়েছিল। কারণ বৌদ্ধরা বেদ বিরোধী হলেও আর্যসংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। বৌদ্ধ আমলে যুগযুগ ধরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠায় কোন বিঘ্ন হয়নি। বৌদ্ধ বিপ্লব ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিন্যাস কিংবা বর্ণাশ্রম রীতিকে আঘাতও করেনি, অস্বীকারও করেনি। তাই বাংলাদেশে যখন বৌদ্ধ রাজারা দেশ শাসন করছেন তখনও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য সমাজশাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত । বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠা বরাবর অক্ষুন্ন ছিল। বিভিন্ন ভাবে ভূমিদান, সাহায্য সহযোগিতা লাভ করে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য রাজন্যবর্গ এবং মুসলমান শাসনামলে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের উপর নেমে আসে নির্যাতন নিপীড়ন, অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা। অসহায় বৌদ্ধরা বাধ্য হয় ধর্মান্তর ও দেশ ত্যাগে করতে। যে কয়জন বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁদের শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুষ্ঠান হত গোপনে। বৌদ্ধ বিহারগুলো হয়ে পড়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও জীর্ণশীর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু পাল আমলে নয়: গুপ্ত, চন্দ্র ও কম্বোজ রাজাদের শাসনামলেও ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, অর্থদান, গ্রামদান অব্যাহত ছিল।[৩৮] সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্দি করলে বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্মে প্রাচীন নিয়মনীতি, সামাজিক বাধানিষেধ, অনুশাসন ও সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য বিন্যাস অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করে বৌদ্ধ সমাজ গঠিত হয়েছিল। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থায় পার্থক্য ছিল না। সংঘারামে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মের উপাসক শ্রেণীর জীবনচর্যা, সংস্কৃতি ও ক্রিয়াকর্মে যুগপ্রচলিত ব্রাহ্মণ্য শাসন ও বিধির অনুরূপ। বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ধর্ম, বর্ণ ও সমাজ নিয়ে বিতর্ক করতেন সত্যি কিন্তু বৌদ্ধ সমাজ বিধি বলে নতুন কিছু তাঁরা সৃষ্টি বা সংস্কার করেননি।

৩.৪ বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের আগমন ও ধর্মপ্রচার

বুদ্ধ বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলি পরিভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে এদেশের প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার ও সমৃদ্ধির অসংখ্য তথ্য প্রমাণ, ইতিহাস ও প্রত্ন সভ্যতা বিদ্যমান। বঙ্গ অতি প্রাচীন জনপদ। ইতিহাস মতে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বঙ্গের রাজা ছিলেন সিংহ বাহু। তিনি বিক্রমশালী ও প্রজাহিতকর নরপতি ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল সিংহপুর। সিংহপুর বর্তমান কুমিল্লা জেলার ময়নামতির কোটবাড়ী এলাকা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই এলাকার বহু প্রাচীন রাজবংশের ধ্বংসাবশেষ উৎঘাটন করেছে। ময়নামতির ইতিহাসে উল্লেখ আছে, খ্রিস্টীয় নবম শতকে বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন সমতটের চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের মধ্যে মানিকচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। রাজা মানিকচন্দ্রের রাণীর নাম ছিল ময়নামতি। তাঁর নামানুসারে ময়নামতি নামকরণ হয়েছে।[৩৯]

চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ রাজবংশের আদি নিবাস ছিল লোহিতগিরি বা লালমাই। সিংহবংশীয় রাজা সিংহ বাহুর রাজত্বকালে তথাগত বুদ্ধ প্রাচীন সমতটে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সিংহ বাহুর (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) বংশানুক্রমে পরবর্তী বংশধর সিংহ উপাধিধারী বহু বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি এখনও কুমিল্লা, ময়নামতি ও লাকসামে রয়েছে। প্রাচীন সিংহবাহুর পুত্র ছিলেন বিজয় সিংহ। খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ বর্ষে রাজা বিজয় সিংহ তাঁর অনুসারীসহ সিংহল গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের দুই জন সাক্ষাত শিষ্য বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গীশ ভিক্ষু পুণ্ড্র বাংলার প্রাচীনতম জনপদ। বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার পুণ্ড্রা পুণ্ড্রবর্ধন ভূক্তি বা পুণ্ড্রনগর বর্তমান মহাস্থানগড়। এটি প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের রাজধানী ছিল।

একাদশ বৌদ্ধ মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র এর বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থ মতে, তথাগত বুদ্ধের সময়ে পুণ্ড্রনগরের শ্রেষ্ঠ বা ধনপতি ছিলেন সার্থপতি। শ্রেষ্ঠীর পুত্রের নাম ছিল বৃষব। বুদ্ধের অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

উপাসক ভারতের প্রাচীন শ্রাবস্ত্রী নগরীর বর্তমান (সায়েট মায়েট) অনাথপিন্ডক শ্রেষ্ঠীর চতুর্থ কন্যা সুমাগধার সাথে পুণ্ড্রনগরের শ্রেষ্ঠী সার্থপতির পুত্র বৃষবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। শ্রেষ্ঠী সার্থপতি জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের অনুসারী ছিলেন। অন্যমতে উলঙ্গ সন্ন্যাসী আজীবিক তীর্থঙ্করের অনুসারী ছিলেন। পুত্রবধু সুমাগধা তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্যদের নমস্কার করতেন না। তিনি শ্বশুরকে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের কথা বলতেন। তিনি বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে পুণ্ড্রবর্ধনে এনেছিলেন। বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন বাসীকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। পণ্ডিত শরৎ চন্দ্র দাসের উদ্ধৃতি দিয়ে নলিনী নাথ দাশগুপ্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে লিখেছেন, বুদ্ধ মগধভদ্রা (সম্ভবত সুমাগধার অন্য নাম) নাম্নী এক ভদ্র মহিলার আমন্ত্রণ রক্ষার্থে ইক্ষু বর্ধনে (পুণ্ড্রবর্ধন) এসেছিলেন। (পূর্বোক্ত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, পৃষ্ঠা-৩৩)[৪০] প্রাচীন ইতিহাস মতে, বুদ্ধ আরাকান হতে সুন্নভূমি বর্তমান চট্টগ্রামে আসার পথে রামকোট বা রম্যভূমি বিশ্রাম করেন। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক এবং মতভেদ রয়েছে। বাংলাদেশের খ্রিস্টপূর্ব শতকের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ঐতিহ্য জনশ্রুতি বা পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর। আর বাদবাকী ইতিহাস দেশ-বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে।

ঐতিহ্য জনশ্রুতি বা পৌরানিক কাহিনী প্রসূত: প্রত্যেক বৌদ্ধদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ফলে থেরবাদী বৌদ্ধদেশসমূহে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার নিয়ে রচিত হয়েছে বিভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও জনশ্রুতি। প্রতিটি দেশের ঐতিহ্যে বুদ্ধ স্বশরীরে সে দেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- শ্রীলংকার ঐতিহ্য মহাবংস ও দীপবংস গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বুদ্ধ একাধিকবার সে দেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার করেন এবং উক্ত দেশটি বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে বলে ভবিষ্যত বাণী করেন। বার্মার ঐতিহ্যেও (Glass Palace charonicle) অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ায়ও বুদ্ধ স্বশরীরে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারের ইতিহাস নিয়ে কোনো ঐতিহ্য রচিত হয়নি। তবে জনশ্রুতি

আছে যে, বুদ্ধ স্বয়ং এদেশে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এমন কি বুদ্ধ বার্মায় যাওয়ার প্রাক্কালে চট্টগ্রামের চক্রশালা নামক স্থানে অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন এরূপ লোক বিশ্বাসও প্রচলিত আছে।[৪১] অবদান শতক এবং দিব্যাবদান[৪২] নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃতি ঐতিহ্য মতে, বাংলার উত্তর জনপদ পুণ্ড্রবর্ধনে বুদ্ধের আমলের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শ্রাবস্তীর বুদ্ধশিষ্য এবং বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্টপোষক অনাথপিন্ডিক তাঁর কন্যা সুমাগধাকে পুণ্ড্রবর্ধনের বৃষভদত্ত নামক এক নিগ্রন্থ সন্ন্যাসী পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। সুমাগধার শ্বাশুর বাড়ীর সবাই ছিলেন নিগ্রন্থ বা উলঙ্গ সন্ন্যাসীর অনুসারী। তাঁদেরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সুমাগধা ধ্যানাস্থ হয়ে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুসহ ঋদ্ধিবলে আকাশ পথে পুন্ড্রবর্ধনে আগমন করেন এবং সুমাগধার শ্বশুর বাড়ির লোকজনসহ পুন্ড্রবর্ধনবাসীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। এগার শতকে ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবধান কল্পলতা[৪৩] গ্রন্থেও অনুরূপ কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহির্বিশ্বে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তাঁর অবদান সর্বজন বিদিত। ইতিহাসে উল্লেখ আছে মহামতি সম্রাট অশোক তৃতীয় সংগীতি শেষে (অনু. খ্রি. পূ. ২৪৭ বা ২৬৩ সালে) নয়টি স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ করে ছিলেন এবং দেশে ধর্ম প্রচারে ধর্ম মহামাত্য নিয়োগ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্য ও সিংহলের ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থ দীপবংস ও মহাবংস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো-

ধর্মদূতদের নাম ও স্থান

১. মজ্ঝন্তিক থের - কাশ্মীর ও গান্ধার (বর্তমান পেশোয়ার ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল)

২. মহারক্ষিত থের - যোনক লোকে (সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডিনিয়া প্রভৃতি গ্রীক দেশসমূহ)

৩. মধ্যম - হিমালয়ের পার্বত্য দেশসমূহ ও নেপাল

৪. ধর্মরক্ষিত থের - অপরান্ত রাজ্য (পশ্চিম ভারত, ইরাবতীর উপকূলীয় অঞ্চল)

৫. মহাধর্মরক্ষিত - মহারাষ্ট্র (বর্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশ)

৬. মহারেবত থের - মহিস মন্ডল অর্থাৎ মহীশূর (বর্তমান ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ)

৭. রক্ষিত - উত্তর কাশাড়া

৮. সো থের ও উত্তর থের - সুবর্ণ ভূমি অর্থাৎ মায়ানমার (Rhys Davids এর মতে, এটি দক্ষিণ বার্মা,বর্তমান মায়ানমার)

৯. মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা - সিংহল দ্বীপ (শ্রীলংকা)[৪৪]

ইতিহাস মতে, সোন ও উত্তর থেরদ্বয় সুবর্ণ ভূমিতে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমন করেন। উক্ত দুজন থের সুবর্ণ ভূমি যাওয়ার প্রাক্কালে চট্টগ্রামে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। সুকোমল চৌধুরী সুবর্ণ ভূমির ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে উক্ত সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে করেন।[৪৫] গৌতম বুদ্ধের সমকাল: ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের দীর্ঘ নিকায়ের' চক্কবতি সিংহনাদ সূত্রে বুদ্ধের সমসাময়িক কালে শাসন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচিত রাজা ছিলেন 'মহাসম্মত'। অঙ্গুত্তর নিকায়ে গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতে ১৬টি জনপদ বা গণ রাজ্যের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো হলো- অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জী, মল্লা, চেতী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল, মচ্ছ, সুরসেন, অস্‌সক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ। এসব জনপদের শাসককে বলা হয় রাজা বা মহারাজা। রাজা শুদ্ধোধন, বিম্বিসার,

Dhaka University Institutional Repository

অজাতশত্রু, প্রসেনজিত, সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই অনুমান করা হয় যে, বুদ্ধের সমসাময়িক কালের শাসন ব্যবস্থা মূলত রাজা প্রথারূপ ছিল। পরবর্তী গোষ্ঠি ও অঞ্চল ক্ষুদ্ররাজ্য ও রাজার উদ্ভব ঘটে।

এ সময় বৌদ্ধধর্মসহ ৬৩টি শ্রমণপন্থা মতবাদ ছিল। বুদ্ধের সমকালে আদি ধর্মমত ও দর্শন ছিল আজীবিক সম্প্রদায়ের। ত্রিপিটকের পালি সাহিত্যে ষড়তীর্থংকর নামে তারা পরিচিত। সে ছয়জন হল অক্রিয়াবাদী আচার্য পূর্ণ কাস্সপ, নিয়তিবাদএর সমর্থক মকখলি গোসাল, উচ্ছেদবাদের সমর্থক অজিত কেস কম্বলী, শাশ্বতবাদী পকুধ কচ্চায়ন, বিক্ষেপবাদী সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্র ও চাতুর্যম সংবরপন্থী নিগ্রন্থ, নাথপুত্র। তারপর ছিলেন মহাবীর ও তাঁর জৈন ধর্ম তখন চার্বাকের লোকায়ত দর্শনও প্রচলিত ছিল। এসব ছিল বুদ্ধের পূর্ব দর্শন মতবাদ।[৪৬]

প্রাচনীকালে ভারতবর্ষকে বলা হত জম্মুদ্বীপ। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল জম্মুদ্বীপ। উত্তরে কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী ও বুদ্ধগয়া হয়ে দক্ষিণে বিন্ধ্যা পর্বত। পশ্চিমে সাঙ্কাশ্য থেকে পূর্বে অঙ্গ ও বৈশালী তাঁর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল। এই সঙ্গে বিভিন্ন মতামত ও তথ্য প্রমাণে স্মরণীয় যে, সিংহলীদের মতে, বুদ্ধ সিংহলে যান, বর্মিদের মতে বুদ্ধ তাঁদের দেশে গিয়েছিলেন আবার বাংলাদেশীরা মনে করেন বুদ্ধ বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। বুদ্ধের সময়কালে মজ্ঝিম দেশ (উত্তর ভারত) ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বুদ্ধের অধিকাংশ ধর্মদেশনা ও বর্ষাবাস পালনের স্থান উত্তর ভারত। ধর্মদেশনা ও বর্ষাবাসের (বর্ষাবাসের সময়কাল ৩ মাস) স্থান সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বুদ্ধ উত্তর ভারত ত্যাগ করেন নি।[৪৭] বিনয় পিটক (Vol-1, P-197), জাতক, মহাবোধিবংশ (P.12) প্রভৃতি গ্রন্থে মজ্ঝিমদেশের পূর্বসীমা পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রিপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে (আঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪) বঙ্গান্তপুত্র উপসেন এবং বঙ্গীশ থের নামক দু'জন বুদ্ধ শিষ্যের নামোল্লেখ আছে। অনেক পণ্ডিত এ দু'জন থের বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেন। অপাদান গ্রন্থে তাঁরা বঙ্গের অধিবাসী এবং বচনে পারঙ্গম হওয়াতে বঙ্গীশ নামকরণ হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকদের মধ্যে অতুলনীয় কবিত্বের অধিকারী বঙ্গীস ছিলেন অন্যতম।[৪৮] মালালাশেখেরা ত্রিপিটক সহ অন্যান্য তথ্যের আলোকে বলেছেন, বঙ্গান্তপুত্র উপসেন নালক অঞ্চলের রূপসারীর পুত্র এবং তাঁর পিতার নাম বঙ্গান্ত।[৪৯]

সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে, ভগবান বুদ্ধ একবার সুন্মভূমির (চট্টগ্রামের পূর্বনাম) অর্ন্তগত সেতক নগরে (চট্টগ্রাম শহরে উত্তরে সীতাকুন্ড) আগমন করেন এবং মানবের কল্যাণে ধর্ম দেশনা করেছিলেন।[৫০] বুদ্ধের, সময়কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও গবেষক বিভিন্ন যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে অভিমত দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, বুদ্ধের ধর্ম যেসব স্থানকে কেন্দ্র করে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা উহার অতি সন্নিকটে। একমাত্র এ কারণেই ধারণা করা যেতে পারে বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেন, মহামানব বুদ্ধ বৃহৎ বঙ্গের শেষ সীমায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রগুলির মধ্যে মগধ ছিল অন্যতম। মগধ এবং বঙ্গ উভয় রাজ্যই পাশাপাশি অবস্থিত। সেই সূত্রে গৌড় বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূল প্রভাব নিশ্চয় ছিল এ কথা বলা যেতে পারে।[৫১] বাংলায় পাল রাজত্ব ছিল বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগ। সেনরাজত্বে রূপান্তরিত হলো রাধা ও কৃষ্ণ। জয়দেব, চন্ডীদাস, চৈতন্য চরিতে বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণব, নাথ, বাউল প্রভাব বিদ্যমান। প্রচ্ছন্ন ভাবে বৌদ্ধ মত ও সাধনতত্ত্ব প্রচার করেছেন। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছে বাংলা সাহিত্যে এক অন্ধকার যুগ। এর কারণ তুর্কী আক্রমণ ও বিজয়। ফলে বৌদ্ধযুগের অবসান। সূচিত হলো নতুন যুগ, যার মাধ্যমে হলো অনুবাদ সাহিত্য।

বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীন ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় এদেশে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তথাগত বুদ্ধের মধ্যমপন্থা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠী গ্রহণ করেছিল। ভগবান বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অব্দে জন্ম, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮ অব্দে বুদ্ধত্ব লাভ এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তথাগত বুদ্ধের বর্ষাবাস যাপনের তালিকায় বাংলাদেশের প্রাচীন কোন স্থানের উল্লেখ নেই। তাহলে তথাগত বুদ্ধ এদেশে আসেনি, ধর্মপ্রচার করেন নাই এ ধারণা সত্য নয়। বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বৎসরব্যাপী বহুজনের হিতে বহুজনের কল্যাণে মঙ্গলময় ধর্মপ্রচারকালে বর্ষার সময়ে বৃষ্টির দরুণ ধর্মপ্রচারে বিঘ্নঘটায় আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমা এই তিন মাস বর্ষাবাস যাপনের পর আশ্বিনী পূর্ণিমার কঠিন চীবর দানের দিন থেকে বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করতেন। বুদ্ধ প্রথম বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন ভারতের প্রাচীন মৃগদাবে বর্তমানে সারনাথে, যেখানে তথাগত পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথমে ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ যে বর্ষাবাস যেখানে যাপন করেছিলেন বর্ষাবাসের তালিকায় সেসব স্থানের নাম উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে বুদ্ধ কোথাও বর্ষাবাস যাপন করেন নাই বিধায় উক্ত বর্ষাবাসের তালিকায় সেসব স্থানের নাম উল্লেখ নেই। তিন মাস বর্ষাবাসের পর বাকী নয় মাস যেখানে সেখানে বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছেন, তা ধর্ম ভান্ডারিক আনন্দ স্থবিরকে জ্ঞাপন করেছিলেন। আনন্দ স্থবির প্রথম সঙ্গীতিতে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সূত্র পিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে তা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাচীন বিভিন্ন জনপদে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের স্থানের নামও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বুদ্ধের বর্ষাবাসের তালিকায় যে সব স্থানের নাম উল্লেখ আছে সেসব স্থান ছাড়া বুদ্ধ আর কোথাও যান নাই, অন্য কোথাও গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন নাই এ ধারণা সত্য নহে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশে এসে ছয় মাস অবস্থান করে দেব মানবের হিতার্থে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম বর্ষে সুংসুমার গিরিতে বর্ষাবাসের পর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে বার্মা প্রাচীন সুবর্ণভূমি, আরাকান, বাংলাদেশে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম বর্ষে বার্মায় ভিক্ষু গবম্পতির প্রার্থনার বর্তমান মায়ানমার বা বার্মায় প্রাচীন সুবর্ণভূমি, আরাকান, বাংলাদেশে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম বর্ষে বার্মার ভিক্ষু গবম্পতির প্রার্থনায় বর্তমান মায়ানমার বা বার্মায় প্রাচীন সুবর্ণভূমি রামঞঞ রাজ্যের সুধম্মপুরে উপনীত হন। বার্মা হতে আরাকানে তথা চট্টগ্রামে প্রাচীন সুহ্মভূমি, কুমিল্লা প্রাচীন সমতট, প্রাচীনবঙ্গে বর্তমান ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজবাড়ী প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ, বগুড়া, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন, রংপুর প্রাচীন কোটিবর্ষ, দিনাজপুর প্রাচীন কজঙ্গলা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করে দেব মানবের হিতার্থে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বর্ণাক্ষরে লিখা রয়েছে। ঐতিহাসিক প্রমাণ দুইটি হলো একটি প্রাচীন গ্রন্থ, আর অন্যটি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ ও শিলালিপি। বাংলাদেশ গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ শাসনবংশে বর্ণিত আছে-'ভগবান বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম বর্ষে অনেকশত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া আকাশমার্গে বার্মার রামঞঞ রাষ্ট্রের সুধম্মপুরের উপনীত হইলেন।'[৫২] ব্রহ্মরাজাদের 'রাজবংশ' নামক ইতিহাসে ভগবান বুদ্ধ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ বার্মায় গমন করেন বলে উল্লেখ রয়েছে। 'বার্মায় অবস্থিত একটি শিলালিপিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু সাথে ছিলেন বলে জানা যায়।' ত্রিপিটক গ্রন্থে বিনয় পিটকের মহাবগগ বর্ণিত আছে-"ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের সপ্তম সপ্তাহের শেষদিন রাজায়তন বৃক্ষমূলে তপ্‌পসু ও ভল্লিক মধু ও কেক দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করেন। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তারাই প্রথম গৃহী উপাসক।[৫৩] বুদ্ধ তাঁদের দানকৃত মধু ও কেক ভোজন করে আটখানা চুল/কেশধাতু প্রদান করলে বণিকদ্বয় তা স্বদেশে নিয়ে মন্দির নির্মাণ করতঃ দেহধাতু নিধান করেন। বার্মার বর্তমান সুয়েডগং প্যাগোডাতে উক্ত পবিত্র কেশধাতু এখন রয়েছে।

ইতিহাস মতে- 'কানরাজগজি মৌরীয় বংশের এক কন্যা পাণি গ্রহণ করেন। আরকানের ইতিহাস রাজোয়াং এর মতে ৬২ জন রাজা এই বংশে ক্রমাগত রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের রাজত্বের সময়ে গৌতম বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যবহারে আরাকানে পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। কানরাজগজির বংশগণ ১৪৬ খ্রি.পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন। তারপর রাইং নুরের চন্দ্রসূর্য বা চন্দ্রসুরিয় নামক নৃপতি আরাকান রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। ইতিহাস দেখা যায়-ধীরে ধীরে গৌতমবুদ্ধ এগিয়ে গেলেন ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, আরকান, বার্মা হয়ে সালাউন নদীর পশ্চির তীর পর্যন্ত। চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভূক্ত ছিল মহাকারুণিক বুদ্ধ সশিষ্যে আরকানের প্রাচীন সুন্মভূমি বর্তমান

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের সময়ে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ছিল সুন্মভূমি। ড. এনামুল হক সাহেব বাংলাদেশ ও মুসলিম প্রবন্ধে বলেন- প্রাচীন বঙ্গভূমি বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুন্ম, সমতট প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য যে বঙ্গ বর্তমান ফরিদপুর, পুণ্ড্র বর্তমান বগুড়া, সুন্ম বর্তমান চট্টগ্রাম, সমতট বর্তমান কুমিল্লা জেলা। ইতিহাস উল্লেখ আছে "চট্টগ্রাম যে সুন্মদেশের অন্তর্গত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই।[৫৪]

'মহাভারতীয় যুগে চট্টগ্রাম সুন্মভূমির অর্ন্তভূক্ত ছিল। ভীম সুন্মভূমি জয় করেন। বলির পুত্র সুন্ম এদেশের প্রথম রাজা ছিলেন। তাঁহার নামের ইহার নামকরণ হয়।'[৫৫] পালি গ্রন্থ সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে ভগবান তথাগত একবার সুন্মভূমির অন্তর্গত শেতক নগরে অবস্থান করে দেব মানবের জন্য ধর্মপ্রচার করেছিলেন। প্রখ্যাত লেখক ঈশান চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত জাতকে উল্লেক আছে, 'শাস্তা যখন সুন্ম রাজ্যের অন্তপাতী দেশক নামক স্থানের অনতিদূরে একটি বনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনপদ কল্যাণী সূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।[৫৬]

উপরোক্ত চট্টগ্রামের প্রাচীন ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী তাঁর চট্টগ্রামের ইতিহাসে বর্ণিত আছে- 'বুদ্ধ হৈলুইন নদীর তীর হইতে চট্টগ্রাম (চন্দ্রনাথ) হস্তিগ্রাম (হাইদগাঁও) আম্রগ্রাম (আমতলী) হইয়া জলপথে তিনমাসে কুশীনগরে উপস্থিত হন।'[৫৭]

প্রখ্যাত লেখক পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর উক্তি হতেও জানা যায় তথাগত বুদ্ধ চন্দ্রনাথে, হস্তিগ্রামে আম্রগ্রামে ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। চন্দ্রনাথ বর্তমান সীতাকুণ্ড। হস্তিগ্রাম পটিয়ার চক্রশালার হাইদগাঁও, আম্রগ্রাম, আমতলী বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের আমবাগানে টাইগার পাস, শুলকবহর, পশ্চিম নাসিরাবাদ এলাক। চন্দ্রনাথ বা সীতাকুণ্ড বৌদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির সীতাকুণ্ডে তীর্থভ্রমণে এসে চট্টগ্রামে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম পুনঃসংস্কার করেছিলেন। ধর্মতিলক মহাস্থবিরের প্রণীত সদ্ধর্ম রত্নাকর গ্রন্থের জানা যায় চট্টগ্রামের চকরিয়ার চন্দ্রজ্যোতি ভিক্ষু ধর্ম বিনয় অধ্যয়নের জন্য বার্মায় যান। সেখান হতে আসার সময়ে তিনটি বুদ্ধমূর্তি সাথে নিয়ে আসেন। সেখানে (বার্মায়) পাঁচ বৎসর শিষ্য দিগকে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দিয়া চট্টগ্রামভিমুখে ফিরিয়াছিলেন। আসার সময়ে পথিমধ্যে সীতাকুণ্ড পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে একখানি আশ্রম স্থাপন করেন। সেখানে পূর্বোক্ত ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি স্থাপন পূর্বক একটি বিহার প্রস্তুত করেন। সেই হইতে সীতাকুণ্ড পাহাড় ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতির আশ্রমের নামানুসারে চন্দ্রশেখর নামে পরিগণিত।[৫৮]

উক্ত গ্রন্থের আরও উল্লেখ আছে বর্তমান শিব মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে একটি চৈত্য ছিল। তাহাই বুদ্ধমন্দির। সেখানে বৌদ্ধযাত্রীগণ পূজা বন্দাদি সম্পন্ন করিত।[৫৯] 'চন্দ্রজ্যোতি স্থবিরের পিতামহ এক সময়ে চন্দ্রশেখর পাহাড়ে স্থাপিত বুদ্ধমূর্তি বন্দনার জন্য গমন করেন। তিনি তথায় রীতিমত পূজা বন্দনা সমাপন করিয়া অবতরণ করিবার সময় বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেই কারণে

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রীগণের বিশ্রামের নির্মিতা চন্দ্রশেখরের নিকটবর্তী সেই গ্রামের নাম পান্থনিবাস প্রস্তুত করেন। তাহার নামানুসারে সেই গ্রামের নাম পান্থশালা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেখানে পথিকগণে সুবিধার জন্য একটি সুবিস্তীর্ণ দীঘিও খনন করা হইয়াছিল। অবস্থানগত দিক দিয়ে দেখা যায়- রাস্তার দুই পার্শ্বে, ভিতরে এবং পাহাড়ের উপরে বহু বোধিবৃক্ষ। যেই বৃক্ষের মূলে বসে তথাগত বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উচ্চ শিখরে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে-There ancient Buddhistic Relies were dugout for destruition by lcenoet arts. They were reinstalled by J. Chowdhury Bar-at-law A.K.D. dedicated to Goutama Buddha, in memory of his beloved son joy deb 1933. মহাকারুণিক বুদ্ধ সশিষ্য বার্মা ও আরাকানে ধর্মপ্রচার করে সেলুইন নদীর তীর হতে প্রাচীন সুন্মভূমি বর্তমান চট্টগ্রামে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। আরাকান থেকে আসার পথে বুদ্ধ পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুসহ কক্সবাজার রামু রামকোট নামক স্থানে বিশ্রাম করেছিলেন। বর্তমানে ঐ স্থানই রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার। রামকোট হতে বুদ্ধ শিষ্যসহ পায়ে হেঁটে প্রাচীন হস্তিগ্রাম বর্তমান পটিয়ার চক্রশালা হাইদগাঁও নামক স্থানে উপবেশন করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। হস্তিগ্রাম থেকে অপভ্রংশ হয়ে হাইদগাঁও নামকরণ হয়েছে। এখানে বুদ্ধ যেখানে ধর্মদেশনা করেছিলেন সেখানে স্তুপ নির্মিত হয়েছিল। বুদ্ধ এখানে বসে ধর্মের চক্র স্থাপন করেছিলেন বিধায় এর নাম চক্রশালা নামকরণ হয়েছে। জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ণিমায় বুদ্ধের স্তুপ থেকে জ্যোতি বের হয়। বৌদ্ধরা ছেলে-মেয়ের মঙ্গলের জন্য এখানে মানত করে এবং প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা বা চৈত্র সংক্রান্তির ও নববর্ষে মেলা বসে। এছাড়া প্রতি পূর্ণিমার এখানে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা বুদ্ধের স্তুপ দর্শনের জন্য আসে। বহু পর্যটক ও তথ্য সংগ্রহকারী এখানে এসে থাকেন।

চক্রশালা বুদ্ধের ধর্মপ্রচার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ বলেছেন -

'বৌদ্ধযুগে চট্টগ্রামের আদিনাম চট্টলা থাকা সত্বেও এটি চক্রশালা নামেই বহির্জগতে পরিচিত ছিল। আধুনিক চক্রশালা গ্রামটির ক্ষীণ স্মৃতি বহন করেছে। স্বয়ং বুদ্ধ এখানে বসে আস্তানা করেছিলেন এবং স্থাপন করেছিলেন এক ধর্মশালা।

এটি আজ চক্রশালা তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। তথায় ক্রমে পণ্ডিত বিহার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে (প্রাগুক্ত, ৩৪১ পৃষ্ঠা) এ প্রসঙ্গে ফাহিয়েন বলেন- বুদ্ধ আরাকানে চারটি স্থানে চারটি ধর্মচক্র স্থাপন করেন। অনেকের মতে এই হস্তীগ্রামেই অন্যতম চক্র স্থাপিত হয়। [১৩]

চট্টগ্রামের প্রাচীন হস্তীগ্রাম বর্তমান হাইদগাঁও গ্রামে যেখানে বুদ্ধ ধর্মচক্র ফো বা মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের শিষ্য দীপঙ্কর স্থবির বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ ও অশীতি অনুরঞ্জন অঙ্কিত বুদ্ধচক্র নামক পাষাণ প্রতিষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। সেজন্য একে চক্রশালা বলা হয়। প্রবীণ ভিক্ষুদের মতে, পূর্ণিমায় ঐ চক্র হতে বুদ্ধের জ্যোতি বের হয়। বুদ্ধ আরাকানে যে ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করেন তার একটি ছিল হাইদগাঁও (পটিয়ার হস্তীগ্রাম বা চক্রশালা)। উহা তখন আরাকানের অধীনে ছিল।[৬১] ঐতিহাসিক ফাহিয়েন বলেন- 'বুদ্ধ আরাকানের চারি স্থানে চারটি ধর্মচক্র স্থাপন করেন। এর অন্যতম চক্রটি যে স্থানে স্থাপন করা হয় সে স্থানটি পরবর্তীতে চক্রশালা হিসেবে পরিচিত লাভ করে।[৬২]

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৬-৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরকানরাজ চন্দ্রসুরিয়ের রাজত্বকাল। তার তিন শতাব্দী পর চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন আরকানে আগমন করেন। কো-কুই-ফি নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে বুদ্ধ আরাকান রাজ্যের চারি স্থানে ধর্মচক্র প্রবর্তন (উপবেশন) করেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উক্ত চারটি স্থানে চারটি ফো বা মঠের মধ্যে তিনটি আরাকানে অপরটি চম্পক নগর হতে বহু পূর্বে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৬৩]

ভগবান বুদ্ধ আম্রগ্রামে অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। আম্রগ্রাম বর্তমান চট্টগ্রাম শহরে। উল্লেখ্যযোগ্য চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন তথ্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন ৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি আরাকানে চারি স্থানে বুদ্ধ উপবেশন ধর্মপ্রচার করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত চারটি স্থানে ফো বা মঠ দেখেছিলেন বলে বহু যোজন পূর্ব দিকে বলে উল্লেখ করেছেন। আরাকান বা চট্টগ্রাম উক্ত তিনটি হল প্রথমটি পটিয়ার চক্রশালা বা হাইদকান্দি, দ্বিতীয়াটি চট্টগ্রাম শহরের আমতলীতে (আম্রগ্রাম)। অবশ্য উহা সনাক্ত করা যায়নি। তৃতীয়াটি চন্দ্রনাথে বা সীতাকুণ্ডে। এছাড়াও ভগবান বুদ্ধ শুধু প্রাচীন সুন্মভূমি বর্তমান চট্টগ্রাম নহে বাংলাদেশের প্রাচীন সমতট বর্তমান কুমিল্লা, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বর্তমান রাজবাড়ী, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বর্তমান বগুড়া মহাস্থানগড় এসে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে দেব মানবের কল্যাণে, ধর্মপ্রচার করেছিলেন।[৬৪]

প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ আছে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে বঙ্গের রাজা সিংহ বাহুর রাজত্বকালে ভগবান বুদ্ধ প্রাচীন সুন্মভূমি বর্তমান চট্টগ্রাম হতে প্রাচীন সমতট বর্তমান কুমিল্লা ময়নামতির কোটবাড়ীর শালবন বিহারে সপ্তাহকাল অবস্থান দেব মানবের হিতার্থে ধর্মপ্রচার করছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, রাজা সিংহ বাহুর পুত্র বিজয় সিংহ বুদ্ধের পরিনির্বাণ বর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে অনুসঙ্গীসহ সিংহল জয় করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গের রাজা সিংহ বাহু এবং তৎপুত্র বিজয় সিংহ বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা বিজয় সিংহের সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় লিখেছেন-

'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ

লংকা করিয়া জয়

সিংহল নাম রেখে

Dhaka University Institutional Repository

নিজ শৌর্যের পরিচয়।
একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লংকা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণ বপাট (যুদ্ধ জাহাজ)
ভ্রমিল সাগর ভারতময়।
তুই কিনা মাগো তাদের জননী
তুই কিনা মাগো তাদের দেশ।'

বঙ্গবীর বিজয় সিংহ শ্রীলংকা বা সিংহল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিধায় সিংহলের জাতীয় পতাকায় সিংহ প্রতীক রাখা হয়েছে। এখনও সিংহলের বৌদ্ধরা তাদের নামের সাথে সিংহ উপাধি ব্যবহার করেন। যেমন-মাধব সিংহ, অমরা সিংহ, পরান সিংহ ইত্যাদি। ১৯৯৩ ইংরেজীতে সিংহলের প্রেসিডেন্ট প্রেমাদাসা বাংলাদেশে সফরকালে রাজধানী ঢাকায় তাঁর বক্তব্যে বঙ্গের রাজপুত্র বিজয় সিংহ সিংহল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার কথা উল্লেখ করিছিলেন। বঙ্গের সাথে সিংহলের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকালের বলেও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। রাজা সিংহ বাহুর রাজধানী ছিল সিংহপুর। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন সিংহপুর ছিল বর্তমান ময়নামতীর কোটবাড়ী। সিংহরা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। ময়নামতি কোটবাড়ীর ইটাখোলা বিহারের উত্তরপার্শ্বে বর্মবংশীয় শেষ বৌদ্ধরাজাদের ভোজ রাজার রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এ ধ্বংসাবশেষ খননকালে ১.৪০ মিটার উচ্চতা এবং ১.২০ মিটার প্রস্থ বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। বুদ্ধিমূর্তিটি বর্তমানে ময়নামতি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সুতরাং সিংহবংশ, শালবংশ, খড়গবংশ, দেববংশ, চন্দ্রবংশ, বর্মবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানী কুমিল্লার ময়নামতিতে ছিল।[৬৫]

উল্লেখ্য যে, চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং, উয়ান চুয়াং প্রাচীন সমতট রাজ্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র এবং এখানে ৩০টি সংঘারাম ও দুই হাজার ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানীর সন্নিকটে ছিল শালবন বিহার। শালবন বিহারের পশ্চিমে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। দক্ষিণে শালবন। বুদ্ধ শালবৃক্ষতলে জন্ম ও পরিনির্বাপিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের জীবনে স্মৃতি বিজড়িত শালবৃক্ষ বৌদ্ধ সংস্কৃতির নিদর্শন। প্রাচীন শালবন বিহারে বুদ্ধ দেব মানবের হিতার্থে সপ্তাহকাল ধর্মদেশনা করেছিলেন। শালবন বিহারে বুদ্ধের অবস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনটি আসন নির্মাণ করা হয়েছিল। মধ্যের আসনটি বুদ্ধাসন, ডানে বসতেন সারিপুত্র, বামে বসতেন মোদ্গাল্যায়ন। ময়নামতীর শালবন

Dhaka University Institutional Repository

বিহারের সর্বোচ্চে উত্তরমুখী উপরোক্ত তিনখানা আসন এখনও বিদ্যমান। সমতটে বুদ্ধ এ আসনে সপ্তাহকাল বসে ধর্মদেশনা করেছিলেন।

সমতটের পর বুদ্ধ বঙ্গে গমন করেন। প্রাচীন বঙ্গ বলতে বর্তমান ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ বুঝায়। বঙ্গে বুদ্ধ কোন স্থানে অবস্থান করে ধর্মদেশনা করেছিলেন তার তথা পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রামের ইতিকথা নামক গ্রন্থে লেখক বলেছেন-আরট্র, পুণ্ড, সৌদির বঙ্গ প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করল বুদ্ধকে।"(চট্টগ্রামের ইতিকথা, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১২) অতি গৌরবের বিষয় এই যে, বাংলাদেশের প্রাচীন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধের শিষ্যের মধ্যে দুইজন বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গীশ নামে বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথমোক্ত 'বঙ্গান্ত পুত্তো' পালি, অর্থ হল বঙ্গের পুত্র। বঙ্গীশ ভিক্ষু প্রাচীন বঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে-

"বঙ্গে জাতোতি বংগীসো বচনে উসস রোতিচ

বংগীসো ইতি মে নামং অভধি লোক সন্মতং"।

(ত্রিপিটকের সূত্র পিটক, অপাদান, শ্লোক নং ৬১০১)

বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যে বঙ্গের ভিক্ষু বঙ্গীশ তৎকালীন সময়ে একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। এই প্রতিভাধর কবি ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে বুদ্ধের স্তূতিগাথা লিখে শ্রোতাদের শুনাতেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখ আছে-"আমি যৌবনে পাণ্ডিত্য অর্জন করে রাজগৃহে যাই। তথায় সারিপুত্রের সাথে আমার দেখা হয়। আমি বিস্মিত হয়ে এক বিচিত্র কবিতা রচনা করিয়া তাহাকে শুনাই। তিনি আমাকে নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দেন। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সন্ন্যাস দীক্ষা প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে বুদ্ধ সমীপে নিয়ে গেলেন। তথায় দীক্ষা লাভের পর কবিতা রচনা করিয়া আমি সুগতের স্তুতি করি। ইহাতে সব্রহ্ম চারীগণ কবি চিত্ত বলে আমাকে উপহাস করতে লাগিলেন।"[৬৩]

বঙ্গীশ ভিক্ষু বুদ্ধকে স্বতি করার জন্য যে কবিতা আবৃত্তি করতেন তার একটা নমুনা ও ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল-

"সহস্য অধিক ভিক্ষু ভজে তথাগতে
যিনি কন পুন্ডবাসী নির্বাণ দানিতে।
পাপ তব নাম প্রভু মহর্ষি সপ্তম
অমৃতের ধারা ঢালো মহামেঘ যম
তব দরশন মাগি হইয়া বাহির
বঙ্গীশ বন্দয়ে তোমা ওগো মহাবীর।"

Dhaka University Institutional Repository

(বি. এ. পালি, ২য় পত্র, বনশ্রী মহাথের, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৩০)

উপরোক্ত তথ্য থেকে জানা যায় বুদ্ধের সময়ে বঙ্গের ভিক্ষু বঙ্গীশ খ্যাতনামা কবি ছিলেন এবং বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন।

বঙ্গের পর বুদ্ধ কর্ণসুবর্ণে সপ্তাহকাল অবস্থান করে ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধের সময়ে কর্ণসুবর্ণ বাংলাদেশের বর্তমান রাজবাড়ী জেলা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা শশাংক (৬০৭-৬৩৭ খ্রি.) রাজধানী প্রাচীন রাঙ্গামাটিতে বর্তমান ভারতের মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমান রাজবাড়ীর পশ্চিমে ভারতের মুশির্দাবাদে। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হলে মুর্শিদাবাদ ভারতে পড়ে। ইতিহাস মতে "শুধু পুন্ডবর্ধন নয়। গৌতম বুদ্ধ একই উদ্দেশ্যে সমতটে (দক্ষিণপূর্ব বঙ্গ) সাতদিন এবং কর্ণসুবর্ণে সাতদিন ধর্মপ্রচার করেছিলেন।"[৬৭] উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বর্তমান রাজবাড়ীতে বুদ্ধ কোন স্থানে বসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা এখনও সনাক্ত হয়নি। তবে 'সমাধিনগর' নামে রাজবাড়ীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বুদ্ধের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে শেষ মার্গ হল সমাধি। ঐ স্থান অনুসন্ধান করলে প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তি ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেতে পারে।

কর্ণসুবর্ণের পর বুদ্ধ শিষ্যসহ পদব্রজে পুণ্ড্রনগরের ইক্ষুনগরে বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ভাসু বিহারে এসে সপ্তাহকাল অবস্থান করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। ৬৩৮ খ্রি. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে এ বিহারে পো-সি-পো বিহার বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন পুন্ডবর্ধনের রাজধানী পুন্ড্রনগরের বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ে বুদ্ধের আগমনের পটভূমিকা এই যে প্রাচীন ভারতের শ্রাবস্তীর বর্তমান সায়েট মায়েট নগরীর বুদ্ধের উপাসক অনাথপিণ্ডিকের চতুর্থ কন্যা সুমাগধাকে পুণ্ড্রবর্ধনে শ্রেষ্ঠী বা ধনপতি সার্থপতির পুত্র বৃষবের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। সার্থপতি নগ্নসন্ন্যাসী তির্থঙ্করের (জৈন মহাবীর) অনুসারী ছিলেন। সার্থপতির পুত্রবধূ সুমাগধার শ্বশুরকে তথাগত বুদ্ধের ধর্মের কথা ব্যক্ত কররে শ্বশুরের অনুমতিক্রমে সুমাগধা বুদ্ধকে আহবান করেন। সুমাগধার আহবানে তথাগত বুদ্ধ পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুসহ পদব্রজে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে প্রাচীন পুন্ডনগরে বর্তমান বগুড়ায় মহাস্থানগড়ের ভাসু বিহারে অবস্থান করে দেব মানবের হিতার্থে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সুমাগধার আমন্ত্রনে সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধ একটি পালি গাথা আবৃত্তি করেন। তা হল-"দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমাবন্তোস পরবতো অসসেথ হিসসান্তি রতি খিত্তা তথা সবা।" (পালি সাহিত্যে ধর্মপদ, ড.সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭, শ্লোক নং-৩০৪) কাশ্মিরী মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা গ্রন্থে অনাথপিন্ডিক সূতা সুমাগধার কাহিনী হতেও জানা যায়-"তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং এর একবার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পুন্ডবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ), সমতট, কর্ণসুবর্ণ এসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন।" দিব্যাবদান গ্রন্থেও পুন্ডনগরের শ্রেষ্ঠী সার্থপতির পুত্র বৃষবের সুমেগধারের নাম উল্লেখ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস বলে- পুন্ডনগরের শ্রেষ্ঠী সার্থপতির পুত্র বৃষবের বুদ্ধের জীবদ্দশায় শ্রাবস্তীর বুদ্ধের উপাসক অনাথপিন্ডির চতুর্থ কন্যা সুমাগধারের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। [৬৮]যেখানে বুদ্ধ ধর্মদেশনা ও অবস্থান করেছিলেন সেখানে অশোক নির্মিত স্মারক স্তুপ ও বুদ্ধের পদচিহ্ন আছে বলে কথিত আছে। দিব্যাবদান, অশোকাবদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্যে দাবী করে যে তথাগত গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য স্বয়ং বাংলাদেশে এসেছিলেন।[৬৯] উপরোক্ত তথ্যের আলোকে প্রমাণিত খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০ অব্দে প্রাচীন পুণ্ড্রগরে তথাগত বুদ্ধ শ্রেষ্ঠী সার্থপতির সময়ে বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ের উপকণ্ঠে ভাসু বিহারে অবস্থান করে সপ্তাহকাল বুদ্ধ মানবের হিতার্থে ধর্মপ্রচার করেছিলেন।

প্রাচীন পুণ্ডবর্ধন বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড়ে ধর্মপ্রচারের পর বুদ্ধ প্রাচীন কোটিবর্ষ বর্তমান রংপুরে গমন করেন। কোটিবর্ষে বা রংপুরে বুদ্ধ কোন স্থানে বসে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার তথ্য পাওয়া যায়নি। রংপুরে বর্তমানেও বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রয়েছে। এখানে বর্তমানে বহু বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কোটিবর্ষ প্রাচীন রাঢ় এর রাজধানী ছিল। প্রাচীন কোটিবর্ষ বর্তমান রংপুর হতে বুদ্ধ শিষ্যসহ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন প্রাচীন কজঙ্গলায় বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলায়। কজঙ্গলা প্রাচীন বাংলার মানচিত্র দিনাজপুর জেলায় অবস্থান দেখা যায়। দিনাজপুরের বর্তমান কাঁকজোল গ্রামই প্রাচীন কজঙ্গলা। ইতিহাস মতে, বলে অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে কজঙ্গলা সূত্র পাঠে জানা যায় বুদ্ধ এক সময়ে কজঙ্গলায় পরিভ্রমণে আসেন। সেখানকার সুবেসু বনে কিছুকাল অবস্থান করেন। সূত্র পিটকে উল্লেখ আছে- একং সময়ং ভগবা কজঙ্গলায় বিহরতি সুবেসু বনে। (কজঙ্গলা সূত্র, অঙ্গুত্তর নিকায়, সূত্র পিটক, ত্রিপিটক)

উক্ত কজঙ্গলা প্রাচীন অঙ্গ, উত্তর রাঢ় ও গৌড়ের মধ্যবর্তী অন্তপাতীদেশ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কজঙ্গলা প্রাচীন বৃহৎ বঙ্গের অর্ন্তভূক্ত একটি রাজ্য, বর্তমান কাঁকজোল গ্রামই প্রাচীন কজঙ্গলা। কজঙ্গলা থেকে বুদ্ধ কৌশাম্বীতে চলে যান। তথায় নবম বর্ষাবাস যাপন করেন। তথাগত বুদ্ধের ঋদ্ধিশক্তি ছিল। পালি সাহিত্যে বুদ্ধের ঋদ্ধিশক্তি প্রদর্শনের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় যে, বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম বর্ষে প্রাচীন সুবর্ণভূমি বর্তমান বার্মা মায়ানমার রামঞঞ রাজ্যে ঋদ্ধি বলে পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুসহ ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। বার্মা হতে আরাকান, আরাকান হতে সুন্মভূমি বর্তমান চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম হতে প্রাচীন সমতট, বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতি, ময়মনামতি হতে প্রাচীনবঙ্গ, বর্তমান ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বঙ্গ হতে প্রাচীন কর্ণসুবর্ণে বর্তমান রাজবাড়ী, রাজবাড়ী হতে প্রাচীন পুণ্ডবর্ধন বর্তমান বগুড়া মহাস্থানগড়, বগুড়া হতে প্রাচীন কোটিবর্ষ বর্তমান রংপুর, রংপুর হতে প্রাচীন কজঙ্গলা, বর্তমান দিনাজপুরের কাকজোল গ্রামে পঞ্চাশত অর্হৎ শিষ্যসহ পায়ে হেঁটে ধর্মপ্রচার

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। বুদ্ধের পায়ের চাপ এখনও এদেশের মাটিতে মিশে আছে। এখনও বিদ্যমান আছে বুদ্ধের দেশীত ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধের বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারের আড়াই হাজারেরও অধিককাল অতিক্রম হয়েছে। কত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে, তবুও বুদ্ধের পূতাস্থি ধর্ম ও সভ্যতা এদেশে টিকে আছে। আর্য সভ্যতার পর বৌদ্ধ সভ্যতা বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও তার গর্ব শুধু বৌদ্ধদের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের নাগরিকের। এ সভ্যতা বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা।

৩.৫ বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস

বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্ব অনেক। এই শতাব্দীতে নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একটি যুগের অবসান এবং আর একটি নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে।[৬৯] বাঙালি বৌদ্ধদের জাতীয় জীবনে বহু অর্জন, বহু পরিবর্তন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে অর্জন ও পরিবর্তনের ধারাগুলি বোঝা যায় এবং তদনুযায়ী জাতীয় জীবনের রূপ, প্রকৃতি ও গতিবিধি নির্ণয় করা যায়। শিল্প সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা যায়। সমাজের জাগ্রত বিবেক হিসেবে শিল্পী সাহিত্যকগণের মন ও মানস, চিন্তা ও চেতনা, ধ্যান ও কল্পনা যুগে প্রভাব সম্পাতী ভূমিকার অধিকারী। ব্যক্তি/ধর্ম, সমাজ, শিক্ষণ, ভাষা ও সাহিত্য দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বৌদ্ধদের সমকালীন চিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, ব্যক্তি ও জীবন প্রকৃতির নানা মুখী আলোচনা প্রতিভাত হয়েছে। বৌদ্ধ মানসের সামগ্রিক গতি প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণে এবং শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যক্তি ও সাহিত্যের গঠনমূলক আলোচনা এক্ষেত্রে নতুন ও নিজস্ব। একটি সুশীল বৌদ্ধিক সমাজের অন্ত:প্রকৃতি ও বহি:প্রকৃতিতে যেমনঃ দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ছিল সমাজের নেতৃবৃন্দ, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবিদের চিন্তাধারায়ও তেমনি সীমাবদ্ধতা ছিল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে বৌদ্ধ সমাজে নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে।

বাঙালি বৌদ্ধদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিশ্লেষণ পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হয়ে থাকলে তা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে। ব্যক্তি প্রচেষ্টার সাথে যৌথ প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলেছিল ফলে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম হয়।

বাংলায় বৌদ্ধ সমাজের পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধির ইতিহাস বিষয়ে পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক সমাজে মতৈক্য আছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, 'যে সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশে আপন ধর্মের বাণী লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

(চাটগাঁয়ও) বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তৃত হইয়া থাকিবে।'[৭০] ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে এদেশে মুসলমান শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ বছর প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে মুসলমান সুশাসন সুবেদার-নবাব নাজিম বাংলাদেশ রাজত্ব করেন। মাঝখানে রাজ গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চার বছর স্বাধীনভাবে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৭১]

ওয়াকিল আহমদ তার, 'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা' গ্রন্থে বলেছেন, এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হয় । অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশ' বছর বাংলায় বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীন ছিল। পাল রাজাদের অনেকে সুশাসক ছিলেন। পাল আমলে দেশীয় সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ ঘটেছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্র (৫২৯-৬৫৪ খি.) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের সম্মান পেয়েছিল। ঐ যুগের বিপুল সংখ্যক বাঙালি বৌদ্ধ কোথায় গেলেন? ১৮৭১ সালে Report on the Sensus of Bengal. এ বৌদ্ধ-জৈন মিলে মাত্র ৮৪,৯৪১ জন পাওয়া যায়। পাল শাসনের পর সেনরা একশ বছর শাসন করেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্ক ভাল ছিল না।

বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল। (বঙ্গদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা ৬৯-৭০) সেন-বর্মন যুগে বৌদ্ধ বিরোধিতার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছিল। বর্মন =রাজ জাতবর্মার রাজত্বকালে 'বঙ্গাল সৈন্য' সোমপুর বিহারের প্রকাংশ অগ্নি সংযোগে বিনষ্ট করেছিল।[৭২] "তুর্কি আক্রমণের প্রথম আঘাত হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়ের উপর পড়েছিল। 'বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত' প্রবন্ধে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী বলেন 'বঙ্গে যখন তুর্কী আফগানের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রায় ভগ্নদশা । স্বতন্ত্র অস্বিত্ব থাকলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দুসম্প্রদায়ের নিম্নস্তর আশ্রয় করিয়া ছিলেন। সমাজে তাহারা ছিলেন অপাক্তেয় । নবাগত তুর্কী আফগান বঙ্গ-বিহারের বহু সংঘারাম ধুলিসাৎ করিয়াছিলেন, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন আবার অনেকে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।" ইতিহাসে প্রমাণ আছে ভগ্নদশা প্রাপ্ত বৌদ্ধরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত নবগঠিত মুসলমান সমাজে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্ম পূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের ত্রয়োদশ শতকের রচনা শূন্য পুরাণের'নিরঞ্জনের রুস্মা' তারই স্বাক্ষর বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ বৌদ্ধ রাজবংশ ও রাজন্যবর্গের অবদান এবং বৌদ্ধ দলন-নিপীড়ন পর্ব

(ক) পাল-চন্দ্র পর্ব

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বের বিভিন্ন লিপিমালা থেকে বোঝা যায় যে, পৌরণিক কাহিনী বাংলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এ পর্বে বৈষ্ণব পরিবারের মূর্তির সংখ্যাই বেশী এবং এতে মহাযানী বৌদ্ধ প্রভাব পড়েছে। এ পর্বে শৈব ধর্মের বেশ প্রসার হয়েছিল কিন্তু জৈন ধর্মের তেমন হয়নি। বাংলায় ত্রয়োদশ শতকেও জৈন সংঘের অস্তিত্ব ছিল।

পাল-চন্দ্র পর্বে বৌদ্ধধর্মেরই সর্বাপেক্ষা জয়জয়কার। সপ্তম শতকের খড়্গ বংশীয় রাজারা, অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের পাল রাজারা, দশম শতকের কান্তিদেব, দশম-একাদশ শতকের চন্দ্রবংশের রাজারা, দশম শতকের কম্বোজ রাজারা সকলেই ছিল বৌদ্ধ। এই সব রাজবংশের পৃষ্টপোষকতার ফলে অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রভাব-প্রতিপত্তি আবিষ্কার করে।[৭৩] আদিম কোন সমাজের লোকজন পাল রাজা গোপালের সময় হতে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশে ফলে এবং সর্বোপরি তন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে গোপন সাধন পদ্ধতি রীতিনীতি এবং আচার-আচরনের প্রচলন হয়। এর ফলে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হয়ে মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান, সহজিয়া, নাথধর্ম, বাউলধর্ম, সুফীধর্ম প্রভৃতির উদ্ভব হয়। বাংলাদেশে মহাযানী বৌদ্ধ দেব-দেবী, আদিবুদ্ধ ও আদি প্রজ্ঞা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ বৈরোচন, অক্ষোভ, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং বজ্রযানী দেবতা বজ্রসত্ত্ব, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, তারা, বজ্রতারা প্রভৃতি।

বাংলাদেশে মহাযানী বজ্রযানী-বৌদ্ধ দেবদেবীর যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের রূপ-গুণ-সমন্বিত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের মূর্তি সংখ্যায় সব থেকে বেশি। এর পরেই জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির-দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর। এ ছাড়া শক্তি ও বৃষ্টির দেবতা বজ্রপানি, কুবেরের বৌদ্ধ সংস্করণ জম্ভল, হেরুক, হেবজ্র প্রভৃতি দেবতার মূর্তি ও পাওয়া গেছে। দেবীদের মধ্যে খদিরবনী তারা মূর্তি, সিততারা, বৈরোচনা সম্ভূত মারীচি, অমোঘ সিদ্ধি সম্ভূত পর্ণ শিবরী, জম্ভলের শক্তি হারীতি, চন্ডা, উষ্ণীষ-বিজয়া প্রভৃতি দেবী মূর্তি পাওয়া যায়।[৭৪] পাল পর্বের যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলির অধিকাংশই নবম থেকে একাদশ শতকের। বেশীর ভাগ মূর্তিই পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিম বঙ্গের বাকুড়া বীরভুম অঞ্চলে। খুব সম্ভবত এসব অঞ্চলে প্রচুর বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হয়েছিল। তিব্বতী সাহিত্য এবং সমসাময়িক লিপি থেকে পাল পর্বে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার ও মহাবিহারের উল্লেখ পাওয়া যায় এগুলি ছিল বৌদ্ধধর্ম এবং জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। রাজা ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল মহাবিহারের ১০৮ মন্দির, ৬টি বিদ্যায়তন এবং ১১৪ জন আচার্য ছিলেন। সোমপুর মহাবিহারের মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র থাকবেন। অতীশ দীপঙ্করও কিছুদিন ছিলেন। এ ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের ত্রৈকুটক বিহার, দিনাজপুরের দেবীকোট বিহার, চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার, ত্রিপুরার

Dhaka University Institutional Repository

পটিকেতক এবং সন্নগর মহাবিহার, বিক্রমপুরের বিক্রমপুরীর বিহার, দীপগঞ্জের হলুদ বিহার, পট্টিকের কনক বিহার, কৃষ্ণ নগরের সুবর্ণ বিহার প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম চর্চা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল।

গুপ্ত যুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য বৈদিক এবং পৌরাণিক ধর্মের প্রসার শুরু হয়। একাদশ দ্বাদশ শতকে বর্মন রাজারা, একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে সেন রাজারা (বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষনসেন) দ্বাদশ-একাদশ শতকে দেব বংশের রাজারা বিষ্ণু, মাহেশ্বর ও পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। এই তিন বংশের রাজাদের চেষ্টা ছিল ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকা এবং বৈদিক ধর্মের প্রচার করা।[৭৫] সে কারণে বর্মন-সেন-দেব পর্বে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে পৌরাণিক ধর্মের যথেষ্ট প্রচার প্রসার হয়েছিল।

দিনাজপুর জেলার সুরোহর গ্রামে এবং কালন্দপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্তির ওপর মহাযানী মূর্তি কল্পনার প্রভাব দেখা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং শ্রীধর দাসের সদুক্তি কর্ণামৃতে বিষ্ণুর দশাবতারে উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর এই দশাবতার হলেন মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম বলরাম, বুদ্ধ, কাল্কি। বর্মন-সেন-দেব পর্বে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল না। এই বংশের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের বিনাশ সাধন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচারই তাদের লক্ষ্য ছিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে গুহ্যাতিগুহ্য সাধনার পথে আত্মগোপন করেছিল। অনেকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্ষেত্র নিবিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধদের দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল। মহামতি গৌতম বুদ্ধকে ও ব্রাহ্মণরা দশাবতারের অন্যতম অবতার করে নিয়েছিল।

হরিকাল দেব বলবঙ্কমল্ল (বণবঙ্কমল্ল)। এ পর্বে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্টপোষকতা আর কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। সব রাজরাই ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্টপোষক।[৭৬] পুষ্যভূতি বংশ ব্রাহ্মণ দেব পুজক হলেও সেই বংশের রাজা হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী সে সময় বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় মুখপত্রও হর্ষবর্ধন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছিলেন রাজা শশাঙ্ক ।

সপ্তম শতকের গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক ছিলেন নব্যব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী। হিউয়েন সাঙের বিবরণী হতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদের উপর নির্যাতনের ও বিনাশের বর্ণনা পাওয়া যায়। শশাঙ্ক কুশীনগরে এক বিহারে থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিতাড়িত করেছিলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদাঙ্কযুক্ত একটি প্রস্তর খণ্ডকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিলেন, বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম কেটে ফেলে তার মূল পর্যন্ত পুড়িয়েছিলেন, একটি বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে সেখানে শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের আরও অনেক অনিষ্ট করেছিলেন।[৭৭] বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে এবং সমসাময়িক চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং শশাঙ্ক কর্তৃক বৌদ্ধ দলনের কথা উল্লেখ করেছেন। হিউয়েন সাং বলেন যে, শশাঙ্ক

Dhaka University Institutional Repository

গয়ার বোধিবৃক্ষ ধ্বংস এবং বুদ্ধমূর্তি বিহার থেকে অপসারণ করেছিলেন। এ ঘটনার পর শশাঙ্কের খুব অসুখ হয় এবং তিনি এসময় মারা যান। [৭৮]

শশাঙ্কের বিরোধীতা সত্ত্বে ও বৌদ্ধধর্ম বাংলায় বিস্তার লাভ করেছিল বরং সপ্তম শতকের শেষের দিকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত বাংলার প্রায় সব রাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সপ্তম শতকের খড়গ বংশ, অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত পাল বংশ, দশম শতকের কান্তিদেব বংশ এবং নবম-দশম শতকের চন্দ্র বংশের রাজাদের পৃষ্টপোষকতার ফলে বৌদ্ধধর্ম আন্তর্জাতিক ধর্মের মর্যাদা পেয়েছিল। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ বৌদ্ধ রাজবংশের সময়ের লিপিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, এই পর্বের রাজারা যেমন বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামা নির্মাণে ভূমিদান করেছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য মন্দির-দেবস্থানকেও ভূমিদান করছেন।[৭৯] বর্মন-সেন-দেব বংশের লিপি এবং পাটলীগুলীতে দেখা যায়, দান গ্রহীতা সকলেই বেদ বিদ ব্রাহ্মণ। গ্রাম, ভূমি, অর্ঘ্যদান সব দানের গ্রহীতা ছিলেন ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধদের বা অন্য কাউকে দান করা একটি উদাহরণ নেই।

বর্মন রাজবংশের রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজ ছিল বৌদ্ধদের দলন, নিপিড়ন, নির্যাতন করা বল্লাল সেনের সমসাময়িক কান্দি রাজবাটীর কাবিকায় লেখা আছে: 'বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। বৌদ্ধাচারীগণ প্রতি নির্যাতন কৈল।[৮০] ইতিহাস বলে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সময় শঙ্করাচার্যের গুরু কুমারীল ভট্ট একজন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজাকে প্ররোচিত করে কয়েক সহস্র বৌদ্ধদের হত্যা করায়। রাজা সুধন্বা বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেছিল।

'শঙ্কর বিজয়ে' বর্ণিত হয়েছে, 'দুষ্ট মতাবলম্বী বৌদ্ধ-জৈনদের তর্কে পরাজিত করে তাদের মস্তক ছেদন করতঃ ঢেকিতে কুটিয়াদুষ্টমত ধবংস করবে।' একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদের নিগৃহীত ও অপমানিত করছিল অন্যদিকে তেমনি তাদের দেবদেবীকে নিজেদের কুক্ষিগত করে ফেলেছিল। স্বয়ং বুদ্ধকে তারা দশ অবতারের অন্যতম অবতার করে নিয়েছিল ধ্যানী বিষ্ণু এবং ধ্যানী শিবমূর্তির ওপর ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির প্রভাব স্পষ্ট। বৌদ্ধ তারা দেবী উমা ও পদ্মবতীর সঙ্গে প্রায় এক। এর ফলে বৌদ্ধ দেবায়তনে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী স্থান করে নেয়। আবার কোথাও কোথাও বৌদ্ধ দেব দেবী ব্রাহ্মণ মতে পূজো হচ্ছিল । খুলনা জেলার শিবাটি গ্রামে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি অর্জিত শিবরূপে পূজিত হচ্ছে। হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের বিলাপ ও নির্যাতন করে ক্ষান্ত হয় নি, তারা দুহাতে বৌদ্ধ ভান্ডার লুঠ করে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর নিজ নিজ নামাঙ্কের ছাপ দিয়ে তা সর্বতোভাবে নিজস্ব করেছেন। হিন্দুর পরবর্তী ন্যায় দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে এই লুণ্ঠনের পরিচয় আছে কোথা ও ঋনস্বীকার নেই। এইভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের বিলোপ সাধন করেছিল।

বঙ্গগৌরবের মধ্যমণি বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্করের নাম পর্যন্ত বিক্রমপুরবাসীরা ভুলে গিয়েছিল। ঢাকা জেলার সাভারের বৌদ্ধ রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষকে পৌরাণিক

Dhaka University Institutional Repository

হরিশ্চন্দ্রের বাড়ী মনে করে সশ্রদ্ধ হয়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেছি। .... বোধিতরুর নিম্নে উপবিষ্ট বিগ্রহের নাম পান্ডারা দিয়েছে-'জটীশঙ্কর'...... বুদ্ধমূর্তিকে সিদুঁর মণ্ডিত করে গ্রাম্য পুরোহিতেরা তারা মূর্তিজ্ঞানে অর্চনা করে মাতৃপূজার বাঞ্ছা চিরতার্থ করেছেন....। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "বৌদ্ধ সাহিত্য ব্যাকরণ, ন্যায় শাস্ত্র, ছন্দ-অলঙ্কার ধর্মদর্শন প্রভৃতি সব কিছুই ব্রাহ্মণেরা পরিবর্তিত করে নিজেদের করে নিয়েছেন। আজ কেউই 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' গায় না; আজ আর ভোগিপাল, যোগিপালের গীত' গায় না আর ইহা শুনিতে লোক আনন্দিত হয় না।"[৮১]

এখন শুনা যায়, 'ধান ভানতে শিবের গীত'। বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা নেড়া-নেড়ী বলে নিন্দিত হতো, বিদ্রুপ করা হতো। বুদ্ধমূর্তি শক্তিমান ঠাকুর হিসেবে পূজিত। প্রাচীনকালে বাংলায় কোন মুসলমান ছিলনা। মধ্যযুগে প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে গেল। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানগণ প্রায় আধুনিক। পাল রাজারা ছিল বাঙালি এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাঁরা পালি ও সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহী হলেও বাংলা ভাষা চর্চা করতেন, তার প্রমাণ বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যকীর্তি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদ। পাল আমলে দশম শতকের দিকে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ করে বাংলা ভাষা বেরিয়ে এসেছে। সেন রাজারা ছিলেন অবাঙালি কর্ণাট দেশ থেকে আগত। তাঁরা ছিলেন ঘোর ব্রাহ্মণ্যবাদী। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতিশাস্ত্র, সাহিত্য চর্চা, সংস্কৃতাশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থায় পৃষ্টপোষকতা করতেন। মানুষ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সেন আমলে বাংলা ভাষায় চর্চা হয়নি। বাংলায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। মধ্যযুগেও বাংলাদেশে হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত হয়েছে।

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী-আফগান ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি লক্ষণসেনকে বিতারিত করে বাংলাদেশ জয় করে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১২০৪ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬২ বছর সময় কালের জন্য ৭৫ জন মুসলমান সুবাদার, রাজা ও নাযিম ক্রমাগত ভাবে দেশ শাসন করেছেন। ত্রয়োদশ থেকে মুসলমানদের সাড়ে পাচঁশ বছর বাংলাদেশের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা সবাই (রাজা গণেশ, রাজা টোডরমল এবং রাজা মানসিংহ ব্যতীত) ছিলেন মুসলমান। মুসলমান শাসককের সবাই ছিলেন (আরবী, ইরানী, তুর্কী, আফগানী, মোঘল, পাঞ্জাবী, বিহারী প্রভৃতি) অবাঙালি। খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাঁর ফারসী গ্রন্থ, "হকিকত-ই-মুসলমানান-ই-বাঙ্গালা'- এ বলেছেন, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বিদেশাগম আরবী, ইরানী, তুর্কী, আফগান মুসলমানদের বংশধর। কিন্তু তারঁ এ দাবী মেনে নেওয়া যায় না। "বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই দেশ অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমান।"[৮২] তাদের বেশীর ভাগই সুফী সাধকদের দ্বারা ধর্মান্তরিত।

Dhaka University Institutional Repository

পাল পর্বের সংখ্যাগরিষ্ট বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্টপোষক সেন বর্মন দেব আমলে কঠোরভাবে অত্যাচারিত হয়। বাংলাদেশ মুসলিম বিজয়ের পর স্বাভাবিক ভাবেই বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বাংলায় যে উত্তর ও পূর্বাংশে বৌদ্ধদের সংখ্যা বেড়ে ছিল সেই উত্তর ও পুর্বাঅংশে পরবর্তীকালে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করে।[৮৩] ইতিহাস মতে, বাংলায় অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান। অভিজাত সমুসলমানদের ধর্মের ভাষা আরবী, রাজকার্যের ভাষা ফারসী এবং এবং বাজারের ভাষা উর্দু। কিন্তু দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আরবী-হিন্দু-ফারসী কিছুই জানত না, জানত শুধু বাংলা।[৮৪] প্রাচীন কালের বাংলায় কোন হিন্দু ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম ছিল না। এদেশের আদিম অধিবাসীদের কৌম ধর্ম ছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং আজীবিক এসেছিল। তারও পরে এসেছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম। বৌদ্ধরা নিজেদের সদ্ধর্মী বলত, জৈনদের উল্লেখ করত নির্গ্রন্থ এবং ব্রাহ্মণদের তীর্থিক (বা বিধর্মী) বলে। হিন্দু ধর্ম বলে কিছু ছিল না।

কোথায়, কিভাবে এই বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ মিশে গেল প্রশ্ন এখন সবার। কিভাবে বর্মন-সেন আমলেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে আসছিল। অভিজাত বৌদ্ধদের অনেকেই স্বার্থহানির আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের দিকে ঝুকে ছিল। রাজা এবং অভিজাত পৃষ্টাপোষকতার অভাবে সংঘারামের ভগ্নদশা । কেউ আর নতুন করে ভিক্ষু হচ্ছিল না। মধ্যযুগে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এদের কেউ কেউ নেপালে তিব্বতে পালিয়ে গেল। কেউ মুসলমান হল। আবার কেউ কেউ সামন্ত হিন্দু রাজাদের আশ্রয় লাভের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের সঙ্গে মিশে গেল। সহজযানী বৌদ্ধরা বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে মিশে যায়।[৮৫]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রধানত রিজলি, বেভেরলি, হান্টার প্রমুখ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত ক্রমে এই মত প্রাধান্য লাভ করে যে বাংলার মুসলমান, বাংলার বৌদ্ধ-হিন্দু সমাজের নিম্নতর থেকে উদ্ভূত ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়।[৮৬] সাহিত্য বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের সমাহার। যে কোন জাতির সাহিত্যে তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ইতিহাস ঐতিহ্যে ও মানব জীবনের প্রতিফলন অনিবার্য ও অবিসংবাদিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বিভাজনে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার মাধ্যমে পালি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণী বিস্তৃত হয়েছে। বাঙালি মুসলমানেরা এদেশে বহিরাগত তবে এর পাশাপাশি পণ্ডিতদের মতে, বাংলার মুসলমানদের পূর্ব পুরুষেরা এদেশের প্রাচীন অধিবাসী ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ-হিন্দু অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ।

"ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কিঅভিযান শুরু হল আর তার ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস নূতনতর রূপ নিল। গৌড় সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হয়েও সেন রাজারা কিছু কাল ধরে মধ্য ও পূর্ববঙ্গে স্বাধিকার রক্ষা করতে পেরেছিল।.......মুসলমান শক্তির বিজয় লাভের প্রধানতম কারণ

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে দেশে সংঘশক্তির অভাব। পাল রাজাদের শেষ দিকে থেকে বাংলাদেশের গণশক্তি ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধতা হারাচ্ছিল। তার উপর বল্লাল সেন লক্ষ্মণসেনের সুশাসনে দন্ডশক্তিও উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল।"[৮৭]

"বৌদ্ধ বিহার ও ব্রাহ্মণ্য মন্দির গুলি প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিল তুর্কিঅভিযান কারীদের দ্বারা। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুট আর অবান্তর উদ্দেশ্য ছিল জাতির মর্মস্থান দেবপীঠগুলির উপর আঘাত হেনে জনসাধারণের মনে ত্রাস জাগিয়ে নিশ্চেষ্ট করে দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্যই অল্পবিস্তর সফল হয়েছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধরা বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেলেন-মিথিলা, নেপাল, উড়িষ্যা, কামরূপ, ঝাড়খন্ডে। অনেকে মার খেলেন, মৃত্যুবরণ করলেন। কতক এখানে -সেখানে লুকিয়ে প্রাণ, জাতি ও ধর্মরক্ষা করলেন।

কোন সময় থেকে বাংলাদেশে আর্যদের বসতি আরম্ভ হয় তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে মৌযসম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দীতে যে উত্তরবঙ্গে আর্যদের উপনিবেশ ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৮৮]

'সমগ্র দেশ বোঝাতে 'বাঙ্গালা' এই নাম মোগলদের অধিকার কালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার আগে সমগ্র বাংলাদেশ বোঝাতে 'গৌড় বঙ্গ' বা 'গৌড় বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহৃত হত। প্রাচীন কালে আধুনিক বাংলাদেশে প্রধানত চার প্রদেশে বিভক্ত ছিল- বরেন্দ্রী, সুহ্ম (বা রাঢ়), বঙ্গ এবং কামরূপ। গৌড় বলতে সাধারণ বরেন্দ্রী রাঢ় বা উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং বঙ্গ শব্দে বঙ্গ কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্ব বাংলা বোঝাত। শাসন কার্যের জন্য বাংলাদেশ তখন চার ভূক্তিতে বিভক্ত ছিল-পৌন্ড্রবধর্নভূক্তি, বর্ধমানভূক্তি, দন্ডভূক্তি এবং প্রাগজ্যোতিষভূক্তি। মৌর্য যুগে বা তারও পূর্বে উত্তরবঙ্গে আর্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার ইতিহাসের সূত্রের খেদ পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্ট্রীয় চতুথ-পঞ্চশ শতাব্দী থেকে।

'ইসলামে বর্ণভেদ না থাকলেও বাংলার মুসলিম সমাজ আশরাফ- আতরাফ চেতনা থেকে মুক্ত ছিলনা। সুতরাং নবগঠিত মুসলিম সম্প্রদায় সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম-সস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোন আমূল পরির্তন (Radicaal change) বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন (Revolutionary change) নিয়ে আসেনি।'[৮৯] বাংলার মুসলিম সমাজ গড়ে উঠতে সময় লেগেছে দু'শ বছর । মুসলিম সমাজের অভ্যুদয় এবং হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সমানতালে ও সমকালে হয়েছে। ষোল-সতের শতক সমৃদ্ধির এবং আঠার শতক অবক্ষয়ের যুগ। আমরা আঠার শতকের প্রথমার্ধকে স্থিতিশীল ও দ্বিতীয়ার্ধকে অবক্ষয় পর্ব বলে অভিহিত করতে পারি।

আট শতক ও বার শতকের মধ্যবর্তীকালে বাংলাদেশে দুটি প্রধান রাজবংশের উথান-পতন ঘটেছে। এ দুটি রাজবংশ হল পাল এবং সেন। বৌদ্ধ পালরা একটানা চারশো বছর রাজত্ব

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোপাল দিয়ে শুরু, ১১৬০ খ্রিস্টাব্দে গোবিন্দ পাল দিয়ে শেষ। পাল বংশের মোট ১৮ জন রাজার মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপাল শক্তিশালী, দক্ষ, ন্যায় পারয়ণ, সুশাসক ছিলেন।[৮০] পাল রাজারা 'পরম সৌগত' এবং 'গৌড়েরশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর প্রভৃতি অধুনা ধবংস প্রাপ্ত স্থান ছিল পাল সাম্রাজ্যের রাজধানী। পাল রাজারা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক ছিলেন। পাল শাসনামালে এই বাংলার উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ ছিল। পাল যুগে বাংলাভাষা চর্চা ও সাহিত্যের প্রসার লাভ ঘটেছিল। চর্যাপদ ও 'সদুক্তি কর্ণামৃত' অনন্য সাহিত্যকীর্তি।

দেশ-কাল-পাত্র এবং সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র ও বাস্তব প্রবহমানতাই ইতিহাস। সাহিত্য হল সে ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোত সম্পর্কযুক্ত মনোজতের শাশ্বত অনুরূপরণন। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত দিক থেকে আজকের বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি অতীব নিস্প্রভ, ধূসর এবং অজ্ঞাত বলে বিবেচিত হলেও আমরা যে হিরন্ময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সে কথা গবেষণার মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রকাশের দায়ভাব গ্রহণের সময় এখনই।

"প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলাদেশ অঞ্চলে এক ধরণের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল। এখানকার মানুষের জীবন জীবিকার পদ্ধতিও ছিল অভিন্ন। সে সময় থেকেই এদেশের মাটির পোষণে প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্যধারায় আমাদের দেহমন পুষ্ট হয়েছে। একটি স্থান বা দেশের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে ঐ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে আলোচনায় আনতে হয়। কারণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য একটি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।" ইতিহাস রচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লিখিত বিবরণ (Textual narratives)[৮১]

403789

প্রাচীন বাংলার জনপদ সম্বন্ধে ড. রমেশ চন্দ্র মজমদারের বক্তব্য "উত্তর বঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, বাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এই সমুদয় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে।"[৮২]

"মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে একটি চর্যাগীতির লেখক লুইপাদকে দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে চর্যাপদের প্রাচীনতম লেখক অনুমান করিয়াছেন।[৮৩] এই জন্য তিনি প্রাচীনতম বাংলা রচনার কাল ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৩) বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র। তারানাথের মতে, সিদ্ধ জালন্ধরী, ভতৃহরি ও গোবিচন্দ্রকে দীক্ষাদান করেন। নাথগীতিকা মতে, জালন্ধরী কানুপার

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

(কাহ্নপাদের) গুরু। গোবিচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মকীর্তির সমসাময়িক ছিলেন। তারানাথ অপরো বলেছেন যে, ধর্মকীর্তির মৃত্যুর সময় কিংবা কিছুকাল পরে গোবিচন্দ্র রাজত্ব করেন। I-tsing (৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) ধর্মকীর্তিকে তার ভ্রমণ সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পণ্ডিত বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৪]

"খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন, ভারত ভ্রমণে আসেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতচর্চা ও আচার আচরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য পাটলিপুত্রে তিন বৎসর ও তাম্রলিপ্তিতে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি এ সময় বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ এবং বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তির চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি তাম্র লিপ্তিতে ২২টি বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে উল্লেখ করেন। গুপ্তযুগের খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গুনাই ঘাটের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, বৈন্যগুপ্ত এ অঞ্চলের অভৈবভাবর্তিক সংঘকে (মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত) জমি দান করেন।[৯৫]

খ্রিষ্টীয় সাত শতকে পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতবর্ষে আসেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য পণ্ডিত শীলভদ্র এর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ফাহিয়েন ও হিউয়েন সং বাংলায় বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেন নালন্দা, বঙ্গ, কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসবর্ণ। তাদের বিবরণ থেকে এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, জীবনধারা, ধর্মচর্চা, সংস্কৃতিচর্চা নানা বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রভাব প্রভূত প্রসার ঘটেছিল। হিউয়েন সাং এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি কজঙ্গলে ৬/৭ টি বৌদ্ধ বিহারে ৩০০ এর অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু, পুণ্ড্রবর্ধনে ২০ টি বিহারে ৩০০০ এরও বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু। এতে হীনযান মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা বাস করতেন। সমতটের ৩০টি সংঘারাম বা বিহারে ২০০০ এর অধিক ভিক্ষু, কর্ণসুবর্ণের ১০টি বিহারে ২০০০ অধিক হীনযানী বৌদ্ধভিক্ষু, এবং তাম্রলিপ্তিতে ১০টি বিহারে ভিক্ষু-১০০০ ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। পুন্ড্রবর্ধনের পো-সি-পোবিহার যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিল তা হিউয়েন সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায়। (প্রাগুক্ত, নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩৫৫-৫৭) এ সংঘারামটি প্রশস্ত, উচুঁ হবে এবং প্রায় ৭০০ জন মহাযানী ভিক্ষু বাস করতো। (হিউয়েন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধভারত, যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (অনু.) শরৎ পাবলিশিং হাউজ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৭২-১৭৩) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা-২১৩) সেই সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন (Pun-na-fan-ton-na), হিউয়েন সাং, সতেন্দ্রনাথ বসু, ফার্মা কে,এলএম প্রা.লি., কলিকাতা, ১৯৮৮,পৃষ্ঠা-১৪৬-৫০) সমতট (Sa-no-ta-ch'a), কর্ণসুবর্ণ (kie-lo-na-sa-fa-la-na) এবং তাম্রলিপ্তিতে (Tau-ma-li-ti) বৌদ্ধধর্ম খুব বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৬]

হিউয়েন সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেকালে বাংলাদেশে ছোট বড় বহু বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল যেগুলিতে শুধু বৌদ্ধধর্ম ও বিদ্যারচর্চাই হতো না; জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও সযত্নে চর্চা হতো, সমাদৃত হতো। পুন্ড্রবর্ধনের 'পো-সি-পো' কর্ণসুবর্ণের লো-তো-মো-ছি রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটি বিহার ছিল সুবৃহৎ উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ বিহার।

ধর্মপাল নির্মিত বিক্রমশীল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাচার্য ছিলেন বাংলার কৃর্তি সন্তান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। তাঁর তিব্বত যাত্রা সর্বজন বিদিত। বিক্রমশীল বিহারের অধিনায়ক রত্নাকর অতীশকে এই শর্তে তিব্বত গমনে অনুমতি দেন যে তাঁকে তিন বৎসর পর ভারতে ফিরে আসতে হবে। কারণ রত্নাকরের ভাষায়, অতীশ না থাকলে ভারত অন্ধকার।[৯৭]

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি দিনাজপুরের দেবকোট থেকে কামরূপের পথ ধরে তিব্বত অভিযান করেছিলেন।[৯৮] "দশম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার শক্তিশালী চন্দ্ররাজাদের রাজ্যভূক্ত হয়। এই বংশের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্যধর্মের প্রতি তারা উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন। চন্দ্র বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন (তার পঞ্চম রাজ্যবর্ষে (৯৩০ খ্রিঃ) রাজধানী বিক্রমপুর থেকে জারিকৃত) থেকে জানা যায় যে তিনি জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অনুরোধে শ্রীহট্ট মন্ডলে ছয় হাজার ব্রাহ্মণের বসতি গড়ে তোলার জন্য বিশাল ভূখন্ড দান করেন।[৯৯] প্রাচীন শ্রীহট্ট চার্যাকার বৌদ্ধসিদ্ধাদের প্রধান সাধনকেন্দ্র সুবিশাল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন বাংলায় পাল বংশের, সমসাময়িককালে চন্দ্রবংশের উত্থান ঘটেছিল কামরূপে। রাজা শ্রীচন্দ্র তাঁর রাজত্বের গোড়াতেই কামরূপে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কামরূপের অংশ হিসেবে শ্রীহট্টের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীচন্দ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন এবং "পরম সৌগত" উপাধি ধারণ করেন।[১০০] প্রত্নবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের আবিষ্কার এই জনপদবাসীর প্রাচীনতম সভ্যতা কীর্তির প্রথম বিকাশ পৌণ্ডবর্ধনভূক্তিকে কেন্দ্র করে। পুন্ড্র অবস্থানের উল্লেখ রয়েছে 'ঐতরের ব্রাহ্মণ' এ (কালসীমা খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০-১০০০)[১০১] 'অনেক ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, বাগের হাটের খানজাহানের দীঘি খননের সময় যে বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায় তা এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবকেই সাক্ষ্য দেয়। যশোর বারবাজার অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পাদপীঠ ছিল বলে মনে হয়।[১০২]

যশোর জেলাসদরে গদখালী মঠবাড়ী বলে একটি গ্রাম আছে। কোতয়ালী থানার অন্তর্গত আলমনগর ও ফরিদপুরের নিকট মঠবাড়ি গ্রামটি বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন স্থান। কালের গর্ভে বৌদ্ধদের স্মৃতি এখান থেকে বিনষ্ট হয়ে গেছে। গঙ্গারিডিদের (গংগারাঢ়ী) প্রাচীন রাজধানী বারোবাজারে বৌদ্ধ আমলের অনেক প্রাচীন নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া গেছে। এখানকার বৌদ্ধ বিহারগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর প্রস্তরের কারুকার্য বৌদ্ধযুগের। ভরতভায়না গ্রামে ৭০ ফুট উচু গোলাকৃতি একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। এর পরিধি ৯০০ ফুটেরও

Dhaka University Institutional Repository

অধিক। স্থানীয় প্রবাদে জানা যায়, এই স্তূপটি ভরত রাজার দেউল, নিকটবর্তী গৌরিঘোনা গ্রামেও এইরূপ একটি স্তূপ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেছেন যে, এগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসস্তূপ।

চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজ রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের সমস্ততীর্থ পরিদর্শন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তীর্থ ভ্রমণ, এবং বৌদ্ধদর্শন ও শাস্ত্র সংগ্রহ করা। এই কারণে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইতিহাসবেত্তাদের কাছে মূল্যবান। হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছেন, এসব অঞ্চলে ত্রিশটি বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। যশোরের আগ্রা গ্রামে তিনটি ঢিবি বা স্তূপ এখনো আছে। যশোর শহরের নিকটবর্তী মুরালীতেও বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। হিউয়েন সাং এর বিবরণ মতে, দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।[১০৩] সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত বুদ্ধমূর্তি ও স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র মহারাজ সম্রাট অশোকের আমলে স্থাপিত।[১০৪]

পুন্ড্রবর্ধন তথা মহাস্থান গড়ের প্রাচীন গোকুল মন্দির এবং গোবিন্দ ভিটা বৌদ্ধ স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বহন করে রয়েছে। হিউয়েন সাং মহাস্থানের ভাসু বিহারকে পো-শি-পো' বলে অভিহিত করেন। এ সমস্ত বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ও স্থাপত্য খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে পাল আমলে নির্মিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে দেখা যায় গৌতম বুদ্ধ বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। .... তানচেং টান ও অন্যান্য পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, দেবকোট, ফুল্লহারি, সান্নাগর, জগভালা, বিক্রমপুরী নামক বিহার বাংলায় নির্মিত হয়।[১০৫]

" দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ থানাধীন আটগাঁও ইউনিয়নের অর্ন্তগত সত্যমানডাঙ্গী গ্রাম। এটি সেতাবগঞ্জ পৌরসভা থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামেই রয়েছে ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ বুদ্ধমূর্তি। এটি যে স্থানীয় হিন্দুরা "শক্তিমান ঠাকুর" হিসেবে পূজা অর্চনা করে আসছে। প্রতিবছর এ ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তিটিকে ঘিরে বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমায় বিরাট মেলা বসে। শক্তিমানডাঙ্গী গ্রামের মন্দির এর সাথে বিরাট অশ্বত্থবৃক্ষ (বোধিবৃক্ষ) বিদ্যমান।[১০৬]

বৌদ্ধ বিহার ছিল ধর্ম প্রচারে ও সাহিত্য রচনার প্রাণকেন্দ্র। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার প্রসার লাভ করে। অশোকের মৃত্যুর পর ভারত নানা রাজ্যেবিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রীষ্ট পূর্ব চতুদর্শ শতাব্দীতে মগধের গুপ্ত রাজ্যের পতন হয়। গুপ্ত রাজারা ছিলেন বৌদ্ধবিদ্বেষী। তারা সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তৎপর হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ 'Glimpses of world History' তে লিখেছেন যে, গুপ্ত সম্রাটদের আমলে হিন্দু সভ্যতার চরম উন্নতি সাধিত হয়। এই সময় থেকে বৌদ্ধদের উৎখাত করা শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম নিশ্চিহ্ন করে

Dhaka University Institutional Repository

দিতে থাকে। ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ বিহারগুলি হিন্দু রাজশক্তির প্রভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কিছু কিছু বৌদ্ধ বিহার হিন্দুদের দেবালয়ে পরিণত হয়।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের (Deltaic) বুভন দ্বীপের সোনাবেড়ে গ্রামে আজ অবধি একটি বিরাট মঠ শৈবদের দেবালয়ের পরিচয় বহন করে চলেছে। বারোবাজার, মুরলী প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ বিহারগুলি সম্ভবত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সপ্তম শতাব্দীর গৌড়াধিপতি রাজা শশাংকের রাজত্বকালে হিন্দুদের অত্যাচারে অসংখ্য বৌদ্ধ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। শশাংক ছিলেন শৈব মতাবলম্বী। তাঁর মত বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজা ইতিহাসে বিরল।[১০৭]

(খ) বাংলাদেশের পাল-চন্দ্রোত্তর পর্বে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব

গুপ্ত সম্রাটদের আমলের পূর্ব থেকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ মতের খুব প্রাদুর্ভার ছিল। বৌদ্ধ মতের প্রাদুর্ভাব বেশি ছিল উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ রাঢ়ে ব্রাহ্মণ্য মত একচ্ছত্র হবার অনেক দিন পরেও ঐসব অঞ্চলে বৌদ্ধ মতের প্রাধ্যন্য ছিল। মধ্যবঙ্গ অঞ্চলে কায়স্থদের মধ্যে মহাযান শাস্ত্রের অনুশীলন পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্তও ছিল।[১০৮]

গুপ্ত সম্রাটদের শাসনকাল থেকে সেন বংশের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত সময়ে গৌড়-বঙ্গ-মগধের প্রধান প্রধান বিহারগুলিতে এবং অন্যত্র বৌদ্ধ মহাযান মতের বিশেষ অনুশীলন হ'ত। বিদেশী ভিক্ষু ও বিদ্যার্থীরা এখানে বাস করে বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুশীলন করতেন। চীনদেশ বিনির্গত পুণ্যকীর্তি নামক এক ভিক্ষুর হস্তলিখিত একটি মহাযান গ্রন্থের পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিটির লেখা সমাপ্ত হয়েছিল গোপাল দেবের ৫৭ রাজ্যাঙ্কে ৯ ফাল্গুণ তারিখে ঘোষলী গ্রামে। বর্মন রাজাদের রাজ্যকালে মধ্যবঙ্গের দক্ষিণ ভাগে মহাযান মতের বেশ চর্চা ছিল। লঘুকাল চক্র নামক মহাযান গ্রন্থের বিমল প্রভা নামক টীকার এক পুঁথির লেখা শেষ হয়েছিল যশোর জেলায় (?) বেঙ্গ নদীর তীরে কোন স্থানে হরিবর্মন দেবের ৩৯ রাজ্যঙ্ক ২৯ আষাঢ় তারিখে। (প্রাগুক্ত, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা-২৮) লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর যখন উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অধিকার তুর্কি পাঠানদের হাতে চলে যায় .... সে সময়েও সেখানে মহাযান মত প্রচলিত ছিল। তখন রচিত 'পঞ্চরক্ষা' নামক মহাযান গ্রন্থের একটি পুথিঁর পুষ্পিকা থেকে জানা যায়। "পরমেশ্বর পরমসৌগত পরম মহারাজাধিরাজ শ্রীমান-গৌড়েশ্বর-মধুসেন-দেব পাদানাং-বিজয়রাজ্যে" ১২১১ শকাব্দে (১২৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) ২ ভাদ্র তারিখে পুঁথিলেখা শেষ হয়েছিল।

এই সময়ে প্রায় দেশশত বৎসর পরে মহাযান মতের বিখ্যাত গ্রন্থ রোধিচর্যাবতারের এক পুঁথি লেখা হয়েছিল বেণু গ্রামে ১৪৯২ সংবতের ফাল্গুণ মাসে (১৪৩৬ খ্রিঃ) ঐতিহাসিকদের মতে বেণুগ্রাম যশোর ফরিদপুর অঞ্চলে বৌদ্ধ আচার্য মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সুন্দরানন্দ কাব্যের পুঁথি নেপালে পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় যে, এ গ্রন্থ দুটির পুঁথি বাংলাদেশ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

নেপালে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[১০৯] গুপ্ত যুগ থেকে শুরু করে পাল বংশের শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়ে বাংলায় বহু দেবদেবী ও উপদেবতার উপাসনা হত। এই সব দেবদেবী ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। বিভিন্ন পূজা-অর্চনা প্রচলিত ছিল। পাল ও সেন বংশের সময়ে নির্মিত বহু প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। বৌদ্ধদের দেবী নয়, বিভিন্ন পূজা-অর্চনা বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

মহাযানের উপাস্য পর দেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন এবং উত্তরাপথে বাসুদেব-কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যেমন, ভক্তি পরায়ণ ভাগবত মত উদ্ভূত হয়েছিল বাংলাদেশে তেমনি লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধমতাদর্শী রামচন্দ্র কবিভারতী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে সিংহলে গিয়েছিলেন। সেখানে ত্রিপিটকচার্য রাহুল পাদের কাছে পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে হীনযান মত অবলম্বন করেন। সিংহল রাজ পরাক্রম বাহু একে "বৌদ্ধগণ চক্রবর্তী" উপাধি দিয়েছিলেন। সেখান থেকে রামচন্দ্র কেদারভট্ট লিখিত বৃত্তরত্নাকরের টীকা এবং ভক্তিশতক ও বৃত্তমালা নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তিশতকে এবং বৃত্তরত্নাকরের টীকায় রামচন্দ্র এই রূপ আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

ভাস্বদ্ভানুকুলাম্বুজন্ম মিহিরে রাজাধিরাজেশ্বরে
শ্রীলঙ্কাধিপতৌ পরাক্রমভুজে নীত্যা মহীং শাসতি
সদগৌড়ঃ কবিভারতী ক্ষিতিশূরঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রোতা নামকরোৎ স ভক্তি শতকং ধর্মার্থমোক্ষ প্রদম।।
শ্রীমদ রাবহুল পাদত্রিপিটক চার্যদগুরো নির্মলং
বৌদ্ধ শাস্ত্রমধীত্য যস্ত্র শরণং রত্ন ত্রয়ং শিশ্রিয়ে।
যো বৌদ্ধগম চক্রবর্তি পদবীং লঙ্কেশ্বরাল্লব্ধবান্
স শ্রী মানিহ সর্ব শাস্ত্র নিপুন ব্যাখ্যামিমাং ব্যাতনোৎ[১১০]

কাজী মোতাহের হোসেন বাঙ্গালীর গানে বলেছেন, "বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ বা ভক্তিপ্রবণ জাতি। .... বাঙ্গালী জাতি আবার বাকচতুর।[১১১] মহাদেশে আর্যজাতির আগমনের পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে, বিশেষ করে সেন আমলে শাসন শোষণ ও শ্রেণী বৈষম্যের নীতিমালা দ্বারা সমাজকে নানা বিভক্ত করে ফেলা হয়েছিল। মানুষদের উপর ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নির্যাতন ও অনাচার অমানবিক পর্যায়ে চলে এসেছিল। অবাঙালি সেনরা বাঙালি জাতিকে কম করে হলেও উত্তম, মধ্যম, অন্ত্যজ শ্রেণী করে ছত্রিশটি ভাগে ভাগ বা এক চল্লিশটি করে দিয়েছিল। বালবলভী (বর্তমান বাগড়ীর প্রাচীন নাম), হরিকেল (চট্টগ্রামের উপকূলীয় ভূখন্ড)

Dhaka University Institutional Repository

টেক্করীর (উত্তর রাঢ়ে অবস্থিত) কৌশাম্বী (রাজশাহীর অর্ন্তগত),কোটিল্যের আরেকনাম চানক্য, ধর্মপালের নাম বা উপাধি বিক্রমশীল।

প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রশাসকবর্গ নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল। চর্যাপদে বাংলার সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রচিন্তা, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘোরতর অবনতির সন্ধান পাওয়া যায়। এসময় বাংলায় বৌদ্ধরা দলে দলে বাংলাদেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়। তাই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রামাণ্য দলিল চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় নেপালে। পাল রাজত্বের ধ্বংসস্তুপের উপরই সেনগণ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন রাজশক্তিরূপে। সমন্বয়ধর্মী পাল রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ দর্শনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[১১২] বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধ পাল রাজারা সুদীর্ঘ চারশ বছর সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব করেছিল।

পাল আমল ছিল আদর্শায়িত বাঙালি সমাজের প্রথম ভিত্তিকার। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জল ইতিহাসে বৌদ্ধ পাল রাজাদের অসামান্য অবদান ও মাহাত্মক তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'বাঙলার ইতিহাসে পাল বংশের আধিপত্যের চারিশত বৎসর নানাদিক হইতে গভীর ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বর্তমান বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির গোড়াপত্তন হইয়াছে এই যুগে; এই যুগই প্রথম বৃহত্তম সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ। ... লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্তা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আশ্রয় করিয়া এক একটি স্থানীয় সত্তাও গড়িয়া উঠে এই যুগেই।'

ধর্মপাল-দেবপাল-মহীপাল শ্রেষ্ঠ........ এই পাল রাজাদের এবং পাল রাষ্ট্রের পোষকতা ও আনুকূল্যে নালন্দা-বিক্রমশীলা- ওদন্তপুরী-সোমপুর-শালবন-সারনাথের বৌদ্ধসংঘ ও মহাবিহার গুলিকে আশ্রয় করিয়া আর্ন্তজাতিক বৌদ্ধ জগতেও বাংলাদেশ ও বাঙালির রাষ্ট্র একটি গৌরবময় স্থান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই সকলের সম্মিলিত ফলে বাঙলায় এই যুগেই, অর্থাৎ এই প্রায় চারিশত বৎসর (৭৫০-১১৫০ খ্রি.) ধরিয়া একটা সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়িয়া ওঠে। ইহাই বাঙালির স্বদেশ ও স্বজাত্যবোধের মূল এবং ইহাই বাঙালীর এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি। পাল যুগের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।[১১৩]

ইতিহাসে প্রমাণ আছে তুর্কী আক্রমণে নালন্দা মহাবিহার ও ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংস হয়েছিল। সেই সাথে বুদ্ধমূর্তি ও গ্রন্থগারের মুল পুঁথি ও সাহিত্য আগুনে পুড়ে ফেলা হয়।

ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত বলেন "তুর্কীরা দুর্গ বলে ভুল করেই নালন্দা ধবংস করেছিল অবশ্যই কুমিল্লার ময়নামতির শালবন মহাবিহার ধ্বংস হয় ব্রাহ্মন ধর্মালম্বীদের হাতে। ভোজবর্মার

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে পরম বিষ্ণুভক্ত জাতবর্মা পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার ধ্বংস করেছিলেন।[১১৪]

বঙ্গাল, বাঙ্গাল, বাঙলা, বেঙ্গল, বেঙ্গালা, বেঙ্গালাহ্ প্রভৃতি বাংলা, ফারসী ও ইউরোপীয় প্রতিশব্দ গুলি বঙ্গ শব্দ থেকেই এসেছে। চর্যাপদে বঙ্গাল ও বাঙ্গালি শব্দ দুটি উল্লেখিত হয়েছে। 'বাঙ্গালাহ' শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে সে বিষয়ে আবুল ফজলের অতি পরিচিত ও বহুবার উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ যুক্তি সঙ্গতঃ

The original name of Bengal was Bang. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called Al. From this Suffix the name Bengal took its rise and currency.[১১৫]

ড. অজয় রায় বলেছেন 'পৌণ্ড্র বরেন্দ্র, গৌড়-কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ-সমতট-হরিকেল এই সব প্রাচীন জনপদ নিয়ে গড়ে উঠেছিল অতীতের বঙ্গভূমি। অধ্যাপক অজয় রায় বাঙালির পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক বিবরণে দেখিয়েছেন যে, পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে বাঙালি জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বহু বিচিত্র নৃগোষ্ঠিক উপাদানের এবং ভাষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের দীর্ঘকালীন সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সমরূপী সমসত্ত্ব জন হিসেবে এই জাতি গড়ে উঠেছে।[১১৬]

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। তাছাড়া এ বিষয়ে আজো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কাজেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত, সম্ভব নয়। ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, যে, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নেগ্রিটো, আদি-অস্ট্রেলিয়া, (ভেডিডি) ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠির মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। (বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-২) বাংলাদেশের বৌদ্ধরা উনিশ শতকে এক নতুন উত্থান ও জাগরণের চেতনাতে, গৌরবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।' ইতিহাসের রক্তমাংস হচ্ছে বিষয় বস্তুকে সংরক্ষিত করা, ইতিহাসের প্রাণ হচ্ছে সমুদ্দেশ্যকে সফল করা। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে তা হয়নি।' বঙ্গ নামটি জাতিগোষ্ঠি বা স্থানের নাম হিসেবেসর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ' গ্রন্থে হাবিবুর রহমান বলেন বং থেকে বঙ্গ। বং শব্দের অর্থ জলাঞ্চল। মুহাম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'বং' অবশ্য দ্রাবিড় শব্দ ও গোষ্ঠির নাম। "আর্যরা উত্তর ভারতে প্রবেশ করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ সংঘাতে দ্রাবিড় জাতিরা পরাজিত হয়ে এদের একটি শাখা সমতট অঞ্চলে চলে আসে। এই দ্রাবিড় গোত্রটি 'বং' গোত্র বলে অনুমান করা হয়। অনেকে মনে করেন দ্রাবিড় 'বং' গোত্রের নাম থেকেই 'বঙ্গ' 'বঙ্গদেশ' ও 'বঙ্গাল' নামের উৎপত্তি/আইনী আকবরীর লেখক আবুল ফজলের মতে, বঙ্গঁ শব্দে সঙ্গে আল (পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাংরা হয়েছে (বঙ্গ+আল=বঙ্গাল) তিবেটো-বর্মণ, অস্ট্রো-

Dhaka University Institutional Repository

এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড় জাতির সমন্বয়ে সমতটের বঙ্গে যখন কৃষি, এবং জল ও স্থল পথে ব্যবসা বাণিজ্য ভিত্তিক সমৃদ্ধশালী জনপদ গড়ে উঠেছে তখন এদেশে আর্যদের আগমন ঘটে।"[১১৭] তিব্বতী 'বনস' শব্দের সাথে দ্রাবিড়ি 'আলম' সংযুক্ত হয়ে 'বাঙ্গাল' হয়েছে। বলা হয় মৌর্যরাই প্রথম (৩২৪ খ্রি.পূর্ব অব্দ) বাংলাদেশকে আর্যাবর্তের সাথে সুদৃঢ় বন্ধনে যুক্ত করে। বাংলার ইতিহাসে প্রাকন মুসলিম যুগের ইতিহাস তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্বয়ংবর রচিত হয়নি। বাংলাদেশের প্রাক-মুসলিম যুগ বলতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্ব কালকে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, গরহাজীর ইতিহাস অনুরাগীর স্বগতোক্তি। বাংলা ভাষার ইতিহাস চেতনা অতি সম্প্রতিক কালের। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে আমরা বর্তমান নিয়ে ব্যাতিব্যস্ত। ভবিষ্যতের ভাবনার সময় নেই। অতীতের প্রতি আমাদের তেমন আগ্রহ নেই, যদিও বতর্মানকে যথার্যথ ভাবে জানার জন্য অতীতকে জানা দরকার। ভাসা ভাসা ভাবে আমরা হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কথা বলি।[১১৮] বাংলাদেশের পুরাকীর্তি সম্পর্কে ভাবনা ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বাংলার প্রাচীন ইতিহাস নেই। প্রাচীন কালে বৌদ্ধরা বাংলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা করতেন। কালের ইতিহাসে সেই কালজয়ী বৌদ্ধ ইতিহাসের ধারা ও সৃষ্ট সাহিত্য কর্ম হিন্দু ও মুসলিম শাসক কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছে। এদেশের হিন্দু ও মুসলমানগণ প্রায়ই আধুনিক। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী ও ত্রিপুরার রাজমালা কাহিনী লিপিবদ্ধ হলেও কাহিনী অতিরঞ্জিত। মুসলমান রাজত্বের সময় ভারতবর্ষ ও বাংলার মুসলমানদের রাজত্বের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার প্রথা আরম্ভ হয়। পরন্তু এই সকল ইতিহাসেও বৌদ্ধ (হিন্দু) রাজত্বের বিষয় কিছু উল্লেখিত হয় নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনেক উপকরণ বিদেশী পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা প্রাচীন সাহিত্য, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রত্নবস্তু, জনশ্রুতি ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতির সাহায্যে তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনার চেষ্টা করে আসছেন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস রচনায় বৌদ্ধযুগের ইতিহাস অস্থি মজ্জায় জড়িত। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধদের ইতিহাস উপেক্ষিত ও বর্জিত। কালে কালে বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আত্মসাৎ করে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মে, সমাজে ও সংস্কৃতিতে একত্রকরণ করেছে। গুপ্ত কবি সখেদেই বলেছিলেন 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'। বস্তুত বঙ্গদেশের ভৌম পরিচয় বার বার এত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যে বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশের কোন স্থায়ী সীমা নির্ধারণ এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠি যে অঞ্চলে বাস করে সাধারণ ভাবে সেটি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ নামে অভিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে বঙ্গ সুক্ষ্ম রাঢ় পুণ্ড প্রভৃতি জনপদের নাম পাওয়া যায়।

সমগ্র বঙ্গদেশকে 'বাঙলা' নামে অভিহিত করা হয় মুঘল যুগ থেকেই। আকবরের শাসন কালে আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এ দেশকে 'সুবা বাঙলা' বলা হয়েছে। অনেকের ধারণা শব্দটির উদ্ভবও ঘটেছিল সে কালেই। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নয়। কারণ চর্যাপদে 'বঙালী' শব্দ আছে (আজি ভুসুকু বঙালী ভৈলী) সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সঙ্কলন গ্রন্থে বাঙলা ভাষার উল্লেখ রয়েছে (গঙ্গা বঙ্গাল বানীচ) কাজেই বঙ্গাল বা বাঙালী শব্দটি অতি প্রাচীন। 'বাঙালি জাতি রূপে গৌড় বঙ্গের অধিবাসীরা সংহত হয়ে উঠেছিল সম্ভবতঃ খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম শতকে বৌদ্ধ পাল রাজবংশীয়দের কাল থেকেই।'[১২০] বাঙালীর জাতিত্ব বিচারে দেখা যায়, প্রোটো বা নিগ্রোবটু-অস্ট্রোলয়েড, অস্ট্রীক বা নিষাদ, দ্রাবিড়, ভোট চীন তথা মঙ্গোলীয় বা কিরাত এবং আর্যভাষী গোষ্ঠির মিলিত সত্তাই প্রথম পর্বে বাঙালি জাতি গঠিত। তারপর দীর্ঘকাল পরিক্রমায় কত 'শক-হুনদল পাঠান মোঘল' এই দেহে লীন হয়েছে। এসেছে তুর্কী, তাতার-আফগানরা, এরপর পাঠান-মোঘলের দল, এদেরও কিছু কিছু বাঙলার রক্তধারায় মিশে গেছে। সর্বশেষ পর্বে ইউরোপীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে পর্তুগীজ আর ইংরেজ রক্তধারা তো বাঙালির দেহে এখনো নতুনভাবে মিলিত হয়ে চলছে। আর্যদেব বলেন, 'কোন জাতির বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, তাহার সংস্কৃতির আলোচনাই মুখ্যবস্তু হইয়া পড়ে। অন্যত্র বলেছেন বাঙ্গালির ইতিহাস অর্থাৎ বাঙ্গালির সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বৌদ্ধযুগ ভারত ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ, ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ।[১২১] শ্রীপরেশ চন্দ্র চট্টোপধ্যায় বলেছেন, বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের ইতিহাস যে একটি মাত্র গ্রন্থকে নিঃসন্দেহে সাহিত্য রূপে স্থান দান করা যেতে পারে বা চর্যাপদ বা চর্যাগীতিকোষ।

তুর্কী আক্রমণ যুগের দেড় থেকে দুইশত বর্ষকালকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধিকাল বা অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের শুধু মূল্যবোধেরই নয়, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছু মূলতু যা কিছু সব একটা জাতির জীবনে আশ্রয় রূপে বর্তমান থাকে, তাতেও ক্ষয় দেখা দিয়েছিল। মুসলিম তুর্কী জাতি, বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণে ও অর্থাপহরণে যে তৎপর হয়ে উঠেছিল, তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। তারা বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করেছে, সাহিত্য ও ধর্মীয় পুথি পুড়েছে, প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার পীঠস্থানসমূহ ধ্বংস করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন তো বিদগ্ধ পণ্ডিততজনের মনন চর্চার বিষয়। দর্শন একটি প্রাচীন বিদ্যা। প্রাকৃত বাঙালীর দর্শন চিন্তার লিখিত রূপ সম্ভবত সর্বপ্রথম পাওয়া যায় দোহাকোষ ও চর্যাপদে। দোহা ও চর্যা রচয়িতা অধিকাংশই ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। [১২২]

বাঙালির দর্শন মানবতাবোধ সমৃদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। আঠারো শতক পর্যন্ত অন্তত তাই ছিল। বাংলাদেশের মানুষের দর্শন ছিল, এখনও আছে। বাঙালির দর্শন চিন্তা, ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তা, মননশীলতা, ঐতিহ্য, জীবনধারা ও সামগ্রিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। ত্রয়োদশ শতকের গোড়াতে খিলজী বংশীয় তুর্কী ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের আগে এদেশে অতীশ দীপংকর, শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, রত্নাকর শান্তি, প্রজ্ঞাকর, জেতারি, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রমুখের মহাযান বৌদ্ধ দর্শন ছিল বাঙালির নিজস্ব দর্শন। [১২৩] বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসে বাঙালীর দর্শন চিন্তার ধারা নির্ণয় করতে হলে বাঙালির অধ্যুষিত ভূখণ্ডে বসবাসরত প্রাচীন জনগোষ্ঠির ইতিহাস, সংগঠন ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন অপরিহার্য। প্রাচ্যবিদ্য মহার্নব সিদ্ধান্ত বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে লক্ষ্মণ সেন মুসলমান বিজয়ের পরে অন্তত ছয় বৎসর (১১৯৯-১২০৫ খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে তৎপুত্র দনুজমাধব বা মাধবসেন পরে রাজ্য লাভ করেন।[১২৪] এবং এরপর লক্ষ্মণ সেনের অপর দুইপুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপসেন পূর্ববঙ্গের অধিপতি হয়েছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগন এশিয়ার নানা স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এখন জাপানের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সকল দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে; এই অক্ষর তদ্দেশবাসী পুরোহিতগণের নিকট অতি পবিত্র। জাপানের হুরিয়ুজি মন্দিরে "উষ্ণীষ বিজয়ী ধারিণী' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষিত আছে।[১২৫] হরিকেল পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং হরিকেল দেশে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, হরিকেল পূর্ব ভারতের পূবসীমায় অবস্থিত। হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ ছিল। চন্দ্রদ্বীপ সরকার বাকলার প্রাচীন নাম। ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রদ্বীপের পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমর্দনের গুরুর নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হয়েছে। চন্দ্রদ্বীপ একটি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ। ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক ফুসে চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন বৌদ্ধদেবতা ভগবতী তারার চিত্র প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে আবিষ্কার করিয়াছেন।[১২৬] প্রথমে বংশপরম্পরা রাজাদের পর্যায় এবং ঘটনার কাল নির্ণয় করিয়া তবে জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধ ও স্থায়ী ইতিহাস লেখ সম্ভব। ঐতরেয় আরণ্যকে (২-১-১-৫) বঙ্গ শব্দ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা রূপে এতে বলা হয়েছে।

' যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি

বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ'

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ এই যে তিনটি জীবজাতি নষ্ট হইয়াছিল তাহারা এইসব পাখি-বঙ্গেরা, বগধেরা, চেরপাদেরা (বা ইরপাদেরা)।[১২৭] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭-১৮) পুণ্ড্র একটি জাতির নাম। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর অশোক লিপিতে 'পুন্ড্রনগর' নামে উল্লেখিত হয়েছে। পুণ্ড্রনগর থেকে পুণ্ড্রবর্ধন নাম হয়। বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে "সুক্ষ্ম" একটি দেশ নামের উল্লেখ আছে।[১২৮] বাঙ্গালা-বিহারের বিহারগুলি সেকালে (অর্থাৎ গুপ্ত শাসনের শেষভাগে) বিদ্যা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের সর্বোত্তম কেন্দ্র ছিল। মুসলমান আক্রমণে বিধবস্ত হইবার পূর্বে আমরা এই মহাবিহারগুলির উল্লেখ পাই। দক্ষিণ বিহারে ওদন্তপুরী ও নালন্দা, বাঙ্গালা বিহার সীমান্তে রাজ মহলের কাছে ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল, বরেন্দ্রীতে সোমপুর, মধ্যবঙ্গে জগদ্দল, পূর্ববঙ্গে সুবর্ণভূমি, দক্ষিণরাঢ়ে পুণ্ড্রভূমি ইত্যাদি। ইতিহাস চর্চায় ধারাবাহিকতার প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সময়, সমাজ ও জীবনকে জানতে হলে প্রয়োজন এর প্রাচীনতম উৎসের সন্ধান করা। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সময় ও কাল পর্যবেক্ষণ করা। ইতিহাস হলো একটি জাতির পরিচায়ক, দর্পণ, যেখানে প্রতিফলিত হয় পূর্বপুরুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের কর্মকাণ্ড অর্থাৎ মানুষের সার্বিক জীবনের আবর্তন।[১২৯] উত্থান, বিকাশ, পতন সভ্যতার ইতিহাসের একটি অবধারিত সূত্র। ইতিহাস হলো জীবনের দর্পণ ও কার্যাবলীর পরিমাপক। এটা চলমান গতিধারায় জীবনকে প্রতিফলিত করে এবং যুগ যুগান্তর ব্যাপি এর ক্রিয়াকর্মের মূল্যায়ণ করে থাকে।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী সেই চার'শ বছর বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সময়। এই দীর্ঘ চার'শ বছরের ইতিহাসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই সময়ে পাল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য পেয়েছে সেন-বর্মন রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণের ফলে সেন রাজত্বের অবসান হয়েছে। মুছে গিয়েছে বাঙালীর ইতিহাসে বৌদ্ধ ও হিন্দু আধিপত্যের গৌরবময় তিলক চিহ্ন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মুসলিম শাসন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আধিপত্যের উদগ্র আকাঙ্খা, একদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার, অর্থাৎ আর্যকরণ (Aryanization) অন্যদিকে আর্যপূর্ব সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার জীবনবিন্যাস ও জীবনদর্শের প্রতিরোধ প্রচেষ্ঠা; জ্ঞানসাধনা, ধর্মসাধনা, কঠোর চরিত্রানুশীল, মানবতাবোধ ও সাহিত্যানুশীল স্তম্ভিত। মুখে মুখে এসব বাণী প্রচারিত হতে থাকে বংশ পরম্পরায়, কাল থেকে কাল, যুগ থেকে যুগ, ঋষি থেকে ঋষির কাছে, আর গুরু থেকে শিষ্যের কাছে। শ্রুতিরম্পরা প্রচলিত বাণীগুলোই পরবর্তীকালে সংগ্রহ ও সংকলিত করে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রচার করা হয়। বুদ্ধ অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধ থেকে বৌদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। গৌতম কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম এবং এ ধর্মের অনুসারীগণ বৌদ্ধ নামে পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজগৃহে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রথম ধর্ম মহাসম্মেলন করেন। সম্রাট অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই ধর্ম হা সম্মেরনে নিকায় গ্রন্থগুলো সংকলিত হয়। এই সব গ্রন্থের কোথাও বলা নেই যে তৎকালে বঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।[১৩০] অবশ্য একটি নিকায় গ্রন্থে (অঙ্গুত্তর নিকায়) বাংলার এক বৌদ্ধ আচার্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু এতে সঠিক ভাবে বোঝা যায় না যে সেই সময় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মে নানা দেব-দেবীরও আর্বিভাব হলো। দুই প্রধান পৃথক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেল, হীনযানী ও মহাযানী। এইসব হলো সম্রাট কণিষ্কের সময় অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে। তাই এক সময় মহাযানী ধর্ম বিশ্বাসও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পর বাংলায় প্রবেশ করে। মহাযানীরাই বাংলায় বুদ্ধপূজার উদ্ভব করে। নানা দেব-দেবীর পূজারও উদ্ভব করে তারা। বাংলার নানা বৌদ্ধ বিহারে হীনযানীদের সঙ্গে মহাযানীরাও তখন থাকতে। দু'রকম বৌদ্ধধর্ম ছিল তখন ভঙ্গভূমিতে।

প্রাচীন বাংলায় মহাযানী ভিক্ষুই সবাই ছিলেন হীনযানী। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরাও ছিলেন এইসব বৌদ্ধ বিহারে। তারাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। এই খড়্গ বংশীয় রাজারা ছিলেন মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। তাদের প্রভাবে সেই সময় মহাযানী বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। চন্দ্র বংশের রাজারাও ছিলেন বুদ্ধের অনুরোগী। তাদের সময় হরিকেল ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের কেন্দ্রস্থল বিশেষ। কম্বোজ রাজবংশ বহিরাগত হলেও ছিল বৌদ্ধধর্মে অনুরাগী। এই সব রাজাদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে'র পাশাপাশি বাংলায় বৌদ্ধধর্মে'রও প্রসার ছিল।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজারা বাংলায় এলেন। তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ ভক্ত। ওদন্তপুরী, সোমাপুরী, বিক্রমশীলা মহাবিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় এই বংশের রাজা মহীপাল ও জয়পালের মহান কীর্তি। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, মহারাজ ধর্মপাল পঞ্চাশটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন।[১৩১] বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে দর্শনশাস্ত্র শিখতে সেই সময় বহু দেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতরা আসতেন। কাশ্মীর, তিব্বত, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতরা তখন এস ভীড় করতেন বঙ্গভূমিতে। এই দেশের পুঁথিপত্র তাঁদের দেশের ভাষায় অনুবাদ করে তাঁরা নিয়ে যেতেন তাঁদের দেশে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন চাং খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এসে দেখেন যে সারা দেশে বৌদ্ধধর্ম তখন নিভু নিভু। কিন্তু বাংলায় তখন ছিল এই ধর্মের প্রচণ্ড জোয়ার। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথ বলেছেন, পাল যুগের শেষে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মে দুরবস্থা দেখা দেয়। পাল যুগে নির্মাণ বহু বৌদ্ধ বিহার ও বিদ্যায়তন ভগ্নপ্রায় ও ভগ্ন, অথবা বিধর্মীদের দ্বারা অধ্যুষিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবও প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছিল। পরবর্তী বর্মন রাজারাও তাই করলেন। তারা ছিলেন কলিঙ্গের অধিবাসী ও গোড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মা বলম্বী। তাঁরাও কেবল দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করলেন। বৌদ্ধরা অবাঞ্চিত হলো। শুধু তাই নয়, বর্মন

Dhaka University Institutional Repository

রাজবংশের রাজা জাতবর্মা সোমাপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহারটিও পুড়িয়ে দেন। বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহারও ভেঙ্গে পড়ে। ভিক্ষুরা বিহার ছেড়ে বনে পাহাড়ে আত্মগোপন করে। যে ধর্মীয় সমন্বয় পাল রাজারা করেছিলেন, তা নস্যাত করলেন সেন ও বর্মন রাজারা। পাল রাজারা ছিলেন বাঙালী।[১৩২] বখ্তিয়ার খিলজী বাংলা দখল করে বৌদ্ধ বিহারগুলো নির্বিচারে লুঠ ও ধ্বংস করল। অসংখ্য বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রাণ হারাল। বিখ্যাত সব বৌদ্ধ বিহার, জ্ঞানের পীঠস্থান, মন্দির, মুর্তি এই হানাদার ধূলিসাৎ করল। বহু মুল্যবান পুঁতিপত্র পুড়িয়ে ছাই করল।[১৩৩] বৌদ্ধদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয় দিল এই তুর্কী হানাদার। বহু নিরীহ বৌদ্ধ প্রাণ দিল। প্রাণ বাঁচাতে বহু হিন্দু বৌদ্ধ, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরের প্রসিদ্ধ সোমাপুরী বৌদ্ধ বিহারটি বখতিয়ার খিলজীর সৈন্যরা ধ্বংস করে আগুন দেয়। সেই আগুনে তারা পুড়িয়ে মারে বিহারাধ্যক্ষ ভিক্ষু আচার্য করুণাশ্রীমিত্রকে। এমনি বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ও পণ্ডিত আচার্য ভিক্ষুদের তুরস্কের মুসলমান হানাদাররা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ থেকে। তারপর শুরু হলো বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের পালা। হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, নয়তো মৃত্যুবরণ কর, এই ছিল হানাদার নীতি। বাংলা ও বিহারের বহু মানুষ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে প্রাণ ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্মৃতি সৌধ, মন্দির, স্তূপ প্রভৃতি কিছু আর অক্ষত রইল না। বৌদ্ধধর্ম অনুরাগীরা সংখ্যায় কমে গেল।

সপ্তম শতকে বাংলাদেশ হয়ে উঠল তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। তিব্বতী সূত্রে উল্লেখ পাই যে খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে মহাযানী তন্ত্রসাধনা বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করে ধর্ম কীর্তির সময়। বাংলায় তখন বেশ কিছু তান্ত্রিক আচার্য ছিলেন, যারা বিহারে অবস্থান করে তন্ত্রসাধনার শিক্ষা দিতেন। বিক্রমপুরের বিহারে ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য ভিক্ষু কুমারচন্দ্র। চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারে ছিলেন তন্ত্রাচার্য ভিক্ষু তৈলপাদ। এই বিহার ছিল তৎকালে তন্ত্রসাধনার বিশেষ কেন্দ্র। বগুড়া ও কৃষ্ণনগরের বিহার দুটিও ছিল তন্ত্রসাধনার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। ইতিহাস বলে, তৎকালে চুরাশি জন তন্ত্রসিদ্ধাচার্য এই দেশে ছিলেন। তাদের মাধ্যমেই মহাযানী তন্ত্রসাধনার বিকাশ ঘটালো এই দেশে। এদের মধ্যে অনেকে তন্ত্রসাধনার গ্রন্থও রচনা করলেন। এইসব গ্রন্থ এক সময় তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ হয়ে লাদাক হয়ে তিব্বতে পৌছায়। সেই সব মূল গ্রন্থ আজ আর নেই, তবে গ্রন্থগুলোর তিব্বতী অনুবাদ এখানো আছে।

মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তন্ত্রসাধনাকে বৌদ্ধধর্ম দর্শনে ঢুকিয়ে নিয়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্মে এক নতুন ধ্যান কল্পনা গড়ে তুললেন। মূল প্রেরণা হলো মন্ত্র আর তার সঙ্গে যুক্ত হলো ধারণী ও বীজ। এই নতুন ধ্যান কল্পনার পথই হলো মন্ত্রযান। মন্ত্রযান ও বজ্রযান এই দুই প্রকার তন্ত্রসাধনার উদ্ভব হলো মহাযানী বৌদ্ধধর্মে। এই ধ্যান কল্পনার গোড়াপত্তন হয় এই বাংলাদেশেই। হীনযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁদে মধ্যে ছিলেন মহাজ্ঞানী, পণ্ডিত, শাস্ত্রবিশারদ ও বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

সব দার্শনিক আচার্য ভিক্ষুরা। এদের মধ্য বিখ্যাত ছিলেন বাঙ্গালী বৌদ্ধ ভিক্ষুশলিভদ্র। তিনি ছিলেন বাংলাদেশেরই মানুষ।

দ্বিতীয় প্রকার তন্ত্রসাধনাকে বলা হলো 'বজ্রযান' সাধনা। শূন্যবাদীদের কাছে নির্বাণ হচ্ছে শূন্যতার পরম জ্ঞান। নির্বাণ প্রাপ্তি হচ্ছে জীবের পরম সুখ। শূন্যরূপ নির্বাণকে এই তন্ত্রসাধনায় কল্পনা করা হলো দেবীরূপে। আর যে চিত্তে বোধিজ্ঞান বা সম্যক জ্ঞানের সঙ্কল্প রয়েছে, তাকে বলা হলো বোধিচিত্ত। এই বোধিচিত্ত ধ্যানের মাধ্যমে যখন শূন্যতায় বিলীন হয়, তখনই নির্ব্বাণ বা পরম সুখের উদয়। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা ছিল না। বেদে মূর্তিপূজার কথা নাই। ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রেও মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের সময়েও মূর্তি পূজার কোনরূপ চল ছিল না। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেও বুদ্ধপূজা হতো না। বহু পরে বুদ্ধের পূজা, স্তূপের পূজা, ধাতুর পূজা প্রভৃতি নানা পূজার উদ্ভব হয়। তারপর তন্ত্রসাধনার উদ্ভবের পর মহাযানীরা অসংখ্য দেব-দেবীর উল্লেখ করে তাঁদের পূজারও ব্যবস্থা করে। এই সব দেব-দেবীর মূর্তি সারা দেশে ছড়িয়ে যায়। তারা, প্রজ্ঞা পারমিতা, নীল সরস্বতী, চক্রেশ্বরী, হারিতি ইত্যাদি নানা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩৪] অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে এই সহজযান তন্ত্রসাধনা, মহাযানীদের মধ্যে উদ্ভব হয়ে ধীরে ধীরে দেশের অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও প্রবেশ করলো। বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম ও এই সহজযান তন্ত্রসাধনা গ্রহণ করলো সহজে মুক্তির উপায় হিসাবে। পাল রাজাদের আমলে দেশে যে ধর্মীয় সমন্বয় ঘটেছিল, সেই কারণে মহাযানী তন্ত্রসাধনা সহজেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ঢুকে গেল। সারা বাংলায় যখন তন্ত্রসাধনার জোয়ার চলেছে, তখন হীনযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা কোন রকমে টিকে আছে বলা যায়। গৌড়, বঙ্গ ও মগধে হীনযানীরা কোনঠাসা হয়ে গেল এই সব তন্ত্রসাধনার দাপটে।

বুদ্ধকে সেই সময় বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে এক অবতারও বানানো হলো। দেখানো হলো, বুদ্ধ আসলে বেদ নিন্দুক অহিংসার অবতার। এই সব কারণে সেই সময় বহু বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আকৃষ্ট হলো। সেন রাজাদের কোপ থেকে বাঁচাতে তখন এই দেশের বৌদ্ধদের হয়তো সেটার দরকারও ছিল। এই সময় বহু বৌদ্ধরা সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করল। ঘোষ, বসু, মিত্র, পাল, পালিত, রক্ষিত প্রভৃতি পদবীধারীরা একসময় বৌদ্ধই ছিলেন। তাঁরা পরে সনাতন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে সেন ও বর্মন রাজাদে রাজাদের ও বহিরাগত ব্রাহ্মণদের কোপ থেকে নিজেদে রক্ষা করেন। ঘোষ বসু, মিত্র, পাল, পালিত, রক্ষিত প্রভৃতি ছিল বৌদ্ধদের নামে শেষ ভাগ। পরে পদবীতে পরিণত হয়। এই পদবীধারীরা ভুলে গেছেন যে এদের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন বৌদ্ধ। বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। সুতরাং শুধুমাত্র তুর্কী হানাদারের জেহাদী খড়্গ নয়, বাংলার বৌদ্ধদের উপর কর্ণাটিক ও কলিঙ্গ ব্রাহ্মণদের চরম বিদ্বেষও এক সময় মার রূপে দেখা দিয়েছিল। তার উপর ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে ধর্মের অবক্ষয়। বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

তন্ত্রসাধনার প্রজ্ঞা ও উপায় বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনায় হলো রাধা ও কৃষ্ণ। এই রাধা কৃষ্ণের মিলনের ভিত্তিতে বৌদ্ধ সহজযান সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় পরিণত হলো।

বৈষ্ণবদের সহজিয়া সাধনা একসময় বাউলদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। সাধন পদ্ধতিতে বৌদ্ধ সহজযান, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা আর বাউল সাধনা সবই এক রকম। এই তিনটির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার প্রজ্ঞা ও উপায় বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনায় হলো রাধা ও কৃষ্ণ ও শাক্ত তন্ত্রসাধনায় তা হলো শিব ও শক্তি। নাথ সিদ্ধাদের কাছেও বৌদ্ধ প্রজ্ঞা ও উপায়, শিব ও শক্তিতে রূপ নিল। এই প্রজ্ঞা ও উপায়, আর শিব ও শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা হলো শূন্যতার জ্ঞানে উপনীত হওয়া। কুলকুন্ডলিনী জাগ্রত করে উর্দ্ধে তোলাই হচ্ছে উপায় বা পুরুষ। আর মহাসুখ স্থান হচ্ছে শূন্যতার জ্ঞান বা প্রকৃতি।

এই শূন্যতার জ্ঞানকে প্রজ্ঞা বলা হলো। উপায় (পুরুষ) যখন প্রজ্ঞার (প্রকৃতি) সাথে মিলিত হলো, তখন উপলব্ধি হলো শূন্যতার মহাজ্ঞান। এটা হলো বোধিচিত্তের শূন্যতা ও করুণার মিলিত অবস্থা। উপায়কে করুণাও বলা হয় বৌদ্ধ তন্ত্রে। উপায় ও প্রজ্ঞা বা পুরুষ ও প্রকৃতির (নারীর) মিলনেই পরম সুখকর অবস্থার প্রাপ্তি। তন্ত্রে মূর্তি পূজা নাই। কিন্তু সাধক কল্পনায় যা দেখলো তাই একসময় মূর্তিতে রূপ পেল ও তাদের পূজা শুরু হয়ে গেল। বলা যায়, তন্ত্রসাধনা পূজার মাধ্যমে নতুন মোড় নিল। তান্ত্রিক মতেই দেব-দেবীর পূজা শুরু হলো সারা দেশে। সাধনা আরাধনায় পরিণত হলো। এই পূজার জন্যেই দশমহাবিদ্যার নানা মূর্তি প্রকাশ পেল। দশ মহাবিদ্যায় দশটি দেবী রয়েছেন-কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধুমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী ও কমলা। তন্ত্রে এদের চেহারার বর্ণনা রয়েছে।[১৩৫] পাল যুগে দেশে সর্বধর্মের যে সংহতি দেখা দিয়েছিল সেটা কর্ণাটকী ব্রাহ্মণরা সেন যুগে নস্যাৎ করে দিল। তারা নানা পুরাণ ও উপাখ্যান তৈরী করে দেশের সমস্ত দেব-দেবীদের ও তাদের পীঠস্থান গুলোকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে টেনে আনল। মহাযানী সহজযান সাধনার উদ্ভবে বৌদ্ধ ধর্মে'র চরম অবনতি দেখা দিল। কোণঠাসা হীনযানীরা তাই এবার ধর্ম থেকে তন্ত্র সাধনাকে দূর করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

এসব নানা কারণে মাহযানী সহজযান সাধনা একসময় এই দেশ থেকে প্রায় বিলোপ হলো। তবে মহাযানীরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগীদের মধ্যে পূজা, নানা পার্বণ পালন, আর তাদের কিছু বিধি বিধানের প্রচলন করে গেলেন। বৌদ্ধ ধর্ম সেই কারণে এই দেশে তার স্বীকীয়তা হারালো। হীনযানী ভিক্ষুদের মধ্যেও কিছু কিছু মহাযানী আদর্শ ঢুকে গেল। শ্রাদ্ধ, ব্রত অঢেল দান, দক্ষিণা, নানা উৎসব, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা, মৃতের সৎকারে মন্ত্রপাঠ, শান্তির জল বিতরণ, মঙ্গলসূত্র হাতে বা গলায় বাঁধা, পূজা, প্রদীব জ্বালানো ইত্যাদি নানা অবৌদ্ধ রীতি হীনযানী ভিক্ষুরা ও বৌদ্ধরা বুদ্ধের ধর্ম বলে মেনে নিলেন। বুদ্ধের প্রদত্ত নৈতিকতা, বিদ্বেষহীনতা, লোভহীনতা প্রভৃতি শুধু মাত্র সূত্রের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধপূজায় উচ্চারিত হলো বটে, তবে কেউ তা

Dhaka University Institutional Repository

সঠিকভাবে মানলো না। সেগুলো পূজায় উচ্চারিত মন্ত্রের মতো পূজার উপচার হিসাবেই রয়ে গেল। ধর্মের এই অবক্ষয় আজও চলেছে এই দেশে। আজ আর শুধু হীনযানী বলে কেউ নেই এই দেশে।

বৌদ্ধ সহজযান সাধনা দশম শতাব্দীতে নিভে গেলেও তখনো বেশ কিছু বৌদ্ধ সহজযান সিদ্ধাচার্যরা এই দেশে ছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন বাঙ্গালী ও এই দেশের অধিবাসী। তার কিন্তু তন্ত্রসাধনা ত্যাগ করলেন না। বৌদ্ধ বিহার থেকে সরে গিয়ে অতি সঙ্গোপনে তাঁরা সহজযান সাধনা চালিয়ে গেলেন। তাঁরা হলেন, চাটিল, কামলি, কঙ্কণ, ডোম্বি, বড়ুয়া, শবর, কুক্কুরিপাদ, অদ্বয়বজ্র নাগার্জুন, তৈলপাদ, কুমারচন্দ্র, অবধূতপাদ ও নড়োপাদ। তাঁরা সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ঠাঁই পেয়ে, ধর্মের নামে সহজযান সাধনা চালিয়ে গেলেন। এই সব সিদ্ধাচার্য ছাড়া আবার কিছু কবিও ছিলেন যাঁরা কবিও ছিলেন যাঁরা সহজযান ও বজ্রযান সাধনার কথা তাঁদের কবিতার মাধ্যমে প্রচার করতেন। তাঁরা হলেন, সরহপাদ, লুইপাদ, শবরপাদ কাহ্নপাদ, ভুসুকু, শান্তি প্রভৃতি। এই সব প্রাচীন কবিরা সান্ধ্য ভাষার মাধ্যমে কবিতা লিখে তন্ত্রসাধনার কথা বলতেন। সান্ধ্য ভাষা হলো দ্বর্থক ভাষা। আসলে কী বলতে চাইছে সেই মূল কথাটি সাদা মাঠা কথার আড়ালে রাখা হতো সান্ধথ্যাভাষার কবিতায়। চর্যা গীতিকোষ গ্রন্থে এ সব কবিদের সান্ধ্যভাষায় রচিত কবিতা রয়েছে।

১৯০৭ সালে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তালপাতার এই পুঁতিটি আবিষ্কার করেন নেপালের এক প্রাচীন গ্রন্থাগারে। এই পুঁথিটির সঙ্গে ছিল মুনিদত্ত নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিতের টিকা। এই টিকার সাহায্যে পুঁথিটির পাঠোদ্বার সম্ভব হয়। গ্রন্থটি হচ্ছে তৎকালীন নানা বাঙ্গালী কবির কবিতার সংকলন। এই চর্যাগীতিকোষ গ্রন্থটি হচ্ছে প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে প্রাচী কবিতাগুলোর সংকলন। এই গ্রন্থটি সংকলিত হয় আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

৩.৭ প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিবর্তন : ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতা

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কখন উদ্ভব ও প্রচার প্রসার লাভ করে এ বিষয়ে পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও গবেষক মহলে নানা মত রয়েছে। সুদীর্ঘ কাল পরেও প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবির্বতন সঠিক ভাবে বলা কঠিন।

বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থল প্রাচীন ভারতবর্ষের বুদ্ধগয়া বা মগধ। প্রাচীন বাংলা ছিল এর সন্নিকটবর্তী জনপদ। সে কারণে গৌতম বুদ্ধের জীবিত কালে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল এরূপ সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আকর গ্রন্থ পবিত্র ত্রিপিটকের পালি সাহিত্য এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম (সদ্ধর্ম) প্রচার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সঠিক তথ্য পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায়না। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর যে সমস্ত দেশ বুদ্ধের পবিত্র ধাতু বা দেহ ভস্মের অংশ লাভ করেছিল তাদের মধ্যে বঙ্গ বা বাংলাদেশের উল্লেখ দেখা যায় না।[১৩৬]

বুদ্ধের দাহক্রিয়া উৎসবেও বাংলার কোন ভিক্ষু গৃহী উপস্থিত ছিল বলে সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন উল্লেখ নেই। সিংহলী কিংবদন্তী Mahavamsa, Ch. Vii, Dipavamsa, Ch. ix এতে উল্লেখ আছে-

'একো লঙ্কং অনুপত্তো সত্তমচ্ছা-- সতানুগো

পতিঠ্ঠিত দেবিন্দ লঙ্কাযংমম সাসনং চ

তস্মা সপরিবারং তংরক্খ লংকা চ সাধুকং।

তথাগতসস্ দেবিদো বচো সুত্বা বিসাবদো,

দেবস্স উপ্পলাবণ্ণালস্স লঙ্কারক্থং সমপ্পয়িং।'

অনুসারে বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় (Lalha) দেশের রাজপুত্র বিজয়সিংহ বুদ্ধ পরিনির্বাণের দিনেই স সৈন্যে লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ করেছিলেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণের পূর্বমুহূর্তেই তথায় উপস্থিত দেবরাজ ইন্দ্রকে নির্দেশ দেন, লঙ্কাদ্বীপে বাঙ্গালার রাজকুমার বিজয়সিংহকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি ইহাও বলেন যে, বিজয় সিংহের দ্বারা তাঁর নবধর্ম লঙ্কায় প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। কথিত আছে, দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের নির্দেশ অনুসারে রাজকুমার বিজয় সিংহকে যথাযথ মর্যাদার সাথে লঙ্কাদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎপলবর্ণ দেবপুত্রকে ভারাপর্ণ করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে দেবপুত্র কি প্রকারে বিজয় সিংহকে রক্ষা করেছিলেন তা বিস্তৃতিভাবে মহাবংশে উল্লেখ আছে। (Mahavamsa, Ch.V.11)

কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাতে একমত নয়। মানচিত্রে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, আরাকান, প্রাগজ্যোতিষপুর প্রভৃতি সমসুত্রেই গাথা। ব্রহ্ম ও আরাকানের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তিব্বত দেশের পূর্ব প্রান্ত হতে কতিপয় জাতি ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় ব্রহ্মদেশে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। অনেকের মতে, মগধ দেশ হতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচারকগণ এসে পূর্ব দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। ব্রহ্মার ইতিহাস মহারাজোয়াং ও আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াং মতে, প্রাগজ্যোতিষপুর ও ব্রহ্মরাজের অর্ন্তগত প্রদেশ সকল পুরাকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রাজগণ রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

1. In very early times tribes moved down from eastern. Tibet along the valley of the brahmaputra into Assam and Burma and their descendants became the china, Kami and Burmese.[137]

2. A second immigration of Indians from the North West. A king mamed Daza-raza entered Burma and settled in Mauriya.

3. (a) All that can with certainly be said of the early History is that the Tribes which called themselves pyu. Kanran and that were ruled by kings from India, Who gave them some degree of civilization: ... The kings of upper Burma crossed from India by land through Bengal and Manipur. (Ibid, Burma History P-13)

   (b) In very early times a king from kapilavastu in Oude, the home of Buddha, was forced by dissension's with neighboring chiefs to leave his country and came with and army into Burma, (Ibid, Burma History, P-9)

ব্রহ্মার পুরাতন ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ স্বশিষ্যে হেলুইন নদীর তীর পর্যন্ত পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন।

নদীর পারস্থ লোকগণ তাঁর ধর্ম গ্রহণ না করে তাঁর প্রতি ঢিলা নিক্ষেপ করেন, সেই জন্য তাঁরা রক্ষেয়াং বা বিধর্মী বলে তাঁর শিষ্যগণ প্রচার করেন। গৌতমবুদ্ধ হেলুউইন নদীর তীর হতে চট্টগ্রাম (চন্দ্রনাথ) হস্তিগ্রাম (হাইদগাঁও) আম্রগ্রাম (আমতলি) হয়ে জলপথে তিনমাসে কুশীনগরে উপস্থিত হন এবং তথায় তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। (Ibid, Buddha had attained Nirvana more than sin centuries before this time, But the Arakanese place the date of Chandra Suriya's reign much it appear that the image was cost during the life time of Buddha and was an actual likeness, (Burma History, P-199).

প্রাচীনকাল থেকে হাইদগাঁও, রামু, চকরিয়া প্রভৃতি স্থানে বহুপুরাতন বৌদ্ধ চৈত্য ও বৌদ্ধ বাসিন্দা রয়েছে। এই সকল কারণে বাংলাদেশে বুদ্ধের আগমন ও ধর্মচক্র স্থাপনের বিষয় প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন মানব সভ্যতা চারটি স্থানের বৃহৎ নদীকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছিল তাই এই সব সভ্যতাকে নদীরমাতৃক সভ্যতা বলা হয়। প্রায় একই কালে (খ্রি. পূর্ব ৪০০০ থেকে ৩০০০ অব্দের ভেতর) মিশর, মধ্যপ্রাচ্য (মেসোপটেমিয়), ভারত ও চীন দেশের নীল নদ, তাইগ্রীস,

সিন্ধু ও হোয়াংহো চারটি নদীকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতা বিকাশ লাভ করে।[১৩৮] হিমবৎ বা হিমালয় থেকে দক্ষিণের সমুদ্র পর্যন্ত বেষ্টিক দেশকে বলা হয়েছে জম্বুদ্বীপ যেমন বলা হয়েছে অশোকের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গিরিলিপি নং ১ এ। জম্বুদ্বীপের পরিবর্তে ভারতকে প্রথম ভারতবর্ষ বলা হয়েছে খ্রিঃ পূর্ব প্রথম শতকের কলিঙ্গ রাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে। আরাকানে সিংহবংশীয় রাজাগণ রাজা ছিলেন।

কানরাজগজি আরাকান রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন কানরাজগজি ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। কানরাজগজি মৌরীয় বংশের এক কন্যার পানিগ্রহণ করেন। আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াং মতে ৬২ জন রাজা ক্রমাগত রাজত্ব করেন। এই বংশীয়গণেরই রাজত্ব কালে গৌতম বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যবহারে আরাকান পরিভ্রমণে এসেছিলেন। মহারাজোয়াং গ্রন্থ মতে, কানরাজগজির বংশধরগণ ১৪৬ খ্রিষ্টব্দে পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন। তারপর রাখাইংমুয়ের (রাখচাই) চন্দ্রসূর্য নামক জনৈক নৃপতি আরাকান রাজ্যের সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি এক বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৫০ খ্রিষ্টাব্দ), তাঁর সময়ে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম রূপে পরিগৃহীত হয় ও রাজ্যমধ্যে বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে।[১৩৯] উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে বুদ্ধ বাংলাদেশ তথা চট্টগ্রামে এসেছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস মতে, বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে খুব প্রাচীন কাল থেকেই বিস্তার লাভ করেছিল। 'সংযুক্ত নিকায়' অনুযায়ী স্বয়ং বুদ্ধ কিছুকাল পশ্চিম বঙ্গের শেতক নগরে বাস করেছিলেন।

এতেও উল্লেখিত হয়েছে যে, ধর্মপ্রচারার্থে বুদ্ধ ছয়মাস কাল 'পুন্ড্রবর্ধন দেশে বাস করেছিলেন। বাংলাদেশে বুদ্ধের আগমন ও বসবাস করা সম্বন্ধে উয়াং চুয়াং তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে এক কিংবদন্তি নিবন্ধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, বুদ্ধ তিনমাস পুন্ড্রবর্ধন এবং সাতদিন সমতটে এবং কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করেছিলেন। অধ্যাপক লিয়াং-চি-চ্যাও এর মতে তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে প্রায় ১৬৯ জন চৈনিক তীর্থযাত্রী (পরিব্রাজক) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁরা প্রত্যেকে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুঁথিপত্র অধ্যয়ন, আলোচনা ও অনুবাদ করেন।[১৪০] উল্লেখযোগ্য হলে চে-মেং (৪০৪ খ্রি.), ফা-হিয়েন (৪০০-৪১৪ খ্রি.) হিউয়েন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রি.), ইৎ-চিং(৬৭১-৬৯৫ খ্রি.), উ-খোং (৭৫১ খ্রি.) য়ুয়ান চুয়াঙ (৬৩৯ খ্রি.) হিউয়েন সাঙ-এর পর এবং ইৎ-সিং তাঁর ভারতে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে সমাগত ৬৫ জন চীনা পরিব্রাজকের ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে 'কাউ-ফা-কাঙ-সাং-চুয়েন' নামক বিখ্যাত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। (ফা-হিয়েনের দেখা ভারত, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মুখোপাধ্যায়, ফার্মা কেএলএম প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৮) এছাড়াও উয়াং চুয়াং সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত বহু স্তূপ সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণে দেখেছিলেন Divyavadana, Ch. xxiii P. 477, উদ্ধৃতি দিয়ে ড. সুনন্দা বড়ুয়ার, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান গ্রন্থে পৃষ্ঠা-৬৭ বলেন, খিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাঁচীতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত দুটি প্রত্নলিপি মতে, পুনবদনের (পুন্ড্রবর্ধনের) উপাসিকা ধমতা বা ধর্মদত্ত এবং উপাসক ঋষিনন্দন বা ইসিনন্দন কর্তৃক প্রদত্ত।

সাঁচীর এক দানানুশাসন থেকেও আমরা জানতে পারি যে ধর্মদত্ত ও ঋষিনন্দনা নামে পুন্ড্রদেশবাসী জনৈক পুরুষ ও মহিলা সাঁচী স্তূপের তোরণ ও বেষ্টনীর নির্মাণ কার্য সমাধার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থদান করেছিলেন। বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সাহিত্য থেকেও জানা যায় যে, ষোলজন বৌদ্ধ প্রাচীন মহাস্থবির গণের অন্যতম কালিকা নামধারী ভিক্ষু তাম্রলিপ্তির অধিবাসী ছিলেন।[১৪১] এসব প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের আমল থেকেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এমনকি বাংলাদেশে যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তার লাভ করে তখনও বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, পুন্ড্রবর্ধন, সুহ্ম, তাম্রলিপিতে প্রভৃতি ভৌগোলিক অঞ্চলের উল্লেখ আছে। মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে 'বঙ্গকে' একটি সমুদ্রবন্দর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। সিংহলী ভিক্ষুরাই এদেশে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। খিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের রচিত মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাগজুর্নীকোন্ডা শিলালিপি থেকে সুনিশ্চিত রূপে জানা যায় যে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।[১৪২] একথা প্রতিধ্বনি করে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, আশোকের পূর্বেই বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। (বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৬)

গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, গঙ্গারিই (Gangaridai) রাজ্যটির সমৃদ্ধি ও শক্তি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। নাগাজুনীকোন্ডা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বাংলা থেকে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য মিশন পাঠানো হতো। কুষাণ আমলের কিছু কিছু মুদ্রা বাংলাদেশে অবিস্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত মুদ্রার মধ্যে মহাস্থানের ধ্বংস স্তূপে কনিষ্কের মূর্তি সঙ্কলিত একটি স্বর্ণ মুদ্রাও রয়েছে।

চৌদ্দ-পনেরো শতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধেরাও যখন আত্মপরিচয় বিস্মৃত, যখন ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, বাউলপন্থী সহজপন্থীরা নিজেদের হিন্দু সমাজভূক্ত বলেই জানে ও মানে, সে সময় বৃহৎ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠিলীন হতে থাকে। বাংলার প্রাচীন জনপদ, দেশ, কাল ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জাতিসত্তার পরিচয় এবং প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে। সাহিত্য রচনা ও অনুধাবনে সাহিত্যের শাস্ত্রীক ভাব উপাদান, সংস্কার ও দেশকাল-সমাজ আর্থিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। প্রাচীন সমাজ কাঠামো, উন্নয়ন, বিবর্তন পরিবেশ ও পরিবর্তন ইতিহাস সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সর্বাগ্রে দেশ জাতি ও

Dhaka University Institutional Repository

কালের সন্ধান সবিস্তারে, ইতিহাস প্রতিভাত করবো। সে কারণে/আলোচনা নৃতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক প্রাচীন সাহিত্য ও উপাদানকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

বঙ্গ শব্দের এক অর্থ কার্পাস তুলা। ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে সে জনগোষ্ঠীকে বাঙালি এবং যে ভূখণ্ডকে বাঙলা বা বাংলাদেশ বলা হয় তা আধুনিক কালের। প্রাচীন কালে এই দেশে একক নামের ও অভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটি ভাবে গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও পুণ্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের পূর্বেই গৌড়, পুণ্ড্র, বঙ্গা, রাঢ়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। ঐতরেয় আরণ্যক (আনু. খ্রী.পূর্ব.ষষ্ঠ শতক) গ্রন্থে বঙ্গ এবং প্রাচীনতর সংস্কৃত রচনায় এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পতঞ্জলির ভাষ্যে গৌড়াঃ, বাঢ়াঃ, পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি গোত্রীর সমাজের উল্লেখ পাই। মানসোল্লাসে 'গৌড় বঙ্গাল' নামের উল্লেখ আছে। হাজার বছরের পুরানো চর্যাগীতিতে বাঙ্গালী, বঙ্গাল দেশ এর উল্লেখ রয়েছে। (বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) আহমদ শরীফ, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১) পাণিনির (খ্রী. ৫ম/৭ম শতক) অষ্টাধ্যায়ী এবং রাজতরঙ্গিনীতে গৌড় নাম রয়েছে। আবার পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যায়নত অঙ্গাঃ, বঙ্গঃ, সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ এর উল্লেখ করেছেন। বোধায়ন ধর্মসূত্রেও (১/২/১৪) পুণ্ডের ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। পুরাণে পূর্বাঞ্চলের দেশ হিসেবে অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গও উল্লেখিত।[১৪৩] আচারাঙ্গ সূত্র নামক জৈন গ্রন্থে সুহ্মের নাম আছে রাঢ়, বজ্রভূমি, পুণ্ড, তাম্রলিপ্তি ও কোটিবর্ষ প্রভৃতির নাম আছে। রামায়ণে বঙ্গ, মহাভারতে বঙ্গ, পুণ্ড, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তির এবং তারও আগে বন্দর Portalis বা পরস্থলী (সম্ভবত নদীয়ার কাছে) উল্লেখ পাই রোমান ঐতিহাসিক Plini-র লেখায়।

পবিত্র ত্রিপিটকে বিনয় পিটকের মহাবর্গে রাঢ়, সংযুক্ত নিকায় ও মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে বঙ্গ এবং দিব্যাবদানে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। ললিত বিস্তরে ও মহাবস্তুতে বঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে। খ্রিষ্টীয় ৬০০ অব্দে বঙ্গ ও গৌড়ের উত্থান হয়। কালিদাসের রঘুবংশে দেখা যায় রঘু সুহ্ম জয় করেই বঙ্গ জয় করেন। রক্ত সংকর বাঙালির স্বভাব চরিত্র যেমন অনন্য, তাদের কৃতি কীর্তিও বিচিত্র। প্রমাণে অনুমানে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বয়ং এবং জৈন ও বৌদ্ধ শ্রাবক শ্রমণ ভিক্ষুরাই প্রথম গৌড় রাঢ়ে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য আগমন করেন। জৈন-বৌদ্ধ শ্রাবক-শ্রমণ ভিক্ষুর মাধ্যমেই উত্তর ভারতের শাস্ত্র, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সমাজ-শাসন, অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি জীবন পদ্ধতির ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সঙ্গে এ দেশীয়দের পরিচয় ঘটে। এভাবে এদের জীবন জীবিকার আর্যায়ন সম্ভব হয়। মৌর্য আমলে এ আর্যায়ন গৌড়ে, রাঢ়ে, পুণ্ড্রে সীমিত ছিল। গুপ্ত যুগে তা কলিঙ্গ সুহ্মে বঙ্গে সমতটে ও প্রাগজ্যোতিষপুরে তথা আধুনিক উড়িষ্যায় বাঙলার আসাম অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল। বৌদ্ধ চর্যাপদে

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গাল, বাঙ্গালী নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবন বতুতার বৃত্তান্তে বঙ্গা এর পরিবর্তে 'বাঙ্গালা' ব্যবহৃত হয়েছে। তুর্কী আমলে বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, বরেন্দ্র আলাদাভাবে চিহ্নিত হত।

মোটামুটি ভাবে গৌড়-রাজশাহী, মালদহ, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ; রাঢ়-বর্ধমান বিভাগ; সুহ্ম-ময়মনসিংহ, পাবনা; সমতট-কুমিল্লা, নোয়াখালী; হরিকেল-চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা; বঙ্গাল-চন্দ্রদ্বীপ, সন্দ্বীপ আর তাম্রলিপ্তি তমলুক। উনিশ শতক অবধি গৌড় ও বঙ্গ নামে দুটো বৃহৎ অঞ্চল। তুর্কীপূর্ব কালে গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, পুণ্ড্র, বগুড়া থেকে মিথিলা অবধি, বরেন্দ্র বঙ্গ ও কামরূপ (আসাম) নামে পরিচিত বিভিন্ন অঞ্চল। সুতরাং আজকের সংকর বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে বিদেশী-বিজাতি বিভাষীর শাস্ত্র-সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনচর্যা গ্রহণ করেই। কাজেই তার নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অন্যরকম হলেও তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি প্রসূত। পুণ্ড্রা, রাঢ়, বঙ্গা, সুহ্মা ছিল ভৌগোলিক বাংলাদেশে প্রধান। বল্লাল সেনের রাজ্য পাচঁটি ভূক্তিতে বিভক্ত ছিল- বঙ্গ, বরেন্দ্র, মিথিলা, রাঢ় ও বাগড়ী।[১৪৪] প্রাচীন কালে বাংলায় কোন মুসলমান ছিল না। মধ্যযুগে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের অর্ধেক লোক কেন মুসলমান হয়ে গেল, তা বুঝতে হলে তখন আমাদের দেশ ও দেশবাসীর অবস্থা কেমন ছিল, সেটা জানতে হবে। প্রাচীন কালে সমগ্র বাংলা কোন নির্দিষ্ট নামে পরিচিত ছিল না। কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জাতি বা সেখানে উৎপন্ন কোন দ্রব্যের নামানুসারে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি হয়েছিল। যেমন-পুন্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, দণ্ডভূক্তি, বাকেরগঞ্জ, বঙ্গ, গঙ্গে, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি।

প্রাচীন কালে জৈন-বৌদ্ধ শ্রাবক শ্রমণ ভিক্ষুরা প্রথম গৌড়ে-রাঢ়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করে। বৌদ্ধ শ্রমণ-ভিক্ষুর মাধ্যমেই বাংলা ও উত্তর ভারতের শাস্ত্র-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাজ-শাসন, অন্ন-বস্ত্র জীবন পদ্ধতির ও সভ্যতার সর্বপ্রকার আয়োজনের সঙ্গে এ দেশীয় পরিচয় ঘটে।[১৪৫] প্রাচীন গৌড় জাতি কোথায় বাস করতো এবং গৌড়রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল এগিয়ে নানা প্রশ্ন ও বির্তক। আধুনিক কালে কেউ কেউ সমগ্রবাংলা অর্থে গৌড়নাম ব্যবহার করেন। কবিবর মধুসূধন বাঙালিদের দেশকেই গৌড় বলেছেন। কিন্তু প্রথমে গৌড় অবশ্যই একটি নগর ও ক্ষুদ্র জনপদের নাম ছিল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির কৃত বৃহৎ সংহিতায় (১৪/৫-৮) পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ ভারতস্থিত বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সমতট, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, লৌহিত্য, গৌড়ক, পৌণ্ড্র, উৎকল তাম্রলিপ্তিক এবং বর্ধমানের উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রসার, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থে মগধ, বরেন্দ্রী, গৌড়, রাঢ়ক, বর্ধমান, তমোলিপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ এর নাম আছে।[১৪৬] সুদূর অতীতে পূর্ব ভারতে কোনো একভাষিক রাষ্ট্রসত্ত্বা বা একভাষিক জাতিসত্তা ছিল না। এমন কি বর্তমান কালের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলের মত একটি বিশেষ নামে পরিচিত কোনো নিরবচ্ছিন্ন ভৌগোলিক এলাকাও

Dhaka University Institutional Repository

ছিলনা। এখানে ছিল কতকগুলো খণ্ড খণ্ড জনপদ এবং অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিববর্তী চীনা ভাষা-ভাষী বহু কোম বা কৌম বা বিভিন্ন নরগোষ্ঠির লোকজন। এই লোকগোষ্ঠিগুলির সঙ্গে এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংস্পর্শ, সংঘাত ও সংমিশ্রণ ঘটেছিল ইন্দো আর্যভাষী জনগোষ্ঠির। বাংলা বা বাঙলা নামে এখনো কোন অঞ্চল অভিহিত হয়নি। এ অঞ্চল বা জনপদগুলোর ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক সীমা নির্দেশ করা কঠিন।[১৪৭] জনপদগুলো হলো বঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল। আদিতে বঙ্গ অঞ্চলের সীমানা ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র কিন্তু পাল ও সেন আমলে বঙ্গের সীমা ক্ষুদ্র হয়ে যায়। সেকালে বঙ্গ গড়ে উঠেছিল বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর এবং খুব সম্ভব খুলনা ও বরিশালের অংশগুলি নিয়ে। শিলালিপিতে বঙ্গর দুটি অংশের নাম বিক্রমপুর ও নাব্য (বরিশাল ও ফরিদপুরের নিম্নভূমি) রূপে উল্লেখিত হয়েছে।

হুগলি-ভাগীরথীর উভয় তীরের অঞ্চল পরিচিত হয়েছিল রাঢ় নামে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ ও যশোরের বিভিন্ন অংশ অভিহিত হয়েছিল গৌড় রূপে। গঙ্গা ও যুমনার মধ্যবর্তী অঞ্চলা, অর্থাৎ বগুড়া রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলকে বলা হত বরেন্দ্র (পুণ্ড্র বা প্রৌণ্ড্রবর্ধন)। কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট নিয়ে গঠিত হয়েছিল সমতট-হরিকেল। সুরমা মেঘনার পূর্বে অবস্থিত শ্রীহট্ট-কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ছিল সমতটের অন্তর্ভূক্ত। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে এ অঞ্চলের উল্লেখ সমুদ্রতীরবর্তী আর্দ্র অঞ্চলরূপে বর্ণনা করেছেন। ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দের একটি তাম্রশাসনের 'ত্রিপুরা' জেলা সমতট অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। এই প্রশাসনিক এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলি তাম্রলেখের সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করে মরিসন বলেছেন যে, এই বদ্বীপ এলাকার আদি লোকজন ছিল অস্ট্রো-এশীয়, তিব্বতী বর্মণ, দ্রাবিড় ও ইন্দো আর্য ভাষা-ভাষী এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিভিন্ন লোকগোষ্ঠি তিনি আরো বলেন-

মোগল ও ব্রিটিশ আমলে বাঙালিগণ তাদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশের সুযোগ পেল, সাহিত্য, ভাস্কর্য, বিদ্যাচর্চা, ও চারুকারু শিল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক অবদান রাখল। আত্মপ্রকাশের এই ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই এই বদ্বীপ অঞ্চলের লোকজন বাঙালি হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করল, আত্ম পরিচয়ের ধারণাও লাভ করল। মরিসনের ধারণা, মোগল আমল, বিশেষ করে ব্রিটিশ আমল বাঙালির আঞ্চলিক চেতনার বা জাতীয় চেতনার উন্মেষকাল ব্রিটিশ আমলকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি উনিশ শতককে বাঙালি রেনেসাঁস যুগ বলে ইঙ্গিত করেছেন। ভৌগোলিক কারণে আরাকান বর্মা, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র সুদৃঢ় ছিল। ইতিহাস মতে, দেব পর্বত ও ময়নামতি লালমাহ অঞ্চলের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চট্টগ্রামের সঙ্গে এবং আরাকানগামী রাস্তার উপর অবস্থিত কক্সবাজারে নিকটবর্তী রামুর সঙ্গে একটি স্থলপথ ধরেও যোগাযোগ রক্ষা করত। চৌদ্দ শতকের ফকরুদ্দীন মুবারহ শাহ কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত উঁচু রাস্তার এই রাস্তা হয়ত সমান্তরাল, নয়ত অভিন্ন ছিল। ('ফখরুদ্দীনের পথ', নামে পরিচিত এই পথের চিহ্ন এখনো আছে। এই পথ ডেমরা-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল। Bangladesh Historical studies, II, 21, 23-মতে, চট্টগ্রাম এবং রামু, অথবা আরো যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলতে গেলে দিয়াং, যার প্রাচীনত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যক উপকরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

গৌড়কে বাংলাদেশেরই বহু জনপদ হতে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। যেমন- সুহ্ম (রাঢ়), বর্ধমান, তাম্রলিপ্ত (মোদিনীপুর), বঙ্গ, উপবঙ্গ (যশোর অঞ্চল) সমতট (কুমিল্লা অঞ্চল), পৌণ্ড্র (বরেন্দ্রী) ইত্যাদি। যা হোক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর কারণে অনেক সময়ে ভৌগোলিক সংজ্ঞার অর্থ বিস্তার ঘটে থাকে। পাল ও সেন রাজগণ অনেক ক্ষেত্রে রাজধানীর নাম থেকে গৌড়েশ্বর ইন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে (৯২৬ খ্রিঃ) 'পঞ্চগৌড়' নাম আছে। দ্বাদশ শতকে রচিত কলহনের রাজতরঙ্গিনীতেও পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ আছে। অষ্টম নবম শতাব্দীর বাঙালি রাজা ধর্মপাল আর্যাবর্তে কিছু কালের জন্য গৌড়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কেউ কেউ রাঢ়, বরেন্দ্র বাগড়ি, বঙ্গ এবং মিথিলাকে পঞ্চগোড় বলেছেন। (প্রাগুক্ত, সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২)। পাল রাজাদের রামাবর্তী ও সেনরাজাদের লক্ষ্মণাবর্তী নামক নগারীদ্বয় গৌড়ের সন্নিকর্টে অবস্থিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে (৬/২/৯৯-১০০) গৌড় নামক একটি নগরের এবং অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্র গ্রন্থে গৌড়ের নাম আছে। ভবিষ্য পুরাণে গৌড়ের ভৌগোলিক বিবরণ আছে, পদ্মানদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমান অঞ্চলের উত্তরে প্রাচীন গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল। পাল-সেন যুগে পদ্মা নদী গৌর অঞ্চলের উত্তর দিকে প্রবাহিত হত। মুসলমান ঐতিহাসিক গৌড়কে লখনৌতী (লক্ষ্মণাবর্তী) বলেছেন এবং রামাবর্তী এর অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (৩য় স্বর্গ) হতে মনে হয়, রামাবর্তী বরেন্দ্রীদেশে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তী কোনো স্থানে অবস্থিত ছিল। তবে নগরটি গৌড়ের কাছে ছিল। প্রাচীন গৌড় বাসীরা তাম্রলিপ্তি (তমলুক) বন্দর হতে পূর্ব দেশে যাত্রা করতেন। তাম্র লিপ্তি সে যুগে বাংলাদেশের সর্ব প্রধান বন্দরের নাম ছিল। ফহিয়েন এই বন্দর থেকে সিংহল ও যবদ্বীপ গিয়েছিলেন। সেকালে রাজপুত্র বিজয় রাঢ়দেশ (গৌড়দেশ)থেকে সিংহল গিয়েছিলেন (মহাবংস ও দীপবংস), পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি সংস্কৃত অভিলেখ মতে, বৌদ্ধ মহা নাবিক বুদ্ধগুপ্ত বাঙালি এবং গৌড়দেশের রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়দেশে শশাঙ্ক রাজা ছিলেন। বানভট্টের হর্ষচরিত এ তাঁকে গৌড়েশ্বর বলা হয়েছে। কিন্তু চীন দেশীয় পরিব্রাজক ভিক্ষু হিউ এন সাঙ তাঁর রাজ্য এবং রাজধানীকে কর্ণসুবর্ণ বলেছেন। কর্ণসুবর্ণ নগরের প্রান্তে রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) বিহার অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান ঐতিহাসিকরা বাংলাকে গৌড়-বঙ্গাল নামে উল্লেখ করেছেন। পরে অবশ্য বঙ্গাল নামেই সমগ্র বাংলা বুঝতেন। মুলত বঙ্গদেশটি ছিল বঙ্গোপসাগর হতে উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এবং গৌড়দেশের বিস্তার ছিল পশ্চিম দিকে বর্তমান উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর পর্যন্ত। মোটামুটি বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় এবং মালদেহের দক্ষিণাংশে প্রাচীন গৌড়রাজ্য অবস্থিত ছিল।

প্রাচীন জৈন এবং সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের সাক্ষাৎ থেকে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়ে রাঢ় দেশে (সুহ্ম) পথশূন্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং দেশের অধিবাসীরাও ভদ্র ও সুসভ্য ছিল না। কারণ জৈন তীর্থঙ্কর বর্তমান মহাবীর যখন রাঢ়দেশে ধর্ম প্রচার বা পর্যটন করেছিলেন, তখন দেশবাসীরা ঐ সৈন্ন্যাসির প্রতি চু-চু শব্দ কুকুব লেলিয়ে দিচ্ছিল। জৈন সন্ন্যাসীদের নিম্নমানের খাবার দেয়া হতা আবার কুকুর ঠেকাবার জন্য তাঁরা একটি লাঠি সাথে রাখত।[১৪৮] পশ্চিম বঙ্গ পুরাতত্ত্ব বিভাগ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বাসস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও উৎখনন কার্য করেন। উৎখননের কালে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে সকল পুরাবস্তু আবিস্কৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে রাঢ় দেশের ঐ অঞ্চলটির অধিবাসীরা অসভ্য ছিলনা বরং উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। এখানে তাম্রপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি (খ্রিষ্টাপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে কয়েক শতক পূর্ববর্তী এরং এর অন্তবর্তী সময়ের) আবিষ্কার হয়েছে।[১৪৯] খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতকে গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ কর্ণসুবর্ণ নগরের উপান্তস্থিত লো-তো-মো-চি অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকা (রাঙামাটি) বিহারের উল্লেখ করেছেন। উৎখননের ফলে রক্তমৃত্তিকা বিহার এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংঘের একটি সীলমোহর আবিস্কৃত হয়।[১৫০] 'সেন বংশীর শেষ রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্ব কালে (আঃ ১১৭৯-১২০৬খ্রি.) তুর্কীসেনানী ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী রাঢ় ও বরেন্দ্র অঞ্চল অধিকার করেন। গৌড় নগর অধিকার করে তিনি সুলতান মুহম্মদ ঘুরী অর্থাৎ মুইজ উদ্দীন মুহম্মদ বিন সামে নামে 'গৌড় বিজয়' জ্ঞাপক টঙ্ক (স্বর্ণমুদ্রা) ৬০১ হিজরী, ১২০৫ খ্রি. ১০ মে প্রচার করে ছিলেন।'

নৃতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়ায় বহুমুখিতা, আর্থসামাজিক ও ধর্মীর বিভিন্নতার কারণে বঙ্গের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতির বিভাজন প্রক্রিয়ায় অধিক প্রভাবিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। সংস্কৃতির সমন্বয় এবং সংস্কৃতির বিভাজনও উভয়ই প্রকট ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সুদূর অতীত কাল থেকে বঙ্গের জনগণ একটি জাতিসত্তায় বিকশিত হয়েছে। এক সময় রাঢ়, বঙ্গ, মিথিলা , বরিন্দা ও বাগদি (বাগড়ী) এই পাঁচ ভাগে বঙ্গ বিভক্ত ছিল। বরীন্দ্র নাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বাংলাদেশের ইতিহাস খন্ডতার ইতিহাস। (পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র) বাংলার ইতিহাসের আদিপর্বে, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও বাঙালির জীবন-জীবিকা, সভ্যতা,

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রধানত গ্রামভিত্তি ও গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত। 'বাঙালি জীবনে সামাজিক আচরণ, জীবন দর্শন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিচিন্তা, ধর্মবোধ দ্বারা সকল যুগে প্রবলভাবে প্রভাবিত দেখা যায়। অঙ্গ, বঙ্গ সুহ্ম, পুণ্ড্র, রাঢ়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি সপ্ত গৌরেশ্বর বজ্রচানী বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমালে ব্রাহ্মণবাদী বর্ণাশ্রমী-সমাজ-সংস্কৃতির মূল কাঠামোটি বাংলার জনসমাজ ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে।'[১৫১] ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির লোক বাস করে। তাই জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য ঐতিহাসিক স্মিথ ভারত উপমহাদেশকে নৃতত্ত্বের জাদুঘর বলে আখ্যায়িত করেছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। তেমনিভাবে বাংলাদেশেও প্রাচীন কাল থেকে জাতিগোষ্ঠির নানা বৈচিত্র্য ও বসবাসের ফলে নৃতত্ত্বের বৈচিত্র্যতা বিদ্যমান। নৃবিজ্ঞানীদের মতে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, হোমো আলপিনাস, ইন্দোআর্য প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক উপাদান গিয়ে বাংলার নরগোষ্ঠী গঠিত।

সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা অতিপ্রাচীন সভ্যতা পণ্ডিতদের অভিমত সিন্ধুলিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হয়েছে। ভারতীয় বর্ণমালার উৎপত্তি প্রাগার্য উৎস থেকে হয়েছে। আর বাংলা লিপির উদ্ভব হয় ......। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা একটি জটিল সুদীর্ঘ ও বিস্তারিত বিষয়। অধিকাংশ বিষয়ই প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও অসঙ্গতিপূর্ণ সমকালীন সাহিত্যকর্ম, ধর্মীয় গ্রন্থ, ইতিহাস এবং অন্যান্য উৎসের বিশ্লেষণ ভিত্তিক ধারণা নির্ভর। প্রাচীন কাল থেকে অবস্থিত প্রত্নবস্তু, বিভিন্ন সাহিত্য, ইতিহাস ও লেখমালার উৎস, তথ্য ও উপাত্তের দ্বারা বৌদ্ধ ইতিহাস নির্ভর করবে। এর দ্বারা বৌদ্ধ ইতিহাস রচনা কিংবা পুর্নগঠন সহায়ক হবে। ইতিহাস সাক্ষ্যবহন করে যে, আদি যুগে ভারত উপমহাদেশে অর্নাযদের বসবাস ছিল। অনার্যদের ভাষা ছিল কিন্তু চর্চা ও সাহিত্যরূপ পায়নি। পুরাকালে আর্যগণ বৈদিক ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্যের ভাষা ধর্ম ও শিল্পকলায় ব্যবহৃত হয়েছে।[১৫২] বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম এবং বৌদ্ধরা এদেশের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী। বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রথম নির্বাচিত নেতা ছিলেন পাল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল। তিনি বৌদ্ধ বংশের সন্তান। পাল যুগে বৌদ্ধদের হাতেই বাঙালি সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা তথা বাঙালি জাতীয় বোধের উন্মেষ ঘটে। বাঙালির যা কিছু গর্ব করার মতো অর্জন তার অধিকাংশই বৌদ্ধ যুগের। [১৫৩] বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় বৌদ্ধধর্ম এককালে প্রাচীন ভারতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহামতি বুদ্ধের ধর্ম যে সব স্থানকে কেন্দ্র করে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো তার নিকটে, একমাত্র এ কারণেই ধারণা করা হয় বুদ্ধের জীবিতাবস্থায়ই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর অভিমতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁর মতে, মহামানব বুদ্ধ বৃহৎ বঙ্গের শেষ সীমায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রগুলির মধ্যে মগধ ছিলো অন্যতম। মগধ ও বঙ্গ এই উভয় রাজ্যই পাশাপাশি অবস্থিত। সে সূত্রেই গৌড় বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মূল প্রভাব ছিলো একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার (বার্মা) ও শ্রীলংকায় বুদ্ধের যাতায়াত ছিলো। বুদ্ধের জন্মস্থান ও ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রভূমি মগধ থেকে খুব কাছে বাংলাদেশের মাটিতেও বুদ্ধের পদাপর্ণ ঘটেছিলো এমন অনুমান করা হয়।

বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ পাশেই মিয়ানমার (বার্মা)। সেদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাস স্মরণ করে দেয় যে, বাংলাদেশের উপর দিয়ে মগধ থেকে মিয়ানমার যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিলো। সেজন্য নলিনী নাথ দাসগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন মগধ, বাঙালা এই দুই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে বুদ্ধের জীবিত কালেই মগধ থেকে বৌদ্ধধর্মের ঢেউ এসে বাংলাদেশকে প্লাবিত করে দেয়া স্বাভাবিক।

যাই হোক, গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং বাংলাদেশে আগমন করেছেন বলে কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে প্রণীত পালি গ্রন্থ ও ইতিহাসাশ্রয়ী সমসাময়িক ঘটনাবলীর সূত্র ধরে, পারিপার্শ্বিতার আলোকে বুদ্ধ যে বাংলাদেশে আগমন করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বুদ্ধের আগমন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে হিউয়েন সাং (খ্রি. ৬২৯-৬৪৫) বলেন- বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিন মাসাধিকাল পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে অবস্থান করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের দীর্ঘ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার কালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ঐতিহাসিক, গবেষক ও পণ্ডিতগণ একমত নন, তবে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ধামরাই ও শাখাসর অঞ্চলে প্রাপ্ত সম্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত কথিত স্তম্ভ ও লিপি, ১৯৩১ সনে মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত মৌর্য যুগের শিলালিপি ও কাল নির্দেশকে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে অনুমান করা যায় বুদ্ধের জীবদ্দশায় না হলেও অন্ততঃ মৌর্য যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। "ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক প্রথম বাঙালি শক্তিধর নৃপতি, তাঁর রাজ্য গৌড় বলে পরিচিত। বহু প্রাচীনকাল থেকে উত্তর অঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত, যেখানে বুদ্ধ স্বয়ং আগমন করেন। উত্তরবঙ্গ মৌর্য সম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্য হিসেবে উল্লেখিত।[১৫৪] সুতরাং প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য, বিভিন্ন শিলা ও স্তম্ভলিপি চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনী এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, মৌর্য যুগে পুণ্ড্রবর্ধনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো এবং পরবর্তীকালে তা সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল। বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমশীল, জগদ্দল, সোমপুর বিহারে শেষে অনেক

তন্ত্র জমিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়েছিল। তান্ত্রিক মতবাদ একটি বহু প্রচলিত ধর্মমত। বজ্রযান ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম। এই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল পূর্বভারতে বাংলাদেশে এবং নিঃসন্দেহে বাংলার লোকায়ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে। তারানাথের মতে, তন্ত্রের উৎপত্তি বহু পূর্বেই হয়েছিল, কিন্তু উহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং গোপনভাবে গুরুশিষ্য পরম্পরায় লুক্কায়িত ছিল। পাল রাজাগণের পৃষ্টপোষকতায় ও সিদ্ধাচার্যদের সক্রিয় প্রভাবে উহা জনপ্রিয় হবে ওঠে। বজ্রযানের চারটি কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল, উড্ডীয়ান, কামাখ্যা, শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি। এই চারটি পীঠাস্থানেই একটা করে বজ্রযোগিনীর বিহার ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বজ্রযানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলে। বৌদ্ধরাই তন্ত্রের গূঢ় সাধন পদ্ধতি লিখিত ভাবে প্রথম প্রকাশ করে। তারা যে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করে তার নাম গুহ্যসমাজতন্ত্র। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে অসঙ্গ কর্তৃক রচিত হয়েছিল। বজ্রযানীদের কল্পনায় আদিবুদ্ধই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ। তিনি সর্বব্যাপী পাল বংশের শ্রেষ্ঠ ও রাজচক্রবর্তী সম্রাট ছিলেন ধর্মপাল। বাংলার পাল রাজগণ সূর্যবংশীয় উত্তরাধিকারী এবং বিক্রমপুরের বর্মন, সেন ও দেব বংশীয়েরা চন্দ্রবংশী উত্তরাধিরী ছিলেন।

সেনরা ছিলেন কর্ণাট দেশীয় কাণাড়ী ক্ষত্রিয়। রাঢ়ে আগত সামন্ত সেনের পুত্র (হেমন্ত বা সামন্ত) সেন থেকেই এ বংশের শুরু। তাঁর পুত্র বিজয় সেন সম্ভবত প্রথম স্বাধীন রাজা (১৩৯৭-১১৬০)। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনই (১১৬০-৭৮) সেন বংশের মধ্যমণি। ইনি আধুনিক ভাষিক বাংলাদেশ ছাড়াও বিহার উড়িয়ার কতক স্বাধিকার আনেন। লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০২ বা ১২০৬) সগৌরবে রাজত্ব করে বৃদ্ধ বয়সে রাজ্য হরান। এর পরও সেন বংশীয় সামন্তরা কিছুকাল স্বাধীনভাবে পূর্ববঙ্গ রাজত্ব করেন। বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০) এবং কেশব সেনের (১২২০-১২২৩) নাম অনুশাসনে পাওয়া যায়।

সেনরা ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী। তারা বৌদ্ধ অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে নতুন করে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র-সমাজ-আচার-রীতি-নীতি, বর্ণানুগ শ্রেণী বিন্যাস, পার্বণ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি অত্যুৎসাহে রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগে পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। সেন যুগে বৌদ্ধ জাতির কোন মর্যাদা বা অধিকার ছিলনা। লুপ্ত প্রায় বৌদ্ধ সমাজ ও নিম্নবিত্তের মানুষ তাদের হাতে পীড়িত হয়েছিল। একালের নাথ-যোগী (তাঁতী), ধর্মঠাকুরের পূজারী, সহজযানী, মীননাথ-গোরক্ষনাথপন্থী বিভিন্ন শাখার বৌদ্ধরা প্রচ্ছন্ন ভাবে শুদ্ররূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রান্তে ঠাঁই করে নিয়ে আত্মরক্ষা করে। বৌদ্ধদের নির্বাণ ও সাম্যের সমাজ এভাবে বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিণতি পায়। ফলে এ সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্বের ও লাঞ্চিতের অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। শূদ্রাদি অস্পৃশ্যের এবং নিম্নবিত্তের পেশাদারী শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার হরণ করা হয়। কৃত্রিম বর্ণবিন্যাসের ফলে উচ্চবিত্তের অধিকাংশ মানুষ যেমন

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত্য গৌরব লাভ করে, তেমনি এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব কোন্দল ও সমাজে স্থায়ী হয়ে থাকে। তাই ঘটকের রচিত কৃত্রিম অবধি সমাজ ক্ষেত্রে অনর্থ ঘটিয়েছে দেখতে পাই। বৃহর্দ্ধর্মপুরাণ মতে (১৩ শতক) বাঙালায় ছিল ব্রাহ্মণ ও ছত্রিশবর্ণের শূদ্র এবং তাদের অধিকাংশ ছিল বর্ণশংকর বা মিশ্ররক্তের। আদিকাল থেকে বাংলাদেশের নানা বর্ণের ও গোত্রের লোকের বাস। পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, গৌড়া, রাঢ়া প্রভৃতি যে গোত্র বাচক শব্দ বিশ্বাস করার কারণ আছে। বাংলাদেশ বর্ণসঙ্কর জাতি অধ্যুষিত দেশ। গ্রীক, শক, হুন, কুষাণ, তুর্কী, মুঘল, ইংরেজ জাতির আগমন ও বসবাস ঐতিহাসিক ব্যাপার। দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় জাতির পরিচয় মেলে। মোট কথা জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ চিরকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিল। মৌর্য যুগ থেকে সেন আমল অবধি জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। সেন আমলে উগ্র ব্রাহ্মণ্য পীড়নে বাংলাদেশ থেকে জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র সাহিত্য সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল অবধি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব প্রবল ছিল। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও আচারের বহুল প্রচার সত্ত্বেও দেশের মানুষের চারিত্রিক দৌর্বল্যজাত সর্বপ্রকার অনাচার ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এসময় বিকৃত রুচি ও আচরণে অশ্লীলতা ছিল প্রকট। গুপ্তরা ও সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী, জনগণ ছিল সাধারণভাবে প্রাচীন জড়বাদের সংস্কারপুষ্ট জৈন-বৌদ্ধ। তার ফলেই মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তন্ত্র-কালচক্র- বজ্র- সহজযানী বিকৃত বৌদ্ধ মতই এখানে জনপ্রিয়তা লাভ করে লোকধর্মে পরিণত হয়। ফলে গৃহস্থের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা পায় বজ্রধর ও বজ্রতারা এবং অবলৌকিতেশ্বর লোকনাথ। করুণা ও মৈত্রীর সূত্র ধরে লোকনাথকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ ভক্তিবাদ দৃঢ়মূল হয়। বজ্রনাথ, আদিনাথ শিবরূপে পরবর্তী কালে প্রচচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ দেবতা হিসেবে অভিন্নরূপ লাভ করেন-নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য তারই পরিণাম প্রসূন।[১৫৫]

"বৌদ্ধ যুগের লৌকিক ধর্ম, বাসলী, ক্ষেত্রপাল, গণেশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। অভিজাতরা যখন সংখ্যাগরুর লৌকিক দেবতাকে স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন নিজেদের রুচি মতো এসব দেবতার একটা তাৎপর্যময় মহত্তররূপ সমাজ মানসে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের আর্যাভিমান বজায় রাখতে প্রয়াসী হয় পুরাণ এ উদ্দেশ্যেই রচিত। তাই সব দেবতারই দুই রূপ লৌকিক ও পৌরাণিক। বৌদ্ধ দেবতা ও অপদেবতা ধর্ম, তারা , মনসা, যক্ষ, লোকনাথ, আদিনাথ, বাসলী পৌরণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতার আবরণে এভাবে টিকে থাকলেন। যদিও সুপরিকল্পিত ভাবেই যেন বৌদ্ধশাস্ত্র সাহিত্য চৈত্য আচার অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে সেন আমলে। তবুও বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র-মন্ত্র দেহকতত্ত্ব স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রাখল। নামান্তর এবং রুচিৎ রুপান্তরে লৌকিক বৌদ্ধদেবতা ও সংস্কার চিরকালের জন্যে দৃঢ়মূল রইল।" সেজন্যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৌদ্ধ প্রভাব ও তার গুরুত্ব অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকার্য, হর প্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সে পথের পথিকৃৎ। জৈন-বৌদ্ধ সাম্য করুণা-মৈত্রীর ঐতিহ্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ দেশে ইসলামী সাম্য ও প্রেমবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে অনুকূল পরিবেশে দেশীয় নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলমানেরা পূর্ব পুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারের সমন্বয়ে লৌকিক ইসলাম গড়ে তুলল। স্বাভাবিক প্রবর্তনা দিয়েছে লৌকিক ইসলাম সৃজনে, এই ইসলাম ছিল মূলত পীর বা গুরুবাদী ইসলাম। তাই বাস্তব এবং কাল্পনিক পীরতত্ত্বে, অলৌকিক কেরামতিতে, বৌদ্ধস্তূপের আদলে পরিকল্পিত দরগাহ পূজায়, জল-দেবতা খাজা খিজিরের প্রতি অবিচল আস্থায় ও মানৎ সিন্নি তাবিজ কবচ ঝাড় ফুঁকে এই ইসলাম ছিল সীমিত। আবার বাংলাদেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী আফগাণ মুঘলের পরতলজাত হল তখন আর্থিক জীবনের অবক্ষয় অবশ্যম্ভবীরূপেই শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত করল। (প্রাগুক্ত, হর প্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম নষ্ট হয়।[১৫৬] শিশুনাগ বংশ, নন্দ বংশ, শুঙ্গবংশ, কম্ববংশ পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেছেন।

উত্তরবঙ্গ চিরকালই পাটলিপুত্র শাসনে ছিল বলে আমাদের অনুমান। আজকের বরেন্দ্র অঞ্চল বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ সর্বপ্রকারে কিন্তু পালরা যে বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলেই কেবল মহাস্থানগড় বা সোমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন পশ্চিম পূর্ববঙ্গ যে তাদের কোন কৃতি-কীর্তি নেই এবং দ্বিতীয় মহীপালই স্বল্পকালের জন্যে কুমিল্লা অবধি সে জয় করেছিলেন; ইতিহাস নয়, বাস্তবেও তার সাক্ষাৎ প্রমাণ মেলে। বরেন্দ্র অঞ্চলে উদ্ভূত বলেই গোপাল বংশ বাঙালির অকারণে গৌরব গর্বের অবলম্বন হয়েছে। তবু পাটলিপুত্র কেন্দ্রীক রাজবংশ দিয়েই আমরা আমাদের ইতিবৃত্তান্ত শুরু করি। কারণ জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব এই অঞ্চলে, গুপ্তরাও এসেছিলেন কনৌজ বা বিহার থেকেই। বৌদ্ধধর্মের আগে রাঢ়ে বরেন্দ্রে জৈনধর্ম প্রচারিত হয়। যদিও জৈনবৌদ্ধ মতে ও চর্চায় সাদৃশ্য অনেক, পার্থক্য সামান্য তবু বৌদ্ধ প্রসারে জৈন মত বিলুপ্ত হয়। অনুমান করা হয় জৈন এবং বৌদ্ধে বিরোধ-সংঘর্ষ হয়েছিল। দিব্যাবদান গ্রন্থে জানা যায়, অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের অবমাননায় কষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নিগ্রন্থে জৈন হত্যা করেছিলেন। বিম্বিসার পুত্র অজাত শত্রুর বৌদ্ধ বিদ্বেষ লোক প্রসিদ্ধ। শশাঙ্কের একটি আদেশ ছিল এই রূপ-

"আ-সেতোর আতুষারাদ্রের বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান।

যো-ন হন্তি স হন্তব্যোভৃত্যান ইত্যশিণ নৃপঃ।"

সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি সেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালকসহ যে ভৃত্য হত্যা করবে না, সে প্রানদন্ডেদণ্ডিত হবে। রাজভৃত্যদের, প্রতি রাজার এই আদেশ। [১৫৭] বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষে হত্যাকাণ্ড, বহু অত্যাচার ও নানা উৎপীড়ন যে হয়েছিল, তার প্রমাণ সে যুগের পুঁথিপত্রে নানা সূত্রে পাওয়া যায়। 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজারা-

Dhaka University Institutional Repository

দুষ্টমতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্
অসংখ্যাতান রাজমুখ্যান্ অনেকবিদ্যা
প্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশু-
ভির্শ্চিত্ত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য
কট ভ্রমনৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমত ধ্বংস
মাচরণ নির্ভয়ো বর্ততে।

অসংখ্য দুষ্টমতালম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজামুখ্যদের অনেকবিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উদুখলে ফেলে, মুষলাঘাতে চূর্ণ করে দুষ্টমত ধ্বংস করে নির্ভয়ে থাকতেন। এই ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে বৌদ্ধগণ নির্মূল হয়ে গেল।

সেন রাজাদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধ বিদ্বেষের আভাস দেয়। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে, সরহের দোহায়, আর্যদেবের, 'চিত্তশোধন প্রকরণ' সাধনমালা, সূচি, তত্ত্বকোষ, প্রভৃতিতে বৌদ্ধ বিদ্বেষ, নিপীড়িত বৌদ্ধ পীড়নে, ব্রাহ্মণ ধর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রকট সাত শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্ক বৌদ্ধ পীড়নের জন্যে নিন্দা পেয়েছেন হিউয়েন সাং ও হর্ষচরিত প্রণেতা বানভট্টের।

হিন্দু জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি বৌদ্ধ নিধন, ক্ষত্রিয় নিধন, অসুর নিধন, স্বেচ্ছা (অস্পশ্য) নিধন, বৌদ্ধ বিহার ও মূর্তি ধ্বংসকরণ। সে কারণে ব্রহ্মা বিষ্ণু বারবার অবতার হয়ে ধরাধামে আসেন। সামন্তসেন ছিলেন সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পর্যায়ক্রমে এ বংশের রাজা হন বিজয়সেন (১০৯৫-১১৫৮ খ্রি.), বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৮খ্রি.) লক্ষণসেন (আনু. ১১৭৮-১২০৪ খ্রি.), বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০) এবং কেশব সেন (১২২০-১২২৩)। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদের দেব-তাদেরও স্বীকৃতি দিয়ে, স্বয়ং গৌতম বুদ্ধকে অবতাররূপে গ্রহণ করে বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্য সমাজভূক্ত হওয়ার জন্যে প্রলুব্ধও করেছিল। এ বিষয়ে একজন বিদ্বানের মত এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

'পৌরাণিকগণ বুদ্ধকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন। শঙ্করাচার্য বুদ্ধের মায়াবাদকে অদ্বৈতবাদ নাম দিয়া সর্বত্র প্রচারিত করেন। বুদ্ধের, প্রবর্তিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের অনুকরণে রামানুজ, মাধবচার্য, বল্লভাচার্য, শ্রী চৈতন্য প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ বৈরাগী ও বৈরাগি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। যখন বুদ্ধ বিষ্ণু হইলেন, শূন্যবাদ ব্রহ্মবাদে পরিণত হইল এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ স্বীয় উপাধি ত্যাগ করিলেন, তখন বৌদ্ধধর্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। ক্রমে বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব ও শৈব হইলেন।' "ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের নিকট উৎপীড়িত নির্যাতিত বৌদ্ধরা মুসলমানদের বিজয় বাংলা বিজয়য়ের পরে সহজেই মুসলমান হয়, 'নিরঞ্জনের রুস্মা' তারই ইঙ্গিত বহন করে। তারপরেও বৌদ্ধ ছিলো তারা নিতানন্দ ও গোস্বামীদের প্রয়াসে নেড়া নেড়ীরূপে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভূক্ত হয়। 'নিরঞ্জনের রুস্মা বা কলিমাজালাল' নামের পদবন্ধে। এতে

Dhaka University Institutional Repository

নির্জিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধা তুর্কী বিজয়কে সদ্ধর্মীর মুক্তির আশ্বাস ও ভগবানের আশীবাদ বলে জেনেছে। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো দেশত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করেছিল। নিম্নবিত্তের বর্ণের ও নির্জিত বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য হামলা থেকে স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্ম বিলয় ঘটিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্বধর্ম ও আচার রক্ষা করেছে, এরা নাথযোগী নামে পরিচিত তাঁতীরা, বৈষ্ণব-সহাজিয়ারা, বাউলরা (হিন্দু মুসলমান) বজ্রসত্ত্ব অর্থাৎ বজ্রধরের (হে বজ্র, হেরুক) সাধকড়াই বজ্রী ও বজ্রকুল। সেই বজ্রকুলই আধুনিক বাউল (বজ্রকুল > বজ্জউল> বাজুল> বাউল)। এবং শৈবনাথপন্থী রূপে মন্ত্র-বজ্র সহজয়ানী যোগী তান্ত্রিকরা আর ধর্ম ঠাকুরের পূর্জারীরূপে রাঢ়ের ডোম চন্ডাল। মতে-আচারে তারা লিও আজ সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিচয়ে তারা হিন্দু। এবং অনেক বাউল মুসলমানও বৌদ্ধ। ইতিহাসের আলোকে অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধরা সম্ভবত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মগধ অঞ্চল থেকে আধুনিক ভৌগোলিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। শাস্ত্রীয়ভাষা পালি প্রাকৃতের অপরিমেয় গুরুত্ব সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা চর্চা ছিল। শাস্ত্র শিক্ষা ও প্রশাসনের বাহন ছিল সর্বভারতীয় সংস্কৃত।

অবশ্য পুণ্ড্রবর্ধনে তথা বগুড়ার মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের তাম্রলিপির ভাষা প্রাকৃত (ব্রাহ্মী) এবং তা জনগণের উদ্দেশ্যেই উৎকীর্ণ। এই ভাষা ছিল প্রশাসনের বিভিন্ন লেখমালার সাক্ষ্যে প্রমাণিত। মৌর্যযুগে পালি প্রাকৃত ছিল রাজকীয় প্রয়াস। অশোকের অনুশাসনের ভাষাই তার প্রমাণ। পাল অঞ্চলে বৌদ্ধ শাস্ত্র, দর্শন ও তন্ত্র-রচিয়তাদের মধ্যে শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, জেতারি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী মিত্র, অভয়কর, শান্তিদেব কমলশীল, দিবাকর চন্দ্র, চন্দ্রগোমী, কুমারবজ্র, দানশীল, পুতলি, নাগবোধি, প্রজ্ঞাবর্মন, বোধিভদ্র, মোক্ষাকর গুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র, শুভাকর এবং চর্যাকীর্তিকারগণ রয়েছেন।[১৫৮]

বাংলার মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে অসংখ্য টীকা-ভাষ্য, তন্ত্র গ্রন্থ এবং মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথপন্থ, কৌলপন্থ প্রভৃতি উপমত সম্পর্কিত বহু তত্ত্বগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার অনুবাদ মূলক নিদর্শন মেলে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় অনুদিত ও রক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থে। 'ময়নামতির শালবন, আনন্দ বিহার ও পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে সেই রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে দ্বাদশ শতকের শেষে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায়'। এক সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রচারে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে। তাই রক্ষকের অভাবে ও ব্রাহ্মণ্যবাদীর বিরূপতার বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য এদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একটা জনবহুল প্রবল ধর্ম সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ঐতিহ্য নিদর্শন এমন নিঃশেষ বিলুপ্ত বিস্ত ত হওয়ার নজিরবোধ করি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। বর্তমান মানুষের কাছে কোন কিছুই আত্মগোপন বা বিস্মৃত নয়: জ্ঞান বলে মানুষ আজ ভারতের বাংলার বৌদ্ধ সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা নানাভাবে আবিষ্কার করে চলেছেন। সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি চিন্তা চেতনার প্রসুত এবং বাঙালির মননে আচারণেই যে সেগুলো পুষ্ঠ ও সর্বত্র পরিব্যাক্ত, সে তথ্য আজ আর গুহায়িত নয়।

মহাযান প্রভাবিত বজ্রযান সহজযান নাথপন্থ, কৌলপন্থ এবং মন্ত্রযান, কাল চক্রযান প্রভৃতি নাম সার বিকৃত বৌদ্ধমত গুলোর উদ্ভবও বিকাশ বাংলাদেশেই এবং এগুলোর বিস্তার ও প্রসার ঘটে কমবেশি গোটা বৌদ্ধ জগতেই। এ পথেই একদিন বাঙালির অধ্যাত্ম বিকাশ ও আত্ম-বিস্তার ঘটেছিল, সম্ভব হয়েছিল তার বিশ্বব্যাপী তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়। পরিবেশ ও ছিল অনুকূল। মৌর্য, পাল ও চন্দ্রবংশীর বৌদ্ধরা এখানে রাজত্ব করেছেন দীর্ঘকাল। শিক্ষা সাহিত্য, শাসন ও সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে বৌদ্ধরা পাল প্রাকৃতে টীকা-ভাষা ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। সহজিয়া ও বাউল গানে ও চর্যায় সিদ্ধাচার্য (চৌরাশী সিদ্ধার অনেকেই বাঙালি) রচিত সাধনতত্ত্ব, দোহা ও চর্যাগীতি আজো আবর্তিত ও বিবর্তিত রূপ চালু রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশ বাঙালির রচনা ও বাংলার নিজস্ব ধর্মতত্ত্বের ধারক। এগুলো বাংলা ভাষা সাহিত্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ ও উৎস। বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি। ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী উত্তর পশ্চিম বঙ্গের পাল রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র শাসন। কারা সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। সকলেই এর প্রভাব স্বীকার করে। তবু নেপাল তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধ যুগে কেবল বাংলাদেশে এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্যনীয়। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাংলাদেশ থেকেই হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানাফাই পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই। হাড়িসিদ্ধা ময়নামতিতে চট্টগ্রামে, কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গৌরক্ষনাথ উত্তর পশ্চিম গিয়ে স্বমত প্রচার করেন।

বাঙলার বা বাঙালির আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষ পুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেরও আল্লাহ খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। (শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী মজনু'তে ধর্ম বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাথ ও নিরঞ্জন, আদ্য ও পুরুষ পুরাণ সব রচনায় সুলভ)। যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধ যুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রম বিলুপ্তিতে গড়ে ওঠে বাঙালি ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। অষ্ট্রিক, আলপাইন পামিরীয় দ্রাবিড়, আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভব। সাতশতকের গোড়ার দিকে বোধ হয় শশাঙ্কের নেতৃত্বে প্রথম বঙ্গগৌড় গড়ে ওঠে।

চর্যাপদে বঙ্গ এর সঙ্গে আর্য ও আলী প্রত্যয় যোগে বাঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দ চালু হয় দেশ ও জাতি অর্থে। ঐতরেয় আরণ্যকেও নুঃ ৫ম শতক বঙ্গ শব্দ দেশ বা জাতি অর্থে পাওয়া যায়। 'আজি

Dhaka University Institutional Repository

ভুসুকু বাঙ্গালী ভইলী' বা অদল বাঙ্গাল দেশ লৌড়িউ আর সর্বানন্দের অমর কোষে (১১৫৯ খ্রি.) বঙ্গাল বচ্চার শব্দ পাচ্ছি। নিত্তাহ্নিক তিলকে লিপিকাল ১৩৯৫ খ্রি.) বঙ্গিদেশ ব্যবহৃত হয়েছে। মুঘল আমলেই কেবল গৌড় বঙ্গাদি অঞ্চল সুবা-ই-বঙ্গাল নামে আখ্যাত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ আছে যেমন দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, জাতক, থেরগাথা থেরীগাথা, অপাদান, মহাবর্গ, চুল্লবর্গ, কথাবত্থু, মিলিন্দ প্রশ্ন, মহাবংশ, দীপবংশ প্রভৃতি কেবল মাত্র ধর্মীয় গ্রন্থসাহিত্য বললে চলবে না, তা তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসের বটে। প্রাচীন মৌলিক ঘটনার ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

ফরাসি গ্রন্থে ও মুসলমানদের মুদ্রায় ও শিল্প লেখে বাংলার প্রচীন জনপদ গুলোর নাম পাওয়া যায়। গৌড়, বরিনদ বা বরেন্দ্র, বংগ বা বঙ্গ, রাল বা রাঢ়, কামরূপ, সিলহট বা শ্রীহট্ট, লখনৈতি বা লক্ষণাবর্তী, সকোনাত বা সমতট। এগুলি প্রাক-মুসলিম যুগের অতিপরিচিত জনপদ। হরিকেল নামটি মুসলমান আমলে শোনা যায়নি। খুব সম্ভব এ জনপদের অবস্থান ছিল চট্টগ্রামের উপকুলীয় ভূখন্ড। গুরুত্বের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গ জনপদ সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী লোকগোষ্ঠীর আবাসভূমি প্রায় সাতশ বছর ধরে সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত হয়েছে। বঙ্গ থেকেই গঠিত হয় বাঙ্গাল বা বাঙ্গালি বাঙলা শব্দ।

বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ঐতরেয় আরণ্য, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতা, কালিদাসের রঘুবংশ, মহাভারত, চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধাচার্যদের রচনা প্রভৃতি উৎস থেকে গৃহীত উপাদানের সাহায্যে অধ্যাপক অজয় রায় গৌড় কামরূপ তাম্রলিপ্ত, সমতট , সুক্ষ বঙ্গ রাঢ় পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদগুলির অবস্থান আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য 'পৌণ্ড' বরেন্দ্র, গৌড় কর্ণসুবর্ণ রাঢ় সুক্ষ, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ সমতট হরিকেল এই সব প্রাচীন জনপদ নিয়েই গড়ে উঠেছিল অতীতে বঙ্গভূমি। ভূগোলবিদ ও পর্যটক টলেমির বিবরণী মতে, তাম্রলিপ্তির পূর্বে গঙ্গার সবগুলো মোহনার উপর-দিয়ে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র উপকূলে গঙ্গাতীরে। অধ্যাপক অজয় রায় বলেছেন- রাঢ়, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রের সম্মিলিত রূপই ছিল গঙ্গাঋদ্ধি। গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস। বাঙালির পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক বিবরণ দিয়ে। অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, পুরা প্রস্তর যুগ থেকে বাঙালি জাতি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বহু বিচিত্র নৃগোষ্ঠিক উপাদানের এবং ভাষা সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের দীর্ঘকালীন সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি সমরূপী সমসত্ত্ব জন (People) হিসেবে এই জাতি গড়ে উঠেছে। চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগস্থল বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান। সে জন্য বাঙালি জাতিরূপ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত । বাঙালি সমাজের আর্যীকরণের ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। বাংলার আর্য সংস্কৃতি ও আর্য সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবের সূচনা মৌর্যশুঙ্গ আমল থেকেই। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই প্রভাব ব্যাপক ও গভীর হয়েছিল খ্রিষ্টীয় পাঁচ শতক

থেকে বার শতকের মধ্যে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি আর্যকরণের প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করেছিল। বার-তের শতকে তুর্কিদের বাংলা বিহার আক্রমণ এ অঞ্চলের বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের চুড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। তুর্কি আক্রমণের আকস্মিক ও প্রচণ্ড আঘাতে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তের শতকের তিব্বতীয় পণ্ডিত লামা ধর্মস্বামীর বিবরণে এবং পনের শতকে লেখা তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রূপে টিকেছিল। ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলার বিহার ধ্বংস হয়েছিল। পাহাড়পুর এবং মহাস্থানের বিহার ও বিদ্যাপীঠগুলি জীর্ণ অবস্থায় বোধ হয় আত্মরক্ষা করছিল। পাল-সেন আমলের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সাহিত্যের সৃজনশীল ধারাটিও এই সময়েই প্রায় অবলুপ্ত হয়েছিল। এ সময় বহু বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধ যোগী তাঁতী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জোলা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মুসলমান তাতীদেরকে জোলা বলা হত। জোলা শব্দটি ফারসি শব্দ জুলাই শব্দের বিকৃত রূপ।

১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করে। তখন থেকেই মধ্য যুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগে বাংলার সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বিজয়ী মুসলমানরা বৌদ্ধ ও হিন্দু বিহার মন্দির সমূহ ধ্বংস করতে থাকে। বৌদ্ধ শ্রমণরা নেপাল ও তিব্বতে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা বৌদ্ধ হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করতে শুরু করে দেয়।[১২৯] গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার প্রসার ছিল। চতুর্থ শতকের আগে থেকেই চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভিক্ষু শ্রমণগণ বাংলাদেশে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করতেন। তাঁদের ব্যবহারের জন্য মহারাজ শ্রীগুপ্ত বর্তমান মালদা-মুর্শিদাবাদের সীমান্তে মৃগশি খাবনে বা মৃগস্থাপনে একটি বিহার নির্মাণ করে তার রক্ষণাবেক্ষনে জন্য ১৪টি গ্রাম দান করে ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধতীর্থ পরিব্রাজক ফা হিয়েন বাংলা আসেন। তিনি ভারত বাংলাসহ ৩০টি বৌদ্ধদেশ ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'ফো-কুয়ো-কি'(Fo-kow-ki) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[১৩০] পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে ফাহিয়েন এখানকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় সূত্রগুলি জানার জন্য চীন থেকে ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি দুই বছর তাম্রলিপ্তি বন্দরে থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন সূত্রগুলি নকল করেন এবং বুদ্ধমূর্তির চিত্র ও নকশা বানান। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাম্রলিপ্তিতে ২৪ টি বৌদ্ধ বিহার ও অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। সব কটি বিহারে ভিক্ষুরা থাকতেন। বৌদ্ধধর্মের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। [১৩১] সমগ্র দেশটি ছিল বৌদ্ধ প্রধান দেশ। এ সময়ে তাম্রলিপ্তি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল। এ যুগের কিছু বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। রাজশাহী জেলার বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত মহাযানী যোগাচারের দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রমাণ করে তখন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি ছিল। ষষ্ঠ শতকের বৈন্যগুপ্তের বিহার নির্মাণে ভূমিদান। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ওর (৬৩৮খ্রি.- ৬৪৫খ্রি.) সপ্তম শতকে শশাঙ্কে আমলে, বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

এসেছিলেন। তিনি বাংলার বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় পুণ্ড্রবর্ধনে ২০টি সংঘারাম ছিল। আর তাতে ৩০০০ হীনযানী-মহাযানী ভিক্ষু বাস থাকতেন। সমতটে (সান-মো-তা-লো) ৩০টি সংঘারাম এবং তাতে ২০০০ ভিক্ষু থাকতেন। এরা স্থবির সম্প্রদায়ের। তাম্রলিপ্তিতে (তান-মো-লি-তি) ১০টি সংঘারাম এবং সেইগুলিতে ১০০০ ভিক্ষু থাকতেন। কর্ণসুবর্ণে ১০টি সংঘারাম ছিল এবং তাতে হীনযানী সম্প্রদায়ের ২০০০ ভিক্ষুক থাকেন। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে সম্ভবত ৬৭৩ খ্রি. বাংলার তাম্রলিপি এসেছিলেন। তিনি বার বছর সেখানে অবস্থান করেন। তিনি সেখানে বহু বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু দেখেছিলেন। একটি বৌদ্ধ বিহারে হিউয়েন সাঙের শিষ্য তা চেঙ এর সাথে পরিচয় হয়। হিউয়েন সাঙের পর তার সময় পর্যন্ত তিনি ৫৬ জন চীনা পরিভ্রমণকারী উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে চেঙ সি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চেঙ সি যখন সমতটে আসেন তখন সেখানে বৌদ্ধরাজ বংশ খড়্গ বংশের রাজত্ব চলছে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার হয়েছে। হিউয়েন সাঙ যেখানে সমতটে ২০০০ ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করেছেন, সেঙসি সেখানে ৪০০০ ভিক্ষু দেখেছেন। এ দেশের রাজা রাজভট্ট প্রতিদিন বুদ্ধের লক্ষ মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করেন এবং মহাপ্রজ্ঞা পারমিতার লক্ষ শ্লোক পাঠ করাতেন। বাংলাদেশে বৌদ্ধ জাতি, সমাজ, বর্ণ, জাতিতাত্ত্বিক সামগ্রিক পরিচয়ে মৌল প্রত্যয় সমূহ (key concepts).

পাল-সেন আমলে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বঙ্গের সীমানার মধ্যে ছিল ইংরেজদের শাসনকালীন বাকরগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার সীমানা ভুক্ত অঞ্চল (আজ যা বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্ত ও বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত)। এর মধ্যে বাকরগঞ্জ বঙ্গাল (বঙ্গ+আল) নামে পরিচিত।[১৬২] দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল(চট্টগ্রাম অঞ্চল) ও বঙ্গাল অঞ্চলে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে তাঁদের রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিকেল ও বঙ্গালের এবং সংশ্লিষ্ট বঙ্গের সীমানা করতে থাকে। হরিকেলের সীমানার মধ্যে আসে নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ত্রিপুরার পশ্চিম ভাগ। ৬০১ হিজরী সনের রমজান মাসে (১২০৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মে) সেন রাজ্যের গোড়ি অংশ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী দখল করে নেওয়ার পর লক্ষ্মণসেন সে অঞ্চলে এসে রাজত্ব করেন, তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে তাঁর নাম বলা হয়েছে বঙ্গ। সম্প্রতি বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে বৌদ্ধ চন্দ্রবংশ বহুকালব্যাপী অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত (৫০০-৮০০) স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন।

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, শ্রী হর্ষবর্ধনের রাজাত্বের অব্যবহিত পূর্বে বৃষ চন্দ্র নামক রাজা স্বাধীন হয়ে এক চন্দ্রবংশ স্থাপন করেন।[১৬৩] এই বংশের রাজা বল চন্দ্র আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলার রাজা সিংহ চন্দ্রের পুত্র শ্রীহর্ষের পুত্র শিলাদিত্য যখন মগধে রাজত্ব করতেন, তখন ত্রিহুত (উত্তরা বিহার) ও কামরূপ পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করেন। এর পরবর্তীতে বিমল চন্দ্র, ললিত চন্দ্র,

Dhaka University Institutional Repository

গোপী চন্দ্র রাজা হন। তাঁদের রাজধানী ছিল বাংলাদেশে চট্টগ্রামের। এ সময় চট্টগ্রামে তীর্থক বৌদ্ধ বিহার ছিল। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা মহাযানের তান্ত্রিক সম্প্রদায় ভূক্ত ছিল। এ সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল সিদ্ধ বলপাদ বা জলন্দরীপাদ। তিনি সিন্ধু নদীর নগর তট নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলায় জলন্ধর (বর্তমান সীতাকুণ্ড) আসেন। গোপী চন্দ্র তাঁর শিষ্য হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

গোপী রাজার একশ বছর পর চাগলা রাজা নামে এক মহাপরাক্রমশালী রাজা হন। তিনি চট্টগ্রামের প্রধান রাজা ছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতা বাংলা হতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তার হয়। রাজ মহিয়সীর প্রচেষ্টায় কতক ধ্বংসম্মুখ বৌদ্ধ বিহার সংস্কার করে দেন। বুদ্ধগয়া ও নালন্দার (বজ্রসেনায়) কয়েকটি শিরি পুনঃনির্মাণ করান এবং মহাসিদ্ধকারী পুত্রকে ডেকে এনে বুদ্ধ উপাসনার জন্য পুন স্থাপন করেন। এর তিনশ বছর পর বাবলা সুন্দর রাজার নাম পাওয়া যায়। চন্দ্র বাহন, অতীত বাহন, কল বাহন ও সুন্দর হাঁচি নামে তাঁর চারপুত্র ছিল। তারা সকলেই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম পুত্র রাখান বা আরাকান রাজত্ব করতেন, ২য় পুত্র চাকমাদের দেশে (পার্বত্য চট্টগ্রামে), ৩য় পুত্র মুন্দ (বর্মা) এবং ৪র্থ পুত্র নানাঘাটা (আসাম, কাছার ও ত্রিপুরা) রাজত্ব করতেন। মনে হয় বাবলা সুন্দর ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের রাজা ছিলেন।[১৩৬] পূর্ববঙ্গের চন্দ্র বংশীয় দেবরাজ বংশ। ঠিক ঐ সময়ে অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে (৮০১-১০০০ খ্রি.) রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কান্তিদেবের এক তাম্রশাসনে হরিকেল মণ্ডলে উল্লেখ আছে। আবার নবম দশম শতাব্দীর মধ্যে ভাগে লয়চন্দ্র দেব (৯০০-১০০০ খ্রি.) নামক এক স্বাধীন নৃপতির নাম দৃষ্ট হয়। তিনি কুমিল্লায় রাজত্ব করতেন। তার পরবর্তীতে পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণচন্দ্র, ত্রিলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র রাজত্ব করতেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গোবিন্দ্র চন্দ্র নামক এক স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত তিনি চন্দ্র বংশ সম্ভূত। সজীব জাতিগুলো কালে কালে স্রোতের গতির ন্যায় কতই পরিবর্তিত। বাহুমাত্রিক কালিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে কখনো পরিবর্তন, কখনো পতন, কখনো অভ্যূদয়: কিন্তু জাতির জীবনধারা বহুরূপে, নানা মতাদর্শে বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক থেকে বর্তমান অবধি জাতি কতো ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসরমান।

প্রাচীন বাঙলার অপর নাম 'গৌড়'। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ জাতির বিবর্তন বা পরিবর্তনের ইতিহাস ফরম্যাল ইতিহাস নয়। সম্পূর্ণভাবে এটা ইনফরম্যাল ইতিহাস। এটা বিষয় বিন্যাস, বর্ণনা, উৎস, বিকাশ, বিপর্যয় প্রভৃতি থেকে বুঝা যাবে।

আমরা ইতিহাস পড়ে, বুঝি; ইতিহাসের খেরোপাতায় বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস সমুজ্জ্বল। কিন্তু বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়নি। বাংলার উৎস, বিকাশ ও জনপ্রবাহে বৌদ্ধ অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বাংলায় বৌদ্ধ অবদান সুমহান ঐতিহ্যে ঋদ্ধ এবং বিগত কালে

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশীরা এর প্রশংসায় উচ্চকিত হয়েছেন। বৌদ্ধ যুগে বাংলার শৌর্য-বীর্য ও উন্নয়ন সমৃদ্ধি বিশ্ববিশ্রুত। বৌদ্ধধর্ম না মানিলেও অনেক হিন্দু ও মুসলমান বৌদ্ধধর্মের বহু আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধমত একটু বিকৃত ভাবে প্রতিপালন করেন। অনেকেই বৌদ্ধ মতাদর্শের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বাংলায় যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজার করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করে না।[১৬৫]

"বাংলায় অনেক কায়স্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ বোধ হয়। কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি বাংলা হাতে তালপাতায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মের পুঁথি আছে। এটি ইংরেজী ১৪৪৬ সালে লেখা। এটি মূল কালচক্রতন্ত্রের পুঁথি। পুঁথিটি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোনো বিহারে দান করেছিলেন। লেখক মগধদেশীয়ে ঝড়গ্রাম নিবাসী করণকায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এরূপ আর একখানি তালপাতার পুঁথি আছে, সেটি ১৪৭৯ বিক্রম সংবত বা ১৪২৩ খ্রিষ্টাব্দে লেখা। এটি বৌদ্ধ স্থবির শ্রীবররত্ন লিখাইয়া ছিলেন। লেখক কপলিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রী বাগীশ্বর। ...... সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ছিল, বৌদ্ধ স্থবির ছিলেন। রাজা গণেশ এর অমর কোষ টীকা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ পনেরো খানি বৌদ্ধ পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অমরকোষের রচনা কাল ইংরেজী ১৪৩১ সাল।"

১৬০৮ সালে মঙ্গোলিয়া থেকে বুদ্ধগুপ্ত নাথ নামে একজন লামা বৌদ্ধধর্মের অবস্থা দেখতে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাংলাদেশে আসেন। তিনি কাশ্রম গ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঙ্গ, ফুকবাদ, ফলগ্র প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন, এই সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুঁথি-পাঁজি ছিল, বৌদ্ধধর্ম ও খুব প্রবল ছিল। ধর্মঠাকুর বা সত্যপীরের রূপান্তর সন্ন্যাসী ঠাকুর। ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছায়ারূপ; এবং সে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ঠাকুর অবস্থান করতেন বিধ্বস্ত বৌদ্ধ বিহারে। বৌদ্ধধর্মের পতনের পর বৌদ্ধ বিহার গুলো ও বৌদ্ধধর্মের পূজা-পার্বণ রীতিনীতি, দেবদেবী ও বৌদ্ধধর্মের অশরীরী ধারার নিবার্ণ চেতনা বিলুপ্ত হয়নি। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রসঙ্গে ড. শ্রী অমলেন্দু মিত্র বলেন, নানা ধর্ম বিশ্বাসের সমবায়ে ধর্মঠাকুরের উদ্ভব।[১৬৬]

বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুর পূজার উদ্ভব ও প্রচার প্রসার ঘটে। রাঢ় অঞ্চলে সম্পর্কে লিখিত প্রাচীন ইতিহাস সামান্য যা পাওয়া যায় তা হল বৌদ্ধধর্ম প্রসারের বিবরণ ও পরবর্তীকালে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ। এই দুই যুগের আবিস্কৃত মূর্তি ও শিলালিপিও কিছু সাক্ষ্য বহন করছে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণবতার ভাবনার ন্যায় তান্ত্রিকতা ম্লান হয়ে গেছে। বৌদ্ধধর্মকে অপসারণের উদ্দেশ্যে শক্তিবাদ ও তান্ত্রিকতা কি রকম চেষ্টিত হয়েছিল তা লৌকিক

Dhaka University Institutional Repository

দেবদেবীর পূজা পীঠগুলি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেক জায়গায় মাটির নীচে বুদ্ধমূর্তিগুলিকে পুঁতে ফেলে শিব অথবা ধর্মঠাকুরে রূপান্তরিত করা হয়।

ধর্মঠাকুরের দেবতা কচ্ছপের ন্যায়। ধর্মঠাকুরের পূজোপকরণে গাছ, হাঁস, মুরগী, শূকর বলি এবং ধর্মপূজার পদ্ধতিতে লৌকিক প্রভাবের প্রধান্য দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের পূজকবৃন্দ ব্রাহ্মণেতর ও অন্ত্যজ জাতি। ধর্মঠাকুরকে আশ্রয় করে বাসুলী, মনসা, শীতলা, পন্ডাসুর, লৌহজংঘ, ডামর শাঞি, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবতা ও উপদেবতা পূজা পেয়েছেন। ড. সুকমার সেন বলেছেন, 'ধর্মঠাকুরের পূজা চলে এসেছে দেশের তথাকথিত নিম্নস্তরের জনগণের মধ্য দিয়ে। এরা সংখ্যাগরিষ্ট ছিলেন।' ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেন, 'ধর্মঠাকুরে মূলতঃ ছিলেন প্রাক আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।'[১৬৭] ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ দেবতা কি দেবতা নন তা আধুনিক পণ্ডিতবর্গ মত প্রকাশ করেছেন। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "Dharma who is however described as the supreme deity, creater and ordainer of the Universe, superior even to Brahma, Vishnu and Siva and at times identified with them and he has nothing of the abstraction of the Bnddhist Dharma about him."[১৬৮]

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মপূজা এবং বুদ্ধের অন্যতম নাম ধর্মরাজ তথ্য থেকে ধর্মঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলে বর্ণনা করেছেন। ধর্মপূজা বিধান সর্ম্পকে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাঙ্গালা দেশেই অনার্য সঙ্গমে বুদ্ধের চরম অধোগতি হয়। এইখানেই বুদ্ধের নৈরাত্মা দেবীর সাথে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে করুণায় দ্রব হয়ে গেলেন। ক্রমশঃ সনাতন ধর্ম প্রবল হয়ে উঠে তারা দল গ্রাস করতে লাগল' ধর্মঠাকুরের পূজা যে একদা বৌদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল তার প্রমাণ রাঢ় অঞ্চলে এখনো বিভিন্ন প্রমাণ ও উৎস বিদ্যমান। বিশাল বৌদ্ধধর্ম বাংলা ও বিহার থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, বাংলায় তার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এ সময় বঙ্গবাসী যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু ঘনরামের ধর্মমঙ্গল প্রকাশিত হয়। তাতে মনে হয় যে ধর্মপূজাই হয় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল খোঁজাতে খোঁজতে বাংলায় ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ বলে উল্লেখ করেছেন।

পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণ, তথ্যপ্রমাণ, শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, সাহিত্য, সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন নিঃসন্দেহে অসাধ্য সাধন এবং বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস রচনায় বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাসের ধারা অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হয়েছে। এর মূল কারণ মুসলিম যুগে বিশেষ করে কালানুক্রমিক ইতিহাসের ধারা বা Dynastic History রচিত হয়েছে। এ সকল ইতিহাস গ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস ও অবদান অবর্তমান। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তি আগমন করে দু' বছর অবস্থান করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ পাঠ এরং বুদ্ধের প্রস্তর মূর্তির চিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত ছিলেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্ব কালে (৬০৬-৬৪৬) প্রখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং (৬৩০-৬৪৪ খ্রি.)[১৬৯] বাংলায় আসেন এবং নির্ভরযোগ্য বিবরণ রেখে যান। তাঁর বিবরনীতে বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধধর্মে ব্যাপক প্রভাব ছিল। [১৭০] বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রসার ও বৌদ্ধ ইতিহাসের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ কাহিনীতে।

একটি দেশের ভৌগোলিক পরিচয় জানার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। ইতিহাসের বিষয় বস্তু হচ্ছে মানুষ এবং তার সমাজ ধর্ম ও সভ্যতা। প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিবর্তনের গতিধারায় এ বাংলার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের গোড়াপত্তন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসই বৌদ্ধ ইতিহাস। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলা তথা বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জন জীবনে প্রভাব বিদ্যমান।

"অতীতের প্রসঙ্গ উঠলেই ইতিহাস কথাটা সামনে চলে আসে। কারণ ইতিহাস অতীত নিয়ে আলোচনা করে। অতীতের ভেতরেই লুকিয়ে আছে বর্তমানের শোকড়। বর্তমানটা হলো অতীতেরই প্রলম্বিত অংশ এবং বর্তমানেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের শোকড়। সেকারনেই অতীতকে জানার বিষয়টিকে অবজ্ঞা করা চলে না কিছুতেই।"

স্বদেশ ও স্বজাতির ইতিহাস চর্চা করা সামাজিক ও ধর্মীয় আত্মচেতনার লক্ষণ। যে জাতির ইতিহাস নেই, সে জাতি নিজস্ব ও হতভাগা। আর যে জাতির ইতিহাস আছে অথচ খোঁজ রাখেন না, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগা। আমরা শেষোক্ত জাতির সাথে তুলনায়। বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস চিরঅম্লান বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম: অতীত ও বর্তমান এ বিষয়ে এই গবেষণা প্রধান উদ্দেশ্য সেকালে ও একালে বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্যের স্বরূপ ও তার অন্তর্গত ক্রমবিকাশের ধারাসমূহ উদ্‌ঘাটন করা।

দীর্ঘকাল পরে বাংলায় বৌদ্ধদের প্রাচীন ইতিহাসচর্চা অনেকটা জটিল। বর্তমান কালে বাংলার বৌদ্ধ জাতিসত্তার ধর্ম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান প্রায়শই বিস্তৃত। একথা সর্বাংশে সত্য যে, বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস কালে কালে ধর্মীয় শাসক শ্রেণীর বিদ্বেষ ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কারণে বিশাল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি ধর্মান্তর, বৌদ্ধ সভ্যতা বিলোপ্ত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে পড়ে যায় মাটি চাপা। হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির মাঝে বৌদ্ধ সংস্কৃতি

একাকার হয়ে যায়। বেদহীন-জাতিহীন বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন কালে এক ধর্ম আন্দোলন ও ভাব বিপ্লব সৃষ্টি করে।

৩.৮ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বৌদ্ধ পুরাবৃত্ত

ভূগোল ও ইতিহাস বাংলাদেশকে একটি স্বতন্ত্র ভূমি এবং বাংলাভাষা ভাষী মানবগোষ্ঠিকে একটি স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। দশম শতাব্দীর পাল রাজা ন্যায়পালের আমলে বৌদ্ধ আচার্য পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন সে যুগের বাঙালি মনীষার এক অশ্চার্য নিদর্শন। সনাতন হিন্দুধর্ম বাংলাদেশে গভীরভাবে শেকড় গাঁথতে পারেনি। তের শতকের প্রথমদিকে মুসলিম বিজয়ের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মমতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপাদানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল ছিল বলেই তুর্কী অমর নায়ক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর পক্ষে অতি সহজে বাংলাদেশ জয় করা সম্ভব হয়ে ছিল। [১৭১] খ্রিস্টীয় এগার শতকে 'বাঙ্গাল' নামে একটি স্বাতন্ত্র জনপদ ছিল যার পূর্ব সীমান্ত ছিল ভাগিরর্তী সেই সময় বঙ্গাল দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ব বঙ্গের ও দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতটময়ী ভূখণ্ডকে বোঝাত। মহাস্থানগড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার ও তৎসংলগ্ন ভাসু বিহার গ্রাম। বৌদ্ধ প্লাবনের যুগে এটি বৌদ্ধস্তুপ বা সংঘারাম ছিল। ইতিহাস মতে, গৌতম বুদ্ধ এখানে তিন মাস কাল অবস্থা করিয়া ধর্ম প্রচার করেছিলেন। চেকি পরিব্রাজক হুয়েন সিয়াং পৌণ্ড্রবর্ধনের প্রায় ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে পো-সি-পো (Po-Shi-Po) নামক একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার দর্শন করছিলেন কানিংহাম মনে করেন যে, ভাসুবিহারই পো-সি-পো বিহার। চীনাভাষার ভাসীভা শব্দই পো-সী-পো তে পরিণত হয়েছে। হুয়েন সিয়াং লিখেছিলেন এই ভাসীভা বিহারে ৭০০ বৌদ্ধভিক্ষু। ভিক্ষু অবস্থান করতেন এবং তারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। প্রাচীন ভারতসহ নানা দেশ হতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণ এখানে এসে অধ্যয়ন করতেন। বর্তমান এই বিশাল ভগ্নাবংশের স্তুপই নরপতির ধাপ নেমে কথিত।

"বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের মধ্য দিয়ে চীন, জাপান, পশ্চিম এশিয়া কোরিয়া, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও শ্রীলংকাতে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি সম্রাট অশোক ও কুষাণরাজ কনিষ্কের প্রচেষ্টায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানকালে ভারতে বৌদ্ধধর্মের তেমন প্রতিপত্তি না থাকলেও হিন্দুধর্মের বহু ধ্যান-ধারণার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। বাংলাদেশে আজও ক্ষুদ্র হলেও বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাংলায় অর্থ হিন্দুর চিন্তাপুষ্ট জাতিভেদ প্রথা কখনই বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের চর্যাপদ বা চর্যাগান রচনা থেকে আজও বিবর্তিত আকারে বৌদ্ধ ধর্মসাধনা প্রচ্ছন্নভাবে বেঁচে আছে বিশেষ করে বাউল সাধনা ও গানে। লোকায়ত দর্শনপুষ্ট তান্ত্রিক সাধনার বেশ কিছু উপাদান মধ্যযুগে বৌদ্ধ বজ্রযান সহজিয়া সাধকদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। মঙ্গল কাজের ধর্মঠাকুর বুদ্ধের লৌকিক রূপ অনেকে অনুমান করেন। ধর্মান্তরিত বাংলার মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশ যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন ইদানিং অনেক গবেষক অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। এমন কি আধুনিককালে অনেক বাঙালি মনীষীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভাবধারার প্রভাব খুবই স্পষ্টভাবে পরিদৃশ্যমান যাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রমুখ চিন্তাবিপদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মনে করা হয়।[১৭২] এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. আহমদ শরীফ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নীহাররঞ্জন রায়, আর সি মজুমদার, রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, আবুল ফজল, ড. দীনেশ চন্দ্রসেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চারভাগে বাংলা ভাষার যে যুগ বিভাজন করেছেন তাতে ৬৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দকে প্রাচীন যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই প্রাচীন যুগকে তিনি বৌদ্ধকাল (৬৫০-১১০০) এবং হিন্দুকাল (১১০০-১২০০) দুই কালে বিভক্ত করেছেন। সুফী, বাউল ও নাথ গীতিকার উদ্ভব বৌদ্ধ কালে। এ কালের রচনা আশ্চর্যচর্যাচয়।

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সূত্রপাত ও উত্তরাধিকার কাদের? প্রশ্নটা জরুরী, অপ্রিয় সত্য, স্বাভাবিক ও যুক্তিবহ। এই সকল কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই উঠবে। কেননা প্রাক ১৯৪৭ কাল পূর্বে দু'তিন হাজার বৎসরের বাংলাদেশের জীবনেতিহাস বর্তমানের সুনির্দিষ্ট জনপদ ভৌগোলিক রাজনৈতিক বিভাজন দ্বারা কদাপি চিহ্নিত ছিলনা। এই ইতিহাস প্রত্নকালাবধি সমগ্রেরই স্রোতধারা বহন করে এনেছে। তার দরুন পৌণ্ড্র জনপদে মহাস্থানগড়ে যে ঐতিহ্য, পাহাড়পুরে যে শাস্ত্র ও বিদ্যাচর্চা, মধ্য যুগে গৌড়ে যে সংস্কৃতিচর্চা, আরাকান রাজদরবার থেকে হুগলী ভুরশুট অবধি যে বাংলা সাহিত্যচর্চা, ইত্যাকার গৌরবময় সকল উপকরণেই আজকের বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। এই সুবর্ণ উত্তরাধিকার প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধদের।

প্রাগৈতিহাসিক ধারায় মানুষের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব ও আদি মানবের বসতি ও ব্যবহার্য প্রত্নসামগ্রীর সভ্যতার ইতিহাসের সূত্র ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য প্রাচীন উৎসে বৌদ্ধ জাতির কালজয়ী অবদান পরিস্ফুট হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হরপ্পা অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়।[১৭৩] মেজর জেনারেল ক্যানিংহাম (Sir Alexander Cunningham) স্যার জন মার্শাল (Sir Johon Marshall) ছাড়াও অনেকে এ বিষয়ে আলোনা করেছেন এবং গবেষণা চালাচ্ছেন।

আর্যদের আদিবাসস্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও আধুনিক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ নিশ্চিত হয়েছেন যে, আর্যরা ভারতীয় নন; বহিরাগত। আর্যদের কাল নির্ণয়ের প্রথম সংকট উত্তরণের প্রয়াস নেন

Dhaka University Institutional Repository

জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার[১৭৫] চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত কক্সবাজারে বৌদ্ধরা প্রকাশ্যে মঘ নামে পরিচিত। এদের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব চট্টগ্রামের ফেনী নদীর পূর্বতীর থেকে সুদূর আরাকান পর্যন্ত এত গভীর ও ব্যাপক ছিল যে, এখনও (১৯৭৯) চট্টগ্রামের দলিল দস্ত াবিজে বাংলা সনের পাশে মঘীসন ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই মানুষের কাম্য নয়; নিবার্ণ লাভই তার একমাত্র প্রেয় ও শ্রেয় লক্ষ্য। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, মৈত্রী, প্রেম, মানবতা ও করুণার আদর্শ বিশ্বজনীন ও সর্বকালীন। বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উপমহাদেশের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বৌদ্ধযুগেই পৃথিবীতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়, যার মধ্যে তক্ষশীলা ও নালন্দা ইতিহাস খ্যাত। "তবকাৎ-ই-নাসিরী"তে উল্লেখ আছে যে, বিহারের ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস করার (১২০৩ খ্রি. গোড়ার দিকে) অব্যবহিত পরে বখতিয়ার বদাউনে গিয়ে কুৎবুদ্দীন আইবকের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে নানা উপঢৌকন দিয়ে প্রতিদানে তাঁর কাছ থেকে খিলাৎ লাভ করেন।" বখতিয়ার নদীয়া নগরীকে ধ্বংস করার পরে লক্ষ্মণাবর্তীতে সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন এই কথা তাবকাৎ-ই-নাসিরীতে বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অর্ন্তগত দেবকোটে (কোটিবর্ষ) তার রাজধানী স্থাপন করেন। (১২০৫ খ্রি. শেষ দিকে)। বখতিয়ার খলজীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলার মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। অবশ্য অতিজ্ঞোচিত ১২০৬ খ্রি. তিব্বত অভিযানে চরম ও গোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়। তিনি তিব্বত জয় করে অপরিজিত ধনদৌলত লুট করার বাসনা করেছিলেন। তিব্বত অভিযানে তাঁর বিশাল সৈন্য বাহিনী, হাতি ও অশ্ব প্রায় সবটাই ধ্বংস হয়েছিল।

তিনি ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অভিযান করেছিলেন। পরবর্তীতে বখতিয়ার ও তাঁর সৈন্য বাহিনী তিব্বত অভিযানে চরম ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে কামরূপ ও তিব্বতের গিরিপথে বিষম কষ্ট ও দুর্ভোগ পেহাতে হয়। পথে কোন খাদ্য না পেয়ে বখতিয়ারের মুসলিম সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলিকে বধ করে মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল। যখন তাঁরা কামরূপ দেশের পাহাড়ের নিকটবর্তী বাকমতি বা গোমতি নদীর সেতুটি হিন্দুরা ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুহাম্মদ বখতিয়ার সসৈন্যে যেখানে পৌঁছে বাঁকমতি নদীর পার হবার কোন পথ পেলেন না। মেজর হ্যানের বর্ণনাকে তিত্তি করে ড. ভট্টশালী শিলহাকো (শিল=পাথর+হাকো=সাঁকো) নামক একটি প্রস্তর সেতুর বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মতে, মুহম্মদ বখতিয়ার সে সেতুটি অতিক্রম করে তিব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন। প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপের কাছে প্রাচীন খাত বা ব্রহ্মপুত্র নদীর কোন শাখার উপর যে সেতুর অবস্থান ছিল। তিনি খুব বিপদে পড়লেন ও হতাশ হয়ে গেলেন। উপায় খোঁজতে তখন পাশ্চবর্তী মন্দিরে তারা আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় হিন্দুরা মন্দিরের চারদিকে তাদের ঘিরে ফেলে। তখন সৈন্যরা বখতিয়ারকে জানালেন "যদি আমরা প্রতিরোধ না

Dhaka University Institutional Repository

করি তবে সবাই বিধর্মী কাফেরদের হাতে ধরা পড়ব মুক্তির কোন উপায় অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে। তখন তারা একসঙ্গে আক্রমণ চালান। সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য সবাই ঘোড়াকে নদীতে নামাতে সক্ষমহল। হিন্দুরা নদীর তীর অবধি তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। যখন মুসলমান সৈন্যরা অশ্বসহ নদীর মাঝখানে এসে পৌঁছলো, তখন দেখল যে জল খুব গভীর এবং তারা সবাই মারা পড়ল কিন্তু মুহম্মদ বখতিয়ার ও তার কিছু সৈন্য কোন মতে নদী পার হলো। আর সবাই জলে সলিল সমাধি হল। পরে তিনি দিনাজপুরের দেবকোটে ফিরে এসে চরম দুঃখ, মানসিক হতাশায় ১২০৬ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তার ফলে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারীদের ঝগড়া বিবাদের দরুন এদের মুসলিম অধিকারের বিস্তার বাধা প্রাপ্ত হয়।

মেজর হ্যানে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের এ প্রস্তর সেতু সম্পর্কে বলেন is built across what may have been a former bed of the Bara Nadi, or at one particular season of Brahmaputr, appearances now indicating a well defined water course, thorough which, Judiging from marks at the bridge, a considerable body of waters must pass in the rains, and at that season, from native accounts the waters of the Brahmaputra stil find access to it.

এই বাংলায় বছর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গে অনেকদিন সেন বংশীয় রাজাদের শাসন ছিল। একাদশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকেও ব্রাহ্মণসেনের বংশধররা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করছিলেন বলে মীনহাজের বর্ণনার দেখা যায়। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ থেকে অষ্টম দশকে পূর্ববঙ্গে দেব বংশীয় রাজরা রাজত্ব করছিলেন। পুরুষোত্তমের প্রপৌত্র, মধুসুদনের পৌত্র এবং বাসুদেবের পুত্র দামোদর কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে রাজত্ব করতেন। তার ১০৫৬, ১১৫৮ এবং ১১৬৫ শতাব্দীর তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এর থেকে বুঝা যায় তিনি ১১৫৩ শকে (১২৩১-৩২খ্রিঃ) রাজাহন এবং অন্তত ১১৬৫ শক (১২৪৩-৪৪খ্রি.) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। [১৭৫]

দামোদরের পুত্র দশরথদেব (১১৪৪-১২৮০খ্রি. পর্যন্ত) রাজত্ব করছিলেন। তার রাজধানী সোনারগাঁও এর বিক্রমপুর এয়োদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের দশরথের পর আর কোন দেববংশীয় রাজত্ব করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলমান ধর্মপ্রচারক এসে এদেশের বহুলোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে, অনেককে আবার জোর করে বা লোভ দেখিয়ে মুসলমান করা হয়। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের নিম্নবংশের লোক এবং বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান হয়ে গেল ব্যতিক্রম কিছু ছাড়া বাকীরা হিন্দু সমাজে চলে এল। বেল্লাল চরিত্রে উল্লেখ আছে হিন্দু সেন রাজারা বেনেদের (বৌদ্ধ বলে) সমাজে অপাঙতেয় করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ সংস্কৃতি হল প্রাচীন বর্জিত আধুনিক জোড়াতালি দেওয়া এবং স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি মিশ্রিত এবং এর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। বর্তমানে বাঙালি বৌদ্ধদের, সমন্বিত প্রয়াসে, সম্মেলন, প্রস্তাবাবলি এবং প্রকল্প প্রভৃতিতে সদিচ্ছা ব্যক্ত করার দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বৌদ্ধরা যেসব বিষয়ে সমস্যায় মুখোমুখি হচ্ছে সে সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে; এবং এ বিষয়ে সরকারি নীতি নির্ধারক ও বৌদ্ধদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রবণতাও বাড়ছে। অবশ্য বাস্তবায়ন সব সময় বৌদ্ধদের মতানৈক্য একটি বিশেষ কারণ। বিরাজমান অনৈক্য ও অন্তকোন্দল বৌদ্ধদের পশ্চাদপদতা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে; বঞ্চিত হচ্ছে, সবোপরি সমগ্রজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বতর্মানে বৌদ্ধদের যে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে তা অত্যন্ত ধীর ও অপর্যাপ্ত এবং সিদ্ধান্তহীন । তুর্কী আক্রমণে লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন বহু রাজপুরুষ ও বিদ্বজনও তাঁর সহগামী হন । আরো এনেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর বঙ্গ থেকে অনেকে চলে যান 'উদ্বাস্ত' হয়ে কামতা কামরূপ অঞ্চলে। এসব অঞ্চলে তাই প্রাচীন বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা কতকাংশে রক্ষা পেয়েছিল।[১৭৬] ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রায় লুপ্ত হল। এই শতকে এদেশে এক পরম সৌগত রাজা মধুসেন ভিন্ন আর কোন বিশিষ্ট বৌদ্ধের সন্ধান ও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রাম বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ দুর্গ: এখনও সেখানে অনেক বাঙালি বৌদ্ধ বাস করেন। সুতরাং মুসলমান বিজয়ের আগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল বলে মনে হয়। হিন্দু রাজারা সাধারণত অন্যধর্মের লোক সম্বন্ধে গোঁড়া হতেন। সুতরাং তাদের রাজ্য মুসলমানদের প্রবেশ ও বসতি স্থাপন সহজ সাধ্য ছিল না; কিন্তু বৌদ্ধরাজাদের রাজ্যে তা সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল, যেহেতু বৌদ্ধরাজাদের পরধর্ম সম্বন্ধে উদারতার অনেক প্রমাণ মেলে। "তবকাৎ-ই-নাসিরী লেখা আছে, বখতিয়ার খলজীর অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অতর্কিত আক্রমণের ফলে পবিত্র তীর্থ নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে সকোনাত (সঙ্কনাৎ) উত্তরবঙ্গ অভিমুখে চলে যান সঙ্কনাৎকে সমতট এর অপভ্রংশ মনে করা হয়। বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাঙলার উত্তরাঞ্চল অধিকার করার সময় প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, কামরূপ (ভারত) ও পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেন রাজাদের অধিকারে ছিল বলে প্রত্নপ্রমানে জানা যায়। উত্তরবঙ্গ ও পাশ্বর্বর্তি অঞ্চল অর্থাৎ সেকালের বরেন্দ্রভূমি (আরো প্রাচীন কালের পৌন্ড্র রাজ্য) খুব সম্ভব গৌড়দেশ নামে অধিক পরিচিত ছিল। লক্ষনসেন ও তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন নিজেদেরকে গৌড়েশ্বর (বাংলার রাজা) বলে অভিহিত করে ছিলেন ।

মুসলমানগণ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন।[১৭৭] বাঙলার উত্তরাকালে সেন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে। ঐতিহাসিকদের মতে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের পূর্ণাঙ্গ রাজধানী ছিল নদীয় তারা নবদ্বীপ। নবদ্বী নামের বিকৃত রূপ নদীয়া (<নদীপা <

Dhaka University Institutional Repository

নদীপ< নদ্বীপ < নবদ্বীপ) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. কানুনগো এবং আরো অনেক পণ্ডিতদের মতে ১২০৪-১২০৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে নবদ্বীপে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে আক্রমণ করে অধিকার এবং ধ্বংস করে। পরে তিনি লক্ষ্মণাবর্তীতে নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ বা নুদীয়হ শহর ছিল লখনৌতি নগরের কাছেই। এখানে প্রাচীন বৌদ্ধ হিন্দু যুগের অসংখ্য প্রত্নকীর্তির ধ্বংসাশেষ বিদ্যমান। কোন কোন পণ্ডিতদের মতে রাজাশাহী জেলার নওগা ও নাওগাঁ এবং মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ বা নুদীয়হ অভিন্ন। সে অঞ্চলটি ছিল প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন অর্ন্তগত বরেন্দ্র অঞ্চলের কোথাও।

পালদের পতনের পর সেন বংশ বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেনরা কর্ণাটের ক্ষত্রিয় বংশজ ছিলেন। তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সেবক ও প্রতিপোষক ছিলেন। ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে হেমন্ত সেন দিয়ে শুরু এবং ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন এ বংশের শেষ রাজা। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন ছিল বিক্রমশালী শাসক। গৌড়েশ্বর হিসেবে সেনদের রাজত্বকাল অর্ধশতাব্দী। গৌড়ে ও নবদ্বীপে সেনদের রাজধানী ছিল। তাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা। তারানাথের মতে, গোবিচন্দ্রের পর তাঁর ভ্রাতা ললিতচন্দ্র কিছুকাল রাজত্ব করেন। ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেশ অরাজক হয়। তারপর পালবংশীয় গোপালদেব রাজা হন। গোপালদেবের রাজত্ব কাল ৭১৫ থেকে ৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ। (বাংলা সাহিত্যের কথা বাংলায় পালবংশীয় রাজাগণ সূর্যবংশীয়। (চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি; গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৪) পাল রাজবংশ দেশজ, এর প্রথম নৃপতি গোপাল 'প্রকৃতিপুঞ্জ' বা জন সাধারণের দ্বারা মনোনীত....। [১৭৮] পালদের পরে এদেশে বর্মন ও সেনদের আবির্ভাব ঘটে। উভয় রাজ বংশই যে ঘোর বৌদ্ধধর্ম ছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণের কোন অভাব নেই। এদের রাজত্ব কালে ভারতের পশ্চিম বঙ্গেও বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। ওদন্তপর ও বিক্রমশীল বিহারের অস্তিত্ব থেকে বিহার প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তখনও টিকে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বর্মন সেনদের অধিকার তেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে কিছু কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকের অস্তিত্বে সেখানে ছিল বলে জানা যায়। এখানে ওখানে ছিটে ফোঁটা কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের কথা বাদ দিলে গোটা বাংলায় এদের সংখ্যা যে অতিনগণ্য ছিল, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধধর্মের শোচনীয় অবস্থা ও অধঃপতনে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়ে সহজযান, বজ্রযান তান্ত্রিকবাদ প্রভৃতি ধর্মমত প্রচারিত হয়। এই তান্ত্রিক সহজযান থেকে নাথধর্ম নামে একটি ধর্মমতবাদ প্রচারিত হয়। এ নাথধর্ম বাংলায় বেশ ভাল ভাবেই অস্তিত্ব ছিল। বৌদ্ধধর্মদের অনেকেই এই নতুন নাথধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ছিল বলে ধারণা করা হয়। ব্রাহ্মণ্য, লোকায়ত ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে এ ধর্মমত গঠিত হয়। বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম চর্চার আগমন ও

Dhaka University Institutional Repository

নির্গমশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বৌদ্ধ ও নাথ পণ্ডিতদের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সর্বজন বিদিত। সেন আমলে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে রাজদরবারে আসন লাভ করে থাকবেন, এ অনুমান যুক্তিসহ বলে ধরা যেতে পারে।

"তুর্কী আক্রমণের ফলে বিহারে ও বাংলায় চলল ধবংসের তাণ্ডব লীলা। তুর্করা নিজেরা ছিল দুধর্ষ, ভয়ঙ্কর জাতি; ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের নৃশংসতা ধবংস প্রবৃত্তি নতুন ধর্মোন্মাদনার বশে আরও উগ্র হয়ে উঠেছিল। যা মুসলমান ধর্মে নেই তাই তাদের পক্ষে ছিল ভ্রান্ত। হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা, বিহার, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবই তাদের বিচারে ছিল 'কুফেরি'। তারা রক্তে ও আগুনে প্রাচীন সাহিত্যে, পুঁথিপত্র, বিহারধবংস, সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তুর্কী বিজয়ের প্রথম পর্বটা ছিল ধবংসের পর্ব। খ্রিষ্ট ১২০০ থেকে খ্রিষ্ট ১৪৫০ অব্দ পর্যন্ত বাংলার জীবন, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুর্কী আঘাতে ও সংঘাতে, ধবংসে ও অরাজকতায় অবসন্ন হয়েছিল।

৩.৯ বৌদ্ধ জাতির গৌরবকীর্তি

প্রদীপের পরিচয় তার আলোকে। বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম প্রদীপের আলোক। বাংলার যম খ্যাতি প্রসিদ্ধি ও গৌরবের উত্তর সূরী বৌদ্ধ। বাংলায় বৌদ্ধ মত অতিপ্রাচীন। বাংলার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা বহু বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত প্রভূত ভাবে আলোচনা করেছেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বাংলাদেশ যথেষ্ট সহায়তা করেছে। বিজয় সিংহের কথা সর্বজন বিদিত। খনার বচন বলে যার খ্যাতি, সেই খনা সিংহল উপনিবেশের বঙ্গকন্যা। সিংহল রাজা পরাক্রমবাহুর (১২৪০-১২৭৫) সময়ে বাংলার বরেন্দ্র দেশ হতে মহাপণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতী সিংহলে যান এবং সেখানে বৌদ্ধ হন এবং রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভাজন হন তিনি ভক্তিশতক নামে কাব্য রচনা করেন। পরাক্রমবাহু রামচন্দ্রকে বুদ্ধাগম চক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করেন। অতীতের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করব, তবে অবশ্যই অতীতমুখো হাবার জন্যে নয়; মোটা দাগে কথাটা হচ্চে ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান পুর্ব পুরুষের গৌরবমন্ডিত উত্তরাধিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে আপন কালকে সঞ্জীবিত করে তোলতে। কোন দূর অতীতে আমাদের এই বাংলাদেশে বৌদ্ধদের আর্বিভাব, বিকাশ হয়েছিল, সেকালের জনপদ ও জনমানুষের পরিচয়, তাদের জীবনধারা, ধর্মীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব, সংস্কৃতি আলোচনা, উনিশ শতকে বৌদ্ধদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বহমানতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রার্সঙ্গিক তথ্য উদ্ঘাটন এবং সবটা মিলিয়ে সম্পর্কিত করে বিশ্লেষণ। মোটামুটি বাংলায় বৌদ্ধদের সেকালে ও একালের সামগ্রিকভাবে ধর্ম সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসমূলক বীক্ষা। উনিশ শতকে বাংলায় বৌদ্ধদের অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণ যদি অনুসন্ধান কারা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, সেকালের বৌদ্ধ নেতৃত্ব সাবির্কভাবে

Dhaka University Institutional Repository

যুগের সংকট ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বৌদ্ধদের ধ্যান-ধারণা ছিল সাধারণত পশ্চাদমুখী।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা উল্টো দিকে। আজ আমাদের অস্তিত্বের সংকট। ঐক্য সমন্বয় ও সাহসের লড়াইয়ের ডাক জাতীয় স্বার্থের জন্যে অপরিহার্য।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ে বিষয়ে পিএইচডি গবেষক মুস্তাফা মজিদ বলেছেন জাতির জাতি পরিচয়ের সম্মাননায় জাতিকে জাতিতে ঐক্য প্রয়োজন, প্রয়োজন সমবেত জন মানুষের যুথবদ্ধ প্রাণ প্রবাহে মূলস্রোতের আবহ সন্ধান।' পরবর্তী কালে সেটা বাঙালীর আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' নামে অতিহিত হত, সেটা প্রাচীন কালে বহু জনগোষ্ঠির আবাসস্থান হয়ে বহু জনপদে বিভক্ত ছিল। অন্তবর্তী কালে এদের অনেক নাম ছিল যথা– গৌড, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল, পুন্ড, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, কর্বট, তাম্রলিপ্তি, বারক, কঙ্ক, গ্রাম, গঙ্গরিড়, বর্ধমান, কজাঙ্গল, দন্ডভূক্তি, খাড়ি, নাব্য ইত্যাদি। এদের ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিল। এর সপক্ষে যে প্রমাণ আছে তা হচ্ছে উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত এক লিপি। তবে সমগ্র বাংলাদেশ যে মৌর্য সাম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিল তার সপক্ষে কোন সুনির্শ্চিত প্রমাণ নেই। (তুলনীয় নোয়খালী জেলার শিলুয়ায় প্রাপ্ত ব্রাহ্মী অক্ষরে ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত এক মূর্তিলেখ)। সম্ভবত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়েই সমগ্র বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হয়েছিল। [১৭৯] প্রাগৈতিহাসিক বাংলাদেশ, আর্য দ্রাবিড়দের সংঘাতের যুগ, বৌদ্ধ শাসনামল, হিন্দুদের শাসনামল, মুসলিম আমল, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ ও পাকিস্তানী শাসনামল অতিক্রম করে বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত বহু রাজা বাদশা, নগর-সম্রাট, গভর্ণর জেনারেল এ ভূখন্ডে তাঁদের শাসনকার্য চালিয়েছি। তাদের শৌর্য বীর্য, যুদ্ধ-সংগ্রাম, বিত্ত ঐশ্বর্যের কাহিনীতে জীবনধারা তথা সুখ-দুঃখের কথা ইতিহাসে বিরল। [১৮০] এ দেশে ব্যবসা উপলক্ষেই আর্য, মোঙ্গলীয়, দ্রাবিড় এবং সেমিটিক রক্তের সংমিশ্রণ ঘটা বাঙালি জাতির জীবনে খুবই সম্ভব ছিল। প্রাচীন কালে বাংলাদেশের সাথে উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশে, সিংহল, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, মালয়, জভা ও চীনসহ বহুদেশের বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ছিল। এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত নৌপথেই সঘটিত হত। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম, ৪থ শতাব্দী হতে বাংলাদেশে বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে জল ও স্থল পথে বাণিজ্যে সুখ্যাতি অর্জন করি ছিল।

"বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব শাখারই চর্চা হত। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজাদের আমলে জ্ঞান চর্চার সে ধারা নিঃশেষ হয়ে যায়।" বৌদ্ধ ভিক্ষুদের

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যচর্চার ভাষা বাংলা। পাল আমলে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয়। এচর্যাপদের জনক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। জৈন, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য সমাজ বাংলা ভাষাকে "রাক্ষস, পিশাচ, অসুর, দস্যু, স্বেচ্ছ (অস্পশ্য) ও পক্ষী শ্রেণীর ভাষা হিসেবে ঘৃনা করেছে। অপর দিকে এক শ্রেণীর বঙ্গীয় মুসলমান ও বাংলা ভাষাকে ছোট লোকের ভাষা, দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনীর কাফের ও মোনাফেকীদের ভাষা বলে অবজ্ঞা করেছেন।" (সাময়িক পত্রে ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা, সফি উদ্দিন আহমেদ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৫)

এছাড়া অনার্যদের বিভিন্ন নামে ডাকা হতো যেমন যবন, হুন, অন্ধ, পুলিন্দ আভির কিরাত, প্রভৃতি নিস্পাদ। বিশেজ্ঞদের মতে, খ্রিষ্টাব্দের দেড় হাজার বছর আগে বাংলার এক সুসভ্য জাতির বাস ছিল। এই জাতি ধান চাষ করতো, সম্বল ও নীলগাই শিকার করতো এবং শুকর পালন করতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, আর্যপূর্ব যুগে বাংলার অধিবাসীগণ সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছে, তারা শান্তি প্রিয় ও সুসমৃদ্ধ জাতি ছিল। (বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৭)

প্রাচীন কালে বাংলাদেশটা ছিল নানা জাতি উপজাতির বাসভূমি। রাঢ়, সুহ্ম, পুন্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন শব্দ গুলি প্রথম দিকে বোঝাত বিশেষ বিশেষ জাতি বা উপজাতিকে। ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, বাঙালীরা অষ্ট্রিক গোষ্ঠির বংশধর। (স্বদেশ অন্বেয়া, পৃষ্ঠা-২০) নৃ-বিজ্ঞানের মতে, বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিলেন অষ্ট্রিক গোষ্ঠির অষ্ট্রো-এশিয়াটিকও দ্রাবিড় জাতির মানুষ। বা তাঁরা ব্রহ্মদেশ ও শ্যাম দেশের মোন্ এবং কম্বোজের ক্মের শাখার মানুষদের আত্মীয়। এ জাতির মানুষেকেই বোধ হয় বলা হত 'নিষাদ বা নাগ'। আবার মঙ্গোলীয় বা ভোট চীনা গোষ্ঠির নানা জাতি উপজাতি যেমন, কোচ, মেছ, কোল, মুন্ডা, কাছারি প্রভৃতি। সম্ভবত এদেরই বলা হত কিরাত জাতি। এসব জাতি উপজাতি অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় কিংবা ভোট চীনা অথবা ভাঙা উপভাষা বলতেন। প্রাচীন কালে রাঢ় বলতে বোঝাত মধ্যপশ্চিম বঙ্গ, সুহ্ম বোঝাত দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গ, পুন্ড্রবর্ধন ভূক্তি বোঝাত উত্তর বঙ্গকে। আবার গৌড় ও উত্তর বঙ্গকে বরেন্দ্র বা বরেন্দী বলতো। বঙ্গ বলতে বিশেষ করে বোঝাত পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ)। সমতট, হরিকেল প্রভৃতি ছিল পূর্ব বঙ্গেরই দক্ষিণাঞ্চলের এক একটা ভাগের নাম। এসব নামের মধ্যে গৌড় ও বঙ্গ শব্দ দুটি সুপ্রাচীন ও সাহিত্য মতে স্বীকৃত। কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশের সাধারণ নাম 'বাঙলা' মুসলমান তুর্কী বিজেতারাই দেন। বাঙালি জাতির আদিম ইতিহাস ধূম্রজালে আবদ্ধ রয়েছে। ঐতিহাসিক গবেষণায় এর রহস্য সঠিকভাবে নিরূপন করা যায়নি। বৌদ্ধযুগের যে যৎসামান্য তথ্য জানা যায় তা খন্ডচিত্র প্রকাশ করেছে মাত্র। অন্যগুলো কল্পনাপ্রসুত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন 'আমার বিশ্বাস বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। ..... বাঙ্গালার ইতিহাস এখনো তত পরিস্কার হয়নি যে, কেহ নিশ্চিত করিয়া বলতে পারেনা বাঙ্গালা

Dhaka University Institutional Repository

Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নুতন। .....বাঙ্গালা Nineva ও Babylon হইতে প্রাচীন অথবা নুতন। বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নুতন....।

বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্য জাতির বংশোদ্ভূত নন। গবেষকদের মতে, বাংলা অনার্য জাতির আদি বাসস্থান। হার্বাট রিজলীর মতে, 'মোঘল জাতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব।' বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদদের মতে, 'মোঙ্গল ও দ্রাবিড় মানব ধারার রক্তের সংমিশ্রণে বাঙ্গালি জাতির সৃষ্টি। দ্রাবিড় ও আর্য শব্দটি মূলত ভাষা ভিত্তিক নাম, যারা এই ভাষায় কথা বলে তাদেরকে দ্রাবিড় ও আর্য বলা হয়। তারা আসলে কোন মানব গোষ্ঠি নয়। বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে অর্থাৎ প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর ইত্যাদি যুগেও এখনো মানুষের বসতি ছিল। সম্ভবত কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডাল ইত্যাদি বাঙ্গালার আদিবাসী। এদের সাধারণ সংজ্ঞা ছিল নিষাদ। দ্রাবিড় ও ব্রহ্ম তিব্বতীয় ভাষাভাষী কিছু জাতিও ছিল। এর পরে কিছু উন্নত শ্রেণীর লোক এখানে বাস করতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে এদেঁর সঙ্গে আর্যদের সংমিশ্রণের ফলে বর্তমানের বাঙ্গালী জাতি।' সিংহলের ইতিহাস গ্রন্থ মহাবংস নামক পালি গ্রন্থে আছে সিংহবাহুর ছেলে বিজয় ভগবান বুদ্ধের পরিনিবার্ণের কিছু আগে লঙ্কাতে বাঙালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মনসংহিতায় (২০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ২০০ খ্রি.) বঙ্গ আর্যাবতের মধ্যে মহাভারতে বাংলার অন্তর্গত তীর্থের নাম আছে। রামায়ণে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ জনপদ বলে উল্লেখিত। খ্রি. ৪ শতকের আগেই এখানে আর্য সভ্যতার মিশ্রণ ঘটেছিল। আলেকজান্ডারের সময় (৩২৭ খ্রি. পূ.) যে গঙ্গারিদাই জাতির বিশাল সাম্রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে সেটি বাঙলা সাম্রাজেই মনে হয়। [১৮১] ভূবিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশ বেঙ্গল বেমিনে অবস্থিত।

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের দেবতার পূজা পদ্ধতিতে বৈদিক ও পৌরাণিক আর্য ও অনার্য উভয় পদ্ধতির সমাবেশ হয়েছিল। ইনি হল ধর্মঠাকুর। অনেক গুলো আর্য অনার্য দেবতা মিলে ধর্ম ঠাকুর হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল "বাংলাদেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ১৮৯৭ সালে লেখা Discovery of living Buddhis Min Bengal প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করেছেন, ধর্মঠাকুর পূজাই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ।" (অনোমা, ২০০৩, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৩৩) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরের পরিচয় দিতে গিয়ে এঁকে বৌদ্ধমতের ধর্ম বলে স্থির করেছিলেন এবং ধর্মঠাকুরের প্রতীককে বৌদ্ধ চৈত্যের রূপান্তর মনে করেছিলেন। সেই থেকে সকলে ধর্ম পূজাকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি বলে ধরে আসছেন। ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বিশেষ ভাবে ঋণী। কারণ তাঁরা প্রথম বাংলাদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাসে বৌদ্ধ জনসমষ্টির অবদান সন্ধান এবং বহু বিলুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিস্কৃত চর্যাচর্যাবিশ্চিয় (চর্যাপদ, বৌদ্ধগান ও দোহা) এবং রচয়িতা সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন বাংলার সহজযানী বৌদ্ধ।[১৮২] বাঙালি সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যের উৎসধারায় বৌদ্ধদের অবদানের কোন আদি মধ্য ও মধ্য যুগের বাঙালিরা এ দেশে টিকে থাকতে দেয়নি। নির্মম ভাবে তারা পূর্বসুরী ভিন্নধর্মী জনসমষ্টির মূল্যবান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। ড. ভুপেন্দ্রণাথ দত্ত লিখেছেন বাংলা সাহিত্যে ..... প্রবল পাল যুগের কোন নির্দশন নাই। যৎসামান্য রক্ষিত হইয়াছে বা আবিস্কৃত হইয়াছে। পরের যুগের ব্রাহ্মণেরা বাঙালির শৌর্য বীর্য্যের ও গুনগরিমার চিহ্ন একেবারে মুছিয়া দিয়াছে। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, এই যে বাংলায় বৌদ্ধ কৃষ্টির সমস্ত চিহ্নই ব্রাহ্মণেরা বিলুপ্ত বা রূপান্তরিত করিয়াছে। হাজার বৎসর পূর্বে বাংলা বৌদ্ধ রাষ্ট্রিক প্রাধান্যের যে সব প্রতিভূ ছিল তাহার কোন চিহ্ন আজ নাই।

সে যুগের অমুসলিম বাঙালী কর্তৃক বৌদ্ধ বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিনাশের বহু উদাহরণ রয়েছে। সেকালে বৌদ্ধ বিদ্বেষী সামন্ত পুরোহিত হিন্দুরা বহু বৌদ্ধ উপাদানের রূপ পাল্টে তা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্তও করে নেন। যেমন, ধর্মঠাকুর এভাবেই এদেশের বৌদ্ধ জনসমষ্টির কৃষ্টি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও ঐতিহ্য সমস্তই হয়েছে বিলুপ্ত।

হর প্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি। তিব্বতে একটি বিশাল বিশ্বকোষ আছে। এর এক অংশের নাম 'তেঙ্গুর' অপর অংশের নাম ' কেঙ্গুর'। তেঙ্গুরের পরিচয় দিতে গিয়ে পাঁচ কড়ি বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, তেঙ্গুর বাঙালায় প্রচলিত বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য গ্রন্থ সকলের সানুবাদ সংগ্রহ মালা। [১৮৩] ঐতিহাসিক লামাতারা নাথের মতে, পাল আমলে সমগ্র মগধ বাংলাদেশের অধীনে ছিল। ধর্মপালের খালিশপুর তাম্রশাসনের দ্বাদশ শ্লোক থেকে জানা যায়, তিনি ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, গান্ধার, যবন, অবন্তী, কীর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। ধর্মপালের রাজত্ব কাল ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতে, ধর্মপালের অভিষেক কাল ৭৯০ থেকে ৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি ৩৫ বছর রাজত্ব করেন। ড. দানির মতে ধর্মপাল ৮১০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার পর তাঁর পুত্র দেবপাল পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

ধর্মপালদেবের সময় থেকেই গৌড় বঙ্গে সমৃদ্ধি দেখা দেয়। তাঁর সুদীর্ঘ শাসন কালে মগধের বিক্রমশীল বিহার, বিহারের ওদন্তপুরী বিহার, এবং পাহাড়পুরের সোমপুরী বিহার নির্মিত হয়। [১৮৪] বিখ্যাত গ্রন্থকার বৌদ্ধ হরিভদ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তর বঙ্গের লুইপা জীবিত ছিলেন। ধর্মপালের সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য এবং বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ পুনগঠিত হয়। এ সময় নতুন বৌদ্ধ মতবাদ বজ্রযান ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করে। Dr. Danli বলেছেন, This form of buddhism had strayed far away from the pristine religion of the Buddha and had imbibed many local elements common with orthodox systems. It was now surcharged with hindu tantric Ideas in philosophy and religion and was sensual in artistic expession.

Dhaka University Institutional Repository

[১৪৫] মহাযান বৌদ্ধ মতের একটি শাখা বজ্রযান, পাল আমলে গৌড় বঙ্গ ও মগধে তন্ত্র ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। এ সময় মহাযানের তান্ত্রিক বজ্রযান বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে নৈকট্য সম্পাদন করে । বিকৃত বজ্রযান থেকে উৎপন্ন হয় সহজযান ধর্ম। মহাযান বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে দিয়ে ছিলেন দক্ষিণেরই মনীষী নার্গাজুন এবং আর্যদেব। মহাযান মাহসাংঘিক মতেরই উত্তরধারা, (অনোমা, ২০০৩, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৩৩) বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে বৌদ্ধ (সংগীতি) চিন্তাবিদগণ ঐক্যমতে আসতে পারেনি এবং এ সম্মেলন সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে প্রাচীনপন্থী ও প্রগতিপন্থী কিংবা হীনযান (থেরবাদ) ও মহাযান এই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রাচীন পন্থীরা ছিলেন সংখ্যালঘু এবং নব্যপন্থীরা সংখ্যাগুরু। থেরাবাদীরা কঠোর কৃচ্ছসাধনার পথ, দারিদ্র্যের পথ ও বুদ্ধ প্রদর্শিত পথকেই প্রকৃত ধর্ম রূপে গ্রহণ করেন।

মহাযানীরা ধর্মকে করে নেন যুগোপযোগী। ফলে তার মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করে বহু অবৌদ্ধ ধ্যান ধারণা, আস্তিকবাদ, সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-সম্মত মতবাদ এবং আরো অনেক কিছু। পুরুষপুরের (এলাহবাদ) অসঙ্গ ও বসুবন্ধু মহাযানী মতে সাংখ্য ও যোগ মতের সংযোজন ঘটান। নাগার্জুন প্রচার করেন বৌদ্ধ দশর্নে "শূণ্যবাদ"। নিরীশ্বর মূর্তিপূজা বিরোধী বৌদ্ধ ঈশ্বরবাদী ও মূর্তিপূজক ধর্মে পরিণত হয়। এক মানুষী বুদ্ধ দার্শনিক ব্যাখার গুণে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধে পরিণত হন। (ড. লুৎফর রহমান, বৌদ্ধ চর্যাপদ, ১৯৯০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩৫) বৌদ্ধ সহজিয়া বাংলায় আট শতক থেকে এগার শতকের মধ্যবর্তী সময়ে আত্ম প্রকাশ করে।

মহাযানে বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের প্রধান দুটি শাখার কালচক্রযান ও বজ্রযান। এই বজ্রযান শাখা থেকে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদের উদ্ভব হয়। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাগীতি ও দোহাকোষ রচনার মাধ্যমে সহজিয়া ধর্মতত্ত্ব, সাধনারীতি ও আধ্যাত্মবাদী মতাদর্শ ব্যক্ত করেন। সরহপা মতান্তরে লুইপা সহজিয়া মতবাদকে প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি ও জনপ্রিয়তা দান করেন। মহাযানী বৌদ্ধ আচার্য, নার্গজূন অসঙ্গ, বসুবন্ধ ছিলেন এই মতবাদের উদগাতা।

বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুণরুত্থানের পূর্বে সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ তাঁদের মত প্রকাশ করেন। বঙ্গের তীর্থিক ও বৌদ্ধগণের ধর্ম বিতন্ডার ফলে উভয় ধর্মের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টায় কিংবা প্রতিবেশিত্য সূত্রে উভয়ের সংমিশ্রণে পশ্চিমবঙ্গে সদ্ধর্মের এবং পূর্ববঙ্গ নাথপন্থার উৎপত্তি হয়। চুরাশি জন সহজিয়া বৌদ্ধচার্যগণের মধ্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা, লুইপা, হাড়িপা, বিরূপা, ধামপা প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী নানা ইতিহাস ও তথ্য প্রমাণে মীননাথকে সর্বপ্রথমে সিদ্ধাচর্যা বলা হয়। নাথ সাহিত্য মীননাথের নামান্তর মৎসন্দ্রনাথ। তাকে বঙ্গের আদি কবি বলা হয়।

দুষ্টমাতর্লম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যান অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্বাণি পরশুভির্শ্চিত্ত্বা বহষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমনৈশ্চূর্নীকৃত্য চৈরং দুষ্টমত ধ্বংস মাচরন

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভয়োবর্ততে। শঙ্কর বিজয়, দীনেশ চন্দ্রসেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত অর্থাৎ অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমূখ্য দিগকে অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত করিয়া তাহাদের মস্তক কুঠার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া অনেক উদুখলে নিক্ষেপ করিয়া মুষলভ্রমণ দ্বারা চূর্ণ করিয়া এইরূপে দুষ্টমতের ধ্বংস আচরণ করিয়া তিনি নির্ভয়ে থাকিতেন। বাঙ্গালী মীননাথ বা মৎচসান্দ্রনাথ বাংলা ভাষার আদিম লেখক আর তান্ত্রিক বৌদ্ধমত সহজযানের প্রবর্তক। এই সহজযান বা সহজসিদ্ধি তান্ত্রিক বৌদ্ধমতই হলো নাথধর্ম। এই নাথপন্থা বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার শূন্যপদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পাল আমলে (৮ম-১২শ শতক) বাংলাদেশ বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটে। আট শতকে দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম যখন লুপ্ত হতে বসে সে সময় বাংলার মাটিতেই বৌদ্ধধর্ম স্বগৌরবে লালিত হয়। নালন্দা, বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী, শালবন, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় এইসব বিহারে অসংখ্য বিদ্যার্থী শিক্ষা লাভ করেছেন। সুদূর তিব্বত, চীন, জাভা, কাশ্মীর থেকে এদেশে এসে বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সাহিত্য সর্ম্পকে বিদ্যাজন করেছেন। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশে পাল রাজাদের অবদান স্মরণীয়। পাল আমলের তাম্রানুশাসন থেকে জানা যায় এই বংশের রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের পরম পৃষ্টপোষক ছিলেন [১৮৬] তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল নালন্দার একটি বিহার এবং অনেক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পাহাড়পুরের সোমপুর, বিক্রমশীল বিহার, ওদন্তপুরী বিহারসহ পঞ্চাশটি বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। [১৮৭] ধর্মপালের পুত্র দেবপালের সময়ে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারের প্রভূত উন্নতি হয়। তখন ইহা বৌদ্ধ ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক ভাবে প্রসিদ্ধ অর্জন করে। উল্লেখ্য যে ধর্মপাল ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক হরিভদ্রের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং দেবপাল বৌদ্ধমতের অনুরাগী ইন্দ্রগুপ্তকে নালন্দার আচার্যরূপে নিয়োগ দান করেন। [১৮৮] পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন।

পাল রাজারা সব সময় উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। সমভাবে ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন সময়ে ভূমি দান করেছেন। মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি, গণেশমূতি স্থাপন করেন। কুমিল্লার মুন্দুক মূর্তির গায়ে শ্রী গোপালদেব এবং নারায়ণপুর মূর্তির গায়ে শ্রীমান মহীপালদেব এর নাম রয়েছে। তিনটি হিন্দুমূর্তির গায়ে এই নাম লেখা আছে।[১৮৯] গোপাল প্রতিষ্ঠিত পাল বংশের রাজাদের মন্ত্রী বা সচিব সাধারণত দেখা যায় ব্রাহ্মণদের যেমন ধর্মপালের গর্গ, দেবপালের দর্ভপানি, কেদারমিশ্র প্রমুখ। নারায়ণ পাল পর্যন্ত গর্গ পরিবার উত্তরাধিকার সূত্রে মন্ত্রিতে থেকেছে। .... পাল বংশের ১৮ জন বা ২০ জন নরপতি রাজা শাসন করেন বলে জানা যায় ৭৫০ অথবা ৭৫৬ থেকে ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার'শ বছর রাজত্ব করেন। তাদের 'জনকভু' অর্থাৎ পিতৃভূমি বরেন্দ্র অঞ্চল বা

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গ বলে ধরা হয়। পাল আমলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান পরিচায়ক বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি। ওদন্তপুরী,সোমপুর এবং বিক্রমশীল বিহার উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে ত্রৈকুটক (পশ্চিমবঙ্গ), দেবীকোট (উত্তরবঙ্গ), পণ্ডিত বিহার (চট্টগ্রাম), পট্টিকেরক ও সন্নগড় (পূববঙ্গ) বিক্রমপুরী (বিক্রমপুর) এবং জগদ্দল বিহার (বারেন্দ্রী) প্রভৃতি বিশিষ্ট। বৌদ্ধতন্ত্র ও জ্ঞান সাধনার অন্যতম কেন্দ্র চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার। ফুল্লহরি বিহারের বৌদ্ধ আচার্যগণ তিব্বতী পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ রচনা করেন। জগদ্দল মহাবিহারে অবলোকিতেশ্বর এবং মহাতারার অর্চনা হয়। এখানকার আচার্যরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ করেন। তিব্বতী গ্রন্থ ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে আরো উল্লেখ আছে পাহাড়পুরের দীপ গঙ্গের হলুদ বিহার, পট্টিকেরক নগরীতে কনক বিহার, বগুড়ার শীলবর্ষ, নদীয়া জেলার সুবর্ণ বিহার বৌদ্ধ সাধনা কেন্দ্র। দেবপালের পরবর্তী পাল রাজগণ প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বিগ্রহপাল বা শূরপাল, ন্যায়পাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, মহীপাল, নয়পাল, মদনপাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার বৌদ্ধ ইতিহাসকে অন্যতম মহাদার্শনিক ও পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর, রত্নাকর শান্তি প্রমুখের আবির্ভাব এই যুগটি স্মরণীয় পরবর্তীতে রামপাল কৈর্বতদের হাত থেকে পাল রাজাদের জনকভূ বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ছিলেন পাল বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। এ সময় রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরে বিখ্যাত জগদ্দল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধচার্য অভয়াকরগুপ্ত তাঁর রাজত্বের সমসাময়িক। অপর এক বৌদ্ধ নৃপতি মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব। তাঁর রাজত্বকাল সম্ভবত ৯৫০ খ্রীষ্টব্দের মধ্যে কোন সময়। নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "দশম শতকের পূর্বার্দ্ধে পূর্ববঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব নামে নরপরি রাজত্বের খবর পাওয়া যায়: তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। জানা যায় রাজা কান্তিদেবের পিতা ছিলেন বৌদ্ধ নাম ধনদত্ত। 'পরমসৌগত' কান্তিদেবের মা ছিলেন শৈব রাজকুমারী শিব প্রিয়া।"[১৯০] দশম শতকের শেষার্ধ্যে পূর্ববঙ্গে চন্দ্রবংশীয় রাজত্বের সূচনা হয়। তারা ছিলেন বৌদ্ধ পরমসৌগত। মৃগ মূর্তি লাঞ্ছিত, ধর্মচক্র তাঁদের রাজকীয় পট্টে অঙ্কিত ছিল।

বৈদিক সাহিত্যে, ব্রাহ্মণ্য বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বৃহদ্ধর্ম পুরাণ সহ অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে বারংবার বাংলা প্রাচীন অধিবাসী মল্ল, শবর, বঙ্গ, নিষাদ প্রভৃতি জাতকে দাস, দস্যু, অসুর,পক্ষী, প্রভৃতি বলে নিন্দা হেয় প্রতিপন্ন , ছোট করে অন্ত্যজ জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলায় অনার্য আর্য সংমিশ্রণে সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন নতুনভাবে গড়ে উঠে। বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে বাংলার আদি অধিবাসী বৌদ্ধ এবং গৌতম বুদ্ধের মতাবলম্বী প্রাচীন কালে বাংলার বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল সর্বত্র। অষ্টম শতাব্দী দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল রাজারা বাংলা শাসন করেন। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তীতে সেনরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও স্তম্ভ স্বরূপ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠায় তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বাংলায় বর্ণ বৈষম্য ও সমাজবিন্যাস ঘটেছিল সেনযুগে কিংবদন্তী অনুযায়ী সেনরাজা বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি নতুন করে সামাজিক সংগঠনের একটা রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হয় এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে তাদের স্থান নির্ণয় করবার প্রয়োজনীয়তা সেনযুগেই অনুভূত হয়। এর ফলে বাংলাদেশে নানাজাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়। সেনরাজত্বের অব্যবহিত পরে রাঢ়ে রচিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণো নানা জাতি উপজাতির উল্লেখ আছে।

প্রাচীন পালি সাহিত্যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এবং প্রাচীন ইতিহাসে পোদ জাতির নাম পাওয়া যায়। ইতিহাসে উল্লেখ আছে এই বাংলায় পোদরা খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি ছিল। এই পোদ জাতি বাস ছিল প্রাচীন বাংলার উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে। পোদরা ছিলেন পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় বংশজাত। প্রাচীন বরেন্দ্র জনপদে পৌন্ড্ররা পোদ জাতি নামে পরিচিত হয়। এই পৌন্ড্র জাতি থেকে বাংলায় সর্ব প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ পৌন্ড্র নগর নামকরণ হয়। এই পোদ বা পৌন্ড্র জাতি বাংলার আদি অধিবাসী। এরাই রচনা করেছে বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বুনিয়াদ। বিস্তৃত শিরস্কতা আলপীয় নরগোষ্ঠি লোক বাঙালীর পূর্বপুরুষ। তবে এরাও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। এদের সংমিশ্রণ ঘটে ছিল কিছু পরিমানে অস্টিক ও দ্রাবিড় ভাষাবাষী লোকদের সঙ্গে। পোদ, বাগদী, মল্ল(মাল), শবর, পৌন্ড্র, সদগোপ ইত্যাদি বাংলার প্রাচীন জাতির বাস উত্তরবঙ্গে। এসব জাতিরা সকলে ছিলেন বৌদ্ধ। তাদের প্রিয়কর্ম ইতিহাসের প্রত্নউপাদান ও সাহিত্যাবদান তা প্রমাণ করে। প্রাচীন ইতিহাস মতে, পাল ও শূরবংশীয় রাজারা এ বংশজাত ছিলেন ব্রাহ্মণ্য শাসনামলে হিন্দুধর্ম ধর্মান্ত রিত হয়ে তারা বর্ণ গোত্র এবং জাতি সম্বন্ধে বিশেষ বৈষম্যের স্বীক্ষর হয়। পরিণত হয় নিন্মশ্রেণীর তফসীল সম্প্রদায় ও নিন্মজাতিতে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনামলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে। ফলে, তারা প্রাচীনত্ব, কৃষ্টি; ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবেই হারায়। মঞ্জুশ্রী মূলকল্প নামক প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্যভাষাভাষী লোকেরা অসুর জাতিভূক্ত। যদিও আলপীয়রা আর্যভাষাভাষী ছিল।

'অসুর' বলতে আর্য পূর্ব যুগের ভারতের এক দেশজ জাতি বুঝাত বৈদিক সাহিত্যে, দাস, দস্যু, নিষাদ প্রভৃতি আরো অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। বৈদিক আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের অনেককেই অনার্যভাষাভাষী বলা হয়েছে। আদিতে বাংলায় কৌম গোষ্ঠিক সমাজ ছিল। এ সমাজে জাতিভেদ ও পদাধিকাতের ঘটিত বৃত্তিভেদ ছিল না। কৌম জাতির অন্যতম ছিল পুন্ড্র ও কর্বট। মনে হয়

Dhaka University Institutional Repository

পুন্ড্রদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি ও কর্বটদের বংশধর হচ্ছে কৈবর্ত। উল্লেখ যে পোদ জাতির সাথে বাংলার মুসলমানদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক প্রভেদ নেই।

খ্রীষ্টপর্ব যুগে থেকেই বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কিন্তু গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু গুপ্তযুগের পরে পালরাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বাংলাদেশে প্লাবিত হয়ে গিয়ে ছিল। সুতরাং সে যুগে জাতিভেদের যে বিশে কড়াকড়ি ও বর্ণ বৈষম্য নিয়ম ছিল না। পাল রাজাদের পরে সেনরাজাগণ বাংলায় আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং নতুন করে আবার জাতি বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু পালা রাজাদের চারশ বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকারি হয়ে গিয়েছিল এর ফলে বহু শংকর জাতি সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় বাংলার শংকর জাতিসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল- ১। উত্তম শংকর ২। মধ্যম শংকর ৩। অন্ত্যজ। প্রাচীন ইতিহাসে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালিরা বর্ণ শংকর জাতি হিসেবে অভিহিত। জাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে বাঙালির দেহ আদি অস্ট্রেলিয়া দ্রাবিড, আর্য ও মঙ্গোলীয় রক্তধারার এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন হয়েছে।

বাঙালীর জাতিসমূহের আদি নিবাসস্থল সম্পর্কে নৃতাত্ত্ববিদগণ বলেছেন বাংলা ছিল কৌম-সমাজের দেশ। এই সমাজের মধ্যে ছিল বিভিন্ন বৃত্তিধারী গোষ্ঠী। বাংলা ছিল তন্ত্রধর্মের লীলাক্ষেত্রে। পরে যখন বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন বৌদ্ধ পাল রাজারা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন করে। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা গোপালের সময় (৭৫০-৭৭০) থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে গোবিন্দ পালের সময় (১১৬১-১১৬৫) পর্যন্ত পালবংশই বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। শেষ পালরাজা পলপাল রাজত্ব করেন ১১৬৫ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। এরই রাজ বংশের ক্রমাগত সাড়ে চারশো বছর (৭৫০-১২০০) রাজত্ব করা বাংলার ইতিহাস এতে অনন্য সাধারণ ঘটনা। ড. অতুলসুর বাংলার মুসলমানদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছের। যথা- ১। আগন্তুক মুসলমান ২। ধর্মান্তরিত মুসলমান ও ৩। উভয়ের মধেক্য সংমিশ্রিত মুসলমান।

এদের মধ্যে বাংলায় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। কারণ বাংলায় মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি প্রথম বাংলা জয় করেন। সেই থেকে শুরু করে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা দেওয়ানি গ্রহণ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশত বৎসর বাংলা মুসলমানদের অধীনে ছিল। মোটামুটি বাংলার মুসলমানগণ উদ্ভব হয়ে ছিল এই সাড়ে পাঁচশ বৎসরের মধ্যে। সেজন্য মুসলমানেরা সকলেই ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমান ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ড.ওয়াইজ (Dr.Wise) বলেছিলেন। বস্তুত চতুর্দশ শতাব্দীতে কিছু কালের জন্য মুসলমান সুলতানরা পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁ হতে রাজত্ব করেন ছিলেন। তাঁরা পীর, দরবেশ ও মোল্লা নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ হিন্দুদের গণহারে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মান্তরিত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান জালালুদ্দিনের সময় (১৪১৪-১৪৩০ খ্রি.) এই ধর্মান্তরিত করার অভিযান তুঙ্গে উঠেছিল। দুর্বল নিম্নসম্প্রদায় হিন্দু বৌদ্ধদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল হয় কোরান গ্রহণ কর, আর তা নয়ত মৃত্যু বরণ কর। প্রাণ ভয়ে অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিল। যারা অস্বীকৃত হয়েছিল, তারা কামরূপ, আসাম, নেপাল, তিব্বত গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর (১২০৪) শুরুতেই সেন বংশের তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলেই তুর্কি বীর বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা মুসলমানদের হাতে চলে আসে। তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীন ছিল। পরের পঞ্চাশ বছর (১৫৩৯-১৫৭৬) বাংলা পাঠানদের অধীনে চলে যায়। তার পর ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট আকবরের (১৫৭৬) আমলে বংলা মুঘল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন (১৭৫৭) বাংলা মুঘলদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দু বৌদ্ধরা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' দ্বারাও আকৃষ্ট হত। খানকাগুলি ছিল মসজিদ ও দরগার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া-দাওয়া দুইই পাওয়া যেত। (ড. অতুলসুর, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলিকাত, ১৯৭৯.পৃষ্ঠা-৫৬) এছাড়া ছিল পদস্খলিত বর্ণ বৈষম্যের স্বীকার নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সমমর্যাদার স্থান পেতেন। ব্রাহ্মণ বাদের অত্যাচার হিন্দুদের ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বাঙালী এক প্রতিভাশালী জাতি। তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তার ধর্মীয় চিন্তাধারা, জাতি বিন্যাস, সমাজগঠন ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা। বৌদ্ধ পণ্ডিতরাই বাংলা তথা পৃথিবীতে প্রথমে শিক্ষার আলোকবার্তকা জ্বালিয়ে ছিলেন। জ্ঞান শিক্ষা সাহিত্যচর্চার আদি পুরুষ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ভিক্ষুগণ। বাঙালি বৌদ্ধদের বলা হয় আত্মবিস্মৃত জাতি। সে ভুলে গিয়ে ছিল তার প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনাচার। একটি জাতির কর্ম-কীর্তি সভ্যতা তথা জীবনের কথা দিয়ে তৈরি হয় ইতিহাস, ইতিহাস একটি জাতির অতীতের দলিল, কালের দর্পণ, সময়ের সাক্ষ্য, জাতির চলমান পদচিহ্ন ও প্রেরণা উৎস, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও আমাদের রাস্তা।

কোন বিশ্বাস, রীতি রেওয়াজ মূল্যবোধ, ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক কর্মকান্ড যা যুগ পরম্পরায় কোন বংশ, গোত্র, সমাজ বা জাতিকে স্থায়ী আসন লাভ করছে, তাকেই বলা হয় ঐতিহ্য জাতি ও বংশগত উত্তরাধিকার। ইংরেজীতে যাকে Custom, Heritoge, Tradition বলে। ঐতিহ্য সমাজগত, জাতিগত, সভ্যতার স্বাক্ষর। ঐতিহ্যের মাধ্যমে একটি সমাজ জাতির বৈষয়িক আধ্যাত্মিক উন্নতি জগত সভ্যতায় তার অবদানের পরিচয় ফুঠে উঠে। তার মন মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, ধর্ম-সংস্কৃতি, মূল্যবোধের বাহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে জাতি যত সমৃদ্ধ, রুচিশীল ঐতিহ্যের অধিকারী, অতীত কর্মকীর্তিতে জাতির যত উন্নত, সে জাতিকে অবশ্যই তত সভ্য জাতি বলতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে। ঐতিহ্য দিয়ে কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠির অতীত ও বর্তমানে পরিচয় ফুটে উঠে। তাই প্রাচীন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে হবে, চর্চা করতে হবে। এর সঙ্গে ইতিহাসের রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। ঐতিহ্যও অতীতের দলিল, ইতিহাসও তাই। ইতিহাসে লেখা থাকে কোন কাগজে, পত্রে বা ফলকে, ঐতিহ্য লেখা থাকে চরিত্রে, কর্মকীর্তিতে, নীতি আচরণ। সচেতন সমাজ জাতি তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করে সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচার যুক্ত থাকে। তবে ঐতিহ্য মানেই সৎ সুন্দর নয়। পূর্বপুরুষরা করত বলেই ঐতিহ্য মাত্রই বরণীয় তাও নয়। বৌদ্ধধর্ম অন্ধবিশ্বাসের সুস্পষ্ট বিরোধী।

ঐতিহ্য একটি জাতির জীবনে চলমান ইতিহাস। এ দিয়ে একটি জাতির অতীত বর্তমানকে চেনা যায়, তার ধর্মবোধ, জীবনবোধকে জানা যায়। বলা যায়, তার জীবনে জ্ঞান চিন্তা ও কর্মের বাস্ত বতা, প্রাগ্রসণ, উন্নত ঐতিহ্য উন্নত জাতির পরিচায়ক। তাই সুন্দর পরিশীলিত ঐতিহ্যতে সংরক্ষণ করতে হয়। যা অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, অরুচিকর তা বর্জন করা দরকার।

ঐতিহ্য বিমুখ জাতি ইতিহাস বিমুখ জাতির মতই অচেতনতার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। মানুষের নানা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক জীবন আচারের প্রাচীন পুরকথাই ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের ইতিহাসের মৌলিক উপাদান। অভিধানে একেই বলা হয়েছে A tale or belief or custom or paactice transmitted orally or handed down from generation to generations একেই tradition এবং cultural heritage বলা হয়েছে। বৌদ্ধরা বাংলার আদি অধিবাসী এবং একটি সুসভ্য ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জাতি। বৌদ্ধরাই বাঙালি জাতির বুনিয়াদ। কিন্তু কালের পরিক্রমায় বৌদ্ধরা ক্রমশ হয়ে পড়েছে ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হীন, বিমুখ এক জাতি, সময়ে চোরবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে গৌরবোজ্জ্বল বৌদ্ধ অতীত। বর্তমানে বৌদ্ধদের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনা হ্রাস পাচ্ছে। আজ বৌদ্ধদের উচিত হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা; চর্চা করা। অতীতের মহৎ ও সমুজ্জ্বল বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরণ করা। যারা আমাদের জাতীয় চেতনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অগ্রপুরুষ তাদের স্মরণ করা। যে চরিত্রে আদর্শ স্থানীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় জাতির জন্য সংরক্ষণ করা।

প্রাচীন বিদ্যাপীঠ বৌদ্ধ বিহার এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ফিরে তাকাই প্রকৃত অর্থে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার সূতিকাগার বৌদ্ধ বিহারকে সমার্জন করতে হবে। এক বিংশ শতাব্দীর নতুন দিগন্তে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই। ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় যে, উপমহাদেশের সুপ্রচীন বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি এই বাংলার একটি গর্বিত উত্তরাধিকারী। একটি জাতি নিজ ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতির রঙেই নিজ স্বকীয়তায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। জীবন থেকে এ উপাদান গুলিকে যদি বিনষ্ট করা যায়, সে জাতি হারিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীকার, গণতন্ত্রের এ আত্ম প্রতিষ্ঠার দিনে তাই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির স্বকীয়তা রক্ষা করতে হবে। 'বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষুরাই পৃথিবীতে প্রথম শিক্ষার আলোকবার্তিকা জ্বালিয়ে ছিল। বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন এবং জ্ঞানচর্চায় বৌদ্ধ বিহার শিক্ষা প্রসারে ঐতিহাসিক ভাবে এক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নানা কারণে বৌদ্ধ বিহার এই গৌরবময় ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম পরাক্রমশীলতা এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম কোণঠাসা বা মৃতপ্রায় হয়ে যায়।

বাংলাদেশে মূলত চট্টগ্রাম কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বৌদ্ধদের বসবাস। কুমিল্লা, নোয়াখালী, লাকসাম এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক রয়েছে। পটুয়াখালী এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় আদিবাসী বৌদ্ধ রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা দীক্ষা, উন্নয়ন সমৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে, দেশের এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের বিষয় বিবেচনা করলে এদেশে বৌদ্ধদের অবস্থান খুব একটা উজ্জ্বল নয়। বৌদ্ধদের এ পশ্চাৎপদতার মূল কারণ হচ্ছে, ধর্ম বিমুখতা, ধর্মের সাথে সমন্বয়হীনতা, অনৈক্য, অবিশ্বাস অনগ্রসরতা, অতীত ঐতিহ্য বিমুখতা এবং সর্বোপরি হীনমন্যতাবোধ। বৌদ্ধধর্মের যে মূল বাণীর সাম্য, মৈত্রী, করুণা, সহনশীলতা, উদারতা, মানবিকতা, অহিংসার শিক্ষা তা সর্বোতভাবে জীবনের সাথে সংযোগ ঘটাতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে বিভিন্ন রাজবংশের ও শাসনকর্তাদের তালিকা

পাল বংশের রাজাদের রাজ্যকাল ও অবদান

ক্রমিক নং	রাজার নাম	রাজত্ব কাল	রাজত্বের সময়	পাল রাজবংশের অবদান
০১	গোপাল	৭৫০-৭৭৫ খ্রি.	২৫ বছর	**ক. রাজ্য বিস্তার :** ধর্মপাল ও দেবপালের সময় পশ্চিমে কাশ্মীর ছাড়িয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা গান্ধার পর্যন্ত, উত্তরে নেপাল, পূর্বে আসাম, দক্ষিণে বিন্ধ্যাপর্বত পর্যন্ত রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। **খ. শিল্পকলা, স্থাপত্য ও শিক্ষা বিস্তার :** চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে নতুন রীতি গড়ে ওঠে। পাল যুগের পুঁথিচিত্র বিশ্বখ্যাত। সোমপুর ও বিক্রমশীল বিহারের পোড়ামাটির ফলক চিত্র বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। সোমপুর বিহারের স্থাপত্যরীতি অনুকরণ করে ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ও কম্বোডিয়ায় বৌদ্ধ বিহার ও ইমারত নির্মিত হয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পাল রাজাদের অর্থানুকুল্যেই পরিচালিত হত। সোমপুর ও বিক্রমশীলসহ ৫০টি মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন পালা জারা। অতীশ দীপঙ্করের মতো জ্ঞান তাপসদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন পাল রাজাগণ। **গ. বাংলা ভাষার সৃষ্টি :** পাল রাজাদের সময়েই মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নিজস্ব রূপে বাংলা ভাষা বিকশিত হতে শুরু করে। রচনা হয় বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ
০২	ধর্মপাল	৭৭৫-৮১০ খ্রি.	৩৫ বছর	
০৩	দেবপাল	৮১০-৮৪৭ খ্রি.	৩৭ বছর	
০৪	শুরপাল	৮৪৭-৮৬০ খ্রি.	১৩ বছর	
০৫	বিগ্রহপাল	৮৬০-৮৬১ খ্রি.	০১ বছর	
০৬	নারায়ণপাল	৮৬১-৯১৭ খ্রি.	৫৬ বছর	
০৭	রাজ্যপাল	৯১৭-৯৫২ খ্রি.	৩৫ বছর	
০৮	গোপাল-২	৯৫২-৯৭২ খ্রি.	২০ বছর	
০৯	বিগ্রহপাল-২	৯৭২-৯৭৭ খ্রি.	০৫ বছর	
১০	মহীপাল	৯৭৭-১০২৭ খ্রি.	৫০ বছর	
১১	নয়পাল	১০২৭-১০৪৩ খ্রি.	১৬ বছর	
১২	বিগ্রহপাল-৩	১০৪৩-১০৭০ খ্রি.	২৭ বছর	
১৩	মহীপাল-২	১০৭০-১০৭১ খ্রি.	০১ বছর	
১৪	শুরপাল-২	১০৭১-১০৭২ খ্রি.	০১ বছর	
১৫	রামপাল	১০৭২-১১২৬ খ্রি.	৫৪ বছর	
১৬	কুমার পাল	১১২৬-১১২৮ খ্রি.	০২ বছর	
১৭	গোপাল-৩	১১২৮-১১৪৩ খ্রি.	১৫ বছর	
১৮	মদনপাল	১১৪৩-১১৬১ খ্রি.	১৮ বছর	
১৯	গোবিন্দপাল	১১৬১-১১৬৫ খ্রি.	০৪ বছর	
২০	পলপাল	১১৬৫-১২০০ খ্রি.	৩৫ বছর	

সেন রাজাবংশের রাজাদের কার্যকালসহ তালিকা :

ক্রমিক নং	রাজার নাম	রাজত্বকাল খ্রিস্টাব্দ	রাজত্বের সময়কাল
০১	হেমন্ত সেন	১০৮০-১০৯৬	১৬ বছর
০২	বিজয় সেন	১০৯৬-১১৫৮	৬২ বছর
০৩	বল্লাল সেন	১১৫৮-১১৭৯	২১ বছর
০৪	লক্ষণ সেন	১১৭৯-১২০৬	২৭ বছর
০৫	বিশ্বরূপ সেন	১২০৬-১২২৫	১৯ বছর
০৬	কেশব সেন	১২২৫-১২২৮	৩ বছর

সমতটের রাজাগণ:খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকেই প্রাচীন বাংলার পূর্বাঞ্চলে সমতট রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন রাজবংশ দীর্ঘকাল ধরে এই রাজ্য শাসন করেন।

খ্রিস্টিয় ৫০৭-৮ সালের দিকে সমতটের রাজা বৈন্যগুপ্তকে এ অঞ্চলের প্রথম স্বাধীন রাজা বলে ধারণা করা হয়। 'দশ আদিত্য' ও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণকারী এই রাজা নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। নালন্দায় প্রাপ্ত একটি সিল এ তাঁর মহারাজধিরাজ উপাধিটি সম্পর্কে জানা যায়। কুমিল্লার ময়নামতিতে ১৮০৩ সালে রাজা বৈণ্যগুপ্তের তাম্র শাসন পাওয়া যায়।

খড়্গ বংশ : খড়গ বংশের রাজারা ৬২৫ থেকে ৭০৫ সাল পর্যন্ত আশি বছর এদেশে তাঁদের রাজধানী জয় কর্মান্ত বাসক (বড় কামতা) হতে রাজ্য শাসন করেন। সমতটের খড়্গ রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। এ বংশের রাজাগণ হল-খড়্গোদ্দম, পুত্র জাতখড়্গ তার পুত্র দেব খড়্গ ও দেব খড়্গের মহিসী প্রভাপতি। তার পুত্র রাজ রাজভট্ট এবং বলভট্ট এ বংশের শেষ নৃপতি।

১. রাজা খড়্গোদ্যম

২. রাজা জাত খড়্গ

৩. রাজা দেব খড়্গ ও রাণী প্রভাপতি দেবী

৪. রাজা রাজখড়্গ

৫. রাজা বলভর

রাত বংশ: প্রাচীন সমতট অঞ্চলে ৬৪০ থেকে ৬৭০ সাল পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেন। রাত বংশের রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১। রাজা জীব ধারণ রাত

২। রাজা শ্রী ধারণ রাত

৩। রাজা বল ধারণ রাত

দেববংশ: ময়নামতি লালমাই এলাকার তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, অষ্টম শতকের প্রথম দিকে দেববংশের স্বাধীন রাজারা সমতট শাসন করেন। এরা শ্রী বঙ্গাল মৃগাঙ্কস্য, পরম ভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করতেন।

১। রাজা শান্তিদেব

Dhaka University Institutional Repository

২। রাজা বীরদেব

৩। রাজা আনন্দদেব

৪। রাজা ভবদেব

চন্দ্র বংশ: ময়নামতি লালমাই এলাকার তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, ৮৬৫-১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শক্তিশালী চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা সমতট রাজ্য শাসন করেন।

বরেন্দ্র অঞ্চলে উদ্ভূত বলেই গোপাল বংশ বাঙালীর অকারণে গৌরব গর্বের অবলম্বন হয়েছে। তবু পাটলিপুত্র কেন্দ্রীক রাজবংশ দিয়েই আমরা আমাদের ইতিবৃত্তান্ত শুরু করি। কারণ জৈন, বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ওই অঞ্চলে, গুপ্তরাও এসেছিলেন কনৌজ বা বিহার থেকেই।

শিশুনাগবংশ

নন্দবংশ

শুঙ্গবংশ

কম্ববংশ

মৌর্যবংশ [ময়ূর ছিল যাঁদের ট্যাবু-টোটেম]

চন্দ্রগুপ্ত-বিন্দুসার অশোক [রাঢ়-বরেন্দ্রে প্রভৃতির অধিপতি] বিম্বিসার অজাতশত্রু। এসঙ্গে আমাদের গঙ্গাহৃদয় বা গঙ্গাহৃদি রাজ্যের অস্তিত্বও স্মর্তব্য। (বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য আহমদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭)

ক্র. নং	রাজবংশ	রাজধানী	সময়কাল	রাজত্বের সময়	ধর্মীর পরিচয়
১	খড়্গ	কর্মান্তবাসক	৬২৫-৭০৫ খ্রি.	৮০ বছর	বৌদ্ধধর্মাবলম্বী
২	রাত	সমতট	৬৪০-৬৭০ খ্রি.	৩০ বছর	ব্রাহ্মণ
৩	দেব	দেবপর্বত	৭২০-৮০০ খ্রি.	৮০ বছর	বৌদ্ধধর্মাবলম্বী
৪	চন্দ্র	রোহিতগিরি	৮৬৫-১১৫৫ খ্রি.	১৯০ বছর	বৌদ্ধধর্মাবলম্বী
৫	বর্মণ	বিক্রমপুর	১০৫৫-১১৪৫ খ্রি.	৯০ বছর	ব্রাহ্মণ

গুপ্তবংশ: (আনু ৩২০-৬০০ খ্রি.)

শ্রীগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্ত [কবি কালিদাস এর আমলের কবি]

চন্দ্রগুপ্ত (২য়)

কুমারগুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত

দামোদর গুপ্ত

কুমারগুপ্ত (২য়)

মহাসেন গুপ্ত

গুপ্তযুগে উৎকীর্ণ লিপি অনুসারে রাঢ় অঞ্চলের স্বাধীনরাজা ছিলেন সিংহবর্মা ও তৎপুত্র চন্দ্রবর্মা (বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পর্বতালিপি) এবং নাগদত্ত (এলাহাবাদ লিপি)

বাঙালার স্বাধীন ও সামন্ত শাসক (ষষ্ঠ শতক)

১. গোপচন্দ্র (আনু: ৫০০-৩৩ খ্রী.)

২. ধর্মাদিত্য (আনু: ৫৩৩-৩৬ খ্রী.)

৩. সমাচার দেব (দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের রাজা, আনু: ৫৩৬-৫০ খ্রী.)

সম্ভবত এ তিনজন রাজারই উদ্ভবক্ষেত্র বা রাজধানী ছিল ফরিদপুর অঞ্চল। কোটিলাপাড়া প্রাপ্ত পাঁচখানি, মল্লাসারুলে প্রাপ্ত একখানি ও বিদ্যার জয়রামপুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন সব লব্ধ তথ্যই এ অনুমানের উৎস ও ভিত্তি।

৪. বৈণ্যগুপ্ত (সমতট রাজ্য, রাজধানী শ্রীপুর, ৫০৭ খ্রী)

৫. সুধন্যাদিত্য

৬. পৃথ্বীর

বাঙালী রাজা: শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) আনু: ৬০৫-৩৫ খ্রী.
[গৌড়-মগধ-দন্ডভূক্তি-উৎকল অধিপতি]
হরিকেল রাজা (আনু: ৮০১-৯০০ খ্রি.) পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম

১. রাজা দেবাতিদেব (আটশতক)

২. রাজা আত্তাকর দেব

৩. ভদ্র দত্ত

৪. ধন দত্ত

৫. কান্তি দেব (৯ম শতকের ১ম পাদ সম্ভবত ভদদেবের দৌহিত্র)

সমতটের চন্দ্র বংশ: (পূর্বোক্ত, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-৩৯)

আরাকানী সূত্রে দেখা যায় বৈশালী নগরে চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন এবং উত্তর আরাকান তখনো সম্ভবত মহাবীর ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে। সমতট অঞ্চলে হয় ঐ বিতাড়িত চন্দ্ররা কিংবা তাঁদের জ্ঞাতি সামন্তশাসক বংশীয়রা রাজত্ব করেন। বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁদের রাজপরম্পরার তালিকা দেয়া হল:

চন্দ্র বংশ: ৮০০-১০৭০ খ্রীস্টাব্দ

রাজা	রাজত্বকাল
১. পূর্ণ চন্দ্র	৮০০-৮৪০ খ্রীস্টাব্দ সামন্ত (?) রাজ
২. সুবর্ণ চন্দ্র	৮৪০-৯০০ খ্রি.
৩. ত্রৈলোক্য চন্দ্র	৯০০-৩০ খ্রি.
৪. শ্রীচন্দ্র	৯৩০-৯৭৫ খ্রি.
৫. কল্যাণচন্দ্র	৯৭৫-১০০০ খ্রি.
৬. লড়হ চন্দ্র	১০২০-১০৪৫ খ্রি.
৭. গোবিন্দ্র চন্দ্র	১০০০-১০২০ খ্রি.
৮. ললিত চন্দ্র	১০৪৫-১০৭০ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মণ রাজত্ব: ১০৮০-১১৫০ খ্রীস্টাব্দ

১. বজ্র বর্মণ

২. জাত বর্মণ (কৈবর্তরাজ দিব্যর সমসাময়িক)

৩. হরি বর্মণ

৪. শ্যামল বর্মণ (১০৭৯ খ্রী.)

৫. ভোজ বর্মণ

পূর্ববঙ্গের দেববংশ: (আনু: ১১৬০-১২৯০ খ্রী.)

১. পুরুষোত্তম দেব

২. মধুমথন (সূদন) দেব (১১৬০-৮০ খ্রী.)

৩. বাসুদেব (১১৮০-১২০৪ খ্রী.)

৪. রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব (১২০৪-৩০ খ্রী.)

৫. দামোদর দেব (১২৩০-৫৪ খ্রী.)

৬. অরিরাজ দনুজ মাধব দশরথ দেব (১২৫৪-৯০ রাজধানী-বিক্রমপুর)

৭. বীরধর দেব

শ্রীহট্টে দেববংশীয় রাজাগণ (১২৯০-১৩২০)

১. খরবাণ দেব

২. গোকুল দেব

৩. নারায়ণ দেব

৪. কেশব দেব

৫. ঈশান দেব

বাংলা বর্ণমালার বিকাশ প্রক্রিয়া

আদি ব্রাহ্মীলিপি (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দ)

অশোক লিপি (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ)

কুষাণ লিপি (১০০-৩০০ খ্রিষ্টাব্দ)

গুপ্ত লিপি (৪০০-৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)

পূর্বী লিপি বা কুটিল লিপি (৬০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ)

নগরী লিপি (৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রাচীন বাংলা লিপি (১০০০ খ্রিস্টাব্দ)

পূর্ণাঙ্গ বাংলা লিপি (১৪০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

পরবর্তীতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ছাপাখানায় ব্যবহারোপযোগী অক্ষর বিন্যাস সম্পন্ন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৭

২. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, পৃষ্ঠা- ৮

৩. বাসন্তিকা, জগন্নাথ হল বার্ষিকী, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭২ প্রবন্ধ : ড. সুকোমল বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্মে সমাজ ও রাষ্ট্রঃ একটি সমীক্ষা।

৪. বৌদ্ধ রশ্মিকা, সম্পাদনা বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও ড. দিলীপকুমার বড়ুয়া, ২০০৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা - ১২

৫. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার, পৃষ্ঠা -১০

৬. চর্যাপদ, শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- প্রাক্‌কথন

৭. বুদ্ধ প্রণাম, হেমেন্দ্র বিকাশ চৌধুরী, (সম্পাদনা), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫, প্রাককথন

৮. বাঙালির আত্মপরিচয়, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবহমান বাংলা, মুস্তাফা নুরুল ইসলাম (সম্পা), ১৯৯৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩১২

৯. প্রাগুক্ত, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা-১১

১০. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৫০

১১. বাংলাদেশের সন্ধানে, মোবাশ্বের আলী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪

১২. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের সন্ধানে, পৃষ্ঠা-১৬৬

১৩. P.C. Sen (ed), Karatoya Mahatmya, V.R.S Monograph, No.2, 25.

১৪. Samuel Beal, Budhist Records of the Western Word, Vol- II, 403-404

১৫. প্রাগুক্ত, বৌদ্ধ রশ্মিকা, পৃষ্ঠা-১৮

১৬. প্রাগুক্ত, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৫৪

১৭. প্রাগুক্ত, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৪৪

১৮. দক্ষিণপূর্ব বাংলার, ফ্রান্সিস বুখানন, (১৭৯৮), ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা), অনু. সালাহউদ্দীন আইয়ুব, আইসিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯. উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ সংক্ষিপ্ত ঘটনা ও পরিচয়, বুদ্ধানন্দ থের, স্মরণিকা, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৬

২০. বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. আব্দুল রহিম ও অন্যান্য, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫

২১. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. আব্দুল রহিম ও অন্যান্য, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭

২২. সুজিত সেন সম্পাদিত, সম্প্রদায়িক, সমস্যা ও উত্তরণ, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭০

২৩. Dighanidaya, sutta No.15, উদ্ধৃতিঃ বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, সুনন্দা বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬৬

২৪. বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাসগুপ্ত, ১৩৫৫, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৩১-৪৯

২৫. Mahavamsa. ch. Vii, Dipavamsa.ch. Ix, উদ্ধৃতঃ, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, পৃষ্ঠা-৬৬

২৬. বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনী নাথ দাশগুপ্ত, ১৩৫৫, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৩৬

২৭. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ-উপাখ্যান, পৃষ্ঠা-৬৭

২৮. ফা-হিয়েন ছিলেন ভারতবর্ষে পর্যটনকারী চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং প্রাচীনতম। তিনি ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে ভারতে আগমন করেন (৪০০ খ্রি.)। ফা-হিয়েনের আসল নাম ছিল কুঙ্গ বা চাং কিয়েন। তিনি ৩৩১ খ্রি. চীন দেশের শানসী নামক প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র তিন বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় ফা-হিয়েন (বাংলা বিনয়ের প্রতিমূর্তি) দীক্ষাকালে তিনি সি (শাক্য নন্দন) উপাধিতে ভূষিত হন।

ফা-হিয়েন ছিলেন আজন্ম বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি চারজন (লুই চিং, তাও চিং, লুই হিং এবং লুই ওয়েই) সতীর্থকে নিয়ে চীন থেকে ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ছয় বৎসরকাল ভারতে অবস্থান সহ সিংহল, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ১৪ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও চিত্রাবলী সংগ্রহ ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে সমুদ্রপথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ৪১৪ খিস্টাব্দে ফো-কিউ-কি' অর্থাৎ বুদ্ধভূমির বিবরণ নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তখন ভারতবর্ষ ফো-দিয়াং বা বুদ্ধের দেশ নামে পরিচিত ছিল। ফা-হিয়েনের ফো-কিউ-কি Samuel Beal

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬৯ সালে, H.A. Gailas ১৮৭৭ সালে ১৯২৩ সাল James legge ১৮৮৬, সান সি বৌদ্ধ সংস্থার উদ্যোগে লি-য়ুং-সি (Li-yung-hsi ১৯৫৭ সালে ইংরেজী অনুবাদ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক V.Smith ১৮৮৬ সালে James এর অনুবাদকে বিশেষ প্রামাণ্য বরে অভিহিত করেন। (ফা-হিয়েনের দেখা ভারত, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মুখোপাধ্যায়, ফার্মা কেএলএম প্রা.লি., কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৩-৫

২৯. Dr.P.C. Baegchi's article published in History of Bengal, ch/xvi.P.413ff. উদ্ধৃতি, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, পৃষ্ঠা-৬৮

৩০. Takakusu I-tsing XXX Basgchi, Le Canon Baudhique on China II P.539 উদ্বৃত: বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, পৃষ্ঠা-৬৯

৩১. History of Bengal, R.C. Majamdor (ed) vol. 1; Dacca University, P.414

৩৩. বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, প্রবন্ধ মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬১

৩৪ বাংলাদেশ: বাঙালীর আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, সম্পাদনায় মুস্তফা নূরউল ইসলাম, প্রবন্ধ: বাংলাদেশ পুরাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত, অভয় রায়ড

, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৯

৩৫. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশ ঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, পৃষ্ঠা-২৯

৩৬. প্রাগুক্ত, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, পৃষ্ঠা-৫

৩৭. বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, ড. রংগলাল সেন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা. ২৫

৩৮. চর্যাপদ, অতীন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৬

৩৯. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৯

৪০. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৯

Dhaka University Institutional Repository

৪১. ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৫, উদ্বৃতি, ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, বৌদ্ধ রঞ্জিকার পটভূমি, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৯-১০

৪২. P.L. Vaidoy Diryavadana, Amasterdam, 1970, P. 257

৪৩. P.L. Vaidya (ed), Avadana Kalpalata by ksmendra, Bihar, 1959, PP. 434, 525

৪৪. J. Takakusus S. M. Nagai (ed), Samantapasadika, Vol-1, PTS, London, 1975, P. 63/ W. Geiger (ed), Mahavams, PTS, London, 1958, ch. XII/ শরৎকুমার রায়, বৌদ্ধভারত, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৪২/আত্মঅন্বেষা ঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৬/ ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গে,ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১০৪

৪৫. Sokumal Chow, Contemporary Buddhism in Bangladesh, Calcutta, 1982, P.3, উদ্ধৃতি বৌদ্ধ রঞ্জিকা, পৃষ্ঠা-১৪

৪৬. মধ্যম নিকায়, ২য় ভাগ, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনু), বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহার কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা-২৪

৪৭. বৌদ্ধ রঞ্জিকা অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ, বিপ্রদাশ বড়ুয়া এবং ড. দীলিপ কুমার বড়ু য়া, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১

৪৮. পূর্বোক্ত, বাংলদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, পৃষ্ঠা-২২

৪৯. Dictionary of Pali Proper Names Malalasekhera, PTS, London, 1974, P-803

৫০. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, সুনীতিরঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৬/প্রাগুক্ত, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, পৃষ্ঠা-১২

৫১. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫

৫২. শাসনবংশ, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. মহাবর্গ, বঙ্গানুবাদ, প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ১৯৩৭, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৪-৫

৫৪. প্রাগুক্ত, চট্টগ্রমের ইতিহাস, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৯

৫৫. প্রাগুক্ত, চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, পৃষ্ঠা-২৫

৫৬. জাতক, প্রথম খণ্ড, ৯৬ নং তৈলপত্র জাতক, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯৭

৫৭. প্রাগুক্ত, চট্টগ্রামের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৫

৫৮. সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক মহাস্থবির, রেঙ্গুন, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা-৩১০

৫৯. প্রাগুক্ত, সদ্ধর্ম রত্নকর, ধর্মতিলক মহাস্থবির, পৃষ্ঠা-৩১৩

৬০. History of Chittagong, Sayed Murtaja Ali, Chittagong, P.-7) এই চক্র হতেই চক্রশালা রাজ্যে নাম গ্রহণ করে। (চট্টগ্রামের ইতিহাস পুরানা আমল, ওহিদুল আলম, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৬৭

৬১. চট্টগ্রামের ইতিহাস, ওহিদুল আলম, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১১

৬২. পটিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, এস, এম, এ জাহাঙ্গীর, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০

৬৩. চট্টগ্রামের ইতিহাস, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২১ (চট্টগ্রামের ইতিহাস, শ্রী পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী দেববর্মা তত্ত্ব নিধি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩১

৬৪. হিউ, এন, সাঙ, সত্যেন কুমার বসু, কলিকাতা, পৃষ্ঠা- ১২

৬৫. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৯

৬৬. থেরগাথা,সূত্রপিটক, নারদ থের, পৃষ্ঠা-৫২৭

৬৭. বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম, নলিনী নাথ দাশ গুপ্ত, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলিকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৪

৬৮. বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান, প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির ও এস ধর্মপাল মহাস্থবির, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৩

৬৯. উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা (১ম, খণ্ড) ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা- প্রস্তাবনা

৭০. বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- মুখবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

৭১. প্রাগুক্ত, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা-পটভূমিকা

৭২. প্রাগুক্ত, উনিশ শতকে বাঙালীর মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনারধারা, ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা-৮

৭৩. বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, নজরুল, ইসলাম, ১৪০১, কলকাতা-২৭

৭৪. প্রাগুক্ত, উনিশ শতকে বাঙালীর মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনারধারা, ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা-২৯-৩০

৭৫. প্রাগুক্ত, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা-৩০

৭৬. প্রাগুক্ত, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক নজরুল ইসলাম, ১৪০১, কলকাতা, পৃষ্ঠা -৩২

৭৭. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপূর্ব, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা-৪৬৪

৭৮. প্রাগুপ্ত, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৩৭

৭৯. প্রাগুক্ত, বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, পৃষ্ঠা-৩৫

৮০. ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা-৩২

৮১. প্রাগুক্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২১

৮২. প্রাগুক্ত, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.,কলকাতা, ১৪০১, পৃষ্ঠা-৫৩

৮৩. প্রাগুক্ত, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রচলিত কলকাতা, ১৪০১, পৃষ্ঠা-৫৪

৮৪. প্রাগুক্ত, বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স পা.লি., কলকাতা, ১৪০১, পৃষ্ঠা-৬৪

৮৫. ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা-৬৬, ৭৭, ৮২

৮৬. বাংলাদেশঃ বাঙালী আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, প্রবন্ধ, কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার মুসলমানের কথা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮৫

৮৭. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি, শ্রী সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫২, পৃষ্ঠা-১

৮৮. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, শ্রীসুকুমাসেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, ১৩৫০, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১

Dhaka University Institutional Repository

৮৯. বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ড. ওয়াকিল আহমদ, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯৮,পৃষ্ঠা-১২

৯০. History of Bengal, Vol-1.P. 176-179, উদ্ধৃতি, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ড.ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা-২০

৯১. প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, মোঃ মোশারফ হোসেন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ

৯২. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, নবম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১

৯৩. The origin and Devolopment of the Bengali language, Suniti kumar chatterji, Calcutta University, 1926, P-120

৯৪. A Record of Budthist Religion Itsing Translated by J. Takakusu, ox ford, 1896, p. xxxi

৯৫. বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৩

৯৬. Ibid, R.C. Majumder/op. cit, vol. 1.P.414

৯৭. Smith Vincent A. The oxford History of India, Ed. pereival shpear, 3rd edition, oxford, 1958, p.201.

৯৮. আজরফ, সিলেটে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৯৫, উদ্ধৃতি থেকে এ.কে.এম. শাহনেওয়াজ, সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৭৭

৯৯. মুস্তাকীম আহমদ চৌধুরী, সিলেট রাজনৈতিক ইতিহাসঃ প্রাচীনকাল থেকে ১৮৫৭, পৃষ্ঠা-৩৭। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪১-৫৩

১০০. রনবীর চক্রবর্তী, অভিন্ন দেবতা, ভিন্নমঠ, প্রাচীন শ্রীহট্টের একটি ব্রহ্মপুর, আকাদেমি পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, পশ্চিম বঙ্গ বাঙলা আকাদেমি, পৃষ্ঠা-৩১

১০১. আবহমান বাংলা, মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, (সম্পাদিত) অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৯

১০২. বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৬

১০৩. যশোর জেলার ইতিহাস, আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা), কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. প্রাগুক্ত, যশোর জেলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা-২১

১০৫. বাংলার ইতিহাস, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৬

১০৬. ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ বুদ্ধমূর্তি অবশেষে সত্যমান ঠাকুর রূপে পূজিত, ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, সৌগত, ১০ম বর্ষে ২০০৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪১

১০৭. যশোর জেলার ইতিহাস, আসাদুজ্জামান আসাদ (সম্পা), কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২২

১০৮. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, শ্রী সুকুমার সেন, কলিকাতা, ১৩৫০, পৃষ্ঠা-২৪

১০৯. প্রাগুক্ত, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা-২

১১০. প্রাগুক্ত, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা-৩১-৩২

১১১. বাঙালির ইতিহাস, ড. মোহম্মদ হাননান, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৩

১১২. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩১

১১৩. বাঙালির ইতিহাস, আদিকবি নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩৯৯-৪০০

১১৪. Ain-Akbari of Abul Fazl All. Vol-II, Tran, H.S. Jarrett and Jadunath Sarkar, Calcutta, 1949, P-132

১১৫. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৭

১১৬. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমদ মোর্তজা, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, মেমারী, বর্ধমান, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৬৯

১১৭. The Early History of Bengal, Promodlal Pal, V.1 PCalcuttam 1999, P-5

১১৮. বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান, অধ্যাপক শাহেদ আলী, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., চট্টগ্রাম, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা-১৯

১১৯. বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৫

১২০. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, (১ম খণ্ড) শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৫

১২১. ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৮২

Dhaka University Institutional Repository

১২২. প্রাকৃত বাঙালীর দর্শন, যতীন সরকার, বাঙালীর দর্শন চিন্তা, ড. ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৩৭

১২৩. মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু দর্শন, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বাঙালির দর্শন চিন্তা, ড. ওয়াকিল আহমদ (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৩-১৪

১২৪. বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় খণ্ড), রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় , দেজ পাবলিকেশন কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৯

১২৫. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, (অশিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), ১ম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১৩

১২৬. বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খণ্ড), রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১৪২

১২৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ড. সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৩

১২৮. প্রাগুক্ত, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ড. সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-৪

১২৯. বিশ্বসভ্যতা, প্রাচীন যুগ, এ কে এম শাহনাওয়াজ প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১৩০. বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, সাধনকমল চৌধুরী, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-১

১৩১. বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ড.অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ফার্মা কেএলএম প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৬৪

১৩২. History and Culture, Dr. A.K. Sur, Best Books, Calcutta, 1992, P. 32.

১৩৩. বৌদ্ধভারত, বিমল চন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ১৩৮৭, পৃষ্ঠা-৪৩

১৩৪. প্রাগুক্ত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, সাধনকমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৯

১৩৫. প্রাগুক্ত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, সাধনকমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৪০

১৩৬. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, ড. সুনন্দা বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬৬, উদ্ধৃত Digha Nikoya, Sutta no-1

১৩৭. Ibid, A. Phayres Burma History, P.10

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮. (শ্রী প্রণয় বল্লভ সেন, ইতিহাস মানচিত্রে, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৫

১৩৯. চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী শ্রী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩০

১৪০. ফা-হিয়েনের দেখা ভারত, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মুখোপাধ্যায়, ফার্মা কেএলএম প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-

১৪১. History and culture of Bengal, Dr. A. K. Sur, Best Book, Culcutta, 1992, P-63

১৪২. Epigraphia Indica. 11, 102, 380, no 108, 217

১৪৩. D.C. Sarcar, Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi, 2nd edition, 1971, pp 36-38, 'বঙ্গ, বাঙ্গলা, বাংলাদেশ' প্রবন্ধে ড. আবদুল করিম উক্ত প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২

১৪৪. বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ড.নজরুল ইসলাম, মিত্র ঘোষ, পাবলিসার্স প্রা.লি., কলকাতা, ১৪০১, পৃষ্ঠা-৩

১৪৫. বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯১৯, পৃষ্ঠা-৩

১৪৬. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৯১

১৪৭. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুণর্মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩

১৪৮. বাংলাদেশের সম্মানে, মোবাশ্বের আলী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩

১৪৯. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, সাহিত্যালোক, ১৩৮৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৯৪

১৫০. Epigraphia Indica, vol-XXXVII, Part-I, Calcutta, January, 1967, PP-25-28

১৫১. বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, তারেক শামসুর রহমান (সম্পাদিত), উত্তরণ, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৯৯

১৫২. প্রাচীন পৃথিবী ঃ পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সভ্যতা, এ.এফ.এম শামসুর রহমান, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, রাজশাহী, পৃষ্ঠা- মুখবন্ধ

১৫৩. Societies and Communities by Niluphar Begum, Upama Procation, Dhaka, 2004, P-368.

Dhaka University Institutional Repository

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, কামাল উদ্দিন হোসেন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.,০ ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩৬)

১৫৫. (প্রাগুক্ত, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, পৃষ্ঠা-২৫-২৬)

১৫৬. (বিষয়: বৌদ্ধধর্ম, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৮১, /হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪১৭)

১৫৭. (প্রাগুক্ত, বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, পৃষ্ঠা-৪৭/বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা, আহমদ শরীফ, ১৯৮৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪

১৫৮. প্রাগুক্ত, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, পৃষ্ঠা-১৫

১৫৯. হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য ড. অতুল সুর সাহিত্য লোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৫৭

১৬০. বাংলাদেশের সন্ধানে, মোবাশ্বের আলী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৮৮

১৬১. বঙ্গবৃত্তান্ত, অসীম রায়, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৯৬) / প্রাগুক্ত, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, পৃষ্ঠা-১৭

১৬২. হিস্টোরিকাল জিওগ্রাফি অফ এনসেন্ট এন্ড আর্লি মিডিভ্যাল বেঙ্গল, এ ভট্টচার্য, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০

১৬৩. History of Bengal, Jadunath Sarkar (ed), Dacca University, P-83

১৬৪. বৃহৎবঙ্গ, দীনেশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৭০

১৬৫. বিষয়ঃ বৌদ্ধধর্ম, হর প্রসাদ শাস্ত্রী, ড. বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পা), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৭ / হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৪০

১৬৬. রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, শ্রী অমলেন্দু মিত্র, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-ভূমিকা

১৬৭. প্রাগুক্ত, ড. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫৮৫

১৬৮. Buddhist survivals in Bengal, B.C. Law, Vol. part 1, P-77-78

১৬৯. হিউয়েন সাং ছিলেন মনস্বী বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি চীনের-হো-নান্ প্রদেশের কু-শিহ্ শহরের কাছে চিন লিউ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল শেন

Dhaka University Institutional Repository

হই। তার ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। ১৩ বছর বয়সে শ্রমণ ২০ বৎসর বয়সে হিউয়েন সাং ভিক্ষু হন।

বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা লাভ ও বৌদ্ধপুঁথি ও ইতিহাস সংগ্রহে অনুসন্ধিৎসু পর্যটক হিসেবে হিউয়েন সাং ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ১৫ বছর (৬২৯-৬৪৫) প্রাচীন ভারত ও বাংলার বিস্তীর্ণ বৌদ্ধ জনপদে পরিভ্রমণ করেন। তিনি নালন্দায় ৫ বছর অধ্যক্ষ পাণ্ডত শীলভদ্রের (৬২৯-৬৪৫ খ্রি.) কাছে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭৬ টি, এর মধ্যে ভারতবর্ষ ও বাংলায় ভ্রমণ বিষয়ে লেখা সি-য়ু্য-কি বা সিউ-ইউ-কি সমকালীন ভারত ও বাংলার ইতিহাস ও ধর্মদর্শন বিষয়ে এক মূল্যবান আকর। তিনি ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে যান। তিনি ৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১৩ অক্টোবর চীনে পরলোক গমন করেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে চীনের রাজধানী শিভ-ফুতে সমাধিস্থ করা হয়। হিউয়েন সাং এর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো-Shaman Hwui li Gi The life of Hiuen-Tsiang (1911), Thomas watters রচিত On Yuan Chwaongs Travels in India, 2 Vols, 1904 / Samuel Beal WM-BD-কি'র অনুবাদ- Buddhist Records of the Western World, 2 Vols. 1906 / সত্যেন্দ্রনাথ বসু'র হিউয়েন সাং, ১২৩৯ অব্দ, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এর হিউয়েন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধভারত / হিউয়েন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধভারত, বারিদ বরণ ঘোষ, (সং ও সম্পা), শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-ঠর

১৭০ বাংলার ইতিহাস, প্রাচীনকাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত ,ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১১

১৭১. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, সালাহ উদ্দীন আহমেদ, পৃষ্ঠা-১২

১৭২. রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, কামাল উদ্দিন হোসেন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৩

১৭৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, কে.এম. শাহনেওয়াজ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৩

১৭৪. Friedrich Max muller, 1823-1209 A.D

১৭৫. পাল সেন যুগের বংশানুচরিত, ড.দীনেশ চন্দ্র সরকার, সাহিত্যালোক, ১৯৮২, কলিকাতা,পৃষ্ঠা-১৪

১৭৬. গোপাল হালদারের রচনা সমগ্র-২, গোপাল হালদার, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩

Dhaka University Institutional Repository

১৭৭. The exect date of this fiction is given as the 10th march, 610 Bengali year or 1203 A.D. the same year the first mahamadan invesion of Bangali............took place. (C.J.A.A.D.Vol- XL, 1, part 1..203) উদ্ধৃত চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেবযর্মা তত্ত্বনিধি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৭

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ও মোঘল সংস্কৃতি, কামাল উদ্দিন হোসেন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৮,পৃষ্ঠা-৩৭

১৭৯. ড. অতুল সুর, বাংলাও বাঙালীর বির্বতন, কালকাত, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৮

১৮০. প্রাগুক্ত, গোপাল হালদার রচনা সমগ্র (২), গোপাল হালদার, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫

১৮১. পৌরানিক অভিধান, অমল কুমার বন্দোপাধ্যায়, ফর্মা কে এল এম প্রা. লি., কলিকাতা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩

১৮২. বৌদ্ধ চর্যাপদ, ড. এস এম লুৎফর রহমান, ধারনী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-প্রসঙ্গ কথা, 'ঘ'

১৮৩. বৌদ্ধ চর্যাপদ, ড. এস এম লুৎফর রহমান, ধারনী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৯৪

১৮৪. A. H. B. Dani A Short History of Pakistan, P-179

১৮৫. Dr. Dani, A. Shart History of Pakistan, p-192

১৮৬. History of Bengal, Vol-1, pp 101, 417

187. Ibid, History of Bengal, Vol-1, pp 115

১৮৮. Ibid, History of Bengal, Vol-1, PP 121-122, উদ্ধৃতি, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপখ্যান, ড. সুনন্দ বড়ুয়া, পৃষ্ঠা-৭১

১৮৯. বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪৩)

১৯০. Ibid, History of Bengal, Vol-1, PP 135

১৯১. বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৫১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ জাতিসত্তার প্রাচীন ইতিহাস ও জীবনধারা

৪.১ বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ

৪.২ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী বৌদ্ধ জাতিসত্তার ইতিবৃত্ত

৪.৩ আদিবাসীদের সমাজ গঠনে বিভিন্ন শ্রেণীসংজ্ঞা

৪.৩ আদিবাসী চাকমা বৌদ্ধ সমাজ

৪.৪ চাকমাদের ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতি

৪.৫ চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার

৪.৬ আদিবাসী উপজাতির পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যচর্চা

৪.৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিসত্তার ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে অবদান

৪.৮ মারমা বৌদ্ধ সমাজ

৪.৯ মগ সম্প্রদায়ের অতীত কথা

৪.১০ মারমা জাতির ইতিহাস সমীক্ষা

৪.১১ বোমাং রাজ পরিবার ও তাদের পূর্বপুরুষগণ

৪.১২ মঙ রাজ পরিবার

৪.১৩ রাখাইন বৌদ্ধ সমাজ

৪.১৪ রাখাইন ইতিহাসে ঐতিহাসিক পর্বের উল্লেখ্যযোগ্য যুগসমূহের বৈশিষ্ট্যতা

৪.১৬ রাখাইনদের ভৌগলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

৪.১৭ রাখাইনদের পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যচর্চা

৪.১৮ রাখাইনদের বসবাস পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও পটুয়াখালী

৪.১৯ রাখাইনদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার

৪.২০ ম্রো বৌদ্ধ সম্প্রদায়

৪.২১ তনচঙ্গ্যা বৌদ্ধ সম্প্রদায়

৪.২২ চাক বৌদ্ধ সম্প্রদায়

৪.২৩ খিয়াং ও খুমি জাতিসত্তা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বৌদ্ধ জাতিসত্তার প্রাচীন ইতিহাস ও জীবনধারা

বাংলায় বৌদ্ধ ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ কাল পরিকক্রমায় আবর্তিত। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনা অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ।

প্রাচীন সমতট, বরেন্দ্র হরিকেল ও বঙ্গভূমির ঐতিহ্যবাহী জনপদের শ্রীচট্টলা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চার ঐতিহাসিক পীঠভূমি হিসেবে গৌরবোজ্জ্বল বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস। অতীতকে জানার জন্য ইতিহাসের প্রয়োজন। ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা গৌরবের বিষয়। বৌদ্ধদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যে প্রতিভাত বাংলাদেশের স্বর্ণযুগের ইতিহাস। বৌদ্ধদের গৌরবময় অতীতই বাংলার ইতিহাস রচনার মূল উৎস। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার, অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা খুবই কঠিন। এ সম্পর্কে তথ্যবহুল কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে, বৌদ্ধরা এদেশের আদি ও প্রাচীন অধিবাসী। বাংলার বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধদের চিন্তার স্বকীয়তা, মানস স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলুপ্ত নয়; গৌরবের। স্বীয় গৌরব ও স্বজাত্যবোধে বৌদ্ধরা মহান। স্মরণাতীত কাল থেকে বৌদ্ধরা সকলের সাথে সম্প্রীতির মাধ্যমে বসবাস করে আসছে। বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায় বৃহত্তর চট্টগ্রামে বসবাস করে। উক্ত অধ্যায়ে সংযতপ্রজ্ঞ হয়ে বাংলাদেশে বসবাসরত (চট্টগ্রামের) বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশর নানা ধর্ম, বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর প্রাচীন আবাসভূমি। ভারতীয় উপ-মহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থল চট্টগ্রাম। এখানকার বৌদ্ধদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম ছিল ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, সুপ্রাচীনকাল হতে এই ভূখণ্ডে বৌদ্ধদের আদি নিবাস। ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদগণের মতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলায় আগমন করেছিল নিগ্রো (Negrito), অস্ট্রিক (Proto Australoid), মঙ্গোলীয়, (a. Palace-mongoloid, b. Tibeto-mongoloid), দ্রাবিড়, (a. Palace-mediterronean, b. Tibeto-mediterronean), আর্য প্রভৃতি গোত্রের জনগোষ্ঠি। আর্য জনগোষ্ঠীর প্রথম দল অন্যান্য দেশ হয়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আগমন করেন। অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহ হিমালয় পর্বতের উত্তর- পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের

Dhaka University Institutional Repository

লোক। মঙ্গোলিয়রা মায়ানমার, বার্মা হয়ে আরাকান, কক্সবাজারসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

ঐতিহাসিকদের অভিমত, মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ (খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী) সুবর্ণভূমিতে (ব্রহ্মদেশ) বৌদ্ধধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। সেখানে যাওয়ার সময় তিনি চট্টগ্রাম হয়ে ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ সংযুক্ত নিকায় ও আঙ্গুত্তর নিকায় মতে, বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য বঙ্গীশ ও বঙ্গান্তপুত্রের জন্মস্থান বঙ্গদেশ বলে জানা যায়। পণ্ডিতদের মতে, তাঁরা ধর্ম প্রচারে বঙ্গদেশে এসেছিলেন এবং চট্টগ্রামের চক্রশালায় অবস্থান করেছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস মতে, মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রেরিত সোনক ও উত্তীয় নামক ভিক্ষু ব্রহ্মদেশে (সুবর্ণভূমি) বৌদ্ধধর্ম (সদ্ধর্ম) প্রচারে জলপথে বা স্থলপথে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

আরাকানের ইতিহাস 'রাজা ওয়াঙ' সূত্রে জানা যায় যে, মগধের চন্দ্রসূর্য (১৪৬-১৯৪ খ্রি.) সামন্তরাজ চট্টগ্রাম ও আরাকান রাজ্য জয় করে চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা চন্দ্র সুরিয়ের মগধাগত সঙ্গীরা প্রথম চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বৃহত্তর চট্টগ্রামে আদি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ হলেন বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি অনুযায়ী বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়।[২] খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক অবধি চট্টগ্রাম, ও আরাকান একটি অখণ্ড রাজ্যরূপে আরাকানের চন্দ্রসূর্য রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। ষষ্ঠ চট্টগ্রাম সমতটের খড়গ রাজবংশের বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা শাসনাধীন ছিল। সপ্তম শতকে চট্টগ্রামে সমতটের বৌদ্ধদের রাজাবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম আরাকান রাজাদের অধীনে ছিল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রাম পাল সম্রাজ্যভূক্ত হয়।[৩] ইতিহাস মতে, চন্দ্রসূর্য দ্বিতীয় শতকে বৈশালীর ধন্যবতীতে রাজত্ব করতেন এবং তা আট শতকের অধিককাল ছিল। চন্দ্র বংশের আদিপুরুষ মহাসিংহ চন্দ্র (৭৮৮-৮১০) এবং এ বংশের চূড়সিংহ চন্দ্র (Chula Taing Chandra) ৯৫১-৯৫৭ খ্রি. চট্টগ্রাম জয় করে বিজয় স্তম্ভ [Tsti-Tat-Gung (চিৎ-তৎ-গং)] অর্থাৎ যুদ্ধ করা অনুচিত, নির্মাণ করেছিলেন। অনেকের মতে, Tsti-Tat-Gung (চিৎ-তৎ-গং) হতে Chittagong নামের উৎপত্তি।

তিব্বতি সূত্রে সিন্ধুদেশীয় বৌদ্ধসিদ্ধ বালপাদ জ্বালন্ধরী নাম প্রাপ্ত হয়ে বঙ্গে ধর্মপ্রচার করেন। জ্বালন ধারা চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের দিকে আরাকানে বৌদ্ধপ্রভাব প্রবল ছিল।[৪] ইতিহাস মতে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লামা তারা নাথের 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থ মতে, দশ শতকের প্রখ্যাত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধচার্য তিলযোগী চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান ছিলেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধপণ্ডিত বর্ণরত্ন এবং বলিরত্ন তিব্বতে ও ভুটানে ধর্মপ্রচারের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Indian Historical quaterly মতে, পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খ্রি.) রাজত্ব কালে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব-উপকুলীয় অঞ্চলের রাজধানী ছিল রাহমী বা রাহমা, বৃহত্তর চট্টগ্রামের রামু। আধুনিক গবেষকদের অভিমত যে, বৃহত্তর চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী রামু অঞ্চলেই পালরাজ বংশের উৎপত্তি।[৫] আরাকান ও পগাঁর বৌদ্ধ রাজারা প্রায় হাজার বছর কাল বৃহত্তর চট্টগ্রাম শাসন করেন। তৎকালীন মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত শাসক জাতির সঙ্গে স্থানীয় বৌদ্ধদের বৈবাহিক সূত্রে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে। তাই চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত রক্ত সংমিশ্রণ জাত একটি বর্ণ শংকর সম্প্রদায়।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ প্রশ্ন (১ম শতক), ললিত বিস্তর (খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক) এবং ভূগোলবিদ টলেমির বর্ণনায় আরাকান (Argyre) শব্দটি পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল থেকে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম বহুবার আরাকান কর্তৃক বিজিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খ্রি. পর্যন্ত [ডেঙ ফেলাউঙ (সেকেন্দর শাহ) থেকে সন্দ থুধম্ম (১৬৫২-১৬৮৪ খ্রি.)] একটানা প্রায় ৮৬ বৎসর কাল চট্টগ্রাম 'মগ' (বৌদ্ধ) শাসনাধীন ছিল।[৬] History of Bengal, A history of Chittagong গ্রন্থ মতে, ১৪৬ খ্রি. থেকে ১৩৩৯ খ্রি. পর্যন্ত হাজার অধিক বছরকাল বাংলা তথা চট্টগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে আরাকান, সমতট, হরিকেল, পাট্টিকার, পাল, পূর্ববঙ্গের চন্দ্র, খড়্গ, দেব ও ব্রহ্মদেশের পগাঁ বৌদ্ধ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। পরবর্তী আরাকান রাজ মিন ফালং চট্টগ্রাম জয় করেন এবং ১৬৬৫ খ্রি. পর্যন্ত একাধারে ৮৫ বছর চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যর্ভুক্ত ছিল। ১৭৫৬ খ্রি. আরাকানিদের বিতাড়িত করে, আওরঙ্গজেব চট্টগ্রামকে মোঘল সাম্রাজ্য এবং নবাবশাসিত সুরে বাংলার্ভূক্ত করেন।[৭] আরাকান ও পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পালরা বাংলা শাসন করেন একাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রাম দেয়াং (পণ্ডিত বিহার), চক্রশালা ও রামুতে বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য নির্মিত হয়েছিল।

ওলন্দাজ ব্যবসা খতিয়ান মতে, সমগ্র চট্টগ্রাম প্রদেশ বারোটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পর্তুগীজ বিবরণীতে 'রাম্বু (রামু), ছকরুআ (চকরিয়া), চক্রশালা, সন্দ্বীপ, দেয়াঙ উড়িয়া, নিয়ামপুর এবং চাটগাম (চট্টগ্রাম) এ কয়েকটি রাজ্যের নাম জানা যায়।[৮] পর্যটক ম্যানরিকের ভ্রমণ বিবরণী মতে, রামুর শাসন কর্তা 'পোনাক' নামে অভিহিত হতো। রামু ছিল চট্টগ্রাম প্রদেশের প্রধান শহর। বর্তমান বৌদ্ধ সভ্যতা ও ঐতিহ্যের আবিস্কৃত নিদর্শন মতে চট্টগ্রামের এ বারোটি রাজ্য ছিল বৌদ্ধ সাম্রাজ্য।

ইতিহাস মতে, বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ পর্তুগীজদের থেকে ১৬৬৬ খ্রিঃ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এ সময় কর্ণফুলী ও রামুতে আরাকান রাজ চন্দ্র সুধর্মার রাজত্ব ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভের পূর্বে সমগ্র চট্টগ্রাম মোঘলদের অধীনে চলে যায়। পরে মোঘলদের হাত থেকে চট্টগ্রাম ইংরেজদের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা (১৭৭৪ খ্রি.) শাসিত হয়।[৯] বাংলার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ছিল রেনেসাঁ (Renaissance) বা নবজাগরণের যুগ। তখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজ পুনরায় জাগরিত হয়। প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ একটি গৌরবোজ্জ্বল সোনালী ঐতিহ্যের অধিকারী হলেও কালে কালে বৌদ্ধরা হিন্দু-মুসলিম আক্রমণ ও অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহুভাবে নির্যাতিত হয় এবং অসংখ্য বিহার ও পুস্তক ধ্বংস সাধিত হয়। ইতিহাস তাই প্রমাণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার আন্দোলন একটি ঐতিহাসিক বিষয়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও পুনজাগরণের অগ্রপথিক ছিলেন চকোরিয়ার কৃতি সংঘপুরুষ আরাকান সংঘরাজ সারমিত্র (সারমেধ) মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮২ খ্রি.)।

এ প্রসঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে আশা দাসের মন্তব্য স্মর্তব্য 'প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে যদি বাঙালির কিছু গৌরব করার থাকে সে ইতিহাস রচিত হয়েছে বাংলাদেশে (চট্টগ্রাম) বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের যুগে।'

বৌদ্ধ জাতির সমৃদ্ধময় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নেই, নেই বাঙালি বৌদ্ধদেরও। চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের উৎপত্তি, আগমন, ধর্মপ্রচার, প্রতিষ্ঠা, ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও ইতিহাস রচনার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধদের আগমন কোন সময় তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। এর প্রকৃত গবেষণাধর্মী ইতিহাস রচিত হয়নি। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশের প্রাচীনতম ধর্ম এবং বৌদ্ধরা বাংলাদেশের আদি অধিবাসী।

বর্তমান বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা আনুমানিক ১২ লাখের অধিক। আর সংখ্যাধিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, পটুয়াখালি, বরগুণা, বর্তমান উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায় তিনটি বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। যথা- ক) বড়ুয়া (সমতলী বাঙালি বৌদ্ধ) খ) চাকমা (আদিবাসী উপজাতি পার্বত্য বৌদ্ধ) গ) মারমা-রাখাইন (আরাকানী অধ্যুষিত বৌদ্ধ)। নিম্নে এই সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক আচার সংহিতা, জীবনবোধ সম্পর্কে আলোচনা প্রবিষ্ট করা হল।

৪.১ বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ

বাংলার গৌরবোজ্জ্বল জাতির নাম বৌদ্ধজাতি। বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি ও আভিধানিক তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়া শব্দের তাত্ত্বিক তাৎপর্য ও উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিত মহলে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিধ ও পণ্ডিতদের মতে, বৃজি বা বজ্জি শব্দ বিবর্তিত হয়ে 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দি বলেন, 'বড়ুয়া' পদবীধারী জনগোষ্ঠী বৈশালীর বজ্জি (বৃজি) জাতির বংশধর। সুতরাং বজ্জি শব্দ থেকে 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপত্তি।[১০] বড়ুয়া শব্দটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি বাচক নয় বরং উপাধি বাচক। অধ্যাপক সুধাংশু বিমল বড়ুয়া আবার বৃজি বা বজ্জি শব্দ বিবর্তিত হয়ে 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপত্তি একথা স্বীকার করেন না। চট্টগ্রামের গবেষক আবদুল হক চৌধুরী 'বড়ুয়া'রা মগত হতে আগত বলে মনে করেন না। তিনি বর্মিদের একটি বংশ বলে অভিমত দেন। আবদুল করিম এর ইসলামাবাদ গ্রন্থ এবং আলীদীন আলী তাঁর চট্টগ্রামঃ প্রথম মানব ভূমি গ্রন্থে 'বড়ুয়া' জাতিকে এদেশের আদি অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।

কারো কারো মতে, বড়ুয়ারা মগধ বা বিহার থেকে অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের বংশোদ্ভূত হিসেবে এদেশে এসেছেন বলে আরাকানীরা বা মগএরা চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের ম্রারমাগ্রী বা ওয়াগ্রী বলে ডাকতেন। 'ম্রারমাগ্রী' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মবাসীর বড়। 'ওয়াগ্রী' অর্থ বড় বা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তাদের মান মর্যাদা উচ্চ বা বড়। সে কারণে তারা বউডগা বা বড়ুয়া গোষ্ঠী, বড়ুয়া রাউচচী, বড়ুয়া গ্রাম, বড়ুয়া পুকুর ইত্যাদি নামে সম্বোধন করতেন। বড়ুয়া শব্দের অর্থ 'বড় আরিয় বা বড় আর্য'। চট্টগ্রামের বড়ুয়া সমাজে পুত্র বধূরা তাঁদের শ্বশুরকে স্মরণাতীত কাল হতে বউড়গা বা বড়ুয়া বা বড় আর্য এবং শ্বাশুড়ীকে হাজমা বা আর্যমা বলে সম্বোধন করতেন। পণ্ডিতদের মতে সেখান থেকে বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত শব্দ 'বটুক' থেকে 'বড়ুয়া' শব্দের উৎপত্তি। 'বড়ুয়া' একটি জাতি বা গোত্র বাচক শব্দ। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস গবেষকদের মতে, বড়ুয়া শব্দটির ব্যবহার প্রথম আসামে দেখা যায়। আসামের প্রাচীন অহোম রাজাগণ প্রথম বড়ুয়া শব্দের উদ্ভাবক। চতুর্দশ শতাব্দীর কবি বড়ুচণ্ডী দাস মনে করেন 'বড়ুয়া শব্দটি সম্মানী বা শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবহৃত হয়েছে। (বড়ুয়া বহুয়ারী আক্ষে বড়ুয়ারঝি অর্থাৎ তিনি একজন উচ্চ বংশ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি র পুত্র বধুর কন্যা।[১১] বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন গ্রন্থে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির বলেন চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের গোষ্ঠী আদিপুরুষ গোত্র প্রধানরূপে বড়ুয়া পদবী গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ত্রিপুরার মহারাজাদের সেনাপতির পদটি ছিল বড়ুয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা চীফ মাতুয়া বড়ুয়া, বড়ুয়া গ্রহণ করেছিলেন। চাকমাদের বড়ুয়া গোজা নামে একটি গোষ্ঠি আছে। এ বড়ুয়া গোজা বা গোষ্ঠিই চাকমা জাতি। অনেকে মনে করেন, বড়ুয়া বৌদ্ধরা আরাকানের 'মগ' সম্প্রদায় ভুক্ত। তবে অধ্যাপক দীপক কুমার বড়ুয়া বলেন, বাঙালি বৌদ্ধরা 'মগ' সম্প্রদায় ভূক্ত নয়। এদের স্বাতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস আছে। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পর কিছু আর্য জনগোষ্ঠী এদেশে আসেন, বড়ুয়ারা সেই আর্য বংশোদ্ভূত।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ এনামুল হক কর্ণেল ফেয়ারের মত সমর্থন করে বলেন, মগ শব্দটি 'মগধ' শব্দের বিকৃত রূপ। তাই বড়ুয়ারা আরাকানীর কাছে 'মগ' নামে পরিচিতি। আবার চট্টগ্রামের সুপণ্ডিত রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের মতে, "আরাকানবাসীদের কাছে মগ শব্দটি মর্যাদাসূচক। মগ কথাটির অর্থ শ্রেষ্ঠ। চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধরা প্রায় আরাকানী গোষ্ঠী, গোত্র নির্ণয়, আচার-আচারণ, পোষাক, খাদ্য ভোজ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত।[১২] বাঙালি বৌদ্ধদের নামকরণ করার ক্ষেত্রে কালের ইতিহাসে বিভিন্ন প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এক এক রাজন্য বর্গের শাসনামলে বৌদ্ধদের নামকরণ ও করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। বৌদ্ধরা সাধারণত ঠিকুজী-কুষ্ঠি করে আমল নাম ঠিক করেন। প্রত্যেকের কাছে ডাক নামে পরিচিত। বর্তমানে আসল নাম আর ডাক নাম প্রায় একটাই রাখা হয়। "উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে অনেক আরাকানী মঘা নাম প্রচলিত ছিল যেমন- মম প্রু, চাইলা প্রু, হোয়া প্রু, কেজ প্রু, অঙ্গ প্রু, ছাতা, প্রু, চাদ প্রু, থোয়াইলা প্রু, মং প্রু, প্রভৃতি। হিন্দু সমাজের প্রভাবে নাম করণ হতো যেমন- দুর্যোধন, দশরথ, রামচন্দ্র, কালীকিংকর, হরিশ্চন্দ্র, বলরাম, জগন্নাথ, দীনবন্ধু, বসুবন্ধ, বীনা, গান্ধি, কৃষ্ণা, অর্জুন ইত্যাদি। আবার বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের অনুকরণে নাম যেমন- শাক্যপদ আনন্দ অমিতাভ, বোধি-রঞ্জন, অশোক, বিশাখা, মল্লিকা, সুজাতা, ক্ষেমা, মহামায়া ইত্যাদি। আজ কাল আবশ্য বৌদ্ধ সমাজে বৌদ্ধ হিন্দু মিশ্রিত আধুনিক নামই দেখা যায়, যেমন-বেনীমাধব, সত্যেন্দ্রনাথ, সুধাংশু ভূপেন্দ্রনাথ, রত্নাপ্রভা, দীপ্তিরাণী, রূপসী বালা, মার্তন্ড প্রতাপ, শশাংক, সতীশ চন্দ্র, সুবল চন্দ্র, মেঘনাথ ইত্যাদি।[১৩] ছোয়াইং (বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণদের আহার), মৈসাং (বৌদ্ধ শ্রামণ), কেয়াং বা ক্যাং (বৌদ্ধ বিহার), লুঙ্গি, ফানুস, নাং (নমস্কার), ছাবইক (ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র), ছাদাং (ত্রৈমাসিক বর্ষব্রত আরম্ভ ও শোষ দিন) ঘেইং (ভিক্ষুসীমা), ফুংগী (ভিক্ষু), ওয়াইক (ভিক্ষু পরিবাস) ফাং (নিমন্ত্রণ), ওয়া (বর্ষাবাস), ফারিরু (সুত্রপাঠ), কারেঙ্গাঁ (ভিক্ষুসেবক) লোথক (ভিক্ষুধর্ম পরিত্যাগ গৃহী), থাগা (গৃহী উপাসক), ফরা (বুদ্ধ) ইত্যাদি।

আলোচনার বিভিন্ন আলোকে বলা যায়, বড়ুয়ারা বর্ণ শংকর জাতি; মগধের শাক্য জাতি (ক্ষত্রিয়) বা বৈশালীর বৃজি (লিচছবী) জাতির বংশোদ্ভূত; তাঁরাই বড়ুয়া বৌদ্ধদের উত্তর পুরুষ। বড়ুয়া শব্দটি কুলীন ও শ্রেষ্ঠত্বের, সম্মানী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সেনাপতি, বিচারক, প্রধান উপাধি ও সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বড়ুয়া বৌদ্ধরাই চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী এবং গৌরবোজ্জ্বল জাতি মায়ানমার, থাইল্যান্ড, আসাম ত্রিপুরায় সে সকল বড়ুয়া বৌদ্ধ বসবাস করে তারা সবাই চট্টগ্রামের বড়ুয়া বংশজাত। বর্তমানে সমতলী বৌদ্ধরা বড়ুয়া, মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী, সিংহ, মহাজন, সিতদার, রাজবংশী, সিং ইত্যাদি নামে পরিচিত। বর্তমানে বড়ুয়া বৌদ্ধ বলতে বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়া সম্বন্ধে বিশ্বকোষ অভিধানে বর্ণিত হয়েছে-

মগধের রাজবংশ এক সময় মুসলমানের আক্রমনে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পালাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হইয়াছে। অপর একটা আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, তাহারা চট্টগ্রামের প্রতিভাবান বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর।

আরাকানবাসী বৌদ্ধগণ ইহাদিগকে ক্ষেরামগরি নামে অভিহিত করে...... । পর্বতবাসী বৌদ্ধ মগদিগের নিকট ইহারা ভূমিয়া (ভুঞা) মগ নামে পরিচিত। বড়ুয়াদের মধ্যে সাধারণত তিনটি উপাধি দেখা যায়। সকলেই বড়ুয়া পদবী ধারণ করে। কেবলমাত্র কার্য দ্বারা যে যে বংশের পূর্বপুরুষ চৌধুরী বা মুৎসুদ্দি আখ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেই এখনই ঐসকল উপাধি বর্তমান আছে। বড়ুয়াগণ সংকর জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। যেহেতু তাহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী ও পর্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দু দিগের ক্রিয়া কলাপের অনুকরণ করিয়াছে। এই কল্পে (উনবিংশ শতাব্দী) শিক্ষিত বড়ুয়াগণ পৌওলিকতা বিসর্জন দিয়া বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা হরিসংকীর্ত্তনের অনুকরণে খোল, করতাল, বাজাইয়া বৌদ্ধ মস্তক মুণ্ডন ও হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধাণ করে।

রাউলি পুরোহিতগণের মধ্যে চারটি বিভিন্ন শ্রেণী আছে (১) মহাথেরো মহাস্থবির (২) কামেথেরো (কামস্থবির) (৩) পঞ্চয়স্ (উপসম্পদা) (৪) মইসাঙ্গ।

দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন, বড়ুয়া মানে বড়।[১৪] রাজবংশী বা বড়ুয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে বড়ুয়া বলে। বড়ুয়া ও রাজবংশী দুইটি বাঙ্গালা শব্দ। ব্রহ্মী, পালি বা মগি ভাষার নহে। ইহাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিগণের বিভিন্ন মত সৃষ্টি হয়।

The Rajbongshis and the buruas of chittagongs are also burmess descent but their origin is not purely burmese.They the offspring of Bengali women by burmise men and they have adopted hindu customs and bengalee language.[১৫]

It (moga is given to ghem (arakanes) by the people of bengal and also to a class of people new found mostly in the district of chittagong and who called themselves. Rajbanshi, The latter claim to be of the same reace as one dytnasty of the kings of aranan and hence the name they have themselve assumed, they are buddhists in religion their language now is bengolee of the chittagong dialect and they have a distinction physiognomy etc.

Dhaka University Institutional Repository

মগ গণ নিম্ন শ্রেনীর বাঙ্গালী সংযোগ একটি নতুন জাতির সৃষ্টি করিল, ইহারাই দেশী মগ বা রাজবংশী। যদিও আরাকানের ইতিহাস রাজোয়াং গ্রন্থে মগধ হইতে আসিয়া কোন রাজা আরাকান উপনিবেশ স্থাপন করা ও রাজত্ব করার উল্লেখ নাই, তথাপি তাহারা বলেন, 'বড়ুয়া শব্দে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মগধ হইতে আসিয়া আরাকানে রাজ্য স্থাপন করায় ইহারা 'রাজবংশী' নামে কথিত। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, বড়ুয়া মানে বড় (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।[১৬]

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রামগুলো ছিল তিন ভাগে বিভক্ত। সংগ নদীর দক্ষিণ পারের গ্রামগুলোকে বলা হতো দক্ষিণকুল যথা, করিয়ানগর, ঢেমসা প্রভৃতি গ্রাম। সংগ নদীর উত্তরকূলের গ্রামগুলোকে বলা হতো উত্তরকূল যথা, পাহাড়তলি, রাঙ্গুনিয়া প্রভৃতি গ্রাম। আর সংগ নদী ও কর্ণফুলী নদীর মাঝের অঞ্চলকে বলা হতো মধ্যস্থলি, যথা পটিয়া, জোয়ারা, বেয়ারিপাড়া, সাতবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম। প্রতিটি গ্রামে বুদ্ধের মন্দির ছিল, ভিক্ষুরা ছিল। বুদ্ধের মূর্তি আনা হত বর্মা থেকে। কিছু কিছু বাঙ্গালী বৌদ্ধরা বর্মায় গিয়ে ব্যবসাও করতো। তারা বর্মি মেয়ে বিয়ে করে দেশে বউ নিয়ে ফিরতো।[১৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল চাকমাদের বাস। তারা এসেছিল আরাকান থেকে। তারাও ছিল হীনযানী বৌদ্ধ। উদ্বাস্তু বাংলার বৌদ্ধরা এই চাকমা অঞ্চলেও সাদরে গৃহীত হলো। চাকমারা বৌদ্ধ হলেও বন্য বরাহ ও পাখি শিকার করতো। বুদ্ধের সঠিক ধর্ম তারা জানতো না। বাঙ্গালী বৌদ্ধরা চাকমাদের বুদ্ধের ধর্মের জ্ঞান দিয়ে তাদের এই ধর্মে উদ্বুদ্ধ করল। বলা হয়, চাকমারা পশু শিকারী জাতি। চাষ-আবাদ তারা জানতো না। বাংলার বড়ুয়া বৌদ্ধরাই তাদের চাষ-আবাদ শেখায়। চাকমারাও ছিল হীনযানী বৌদ্ধ। সেই কারণে তারা এই ধর্মের শ্রবৃদ্ধির জন্যে উদ্যোগী হয়। চাকমা রাজা ধরম বকস এর পত্নী রাণী কালিন্দী এক সময় চট্টগ্রামের উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজনগরে বুদ্ধের মূর্তির স্থাপন করেন। এই রাণী সতেরোটি পালি সূত্র সংগ্রহ করে সেগুলো চাকমা ভাষায় রূপান্তর করে 'অগরতারা' নামের এক সংকলন গ্রন্থ চাকমাদের জন্যে প্রকাশ করেন। এটাই নীলকমল দাস ও পরে ফুল চন্দ্র বড়ুয়া বাংলায় অনুবাদ করে 'বৌদ্ধ রঞ্জিকা' নামে প্রকাশ করা হয়।

বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ না বলে তারা বলল ফরা-তরা-সাংকা। ফরা হলো মঘ বা বর্মি ভাষা অর্থাৎ ঈশ্বর। তরা হলো ধর্ম, এটাও বর্মি ভাষা। সাংকা হলো সঙ্ঘ এটা আরাকানি বর্মি ভাষা। বিহারকে বলে কেং (বর্মি ভাষা), বুদ্ধকে গোঁয়াই (বর্মি ভাষা), পিন্ডদান না বলে সোয়াইং। নিমন্ত্রণ করাকে বলে ফাং (বর্মি ভাষা), আষাঢ়ী পূর্ণিমাকে বলে ছাদাং, বেড়াকে বলে ঝলি ইত্যাদি। তাদের চাল চলনে, চেহারায়, পোষাকে সংমিশ্রণের প্রতিফলন হলো। মেয়েরা পরতো বর্মি লুঙ্গী, ব্লাউজ ও ওড়না পুরুষরা পরতো ধুতি, লুঙ্গির মতো ভাঁজ করে।

বাঙ্গালীরা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ আর চট্টগ্রামের আগন্তুকরা ছিল মঙ্গোলয়েড। এই দুই গোষ্ঠীর মানুষ মিলে গিয়ে সৃষ্টি হলো মঙ্গো অস্ট্রিক বাঙ্গালী গোষ্ঠীর। তাদের কপাল চওড়া, নাক অনুন্নত,

Dhaka University Institutional Repository

চোখ তেমন চেরা নয়, গায়ে মাথায় চুল দাড়ি কম, মুখ চেপ্টা, দৈর্ঘতাহীন ইত্যাদি। তারা হলো কর্মঠ, তেজি, শক্তিধর, ন্যায়নিষ্ঠ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, পরিশ্রমী, সহনশীল ও জেদী প্রকৃতির মানুষে। এই সকল বহুমুখীতার কারণে কিছু কিছু বৌদ্ধরা মোগল সুবেদারদের কাছে চাকরি পেল। তারা সুবেদারদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হলো। তত্ত্বাবধায়ক হয়ে কেউ হলো মুৎসুদ্দি।

খাজনার হিসেব রাখার জন্যে অনেককে বলা হলো খাজাঞ্চী। আবার কেউ বা কোতোয়ালদের অধীনে দারোগা হলো মোগলরা বিশ্বস্ততা, পরিশ্রম ও ন্যায়নিষ্ঠতার জন্যে রাজকার্যে এই বাঙ্গালী বৌদ্ধদেরই পছন্দ করতো। মোগল সুবেদাররা বলতো, এ লোগ বড়েয়া জাতি। অর্থাৎ এরা মহৎ জাতি। এই বড়েয়া শব্দ থেকেই বড়ুয়া শব্দের উদ্ভব। বাংলার বৌদ্ধরা নিজেদের চিহ্নিত করার জন্যে এই বড়ুয়া শব্দ তাদের পদবী হিসাবে নামের সঙ্গে যুক্ত করল। পূর্বে এদের পদবী ছিল ফ্রু। এটি বর্মি মগদের পদবী, যেমন মংফ্রু মেয়াফ্রু মইয়ফ্রু ইত্যাদি। এগুলো বাঙ্গালীর প্রাচীন বর্মি নাম। তাদের নামের শেষের ভাগটাই পদবী হিসাবে তখন ব্যবহৃত হতো। মোগল আমলে বড়ুয়া পদবী হলো চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের। এটা মোগলদেরই অবদান।[১৮]

বাংলার সমতলী বৌদ্ধরা বড়ুয়া উপাধিধারী। অনেকে বড়ুয়া আবার অনেকে 'বরুয়া' লিখতে দেখা যায়। এখন বড়ুয়ারা বৌদ্ধ অর্থে পরিচিত।

বৌদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন। বড় + অরিয় = বড়ুয়া। (বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ)

কারো কারো মতে, বর+উয়া = বরুয়া। বর, উত্তম, শ্রেষ্ঠ এই অর্থে অভিধানে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'বড়ুয়া'র আভিধানিক অর্থ শ্রেষ্ঠ। বড়ুয়া শব্দটি প্রত্যয় সাধিত শব্দ। বড় ধাতুর সাথে উয়া প্রত্যয় যোগে বড়ুয়া শব্দটি গঠিত। বড় + উয়া = বড়ুয়া।[১৯] বড় উয়া (বড়টা ব বড়টি) শব্দ থেকে বড়ুয়া পদবির উৎপত্তি। বড়ুয়া শব্দের অভিধানিক অর্থ শ্রেষ্ঠ, সম্মানীত, শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণী, অগ্রজ ইত্যাদি। রাজমাল গ্রন্থ মতে, 'বড়ুয়া' উপাধি নিঃসন্দেহে পদবাচক। ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমানিক্য এই উপাধির প্রবর্তক। অনেক পন্ডিত ও গবেষক মনে করেন বড় অর্থ থেকে বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি।

শ্রী ধন্যমানিক্য রাজা তদবধি সেনা

বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা।

(ধন্যমানিক্য, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২)

Dhaka University Institutional Repository

ধন্যমানিক্যের বঙ্গ জয়ের পূর্বে এ উপাধি হয়। তিনি সৈন্য বাহিনীর জন্য নাজির, সরদার, হাজারী, বড়ুয়া ইত্যাদি উপাধি প্রবর্তন করেন। এসময় সেনাপতির উপাধি ছিল বড়ুয়া।[২০]

চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যে আরো কিছু পদবী প্রচলিত আছে মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী, সিকদার, মহাজন, রাজবংশী, সিংহ, হাজারী ইত্যাদি। এ সমস্ত পদবী পেশা জ্ঞাপক। ঐতিহাসিকদের মতে, বড়ুয়া বৌদ্ধরা এদেশের আদি অধিবাসী উচুঁ স্থানে বসবাস করতো। কাজেই অনেকের ধারণা উচুঁস্থানের বাসিন্দা থেকে বড়ুয়া বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য নির্ভর কোন ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে পন্ডিত ও গবেষক মহলে আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের শেষ নেই।

বড়ুয়া পদবীর বৌদ্ধরা চাকমা রাজবংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং একত্রে রাজকার্য পরিচালনা করত। ১৮৬০ সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রাম পৃথক জেলা হয় এবং ১৯০০ এ্যাক্ট এর মাধ্যমে সংরক্ষিত এলাকা হয়। তখন চাকমারা সেখানে চলে গেলে বিচ্ছিন্ন বড়ুয়া পরিবার গুলো সমতলে বড়ুয়া পদবীতে থেকে যায়।[২১]

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির সদ্ধর্মের পুনরুত্থান এ বলেছেন, প্রতিবেশী চাকমা জাতির সহিত বড়ুয়া জাতির সম্পর্ক যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। চাকমা সমাজে বড়ুয়া গোজা ও রণ পাগলা গোষ্ঠি বিদ্যমান। বর্তমানে ইহারা চাকমা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। রোয়াজা, দেওয়ান প্রভৃতি চাকমা গোষ্ঠি বড়ুয়া সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। বিরাজ মোহন দেওয়াকন বলেছেন, রাজা থৈণ সুরেশ্বরীর (১৪১৯-৭০) রণ পাগলা নামে একজন যুদ্ধ বিশারদ সেনাপতি ছিল। রণ পাগলার বংশধরেরা বড়ুয়া গোজায় সৃষ্টি করে এবং এখনো বড়ুয়া গোজায় আছে। (চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, বিরাজ মোহন দেওয়ান, রাঙ্গামাটি, সরোজ আর্ট প্রেস, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৩১) এই রাজা বুড়া বড়ুয়ার পুত্র সাথুয়া বড়ুয়া বা রাজা সাথুয়া।

চাকমা রাজ সরকারে বড়ুয়ারা চাকরী করেছে। বড়ুয়া ও চাকমা জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ছাড়াও বহুবার রক্তের সম্পর্ক ঘটিয়াছে। একের অংশ বিশেষ অপরে মিশিয়া গিয়াছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও উভয় জাতি পাশাপাশি বাস করিয়াছে।[২২]

চাকমা রাজা শুকদেব রায়ের বংশের রাজত্ব আসে বড়ুয়া বংশ হতে। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. হান্টার সাহেব তাঁর Statiscal Account of Bengal গ্রন্থে চট্টগ্রামের বড়ুয়াগণকে রাজবংশী বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩]

১৮৯৪ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় বলেন, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধরা অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মগধ সম্রাজ্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যাগ করে এতদঞ্চলে আরাকান বৌদ্ধ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে। বড়ুয়া বৌদ্ধরা বহুবছর আরাকানী বৌদ্ধদের সঙ্গে বসবাস করে আসছিল। আরাকানী বৌদ্ধরা বড়ুয়া বৌদ্ধদের মার্মাগ্রী বলে উল্লেখ করতেন। মার্মাগ্রী শব্দের অর্থ উচ্চ বংশীয় ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ। আবার অনেকে রাজবংশের ক্ষত্রিয়গণ মগধ সাম্রাজ্য দেশাগত বলে তাদেরকে সংক্ষেপে 'মগ' নামেও অভিহিত করা হতো।[২৪] পূর্ণ চন্দ্র চৌধুরী বলেন, খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে মগধদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ পূর্বদেশে (বঙ্গদেশে) আসিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম।[২৫]

ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া বলেছেন, বৈশালীর বজ্জি জাতির এদেশে এসে চাষের জন্য জমি আবাদ করতে থাকে এবং সেচ কার্যের প্রয়োজনে অনেকে খাল খনন করেন। এ রকম খালের পরিচয় কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটিয়া, রাউজান ও রাঙ্গুনিয়ায় বিদ্যমান। বজ্জিরা বৈশাখী তথা মগধের অধিবাসী। সেজন্য বজ্জিদের মগধ থেকে আগত বলে মগও বলা হয়। বজ্জি ও মগ প্রায়ই সমার্থক। রাউজানে এখনো বজ্জি খাল ও মগদাই খাল বিদ্যমান। এই বজ্জি থেকেই বড়ুয়া উপাধি এসেছে বলে পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন, বৃজ্জি>বৃজ্জিয়া>বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন ভারতে মগধ রাজ্যে বৃজ্জি জাতির বাস ছিল। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের স্থান বৈশালীর বৃজ্জি রাজবংশ হতে 'বড়ুয়া' জাতির উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, বড়ুয়া বৌদ্ধরা সুদীর্ঘ কাল আরাকান রাজার রাজত্ব কালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরাকানী মগদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে তাদের মধ্যে পরস্পর সৌহৃদ্যতা গড়ে উঠে এবং বিবাহ বন্ধন ও ক্রমশঃ আরম্ভ হয়। যার ফলে বড়ু য়ারও মগ নামে পরিচিতি হয় এবং বড়ুয়াদের ব্যবহারিক শব্দ, নাম, সংস্কৃতি ও দেহের গঠনে নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে আরাকানী প্রভাব বিদ্যমান।

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে বাঙালি বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে মাগধী, আরাকানী, হিন্দু, ও মুসলিম এই চার জাতির সংমিশ্রণ ও সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চট্টল সংস্কৃতির গোড়ার কাহিনী প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, চাটিগাঁর আধুনিক বৌদ্ধরা কাগজ পত্রে বড়ুয়া বলিয়া পরিচয় দিলেও জেলার সর্বসাধারণের নিকট অদ্যবধি মগ নামে পরিচিত।[২৬] ফ্রান্সিস বুখানন দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রাম কক্সবাজারে চকরিয়া, রামু পীলং এ সমতলে বসবাসকারী বৌদ্ধ আধিবাসীরা বাঙালীদিগের নিকট মগ নামে পরিচিত। তাদের অধিকাংশ রাধুনি বা বাবুর্চির চাকরি পেয়েছে। আবার তারা রাজবংশী নামেও পরিচিত। (রাজবংশী (বাংলা) অর্থাৎ রাজকুলোদ্ভব এই উপাধি বাঙালি বড়ুয়াদের জন্যে ব্যবহৃক হয়) তারা বাংলা ভাষাতে কথা বলে। তাদের বই পত্র রাখাইন হরফে লেখা। তাদের ধর্মীয় গুরু রাউলিম এই ধর্মীয় গুরুরা অকৃতদার থাকে, তার

Dhaka University Institutional Repository

সেকুলার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনা এবং তারা অনেকটা আরাকানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পৌনগিদের মতো।[২৭]

ব্রহ্মদেশ প্রাচীন এবং বৌদ্ধ প্রধান দেশ। আরাকানে বৌদ্ধ শাসন। সাধারণত 'মগ' বলতে আরাকানীদের বুঝায়। স্থানীয় বৌদ্ধদের উপর মগদের শাসন যেমন ছিল, তেমনি ছিল ত্রিপুরাধিপতিদের শাসন, হিন্দুদের শাসন, মুগল মানদের শাসন এবং চাকমাদের শাসন। এর মধ্যে চাকমাদের সাথেই ছিল বড়ুয়াদের গভীর সম্পর্ক। আরাকানী মগরা বাংলার বৌদ্ধদের উপর ধর্মীয় ও ভাবাগত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের মগ বলা হয়। আসলে বড়ুয়ারা মগ সম্প্রদায়ভূক্ত নয়। ড. আবদুল মাবুদ খান বলেন, আরাকানের প্রাচীন রাজধানী 'ম্রোহঙ'। ম্রোহং>মোগং>মগ, এভাবে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি। নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীর দিকে বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী থেকে আরম্ভ করে অনেক নৃপতির নির্যাতানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মগদাবাসী বৌদ্ধরা বঙ্গদেশ ও ব্রহ্মদেশে চলে আসে। মগধের অধিবাসী বলে তাদেরকে সাধারণভাবে 'মগ' বলা হয়ে থাকে। তাই বড়ুয়া বৌদ্ধরা আদি মগধবাসীদের বংশধর তাই আরাকানি 'মগ' সম্প্রদায় ভূক্ত নয়। নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আরাকানী বৌদ্ধরা বড়ুয়া বৌদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ড. আহমদ শরীফের মতে, চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধরা একটি আরাকানী বর্ণ সংকর জনগোষ্ঠি। মোগল বিজয়ের পূর্বে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ পযর্ন্ত চট্টগ্রামে আরাকানী মগ অধিবাসীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ। ড. সুকোমল চৌধুরী বলেন, বড়ুয়ারা আরাকানের মধ্য দিয়ে মগধ থেকে বাংলায় এসেছে। অনেকর অভিমত চট্টগামের রাজবংশী ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা বর্মি (আরাকানী) বংশোদ্ভূত। কিন্তু চট্টগ্রাম তথা বাংলার বড়ুয়া বৌদ্ধদের মূলউৎস বর্মি নয়। মগধের বৈশলীর বৃজিদের চট্টগ্রামে আগমন করায় বজ্জিহতে বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তাই বড়ুয়া জাতির মূল উৎস বৈশালির বৃজি ও কপিলাবাস্তুর শাক্যজাতি।[২৮]

ডা. রাম চন্দ্র বড়ুয়ার মতে, বৈড়গা শব্দ বড়ুয়া শব্দের অপভ্রংশ। বৈমালীর বজ্জিরা এয়োদশ শতকে বাংলার চট্টগ্রামের আরাকানী অঞ্চলে এসেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকে বাঙালি বৌদ্ধরা বড়ুয়া উপাধি ব্যবহার শুরু করে। আমসার পদবিধারী রাজকর্মচারী, এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে ত্রিপুরার রাজা ধনমানিকের সময় (১৪৯৯-১৫১৪খ্রি.) সেনাবাহিনীতে 'বড়ুয়া' পদ সৃষ্টি করা হয়। এ সম্পর্কে ত্রিপুরার ইতিহাস গ্রন্থ রাজামালা থেকে জানা যায় যে "শ্রী ধনমানিক্য রাজা তদবধি সেনা 'বড়ুয়া' পদবি খ্যাতি করিল রচনা।" 'বড়ুয়া' ছিল হাজারী'র উপরিস্থ পদ। বড় শব্দ থেকে 'বড়ুয়া' পদবী সৃষ্টি হয়েছিল।' পঞ্চদশ মহতকের কবি বড়ুচণ্ডী দাসের একটি পদে বড়ুয়া শব্দের উল্লেখ দেখা যায়:

" একে তুমি ফুল নারী

Dhaka University Institutional Repository

কুল আছে তোমার বৈরী

অপর নাহে বড়ুয়া বধূ।"

ড. প্রণব কুমার বড়ুয়ার মতে "চতুর্দশ শতকের শেষে অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথম থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের একমাত্র রাজবংশী পদবি ছিল বলা যায়। নামে মাত্র কয়েক জন বড়ুয়া পদবী বৌদ্ধ ছিল। "কেউ কেউ মনে করেন 'বড়ুয়া' শব্দটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি বাচক নয় বরং উপাধিবাচক, যেমন-দেওয়ান, চৌধুরী, রায়, বড়ুয়া ইত্যাদি।"[২৯] বড়ুয়া বৌদ্ধরা সুপ্রাচীন কাল থেকে বড়ুয়া পদবী ধারী ছিলেন না। এই পদবী বাংলা ভাষা বিস্তারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তখন বাংলা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়েই ছিল। কালক্রমে ভাষা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে পূর্বভাগও বাংলা ভাষাভাষি হয়ে যায়। 'বড়' থেকে 'বড়ুয়া' এই পদবীর উদ্ভব দেক যায় ধন্যমানিক্যের আসলে (১৪৬৩-১৫১৫)। তখন বৌদ্ধদের মধ্যে যারা উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের উপাধি ছিল বড়ুয়া। এ রকম অল্প সংখ্যক পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের মতে, ১৭টি ১৮টি পরিবার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অন্যান্যরা বড়ুয়া পদবী গ্রহণে প্রভাবিত হয়ে এখানকার বড়ুয়া সম্প্রদায়।

বৌদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন বড়+অরিয়=বড়ুয়া বা বৈশালীর 'বৃজি' জাতির অপভ্রংশ বড়ু য়া। তাদের মতে বৌদ্ধরা মগধাগত।[৩০] "বড়ুয়া প্রাচীন নামগুলি বাঙালির নাম হতে বিভিন্ন দেখা যায় প্রথম দিকে কেওয়েই ফুরু, হোয়াসোং পুরু, মম ফুরু, অঙ্গ ফুরু, ছাতা ফুরু, চর ফুরু ইত্যাদি। মধ্য সময়ে বীমরাজ, দুর্যোধন, নকুল, বকুল, সহদেব, অর্জুন, ভীম, কর্ণ, বীরকর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি। বর্তমানে বাঙালির অনুকরণে সুন্দর সুন্দর নামকরণ করেন।"[৩১] বর্তমানে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বিভিন্ন উপাধিধারী বৌদ্ধ। বাংলাদেশে বড়ুয়া উপাধিধারী বৌদ্ধদের সংখ্যা সর্বাধিক। তবে যেসব উপাধি ব্যবহার হয় তা হলো বড়ুয়া, মুৎসুদ্দি, তালুকদার, চৌধুরী, মিয়া, দেওয়ান, সিকদার, মহাজন, রাজবংশী, সিংহ, রায়, হাজারী, সিং ইত্যাদি।

বড়ুয়া উপাধির বৌদ্ধরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, কক্সবাজার, মীরসরাই, বাঁশখালী, ফটিকছড়ি, সীতাকণ্ড সহ বিভিন্ন বৌদ্ধ জনপদে বসবাস করেন। মুৎসুদ্দিরা পাহাড়তলী, রাঙ্গুনিয়া, পটিয়ায়, সিকদার দেখা রাউজান, উখিয়া, চন্দনাইশ, মহাজন দেখ যায়, রামু, চকরিয়া, মহেশখালীতে, তালুকদার ও চৌধুরীরা রাঙ্গুনিয়া সাতবাড়িয়া, রাউজান, উখিয়া, পালং, হাটহাজারী এবং সিংহ, চৌধুরী ও রাজবংশীরা লাকসাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ও সীতাকুন্ড অঞ্চলে বসবাস করে সংখ্যাধিক বিভিন্ন উপাধিধারী বৌদ্ধরা। এসকল বৌদ্ধরা বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করলেও পরিচয় দেয় 'বড়ুয়া' বলে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির বলেন, "বংশ জাত বিচারে দেখযায়, চট্টগ্রামে আজ যারা বড়ুয়া বলে পরিচিত, পূর্বে এভাবে সকলে বড়ুয়া উপাধি ব্যবহার করতেন না। পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবিত হয়েছেন মাত্র। বড়ুয়া ও চাকমাদের মধ্যে এক সময় দেওয়ান উপাধি ছিল; বড়ুয়াদের মধ্যে বর্তমান না থাকলেও চাকমাদের মধ্যে দেওয়ান এখনো আছে।[৩২]

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজা ছিলেন রাজা অতীতবাহন। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি গ্রন্থে লিখেন যে, মুসলিমদের কর্তৃক মগধ (বিহার) বিজয়ের প্রাক্কালে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষু বুকি ভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় রাজা রালাসুন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে অতীতবাহন চাকমার রাজা ছিলেন।[৩৩]

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, চাকমা রাজা সেরমুস্ত খানের কোনো পুত্র না থাকায় তিনি শুকদেব বড়ুয়াকে পুত্রবৎ পালন করেন। সেরমুস্ত খানের মৃত্যুর পর শুকদের ১৭৫৮ সালে রাজা হন। তিনি রাজধানী আলীকদম থেকে রাঙ্গুনিয়া থানার পদুয় গ্রামে সুকবিলা নামক স্থানে স্থানান্তর করেন। মোঘল সম্রাট তাকে 'রায়' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর আমলে ১৭৬০ সালের ১৫ আগস্ট নবাব মীর কাসিম চট্টগ্রামের শাসন ভা ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। পরবর্তীতে চাকমা রাজা জ্যানবক্স খাঁ সুকবিলাস থেকে রাজাধানী রাঙ্গুনিয়া রাজানগরে নিয়ে আসেন এবং ১৮৫২ সাল পযর্ন্ত সেখানে তাঁদের রাজধানী ছিল। ১৮৫৩ সালে চাকমা রাজা হরিশ চন্দ্র তাঁর রাজধানী রাজনগর থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করলে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক জেলা হয় এবং ১৯০০ সালের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়াল দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা ঘোষনা করা হয়। এখন চাকমারা সংরক্ষিত এলাকায় চলে গেলে, বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলো সমতলে থেকে যায়। বৌদ্ধ পরিবার হিসেবে পরবর্তীকালে বড়ুয়াদের প্রভাবে অন্যান্য পরিবারগুলি ক্রমে বড়ুয়া হয়ে যায়। সৃস্টি হয় বৃহত্তর 'বড়ুয়া' সম্প্রদায়।

পণ্ডিত ধর্মতিলক মহাস্থবির, উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দি, আবদুল মাবুদ খান প্রমুখ পণ্ডিত ও গবেষকদের ধারণা, বাঙালি বৌদ্ধরা উত্তর ভারতের মগধ হতে বাংলাদেশে এসেছেন। খ্রিস্টীর সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাক্ষণ্য ধর্মের পুর্নজাগরণের পথিকৃৎ মিহিরকুল ও গৌড়রাজ শশাঙ্কে (৬০৬-৬৩৮) বৌদ্ধদের উপর নির্মম নির্যাতন, অত্যাচার নিধন ও ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। এ সময় বৌদ্ধরা পালিয়ে আসাম ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রামের আরাকান বৌদ্ধদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। আরাকান শাসকের সকলে বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা আরাকান শাসনাধীন ছিল সে কারনেই আসামে এবং চট্টগ্রামে প্রাচীন বড়ুয়া উপাধিধারী জনগোষ্ঠী উত্তর ভারতের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বংশধর। তাই আরাকান বাসী বৌদ্ধ তাঁদের মগধাগত বুদ্ধর ক্ষত্রিয় বংশের লোক বলে সম্মানার্থে বড় আর্য বা বড়ুয়া বলে সম্বোধন করতেন। পণ্ডিতদের ধারণা এখানে থেকে বড়ুয়া শব্দের উৎপত্তি।

বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধরা একটি সুশিক্ষিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়। শিক্ষা দীক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী পদে চাকরির ক্ষেত্রে সমতলী বৌদ্ধদের সংখ্যা বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

শহরগুলিতে বৌদ্ধদের সংখ্যা বসতি ও বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বৌদ্ধদের বসতি সংখ্যাধিক এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে বড়ুয়াদের শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি এবং এ সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকুরি জীবিদের সংখ্যাও বেশি।

৪.২ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী বৌদ্ধ জাতিসত্তার ইতিবৃত্ত

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ভূ-খণ্ডটি মূলত উত্তর থেকে দক্ষিনে বিস্তৃত। উত্তরে ভারত ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরামের লুসাই পর্বত শ্রেনী, মায়ানমারের অংশ, দক্ষিণে মায়ানমার, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা পরপর অবস্থিত। উত্তরে খাগড়াছড়ি জেলা, মাঝখানে রাঙ্গামাটি জেলা ও বান্দরবান জেলা। পূর্বের বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে এই তিনটি পার্বত্য জেলায় বিভক্ত। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫১৩৮ বর্গমাইল বা ১৩০০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫', থেকে ২৩°৪৫' পর্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১°৪৫' থেকে ৯২°৫২' পর্যন্ত এর অবস্থান।[৩৪] প্রশাসনিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামরে তিনটি জেলায় ২৫টি থানা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলায় ৮টি থানা, রাঙ্গামাটি জেলায় ১০ টি থানা, এবং বান্দরবান জেলায় ৭টি থানা অবস্থিত।[৩৫] পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জেলার প্রত্যেক থানায় আদিবাসী উপজাতি বৌদ্ধরা বসবাস করে।

ক) খাগড়াছড়ি জেলায় আয়তন ২৬৬০ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯৭ সালের (ইত্তেফাক ১৯৯৭) হিসাব মতে, উপজাতী ২,০৪,৬০৫ জন, বাঙ্গালী ১,২৫,৬৪০ জন, মোট জনসংখ্যা ৩,২৯,৯২৩ জন। শিক্ষার হার ২০%, কলেজ ৫টি, উচ্চ বিদ্যালয় ২৫টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৫৬টি, কারিগরি বিদ্যালয় ১টি ।

খ) রাঙ্গামাটি জেলার আয়তন ৬,১১,৬১৩ বর্গ কিলোমিটার। উপজাতী ২,২৩,২৯২ জন বাঙ্গালী ১,৭৮,০৯৬, মোট জনসংখ্যা ৪,০১,৩৮৮ জন। শিক্ষার হার ৩৬.৪৮% জন, কলেজ ৩টি, উচ্চবিদ্যালয় ৩৯টি, জুনিয়র বিদ্যালয় ১২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫০৭ টি, কারিগরি বিদ্যালয় ৩টি।

গ) বান্দরবান জেলার আয়তন ৪,৫০২ বর্গ কিলোমিটার উপজাতি ১,১০,৩৩৩ জন বাঙ্গালী ১,২০,২৩৬ জন, মোট জনসংখ্যা ২,৩০,৫৬৯ জন। শিক্ষার হার ২৩.৮৮%, কলেজ ২টি, উচ্চবিদ্যালয় ১৫টি, জুনিয়র বিদ্যালয় ২৮টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩১০টি।[৩৬]

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯,৭৪,৪৪৫ জন। এদের মধ্যে উপজাতীয় ৬,৬৩,০৭৭ জন আর বসতি স্থাপন কারী বাঙালী ৩,১১,৩৬৮ জন।

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতীয়রা সকলেই এক ও অভিন্ন নয়, তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র ধর্ম গোষ্ঠি, সংস্কৃতি ও পরিচিতি। তবে সংখ্যাধিক্য আদিবাসী উপজাতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী (চাকমা, মারমা, চাক, তনচঙ্গা, খিয়াং, মুরং)। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতির ভাষাভাষির ১৩ জনগোষ্ঠি। এই উপজাতি গুলো হলো- চাকমা, মারমা (মগ), ত্রিপুরা, মুরং (ম্রো), তনচঙ্গ্যা, বম, পাংখো (পাংখুয়া), খুমি, লুসাই, চাক, খিয়াং, উসাই ও রিয়াং।

জনসংখ্যার বিবেচনায় চাকমা ৩,০৬,৬১৬ জন, রাখাইন মারমা (মগ) ১,৭৬,২৩০ জন, ত্রিপুরা ১,০২,৪৫৫ জন, মুরং ৩২,০৯৮ জন, তংচঙ্গ্যা ২১,১৪০ জন, বোম ৫,৫৮৪ জন, পাংখু ১,৬০৮ জন, খুমি ১,০৯১ জন উসাই ৯৬৬ জন। (প্রাগুক্ত, বিদ্রোহী পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি, পৃষ্ঠা-২৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোর প্রায় ৬০% বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। (সমুজ্জ্বল সুবাতাস, বান্দরবান, ২০০০, পৃষ্ঠা-৩২) শতকরা হিসেবে ৩০.৫৭% চাকমা ১৬.৬০% ভাগ মারমা, চাকমারা বেশি রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়, রাখাইন মারমাদের ঘনবসতি কক্সবাজার, পটুয়াখালী, চন্দ্রঘোনা, বান্দরবান, লামা ও আলীকদম। উপজাতিদের মধ্যে চাকমা ও মারমা শিক্ষায়, সংখ্যায়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকে দিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। চাকমা জাতির ২৪টি গোত্র, মারমাদের ২১ টি গোত্র। উপজাতির সমাজে প্রধান বা সমাজপতি পাবর্ত্য জেলার তিন রাজা, চাকমা মং, বোমং রাজা। রাজার নিজ নিজ সার্কেল বা এলাকা প্রধান, সমাজ শাসনেরও কর আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের। উপজাতিদের মৌজা প্রধানকে বলা হয় হেডম্যান, পাড়া বা গ্রাম প্রধানকে বলা হয় কারবারি। চাকমা ও মারমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুঘলদের দ্বারা প্রভাবিত এবং মৌলিক কাঠামো আরাকানদের দ্বারা প্রভাবিত।

রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা নিয়ে গড়ে উঠে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল। উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের দক্ষিন-পূর্বে অবস্থিত। আয়তকন ৫,০৯৩ বর্গমাইল যা পুরো বাংলাদেশের এক দশমাংশ।[৩৭] পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে মোট ১৩টি উপজাতি। ধর্মের দিক দিয়ে এদের অধিকাংশ বৌদ্ধ। বাকিরা হিন্দু, খ্রিষ্টান, মুসলিম।[৩৮]

এদের জীবন যাপন, চলাফেরা, ভাষা সব মিলিয়ে এদের পুরো সংস্কৃতিই বাঙ্গালী সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। বর্তমানে এখানকার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ উপজাতি ও বাকী ৪০ ভাগ অউপজাতি।[৩৯] পার্বত্য সমস্যার প্রথম সূচনা হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠি ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম জেলা থেকে উপজাতীয় অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলটিকে পৃথক করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক এক নতুন জেলার গঠন করে। প্রচলিত প্রথার সাথে মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে (ক) চাকমা সার্কেলে (খ) বোমং সার্কেল ও (গ) মং সার্কেল ভাগ করা হয়। প্রত্যেক সার্কেলে নিযুক্তি লাভ করেন একজন উপজাতীয় রাজা। এছাড়া পার্বত্য এলাকাটিকে ৩৬৫ টি মৌজায় ভাগ করে প্রতিটি মৌজা

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধানের জন্য একজন হেডম্যান এবং প্রতিটি গ্রামের জন্য একজন কারবারি নিয়োগ করা হয়। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ শাসক বর্গ চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ১৯০০ প্রবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে শাসন বর্হিভূত এলাকা ঘোষণা করে।[৪০] এই ম্যানুয়েলটি পাহাড়ীদের কাছে খুব প্রিয়।

১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ এলাকার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ১৯৬৩ সালে সংবিধানের এক সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ এলাকার মর্যাদা বাতিল করা হয়।[৪১] এসময় অনেক উপজাতি ভারত ও বার্মায় চলে যায়। তাছাড়া পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করলে পাহাড়ের প্রায় লক্ষ লক্ষ উপজাতি বাস্তুহারা হয়। চাকমাদের প্রায় ৫৪ হাজার একর আবাদী জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। সে সঙ্গে তলিয়ে যায় চাকমা রাজবাড়ী সহ প্রচুর ভুমি। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালের ১৬ মে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, সন্তু লারমা, ভবতোষ দেওয়ান, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা প্রমুখ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গড়ে তোলেন রাঙ্গামাটি কমিউনিষ্ট পার্টি।[৪২]

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী উপজাতীয় নেতা মংরাজা মং দ্রুত সাইনের নেতৃত্বে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের এক উপজাতি প্রতিনিধি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ৪ দফা দাবি সহ সাাক্ষাৎ করতে যান। তাদের দাবিসমূহ ছিলো (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ঘোষণা এবং একটি নিজস্ব পরিষদ রাখা (খ) উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের আইনের অনুরূপ বিধান গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করা (গ) উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা এবং (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন না আনা। এ প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, কে কে রায়, মিসেস বিনেতা রায়, সুবিমল দেওয়ান এবং জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা।[৪৩] স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়ীদের দাবী প্রত্যাখান করেন। ফলে ১৯৭২ সালে মার্চ মাসে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অঙ্গ সংগঠন হিসেবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ গঠন করা হয়। এই দলেরই সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৩ সালে ৭ জনুয়ারী।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে উপজাতি সম্মেলন নামে একটি রাজনৈতিক ফোরাম গঠন করেন।[৪৪] এ সময় লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে পাহাড়ে পুনবার্সন করে উপজাতি পাহাড়ীকে কোনঠাসা করে এবং স্বতন্ত্র জাতির অবস্থান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পরবর্তীতে এরশাদ সরকার ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলায় স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। ১৯৯৩ সালে বেগম খালেদা জিয়া সরকার শান্তি বাহিনীর সাথে বৈঠকের প্রেক্ষিতে প্রায় ৫ হাজার উদ্বাস্তু পাহাড়ী স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর আওয়ামী সরকার আমলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ পাবর্ত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক এ শান্তি চুক্তি এতদঞ্চলে ইতো মধ্যে শান্তি ও উন্নয়নের এক নবযুগের সূচনা করেছে। সদাশয় সরকার ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠন করেছেন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গুরুত্ব ও মর্যাদা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ যে, জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমাকে স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তাই সুবৃহৎ চীনা ভোট (Sina-Tibetan) মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠির অন্তভূর্ক্ত। চীনা-ভোট (Sina-Tibetan) বৃহৎ দলটি প্রথমে ভোট বর্মী (Tibeto-Burman) এবং পরে চীনা-শ্যাম –উপভাগে বিভক্ত হয়। পরে চীনা-শ্যাম থেকে শ্যাম দল এবং সেখান থেকে হা-শ্যাম সৃষ্টি করে। ভোট-বর্মী দল থেকে ছয়টি উপদলের সৃষ্টি হয়, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ছক থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

আদিবাসী পার্বত্য উপজাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি

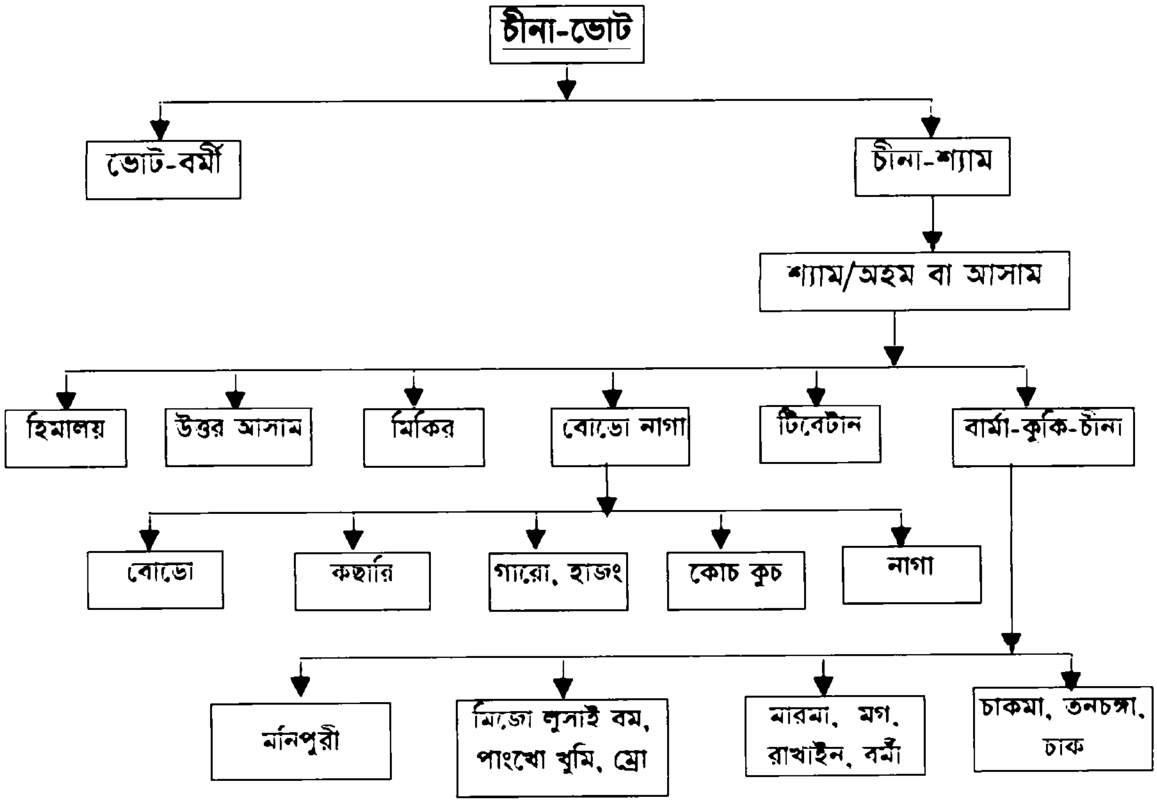

উৎস: (বরেন ত্রিপুরা, ১৯৯০)

Dhaka University Institutional Repository

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, উপজাতীয়রা দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত। কৃষি কাজই হলো ঐতিহাসিকভাবে তাদের জীবন ধারণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এ চাষকে জুম চাষ (যুম, চাকমারা বলে 'জুম'; বাংলায় 'ঝুম' বলা হয়। জুম চাষ উপজাতীয়দের একটি ঐতিহ্যবাহী বৃত্তি পেশা। ব্রিটিশ শাসনামলে (১৭৮৫-১৯৪৭) পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ একটি অত্যন্ত ফলপ্রস চাষ হিসাবে গণ্য হত। একে Exceeded area ঘোষণা করে। তাই তাদের জুম জাতি (যুমিয়া; চাকমায় 'জুমুয়া' বাংলায় 'ঝুমিয়া') বলা হয়। পাবর্ত্য অঞ্চলের আদিবাসী উপজাতিদের একতা, সরলতা, সহজ, সৎ, আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনচেতা, পরোপকারীতা, সত্যবাদিতা, আতিথেয়তা, দান, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, শ্রম, সহিষ্ণুতা, সত্যিই অসাধারণ ও অনন্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী উপজাতিদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মারমা, চাকমা, তনচঙ্গ্যা, চাকদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অন্তর্গত। মারমা, ম্রো এবং কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুণার রাখাইনদের ভাষা সিনো টিরেটান পরিবারের টিবেটটা-বার্মেন বা ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্ভূক্ত।[৪৫] তাদের মুখ মন্ডল গোলাকার, নাক কম বেশি চ্যাপ্টা, চুল সোজা এবং কালো, চোখের মণির রঙও কালো, ওষ্ঠ পাতলা, গায়ের রং ফর্সা বা ঈষৎ হলদেটে, দাড়িগোঁফ কম, দেহ কেশহীন, উচ্চতা মাঝারি ইত্যাদি বৈশিষ্টা বিদ্যামান। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব উপজাতি ও আদিবাসীদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ যে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর সভ্যতার এক অপূর্ব নিদর্শনা পৃথিবীতে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর আছে মোট তিনটি- একটি লন্ডনে, অপরটি দু'টি এশিয়া মহাদেশের জাপানের টোকিওতে এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত জাদুঘরটি জাতিতাত্ত্বিক নিদর্শনের অমূল্য সম্পদ। ১৯৬১ সালে পরিকল্পিত এ জাদুঘর চালু হয় ১৯৬৫ সালে। এ জাদুঘরে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সংশ্লিষ্ট জাতি, জনগোষ্ঠি, আদিবাসী ও মৌল গোষ্ঠি গুলোর একটা সামগ্রিক পরির্চিতি। এতে বাঙালি জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জাতি তাত্ত্বিক পরিচয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এতে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৩ টি উপজাতীয় জনগোষ্ঠির জীবন ধারা প্রধানরূপে বিদ্যামান। যেমন- চাকমা (চাঙমা), মারমা (মগ), রাইখান (রাখাইন), চাক (সা), ত্রিপুরা (টিপরা), তঞ্চঙ্গ্যা (টংচঙ্গা), মুরং (ম্রো), লুসাই (মিজো), পাংখো (পাঙকো), বম (বনসোগী), খ্যাং (খিয়াং), খুমি (কুমি) প্রভৃতি উপজাতির জীবন ধারা।[৪৬] পাহাড়ী উপজাতিদের সমাজ সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্য হলো চাকমাদের বস্ত্র বয়ন শিল্প। তাদের বস্ত্র বয়ন শিল্প উপজাতিদের মধ্যে বহু শতাব্দী হতে বিদ্যমান ছিল। তাদের বস্ত্র বয়ন শিল্প সর্বাংশে পরিপূর্ন। বস্ত্র বয়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচাঁমাল কার্পাস উৎপাদন হতে আরম্ভ করে চরকির সাহায্যে সুতাকাটা, রংকরা, কাপড়বুনা, এবং বুনা শেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে গায়ে দেওয়া পর্যন্ত সকল প্রণালী তাদের নিজস্ব। পাহাড়ীদের বস্ত্রবয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতি গুলি সবগুলিই গাছ ও বাঁশের তৈরি। কাপড় তৈরি করণ প্রক্রিয়া ও বিধিগুলি বহু শতাব্দীর পুরাতন হলেও বর্তমানে আধুনিক ডিজাইন ও বৈচিত্র্যতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ি আদিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকে স্বজাতীয় পদ্ধতিতে বয়ন করা কাপড় ব্যবহার করতেন। এখানে সকল আদিবাসীরা স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যবাহী প্রথায় কাপড় ও অলংকার পরিধান করে এবং নিজস্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ভাষাকে চর্চা করে। আধুনিক কালে পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা ও বৃহত্তর জাতির গোষ্ঠির সংস্পর্শে এসে কিছু পরিবর্তন ও সচেতনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজ থেকে অনেকাংশে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার পরিহার হচ্ছে। দিন দিন শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ জাতি ধর্ম, সংস্কৃতি ও সংস্কার প্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক ইতিহাস সমাজ বিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এ বিশ্বের যে কোন জাতির এবং গোত্রের ধ্যান-ধারা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় জানতে হলে ঐ জাতির বা গোত্রের সামাজিক ইতিহাস জানা অবশ্যই কর্তব্য। আমরা বর্তমানে কোন অবস্থায় আছি, পূর্বে কি অবস্থায় ছিলাম, তা আমরা আমাদের সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস থেকে জানতে পারি। বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠি তাদের বিভিন্ন ভাষা, ধ্যান-ধারণা, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতিনীতি, উত্থান-পতনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখে। চাকমাদের পূজা পার্বণ ও উৎসব গুলো গৌতম বুদ্ধের জীবনাশ্রয়ী এবং ঘটনা বিজড়িত পূর্ণিমা, অমাবস্যা ধর্মীয় তিথি কেন্দ্রিক। বুদ্ধ পূর্ণিমা তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এছাড়া প্রবারণা, মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা ইত্যাদি। সমাজিক উৎসব হিসাবে নববর্ষ বা চৈত্র সংক্রান্তিতে বিজু /বিঝু (সম্মিলিত বৈসাবি) অন্যতম। চাকমারা জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে ধর্মীয় রীতিনীতির পাশা পাশি বিভিন্ন আনন্দ উৎসব করে থাকে। এদের পোশাক পরিচ্ছেদ নিজস্ব ঐতিহ্য মন্ডিত। পরিধেয় ঐতিহ্যবাহী পোষাক তারা নিজেরাই তাঁতে (বোনে) তৈরি করে।

চাকমাদের খাদ্যাভ্যাস বাঙালি থেকে ভিন্ন ধরণের। খাদ্যাভাসের বিষয়ে চাকমাদের কোন সংস্কার নেই । চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তারা সচরাচর শুকুর, মুরগি, ছাগল এবং বিভিন্ন বন্য প্রানী ও পশুপাখির মাংস খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। মাছ, শুটকি, কাঁকড়া, চিংড়ি, হাঙ্গর, ছিদোল (নাপ্পি) এবং বাশের অংকুর, বেতের ডগা, ওল, জুম চাষের বিভিন্ন সবুজ শাক সবজি খাদ্য তালিকায় প্রধান। তাদের খাদ্য রন্ধন প্রক্রিয়া ও স্বাদ বাঙালি খাদ্যের স্বাদ থেকে একটু ভিন্ন রকম। চাকমা সমাজে বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে এবং কর্মব্যস্ততা শেষে নিত্য কিংবা মাঝে মাঝে মদ পানের রীতি আছে। চাকমারা নিজেরাই ঘরে মদ তৈরী করে। এটা সমাজে স্বীকৃত এবং ইহা একটি অপরিহার্য পানীয়।[৪৭] উপজাতীয় রাজাদের বংশ তালিকায় চাকমা জাতির ইতিহাসে চম্মন খান, জব্বর খান, শুকদেব, জানবক্স খান, ধরমবক্স খান, শের দৌলত খান প্রমুখ রাজাদের নাম ও কার্যবিবরণী পাওয়া যায়। মুসলিম নাম গ্রহন করলেও তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এমন মত ও পাওয়া যায় যে, মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের সময় মুঘলদের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য প্রর্দশনের জন্য চাকমা রাজারা কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত প্রজারা মুসলিম নাম ও পদবি ব্যবহার করতেন। যদিও তারা কোনদিন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হননি।[৪৮]

কেউ কেউ অভিমত জানান যে, চাকমা রাজারা পরবর্তীতে কয়েকজন ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিল। এটা সত্য যে, উপজাতিরা নিজ ধর্মীয় জাতিসত্তা বিসর্জন দিয়ে কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি এলাকায় কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি। অর্থাৎ উপজাতীয় রাজারা এমনকি প্রজারা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো তাহলে এ এলাকায় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মসজিদ নির্মিত হতো।[৪৯]

১৪১৮ সালে চাকমা রাজা মো আন তমুণি ব্রহ্মদেশ থেকে বিতারিত হয়ে রামু ও টেকনাফে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাকমাদের সাথে মোগলদের সর্ম্পক কেমন ছিল তা জানা না গেলেও চাকমা সম্প্রদায় মুসলিম রাজার সমর্থন লাভ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। যার ফলে মুসলিম রাজার সংশ্রবে এসে তারা অনেক মুসলিম ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইংরেজ গর্ভণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং এর কাছে ১৩ জুলাই ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে লেখা একটা চিঠিতে সর্বপ্রথম জানা যায়, রামু খান নামে একজন পাহাড়ী লোক তাদের তুলা চাষের উপর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে খাজনা দেয়। সেই থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত এবং অনগ্রসর এলাকা হিসেবে সেই সময়ের সরকারগুলোর কাছে সংবিধান সম্মত ভাবে বিবেচিত হত। বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামেরই বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হয়।[৫০]

তবে এদের মধ্যে বিশেষ একটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায় বিশেষ কতকগুলো কারণে। যেমন ঃ

ক) উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও ধর্মে তারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী;

খ) নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা মঙ্গোলীয়ান জাতিগোষ্ঠির অন্তর্গত;

গ) পেশাগত দিক থেকে এরা প্রায় সকলেই জুমচাষী;

ঘ) সাংস্কৃতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এরা একে অপরের খুবই কাছাকাছি, আবার বাঙালি সংস্কৃতি সঙ্গে রয়েছে এদের সকলেরই মেরুদূর প্রভেদ।[৫১]

বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে এরা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ী এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছে সুদূর অতীতে। ---- ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোঘল শাসনামলে এবং ১৭৬০ খ্রিঃ থেকে ১৮৬০খ্রিঃ পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলে এই অঞ্চলটির নাম রাজস্ব সংক্রান্ত জুন নোটিফিকেশন নং ৩৩০২ অনুসারে ১৮৬০ সালের পহেলা আগষ্ট রেইভান অব ফ্রন্টিয়ার ট্রাইব ত্র্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০ অনুসারে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যদিও বর্তমানে এ জেলাকে

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙে ৩টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। ১৮৬০ সালে জুলাই মাসে প্রথম পাহাড়ী অঞ্চলের শাসনের দায়িত্ব দিয়ে পাহাড়ী উপজাতিদের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। তখন থেকেই সেই পাহাড়ী এলাকা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে ১৮৬৭ সালে জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত 'পাহাড়ী উপজাতিগনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট' থেকে পরিবর্তন করে পার্বত্য অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার করা হয় এবং তার উপর সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের রাজস্ব আদায় ও বিচার কাজ পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়। একই সাথে জেলাটাকে কয়েকটা মহকুমায় বিভক্ত করা হয় এবং সেগুলোর দায়িত্বে কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।[২২] আদিবাসী বৌদ্ধ উপজাতীয় মধ্যে, চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, চাক, ম্রো, উল্লেখযোগ্য। Consur Report ১৯৯১ মতে, চাকমা ২৩৯, ৪১৭ জন, মারমা, ১৪২, ৩৩৪ জন ম্রো ২২,১২৯ জন, চঞ্চঙ্গ্যা ১৯২১১ জন, চাক ২০০০ জন। অন্য হিসাব মতে, রাখাইন উপজাতি ২২০০০ জন। বাংলাদেশে সর্বমোট ৫,২০,৫০০ জন এর অধিক উপজাতি আছে।

১৯৯৭ সালের হিসেবে চাকমা ৩,০৬৬১৬ জন, মারমা ১,৭৬,২৩০ জন, মুরং ৩২,০৯৮ জন, অচঙ্গ্যা ২১,১৪০, চাক ২১০০ জন, খুমি ১,০৯১ জন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতির সংখ্যা ৫ লক্ষ ১ হাজার ৪৪ জন। ১৯৯৭ সালের হিসেবে ৬,৬৩,০৭৭ জন।

বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত।

পার্ব্যত চট্টগ্রাম জাতিগোষ্ঠী পরিসংখ্যান

সারণী-১

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন উপজাতি বা জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা

ক্রমিক	জাতিগোষ্ঠী	জনসংখ্যা
১	চাকমা	২৩৯৪১৭
২	মারমা	১৪২৩৩৪
৩	ত্রিপুরা	৬১১২৯
৪	ম্রো	২২১৬৭
৫	তঞ্চঙ্গা	১৯২১১
৬	বম	৬৯৭৮
৭	পাংখো	৩২২৭

৮	চাক	২০০০
৯	খিয়াং	১৯৫০
১০	খুমী	১২৪১
১১	লুসাই	৬৬২
১২	অন্যান্য (আদিঃ)	৮২৮
মোট উপজাতীয় জনসংখ্যা		৫০১১৪৪

জনগোষ্ঠী	বান্দরবান	রাঙামাটি	খাগড়াছড়ি
উপজাতি	১১,০৩৩৩	২,২৩,২৯২	২,০৪,৬০৫

১৯৯৭ সালের আদমশুমারী পরিসংখ্যান

সারণী-২

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় উপজাতি ও অ-উপজাতি জনসংখ্যা

জনগোষ্ঠী	বান্দরবান	রাঙামাটি	খাগড়াছড়ি	মোট
উপজাতি	১১০৩৩৩	২২৩২৯২	১৬৭৫১৯	৫০১১৪৪
অউপজাতি	১২০২৩৬	১৭৮০৯৬	১৭৪৯৬৯	৪৭৩৩০১
সর্বমোট	২৩০৫৬৯	৪০১৩৮৮	৩৪২৪৮৮	৯৭৪৪৪৫

সারণী-৩

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা

ইসলাম	হিন্দু	খ্রীষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য	মোট
৪২৯৯৫৪	৮৭৮০৬	২২২০৬	৪২৫৩১১	৯১৬৮	৯৭৪৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪

বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজাতির থানা ভিত্তিক অবস্থান ও জনসংখ্যা

উপজাতি	বান্দরবান	বোয়াংছড়ি	রুমা	থানছি	আলীকদম	লামা	নাইক্ষ্যংছড়ি	মোট
মারমা	১৭৩৬৪	১১১৫০	৮০২৫	৬১৪৫	২৪৯৯	১০৫৩৭	৩৫৬৮	৫৯২৮৮
ম্রো	৩১৮৮	৭৭০	২৬১৫	৩৭৩৮	৬২৯৬	৩৯২৫	১৫০১	২১৯৬৩
ত্রিপুরা	৩৩৩	১০৬৪	৯০৩	২৪৪৭	১৩৪৫	২০৯৫	-	৮১৮৭৭
বম	১১৭৪	৭৪৯	৩৮৯৫	৬১১	-	-	-	৬৪২৯
তঞ্চঙ্গ্যা	২০৮০	৮৯৮	৩৩৯	-	১০৭০	৪০	১০৬৬	৫৪৯৩
চাকমা	১৩৬৩	৭১৬	২০৯	৫১০	৩২০	১৩২	৯১৩	৪১৬৩
চাক	-	-	-	-	-	-	১৬৮১	১৬৮১
খিয়াং	৬৪৫	৪৮৪	১২৩	১৭৩	-	-	-	১৪২৫
খুমী	-	৫৭	২৬৮	৮২৫	-	-	-	১১৫০
লুসাই	১১	-	২১৫	-	-	-	-	২২৬
পাংখোয়া	-	-	৯৯	-	-	-	-	৯৯
অন্যান্য	-	৭৩	-	-	৫৯	-	৯৭	২২৯
সর্বমোট	২৬০৮৮	১৫৯৬১	১৬৬৯১	১৪৪৪৯	১১৫৮৯	১৬৭২৯	৮৮২৬	১১০৩৩৩

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান এই তিনটি পাহাড়ি জেলাকে বলা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বা চিটাগাং হিল ট্রাক্টস (CHT). ১৮৬০ সালে তৎকালীন বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশের পার্বত্য ভূমিকা আলাদা করে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এখানকার উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক মিল খুবই কম। এখানে প্রায় ১৩টি বৃহৎ উপজাতির বাস।

ভৌগোলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন ৫,১৩৮ বর্গমাইল অর্থাৎ মোটামুটি বাংলাদেশের আয়তনের ১০ ভাগের এক ভাগ। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তিনটি পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা ছিল ৫ লাখের কিছু বেশী। এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই ছিল উপজাতীয়। ১৯৮১ সালের আদমশুমারীতে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা সাড়ে ৭ লাখের কাছাকাছি হয়। যার মধ্যে ৬০ শতাংশ উপজাতীয় এবং ৪০ শতাংশ বাঙালি। ১৯৯১ এর পরে পার্বত্য জেলা সমূহের জনসংখ্যা ৯ লাখের

Dhaka University Institutional Repository

উপরে দাঁড়ায়। এ সময়ের এক আনুষ্ঠানিক গননায় তিনটি জেলার বাঙালি লোকসংখ্যার অনুপাত ৪১ থেকে ৪৮ শতাংশ। তিন পার্বত্য জেলার শিক্ষিত উপজাতীয় যুবকদের উদ্যোগে ও আগ্রহে ১৯৭২ সারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামক একটি রাজনৈতিক দল জন্ম নেয় বা সংঘটিত হয়। এক বছর পর তারা তাদের দলে শান্তিবাহিনী নামে একটি সশস্ত্র শাখার কার্যক্রম চালু করে। রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার এবং জনসংহতি সমিতির মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত যখন বিভক্ত হয়ে যায় তখন আংশিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকারি আইনের পাশাপাশি প্রচলিত আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০। পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এ্যাক্ট ১৯৭৬, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন। ১৯৮৯, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত সকল সম্প্রদায় নিয়ে অনেক বির্তক রয়েছে। যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৭/১৮ সম্প্রদায় বসবাস করছে এর মধ্যে ১১/১৩ টি সম্প্রদায়কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৮ সালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী পরিষদের সদস্য সংখ্যা চেয়ারম্যান সহ ৩১ এর স্থলে ৩৪ জন করা হয়। ২ জন উপজাতি, ১ জন অ-উপজাতি সহ মোট ৩ জন মহিলা সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। শান্তিচুক্তির মাধ্যমে প্রতিবছর ৩৭২ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। চাকুরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটায় নিয়োগ পাচ্ছে। বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় ১৪ লাখের অধিক মানুষ বসবাস। বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল এর ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'মো লাং নীং'

প্রাচীন এবং নবীন উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উপজাতীয় নাচ গানের আসরে শিক্ষিত যুবকদের উপস্থিতি নিতান্তই কম। আজ কাল লেখাপড়ায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, কল্প কাহিনী, কুসংস্কারের প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় কিংবা আগ্রহী নয়। বর্তমানে নবীন ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে এবং যথেষ্ট সতেচন ও বুদ্ধিমান। তারা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারী, বিবিএ, সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, অর্থনীতি, আই,আর, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, পালি, দর্শনসহ প্রভৃতি বিষয়ে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগে বাঙালী বৌদ্ধরা সমাজে প্রাচীন ও নবীন পন্থীদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও পার্থক্য দেখা গিয়েছিল, বর্তমানে উপজাতিদের মধ্যে অনেকটা সেই রকম। উপজাতিরা পূর্বের আদিম সংস্কৃতির তুলনায় বর্তমানে অনেক সুসভ্য, আধুনিক ও সচেতন। আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত উপজাতির এক ধরনের উগ্র আত্মমর্যাদাবোধ। তাঁদের কোন সামাজিক কুপ্রথার উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

বা নিন্দা তাঁরা সহ্য করতে রাজি নয়। সম্ভব হলে তাঁরা প্রথাটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেন। কালের গতি ও অবস্থার পরিবর্তনে এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিতে ক্রমশ যেমন পরিবর্তন, উপজাতিয় সমাজে ও কালক্রমে এ ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন। বংশমর্যাদা বিচারে উপজাতিয় চাকমা, মারমা, রাখাইনরা সূর্যবংশীয় কিংবা চন্দ্রবংশীয় উত্তরাধিকারী।

প্রাচীন কালের বঙ্গ, পুণ্ড, রাঢ়, সমতট, হরিকেল, জনপদের আদি অধিবাসী ছিল বৌদ্ধরা। বর্তমানে বাঙালি জাতির ধমনীতে তাঁদের রক্ত বইছে এবং তাদের সংস্কৃতি বাঙালির সভ্যতাকে সমাজকে পরিপুষ্ট করেছে । আজ বৌদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও সভ্যতা বাঙালির গৌরবের বিষয়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদের আদি বাংলা ভাষার নিদর্শন ও বাঙালি ও বাংলার অমূল্য অবদান।

প্রাচীন বঙ্গে বসবাসকারী পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে ধর্ম পূজার বিধান আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত, ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিনতি। অনার্য জাতি বিশেষের মধ্যে প্রচলিত ধর্মপূজার প্রাচীন অনুষ্ঠান হতে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছে। কারো কারো মতে উন্নত আর্য সংস্কৃতি হতে এর উৎপাত। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ক্ষীণাবশেষ বর্তমান উপজাতিদের (চাকমা, মারমা, রাখাইন, চাক, মুরং, খিয়াং, খুমি, তনচঙ্গ্যা) মধ্যে ধর্ম পূজার বিধান রয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে চাকমা ভাষায় ধর্মকাম বলে। এর অন্য নাম সিদ্ধিপূজা, জাদি পূজা। উপজাতি সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক সকল পূজার মধ্যে এটি অন্যতম পূজা। মহাসমারোহে এ পূজা সম্পন্ন করেন। ইহার অনুষ্ঠান ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারন বলে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অনেকে বিপদে পতিত হলে ইহা মানত করত। বর্তমানে আদিবাসী সমাজে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে ধর্মপূজার বিশ্বাস শিথিল হয়েছে।

শ্রদ্ধাবান গৃহী সমস্ত ঘরদ্বারা পরিস্কার করে সস্ত্রীক স্নাতশুচি হয়ে পূর্বাহ্নে আত্নীয় স্বজনকে নিমন্ত্রন করেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহবান করেন। বুদ্ধ মূর্তির সামনে পূজা অর্পণ করে, বৈকালে ধুপ, দীপ, পুস্প প্রভৃতি দ্বারা ঘন্টাধ্বনি সহকারে বুদ্ধের বন্দনা/অর্চনা করেন। এ সময় বিকৃত পালি ভাষায় লিখিত চাকমা বৌদ্ধ শাস্ত্র 'সাহস পুলুতারা' এবং 'মালেমতারা' পাঠ করা হয়। (মৎ প্রনীত "চাকমা জাতির ইতিহাস (পৃ-৫৪) এবং সতীশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'চাকমা জাতি' (পৃষ্ঠা-২০০ দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন কুসংস্কার থাকলে ধর্মকাম, ধর্মঠাকুরের পূজা নয়, এতে বুদ্ধ পূজা, দশপারমিতা প্রার্থনা, ধর্মপদের বাণী এবং সাইত্রিশ প্রকার পাক্ষিক ধর্মলোচনার প্রতীক।[৫৪]

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নানামাত্রিক ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও নৃতাত্ত্বিক সুস্বীকৃত বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যতম হলো এ অঞ্চলের ভাষাগত বৈচিত্র্য। পার্বত্য চট্টগ্রামেও বেসরকারী পর্যায়ে নানা ভাষা কেন্দ্রিক উদ্যোগ আয়োজন চলছে। বান্দরবানের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনসটিটিউট সেখানকার বৈচিত্র্যমন্ডিত ভাষা ঐতিহ্যের অধিকারী ক্ষুদ্র জাতিগুলো মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসি জনগোষ্ঠি গুলোর বর্ণমালাগত সমস্যা এখন খুব একটা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সব'কটি জনগোষ্ঠির হরফ বা বর্ণমালা সম্প্রতি কম্পিউটারের আওতায় এসেছে। যেমনঃ চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের Aujhaapaat, মারমা ও চাকদের Myanmar বম খুসি ও লুসাইদের ভড়সধহ ম্রোদের Mruchow, ত্রিপুরাদের Bijoy-sutonny প্রভৃতি ফন্টে মুদ্রন ও প্রকাশনার কাজও ইদানিং এগিয়ে চলেছে। এখন সেই লিপিগুলোর ব্যাপকচর্চা ও উন্নয়ন দরকার।

প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামো

১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার নিম্নোক্ত প্রশাসনিক কাঠামো চালু করেনঃ রাজা (সার্কেল প্রধান), হেডম্যান (মৌজা প্রধান), কার্বারী (গ্রাম প্রধান) চাকমা জাতি এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতাধীন ছাড়াও স্বতর্স্ফূত ভাবে নিম্নোক্ত একটি সামাজিক মর্যাদা বা কাঠামো রয়েছে ঃ ক) ভন্তে বা বৌদ্ধ ভিক্ষু (ধর্মীয় প্রধান), খ) গেংগুলী (চারণ কবি) গ) ওঝা (তান্ত্রিক চিকিৎসক), চীনা তিব্বতী (Sino – Tibetan) ভাষা গোষ্ঠিকে কেউ কেউ ভোট চীনীয় গোষ্ঠি বলেন।

চাকমারা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির লোক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভূক্ত উপজাতিদের ভাষার মত তাদের ভাষা টিবটো বার্মান (Tibeto-Burman) বা সিনে টিবেটান (Sono-Tibetan) নয়। চাকমা ভাষা ইন্দো ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত একটি ভাষা। ইন্দো (ইউরোপীয়) এবং এরিয়ান (ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষার ভিত্তিতে); এটি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার নিকটবর্তী একটি ভাষা।[৫৫] চাকমা হরফে লিখিত পাণ্ডুলিপি গুলোর মধ্যে, তাহলিক শাস্ত্র, শাঙেচ ফুলু তারা, আঘরতারা, রাধামন, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪.৩ আদিবাসীদের সমাজ গঠনে বিভিন্ন শ্রেণীসংজ্ঞা

গোত্র বা কৌম (Clan): গোত্র বা কৌম হচ্ছে দুই বা তার অধিক গোষ্ঠীর একটি জাতি দল। এ দলের সদস্যরা একই পূর্বসূরীর উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের জানে কিন্তু যে শীর্ষস্থানীয় পূর্বসূরীর মাধ্যমে তারা একে অপরের জ্ঞাতি সদস্য বৃদ্ধির কারণে এবং বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সূত্রীতার ধারা তাদের জানা নেই। গোষ্ঠীর মতো কিংবা মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal) কিংবা আনুষঙ্গিক এবং আচার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের মাধ্যমে সংহতি ও ঐক্য রক্ষা করে। সংক্ষেপে গোত্র(Clan) হচ্ছে একটি জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলী বা একদল লোকের একটি সাধারণ এক রৈখিক পূর্বপুরুষের দাবীকে বর্ণনা করে।

কুল বা বংশ (Lineage): সাধারণভাবে কুল বা বংশ পদটি দ্বারা বর্ধিত পরিবার বা গোত্রের ক্ষুদ্রাংশ বোঝায়। আদিম সমাজের গোত্রগুলো পিতৃ ও মাতৃসূত্রীয় নীতিতে পরিলক্ষিত হয়। পিতৃসূত্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

গোত্রের নাম Clan এবং মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম gen। অতএব কুল বলতে পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) গোষ্ঠী যার সদস্যরা একজন অভিন্ন বা একই পূর্বপুরুষ থেকে অবিচ্ছিন্ন বা অখণ্ডিত ধারার বংশোদ্ভূত। কুল হল একটি জ্ঞাতি দল কিংবা পূর্বসূরী কেন্দ্রিক।

উপজাতি (Tribe): ঊনিশ শতক থেকে নৃ-বিজ্ঞানীগণ এক ধরণের রাষ্ট্রবিহীন সমাজকে প্রণালীবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন সাধারণভাবে একটি বিবর্তনের মাত্রায়। এটি হচ্ছে ট্রাইব বা উপজাতি। Tribe হচ্ছে সাধারণভাবে পশুপালক এবং পল্লী জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ গোষ্ঠী যারা স্বাতন্ত্র্য সূচক ভাষায় স্থানিক (Spatial) রূপ বা উপভাষা এবং একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে যা তাদেরকে অন্যান্য উপজাতি থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে। গত কয়েক শতক ধরে উপজাতি, শব্দটির ব্যবহার নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। তারা মনে করেন পদটি অবমাননাকর। উপজাতি হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠি, যেখানে অসংখ্য কোম গোষ্ঠি, জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠির লক্ষ্য করা যায়। বোগারডাস এর মতে উপজাতি গোষ্ঠি রক্তের বন্ধন ও অভিন্ন ধর্মের উপর নির্ভরশীল। উপজাতির বৈশিষ্ট্য সমূহ হলো- ক) প্রত্যেকটি উপজাতি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে; খ) উপজাতির সদস্যের মধ্যে একাত্মবোধ, ঐক্যচেতনা বিদ্যমান; গ) উপজাতির সদস্যরা অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী; ঘ) এটি আন্তঃগোষ্ঠি বিবাহমূলক জনসমষ্টি; ঙ) এ গোষ্ঠির সদস্যরা পরস্পর রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ; চ) প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে; ছ) উপজাতীয় সংগঠনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা অভিন্ন পূর্ব পুরুষকে পূজা (Ancestor worship) করে; এবং জ) উপজাতির থাকে অভিন্ন নাম ও ভৌগোলিক সত্ত্বা। এরা ঐতিহ্য প্রিয় ও সহজ সরল বৈচিত্রপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। উপজাতীয় জনগণ বিশ্বাস করে যে, তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে।

সম্প্রদায় (Community): সম্প্রদায় এর ল্যাটিন অর্থ হলো 'অন্যের প্রতি এক ধরণের মনোগতবোধ'। এর পশ্চিমা অর্থ হলো একটি স্বার্থগত ঐক্য। সাধারণভাবে সম্প্রদায় বলতে বোঝায় যখন কোন গোষ্ঠীর সদস্যরা একত্রে বসবাস করে, তারা বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে বরং একটি সাধারণ চিন্তা-চেতনা ও একই ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয়ে একত্রে জীবনযাত্রায় অংশীদার হয়। সম্প্রদায়ের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে একজন ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সম্প্রদায়ের ভিত্তি হলো-অঞ্চল এবং সম্প্রদায়গত অনুভূতি।

সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় ল্যান্ডবার্গ বলেন, 'সম্প্রদায় হচ্ছে একটি মানব গোষ্ঠি; যা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং পরস্পর নির্ভরশীল অভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। প্রকৃত পক্ষে সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনসমষ্টি, যা একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাস করে এবং অভিন্ন জীবনযাত্রার অংশীদার।

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠি (Group): মানুষ সামাজিক জীব। সে একা ও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা গোষ্ঠির মধ্যে সম্পন্ন হয়। গোষ্ঠি জীবন মানুষের ব্যক্তিত্ব রূপায়ণে বিশেষ সহায়ক। কোন জনসমষ্টি সুসংবদ্ধ পারস্পরিক ক্রিয়া; অংশীদারিত্বমূলক অবস্থা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং অভিন্ন চেতনা সম্পৃক্ত হলেই সামাজিক গোষ্ঠি হয়।

গোষ্ঠির সংজ্ঞায় শেরিফ বলেছেন, গোষ্ঠি হচ্ছে এমনই একটি সামাজিক একক, যার মধ্যে রয়েছে একাধিক ব্যক্তি এবং তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে কম-বেশি পদমর্যাদা ও ভূমিকা যেসবের মাধ্যমে তারা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত হয় এবং আদর্শ মূল্যবোধ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মোট কথা গোষ্ঠি হচ্ছে ব্যক্তির সমষ্টি বিশেষ, যা মোটামুটি স্থায়ী, সংগঠিত এবং একাধিক অভিন্ন স্বার্থ ও কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

সংঘ (Association): যখন কিছু সংখ্যক মানুষ একই উদ্দেশ্য কিংবা অভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংগঠিত হয় এবং একটি নির্ধারিত কর্মপন্থা অবলম্বন করে তখন তাকে সংঘ বা সমিতি বলে। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, সংঘ বা সমিতি হলো এমন একটি সংগঠিত গোষ্ঠি, যা তাদের সাধারণ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য গঠিত হয়। (We define an association as a group organized for the pursuit of an interest, or group of interests in common মূলত সংঘ হল ব্যক্তি ধারা গঠিত একটি সুশৃংখল ও বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার অংশমাত্র।

সমাজ (Society): সমাজ হচ্ছে একদল লোকের সমষ্টি, যারা একটি সাধারণ সংস্কৃতির অংশীদার (যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সঞ্চালিত করে), ভূ-খণ্ড এবং পরিচিতি আছে। সমাজ হলো মানব গোষ্ঠীর বৃহত্তম রূপ। একটি আত্মসমর্থিত জনগোষ্ঠী এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সমাজ তিনভাগে বিভক্ত। যথা- ক্রিয়ার দিক থেকে (Functionglly), কাঠামোগত দিক থেকে (Structurally) এবং গতিশীলতার দিক থেকে (Dynamically)। ম্যাকাইভার ওপেজ সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সমাজ হচ্ছে প্রথা পদ্ধতি (Customs) ও প্রক্রিয়া, কর্তৃত্ব ও পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতা, একাধিক গোষ্ঠী ও উহার বিভাজন এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণমূলক একটি ব্যবস্থা বিশেষ।'

আবার গিডিং বলেন, 'Society is the Union its of, the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together.' হারকিনস মনে করেন, 'সমাজ হচ্চে নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিদের এমন একটি স্থায়ী অথবা ক্রমবিকশিত গোষ্ঠি যার মাধ্যমে তারা তাদের বংশানুক্রম এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়।' [৫১]

Dhaka University Institutional Repository

জাতি (Nation) : জাতি হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের নিজস্ব সাধারণ ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও একটা সুনির্দিষ্ট এলাকা আছে। বর্তমানে জাতি বলতে আমরা দুটো জিনিস বুঝি। প্রথমত, জাতক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার সে জাতিভূক্ত, জাতকও সেই জাতিভূক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, জাতককে নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। তার মানে বংশানুক্রমে জাতকের জাতির আর কোন পরিবর্তন ঘটে না।

জাতি-বর্ণ প্রথা (Caste System) : সমগ্র ভারতীয় সমাজ সংগঠনই দুটি মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এর একটি মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি নির্ধারণের ধারণার সাথে এবং অন্যটি তার প্রতিপালন ও ছেলেবেলার শিক্ষা দীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। এই দুটিকে একত্রে বলা হয় 'বর্ণ আশ্রম ব্যবস্থা'। জাতি-রর্ণ (Caste) বৈষম্য বিষয়টি বৌদ্ধধর্মে নেই। বরং এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও প্রসার। হিন্দু সমাজ গঠিত হয়েছি জাতিভেদ প্রথার ওপর। এই সমাজে প্রতি জাতির এক একটা বিশেষ বৃত্তি ছিল। হিন্দু সমাজে অসংখ্য জাতি। কিন্তু গোড়ার দিক মাত্র চারটি শ্রেণী ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চর্তুবর্ণের ওপর হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ধারণা করা হয় বর্ণ বিভাগ কল্পনা আরো প্রাগার্যদের কাছ থেকে নিয়েছিল। [৫৭]

গোত্র বা কৌম (Clan): গোত্র বা কৌম হচ্ছে দুই বা তার অধিক গোষ্ঠীর একটি জাতি দল। এ দলের সদস্যরা একই পূর্বসূরীর উত্তরসূরী হিসেবে নিজেদের জানে কিন্তু যে শীর্ষস্থানীয় পূর্বসূরীর মাধ্যমে তারা একে অপরের জ্ঞাতি সদস্য বৃদ্ধির কারণে এবং বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সূত্রীতার ধারা তাদের জানা নেই। গোষ্ঠীর মতো কিংবা মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal) কিংবা আনুষঙ্গিক এবং আচার অনুষ্ঠান ও প্রতীকের মাধ্যমে সংহতি ও ঐক্য রক্ষা করে। সংক্ষেপে গোত্র(Clan) হচ্ছে একটি জ্ঞাতি সম্পর্কের পদাবলী বা একদল লোকের একটি সাধারণ এক রৈখিক পূর্বপুরুষের দাবীকে বর্ণনা করে। [৫৮]

কুল বা বংশ (Lineage): সাধারণভাবে কুল বা বংশ পদটি দ্বারা বর্ধিত পরিবার বা গোত্রের ক্ষুদ্রাংশ বোঝায়। আদিম সমাজের গোত্রগুলো পিতৃ ও মাতৃসূত্রীয় নীতিতে পরিলক্ষিত হয়। পিতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম Clan এবং মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম gen। অতএব কুল বলতে পিতৃসূত্রীয় (Patrilineal) গোষ্ঠী যার সদস্যরা একজন অভিন্ন বা একই পূর্বপুরুষ থেকে অবিচ্ছন্ন বা অখণ্ডিত ধারার বংশোদ্ভূত। কুল হল একটি জ্ঞাতি দল কিংবা পূর্বসূরী কেন্দ্রিক।

উপজাতি (Tribe): উনিশ শতক থেকে নৃ-বিজ্ঞানীগণ এক ধরণের রাষ্ট্রবিহীন সমাজকে প্রণালীবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন সাধারণভাবে একটি বিবর্তনের মাত্রায়। এটি হচ্ছে ট্রাইব বা উপজাতি। Tribe হচ্ছে সাধারণভাবে পশুপালক এবং পল্লী জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ গোষ্ঠী যারা স্বাতন্ত্র্য সূচক ভাষায় স্থানিক (Spatial) রূপ বা উপভাষা এবং একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে যা তাদেরকে অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতি থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করে। গত কয়েক শতক ধরে উপজাতি, শব্দটির ব্যবহার নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক চলছে। তারা মনে করেন পদটি অবমাননাকর। উপজাতি হচ্ছে এমন একটি গোষ্ঠি, যেখানে অসংখ্য কোম গোষ্ঠি, জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও ক্ষুদ্র অন্তরঙ্গ গোষ্ঠির লক্ষ্য করা যায়। বোগারডাস এর মতে উপজাতি গোষ্ঠি রক্তের বন্ধন ও অভিন্ন ধর্মের উপর নির্ভরশীল। উপজাতির বৈশিষ্ট্য সমূহ হলো- ক) প্রত্যেকটি উপজাতি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে; খ) উপজাতির সদস্যের মধ্যে একাত্মবোধ, ঐক্যচেতনা বিদ্যমান; গ) উপজাতির সদস্যরা অভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী; ঘ) এটি আন্তঃগোষ্ঠি বিবাহমূলক জনসমষ্টি; ঙ) এ গোষ্ঠির সদস্যরা পরস্পর রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ; চ) প্রত্যেক উপজাতির নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে; ছ) উপজাতীয় সংগঠনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা অভিন্ন পূর্ব পুরুষকে পূজা (Ancestor worship) করে; এবং জ) উপজাতির থাকে অভিন্ন নাম ও ভৌগোলিক সত্ত্বা। এরা ঐতিহ্য প্রিয় ও সহজ সরল বৈচিত্রপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। উপজাতীয় জনগণ বিশ্বাস করে যে, তারা একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে।

সম্প্রদায় (Community): সম্প্রদায় এর ল্যাটিন অর্থ হলো 'অন্যের প্রতি এক ধরণের মনোগতবোধ'। এর পশ্চিমা অর্থ হলো একটি স্বার্থগত ঐক্য। সাধারণভাবে সম্প্রদায় বলতে বোঝায় যখন কোন গোষ্ঠীর সদস্যরা একত্রে বসবাস করে, তারা বিশেষ স্বার্থের অংশীদার না হয়ে বরং একটি সাধারণ চিন্তা-চেতনা ও একই ঐতিহ্যের ধারক বাহক হয়ে একত্রে জীবনযাত্রায় অংশীদার হয়। সম্প্রদায়ের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এর মধ্যে একজন ব্যক্তি তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে। সম্প্রদায়ের ভিত্তি হলো-অঞ্চল এবং সম্প্রদায়গত অনুভূতি।

সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় ল্যান্ডবার্গ বলেন, 'সম্প্রদায় হচ্ছে একটি মানব গোষ্ঠি; যা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে এবং পরস্পর নির্ভরশীল অভিন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। প্রকৃত পক্ষে সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনসমষ্টি, যা একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাস করে এবং অভিন্ন জীবনযাত্রার অংশীদার।

গোষ্ঠি (Group): মানুষ সামাজিক জীব। সে একা ও বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা গোষ্ঠির মধ্যে সম্পন্ন হয়। গোষ্ঠি জীবন মানুষের ব্যক্তিত্ব রূপায়ণে বিশেষ সহায়ক। কোন জনসমষ্টি সুসংবদ্ধ পারস্পরিক ক্রিয়া; অংশীদারিত্বমূলক অবস্থা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং অভিন্ন চেতনা সম্পৃক্ত হলেই সামাজিক গোষ্ঠি হয়।

গোষ্ঠির সংজ্ঞায় শেরিফ বলেছেন, গোষ্ঠি হচ্ছে এমনই একটি সামাজিক একক, যার মধ্যে রয়েছে একাধিক ব্যক্তি এবং তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে কম-বেশি পদমর্যাদা ও ভূমিকা যেসবের মাধ্যমে তারা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত হয় এবং আদর্শ মূল্যবোধ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মোট কথা গোষ্ঠি

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে ব্যক্তির সমষ্টি বিশেষ, যা মোটামুটি স্থায়ী, সংগঠিত এবং একাধিক অভিন্ন স্বার্থ ও কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

সংঘ (Association): যখন কিছু সংখ্যক মানুষ একই উদ্দেশ্য কিংবা অভিন্ন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সংগঠিত হয় এবং একটি নির্ধারিত কর্মপন্থা অবলম্বন করে তখন তাকে সংঘ বা সমিতি বলে। ম্যাকাইভার ও পেজের মতে, সংঘ বা সমিতি হলো এমন একটি সংগঠিত গোষ্ঠি, যা তাদের সাধারণ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য গঠিত হয়। (We define an association as a group organized for the pursuit of an interest, or group of interests in common মূলত সংঘ হল ব্যক্তি ধারা গঠিত একটি সুশৃংখল ও বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের সামাজিক জীবন ব্যবস্থার অংশমাত্র।

সমাজ (Society): সমাজ হচ্ছে একদল লোকের সমষ্টি, যারা একটি সাধারণ সংস্কৃতির অংশীদার (যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সঞ্চালিত করে), ভূ-খণ্ড এবং পরিচিতি আছে। সমাজ হলো মানব গোষ্ঠীর বৃহত্তম রূপ। একটি আত্মসমর্থিত জনগোষ্ঠী এবং নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। সমাজ তিনভাগে বিভক্ত। যথা- ক্রিয়ার দিক থেকে (Functionglly), কাঠামোগত দিক থেকে (Structurally) এবং গতিশীলতার দিক থেকে (Dynamically)। ম্যাকাইভার ওপেজ সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'সমাজ হচ্ছে প্রথা পদ্ধতি (Customs) ও প্রক্রিয়া, কর্তৃত্ব ও পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতা, একাধিক গোষ্ঠী ও উহার বিভাজন এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণমূলক একটি ব্যবস্থা বিশেষ।'

আবার গিডিং বলেন, 'Society is the Union its of, the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together.' হারকিনস মনে করেন, 'সমাজ হচ্ছে নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিদের এমন একটি স্থায়ী অথবা ক্রমবিকশিত গোষ্ঠি যার মাধ্যমে তারা তাদের বংশানুক্রম এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে বজায় রাখতে সক্ষম হয়।' [৫]

জাতি (Nation) : জাতি হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের নিজস্ব সাধারণ ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও একটা সুনির্দিষ্ট এলাকা আছে। বর্তমানে জাতি বলতে আমরা দুটো জিনিস বুঝি। প্রথমত, জাতক যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবার সে জাতিভূক্ত, জাতকও সেই জাতিভূক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, জাতককে নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। তার মানে বংশানুক্রমে জাতকের জাতির আর কোন পরিবর্তন ঘটে না।

Dhaka University Institutional Repository

জাতি-বর্ণ প্রথা (Caste System) : সমগ্র ভারতীয় সমাজ সংগঠনই দুটি মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এর একটি মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি নির্ধারণের ধারণার সাথে এবং অন্যটি তার প্রতিপালন ও ছেলেবেলার শিক্ষা দীক্ষার সাথে সম্পৃক্ত। এই দুটিকে একত্রে বলা হয় 'বর্ণ আশ্রম ব্যবস্থা'। জাতি-বর্ণ (Caste) বৈষম্য বিষয়টি বৌদ্ধধর্মে নেই। বরং এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও প্রসার। হিন্দু সমাজ গঠিত হয়েছি জাতিভেদ প্রথার ওপর। এই সমাজে প্রতি জাতির এক একটা বিশেষ বৃত্তি ছিল। হিন্দু সমাজে অসংখ্য জাতি। কিন্তু গোড়ার দিক মাত্র চারটি শ্রেণী ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চর্তুবর্ণের ওপর হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ধারণা করা হয় বর্ণ বিভাগ কল্পনা আরো প্রাগার্যদের কাছ থেকে নিয়েছিল। (মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা)

৪.৪ আদিবাসী চাকমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে। রাঙ্গামাটি বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি এ তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম। ইতিহাস মতে, 'কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে প্রাচীন কিরাত ভূমি' বা কার্পাস মহলই বর্তমান পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রধান ১৩টি আদিবাসী বসবাস করে। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, (টিপরা) মুরং, তনচঙ্গ্যা, পাংখোয়া, বম, চাক, খুমি, রিয়াং, উসুই, লুসাই, খিয়াং। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এদের মধ্যে চাকমা ও মারমা আদিবাসী সংখ্যায় অধিক। বাংলাদেশের ৪৫টি আদিবাসীর ২৮/৩২টি আদিবাসী জাতিসত্তা পার্বত্য চট্টগ্রাম বাস করে বলে একে জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর বলা হয়। চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস। ১) বান্দরবান জেলার সাতটি থানা ২) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা দশটি থানা ৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় আটটি থানা। সবকয়টি জেলা ও থানায় আদিবাসী উপজাতীয় বৌদ্ধরা অবস্থান করে।

বৃহত্তর পার্বত্য জেলায় আদিবাসীদের তিনটি সার্কেল ১) চাকমা সার্কেল ২) বোমং সার্কেল ও ৩) মং সার্কেল এর মধ্যে চাকমা সার্কেলে চাকমা রাজা এবং বোমং ও মং সার্কেলে মার্মা রাজা।

৪.৫ চাকমাদের ইতিহাস ও সমাজ সংস্কৃতি

বর্তমানে আদিবাসী উপজাতিদের মধ্যে সর্বাধিক আধুনিক শিক্ষিত, সচেতন, সংস্কার প্রিয় ও উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী 'পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্বে চট্টগ্রামের সাথে সংযুক্ত ছিল। পাহাড়ী জাতিদের আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবীতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১ আগষ্ট Bengal Govt Act XXII 1860 অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা লাভ করে।'[৬১] শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য Bengal

Dhaka University Institutional Repository

Government 1881 খ্রীষ্টাব্দের পহেলা সেপ্টেম্বর এই বিস্তৃত পার্বত্য ভূমিকে তিনটি সার্কেল যথাঃ চাকমা সার্কেল রাঙ্গামাটি, বোমাং সার্কেল বান্দরবন ও মং সার্কেল মানিকছড়ি বিভক্ত করা হয়।

স্যার রিজলীর মতে, ব্রহ্মভাষার ' সাক' বা 'সেক' জাতি থেকে চাকমাদের উৎপত্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চাকমারা সাকদেরই উত্তরপুরুষ। আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামারতী নগরের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই সাক বা সেক জাতি এককালে খুব প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। তাদের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ ন্যা সিং ন্যা থৈন ৩৫৬ মগাব্দে (৯৯৪ খ্রীঃ) সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। চাকমা রাজ শ্রী ভুবন মোহন রায় বলেছেন, চাকমারা আসলে শাক্য বংশ সম্ভূত মহামুণি বুদ্ধের বংশধর। চাকমারা নিজেদের বলেন চাঙমা আবার 'চাকমাকে আরাকানী ভাষায় বলা হয় সাক-মাঙ বা শাংমাং কেউ কেউ সাক (Sak) বা থেক (Thek) বলেন।' লামা তারানাথের লিখিত বইয়ের ইউরোপীয় অনুবাদ করা চাকমা শব্দটির বানান Tsakam বা Cagma করেছেন। ভারতের মিজোরা চাকমাদেরকে তাকাম (Takam) বলে। Gastadi নামক ইউরোপীয়, Bengala নামক একটি মানচিত্রে উল্লেখ করে Chatma (চাড়মা), কালী প্রসন্ন সেন (১৯৩১-৩৬) শ্রী রাজমালায় চাখমা লিখেন। চট্টগ্রামের বাঙালিরা চাকমাদেরকে 'চাম্মুয়া' বলে। চাকমারা বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে এবং জুম চাষ করে বলে তাদেরকে জুম্ম বলা হয়। (বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ বিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৩,১৪,১৫,১৬)

চাকমারা স্বাভব ও ব্যবহারের দিক থেকে অন্যান্য উপজাতি থেকে উন্নত। চাকমারা শিক্ষিত, সহজ, সরল, সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ। তার স্বজাত্যবোধে মহান, সাহসী ও স্বাধীনচেতা। এরা মিতভাষী সত্যপরায়ন, অতিথি পরায়ন এবং কর্মঠ। ইউরোপীয় পর্যটক ফ্রান্সিস বুখানন দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন চট্টগ্রাম যারা 'সাক' নামে পরিচিত তারা আসলে 'চাকমা'। উত্তরাঞ্চলে তাদেরকে চাকমাই বলা হয়। (প্রাগুক্ত, দক্ষিণ পুর্ববাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮), পৃষ্ঠা-১১২) তিনি বলেছেন, বাঙালিরা 'সাকসা' শব্দটিকেই বিকৃত করে 'সাগমা' বা 'চাকমা' করেছে।

মগ ভাষায় 'শাক্য' অর্থ সাক আর যারা রাজবংশসম্ভূত তাদেরকে বলা হয় 'সাকমাং' (মাং রাজা অর্থে)। এই চাকমাং থেকে চাকমা। এই বিশেষ কথাটির উপর চাকমারা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। নুতন চন্দ্র বড়ুয়া তাঁর চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আরাকানীরা শাক্য বংশকে 'চাকমাং' বলতো। শাক শব্দের অর্থ শাক্য এবং 'মাং' শব্দের অর্থ রাজ বংশ। এই চাকমাং থেকে চাকমা জাতির নাম হয়।

চাকমাদের প্রধান ধর্মী গ্রন্থ ত্রিপিটক (বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম পিটক)। চাকমা রাজমহিষী শ্রীমতি কালিন্দী রাণী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবু নীলকমল দাস কর্তৃক সদাদের ধর্মগ্রন্থ আদুত্তোয়াং এর বঙ্গানুবাদ

Dhaka University Institutional Repository

সমাপ্ত করান। পরে তা বৌদ্ধ রঞ্জিকা নামে পদ্যাকারে প্রকাশিত হয়। এটাও চাকমা সমাজে ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে পরিগনিত। চাকমাদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বোধি লাভ ও পরিনির্বাণের স্মৃতি বিজড়িত বৈশাখী পূর্ণিমা প্রধান ধর্মীয় উৎসব, মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ছাদাংম প্রবারণা অন্যতম। সামাজিক উৎসব হিসাবে বিজু (সার্বজনীন বৈসাবি) অন্যতম বৃহৎ উৎসব। চাকমারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিক্ত হলেও তাদের জ্ঞাতি ভিত্তিক সমাজ ভুক্ত (Centilo Society) বলা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা সবাই জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের মানুষ। স্যার রিজলী বলেছেন। প্রায় দেড়শত গোষ্ঠি নিয়ে চাকমা সমাজ গঠিত। চাকমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব খুব প্রবল এবং শ্রেণী বৈষম্য নেই। [৬১] চাকমারা মৃত ব্যাক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মমতে শ্মশানে দাহ করে। শিশু হলে কবরস্থ করা হয়। চাকমারা বস্ত্র বয়ন করা ও কুটির শিল্প সমগ্রী তৈরীতে অত্যন্ত পটু। চাকমারা প্রধানত জুম চাষের উপর নির্ভর শীল।

"পিতৃতান্ত্রিক চাকমা সমাজে গোষ্ঠি (Clan) গোচা (Tribe) ভেদে অন্তর্বিবাহ (Endogamy) ও বহির্বিবাহ (Exogamy) উভয়ই প্রচলিত আছে। চাকমারা বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাছাকাছি এসে গেছে। আধুনিক সমাজের মত এদের মধ্যেও স্বামী স্ত্রী সর্ম্পক খুব পাকাপোক্ত। চাকমাদের সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস মূলত রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেনীবিন্যাস ছিল ধাপে ধাপে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে। তখনকার চাকমা সমাজের শ্রেণী বিন্যাস হলো- রায়, দেওয়ান, তালুকদার, খীসা, কার্বারী ও চাকমা।

কালক্রমে সমাজের পুরানো কাঠামো ও এর কার্য প্রণালী এবং রাজা কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। সমাজে বংশগত পদমর্যাদার পরিবর্তে সামাজিক পদমর্যাদাই প্রাধান্য বিস্তার করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী স্বভাবতই পূর্বের অনেক সামাজিক সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, জীবনবোধ ইত্যাদি পরিবর্তনে দৃঢ় পক্ষপাতী। সাধারণত সচারচর দু'টি কারণে সামাজিক কাঠামো ও কার্য প্রণালীর পরিবর্তন ঘটে। ১) সংস্কারমূলক (Reformative) ও (২) রক্ষণমূলক (Conservative) প্রথমোক্ত পদ্ধতি সমাজে নতুন নতুন চিন্তাধারা গ্রহনে পক্ষপাতী এবং দ্বিতীয়টি সমাজের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চায়। এ দুটি বিষয়ই চাকমা সমাজে সমাজ বিবর্তনে মূখ্য হিসাবে বিরাজমান।

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। চাকমা রাজা হলেন চাকমা সমাজে প্রধান রাজার আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে মৌজার হেডম্যানগণ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রত্যেক হেডম্যানের অধীণে প্রতি গ্রামের একজন করে কারবারি আছে। চাকমা সমাজ ব্যবস্থা একদা খুবই উন্নত ছিল। বর্তমানে এ সমাজ ব্যবস্থায় রাজা-হেডম্যান-কারবারিক রূপ অনেকটা শিথিল ও স্থবির হয়ে পড়েছে। অতীতে চাকমা রাজারা ১৭৩৭ সালের পূর্বে ধামেই, চেগে, ঘীসা প্রভৃতি পদাধিকারী পদবী ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরায় ১৭৩৭ সালে দেওয়ান পদ সৃষ্টি করা হয়। রাণী কালিন্দীর রাজত্বকালে 'দেওয়ান' পদের পরিবর্তে 'তালুকদার' পদের প্রবর্তন করেন।

স্যার রিজলী চাকমাদের মধ্যে ৪৪টি গঝা (Sept) আছে বলে উল্লেখ করেন। রাঙ্গামাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অশোক কুমার দেওয়ান বলেছেন 'আরাকানী' গৃং-সা শব্দ থেকে চাকমাদের গঝা শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। গঝা মানে চাকমাদের নেতা ব্যক্তি। এরা রাজার অধীনে ছিল। কতগুলো গোত্র বা গোষ্ঠি মিলে চাকমাদের এক একটি গঝা গঠিত হয়েছিল। সতীশ চন্দ্র ঘোষ এর চাকমা জাতি গ্রন্থ মতে, চাকমারা গোত্র বংশ বা গোষ্ঠিকে গুথি বলে। কয়েকটি গঝাও গোষ্ঠির নাম প্রদত্ত হলো- বগা, পোমা, দার্য্যা, বোর্বুয়া, তৈন্যা, ওয়াংঝা, আমু, কাম্বেই, কুদুগা, লেবা, ধামাই, চাদং প্রভৃতি গঝা আর ধুর্য্যা, কাত্তুয়া, গজাল, মুলিয়া, নেন্দাব, কালাবাঘা, চাজ্যা টাবু, কাঙ, দোজা, জাদি, চেগে, ধাবানা, চাদং প্রভৃতি গোষ্টি। চাকমা সমাজে থানমান মালেইয়া, দাগান, চুঙুলাং, ভাত মজা দেনা প্রভৃতি পূজা রীতিকর্ম প্রচলিত আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে চাকমারা সংখ্যায় অধিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে সর্বাগ্রে। চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের মত চাকমাদের তথ্য বহুল ইতিহাস রয়েছে। চাকমা শব্দের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

H. H. Risely তাঁর Tribes & Castes of Bangla গ্রন্থে বলেন, আরাকানের চাক বা সাক সম্প্রদায় থেকে চাকমারা উদ্ভূত। আরাকানের দক্ষিণাঞ্চলে রামাবত নগরে চাক সম্প্রদায়ে বসতি ছিল। চাকমারা চাক সম্প্রদায়ের একটি শাখা।[৬২] আরাকানী কিংবদন্তী এবং অন্যান্যদের মতে, চাকমারা মোঘল বংশধর। গ্রন্থমতে থাইল্যান্ড মিয়ানমার সীমান্তে চাক ও শাস জনগোষ্ঠি চাকমা জাতির মৌলিক উৎস। চাকমা সম্প্রদায়ের আদি ইতিহাস সম্পর্কে চাকমা সমাজে দুটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ক) রাধামন ধনপতি ও খ) চাটিগাঁর ছড়া। উক্ত উপাখ্যানের কাহিনী মতে, চাকমা রাজা সাধ্বং গিরি তাঁর দলবল নিয়ে চম্পক নগরে বা চম্পা নগরে বাস করতেন। এই চম্পক থেকে চাকমাদের নামকরণ হয়েছে বলে অনেকের ধারণা কারো মতে, কপিলাবস্তুর গৌতমবুদ্ধের শাক্যবংশোদ্ভূত চট্টগ্রামের চাকমারা। ড. হাইনজ বার্শাটি মনে করেন, যে চাকমারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার লোক, হাচিংসন মনে করেন, চম্পা নগর ভারতের বিহার রাজ্যে। ফা হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে চম্পা নগর ভাগলরস্থ কর্ণপুরের রাজধানী। Captain T.H. Lewin বলেন, চাকমারা মালয়ের চম্পা নগরের বংশোদ্ভূত ভৌগোলিকিভাবে চম্পা নগর বার্মার আকিয়াবের নিকটে অবস্থিত। আবার কারো মতে, চাকমাদের আদি বাসস্থান চম্পক নগর, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত। চাকমা নামটি চম্পক নগরের অপভ্রংশ। চম্পক>চম্পা>চাংমা>চাকমা।

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসি পণ্ডিত পিয়ের ব্যাসানেত বলেছে যে, চট্টগ্রামে চাকমা উপজাতি ভারতীয় আর্যদলের বংশধর। তবে চাকমাদের জাতিতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্যে মঙ্গলীয়ান জনগোষ্ঠির লোক হলেও ইন্দো-এরিয়ান ভাষায় কথা বলে। তাদের ভাষা অসমীয়া ও চট্টগ্রামী বাংলাভাষার অনুরূপ। (পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮৫)।

ইতিহাস মতে, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৪১৮) চাকমা রাজা মঙ্গন খানের নেতৃত্বে চাকমা সম্প্রদায় আরাকান থেকে চট্টগ্রামে আগমন করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চল থেকে উত্তর দিকে সরে আসে এবং আলী কদম থেকে শিল নদীর তীরে সুখ বিলাস নামক স্থানের রাজানগরে রাজধানী স্থাপন করেন।[৬৩] চাকমা রাজা সের দৌলত খাঁ ও জান বকস খাঁর সময় রাঙ্গুনিয়ার বিস্তৃত ভূ-ভাগে চাকমাদের জামিদারী ছিল পরবর্তীতে সেরমুস্ত খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় ফতে খাঁ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বা ১৭৭৩ সালে রাজা হন। চাকমা রাজা ধরম বকস খাঁর পত্নী কালিন্দী রাণীর (১৮৩২-১৮৭৩) রাঙ্গুনিয়া সুখ বিলাসে রাজবাড়ি, রাজানগরে চাকমা রাজার রাজবাড়ির নিদর্শন আছে। ব্রিটিশ শাসনামলে চাকমা রাজ্য ছিল তাদের অধীনে একটি সামন্তরাজ্য। চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগর ছিল চাকমা রাজ্যের রাজধানী। চাকমারাই শুধু তাদের প্রজা ছিলেন না, বড়ুয়া, হিন্দু ও মুসলমানও ছিলেন তাঁদের শাসনাধীন। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে চাকমা রাজার রাজধানী গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্য এবং রাজানগরের চাকমা রাজবাড়ী সুবর্ণ অতীতের সাক্ষী। (বৌদ্ধ রঞ্জিকা-শ্রীনীলকমল দাস, রচিত, বিপ্রদাশ বড়ুয়া ও ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া (সম্পা), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরে রাণীর দিঘি, রাজানগর, রোয়াজারহাট, রাজা পুকুর লেন, রাঙ্গুনিয়ার রাণীর হাট, বাজার হাট প্রভৃতি চাকমা কীর্তির অবদান। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮৭৩ সালে রাজা হরিশ চন্দ্র তার বাসস্থান রাজানগরু থেকে রাঙ্গামাটিতে নিয়ে আসেন। ব্রিটিশ সরকার চাকমা রাজা হরিশ চন্দ্রকে ১৮৭১ সালে রায় বাহাদুর এবং ১৮৯২ সালে ভুবন মোহন রায়কে চীফ উপাধিতে ভূষিত করেন। ধর্মপ্রচারে চট্টগ্রাম আসলে তাকে সংঘরাজ উপাধি প্রদান করেন। চাকমাদের মালা/বর্ণ কে 'অঝপাত' বলা হয়। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আছে। চাকমারা সার্কেল প্রধানকে রাজা, মৌজা প্রধানকে হেডম্যান এবং গ্রাম প্রধানকে কার্বারী বলে। বর্তমান চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীর্ষ রায়।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন চাকমারা দূর অতীতে বাংলাদেশের পূর্বভাবে সমভূতিতেও বসবাস করতো। চাকমাদের প্রাচীন ইতিহাস বিজগ থেকে জানা যায় যে, তাদের আদি বাসস্থান চম্পকনগর বা চাম্পা নগর নামক স্থানে ছিল। কোন কোন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে, চম্পক নগর হিমালয় পর্বতের পাদদেশে। কারো মতে, বার্মাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে ইরাবতী নদীর তীরে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন, চাকমাদের আদি পুরুষ-উদয়গিরি প্রাচীনকালে চম্পনগরে এক রাজ্য পত্তন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর পিয়ারে ব্যাসনেত তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গ্রন্থে চাকমাদের গোড়াপত্তনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, চাকমাদের আদি নিবাস ছিল বার্মার (মায়ানমার) ইরাবতী নদীর তীরে চম্পকনগর নামক স্থানে। এক সময় তারা আরাকান পর্বত অতিক্রম করে আধুনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা মাহবুব উল-আলম বলেছেন, খ্রিস্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে চাকমারা চম্পক নগরে অবস্থান করছিল। এ স্থানটি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা (আধুনিক কুমিল্লা) জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ করে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী জাতক গ্রন্থে রাজা শম্ভু মিত্র ও অশুম্ভ মিত্রের কাহিনীতে চম্পক নগরের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চম্পক নগর বর্তমানে কোন জায়গায় অবস্থিত তা বলা কঠিন।

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন থ্যাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে এক হিন্দু রাজার নেতৃত্বে প্রাচীনকালে চম্পা নামক এক রাজ্য ছিল।

৪.৬ চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার :

চাকমারা চাকমা বর্ণে তাদের যে ইতিহাস লিখেছিল সেগুলোর নাম 'বিজগ'। তবে চাকমাদের বিজগ বা ইতিহাস বইগুলোতে তাদের অতীত সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে এই বিষয়ে আরাকান, ত্রিপুরা এবং ইউরোপীয় লেখকদের লেখার উপর নির্ভর না করে গত্যন্তর নেই। আশার কথা এই যে, ইতোমধ্যে এই বিষয়ে কয়েকজন দেশী ও বিদেশী গবেষক এগিয়ে এসেছেন যার ফলে চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে যেগুলোর আলোকে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এতদঞ্চলে চাকমাদের অবস্থিতি, ষোড়শ শতাব্দী থেকে মানচিত্রে তাদের অবস্থান এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তাদের রাজাদের সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমার রাজা (King of Chagma) ছিলেন রাজা অতীতবাহন। তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে একটি গ্রন্থে লিখেন যে, "মুসলিমদের কর্তৃক মগধ (বিহার) বিজয়ের প্রাক্কালে বহু সংখক বৌদ্ধভিক্ষু কুকি-ভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় রাজা বালাসুন্দ্রের পুত্রদের মধ্যে অতীতবাহন চাকমার রাজা ছিলেন"। লামা তারানাথ (১৬০৮)-এর মতে ঐ সময় রাজা অতীতবাহন চাকমার রাজা ছিলেন সেহেতু এ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতেও যে এতদঞ্চলে চাকমারা ছিল তা জানা যাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাদের এর পরবর্তী দুই শতাধিক বছরের কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনও পাওয়া যায় নি। অতঃপর আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থগুলো থেকে চাকমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে "আকেজন চাকমা রাজা (আরাকানী ভাষায় সাক-মাঙ)

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর দিক থেকে গিয়ে তৎকালে আরাকানের অধীনস্থ কক্সবাজার জেলার রামু (প্যাঁওয়া) অধিকার করেন।"[৬৪]

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ও মধ্যভাগে চাকমাদের মূল জনগোষ্ঠিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর উপরাংশে বসবাস করছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে চাকমারা চাকোমাসে ছিল তা জানা যায়। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে চাকমাদের রামু বিজয়ী দলটি কর্ণফুলী নদীর নিম্নাংশে দক্ষিণ তীরে চলে আসে। আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থগুলোর সূত্রে জানা যায় যে, ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে সেখানকার চাকমা রাজার নাম "উদং" ছিল। আরাকান রাজা মাঙরাজাগ্রি (১৫৯৩-১৬১২ খ্রিস্টাব্দ) চাকমাদেরকে তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধা করেন।

(রাজা ভুবন মোহন রায় বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চাকমাদের রাজা ছিলেন সাখুয়া বড়ুয়া। তাঁর দুই ছেলে ছিল। তারা হলেন চন্দন খান ও রওন খান। রাজা সাখুয়া তাঁর স্ত্রী এবং অমাত্যদের ষড়যন্ত্রে নিহত হন: এজন্য তাঁর স্ত্রী চাকমা ইতিহাসে 'কাত্তুয়া রাণী' হিসেবে পরিচয় লাভ করেন। এ.এম. সিরাজুদ্দীন বলেন, তৎকালীন ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মোগলদের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে চন্দন খান পার্বত্যবাসী প্রজাদের দ্বারা প্রথম রাজা হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর নিযুক্তি আরাকান রাজা কর্তৃক স্বীকৃত হয়। তিনি তাঁর বাস্থান 'তৈন'-এর রামানুসারে 'তৈন খান' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর বাসস্থান 'তৈন', জুমবঙ্গের পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল"। বর্তমানে এটি বান্দারবান পার্বত্য জেলায় আলীকদম (আলে খাং দং) উপজেলা নামে পরিচিতি। সেখানে তৈন (২৮৭ নং) এবং তৈনফা (২৯১ নং) নামে দুটি মৌজা রয়েছে। মোগলদের রেকর্ডপত্র থেকে আরো জানা যায় যে, ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে রওন খান এবং ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক কাত্তুয়া Kuttooah-কাত্তুয়ারানী? চাকমাদের উপর রাজত্ব করেছিলেন।

অতঃপর ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজা জালাল খান (মতান্তরে জলীল খান) চাকমাদের রাজা হন। তাঁর সময়ে তাঁর রাজ্যে লবণ, শুটকী, কাল সূতা, মুরগি, তামাক, গুড় ইত্যাদি কতগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দেয়। এ বিষয়ে সমতলের ব্যবসায়ীদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে বাণিজ্য করার অনুমতি দানের ব্যাপারে তিনি চট্টগ্রামস্থ মোগল ফৌজদারের কাছে অনুরোধ জানান এবং বাণিজ্য শুল্ক হিসেবে তাদের ১১ মণ কার্পাস দেন। এ প্রদত্ত শুল্ক থেকে পরে 'কার্পাস মহল'-এর নামটির উদ্ভব ঘটে। "কিন্তু ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে জালাল খান রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলে মোগল দেওয়ান কিষাণ চাঁদ (কৃষ্ণচন্দ্র) কর্তৃক আক্রান্ত হন; তার বাসস্থান ধ্বংস করা হয় এবং তিনি আরাকানে পালিয়ে যান এবং সেখানে পরবর্তীকালে মৃত্যুবরণ করেন"।

১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজা সেরমুস্ত খানের বাসস্থান তৎকালীন আরাকানে (সম্ভবত কক্সবাজার জেলার রামুর পূর্বদিকে রাজাকূলে) ছিল। ইংরেজদের রেকর্ডপত্রে রামুর একটি জমিদারীর নাম

Dhaka University Institutional Repository

'শেরমস্ত-কাম-জবরদস্ত খান" দেখা যায়। এটি সেরমুস্ত খানের অধীনস্থ এলাকা ছিল কিনা গবেষণার বিষয়। এই সময় এপ্রিল মাসে (আরাকানী তেংখুং মাসের শুক্লপক্ষের ২য় দিবসে) রামুর বাসিন্দাদের সহায়তায় জনৈক 'কাত্যা' নামক একজন আরাকানী বিদ্রোহী মুসলিম কর্তকর্তা রাক্ষাটং পাহাড়ের যুদ্ধে আরাকানের রাজা দ্বিতীয় চান্দা উজিয়াকে পরাজিত ও নিহত করে তিন দিনের জন্য আরাকানের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পর আরাকানীদের হাতে নিহত হন। ফলে ঐ সময়ে আরাকানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থায় (অথবা অন্য কোন কারণে?) চাকমা রাজা সেরমুস্ত খান ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের কাছে 'কোদালা' মৌজার বন্দোবস্তী নেন এবং তাদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখ চট্টগ্রামের কালেক্টর (এ. স্মিথ?) কর্তৃক চাকমা রানী কালিন্দীকে লিখিত একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, রাজা সেরমুস্ত খানের রাজ্যের সীমা উত্তরে ফেনী নদী থেকে দক্ষিণে শঙ্খনদীর মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত এবং পশ্চিমে নিজামপুর রাস্তা থেকে পূর্বে কুকী রাজ্য (মিজোরাম) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সময়ে তাঁর পালিত পুত্র (ভ্রাতুস্পুত্র?) শুকদেব রায় চন্দ্রঘোনার অনতীদূরে শুকবিলাস নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সাথে চাকমা রাজার সংঘর্ষ থেমে যায়। ইংরেজরা ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ঐ সময় পর্যন্ত চাকমা রাজার কাছে তাদের দাবিকৃত কর প্রদান থেকে চাকমা রাজাকে অব্যাহতি দেয়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাজা জানবক্স খানের কাছ থেকে কার্পাসের পরিবর্তে টাকায় (তঙ্কায়) রাজস্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পর ১৮১৫ টাকা কর ধার্য করা হয় (প্রাগুক্ত, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতি, ১৯০৯: পৃষ্ঠা-৭৯-৮০) রাজা জানবক্স খান কবে পরলোক গমন করেন এখনও তা জানা যায়নি। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে এপ্রিল তারিখ ফ্রান্সিস বুকানন যখন রাঙ্গামাটিতে চাকমা রাজবাড়ির নিকট যান, তখন রাজা জানবক্স খানের পুত্র টব্বর খান চাকমাদের রাজা ছিলেন।[৬৪] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জব্বর খান (১৮০১-১৮১২ খ্রিঃ) চাকমাদের রাজান হন। তাঁর নির্দেশে গ্রহাচার্য শঙ্করাচার্য নামক একজন ব্রাহ্মণ "রাজনামা" নামক একটি চাকমা ইতিহাস লিখেন (মাধব চন্দ্র চাকমা রাজমালা/আগরতলা ১৯৪০। অশোক কুমার দেওয়ান: ১৯৮২)। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে রাজা জব্বর খান পরলোক গমন করার পর তৎপুত্র রাজা ধরমবক্স খান চাকমাদের রাজান হন। "তাঁর সময়ে জনৈক ফাফ্রুকে তাদের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় তাদের অধিকাংশ লোক পুনরায় আরাকানে চলে যায়।" রাজা ধরমবক্স খানের তিন মহিষী-রাণী কালিন্দী, আটক বিবি ও হারি বিবির মধ্যে কেবল তাঁর ঔরসে রাণী হারিন বিবির গর্ভে রাজকুমারী মেনকা (ওরফে চিগনবি) নামে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে (?) পরলোক গমন করলে রাণী কালিন্দী চাকমাদের নেতৃত্বে দিতে থাকেন প্রথম দিকে ইংরেজরা তাঁকে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে ইংরেজরা তাঁর স্বামীর সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার মেনে নেয়। রাণী

Dhaka University Institutional Repository

কালিন্দীর সময় চাকমাদের পুরাতন রাজধানী রাজানগরের পাকা রাজবাড়িটি এবং শাক্রমুনি বৌদ্ধবিহার (১৮৬৯-৭০ খ্রিঃ) নির্মিত হয়। তিনি আরাকান থেকে আগত সংঘরাজ সারমেধ মাহস্থবিরের কাছে হীনযান পন্থী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর সময়ে প্রথম হীনযান পন্থী বৌদ্ধ ধর্ম এতদঞ্চলে প্রবেশ করে এবং অচিরে তা চাকমা, মারমা ও বড়ুয়াদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা প্রায় ৬৭৯৬ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে প্রথম বারের মত সাবেক চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ ডিস্ট্রিক্ট বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে কাপ্তাইয়ের সন্নিকটে চন্দ্রঘোনায় প্রথমে জেলা সদর স্থাপন করে। পরে অবশ্য ১৮৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে তারা জেলা সদর চন্দ্রঘোনা থেকে সরিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে নিয়ে আসে। এসময় ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা মিজোরামের লুসেইদের দমনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে। রাণী কালিন্দী ঐ সময়ের কিছু পরে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (১২৮৩ বাংলার সনের ৫ই আশ্বিন) পরলোক গমন করেন। তাঁর পরলোক গমনের পর রাজা ধরমবক্স খানের দৌহিত্র রাজা হরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর চাকমাদের রাজা হন। উল্লেখ্য যে, পিতার দিক থেকে তিনি রণু খাঁ দেওয়ানের প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের পুত্র ছিলেন। "ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট হরিশচন্দ্রকে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা উপাধি প্রদান করেন।" [১৫] "১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিন সার্কেলে বিভক্ত করার ঘোষণা করেন।" এই তিনটি সার্কেল হলো যথাক্রমে-চাকমা সার্কেল, বোমাঙ সার্কেল ও মঙ সার্কেল। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী রাজা হরিশচন্দ্র রাঙ্গামাটিতে স্বগৃহে পরলোক গমন করেন। রাজা হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যুবরাজ ভুবন মোহন রায় নাবালক থাকায় উক্ত কাউন্সিলকে আবার চাকমা সার্কেল পরিচালনার ভার প্রদান করা হয়।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটিতে 'রাঙ্গামাটি গভর্ণমেন্ট ইংলিশ হাইস্কুল' চালু হয়। রাজা ভুবন মোহন রায় চাকমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে তারিখ রাজপদে অভিষিক্ত হন।

তাঁর সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনের সুবিধার্থে সদাশয় সরকার কর্তৃক "১৯০০ সালের মে মাসের Chittagong Hill Tracts Regulation (Regulation No. 1 of 1900) নামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় একটা নতুন আইন চালু করা হয়। উক্ত আইন বলে ১৯৬৩ সালের বেঙ্গল আইন নং ৪ রহিত করা হয়। Chittagong Hill Tracts Regulation বলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার একটি জেলায় উন্নীত করা হয় এবং শাসনকর্তার পদবী পুনরায় সুপারিনটেনডেন্ট করা হয়।" উল্লেখ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে যে বিভিন্ন মৌজায় বিভক্ত করার প্রক্রিয়া চলছিল এ সময়ে এসে তা তিন শতাধিক মৌজায় (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ৩৭২ মৌজায় এবং বর্তমানে ৩৭৩ মৌজায়) বিভক্ত করে প্রত্যেক মৌজায় একজন করে হেডম্যান (Headman) নিযুক্ত করা হয়। রাজা ভুবন মোহন রায়ের সময় প্রথমবারের মত চাকমাদের মধ্য থেকে যামিনী রঞ্জন

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান, রাজেন্দ্র তালুকদার, কৃষ্ণকিশোর চাকমা, বলভদ্র তালুকদার, নলিনাক্ষ রায় প্রমুখ ব্যক্তি বি.এ. পাস করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সাবেক কাউন্সিলার ত্রিলোচন দেওয়ানের পুত্র কাহিনী মোহন দেওয়ান "পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি" নামে সর্বপ্রথম এতদঞ্চলে একটি সংগঠন গঠন করেন। কৃষ্ণকিশোর চাকমা সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুলস পদে থেকে এতদঞ্চলে বহু স্থানে নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে শিক্ষক পদে নিয়োগ দান করে এতদঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটান এবং তিনি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে চাকমাদেরকে সামজব্যবস্থা ভেঙ্গে আধুনিক সমাজ গঠন করার জন্য উৎসাহিত করেন।

রাজা ভুবন মোহন রায়ের উৎসাহে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রাঙ্গামাটি গভর্নমেন্ট ইংলিশ হাউস্কুলের শিক্ষক সতীশ চন্দ্র ঘোষ 'চাকমা জাতিঃ জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত' নামে একটি চাকমা ইতিহাস গ্রন্থ লিখেন। রাজা নিজেও ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'চাকমা রাজবংশের ইতিহাস' নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। রাজা ভুবন মোহন রায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। রাজা ভুবন মোহন রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রথম পুত্র যুবরাজ নলিনাক্ষ রায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখ চাকমা সার্কেলের চীফ হন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই জুন তারিখ তাঁকে 'রাজা উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ভারতবর্ষের বিখ্যাত বাগ্মী মিঃ কেশব চন্দ্র সেনের নাতনী বিনীতা রায়কে ববিহ করেন। তাঁর সময়ে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাণী বিনীতা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বকপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভেচ্ছা নিয়ে এতদঞ্চলে 'গৈরিকা' নামে প্রথমবারের মত একটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে তার শুভখযাত্রা শুরু করে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে ভারত ও পাকিস্তান জন্মলাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। এর কিছুকাল পরে রাজা নলিনাক্ষ রায় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর পরলোক গমন করেন।

রাজা নলিনাক্ষ রায়ের পরলোক গমনের পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখ রাজা ত্রিদি রায় চাকমাদের রাজা হন। তাঁর সময়ে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই নামক স্থানে বিরাট একটি বাঁধ দেওয়া হলে কর্ণফুলী নদীর আববাহিকায় তার পাঁচটি উপনদীর উপত্যকাগুলোর নিম্নাঞ্চলসহ প্রায় ২৫০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন চাষযোগ্য জমির ৪০% (৫৪,০০০ একর জমি) জলমগ্ন হয়। ঐ সময় রাঙামাটি মৌজায় (১১৬ নং) রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলে ইট দিয়ে নির্মিত সুরম্য চাকমা রাজবাড়িটি জলে ডুবে গেলে চাকমা রাজ পরিবার বর্তমানের (১০২ নং রাঙ্গাপানি মৌজায়) রাজবাড়ি এলাকায় নতুন রাজবাড়িটি নির্মাণ করে বসবাসের জন্য চলে আসে।[৬৭] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অনেক উপজাতীয় ছাত্র ও যুবক এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করে। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়; বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে জন্ম লাভ করে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৯৯ নং

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম ১নং আসন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পুনরায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে জুন তারিখ রাঙ্গামাটিতে একটি সম্মেলনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' নামক একটি সংগঠন গঠনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি একসময় এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। ঐ সময় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাজকুমার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর কাকা, কুমার সমিত রায়কে প্রদান করা হয়; অতঃপর চাকমা রাজা, ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় সাবালক হলে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমাদের রাজা হন এবং তদবধি চীফ হিসেবে চাকমা সার্কেল পরিচালনা করছেন ও চাকমা প্রধান হিসেবে সামাজিক দায়িত্বও পালন করেছিলেন। ঐ সময় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রাজকুমার দেবাশীষ রায় নাবালক থাকার কারণে তাঁর সাবালক হওয়া পর্যন্ত চাকমা সার্কেলের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর কাকা, কুমার সমিত রায়কে প্রদান করা হয়: । অতঃপর চাকমা রাজা, ব্যারিস্টার দেবাশীষ রয় সাবালক হলে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে চাকমাদের রাজা হন এবং তদবধি চীফ হিসেবে চাকমা সার্কেল পরিচালনা করছেন ও চাকমা প্রধান হিসেবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনেকে মনে করেন উত্তর মিয়ানমার (শান), প্রাচীন মগধ (বিহার) কালাবাঘা (শ্রীহট্ট), প্রাচীন মালাক্কা (মালয়), কোচীন চীনের শম্পা ও হিমালয় পাদদেশের প্রাচীন সাংগু নদীর (ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী অঞ্চলে চাকমারা একদা বসবাস করতেন। চাকমাদের আদিপুরুষ বিজয়গিরি সম্ভবত থাইল্যান্ড থেকে মিয়ানমার চম্পক নগরে এবং সেখান থেকে প্রাচীন ভারত ভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন। চাকমা লোক সাহিত্য 'চাটিগাং ছড়া' পালানুসারে চম্পকনগরের রাজা সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি (আনু ৯৯৪-৯৯৫ খ্রি.) আরকানীদের সাথে যুদ্ধ করে আরকানের রোসাঙ রাজ্য অধিকার করেন। এভাবেই নাকি আরকান ও উত্তর মিয়ানমারে চাকমা রাজ্য গড়ে ওঠে।

ইতিহাসবিদগণ মনে করেন সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে রাজা শুকদেবের আমলে চাকমারা কক্সবাজার জেলা থেকে উত্তর দিকে সরে আসেন এবং আলী কদম থেকে রাঙ্গুনিয়ার শিলক নদীর তীরে শুক বিলাস নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করে। ইংরেজ সরকরের রাজস্ব বিভাগের নথিপত্র থেকে এ তথ্য জানা যায়। চাকমা রাজা সেরমস্ত খাঁন মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফতে খাঁ ১৩৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজা নিযুক্ত হন। চট্টগ্রাম জেলার ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী হেনরী ডেরলিস্ট বলেন, ফতে খাঁর রাজ্য সীমা উত্তরে ফেনী নদী, দক্ষিণে শঙ্খ নদী, পূর্বে কুকী রাজ্য ও পশ্চিম নিজামপুর পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [৬৮] ১৬৬৬ সালে মোগল সম্রাটদের কর্তৃত্ব পার্বত্য এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৬০ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। মোগল সম্রাটদের কর্তৃত্ব পার্বত্য এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৬০ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। মোগল সম্রাটরা পাহাড়ী রাজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা ছাড়া তাদের শাসন কার্যে তেমন হস্তক্ষেপ করেনি। মোগল বাদশাহদের প্রতি সম্ভবত আনুগত্য ও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ চাকমা রাজারা অনেকেই মুসলিম নাম ও পদবী ব্যবহার করতেন, যেমন চমন খান,

Dhaka University Institutional Repository

জালাল খান, শের দৌলত পাগলা, জবর খান, ধরম বকস খান প্রমুখ। এরা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ। চাকমা রাজাদের 'রায়' উপাধিও মোগলদের দেয়া। চাকমা রাজা সেরমুস্ত খানের মৃত্যুর পর তাঁর পালিত পুত্র শুকদেব ১৭৫৮ সালে রাজা হন। তার আমলে ১৭৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ইংরেজদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকমা রাজা জান বকস খাঁ শুকবিলাস থেকে রাজধানী রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে নিয়ে আসেন এবং ১৮৫২ সাল পর্যন্ত সেখানে তাদের রাজধানী ছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চাকমা রাজা হরিশচন্দ্র তার রাজধানী রাজানগর থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করলে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৭৬ সালের মধ্যভাগে চাকমা ও অন্যান্য পাহাড়ীরা প্রথমবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিল রাজা শের দৌলত ও তাঁর সেনাপতি রামু খাঁ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার সময় চাকমা রাজারা ব্রিটিশদের সহযোগিতা করায় ব্রিটিশ সরকার রাজা হরিশচন্দ্রকে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রায় বাহাদুর এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ভুবন মোহন রায়কে চীফ উপাধি দান করেন।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামকে জেলা করা হয়। সে সময় প্রচলি প্রথার সাথে মিলিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তারা ৩টি সার্কেলে ভাগ করে- ক) চাকমা সাকেল-১৬৫৮ বর্গমাইল খ) বোমাং সার্কেল ১৪৪৪ বর্গমাইল ও গ) মং সার্কেল-৬৫ বর্গমাইল। প্রতিটি সার্কেলে একজন রাজা নিযুক্ত হন। পার্বত্য এলাকাকে ৩৬৫টি মৌজায় বিভক্ত করে প্রতি মৌজার জন্য একজন হেডম্যান ও প্রতিটি গ্রামের প্রধান হিসেবে করবারী নিযুক্ত হয়। ১৮৯৮ সালে রাঙ্গামাটিতে জেলা সদর স্থাপিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানিদের পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু মংরাজা মংপ্রু চাই চৌধুরী ও চারুবিকাশ সহ বিশিষ্ট পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রণবিক্রম ত্রিপুরা, অশোক মিত্র কারবারী সহ শত শহ পাহাড়ী মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭২ সালে চারুবিকাশ চাকমা ও মানবেন্দ্র লারমা পাহাড়ী জনগণের স্বাধীকার, ১৯০০ সালের অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা সংবিধানে প্রতিস্থাপন, রাজাদের দপ্তর ও বহিরাগত রোধ বিধি প্রবর্তনের জন্য একাধিকবার, সরকারের নিকট দাবি জানান। এ ব্যাপারে সরকারের নিকট থেকে তারা কোনো অনুকূল সাড়া না পেয়ে হতাশ হন।

এই সীমিত বাসযোগ্য অঞ্চলে ব্যাপক বাঙালি জনগোষ্ঠী আগমনের ফলে উপজাতীয়দের গোটা আর্থসামাজিক জীবন পর্যুদস্ত করে তোলে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি জনসংখ্যা ছিল ৯৭.৫০% এবং বাঙালি জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২.৫০%। এই ক্ষুদ্রতম বাঙালি জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেলেও ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তা খুবই নগণ্য ছিল। ১৯৫১ সালে এই জনসংখ্যা ছিল ৯% এবং ১৯৬১ সালে ছিল মাত্র ১২%। কিন্তু ১৯৮১ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাড়ায়

Dhaka University Institutional Repository

৪০% । অবশেষে দীর্ঘ একুশ বাইশ বছর সংগ্রামের পর বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হয়। ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৮ সনের ১৫ই জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ১৯৯৯ সনের মে মাসে প্রখ্যাত গেরিলা নেতা সন্তু লারমা নবগঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

চাকমা (Chakma) উপজাতিরা তাদের পরিচয় দেওয়ার সময় নিজেদেরকে চাকা (chakma) বলে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। স্যার রিজলী এর মতে, চাকমাদের দেহে ৮৪.৫% ভাগ মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান শাখার দলভূক্ত। বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী চাকমাদের জনসংখ্যা ২,৩৯,৪১৭ জন ছিল। ১১৯৭ সালের হিসেবে জনসংখ্যা জনসংখ্যা ৩,০৬৬১৬ জন। বর্তমানে চাকমা জনসংখ্যা প্রায় চার লক্ষের মত। চাকমারা পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বাইরেও ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিলস, অরুণাচল এবং মায়ানমারের আরাকানের দৈংনাক নামে চাকমাদের শাখা রয়েছে।

"চাকমাদের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, কপিলাবস্তুর শাক্য বংশজাত গৌতম বুদ্ধের বংশধর চাকমারা। চাকমা কিংবদন্তী মতে শাক্য জনপদ কলাপ বা কলাহ নগরে চাকমাদের আদিবাসভূমি ছিল। কলাপনগর হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি নগর। চাকমাদের তাল পাতার পুঁথিতে 'কলাপ' নগরের উল্লেখ আছে। কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী জনপদ কলাপ নগরে শাক জাতি বাস করত। গৌতম বুদ্ধ শাক্য বংশীক। এ কারণে চাকমারা মনে করেন তারা শাক্য বংশোদ্ভূত"। আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-২১৪) বলা বাহুল এ দাবির কোন ঐতিহাসিক সমর্থন নেই। ড. সুকোমল চৌধুরী বলেছেন, 'চাকমা জাতির মূল উৎস বৈশাখীর বৃজি ও কপিলাবাস্তুর শাক্য জাতি'। চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগে চাকমা সম্প্রদায় আরকান থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আগমন করেন বলে জানা যায় কথিত আছে, চাকমা রাজা মঈন থানি মধ্য মিয়ানমার নিজস্ব রাজ্য থেকে আরকান রাজ কর্তৃক ১৪১৮ সালে বিতাড়িত হয়ে কক্সবাজার জেলার রামু ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাংলার মুসলিম শাসক জালালউদ্দিন তাদেরকে মাতামুহুরী নদীর উপকূলে আলী কদম নামক স্থানে বসতি স্থাপনে র অনুমতি প্রদান করেন। আলী কদম ব্যতীত রামু ও টেকনাফ এলাকায় তাদের আরও কয়েকটি গ্রাম দান করা হয়

[৮] স্যার ফেইরী বলেন, ১৫৪৬ সালে একজন চাকমা রাজা (মাক ম্যাঙ), উত্তর দিকে থেকে গিয়ে তৎকালে আরাকানের অধীনস্ত কক্সবাজার জেলার রামু (প্যাওয়া) অধিকার করেন। (History of Durama A, phare, 1883, London , P. 79)

Dhaka University Institutional Repository

রামু থানার বর্তমান চাকমাবিহীন চাকমার কুল, চাকমার বিল রাজায় কুল চাকমা পাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহ চাকমা সম্প্রদায়ের নামের সাথে জড়িত আছে। পরবর্তীতে যোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ও মধ্যভাগে চাকমাদের মূল জনগোষ্ঠি পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফূলী নদীর উত্তরাংশে বসবাস করছিল। অপরদল ১৫৬৯ সালে কর্ণফূলী নদীর নিম্ন দক্ষিণ তীরে চলে আসে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে রাজা শুকরেদ রায়ের আমলে চাকমারা কক্সবাজার জেলা থেকে উত্তর দিকে সরে আসেন এবং আলী কদম থেকে রাঙ্গুনিয়ার শিকল নদীর তীরে শুক বিরাস নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিসত্তার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান। সাহিত্য ও সংস্কৃতি কোন জাতির দর্পণ। একটি জাতির ভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক ইতিহাস সেই জাতির অমূল্য সম্পদ। আধুনিক কালে মুদ্রণ যন্ত্রের উন্নয়নের ফলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চা ও সংরক্ষণ পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.৭ আদিবাসী উপজাতিদের পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যচর্চা

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্য কয়েকটি ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন বইপত্র ও সাময়িকী প্রকাশ করেছে। সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা সন ও সম্পাদকের নাম প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক	সাল	প্রতিষ্ঠান/সংগঠন	লেখক/সম্পাদক	পত্র-পত্রিকা
১	১৯৭৮	বনফুল প্রকাশনা কমিটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সুহৃদ চাকমা	বনফুল
২	১৯৭৮	মুভূলা লিটারেচার গ্রুপ	সুসময় ও সজীব চাকমা	ক'র্জলি
	১৯৭৯	,,	সুসময় চাকমা	বিজু
	১৯৮০	,,	সুসময় চাকমা	বিজু
	১৯৮০	,,	সুগত চাকমা ও সুসময় চাকমা	রাধামন ধনপুদি ১ম খন্ড
	১৯৮০	,,	সুসময় চাকমা	রেঙ
	১৯৮১	,,	সুসময় চাকমা	বিজু
৩	১৯৮১	হিল্লোল সাহিত্য সংসদ	মৃত্তিকা ও মঙ্গলকুমার চাকমা	বিজু ফুল
	১৯৮২	,,	স্মৃতেন্দু বিকাশ চাকমা	বিজু ফুল

	১৯৮৩	,,	মানস মুকুর চাকমা	,,
৪	১৯৮১	রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল	চিরজ্যেতি চাকমা	রাধামন ধনপুদি (২য়) ফুল পারা
	১৯৮২	,,	শ্যামল কুমার চাকমা	মত্রং
	১৯৮২	,,	দীপেন দেওয়ান ও কৃষ্ণ চাকমা	ইরুক
	১৯৮৩	,,	লালন চাকমা ও বীরকুমার চাকমা	পাওলী
	১৯৮৪	,,	লালন চাকমা	হিয়াংনিক
	১৯৮৪	জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল	চন্দন চাকমা ও হরি কিশোর চাকমা	সাঙেত
	১৯৮৫	,,	যশেশ্বর চাকমা	রদঙ
	১৯৮৬	,,	নির্মলেন্দু চাকমা সুখেশ্বর চাকমা	ইধরেগা
	১৯৮৬	,,	বিস্মিত চাকমা	এক ঝাঁক বিজোল রোদ
	১৯৮৭	,,	মৃত্তিকা চাকমা ও নির্মল চাকমা	কবরক জুম আঙিযার আইলুম
	১৯৮৭	,,	জ্ঞানদীপ্ত চাকমা	কজ'ফুল
৫	১৯৮১	ইরুক প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি	সুহৃদ, রাস্কীন ও মৃত্তিকা চাকমা	ইরুক (১৯৮১), ইরুক(১৯৮১)
৬	১৯৮২	হিল্লো লিটারেচার গ্রুপ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	চিরজ্যোতি চাকমা, মানস, শ্যামল, শুভ্রা, মঙ্গল,	সত্রং
৭	১৯৮২	চাকমা ভাষা প্রকাশনা পরিষদ	চিরজ্যোতি ও মঙ্গল চাকমা	চাঙমার আগপুদি
৮	১৯৮৩	জুম, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	অভয় চাকমা, সুহৃদ, হরেন্দ্র সুসময় ও অনুপক চাকমা	জুম প্রকাশনা, এক
৯	১৯৮৩	আরুক, রাঙ্গামাটি	প্রতিম, সমিত, রতন, সমরেশ, নিপুল, কিজুসং, কেতনধন, রূপক, নির্মল, কুশলাা	কজমাপাদা

১০	১৯৮৩	বরগাঙ্ পাবলিকেশন্স, রাঙ্গামাটি	সুগত চাকমা	চাকমা পরিচিতি
১১	১৯৮৪	চম্পক পাবলিকেশন্স, রাঙ্গামাটি	বীরকুমার চাকমা, সঞ্জয় চাকমা, প্রতিম চাকমা	চম্পক
১২	১৯৮৪	শংগোলা লিটারেচার গ্রুপ, খাগড়াছড়ি	প্রদীপ্তখীসা	নির্বিলির ফুগুদিকানা
১৩	১৯৮৫	উপজাতীয় সাহিত্য সংসদ, খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ	হেমন্ত বিকাশ চাকমা প্রদীপ্ত খীসা	কিজিং
১৪		পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখা		শৈল প্রপাত
১৫	১৪০৮	চট্টগ্রাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চট্টগ্রাম		উত্তর মেঘ

সার্বজনীনভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অন্যান্য সংগঠন গুলো গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে।

ক্রমিক	সাল	প্রতিষ্ঠান/প্রকাশক	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক/পত্র-পত্রিকা
১		পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ	সুসময় চাকমা	মৈত্রীবাণী
		,,	বিমলতিষ্য ভিক্ষু	মৈত্রীবাণী
		,,	ড. নীরুকুমার চাকমা	মৈত্রীবাণী
২	১৯৮৩	ঢাকা ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন	দীপেন দেওয়ান	ফদাংতাং
	১৯৮৪	,,	দীপেন দেওয়ান ও অনুপম চাকমা	লাড়েই
	১৯৮৫	,,	অনুপম চাকমা	Ray
	১৯৮৬	,,	অনুপম চাকমা	ফদাংতাং
৩	১৯৮৪	রাঙ্গামাটি ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন	প্রতিম রায়	কোচপানা
	১৯৮৫	,,	মিশন চাকমা ও প্রতিম রায়	পাজন
	১৯৮৬	,,	অরুণ জ্যোতি চাকমা	The voice of ratsu
৪	১৯৮৪	বৌদ্ধ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ	সঞ্জয় চাকমা ও অরুন চাকমা	বিশ্ব জ্যোতি
৫		সেন্টার ফর পাবলিকেশন অফবুদ্ধিজম	রেভা. ধম্মালঙ্কর	স্বস্তিকা(৩ সংখ্যা)
৬	১৯৮৬	হিল স্টুডেন্টস অব রাজশাহী ভার্সিটি	মধুমঙ্গল, শুভাশীষ অগ্রুন	হুচ (পদক্ষেপ)

			চাকমা ও গৌতম দেওয়ান	
৭	১৯৮১	রাঙ্গামাটি	নিবারণ চন্দ্র দেওয়ান	তারফা
৮	১৯৭৭	ময়মনসিংহ প্রবাসী পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ছাত্র-ছাত্রী	সুমেধ কুমার দেওয়ান	রানর্জুনি
৯	১৯৮৩	রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের উপজাতি ছাত্ররা	যশেশ্বর চাকমা	পাজন
১০	১৯৮৪	রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজের উপজাতি ছাত্ররা	নবিনাশ চাকমা	পাজন
১১	১৯৮৩	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রী	শুভাশীষ চাকমা	রানর্জুনি
১২	১৯৮৪	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রী	শুভাশীষ চাকমা	রানর্জুনি
১৩	১৯৭৫	খারিক্ষ্যং বনানী পাঠাগার, বন্দুক ভাঙ্গা	তরুনকুমার চাকমা	বাজীর
১৪	১৯৮২	এক্কান চাঙমা সাহিত্যপাদা	শ্রীকৃষ্ণ চাকমা	আরুক
১৫	১৯৮৩	এক্কান চাঙমা সাহিত্যপাদা	শ্রীকৃষ্ণ চাকমা	আরুক
১৬	১৯৮৪	এক্কান চাঙমা সাহিত্যপাদা	শ্রীকৃষ্ণ চাকমা	আরুক
১৭	১৯৮৪	দীঘিনালা থেকে চঙ্কু চাকমা	সত্যকুমার চাকমা ফদাঙ টাঙ চাঙমা	আগমুলিম
১৮	১৯৮০ চলমান	উপজাতীয় সংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট		গিরিনির্ঝর
১৯		রাঙ্গামাটি থেকে		বনভূমি
২০	১৯৯০ চলমান	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম সমন্বয়বাদী লিটল ম্যাগাজিন পাহাড়ী ও সমতলি সংস্কৃতি চর্চার ছোট কাগজ	চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া ও হাফিজ রশিদ	সমুজ্জ্বল সুবাতাস (১৪ সংখ্যা)

নাটক

১	১৯৭৮	জুভাপ্রদ	ননাধন চাকমা	ধেঙাবৈদ্য (শয়তান ও মা)
২	১৯৭৯	জুভাপ্রদ	ননাধন চাকমা নীল মোন'সবন	
৩	১৯৮২	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট	জভগদত্ত ঘীসা	হয় নয় বৈদ্য
৪	১৯৮৩	রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল	চিরজ্যোতি চাকমা	আনাত ভাঝি উধে কা মু

Dhaka University Institutional Repository

৫	১৯৮৪	জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল	শান্তিময় চাকমা	যে দিনত যে কাল
৬	১৯৮৫	জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল	শান্তিময় চাকমা	বিজু রামর স্বর্গত যানা
৭	১৯৮৬	জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল	শান্তিময় চাকমা	আন্ধারত জুনি পহর
৮	১৯৮৭	রূপ ও রঙ নাট্য গোষ্ঠি	মোঃ আরফান আলী	পরান দান

এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন, স্কুল-কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন, লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত এবং অনিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। চাকমা সাহিত্যের ইতিহাস বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গুলোর নিয়মিত প্রকাশনা অন্যান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট গঠিত হয়েছে। এই সংগঠন থেকে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি বৎসর সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। (পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা) দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৬৮, প্রবন্ধঃ চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, নন্দলাল শর্মা, গিরিনির্ঝর, জুন ১৯৯৮)

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত চাকমাসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যমূলক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুস্তকের নাম, লেখকের নাম, রচনা কাল ও স্থানের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

১	চাকমা জাতি	সতীশ চন্দ্র ঘোষ	১৯০৯	কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
২	চাকমা পরিচিতি	সুগত চাকমা	১৯৮৩	রাঙ্গামাটি, বরগাঙ পাবলিকেশন
৩	চাকমা রাজবংশের ইতিহাস	রাজা ভুবন মোহন রায়	১৯১৯	চট্টগ্রাম
৪	চাকমাজাতির ইতিবৃত্ত	বিরাজ মোহন দেওয়ান	১৯৬৯	রাঙ্গামাটি সরোজ আর্ট প্রেস
৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী	কামিনী মোহন দেওয়ান	১৯৭০	রাঙ্গামাটি সরোজ আর্ট প্রেস
৬	বাংলাদেশের উপজাতি	সুগত চাকমা	১৯৮৫	বাংলা একাডেমী ঢাকা
৭	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা	সুগত চাকমা	১৯৮৮	রাঙ্গামাটি (উ.সা.ই)
৮	চাকমা পূজা-পার্বণ	বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান	১৯৮৯	রাঙ্গামাটি (উ.সা.ই)
৯	চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ১ম,	আশোক কুমার	১৯৯১/১	চট্টগ্রাম, তিলোত্তমা

Dhaka University Institutional Repository

	২য়,	দেওয়ান	৯৯৩	মুদ্রণালয়, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স, ঢাকা
১০	পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি	সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	১৯৯৪	রাঙ্গামাটি (উ.সা.ই)
১১	তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি	যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	১৯৯৫	চট্টগ্রাম, শান্তি প্রেস
১২	চাকমা দপর্ণ	যামিনী রঞ্জন চাকমা	১৯৯৩	রাঙ্গামাটি সরোজ আর্ট প্রেস
১৩	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার পরিষদ ৯১	জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা	১৯৯৩	রাঙ্গামাটি
১৪	তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি	বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা	১৯৯৫	চট্টগ্রাম, নিও কনসেপ্ট লিমিটেড
১৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি	সুগত চাকমা	১৯৯৩	সুদীপ্ত প্রিন্টার্স, ঢাকা
১৬	পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতী	মুস্তাফা মজিদ	১৯৯২	বাংলা একাডেমী ঢাকা
১৭	পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি	বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা)	২০০৩	দিব্য প্রকাশ, ঢাকা
১৮	মারমা জাতিসত্তা	মুস্তাফা মজিদ (সম্পা)	২০০৪	মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
১৯	আদিবাসী রাখাইন	মুস্তাফা মজিদ (সম্পা)	২০০৩	দেশ প্রকাশ, ঢাকা
২০	রাখাইন লোক কাহিনী	উ ক্য থিন	১৯৮১	দি এলিট প্রেস, কক্সবাজার
২১	চাকমা প্রবাদ	ড. দুলাল চৌধুরী	১৯৮৭	ঢাকা,
২২	আরণ্য জনপদে	আবদুস সাত্তার	১৯৬৬	ঢাকা, জলি বুকস
২৩	নিভৃতে নিবাসী	মোঃ মোশারফ হোসেন ও মোঃ মাহবুবুল হক	২০০৩	মৌ প্রকাশনী, ঢাকা
২৪	আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য	আবদুস সাত্তার	১৯৭৮	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২৫	গবেষণা কর্মঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম	আতিকুর রহমান	২০০০	ঢাকা
২৬	বিচিত্র উপজাতির জীবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা	লাল সাহেব	১৯৯৪	ইউসুফ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা
২৭	বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক (১৭৮৫-১৮২৪)	রতন লাল চক্রবর্তী	১৯৮৪	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২৮	প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম,	সিদ্ধার্থ চাকমা		নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা
২৯	রাখাইন ইতিবৃত্ত	মং ছিন চীং (মং ছিন)	১৯৯৪	দি রাখাইন ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি,

Dhaka University Institutional Repository

				কক্সবাজার
৩০	পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিতি	সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	১৯৭৮	রাঙ্গামাটি
৩১	বাংলাদেশের উপজাতি	মুস্তাফা মজিদ	২০০২	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩২	পটুয়াখালী রাখাইন উপজাতি	মুস্তাফা মজিদ	১৯৯২	বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩৩	বাংলাদেশের উপজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি (স্মরণিকা)	জাফর আহমেদ হানাফী	১৯৯৩	জাতীয় যাদুঘর, ঢাকা
৩৪	দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন	ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা)	১৯৯৪	আইসিবিএস, ঢাকা
৩৫	আরাকানে হিন্দু, বড়ুয়া অধিবাসী	আবদুল হক চৌধুরী	১৯৮৬	বাংলাএকাডেমী, ঢাকা
৩৬	বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার	সুগত চাকমা	২০০২	নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

চাকমা সাহিত্যিকগণ বাংলা বর্ণে চাকমা সাহিত্য রচনা করলেও চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তাদের বর্ণমালাকে 'অঝাপাত' বলা হয়। বর্তমান চাকমা ভাষার শব্দ সম্ভারে আর্য শব্দ, অনার্য শব্দ ও বিদেশী শব্দ এ তিনটির প্রভাব বিদ্যমান। কেউ কেউ চাকমা হরফ ব্রাহ্মীলিপি থেকে এসেছে বলে মনে করেন। চাকমা হরফে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সংগৃহীত আছে। চাকমাদের ধর্মপুস্তকের নাম আগরতারা (অগ্রত্রাণ)। ইহা চাকমা অক্ষরে লিখিত। বর্মী অক্ষরের সঙ্গে চাকমা অক্ষরের অনেক সাদৃশ্য আছে। এনায়েত বাজার বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ধর্মবংশ মহাস্থবির ত্রিলোচন দেওয়ান বাহাদুরের বদন্যতায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।[৬৯] চাকমাদের ভাষা সাহিত্যকীর্তি বহু প্রাচীন। রূপকথা, লোককাহিনী, বারমাসী ছড়া, ধাঁধা, হেঁয়ালি, পালাগান, কবিতা, গান, উপন্যাস প্রভৃতিতে চাকমা সাহিত্য সুপ্রসিদ্ধ। সুহৃদ চাকমা- চাকমা সাহিত্যের কালকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন ঃ

ক) প্রাচীন যুগ (১৩০০ খ্রী.- ১৬০০ খ্রী.)

খ) মধ্য যুগ (১৬০০-১৯০০)

গ) আধুনিক যুগ (১৯০০- সাম্প্রতিক কাল)

প্রাচীন যুগের সাহিত্য হিসেবে রাধামন ধনুপদি পালা, চাদিগাঙ ছারা পালা, লক্ষ্মী পারা পালার নাম উল্লেখযোগ্য।মধ্যযুগের সাহিত্য হিসেবে চান্দবীর, কালেশ্বরী, মেয়াবীর বারমাস, সাদেং গিরি উপাখ্যান, গোজেন লামার নাম। ড. বেনীমাধব বড়ুয়ার মতে, গোজেন লামা রচিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। কেউ কেউ ১৭৭২ অথবা ১৭৭৭ সাল বলেও উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগের সূচনা কবি চুনীলাল দেওয়ানের চাকমা কবিতা দিয়ে ১৯৪৬ সালে। এর পর মুকুন্দ লাল তালুকদারের 'পুরান কথা', সলিল রায়ের চাকমা কবিতা। চাকমাদের সামাজিক পার্বণগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে গঙাত ভাতজরা দেন/নুয়াভাত বামনী,/অহইয়া/ সিন্দি থানমানা উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে চাকমাদের অবস্থা ব্যাপক অর্থে এখন আর আগের মতো নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও ব্যাক্তি সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুতায়ন, পর্যটন, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক স্কুল-কলেজ, উন্নয়ন প্রকল্প, আধুনিক চাষাবাদ, সংস্কৃতির বিকাশ, চাকুরী শিক্ষা-দীক্ষা, বনায়ন এবং জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

৪.৮ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিসত্তার ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে অবদান

সাহিত্য ও সংস্কৃতিয়ে কোন জাতি দর্পণ। একটি জাতির ভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক ইতিহাস সেই জাতির অমূল্য সম্পদ। আধুনিক কালে মুদ্রন যন্ত্রের উন্নয়নের ফলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চা ও সংরক্ষণ পূর্বের তুলনায় বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিসত্তার ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচন প্রবিষ্ট করা হলো।

চাকমা জাতির নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। তবে এর ইতিহাস বেশী প্রাচীন নয় আজ থেকে দু'শ বছর আগে চাকাম লিপিতে (script) চাকমা ভাষায় সাহিত্য রচিত হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৭০] পূর্বে চাকমা ভাষার রচনা রীতি তেমন ছিল না। চাকমারা বাংলা ও ইরেজীতে লেখাপড়া করেন। বিগত দু'দশক ধরে চাকমা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে চাকমারা প্রাচীন লোকসাহিত্য, গাথা, উপাখ্যান, পালা, কল্পকাহিনী, গল্প, ধাঁধাঁ, প্রবাদ, সামাজিক রীতিনীতি ও কিংবদন্তি বিষয়ের উপর চাকমা ভাষায় সাহিত্য ও পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তবে চাকমা লিপিতে বই ও পত্রিকা মুদ্রণে নানা বেগ পেতে হয়।

ইতিহাসে জানা যায় যে, ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে হরকিশোর চাকমার 'চাকমা লেখা' বই চাকমা লিপিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় নোয়ারাম চাকমার 'চাকমার পথম শিক্ষা' পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাথমিক শ্রেনীর পাঠ্য হিসাবে বইটি ইষ্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছিল। ১৯৭১ সালে নন্দধন চাকমার 'চাকমা ভাষা শিখিবার বই' ১৯৭৩ সালে চিজির বই 'চাকমা বর্ণমালা সর্ম্পকিত বই সাইক্লোষ্টাইল করে প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে ভিক্ষু শ্রদ্ধালঙ্কার 'চাকমা বর্ণমালা' ১৯৮০ সালে চিজির বই প্রকাশ করেন। ১৯৮২ সালে চিরজ্যাতি চাকমা ও মঙ্গল চাকমা সম্পাদিত চাঙমার আগপুঁথি বা Chakma Primer চাঙমা ভাষা প্রকাশনা পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সুখের বিষয় এই যে, ১৯৮৩ সাল থেকে উপজাতীয় সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি থেকে ভাষা শিক্ষা কোর্স, সাংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বাংলা লিপিতে চাকমা ভাষা শেখার জন এ প্রতিষ্ঠান ১৯৮৪ সালে 'চাকমা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ' প্রকাশ করেছে। বর্তমানে বাংলা লিপিতে চাকমা ভাষার সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। বাংলা লিপিতে চাকমা কবিতার প্রথম প্রকাশ সতীশ চন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' (১৯০৯ কলকাতা) গ্রন্থে। ১৯১৯ সালে রাজাভুবন মোহন রায় 'চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস' গ্রন্থ লিখেন। [৭১] ত্রিশের দশকে ফিরিং চান্দ প্রবোধ চন্দ্র চাকমার 'আল ঝি মিনার কবিতা' কবিতা নামক একটি লোকগাথা হ্যান্ড প্রেসের মাধ্যমে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ সময় পন্ডিত ধর্মধন চাকমার 'চান্দবির বারমাস' ও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের দিকে একজন ইংরেজ বাংলা লিপিতে চাকমা ভাষার চাকমা প্রাইমার নামে একটি শিশুপাঠ বই প্রকাশ করেন।

১৯৩৬ সালে রানী বিনীতা রায়ের (রাজমাতা) পৃষ্ঠ পোষকতায় অরুন রায় সম্পাদিত পত্রিকা 'গৈরিকা' প্রকাশিত হয়। এটি ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রকাশ পায়। এতে ১৯৪৬ সালে চুনীলাল দেওয়ানের 'চাকমা' কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে এ পত্রিকায় মুকুন্দ তালুকদারের চাকমা কবিতা পুরনে কথা বের হয়। গৈরিকায় সলিল রায়ের ও একটি চাকমা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

ষাটের দশকে সলিল রায়ের লেখা চাকমা গান সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরার কণ্ঠে চট্টগ্রাম বেতারে প্রচারিত হয়। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'ঝরণা' পত্রিকায় কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার রাধামোহন ধনবতী কাহিনী অবলম্বনে 'চাকমা গেঙ্গুলী গীত প্রকাশিত হয়। বিরাজ মোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (১৯৬৯) গ্রন্থে গোজেনের লামা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে নানধন চাকমার বারটি চাকমা কবিতার সঙ্কলন 'রাঙামাত্যা' প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সাল থেকে চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক উন্নয়নে রাঙ্গামাটিতে কয়েকটি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠন গুলো হলো ঃ

ক) জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ)

খ) মুড়াল্যা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি

গ) গিরিসুর শিল্পী গোষ্ঠি

ঘ) জাগরনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি

ঙ) ফ্রেন্ডস লিটারেচার গ্রুপ

চ) উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠি

ছ) পাবর্ত্য চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সংসদ

জ) রাধামন সাহিত্য গোষ্ঠি।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ণ অগ্রযাত্রায় জুভাপ্রদে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ২৩ টি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। জুভাপ্রদ চাকমা কবিতা ও গানের বই ছাড়াও বিজু সংকলন, চাকমা বাংলা অভিধান চাকমা ভাষার ইতিবৃত্ত চাকমা ভাষাতত্ত্ব ও চাকমা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত বই প্রকাশ করে।

ক্রমিক নং	সাল	প্রতিষ্ঠান/প্রকাশক	সম্পাদক/লেখক	পুস্তক/পত্র-পত্রিকা
১	১৯৭২	জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর	সৌমেন্দ্র নারায়ণ দেওয়ান	বিজু (প্রথম প্রকাশনা)
২	১৯৭২	জুভাপ্রদ মহিলা সংসদ	নন্দিতা চাকমা ও শিবানী দেওয়ান	জুনি
৩	১৯৭২	জুভাপ্রদ তরুণ সংসদ	রমনী রঞ্জন চাকমা, আ যোই অং মগ ও প্রীতি কান্তি ত্রিপুরা	সাঙু
৪	১৯৭৩	জুভাপ্রদ	রঞ্জিত দেওয়ান ও ঝর্ণা চাকমা	চাকমা গান
৫	১৯৭৩	জুভাপ্রদ	ননাধন চাকমা	চিজির বই
৬	১৯৭৩	জুভাপ্রদ	অনুল্লেখিত	বারগী
৭	১৯৭৩	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	চাঙমা বাংলা কথাতারা
৮	১৯৭৪	জুভাপ্রদ	নানাধন, দেবী প্রসাদ, উদয় শংকর, সুকুমার ও কনিক চাকমা	রাঙুনী
৯	১৯৭৪	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	চাকমা ভাষার ইতিবৃত্ত
১০	১৯৭৪	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব
১১	১৯৭৫	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	পালি, প্রাকৃত ময়্যাং এবং চাকমা
১২	১৯৭৬	জুভাপ্রদ	সুদত্ত খীসা	বিজুগুলা
১৩	১৯৭৬	জুভাপ্রদ	সুহৃদ চাকমা	হৃদক
১৪	১৯৭৬	জুভাপ্রদ	অভিতাভ চাকমা	থেঝেরা
১৫	১৯৭৭	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	হাওঝর চাঙমা গান
১৬	১৯৭৭	জুভাপ্রদ	সুহৃদ চাকমা ও বাবু ধঙ্যা চাকমা	গেংখুলী
১৭	১৯৭৭	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	চাঙমা গান
১৮	১৯৭৭	জুভাপ্রদ	অং চ হ্লা ও নানাধন চাকমা	কথোপকথন
১৯	১৯৭৭	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	চিজির গান

Dhaka University Institutional Repository

২০	১৯৭৭	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	রঙগীদ
২১	১৯৭৮	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা ও দেবী প্রসাদ দেওয়ান	চাঙমা গান
২২	১৯৭৮	জুভাপ্রদ	দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা	পদোরঙ কোচপানা
২৩	১৯৭৯	জুভাপ্রদ	সুগত চাকমা	রংধং (শেষ প্রকাশনা)
২৪	১৯৭২	মুড়াল্যা সংস্কৃতিক গোষ্ঠি	দীবঙ্গর শিরিগ্যান	লুরা
২৫	১৯৭২	মুড়াল্যা সংস্কৃতিক গোষ্ঠি	দীবঙ্গর শিরিগ্যান	ফুরামোন
২৬	১৯৭৪	গিরিসুর শিল্প গোষ্ঠি	বিনয়শংকর চাকমা	শিঙ্গা
২৭	১৯৭২	মুড়াল্যা ও জাগরনী সংস্কৃতিক গোষ্ঠি	সাহানা দেওয়ান	ওয়া
২৮	১৯৭৫	জুভাপ্রদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সংসদ	নানাধন চাকমা	গোজেন লামা
২৯	১৯৭৮	ফ্রেন্ডস লিটারেচার গ্রুপ	সুমেধ কুমার দেওয়ান ও বাসনা বিকাশ দেওয়ান	রঙ্‌রঙ্
৩০	১৯৭৯	উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠি	মানসমুকুর চাকমা	চাঙমা ছড়া
৩১	১৯৮০	উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠি	নন্দিতা খীসা ও সাবিত্রী চাকমা	রিপরিপ
৩২	১৯৮১	উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠি	রাজা দেবাশীষ রায় ও রূপায়ন দেবান	হুয়াং ছেরে চাকমা গীত

চন্দ্র ঘোষ ১৯০৯ সালে "চাকমা জাতি" নামে সতীশ গ্রন্থ লিখেন। এরপর রাজা ভুবনমোহন রায়, মাধচন্দ্র চাকমা কর্মী, নোয়ারাম চাকমা, বিরাজমোহন দেওয়ান, প্রাণহরি তালুকদার প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ চাকমা জাতির ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করেন। এ প্রবন্ধে বিস্তৃত চাকমা ইতিহাস আলোচনা সম্ভব নয়, প্রাসঙ্গিকও নয়, তাই বিভিন্ন ইতিবৃত্তকার প্রদত্ত তুলনামূলক একটি চাকমা রাজবংশপঞ্জী তুলে দিলাম। এক নজরে এটিই অষ্টাদশ শতকের চাকমা ইতিহাস।

১। সতীশচন্দ্র ঘোষ (চাকমা জাতি, ১৯০৯)
জল্লাদ খা বা ফতে খাঁ
সেরমুস্ত খাঁ
শুকদেব রায়
সেরদৌলত খাঁ
জান বক্স খাঁ

Dhaka University Institutional Repository

২। R.H.S Hutchinson (C.H.T. Gazetteer, 1909)

Raja Bijoygiri

Chaman Khany

Tabbar Khan

Jabbar Khan

Jallal Khan

Shermust Khan

Sher Daulat Khan

Jan Box Khan

৩। রাজা ভুবনমোহন রায় (চাকমা রাজবংশাবলী, ১৯১৯)

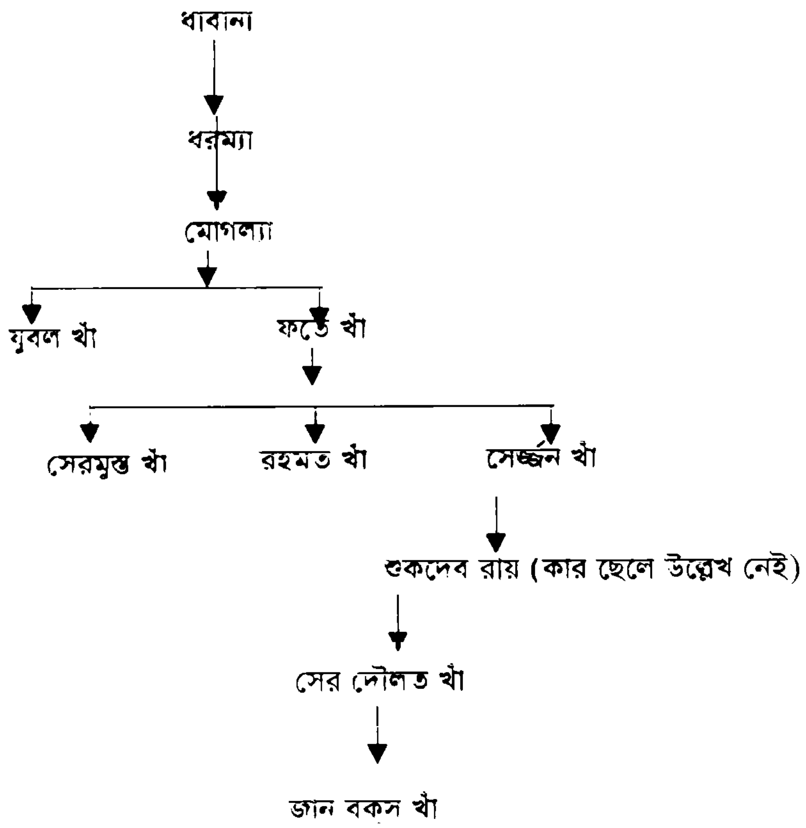

Dhaka University Institutional Repository

৪ । মাধবচন্দ্র চাকমা কর্মী (শ্রী শ্রী রাজনামা, ১৯৪০)

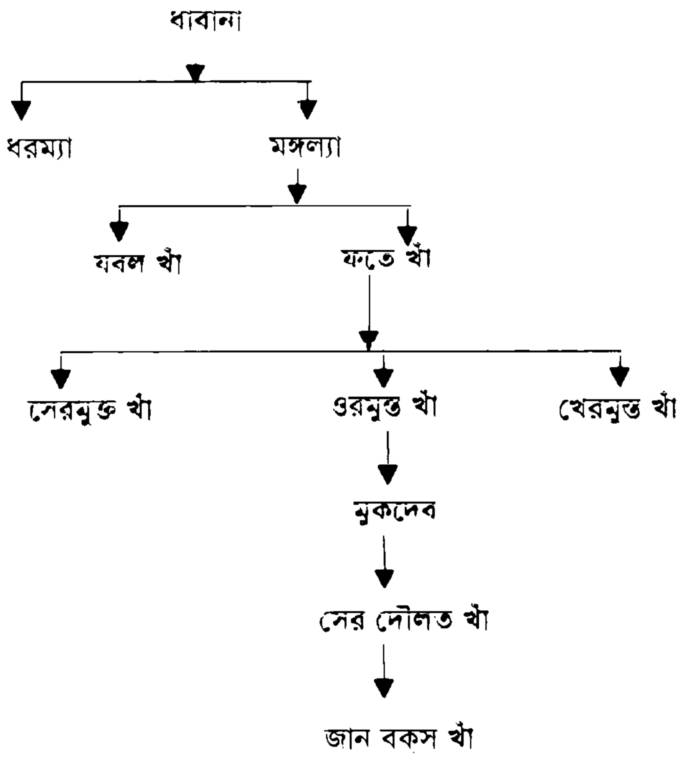

৫ । বিরাজমোহন দেওয়ান (চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, ১৯৬৯)

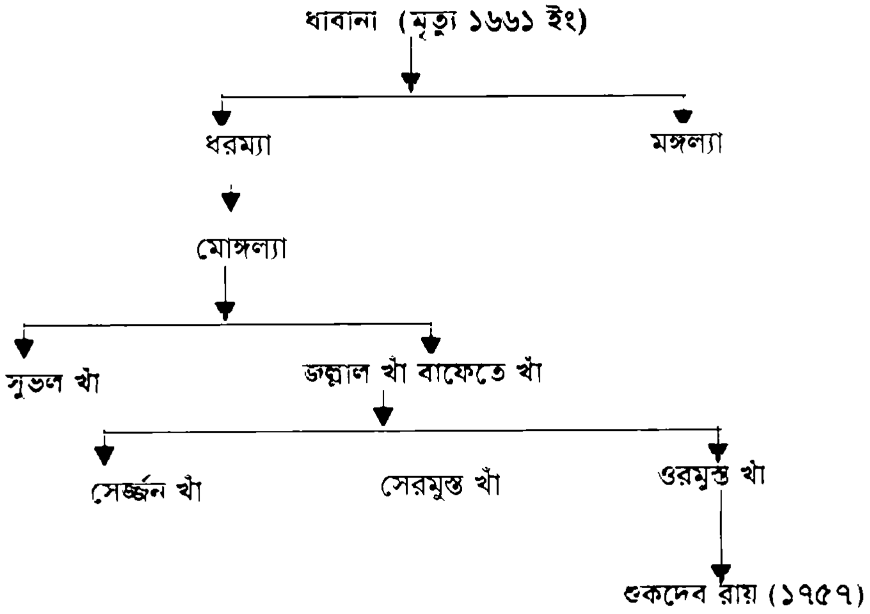

Dhaka University Institutional Repository

সের দৌলত খাঁ (১৭৭৬ ইং)- (কার পুত্র উল্লেখ নেই)

জান বক্স খাঁ (১৭৮২ ইং)

(তালিকাটি অশোককুমার দেওয়ান লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত চাকমা রাজাগণের নামের তালিকা

ক্রমিক	রাজার নাম	সময়	পূর্ববর্তী রাজার সাথে সম্পর্ক
০১.	রাজা সাথুয়া	...	...
০২.	রাজা চন্দন খান	(১৭১১ খ্রি.)	রাজা সাথুয়ার বড় ছেলে
০৩.	রাজা রত্তন খান	(১৭১২ খ্রি.)	রাজা সাথুয়ার ছোট ছেলে
০৪.	(রাণী) কাত্তুয়া	(১৭১৩ খ্রি.)	রাজা সাথুয়ার স্ত্রী (?)
০৫.	রাজা জালাল খান	(১৭১৫-২৪ খ্রি.)	রাজা সাথুয়ার দৌহিত্র (?)
০৬.	রাজা ফতে খান (?)	(১৭২৬ খ্রি.(?)	জালাল খানের ছোট ভাই (?)
০৭.	রাজা সেরমুস্ত খান	(১৭৩৮-৫৮ খ্রি.)	রাজা ফতে খানের ছেলে (?)
০৮.	রাজা শের জব্বর খান	(১৭৫৮-৬৫ খ্রি.)	রাজা সেরমুস্ত খানের ভাই
০৯.	রাজা শের দৌলত খান	(১৭৬৫-৮২ খ্রি.)	রাজা শেরজব্বর খানের ছেলে
১০.	রাজা জানবক্স খান	(১৭৮২-৮৭ খ্রি.)	রাজা শেরদৌলত খানের ছেলে
১১.	রাজা টব্বর খান	(১৭৯৮-১৮০১ খ্রি.)	রাজা জানবক্স খানের বড় ছেলে
১২.	রাজা জব্বর খান	(১৮০১-১২ খ্রি.)	রাজা জানবক্স খানের ছোট ছেলে
১৩.	রাজা ধরমবক্স খান	(১৮১২-৩২খ্রি.)	রাজা জব্বর খানের ছেলে
১৪.	রাণী কালিন্দী	(১৮৪৪-৭৩খ্রি.)	রাজা ধরমবক্স খানের প্রথমা স্ত্রী
১৫.	রাজা হরিশচন্দ্র রায়	(১৮৭৩-৮৫খ্রি.)	রাজা ধরমবক্স খানের দৌহিত্র
১৬.	রাজা ভুবনমোহন রায়	(১৮৯৭-১৯৩৩খ্রি.)	রাজা হরিশচন্দ্র রায়ের ছেলে
১৭.	রাজা নলিনাক্ষ রায়	(১৯৩৫-৫১ খ্রি.)	রাজা ভুবনমোহন রায়ের ছেলে

Dhaka University Institutional Repository

১৮.	রাজা ত্রিদিব রায়	(১৯৫৩-৭১খ্রি.)	রাজা নলিনাক্ষ রায়ের ছেলে
১৯.	রাজা দেবাশীষ রায়	(১৯৭৭খ্রি. থেকে বর্তমান চাকমা রাজা)	রাজা ত্রিদিব রায়ের ছেলে

উৎসঃ বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২ (২য় সং),পৃষ্ঠা-২৪

চাকমা রাজবংশের রাজাদের নামের তালিকা:

- ধাবানা (মৃত্যু ১৬৬১ ইং)
  - ধরম্যা
    - মোগল্যা
      - যুবল খাঁ
      - ফতে খাঁ (১৭৩৭)
        - ওরমুস্ত খাঁ
        - সের্জ্জন খাঁ
        - সেরমুস্ত খাঁ (১৭৩৭-১৭৫৮)
          - শুকদেব রায় (১৭৫৭-১৭৭৬)
          - জান বকস খাঁ (১৭৮২-১৭৯৯)[৭২]
          - টব্বর খাঁন (১৮০০-১৮০১)
          - জব্বর খাঁন (১৮০১-১৮১২)[৭৩]
          - ধরম বক্স (১৮১২-১৮৩২)
          - কালিন্দী রাণী (১৮৩২-১৮৭৩)[৭৪]
          - হারিশ্চ চন্দ্র (১৮৭৪-১৮৮৫)
          - ভুবন মোহন রায় (১৮৯৭-১৯৩৩)
          - নলিনাক্ষ রায় (১৯৩৫-১৯৫৩)
          - ত্রিদিব রায় (১৯৫৩-১৯৭২)
          - কুমার সমিত রায় (১৯৭২-১৯৭৭)
          - দেবাশীষ রায় (১৯৭৭........)
  - মঙ্গল্যা

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯ মারমা বৌদ্ধ সমাজ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমা এবং কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুণাতে বসবাসরত রাখাইল নামে নৃতাত্ত্বিকভাবে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠির ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও খাদ্যাভ্যাস, ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি এক হলেও এরা অবস্থানগত ভেদে একে অন্যের থেকে ভিন্নতর এবং স্বস্ব পরিচয় দিতে পছন্দ করে। যদিও বাঙালিদের কাছে উভয় জনগোষ্ঠি 'মগ' নামে অভিহিত। কিন্তু পাহাড়ি এবং সমতলের অধিবাসী এই দুই ধারার জনগোষ্ঠিই নিজেদেরকে 'মগ' পরিচয় দিতে অপছন্দ করে। 'মগ' শব্দটিকে এরা নিন্দনীয় অর্থে দস্যুতা জ্ঞাপক মনে করে।

যদিও মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে মগ, ফিরিঙ্গী ও পতুর্গীজ জল দস্যুদের উৎপাত ও অত্যাচারে অতীষ্ঠ ছিলো এ দেশের জনগণ এবং তাদের অত্যাচারের বিস্তৃতি ছিলো দেশের অভ্যন্তর পার্স্ত। তথাপি সেই মগ জল দস্যুদের উত্তরসূরি বর্তমান রাখাইন ও মারমারা যে নয় সেই সত্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।[৭৪] দৌলত কাজীর মতে, রোসাঙ্গে (আরাকান) রাজারা মগধরাজ পরিবার থেকেই এসেছিলেন। দর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে তারা ছিলেন বৌদ্ধ। কবি-তাঁর সতী ময়না লোর চন্দ্রানী গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মগধের প্রতি এবং মগধ রাজ্য এ দুটি শব্দ মাধ্যমে রাজা ও আরাকান রাজ্যকে বোঝাতে চেয়েছেন। আরাকান রাজাদের উত্তর সূরীকে হয়তো মগধে খুঁজে পাওয়া যাবে। আরাকানীরা প্রথমত মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠি থেকে আগত এবং পরবর্তী সময় তাদের মধ্যে অস্ট্রালয়েড ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলাদেশে মারমাদের বসবাসের ঐতিহাসিক পটভূমি, আভিবাসী হিসেবে তাদের আগমণের ইতিবৃত্ত, তাদের আত্ম পরিচিতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সামাজিক-আচার-ব্যবহার, ধর্ম বিশ্বাস, ইত্যাদি নানাদিক সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে। "মারমা ও রাখাইন বর্মা থেকে বাংলাদেশে এসেছে। নৃতত্ত্ববিদ পিয়ারে ব্যাসানত তাঁর Tribe of Chittogong till Tract গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মারমারা বর্মার সুদূর দক্ষিণাঞ্চলের পেগু থেকে এসেছে। অপরদিকে রাখাইনরা এসেছে চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আরাকান থেকে। মারমা ও রাখাইনরা একইভাবে রাজনৈতিক কারণে দেশ ত্যাগ করে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে.........। কারো কারো মতে, শাক্যবংশের জনগোষ্ঠি রাক্ষাপুর রাখাইন এবং মেয়েই ম্রাইমা জনগোষ্ঠর তেলেইং বংশের লোকই মারমা। শব্দের উৎপত্তি হলো ম্রাইমা>ম্রাম্মা>ম্যানমা>মায়ানমার। History of Barma গ্রন্থ মতে, রাজা মিন রাজীগীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র মিনখা মৌং (১৬১২-১৬২২ খ্রিঃ) আরাকানের রাজা হন। তিনি তেলেং রাজপুত্র মেং শোয়ে প্রু কে (১৬১৪-১৬৩০ খ্রিঃ)আরাকান অধীকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য 'বোমাং' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। (বোমাং অর্থ মহাসেনাপতি)। মারমা জাতির উৎপত্তি ইতিহাসে মেং শোয়ে প্রু

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বর্তমান অংশে প্রু চৌধুরী পর্যন্ত পনেরজন রাজার ইতিহাস পাওয়া যায়। এ হিসেবে মারমা তেলেং বংশ এর বলে মনে করা হয়। বোমং মং চ প্যাই এর মৃত্যুর পরবর্তীকালে পেগুর রাজপরিবারের মং গ্রই প্রু ও হেরী প্রু এ জন্য উপরাধিকার সূত্রে বোমাং উপাধি ধারণ করেন। এর পরবর্তীতে বোমাংগ্রী উপাধি গ্রহণ করেন।

মং সার্কেলে রাজা বা মং চীফ পদে ম্রাচাই দাহব ইং (১৭৮৫-১৭৮৭) থেকে বর্তমান পাইলা প্রু চৌধুরী পর্যন্ত মোট বারো জন রাজার ইতিহাস পাওয়া যায়। সংসার্কেলের পাইলা প্রু চৌধুরীর রাজবাড়ি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি অবস্থিত। বোমাং থং এর ভৌগোলিক পরিসীমা সর্বমোট ২,৩৮৫ বর্গমাইল আয়তন বিস্তৃত প্রায় ১১৭ মৌজাকে নিয়ে সীমিত। বর্তমানে বোমাং সার্কেলের অংশে প্রু চৌধুরীর রাজবাড়ি বা রাজধানী (ক্যর্কচি স্রোহ বা ম্যাকছে স্রোহ) বান্দরবান। মারমা উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বিতীয় সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত সুরেন্দ লাল ত্রিপুরার পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিতি পুস্তিকা সূত্রে জানা যায় যে, মগ বা মারমা উপজাতির সংখ্যা ১,১৬,৪৭৭ জন। তাদের অধিকাংশ বোমাং ও মং সার্কেলে বসবাস করে। কয়েক হাজার মগ বা মামা চাকমা সার্কেলের অধিবাসী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মগ বা মারমা উপজাতি নিজেরা মগ বলে স্বীকার করে না। তাদের দাবি তারা আরাকানের মারমা উপজাতির অংশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী। তাদের অভিযোগ তাদের মগ খ্যাতি ইংরেজ ও বাঙালিদের দেওয়া। প্রবন্ধ-আবদুল হক চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা উপজাতি। আবদুল হক চৌধুরী, মগ বা মারমা উপজাতির ২২টি গোত্রে, প্রফেসর পিয়ের ব্যাসানে ২১টি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেন, অরণ্য জনপদ এর লেখক আবদুস সাত্তার ১৫টি মগ বা মারমা গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রফেসর পিয়ের ব্যাসানেত বলেন, মগ বা মারমারা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত হলেও প্রধানত পলিনসা, থাংসা, ফ্রাংসা, খ্যাংসা বদ রিগ্রিসা। পলিনসা গোত্রের মগ বা মারমা উপজাতি মং সার্কেল ও রিগ্রিসা গোত্রের মগ বা মারমা উপজাতি বোমাং সার্কেলে বসবাস করে। নিম্নে তিন পার্বত্য জেলা এবং পটুয়াখালী, বরগুণা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম মারমা ও রাখাইনদের জনসংখ্যা তালিকায়[৭৫] প্রদত্ত হলো-

জেলা		লোক সংখ্যা
বান্দরবন পার্বত্য জেলা	মারমা	৫৯,২৮৮ জন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মারমা	৪২,১৭৮ জন
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	মারমা	৪০, ৮৬৮ জন
পটুয়াখালী, বরগুণা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম	রাখাইন	২২, ৪০১ জন
মোট		১,৬৪,৭৩৫ জন

বান্দরবান পার্বত্য জেলার মূলত মারমারাই সংখ্যায় বেশি। সমগ্র পার্বত্যাঞ্চলে মারম জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৩৬ জন, ১৯৯১ সালের আদম শুমারী মতে, শুধু বান্দরবানের পার্বত্য জেলার-৫৮,

Dhaka University Institutional Repository

২৮৮ জন মারমা রয়েছে। ২০০০ সালে এ দেশে মারমাদের জনসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। ১৯৯৭ সালের হিসেব মতে মারমা ও রাখাইন জনসংখ্যা ১,৭৬,২৩০ জন। মারমারা নিজেদেরকে মারমা লুম্যো অর্থাৎ জনগোষ্ঠি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাতটি উপজেলায়, থানচি, রুমা, বোয়াংছাড়ি, লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি ও বান্দরবান সদরে মারমারা বাস করে। "মারমা নৃগোষ্ঠির সামাজিক কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বোমাং রাজ ও মংরাজ। রাজা কর্তৃক মনোনীত রোজা-ফাইনস (গ্রাম-প্রধান) চ্যাইং-চেরে (হিসাব-নিকাশও দলিল দস্তাবেজ প্রস্তুতকারী), দগইং দমদা রেহসা (দেহরক্ষী ও পুলিশ), তাইংসা-তইংগাং (দলনেতা), রোয়সী (আদেশ-নির্দেশ ঘোষনাকারী), হেডম্যান-কারবারী (মৌজার রাজস্ব কর আদায়কারী) ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে রাজার সভাপর্ষদ গঠিত। প্রবন্ধঃ উ চনু, বান্দরবান পার্বত্য জেলাঃ উপজাতীয় নৃগোষ্ঠী মারমা)।

মারমারা থেরবাদ (বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মারমা সমাজে পুরোহিত সংঘও দুইভাগে বিভক্ত। যেমন-মাংগই এবং সাংঘাগইং অর্থাৎ রাজগুরু পুরোহিত সংঘ এবং প্রজাগুরু পুরোহিত সংঘ। জন্ম, মৃত্যুবিয়ে জীবনে বৌদ্ধ মারমা পুরোহিতদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মারমারা পূজা-পার্বণে বিপুল আয়োজন ও আনন্দোৎসব করে থাকে। ধর্মীয় উৎসব বিশেষ করে বুদ্ধ-পূর্ণিমা, আশ্বিণীপূর্নিমা বা প্রচারনা (ওয়াগ্যেয়াই),আর্যীয় পূর্ণিমা (ওয়াছোলাব্রো), ফানুস উড়ানো উৎসব মাঘী পূর্ণিমা, কার্থনচীবর দান এবং সামাজিক উৎসবের মধ্যে, রাখা ভাংপোয়ে (রথটানা), মাঙ্গলা ছং পোয়ে (বিবাহ অনুষ্ঠানে), মেদে তং পোয়ে (শিশুর জন্মোৎসব), আসুহ পাহ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) ককসাহ চা পেয়ে (নবান্ন অনুষ্ঠান), পইং জ্রা পোয়ে (রাজপুন্যাহ), সাংগ্রাইং (চৈত্র সংক্রান্তি) ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য । মানব সমাজের জীবন যাত্রার প্রণালী হচ্ছে সংস্কৃতি। ক্যাপা, চাগায়াং, রুদ্ধ, লাঙ্গা, সাইংবক, সইং-আকাহ ও নব্রাইংলা প্রধান সংগীত ও নৃত্যে মারমাদেরকে ঐতিহ্য বাহী ভূমিকা ও তাৎপর্য রয়েছে। মারমাদের বাসগৃহ, ক্যাংবা প্যাগোডা (বৌদ্ধ বিহার), জ্যাদি (স্মৃতিস্তম্ভ), চৈত্য, সাংখাইন (পালিটোল), দজ্জরুৎ (ধর্মঘর), ইত্যাদি স্বতন্ত্র ঐতিহ্যগত অনন্য নিদর্শন। জুম চাষা ও বনজ সম্পদ আহরণের উপর মারম্যাদের জীবন জীবিকা নির্ভরশীল । মারমাদের অর্থনীতি প্রধানত জীবিকা ভিত্তিক অর্থনীতি । পূর্বে মারমা সমাজ পশ্চাৎমুখী ও অনগ্রসর থাকলে ও বতর্মানে অনেকসচেতন। শিক্ষিত এবং সমুন্নত । ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষিত মারমা ডাক্তার ১৩ জন, ইঞ্জিনিয়ার ১৩ জন, কৃষিবিদ ৩ জন, স্নাতকোত্তর-ডিগ্রধারী ৪০, স্নাতক ১৪৭ জন। এর মধ্যে মহিলা ২৮ জন । জ্যেতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমাকে ১৯৯৯সালে ১২মে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১০ মগ সম্প্রদায়ের অতীত কথা

কক্সবাজার, রামু, চকরিয়া, টেকনাফ প্রভৃতি স্থানে মঘ জাতির বসতি রয়েছে। 'মঘ' শব্দে আরকানবাসী জাতি বিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদগণষ ইহাদিগকে ইন্দোচীন সংমিশ্রিত বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকে অনুমান করেন মঙ্গো শব্দ হইতে অপভ্রংশে 'মগ' হইয়াছে। উহা বাঙ্গালা, সংস্কৃত, কি পালি ভাষায় মূল শব্দ নহে। ইহা দিগের মধ্যে মারমাগিরি, ভূইয়ামগ বরুয়ামগ, (রাজবংশীয় মগ) মার্মা বা ম্যাম-মা-মগ, রোয়াঙ্গামগ, রোয়াঙ্গ ও থোঙ্গয়া জুমুয়া মগ নামে কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে। মগজাতি স্থান বিশেষ বসবাস হেতু এই পার্থক্য ঘটিয়াছে। পুর্বে ইহারা আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসীরুপে গন্য ছিল। ক্রমে জুমিয়া ও রোরাঙ্গন চট্টগ্রামের সমতল ক্ষেত্রে অবতরন করিয়া তকাংশ উন্নত হইয়াছে। ইহাদের প্রাকৃতিক গঠন সুদুর ও বলিষ্ঠ, মুখাকৃতি দেখিলে ইহাদের চীন সংশ্রব, খর্বাকৃতি চওড়া ও চেপ্টা মুখ, চেপ্টাবিস্তৃত গন্ডাস্থি, নাসাফলক অস্থিবিহীন, খেদা নাক এবং বক্র পত্রযুক্ত, ক্ষুদ্রাকার চক্ষু দেখিয়া মোঙ্গলীয় সংশ্রব মনে সমুদিত হয়। এ জনগোষ্ঠীর লোকেরা নৃতাত্ত্বিক জতিসত্তায় ইন্দোএরিয়ান বংশোদ্ভুত এক মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীভুক্ত জাতি।

ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকালে এবং চট্টগ্রামে প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গ ও বিহারবাসী নানা সম্প্রদায়িক লোক তথায় যাইয়া বসতি করেন। আসাম কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ একসময়ে পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বসবাস হইয়াছিল, তদ্রুপ এ আরাকান বিভাগে ও ইহার প্রকার বৃদ্ধি হয়। এই সকল লোকের মধ্যে স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সাথে বিবাহিদি হয়েছিল। মগদের পূর্বোক্ত তিনটি থাকের মধ্যে ২৪টি স্বতন্ত্র বংশ বা গোত্র প্রচলিত আছে। মগরাজতত্বের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুল সম্প্রসারন দৃষ্ট হয় ও ইহাতে দেখা যায় মগরাজাগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন ।

১৭৮৪ সালে শেষ দিকে বর্মীরাজ বোদাফায়ার সময় সমগ্র আরাকান রাজ্যের সকল অধিবাসীকে ম্যানমা নামে অভিহিত করা হয়। বর্মী উচ্চারণে ম্যামমা হলেও অক্ষারিক বানানে ম্রাইমা (মাই অর্থ দ্রুত, মা অর্থ শক্ত)। মারমা জাতির উৎপত্তিগত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, মারমারা জল দস্যু। ছিল তাই তাদের 'মগ' বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, তাদের পূর্ব পুরুষগণ মগধ রাজ্যের অধিকারী ছিল বিধায় তারা 'মগ' ড. আবদুল মাবুদ খান বলেছেন, 'মগ' বা 'মগ' শব্দ সংস্কৃত বা ফারসী জাত বলে অনুমানের কোন সঙ্গত কারণ নেই। মগ বা মারমা উপজাতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা নয়। তারা আরাকানী বহিরাগত।[৭৬] ইতিহাস মতে, মগ বা মারমা উপজাতি রাজনৈতিক কারণে শরণার্থী হয়ে দু'বারে প্রথমে চট্টগ্রামে পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকের মতে, বার্মা থেকে মার্মা হয়েছে। Colonel A phayre Zuvi On the thistory of Aralran গ্রন্থে বলেন, ম্রাম্মা শব্দ বর্মী মেয়ামা (myamma) শব্দের বিকৃতরূপ। মেয়ামা শব্দকে বা-মা উচ্চারণ করে এবং এই বা-মা শব্দটি বামা শব্দে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান বার্মা নাম পরিবর্তন করে প্রাচীন জাতি মেয়ামা অনুসারে মায়ানমার নামকরণ করা হয়। (ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পত্রিকা, ১ম-৩য় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-১৬)। মারমা শব্দটির উৎপত্তি হল মায়ানমার (বার্মা)>ম্রাইমা>মারমা। মারমা শব্দটি ব্রহ্মদেশের তেলেইং ভাষায় মেয়ামা শব্দের বিকৃতরূপ। এই ম্রাইমা হতে মারমা শব্দের উৎপত্তি। প্রবন্ধ অং সই মারমা মারমা ইতিহাসের উপর একটি অনুপুঙ্খ আলোচনা। এম. ফেইরী History Burma গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'মগ' কথাটি বিস্তৃত বাংলা শব্দ এবং সম্ভবত গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি মগধ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মগরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং মগধ থেকে প্রচারি গৌতম বুদ্ধের ধর্মানুসারী বলে তারা মগ নামে খ্যাত। [৭৭]

D.G.E. Hall তাঁর A History of South East Asia গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, মগ কথাটির উদ্ভব ঘটেছে মঙ্গোলীয় বা মাঙ্গাল থেকে। কেননা, মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির লোকদের সঙ্গে মগদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্যে মিল রয়েছে। 'মগ' কথাটি যে বাঙ্গালীদের প্রদত্ত তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর ভূপর্যটকদের বিবরণীতে। বাঙ্গালীরা ম্রৌক উ রাজ্যকে আরাকান এবং এই অঞ্চলের আধিবাসীদেরকে মগ গ্রামে অভিহিত করতো। (The history of Barma, colonel A phayre, london, 1901, P-211). প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড. গ্রীয়ারস গন্তব্য করেন যে, মগ কথাটি ইন্দোচীন ভাষায় জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মগরা আমলে ইন্দোচীন জাতির অর্ন্তভুক্ত। [৭৮]

যদুনাথ সরকারের মতে, ফরাসি যুগ (অগ্নি উপাসক) সংস্কৃত 'মদগু' শব্দ থেকে (জলচর পক্ষি) মদগু>মগ বা মঘ হয়েছে।[৭৯] মগদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে স্যার রিজলী বলেন, এদের মধ্যে ৮৪.৫ জন মঙ্গোলীয় আকৃতির লোক দৃষ্ট হয়।[৮০] ড. আহমদ শরীপের মতে, মগ্র, বৌদ্ধের প্রতিশব্দ, এ মগ বা মঘ মগধ, শবদজাত। মগধ' শব্দজাত। মগধ>মগহ>মঘ>মগ।

মোঘলরা পূর্ববঙ্গ অধিকারের আগে আরাকানের মগরাজা সিকান্দর শাহ (১৫৭১-১৫৯৩) সমগ্র চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার অংশ বিশেষ দখল করে নেয়। ১৬০৩ খ্রিঃ মগরা ঢাকা আক্রমণ করে। কিন্তু স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ১৬০৭ সালে মগরাজ সেলিম শাহ চট্টগ্রামে পতুগীজদের আক্রমণ করেন । ১৬২৫ খ্রি. মগরাজা সিরি থুডামার মোঘল বাহিনীকে পরাজিত করে ঢাকা শহর থেকে নরজারী ধরে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ হতে মগ দস্যুদের বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয় শায়েস্তা খানের (১৬৬৪) বিশেষ কৃতিত্ব। ১৬১৭ খ্রিঃ আরাকানের মগ রাজপর্তুগীজদের নিকট হতে সন্দীপ কেড়ে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে শয়েস্তা খানের জ্যৈষ্ঠপুত্র বুযুর্গ উমেদ খানের সৈন্যরা চট্টগ্রাম জয় করে। ১৬৬৬ সালে মগরা সম্পূর্ণ পরাজিত এবং মোগলরা ২০০০ মগ কে ধরে নিয়ে গিয়ে দাম বানিয়েছিল।

মাঘ মাসের পূর্ণিমাকে "তাবুং লব্রে' বলা হয়। মগদের অন্যতম প্রধান উৎসব থিঞ্জিয়ানা এ সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। এদের ধর্ম গ্রন্থের নাম "থাদুওয়াং"। মগদের ভাষা মগী নামে খ্যাত এবং তা আরকানী ভাষায় সংমিশ্রণ। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বার্মিজভাষা থেকে এ ভাষা উদ্ভুত হয়েছে। মগরা বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার দিকে বেশী আগ্রহী এবং পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন ও সুশিক্ষিত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এদের মধ্যে আর আদিম বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না"। ১৫তম বোমাং চীফ ২০০৪ সালে বোমং রাজা অংশৈ প্রু চৌধুরী ৯০ বছর হন। ১৯১৫ সালে ১ আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সালে ২৬ অক্টোবর বান্দরবান বোমং সার্কেলের ১৫তম রাজা হন।

তিনি রাষ্ট্রপ্রতি শহীদ জিয়া সরকারের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। "মিন ছোয়া পু (Min Soa Pya) নামে মারমাদের এক পূর্ব পুরুষ সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল বোমাং (Bohmaung) যার অর্থ হলো কমান্ডার। তিনি তৎকালীন আরাকান রাজ্যের খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বোমাং রাজার উদ্যোগে আবারও মারমা শব্দটি বাংলাদেশে বসবাসরত উপজাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বার্মা থেকে আগত বর্মী রাজ্যের উত্তররাধিকারী মারমা সম্প্রদায়। যাঁদের অধিকাংশ বান্দরবানে বাস করে। হাল আমলে বোমং ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, ইতিহাস বিদ ড. আবদল মাবুদ খান, চন্ট্রল ইতিহাস বিদ আবদুল হক চৌধুরী, অলক দাসগুপ্ত, ক্য শৈ প্রু, উ থোয়াই প্রু, এস, এ প্রু, মং ক্যশৈনু নোভ এবং আরো অনেকে।

উল্লেখ্য যে, মারমাদের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে লালন করে এসেছেন বোমাং গণ ও মং গণ। মানুষের জীবনে বিয়ে একটি প্রধান সামাজিক পুরুত্বপূর্ণ দিক এবং প্রপঞ্চ। এটি একটি সামাজিক চুক্তিও বটে। প্রত্যেক সমাজেই বিয়ের ধরণ পদ্ধতি, রীতিনীতি এবং পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণত মারমা সমাজের বিয়ে খুবই আকর্ষণীয় এবং আনন্দময় অনুষ্ঠান। মারমাদের মৃতদেহ সৎকার এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতিনীতি। বর্তমানে মারমা সমাজে গইং নামে কতগুলো সংঘ বা সংগঠন আছে। মুলত উক্ত সংগঠনগুলো এক একটি তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতি অনুসরণ করে। সাংগ্রীইং মারমাদের ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে খুবই অর্থবহ, আনন্দময় উৎসব। মারমাদের কাছে বর্ষবরণ হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎসব। যাকে তারা তাদের ভাষায় সাংগ্রাইং বলে থাকে। বর্ণাঢ্য নানা অনুষ্ঠান আয়োজনে মধ্য দিয়ে মারমা তিনদিন ব্যাপী সাংগ্রাইং উদযাপন করে থাকে। ক্য-শৈপ্রু এর মতে বাংলায় সংক্রম হতে সংক্রান্তি। মারমা ভাষায় সাংক্রাই হতে সাংগ্রাইং শব্দের উৎপত্তি। "মং চাই শৈ ম্যা বলেন, সাংগ্রাইং মগধ শব্দ সংক্রমণা বা সংক্রমণ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

এসেব। এ অর্থে যোগাযোগ, সন্ধি বা মিলন ও বলা চলে)। মারমাদের সাংগ্রাইং নির্ধারণের ভিত্তিগুলো মারমা বর্ষপঞ্জি। ১৩৫৯ বছর পূর্ব থেকে মারমা বর্ষপঞ্জি (গ.জা. সাকরাই গণনা শুরু হয়)।

সাং গ্রীইং চৈত্র সংক্রান্তি বা নববর্ষ বরণ উৎসব মারমাদের বার্ষিক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সার্বজনীন ঐতিহ্যবাহী লোকতত্য উৎসব। মারমারা সাংগ্রাইং পরের প্রথম দিনকে পাইং ছোয়াই (সুন তোলা), দ্বিতীয় দিনে সাংগ্রাইং আক্যা (অবরোহণ বা আগমণ দিবস), তৃতীয় দিন সাংগ্রাইং আপ্যাইং (আরোহণ বা নির্গমণ দিবস)। (মারমা জাতিসত্তা, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১২৯, প্রবন্ধ ক্যা শৈ প্রুত পূর্বকথন সহ সাংগ্রাইং এর কিছু কথা) মারমা সমাজে প্রধান ও অন্যতম আকর্ষণীয় হলো রিলভ বোয়ে বা জকেনি উৎসব (Water Fastiral)। এটি যুবক-যুবতীদের জন্য একটি ধর্মীয়ের সামাজিক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। এই অুনষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি এবং পরস্পরের মেলবন্ধন নিবিড় ও গভীর হয়ে থাকে। সাংগ্রাইং উৎসবের সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্য ক্রীড়া, নানা প্রকার পিঠা তৈরি, ছোয়াইং ভোজন গুরুত্ব পায়।

রাজপুন্যাহ একটি ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। সপ্তদশ ও অস্টাদশ শতকে মোঘল, পর্তুগীজ ও আরাকান ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠি কর্তৃক রাজা-প্রজা, জমিদার, তালুকদার, রোওয়াজা, ফাইনসী দ্বারা পরিচালিত কর প্রদানের রীতিনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এই পার্বত্য অঞ্চলে রাজপুন্যাহ নামক রাজকীয় প্রথার প্রবর্তন। পরবর্তীতে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তদানীন্তর ব্রিটিশ সরকার The chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 তথা Hill Tracts Manual বা শাসন বিধি জারির মাধম্যে বোমাং চাকমা ও মং রাজপুন্যাহ কে প্রশাসনিক সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিশেষঅংশে হিসেবে সুত্রপাত হয়। ১৯৮৯ সালে ১৬ নং আইনে W.H.J. Christy Deputy Commisioner কর্তৃক ১২৯৭ মঘী সনে (১৯৩৬ খ্রি.) প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রামের Headman Manual বিধি অনুসারে প্রত্যেক মৌজার হেডম্যান ও গ্রামের কারবারীর মাধ্যমে জুমকর ও অন্যান্য কর বা খাজনা আদায়ের নিয়ম অব্যাহত রয়েছে। এ প্রথা সিদ্ধ কার্য হয়ে থাকে রাজপুন্যাহ অনুষ্ঠানে। জুমিয়া পাহাড়ীগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তিনদিন ব্যাপী রাজপুন্যাহ অনুষ্ঠানে ও মেলায় সমবেত হয়। (পইংজ্রা বোমাং রাজপুন্যাহ ৯৪ স্মরণিকা) উপজাতীয় সংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদ, বান্দরবান, ১৯৯৪ প্রবন্ধঃ মং ক্য শোয়ে নু নেভী, বোমাং রাজপুন্যাহর ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট)।

- সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে এ কে এম মকছুদ আহমেদ এর সম্পাদ নায় গিরিদাম্প, পত্রিকা, প্রকাশিত হয়েছে। রাঙ্গামাটি বান্দারবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রচার বহুল সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

- পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র সাপ্তহিক 'বনভূমি' ২৭ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে প্রকাশিত হয়।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা।সাংগু উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বান্দরবান থেকে বোমাং রাজপুন্যাহ স্মরণিকা, পইংজ্র।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতির শিক্ষাবিস্তারে মোনঘর শিশু সনদ ও পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনার্থ আশ্রস, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। এর পরিচালক প্রজ্ঞানন্দ মহাথের এবং ভদন্ত শ্রদ্ধালঙ্কার মহাথেরো এর অবদান স্মরণীয়। এ ছাড়া বান্দরবান বৌদ্ধ অগখালয় বালাঘাটা বান্দরবান।
- ঢাকার মিরপুর শাক্যমণি বৌদ্ধবিহার পাহাড়ী উপজাতির সামগ্রিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।
- রাঙ্গামাটি বৈচিত্যের ঐকতান- রাঙ্গামাটি প্রকাশনী- সম্প্রালয়, ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশের মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েন- সম্বোধি, ১৯৯০।
- মারমাদের উন্নতি সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি বিকাশে বান্দরবান উপজাতীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বিভিন্ন ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক মি. এস. এ প্রু। এ সাথে কাজ করে যাচেছন গবেষণা কর্মকর্তা মি. চ ফুই ফ্রু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য)।
- পাবর্তাঞ্চলের প্রথম ম্যাগাজিন মাসিক চিম্বুক। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক খান জামা লুসাই, সম্পাদক মো. বাদশ মিঞা।
- স্থানীয় সরকার পরিষদ ও উপজাতী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান এর সংকলিত স্মরনিকা সাংগ্রীহং, বৈসাধি [বৈসু, সাংগ্রাইং-বিজু] প্রকাশিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশে মারম স্টুডেন্টস কাউন্সিল, কেন্দ্রিয় কমিটি চট্টগ্রাম থেকে মংখ্যাই চিংমারমা সম্পাদিত চেদনা।
- মংছেনচীং (মংছিন) এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, রাখাইন সংকলন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১৩ উপজাত সম্প্রদায়ের আদিমতম হচ্ছে ম্রো আদিবাসী। বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত বান্দরবান জেলায় যথাক্রমে আলীকদম, লামা, থানছি, রুমা, ও টংকাবতী এসব এলাকার বাহীন অরণ্যহলোতে তাদের বসবাস। জুমচাষ, পশুপাখি, বণ্য প্রাণী এবং ফল মূল জীবন ধারণ এবং আহার।

পোষাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ম্রো রমনীরা প্রায় ৯ ইঞ্চি চওড়া ওয়ান আই কোমরগুনী জড়িয়ে রাখে। ইদানিং শ্রো নারীরা ওয়ান চা গায়ে জড়িয়ে রাখে। পুরুষেরা ঐতিহ্যবাহী দ্যং (লেংটি) লজ্জা নিপারণে পরিধান করে থাকে। ম্রোদের গো ও শুকর হত্যা উৎসব এক বৈচিত্রময় অনুষ্ঠান। (চিম্বুক,

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের মুখ পাত্র, সেপ্টেম্বর-২০০৪, পৃষ্ঠা-১২, প্রবন্ধ কাজলকান্তিদে, ম্রো আদিবাসীদের জীবন ধারা) ম্রো উপজাতিরা যাবাবর শ্রেণীর। তাদের অধিকাংশ গ্রাম গুলো প্রত্যন্ত গ্রহীন অরন্যে উচু পাহাড়ে। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করলেও স্ব স্ব ধর্মীয় সামাজিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যুগযুগ ধরে, চর্চা করে আসছে। স্রো সম্প্রদায় প্রকৃতি উপাসক বা সর্বগ্রহণবাদী হলেও বেশির ভাগ ম্রো বৌদ্ধ ধর্মানুসারী এবং কয়েক দশক ধরে কিছু সংখ্যক ম্রো খৃষ্টান ধর্মের ধর্মান্তরিত হচ্ছে। রাংলাই শ্রো , ম্রো সম্প্রদায়ের নেতা ও সুয়ালক ইউপি চেয়ারম্যান, এবং ম্রোচেট এর সভাপতি।

- রাঙ্গামাটির সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য বিশ্বজগৎ তনচংগ্যা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় মারমা (সন্তুলারমা)
- পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য উক্যসহ চৌধুরী
- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মাণিক লাল দেওয়ান
- বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মা ম্যা চিং।
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নক্ষত্র লাল ত্রিপুরা
- বান্দবানের সাংসদ সদস্য ও বিরোধীদলীয় হুইপ বীর বাহাদুর।
- পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের সভাপতি শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাথের ও সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান বিকাশ চাকমা।
- মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন সভাপতি এম কে মং

ইতিহাস থেকে জানা যায় অতি সম্প্রতি প্রাচীনকাল থেকে মগধ ও আরাকানের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছির। এ সময় বহু ধর্মযাজক ধর্ম প্রচার করার জন্য আরাকান গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু রাজানুগহে একমাত্র বৌদ্ধধর্মই আরাকানে টিকে যায়। একটি আরাকানী কিংবদন্তী থেকে জানা যায় উত্তর ভারতের একটি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী মিয়ানমারে আশ্রয় গ্রহণ করে। এরা পরবর্তীকালে আরাকানে কয়েক বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে নবম শতাব্দীর আরাকানের চন্দ্র বংশীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের মগধ বংশীয় বলে পরিচয় দিতে শুরু করেন। চন্দ্র বংশীয় রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং আরাকানের বৈশালী নগর ছিল তাদের রাজধানী। কালক্রমে চন্দ্র বেংশীয় রাজাদের যশ ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমুদয় আরাকানবাসী সাধারণভাবে মগ নামে পরিচিতি লাভ করে। এভাবে চন্দ্র বংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মের পীঠভূমি মগধের সঙ্গে যোত্রসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের মতো পরবর্তীকালে ম্রাউ বংশের রাজারাও মগধ বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দিতেন বলে জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। উক্ত কাহিনীর সূত্র ধরে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন, মঙ্ঘ (মগধ>মগহ>মগ) থেকে মগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

বাংলাদেশের এই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর এক অংশ নিজেদেরকে মারমা বা বার্মিজ বলে পরিচয় দেয়। এই জনগোষ্ঠী বারান্দারবান, রামগড়, এলাকায় বসবাস করে। 'মারমা' শব্দটি বার্মিজ মেয়ামা শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। একাদশ শতকের একটি তলাইং মুদ্রা থেকে জানা যায় বার্মিজ জনগোষ্ঠী প্রাচীন নাম হলো 'মেয়ামা'। পরবর্তীকালে মোয়ামা শব্দটি বা মা শব্দে রূপান্তরিত হয়। এই বা-মা শব্দ থেকে মিয়ানমার পূর্ববর্তী নাম বার্মার ইংরেজী নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। আবার অনেকে সংস্কৃত শব্দ 'ব্রহ্ম' শব্দ থেকে বার্মা বা মারমা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন।

রাখাইন শব্দের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশটি পূর্বে আরাকান নামে পরিচিত ছিল না। আরাকানের অধিবাসীগণ তাদের মাতৃভূমিকে রাখাইন প্রে বা রাখাইন পি নামে অভিহিত করত। এর অর্থ হচ্ছে রাখাইনদের দেশ বা রাজ্য। রাখাইন শব্দটি রখইতা তঙ্গী বা রখইতাপি থেকে গৃহীত। রখইতা শব্দ সংস্কৃত রক্ষ এবং পালি রকখো থেকে উদ্ভূত এবং রখইতা শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস। আরাকানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বে আরাকানবাসীদের কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ছিল না বলে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ আরকানকে এই নামে অভিহিত করতেন। সেই পটভূমিতে আরাকানবাসীগণ তাদের মাতৃভূমিকে রখইতা তঙ্গী অর্থাৎ রাক্ষসপুরী বা যক্ষপুরী বলে পরিচয় দেয়, যদিও সেখানে রাক্ষস বা যক্ষ নামে কেনো প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। কেউ কেউ মনে করেন সংস্কৃত ও পালি শব্দ রকখ হতে রক্ষাইন, অপভ্রংশে রাক্ষাইন বা রাখাইন শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। যে জনগোষ্ঠী নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে বলে রাখাইন এবং তাদের মাতৃভূমির নাম হলো রক্ষাপুরা বা রক্ষাপুরী। উক্ত নামে নিজের মাতৃভূমিকে পরিচয় দিয়ে আরকানীরা নিজেদের অধিকতর সম্মানিত জাতি বলে মনে করত এতে মাতৃভূমির প্রতি আরকানী জাতির গভীর ভালবাসা ও মমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্নেল ফেয়ার কিছুদিন পূর্বে পেগুতে রাখাইন নামের একটি জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন। তবে ওরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নয়। কারও কারও ধারণা বর্তমান আরকান শব্দটি (রৌপ্যশুভ্র) বা (সুখশান্তিময় দেশ) হিসেব ইউরোপীয় বণিকদের দেয়া নামকরণ হতে উৎপত্তি হয়েছে।

শাক্য বংশীয় জনৈক সন্ন্যাসী অর্জুনের পুত্র মারায়ু কর্তৃক আনুমানিক খ্রি.পূ. ৩৩২৫ সালে বর্তমান মিয়ানমার আরকান অঞ্চলে প্রথম ধান্যবর্তী নগর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাখাইন জাতির ইতিহাস সূচিত হয় এবং ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় ব্রাউ বংশীয় রাজা মহাসামন্তের আমলে রাখাইন জাতির ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু আবদুল হকচৌধুরী বলেন খ্রি. পূ. ২৬৬ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটা দেশ ও জাতির

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে মানব সমাজের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক উত্থান- পতনের কাহিনী অবশ্যই বিজড়িত আছে। কথিত আছে প্রথম ও দ্বিতীয় ধান্যবর্তী যুগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৫ সাল হতে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৮ সাল পর্যন্ত রাখাইন জাতি দেবদেবীর পূজা করতেন। তৃতীয় ধান্যবর্তী যুগে (খ্রিষ্ট পূর্ব ৫৮০-৩২০ খ্রি.) রাখাইনদের চন্দ্র বংশীয় রাজা চান্দা সুরীয়ার (চন্দ্রসূর্য) আমলে তার আমন্ত্রণে আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫৬৮ সালে স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ রাখাইন জাতির নিকট বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং তাদেরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। রাজা চান্দা সুরীয়ার উদ্যোগে ঐতিহাসিক মহামুনি বুদ্ধমূর্তি তখন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে উক্ত বুদ্ধমূর্তিটি বৈশালী থেকে আনীত হয়ে মিয়ানমার মান্দালয়ে সংরক্ষিত আছে। তখন থেকে রাখাইন জাতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু জনাব আবদুল হক চৌধুরী আরকানের প্রাচীন ইতিহাস রাজোয়াং এর বরাত দিয়ে বলেন, আনুমানিক ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে মগধের সামন্ত রাজা চন্দ্রসূর্য আরকানের ধান্যবর্তীতে রাজ্য স্থাপন করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং সেখানে মহামুনি বুদ্ধমূর্তি ও মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ করেন।

খ্রি. পূ. ২৬৬৬ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরকান ছিল রাখাইনদের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ রাজ্যে বহু রাজবংশ রাজত্ব করেছেন, তন্মধ্যে চন্দ্রবংশ ও ম্রাউ রাজবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রবংশের রাজারা ৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত এবং ম্রাউ বংশের রাজারা ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের সময়ে আরকানের রাজধানী ছিল বোতালী বা বৈশালী এবং ম্রাউ রাজবংশের রাজধানী ছিল মাউক বা ম্রোহঙ (পাথরকিল্লা)। বৈশালী যুগের (খ্রি. ৩২০-৮৬৪) চন্দ্রবংশের রাজাদের সাথে সমতট বা কুমিল্লা অঞ্চলের তখনকার গুপ্ত ও পাল রাজাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে জানা যায়। তাছাড়া চন্দ্রবংশের ১৯তম রাজা শ্রীধর্ম বিজয় খ্রি. ৫৯৫-৬৬৭) কর্ণফুলি নদীর তীর পর্যন্ত নিজ রাজ্য সীমা বিস্তৃত করেন বলে জানা যায়। তাই ধরে নেয়া যে খ্রিষ্টিয় নবম শতক থেকে এ অঞ্চলে রাখাইন শাসকদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং তখন থেকে রাখাইনরা এখানে বসতি গড়ে তোলে। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, প্রাচীন আরকানের রাখাইন রাজারা এক সময় ঢাকা মুর্শিবাবাদ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন। আরকানের প্রাচীন ইতিহাস রাজোয়াং এর মতে দ্বাদশ শতকে পারিমম বংশর রাজা তাই খিং জেত নেপাল পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে আরকানী রাজারা সন্দ্বীপ, ভূলুয়া বা নোয়খালির অধিকার নিয়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এবং সেখানকার আলমদিয়া ও যুগীদিয়া দ্বীপ দুটিতে আরাকানীদের শক্তিশালী দূর্গ ছিল। কিন্তু ১৪৬-১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম কখনও সম্পূর্ণ আর কখনও আংশিকভাবে প্রায় হাজার বছর আরকান রাজ্যভূক্ত ছিল। এ সময়ে আরকানের রাখাইনগণ রাজকর্মচারী হিসেবে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বসতি গড়ে তোলে।

বার্মিজ সৈন্যদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আরকানের অধিকাংশ রাখাইন স্থল ও জলপথে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে পালিয়ে আসতে শুরু করে। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে আরকানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১২০টি পরিবার ৫৬টি নৌযান যোগে ১১ দিন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পটুয়াখালী জিলার রাঙ্গাবালী দ্বীপে অবতরণ করে। ১৭৯৩ সালে ১০ হাজার রাখাইন চকরিয়া হারবাং অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮০১ সালে জানুয়ারি মাসে ৯০ হাজার রাখাইনকে নিয়ে রাখাইন বিপ্লবী নেতা বোশাং ব্যেন (কিং বেরিং) চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসেন। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে রামু শহরে ব্রিটিশ কোম্পানি সরকারের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন ফ্রগো ও হেমিল্টন তাদের প্রতিবেদনে ১৮০২ সালে রামুর পার্শ্ববর্তী ১২ মাইলের ভিতর লক্ষাধিক রাখাইন উপস্থিতির কথা উল্লে করেন। ১৮২০ সালে ডিসেম্বর মাসে ৭৪টি পরিবারের মোট পাঁচ শতাধিক রাখাইন সদস্য পটুয়াখালী অঞ্চলে বানিয়া তলী দ্বীপে চলে আসে। সর্বশেষ ১৮২২ সালে আরও ৬০টি পরিবারের তিন শতাধিক সদস্য আরকানের ধান্যবর্তী হতে পটুয়াখালী এলাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাছাড়াও এ রাজ্য বিপর্যয়ের কারণে প্রায় দু'লক্ষোর মতো রাখাইন ভারতের ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্যে চলে যায় বলে জানা যায়। ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন হেরেম বকস ১০ হাজারেরও অধিক রাখাইন উদ্বাস্তুদের নিয়ে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কক্সবাজার শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার মানবতার খাতিরে এবং কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গলপূর্ণ জমি চাষাবাদের উপযোগী করার জন্য রাখাইন শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন ককসকে উক্ত আরকানী বসতিগুলির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কক্সবাজার নামটি এখনও তাঁর নামের সাথে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১ মারমা জাতির ইতিহাস সমীক্ষা

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার বাঙালি কবি দৌলত কাজী তার রচিত 'সতী ময়না' কাব্যে আরাকানের রাজবংশকে "মগধ বংশ" বলে গুণগান করেছেন। এককালে গৌতম বুদ্ধের সময় মগধ রাজ্যটি একটি সভ্য রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। মগধের রাজা বিম্বিসারও গৌতম বুদ্ধের একজন পূজারী ছিলেন। তাই আরাকানের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজবংশকে এক্ষেত্রে মগধ বংশীয় বলে সম্মান জানানো হয়েছে বলে মনে হয়। আরাকানী পণ্ডিত সেন থাঅং এর ধারণা "হিন্দু ধর্ম উত্থানের সময় মগধ রাজ পরিবারের একটি শাখা চট্টগ্রামে আসে বলে তাদের মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে। এটা অস্বাভাবিক নয় যে, ঐ রাজ পরিবার বিহারের) (রাজ বংশজাত হতে পারে। তাঁর মতে নিম্নরূপে 'মগ' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে-"মগহি>মগই>মগ" (সেন থা অং ১৯৮০)। ১৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে মারমা প্রধান মেঙ স পিউ (মং চ প্যাই) আরকানের অধীনে চট্টগ্রামের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ফলে তখন থেকে মারমারাও মগ নামে পরিচিত হতে থাকেন।

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামী বাঙালিরা চাকমা ও মারমা উভয় জনগোষ্ঠীকে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বোঝানোর জন্য'জুম্মুয়া" বলতো। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখ বান্দরবানের প্রথম বোমাং রাজা কং হ্লা প্রু তাদের মধ্যেকার প্রথম সাক্ষাতের সময় ফ্রান্সিস বুকাননকে তাদের জনগোষ্ঠীর পরিচয় 'মারমা' (Ma-ra-ma) বলেন।[৮১] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, বর্মী ও আরকানীদের কাছে চট্টগ্রাম ও পাট্টিকেরা রাজ্য বহু পূর্ব থেকে পরিচিত ছিল। আরাকানী রাজা সুলতইং চন্দ্র ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেন। আর পাট্টিকেরা (ময়নামতী, কুমিল্লা) রাজা রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের উচ্চপদস্থ বর্মী অফিসার ধাদিয়েবা (Dhadi-eba) একটি বৌদ্ধবিহারকে তাম্রলিপি দিয়ে ভূমি দান করেছিলেন: (এ.কে.এম. শামসুল আলম, ১৯৮২)। এসব বর্মী ও আরাকানী উপস্থিতিগুলোর সাথে মারমাদের কোন ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিল কিনা সে বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে আরো অগ্রগতি হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

৪.১২ বোমাং রাজ পরিবার ও তাদের পূর্বপুরুষগণ

বান্দরবানের বোমাং রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ রাজা বায়িন্নঙ (1551, P-81) বার্মার একজন শক্তিশালী ও দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। বায়িন্নঙ তাঁর ভগ্নীপতি বর্মীরাজ তবিনশোয়েহ্তি (১৫৩১-৫০ খ্রিষ্টাব্দ) এর মৃত্যুর পর তৌগু এবং পেগু দখলের পর রাজা হন।[৮২] তিনি মন Mon (মোঁয়ে), শান ইত্যাদি জাতিকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত ও বশীভূত করে বার্মকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল

Dhaka University Institutional Repository

পেগু শহরে। সেখানে তাঁর একটি সুন্দর রাজপ্রসাদ ও দরবারগৃহ ছিল। ভেনিসীয় ভ্রমণকারী কায়েজার ফ্রেডিরিকে ও ইংরেজ ভ্রমণকারী র‍্যালফ্ফিচ পেগুর সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

রাজা বায়িন্নঙের সেনাবাহিনী ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পেগু থেকে রওনা হয়ে উত্তর থাইল্যাণ্ডের চিয়েংমাই রাজ্য জয় করে তাদের অধীনে আনে। তাঁর স্বপ্ন ছিল 'চক্রবর্তী রাজা' হওয়ার। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে 'চক্রবর্তী রাজা' হতে হলে বুদ্ধধাতু এবং সাদা হাতীর অধীশ্বর হতে হয়। তাই তিনি শ্যামের আয়ুথিয়ার রাজা চক্রপতের কাছে এক জোড়া সাদা হাতী তাঁকে দেওয়ার জন্য দাবি করেন। শ্যামের রাজা তাঁর এ দাবি প্রত্যাখ্যান করার কারণে তিনি ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আয়ুথিয়া অধিকার করে শ্যামের রাজপরিবার ও সাদা হাতাগুলো পেগু শহরে নিয়ে আসেন। [৪১] এতে প্রায় সমগ্র থাইল্যাণ্ডের উপর তাঁর প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করে। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী চিয়েংমাইয়ের শান রাজপুত্র মেকুতিকে আশ্রয়দানের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী চিয়েংমাইয়ের শান রাজপুত্র মেকুতিকে আশ্রয়দানের কারণে তাঁর সেনাবাহিনী লাওসের লুয়াংপ্রবাং রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনচাং প্রথব বার দখল করে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পেগুতে প্রত্যাবর্তন করে। রাজা বিয়ান্নঙ ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে পেগুতে জিন্মী হিসেবে রাখা শ্যামের যুবরাজ ফ্রানারেত পরবর্তীকালে রাজা নরেসুয়েন)-কে মুক্তি দিয়ে তাঁর এক বোনকে বিয়ে করেন। রাজা বিয়ান্নঙ ১৫৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনচাং এর সিংহাসনে লাওসীয় যুবরাজ (Oupahat) কে বসিয়েছিলেন।

রাজা বায়িন্নঙের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ন্যানদাবায়িং (Nanda-baying 1581-99) পেগুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁ সময়ে আভা, প্রোম, তৌঙ্গু ও চিয়েংমাইয়ের ভাইসরয়রা তাঁর আত্মীয় ছিলেন। তাঁর এক চাচা আভার ভাইসরয় থাদোমিনসাউ তাঁর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের সূচনা করলে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁকে হাতীতে চড়ে দ্বৈতযুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। ইতোমধ্যে শ্যামের রাজা ফ্রানারেত স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত তাঁর প্রেরিত তিনটি বর্মী অভিযান অ:য়থিয়া অধিকার করা সত্ত্বেও প্রশাসনিক দূর্বলতার কারণে ব্যর্থ হয়। ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে চিয়েংমাই তাঁর হাতছাড়া হয়। এভাবে অনবরত যুদ্ধের ফলে এবং রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে পেগু রাজ্য দূর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে আবার গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। এ সময় তৌঙ্গুর রাজা আরাকানীদেরকে যৌথভাবে পেগু আক্রমণে আমন্ত্রণ জানান। আরাকান রাজ মাঙরাজাগ্রি ওরফে সেলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২ খ্রিস্টাব্দে) সে সুযোগ গ্রহণ করেন। ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী স্থলসৈন্যসহ নৌপথে পেগু পৌঁছে তৌঙ্গুর সৈন্যদের সাথে যৌথভাবে আক্রমণ চালিয়ে পেগু অধিকার ও ধ্বংস করে। যুদ্ধজয়ের পর তৌঙ্গুর বাহিনী পেগু থেকে একটি বুদ্ধদন্ত ও পেগুর রাজা নানদাবায়িংকে লাভ করে। আর আরাকানীরা তাদের ত্যাগে পেগুর এক রাজকুমারী ও রাজকীয় সাদা হাতীটা পায়। পৌগুতে পৌঁছার পর ন্যানদাবায়িংকে হত্যা করা হয়। (DGE, Hall, P. 300).

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে আরাকান রাজা তাঁর সুন্দরী বন্দীর (রাজাকনজ্যার) প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন এবং তাঁর শ্যালক (পেগুর রাজপুত্র)-কে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। [৮৪] পেগুর এই রাজপুত্রের নাম ছিল মেঙ স পিউ (মং চ প্যাই)। আরাকান রাজা মেঙখামং (১৬১২-২২ খ্রিস্টাব্দ) তাঁকে "বোমাং উপাধি দিয়েছিলেন। (Bauinnaung is living Descendants: The magh Bohmoung, GE Hassan Journal of the Burma Research Society.P.35) উল্লেখ্য যে, আজকের বান্দরবানের বোমাং রাজপরিবারের লোকেরা পেগুর রাজপুত্র মেঙ স পিউ এর বংশধর। পর্তুগীজ সূত্র থেকে ন্যানদাবাগিং এর কন্যা পেগুর রাজকুমারীর নাম ক্ষেণানঙ পাওয়া যায়। আসলে তাঁর নাম ছিল 'খংমহ্রং' (সাই-ড-হফ্)। রাজকুমারী খিংমাহফ্-এর মা বংশের দিক থেকে শ্যামের রাজকন্যা ছিলেন। তাঁর অনুরোধে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা মাঙরাজাগ্রি পেগু থেকে আনীত লোকদেরকে ১২টি থং এ একত্রিত করে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন (বর্মী ও আরাকানী ভাষায় হাজার শব্দের প্রতিশব্দ হলো থং)। এতে তারা বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল। ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী মগ্যানরিক চট্টগ্রামের দেয়াং থেকে রান্নু হয়ে আরাকানের রাজধানী ম্রাউকউ (ম্রোহং) পর্যন্ত গিয়েছিলেন। ঐ সময় সেখানে অবস্থান কালে পেগুর রাজকুমারী খিনমাহফু এর সাথেও সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। জনব আবদুল মাবুদ খান (১৯৮৩) বোমাং রাজাদের যে বংশ তালিকা এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তাঁর লিখিত বান্দরবনের রাজ পরিবারের ইতিবৃত্ত প্রবন্ধে প্রদান করেছেন তাতে মেঙ স পিউ (১৫৯৯-১৬৩০ খ্রিস্টাব্দ), তৎপরে তৎপুত্র মেঙরাই প্রু ওরফে পালাই প্রু (১৬৩০-৬৫ খ্রিস্টাব্দ), অতপর তৎপুত্র হরি প্রু (১৬৬৫-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং তৎপরে তৎ ভ্রাতৃস্পুত্র হরিঞো (১৬৮৭-১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) মারমাদের রাজা হন বলে লিখেছেন। হাচিনসন (১৯০৯) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, "তিন পুরুষ পরে (Angunya) এর পুত্র হারিও (Hario) চট্টগ্রামের গভর্ণর হন। তিনি ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা (চান্দা) উজিয়ার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'বোমাংগ্রি' উপাধি লাভ করেন।" অতঃপর তৎ দৌহিত্র কং হ্লা প্রু রাজা হন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন বান্দারবানের প্রথম বোমাং রাজা। আবদুল মাবুদ খান (১৯৮৩) এর মতে কং হ্লা-প্রুর রাজত্বকাল হলো ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন বোমাং রাজা কং হ্লা প্রুর সাথে ফ্রান্সিস বুকাননের সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছরের মত ছিল বলে বুকাননের মনে হয়েছিল। বান্দরবান শহরের অনতীদূরে সোয়ালক নদীর পূর্ব তীরে কাঠের তৈরি তাঁর একটি সুন্দর রাজবাড়ি ছিল। তাতে চেয়ার, কার্পেট, বিছানা, ম্যাট এবং আসবাব পত্র ছিল। তাঁর তিন রাণী, ছয় পুত্র ও ছয় কন্যা ছিল। তারাও বিবাহিত ছিল। প্রচুর সংখ্যক চাকর-চাকরাণী তাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। বোমাং রাজা কং হ্লা প্রু যথেষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন। (আকৃতির দিক থেকে) তিনি (কিছুটা) ক্ষুদ্রাকৃতি/ছোট, শক্তিশালী এবং ভদ্র ছিলেন। [৮৫] তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

রাজবাড়ির নিকটে ৪০ বা ৫০টি বাড়ি নিয়ে একটি গ্রামে বৌদ্ধবিহার ছিল। তাতে বৌদ্ধভিক্ষুরা ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিতেন। ঐ গ্রামটি ঐ সময়ের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল বলে ফ্রান্সিস বুকানন শুনেছিলেন। হাচিনসন (১৯০৯) এর মতে মোগলেরা ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বোমাং রাজা কং হ্লা প্রু কে আরাকানে তাড়িয়েছিল। তিনি ১৭৭ ৪ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজদরবারের অত্যাচারের ফলে (বৃহত্তর) চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে (বর্তমান কক্সবাজার জেলার) রামু, ঈদগড় ও মাতামুহুরী নদীর তীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ সব অঞ্চলে যে সব জামিদারীগুলোর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে রামু, চকোরিয়া ও সাতকানিয়া এলাকায় কমলা ফ্রু (কং হ্লা প্রু) এর নামে জমিদারী ছিল। তখন তাঁর ছেলে সাথাং প্রু (সাথাং ফ্রু) এর অধীনে ঐ জামিদারী ছিল (এস.সি. ২৯ শে জানুয়ারি, ১৮৮৩, নং ২৯। রতন লাল চক্রবর্তী ১৯৮৪)। উল্লেখ্য যে, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'Kumla Pru' (কং হ্লা প্রু) প্রু ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে সাথাং প্রু ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। বোমাং সা থাং প্রু (Sa Taing Hpru) ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বান্দরবান শহরে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন (হাচিনসন ১৯০৯)। উল্লেখ্য যে, বান্দরবান শহরাঞ্চলে মারমাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে রিগ্রেসা (Regreatsa) দলের লোকেরাই প্রধান দল। "১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বোমাং সা থাং প্রুকে চট্টগ্রাম নদীর দক্ষিণ দিকে কর্ণফুলী নদী থেকে নাফ নদী পর্যন্ত মহলের কর আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।" সতীশ চন্দ্র ঘোষ (১৯০৯) বোমাং রাজার এলাকা থেকে বিতাড়নের ব্যাপারে নিম্নলিখিত কথাগুলো লেখেন, "১৮১৩ অব্দের আগষ্ট মাসে খ্যান ব্রে (চিনপিয়ান)... ২০০ উশৃঙ্খলকারী লোক লইয়া পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এত উপদ্রব করিতে থাকে যে, তাহাতে তত্রত্য অধিবাসিগণ পলাইয়া যায়। বোমাং কোং লা ফ্রুর ছয় পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ ছাথান ফ্রু (সা থাং প্রু) ৪০০ লোক লইয়া তাহাদিগকে এদেশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে তাড়াইয়া দেন।" তবে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ চিনপিয়ান কর্তৃক ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট যে পত্র প্রেরিত হয় তাতে তিনি বোমাং রাজা কং হ্লা প্রুর এলাকায় আত্মগোপন করে থাকার কথা লিখলেও তাঁর লোকেরা সেখানে কোন লুটতরাজ করেনি বলে জানান। চিনপিয়ানের উক্ত পত্র থেকেও সা থাং প্রু এবং জনৈক মুরাং টয়ঙ্গা (ত্রিপুরা উপজাতীয় টয়ঙ্গা নামক জনৈক ব্যক্তি) এর সাথে তাঁর সংঘর্ষ চলছিল বলে জানা যায়। পরবর্তী কাল চিনপিয়ানের মৃত্যুর পরে ঐ বিরোধ আপনিই শেষ হয়ে যায়।" "১৮২৬ অব্দে ছাপান ফ্রু বনজুগী (বম) সর্দ্দার রেংচুলুমকে জয় করিলেন।" বোমং রাজা সা থাং প্রু দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর পরবর্তীকালে বোমাং রাজা হিসেবে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কঙহ্লাঞো (১৮৪০-৬৬), অতঃপর তার খুড়তুত ভাই মঙ প্রু (১৮৬৬-৭৫), তৎপরে তৎ ভ্রাতা সাক হ্লাইং ঞো) (১৮৭৫-১৯০১), অতঃপর তৎ ভ্রাতুষ্পুত্র চা হ্লা প্রু (১৯০১-১৬), তৎপরে তৎ ভ্রাতুষ্পুত্র মঙ সা ঞো (১৯১৬-২৩), এরপর তৎ ভ্রাতুষ্পুত্র ক্য জ্যাইং প্রু (১৯২৩-৩৩), তৎপর তৎপুত্র ক্য জ সাইং পু (১৯৩৩-৫৯),

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরে তৎ ভ্রাতা মঙ শৈ প্রু চৌধুরী ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা হন। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেন। এমতাবস্থায়, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মিঃ অং শৈ প্রু চৌধুরী বোমাং রাজা হয়ে সম্প্রতি অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন। [৮৬]

৪.১৩ মঙ রাজ পরিবার

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়িতে মঙ সার্কেলের প্রধান মঙ চীফ বা মঙ রাজার রাজবাড়ি আছে। মঙ রাজপরিবারের সদস্যরাও উপজাতি হিসেবে মারমা উপজাতির লোক। তাদের পরিবারের ইতিহাস নিম্নরূপ-

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বর্মী রাজ বোধপায়ার সেনাবাহিনী যখন আরাকান দখল করে তখন আরাকান থেকে অনেক লোক কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার দক্ষিণাংশের দিকে পালিয়ে আসে। ইংরেজদের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে ঐ সব শরণার্থীর সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। জনশ্রুতি মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সব শরণার্থীরা সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। জনশ্রুতি মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সব শরণার্থীরা এসেছিল তাদের মধ্যে একটি দল জনৈক ম্রাচাই নামক তাদের এক নেতার নেতৃত্বে আরকানের পলৈংখ্যাং নামক নদীর উপত্যকা থেকে এখানে প্রথমে মাতামুহুরী উপত্যকায় আসে। অতঃপর "১৭৮৭ সালে ম্রাচাই এর মৃত্যু হলে তাঁর পৌত্র সাইলেং প্যালেইংসাদের সর্দার হন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অনুগামী ১৮৭ পরিবারের জন্য মোট ১৭৪ টাকা কার্পাস কর প্রদানের শর্তে একটি মহল লাভ করেন। সাইলেং নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র খেদু মহলে পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে প্যালেইংসাদের ধাবেং বা সর্দার হন। তিনি মাতামুহুরী নদী উপত্যাকা ত্যাগ করে তাঁর অনুগ্রামীদের সহ রেগুলেশন এলাকায় সীতাকুণ্ড পাহাড়ে চলে আসেন। সেখানে তিনি তাঁর অনুগামীদের বসবাস করার জন্য একটি কার্পাস মহল লাভ করেন।" (পূর্বোক্ত, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, ১৯৮৪)। খেদুর পুত্র কুঞ্জধামাই (কংজাই?)। "তিনি পরে ক্রমশ পূর্বাভিমুখে সরিয়োছেন। কুঞ্জধামাইর পুত্র ক্যজচাই। । পার্বত্য চট্টগ্রামের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টি.এইচ. লইনের সুপারিশ ক্রমে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশের ৬৫৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে মঙ সার্কেল সৃষ্টি করে তাঁকে মঙ চীফ (মঙ রাজা) করেন। তিনি ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অতঃপর তৎপুত্র নরবদি (হরচন্দ্র) ১৮৮৪ খ্রি পর্যন্ত মঙ সার্কেল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন। তৎপরে তাঁর বড়বোনের ছেলে নেপ্রুসাঁই চৌধুরী ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে তারিখে মঙগ চীফ হিসেবে নিযুক্ত হন (সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, ১৯৮৪)। রাজা নেপ্রুসাঁই চৌধুরী তাঁর মামাতো বোন (নরবদির দুই কন্যা) রাজকুমারী চৌখুই এবং হ্লা ম্রাচুকে

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ করেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী রাণী চৌথুইয়ের গর্ভে রাজকন্যা হ্লানুমা চৌধুরাণী (কিরণশশী) এর জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর রাজকুমারী হ্লানুমা চৌধুরাণী সার্কেল প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁর স্বামী কং হ্লা চাই বান্দারবানের বোমাং রাজপরিবারে সদস্য ছিলেন। মঙ রাণী হ্লানুমার মৃত্যুর পর তাঁরপুত্র মং প্রু সাইনমঙগ সার্কেলের চীফ নিযুক্ত হন। তিনি চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের কন্য রাজকুমারী নীহারবালাকে বিবাহ করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি সপরিবারে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেছেন।

বোমাং সার্কেলের রাজাগণের নামের তালিকা ও সন-তারিখ

বোমাং রাজবংশ পেগুরাজ বংশের উত্তরসুরি ।

বোমাং রাজবংশ তালিকা

হাইসাওয়াদি রাজ্যের রাজধানী পেগুর অধিবাসী: ১৫৩১ খ্রী.হতে শুরু

১. তবাং শোয়েথী ১৫৩১ খ্রী.- ১৫৫০ খ্রী.

২. বরাঙ্ নঙ ১৫৫০ খ্রী.-১৫৮১ খ্রী.- তবাং শোয়েথীর পুত্র।

৩. নাইন্দা বরাঙ ১৫৮১ খ্রী.-১৫৯৯ খ্রী.- বরাঙ্ এর পুত্র।

চট্টগ্রামের অধিবাসী ঃ১৬৪১ খ্রী. হতে শুরু

১. মং চ প্যাই বোমাং ১৬৪১ খ্রী. ১৬৩০ খ্রী.- নাইন্দা বরাঙ্ এর পুত্র।

২. মং গ্রই প্রু বোমাং ১৬৩০ খ্রী.-১৬৬৫ খ্রী.- মং চ প্যাই এর পুত্র।

৩. হেরী প্রু বোমাং ১৬৬৫ খ্রী. -১৬৮৭ খ্রী.- মং গ্রই প্রু এর পুত্র।

৪. হেরী ঞো বোমাংগ্রী ১৬৮৭ খ্রী.-১৭২৭ খ্রী.- হেরী প্রু এর পুত্র।

বান্দরবান এর অধিবাসী ঃ ১৮০৪ খ্রী. হতে শুরু ঃ ব্রিটিশ স্বীকৃতি ১৮২২ খ্রী.

১. কং হ্লা প্রু বোমাংগ্রী ১৭২৭ খ্রী.-১৮১১ খ্রী.- হেরী ঞো এর পুত্র।

২. সাক থাই প্রু বোমাংগ্রী ১৮১১ খ্রী.-১৮৪০ খ্রী.-কং হ্লা প্রু এর পুত্র।

৩. কং হ্লা ঞো বোমাংগ্রী ১৮৪০ খ্রী.-১৮৬৬ খ্রী.-সাক থাই প্রু এর ভ্রাতুস্পুত্র।

৪. মং প্রু বোমাংগ্রী ১৮৬৬ খ্রী. ১৮৭৫ খ্রী.- কং হ্লা ঞো জেঠতুত ভ্রাতা।

৫. সাক হ্লাই ঞো বোমাংগ্রী ১৮৭৫ খ্রী.-১৯০১ খ্রী. মং প্রু এর ভ্রাতা।

৬. চ হ্লা প্রু বোমাংগ্রী ১৯০১ খ্রী.-১৯১৬ খ্রী.সাক হ্লাই ঞো ভ্রাতুস্পুত্র।

৭. মং সো ঞো বোমাংগ্রী ১৯১৬ খ্রী.-১৯২৩ খ্রী.- চ হ্লা প্রু এর জেঠতুত ভ্রাতা।

৮. ক্য জাই প্রু বোমাংগ্রী ১৯২৩ খ্রী.-১৯৩৩ খ্রী.-মং সা ঞো ভ্রাতুস্পুত্র।

৯. ক্য জ সাই বোমাংগ্রী ১৯৩৩ খ্রী.-১৯৫৯ খ্রী.- ক্য জাই প্রু এর পুত্র।

১০. মং শোয়ে প্রু বোমাংগ্রী ১৯৫৯ খ্রী.-হতে অদ্যাবধি-ক্য জ সাই এর ভ্রাতা।

মং শোয়ে প্রু ভূতপূর্ব পেনু রাজকুমার আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের শাসনকর্তাঃ ১৬১৪-১৬৩০ খ্রিঃ)

মেংরাই প্রু বা পালাই প্রু (পুত্র)	শাসনকর্তা	(১৬৩০-১৬৬৫)
হারি প্রু (পুত্র)	শাসনকর্তা	(১৬৬৫-১৬৮৭)
হারিঞো (ভাগিনী)	শাসনকর্তা	(১৬৮৭-১৭২৭)
কংহলা প্রু (পৌত্র)	শাসনকর্তা	(১৭২৭-১৮১৯)
সাথাং প্রু (পুত্র)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৮১৯-১৮৪০)
অং প্রু (ভ্রাতা)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৮৪৬-১৮৬৬)
মং প্রু (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৮৬৬-১৮৭৫)
সানাই ঞো (ভ্রাতা)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৮৭৫-১৯০১)
চোলা প্রু (ভ্রাতুস্পুত্র)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৯০১-১৯১৬)
মং সা ঞো (জেঠতুতো ভাই)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৯১৬-১৯২৩)
কাজেন প্রু (ভ্রাতুস্পুত্র)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৯২৩-১৯৩৩)
ক্যজ সেইং (পুত্র)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৯৩৩-১৯৫৯)
মং শোয়ে প্রু চৌধুরী (ভ্রাতা)	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(১৯৫৯-২০০৩)
অং শো প্রু চৌধুরী	বান্দরবনের বোমাং চিফ	(২০০৩-)

মং সার্কেলের গোত্র প্রধান ও মং চিফদের নামের তালিকা ও সন তারিখ[৮৭]

ম্রাচাই দাহবইং	(১৭৮৫-১৭৮৭)
সাইলেং (পৌত্র)	(১৭৮৭-১৭৯৩)
খেদু (ভ্রাতুস্পুত্র)	(১৭৯৩-১৮০০)
ক্যংজাই (পুত্র)	(১৮০০-১৮২৬)
ক্যজসেঁই (পুত্র)	(১৮২৬-১৮৭০)
নরবদি (পুত্র)	(১৮৭০-১৮৭৯)
ক্যজ প্রু(ভ্রাতা)	(১৮৭৯-১৮৮৩)

নেপ্রু সেঁই (ভাগিনা)	(১৮৮৩-১৯৩৬)
নাইউমা চৌধুরাণী (কন্যা)	(১৯৩৬-১৯৫৩)
মং প্রু সেঁই (পুত্র)	(১৯৫৩-১৯৮৪)
নীহার দেবী (স্ত্রী)	(১৯৮৪-১৯৯১)
পাইলা প্রু চৌধুরী	(১৯৯১-)

৪.১৪ রাখাইন বৌদ্ধ সমাজ

আরাকানের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মঙ্গোলীয় জনসমষ্টি বংশধরগণ যারা পটুয়াখালী জেলার সর্বদক্ষিণাঞ্চল, চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বান্দরবান এলাকায় বাস করে তারা সাধারণত 'মগ' নামে পরিচিত। 'মগ' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ফারসী 'মুঘ' (অর্থাৎ অগ্নি উপাসক) শব্দ থেকে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ, আরাকানের অধিবাসীগণ প্রাচীন কালে সকলেই জড়-উপাসক ছিলেন (কোরেশী মাগন বিরচিত চন্দ্রাবতী, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৬) সতেন্দ্রনাথ ঘোষাল মনে করেন, সংস্কৃত 'মগদু' (জলচর পক্ষী বা জলদস্যু) থেকে 'মগ' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বৃতি পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়, আব্দুল মাবুদ খান) প্রফেসর ডি, জি, ই, হল (D.G.E. Hall) মন্তব্য করেন যে 'মগ' শব্দটি 'মাঙ্গাল' বা মঙ্গোলীয় শব্দের বিকৃতরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরাকানের অধিবাসীদের চেহারাগত দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি মিল লক্ষ্য করা যায়।[৮৮] ড. গ্রীয়াসন উল্লিখিত মত সমর্থন করে বলেন, 'মগ' শব্দটি ইন্দোচীন জনগোষ্ঠী থেকে গৃহীত। কারণ, আরাকানীরা হল ইন্দোচীন জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। সুতরাং আরাকানীরা এবং তাদের বাংলাদেশস্থ বংশধরগণ 'মগ' পদবাচ্য।[৮৯] আবার কেউ কেউ 'মাড' (অর্থাৎ রাজা) শব্দ থেকে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন, অবশ্য এর স্বপক্ষে তাঁরা কোন যুক্তি উপস্থিত করেন নি।

ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, অতি প্রাচীন কাল থেকে মগধ ও আরাকানের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগযোগ বিদ্যমান ছিল। এই সময় হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য বহু ধর্মযাজক আরাকানে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু রাজছত্রছায়ায় একমাত্র বৌদ্ধধর্ম আরাকানে টিকে যায়।[৯০] একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, উত্তর ভারতের একটি ক্ষত্রিয় গোত্র প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে এই গোত্রের কয়েকজন রাজা আরাকানে ব্রহ্মদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পরবর্তীকালে এই গ্রোত্রের কয়েকজন রাজা আরাকানে কয়েক বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। উল্লিখিত কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে নবম

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীর আরাকানের চন্দ্রবংশের রাজন্যবর্গ নিজেদেরকে মগধ বংশীয় বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। চন্দ্রবংশের রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

নবম শতাব্দীতে আরাকানের চন্দ্রবংশের রাজাদের নিজেদেরকে মগধ বংশোদ্ভূত বলে আরাকানের জড়-উপাসক জনগোষ্ঠীর সামনে পরিচয় দেয়া খুব অস্বাভাবিক ছিল না। চন্দ্রবংশের রাজাদের যশ ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমুদয় আরাকানবাসী সাধারণভাবে 'মগ' নামে পরিচিতি লাভ করে। চন্দ্রবংশের রাজারা বৌদ্ধধর্মের পীঠভূমি মগদের সঙ্গে এভাবে যোগসূত্র দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন। চন্দ্রবংশের রাজাদের নজ্যায় পরবর্তীকালে ম্রাউ রাজবংশের (১৪৩৪-১৭৮৪) রাজারাও মগধ বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দেয়া প্রয়োজন মনে করতেন; বাঙলা সাহিত্যে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। উক্ত কাহিনীর সূত্র ধরে পণ্ডিত ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, মগধ (মগধ>মগ্‌হ্>মগ) থেকে মগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হয়েছে আরাকানে 'মগ' নামে কোন জনগোষ্ঠী নেই। 'আরাকানে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর লোক রয়েছে। তন্মধ্যে মঙ্গোলীয়, তিব্বতী, বর্মী, ভারতীয় ও আরবীয় অন্যতম।

পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অনেকেই নিজেকে মারমা (বার্মীজ) নামে পরিচয় দেয়। মারমা শব্দটি (Myamma>Mramma>Marma), মেয়ামা (Myamma) শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। একাদশ শতাব্দীর একটি তলাইং মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, বর্মী জনগোষ্ঠীর জাতীয় নাম হল মেয়ামা। পরবর্তীকালে মেয়ামা শব্দটি বা-মা শব্দে রূপান্তরিত হয়। [৯১] এই বা-মা শব্দ থেকে ব্রহ্মদেশের ইংরেজি নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃত শব্দ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মদেশের নামের উৎপত্তি হয়েছে বলাবাহুল্য, আরাকানের অধিবাসিগণ বর্তমান বর্মী জাতির একটি অংশ। আরাকান ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত একটি প্রদেশ এবং আরাকানের অধিবাসীরা বর্মীদের জাতীয় নাম মেয়ামো দ্বারা পরিচিত।

আরাকানীদের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস ও সংস্কৃতি আছে যা বর্মী ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আরাকানের প্রাচীন নাম হল রাখাইন প্রে। সুতরাং এই সকল যুবক রাখাইন নামে পরিচিত হওয়ার জন্য আগ্রহী। উল্লেখ্য যে রাখাইন শব্দের একটি তাৎপর্যপূর্ণ্য ইতিহাস রয়েছে। পালি শব্দ রকখা হতে রাখাইন শব্দের উৎপত্তি। রাখাইন জাতির উৎপত্তি হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৪১ বছর আগে।

চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র দেশটি পূর্বে আরাকান নামে পরিচিত ছিল না। আরাকানের অধিবাসীগণ তাদের মাতৃভূমিকে রাখাইন প্রে বা রাখাইন পি বলে অবিহিত করে। রাখাইন শব্দটি রখইঙ্গ তঙ্গী বা রখইঙ্গ পি থেকে গৃহীত রখইঙ্গ শব্দ সংস্কৃত রক্ষ এবং পালি সখখো থেকে গৃহীত হয়েছে। রখইন শব্দের অর্থ হল দৈত্য বা রাক্ষস।

কর্নেল আর্থার ফেয়ার বলেন, There is a tribe in Arakan which is known as Rakhain and the people belonging to this tribe feel proud in introducing

Dhaka University Institutional Repository

themselves as Rakhaingyi and their country as Rakhaine. They are supposed to be the aboriginals to the land. Thus the home of Rakhaine tribe was known to be Rakhaing Tonigyi or Rakhaine pyee which are apparently the corrupt forms of Raksa tungya or Raksapura. কর্নেল আর্থার ফেয়ার কিছুদিন পূর্বেও পেগুতে রাখাইন নামে একটি জনগোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছেন। যদিও উক্ত জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন সাদৃশ্য নেই। একথা সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে রাখাইন (Rakhaine> Arkhang>Araccan>Arakan) শব্দ থেকে আধুনিক।

অবশ্য বর্তমানে একটি জনগোষ্ঠী থেকে আর একটি জনগোষ্ঠী পৃথক করা খুবই কঠিন। আরাকান নামের উৎপত্তি হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে আরাকানের কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজেদেরকে 'রায়াইংগ্যা বলে পরিচয় দেয়। ভাষাবিদগণ মন্তব্য করেন যে 'রাখাইন' শব্দ থেকে রোয়াং শব্দটি গৃহীত হয়েছে। রোয়াং একটি তিব্বতী বর্মী শব্দ এবং তার অর্থ হল আরাকান। কালক্রমে রোয়াং শব্দটি রোয়াইংগ্যায় পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেন যে আজও চট্টগ্রাম জেলায় রোয়াং এবং রোয়াইংগ্যা শব্দ দ্বারা যথাক্রমে আরাকান এবং আরাকানের অধিবাসীকে বোঝায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রোয়াং 'রোসাঙ্গ' ও 'রোকাম' প্রভৃতি শব্দগুলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং উক্ত শব্দসমূহ যথাক্রমে আরাকান ও আরাকানের প্রাচীন রাজধানী ম্রোহংকে বোঝা তাতে কোন সন্দেহ নেই। উইলিয়াম হান্টার আরও বলেছেন, "The present Maghs are not the descendants of the early Arakancese pirates. The ancestors of the present Magh people were brought in here by the Company sarkar during the beginning of tghe last quarter of the 18th century from Chittagong and Ramu areas for jungle cutting and reclamation of land." (উদ্ধৃত, আব্দুল মাবুদ খান, পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়) ঐতিহাসিক জি.ই. হার্ভের ভাষায়ও তার সমর্থনপাওয়া যায়ঃ ..In 1789 the British in Bengal were granting Magh familties rich reiceland in Bakergonj-Sunderbans, the southern most Ganges delta; at that time it was uninhabited swamp and forest.. উল্লিখিত আলোচনা এ কথা প্রমাণ করে যে পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ বসতি আরাকানী উপনিবেশ রামু ও কক্সবাজারের লোকজন দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে রামু ও কক্সবাজারের লোকজন দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে রামু ও কক্সবাজারের বসবাসকারী আরাকানজীদের বংশধরগণ নিজেদেরকে রাখাইন নামে পরিচয় দেয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম জেলার প্রধান আরাকানী উপনিবেশ গড়ে উঠে।

আরাকানীরা খুবই কর্মঠ ও পরিশ্রমী। জঙ্গল কেটে বাঘ ও কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে এরা পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণাঞ্চল আবাদ করে। একটি জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, সুইলং চৌধুরী ছিলেন প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

আরাকানী বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে অন্যতম এবং তাঁর পুত্র অংকিউ চৌধুরী খাপড়াভাঙ্গায় প্রথম বসতি স্থাপন করেন। অংকিউ চৌধুরীর পুত্র মারাচা চৌধুরী উক্ত গ্রামে একটি প্যাগোডা নির্মাণ করেন। এই প্যাগোডা খাপভাঙ্গা জেদী নামে আজও পরিচিত। উল্লেখ্য যে খাপড়াভাঙ্গায় বর্তমানে কোন আরাকানী বসতি নেই। এতদসত্ত্বেও আরাকানীরা বর্মী সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। বর্মী ভাষায় লিখিত আওয়া জোঁয়ে রাজওয়ে নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, আরাকানের এই গোলযোগ ও অরাজকতার সময় (১৭৮৫-১৮২৫) ১৫০টি আরাকানী পরিবার ৫০টি নৌকা নিজয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে গলাচিপা থানাধীন রাঙ্গাবালি দ্বীপে উপনীত হয় ও জঙ্গল কেটে উক্ত অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ক্যাপটেন প্যো অং উ গোস্বাগ্রী ও অক্যু সুফক্যু চৌধুরী ছিলেন তাদের সরদার। এই তিনজন আরাকানী সরদারের প্রচেষ্টায় জনমানবহীন অরণ্য ভূমি মনুষ্য বসতির যোগ্য হয়ে উঠে।

সারণি-১

পটুয়াখালীতে বৌদ্ধ জনসংখ্যার তালিকা

বছর	পুরুষ	মহিলা	মোট জনসংখ্যা
১৮৭২	২,১৪০	১,৯০৯	৪,০৪৯
১৯১১	-	-	৮,৬০০
১৯৫১	-	-	১৬,৩৯৪
১৯৬১	৫,৯৩৪	৬,২৫৫	১২,১৯০
১৯৭৪	-	-	কোন উল্লেখ নেই
১৯৭৯	১,৮৮১	১,৮৩২	৩,৭১৩

(সূত্রঃ Census of India: 1872, 1911, Census of Pakistan: 1951, 1961, Census of Bangladesh: 1974, 1979)

বাখেরগঞ্জ সুন্দরবন কলোনিজেশন এলাকায় বৌদ্ধ সমটপ্রদায় উপজাতীয়দের প্রায় ২০০ গ্রাম গড়ে উঠেছিল। সেগুলো প্রত্যেকটি ছিল নিজ হাতে জঙ্গল কেটে আবাদ করা জমির উপর। প্রথম প্রথম জঙ্গল আবাদ করার পর বিনা খাজনার পাঁচ থেকে দশ বছর চাষ করে ফসল ফলাতে পারত। কিন্তু পরবর্তীকালে সিএস সেটেলমেন্ট নামে সার্কেল সেটেলমেন্টে প্রথম দশ বছরের জন্য খাজনা ধার্য করে দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সময়টা কলোনিজেশনের স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হবেনা। কারণ ঐ সময়ে বৌদ্ধ উপজাতি মগ বা রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যেমন, সুদূর বর্মা থেকে কারিগর এনে বর্মার প্যাটার্ন বা নির্মাণ শৈলী অনুযায়ী বৌদ্ধ বিহার, প্যাগোডা, বুদ্ধ মূর্তি ইত্যাদি তৈরি

Dhaka University Institutional Repository

করিয়ে ছিলেন। ঐসব বিহার, প্যাগোডা, বৌদ্ধ মূর্তি তৈরির সময় অন্তত চার পাঁচ বছরব্যাপী পর পর বিরাট ধর্ম সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। ঐ সমল ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরাকান ও ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অংশগ্রহণ করত। নৃত্য ও সঙ্গীত দল এসে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করত। ঐ সকল প্যাগোডা ও বুদ্ধ মূর্তির নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-খাপড়াভাঙ্গা ইউনিয়নে ম্যাচা চৌধুরীর প্যাগোডা, কুয়াকাটার ব্রোঞ্জের শায়িত মূর্তি, মিস্ত্রী পাড়ার পাথরের মূর্তি ও সীমা, তালুকদার পাড়ার প্যাগোডা ও সীমা। অংকুজান পাড়ার শ্বেত পাথরের মূর্তি ও সীমা এবং বর্তমানে তালতলী পাড়ার বড় ব্রোঞ্জের মূর্তি।

১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে খৃষ্ট ধর্ম যাজক Father Manrique আরাকানে উপস্থিত হন এবং অনেক দিন যাবৎ রাজধানী ম্রাউক (Mra-uk-U) এ অবস্থান করেন। তাঁর দিনপঞ্জিকে ভিত্তি করে লেখা Mourice Collies এর The Land of Great Image বইয়ের ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

"The Buddha had died in 543 B.C. Altogether 2173 years had elapsed since then, and for that immense period, the immense period, the image of the Founder of the Religion had remained on sirigutta, the oldest, most mysterious, the most holy object in the world. The relics detailed to the disciples on selagiri had all been found and enshrined Arakan was a sacred country, it was the most notable Buddhist ruler in existence. Grave indeed was his responsibility. He had not only to maintain the state as the homeland of the Arakanese race, but as the one place onthe earth where an authentic shape of the Tathagata was preserved a possession of greater potency than the most precious relics. এবং উক্ত বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে প্রকাশ পায় রাক্ষাইন আভিজাত্য; 'The Capital' (City of Mrauk U) was crowded too, with visitors from the towns and villages and a large number of foreign merchants from thes countries of the Bay Siam, Burma, India and the spice Islands, took the opportuntity of what was expected to be a lievely market and arrived in ships laden with every sort of merchandise, food, medicines scented woods, minerals, silk, carpets, metal work and porcelain. The goods were allowed in duty free.

It should be formed in mind that Mrauk-U though less substantially built was comparable in size and wealth to such western cities as Amsterdam and London. Schonten declares it, the richest city in that part of Asia,

Dhaka University Institutional Repository

exceeding in it sources both Pegue and Ayudhya, and capital of Siam. (বাংলাদেশে উপজাতি: রাক্ষাইন, তাহান, ময়নামতি)

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে রামব্রে (Ramhree) বিভাগীয় শাসনকর্তা মহাসামন্ত (Mahatanmada) উপাধি ধারণ করে রাক্ষাইন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তকখন থেকে রাক্ষাইন জাতির ভাগ্যের পতন ঘটে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বির্মজ রাজা বোদোপ্রা (Bodopra) আরাকান জয় করায় স্থল ওজলপথে রাক্ষাইনগণ বিপুল সংখ্যায় বাংলার বুকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এবং পটুয়াখালী জিলার সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত এই সমুদ্র সৈকতে আশ্রয় নেয়। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ১০ হাজার রাক্ষাইন উদ্বাস্তুদের দ্বারা হারবাঙ্গা (Harbanga) শহর স্থাপিত হয় এবং ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৫০ হাজার রাক্ষাইন উদ্বাস্তু চট্টগ্রাম জিলার বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। Captain Herem Cox দশ হাজারেও অধিক রাক্ষাইন উদ্বাস্তুদের দ্বারা ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কক্সবাজার শহর স্থাপন করেন। তারপ ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন Bo Shan Pyan এর নেতৃত্বে প্রায় ৯০ হাজার রাক্ষাইন একত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম জিলাধীন রাক্ষাইন অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়ে আরাকান রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য বর্মিজদের বিরুদ্ধে বারংবার বহু বৎসর যাবৎ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন Bo Shan Pyan এর মৃত্যুর পর তার অধিকাংশ জনগণ রামু, হারবাঙ্গ, কক্সবাজার, মহেশখালী এবং টেকনাফের বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। পটুয়াখালী জিলার রাক্ষাইন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত দলের ১. ক্যাপ্টেন প্যোঅং, ২. উঃ গোম্বগ্রী এবং ৩. অক্যো চৌধুরী-এই তিনজন প্রধানের অগাধ আত্মনির্ভরশীলতায় এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জনমানবহীন হিংস্র প্রাকৃতিক অরণ্যভূমি আবাদি ভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এভাবে রাক্ষাইনগণ বাঙাবালী দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে তারা নতুন ভূমির অন্বেষণে সর্বপ্রথম উপস্থিত হন গলাচিপা থানাধীন নৌডুবীতে। রাঙাবালী হতে নৌডুবি সর্ববিষয়ে উত্তম হেতু তারা রাঙাবালীকে চিরতরে ছেড়ে মৌডুবিতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে তাদের বসতি আরও বিস্তার লাভ করে এবং বালিতাতলী (বরগুণা থানা), বগী (আমতলী থানা), টিয়াখালী (কলাপাড়া থানা) এবং কুয়াকাটা (কলাপাড়া থানা) অঞ্চলসমূহ রাক্ষাইন সমাজ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের এক হিসাবে পটুয়াখালী জিলার রাক্ষাইন সংখ্যা প্রায় ২৫ (পঁচিশ) হাজার এবং পাড়ার সংখ্যা ২২০ টি ছিল। পটুয়াখালী জিলার এই এলাকাসমূহ রাক্ষাইনগণের আবির্ভাবের পূর্বে জনমানবহীন ও হিংস্র জীবজন্তুতেপূর্ণ অরণ্যভূমি ছিল।

৪.১৫ রাখাইন ইতিহাসে ঐতিহাসিক পর্বের উল্লেখ্যযোগ্য যুগসমূহের বৈশিষ্ট্যতা

প্রথম ধান্যবর্তী যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩২৫ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০): জনৈক সন্যাসী অর্জুনের পুত্র মারায়ু এ যুগের নির্মাতা এবং তার ৫৪ জন উত্তরসূরি বংশ পরম্পরায় আরকানকে শাসন করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ধান্যবর্তী যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০-খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮০): প্রতিষ্ঠাতা কেঙ রাজাগ্রী এবং তাঁর পরবর্তীতে ২৮ জন উত্তরসূরি আরাকানে শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

তৃতীয় ধান্যবর্তী যুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮০-খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০): প্রতিষ্ঠাতা চান্দা সূরীয় রাজা এবং তাঁর ৪০ জন উত্তরসূরি আরাকানের অধিপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ যুগের উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো রাজা চান্দা সূরীয়ার শাসনামলে মহামতি গৌতম বুদ্ধ স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে সমস্ত আরাকানবাসীকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন।

বৈশালী নগর (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০-৯৬৪): প্রতিষ্ঠাতা ধন চন্দ্র রাজা এবং তাঁর ২২ জন উত্তরসূরি রাজন্য আরাকানের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ যুগ থেকে আরাকান একটি সাম্রাজ্য হিসেবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। শিল্প, সাহিত্য চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতিতেও এ কালের আরাকান বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ম্রাউক উ যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ৯৬৪-১০১৮): প্রতিষ্ঠাতা ম্রো রাজা এবং মোট ২ জন শাসক এ যুগের আরাকান অধিপতি হিসেবে শাসন করেন।

লে ম্রো যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ১০১৮-১৪০৬): এ যুগের প্রথম দিকে আরাকান একটি অতি সুসংহত ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ক্ষমতার লড়াই ইত্যাদির কারণে ক্রমশ একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের শাসক মাঙ চ মোয়েন বর্মীদের হাতে রাজ্য হারিয়ে গৌড়ের নির্বাসন গ্রহণে বাধ্য হয়।

ম্রাউক উ প্রথম স্বর্ণালী যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ১৪০৬-১৫৩১): প্রতিষ্ঠাতা মাঙ চ মোয়েন এবং তাঁর ১১ জন উত্তরসূরি আরাকানের শাসক হিসেবে শাসন করার পাশাপাশি রাজ্য বিস্তারেরও বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। ম্রাউক উ দ্বিতীয় স্বর্ণালী যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ১৫৩১-১৬৩৮): প্রতিষ্ঠাতা মাঙ বাগ্রী এবং তাঁর পরবর্তী ৮ জন রাজন্য আরাকানের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। এ যুগের শাসকগণ সমর কুশলতায় স্বীয় সাম্রাজ্যকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় এবং প্রজার সেবায় দেশবাসীর নিকট আস্থাভাজন হতে, বিভিন্ন উপলক্ষে স্মারক নিদর্শন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করে ধর্ম ভীরু এবং সু-শাসক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। অন্যদিকে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও খুবই বিকাশ লাভ করে। [ম্রাউক তৃতীয় যুগ (খ্রিষ্টাব্দ ১৬৩৮-১৭৮৪): প্রতিষ্ঠাতা ঙাকুছালা (নরপতি) এবং তাঁর পরবর্তী ২৭ জন রাজন্য আরাকানের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। পারস্পরিক অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্র আর ক্ষমতা লড়াইয়ের কারণে এ সময়ে আরাকানের চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।[৮৩] ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে (রাখাইন ১১৪৬ অব্দে টৈনছুং মুং লাছোৎ ৯ তারিখ) সদ্য স্বাধীনতা লুপ্ত আরাকানের ছেংডোয়ে, রেমেব্রে, মেং অং অঞ্চলসমূহ হতে ১২০টি পরিবার ৫৬টি নৌযান যোগে পিতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে চলে যায়। অকুল সমুদ্র পথে ১১ দিন চলার পর তারা বাখেরগঞ্জ অঞ্চলে রাঙ্গাবালী দ্বীপে অবতরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দশ সহস্রাধিক রাখাইন চট্টগ্রামের চকরিয়ার হারবাং অঞ্চলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের পূর্ণিমার রাতে (বুধবার) নব্বই হাজারাধিক রাখাইনকে নিয়ে রাখাইন বিপ্লবী নেতা বোশাং ব্যেন (কিং বেরিং) চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে আসেন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে রামু শহরে ব্রিটিশ কোম্পানী সরকারের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন ফ্গো তাঁর প্রতিবেদনে রামুর পার্শ্ববর্তী ১২ মাইলের ভিতর লক্ষাধিক রাখাইন উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে (রাখাইন ১১৯২ অব্দ) ডিসেম্বর মাসে ৭৪ টি পরিবারের মোট পাঁচ শতাধিক সদস্য বাখেরগঞ্জ অঞ্চলের বালিয়াতলী চলে আসে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে আরও ৬০টি পরিবারের তিন শতাধিক সদস্য আরাকানের ধান্যবতী হতে বাখেরগঞ্জ এলাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ছাড়াও ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের আকাশ থেকে স্বাধীনতার সূর্য লুপ্ত হয়ে যাবার পর দখলদার বর্মী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন, হত্যা ও আটক করে বর্মায় নিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় দু'লক্ষেরও অধিক রাখাইন ভারতের ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্যে চলে যায়।

৪.১৬ রাখাইনদের প্রাচীন ইতিহাস মূল্যায়ন

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব কোণে কক্সবাজার জেলাএবংদক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ এলাকায় পটুয়াখালি ও বরগুণা জেলায় রাখাইনরা বাস করে। "রক্ষণ হতে রাখাইন শব্দের উৎপত্তি। রাখাই শব্দের উৎপত্তি।' রাখাইনরা ধর্ম, ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে এসেছে বলে তাদের নাম রাখাইন হয়েছে। (উ ক্য থিন, রাখাইনদের জন্ম ও জন্মোৎসব, মংছেল চীং (সম্পা)ঃ রাখাইন, ১৯৮১, কক্সবাজার)

বাংলাদেশের উক্ত জেলাগুলোর বাইরে ও রাখাইনারা মায়ানমার বা বার্মার আরাকান অঞ্চলে বাস করে। তারা আরাকানকে রাখাইন প্রে (Rakhine Prey) বলে। অতীতে "একে তার অধিবাসীদের কর্তৃক রাখাইন ভূমি বলা হতো"।[১৪] এখানে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উপকূলীয় শহর কক্সবাজারের বেড়াতে গেলে যে কারো সহজেই রাখাইনদের, জনপদ, বৌদ্ধবিহার (ক্যাং), চৈত্য (জাদী), মার্কেট চোখে পড়বে। তারা এ জেলায় রামু (প্যাওয়া), হারবাং, চকরিয়া, হুগলী, টেকনাফ এবং মহেশখালী (রাখাইনদের ভাষায় মাহাচু) দ্বীপে ও বাস করে। (পূর্বোক্ত, বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, পৃষ্ঠা-৮৬)

তারা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও গলাচিপা থানায় এবং বরগুণা জেলার বরগুণা ও তালতলী থানায় বাস করে। এখন অনেক পর্যটক মাঝে মাঝে পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণাংশে সমুদ্র উপকূলে কুয়াকাটা বেড়াতে যায়। আর তারা সেখানে গেলে সহজেই সেখানকার

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি তাদেরকে আকর্ষণ করে। তাদের সংস্কৃতি সৌন্দর্য ও বর্ণাঢ্যতার কারণ হলো সুদূর অতীত থেকে তারা তাদের সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল।

মং উশান (১৯৮৭) লিখেছেন যে, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ঐ বছর পটুয়াখালি ও বরগুনায় রাখাইনদের জনসংখ্যা ৩৭১৩ জন ছিল। তবে কক্সবাজার জেলায় রাখাইনদের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এ যাবত পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও এর কয়েকগুণ হবে। সংখ্যাটি উর্ধ্বে নয়। কক্সবাজার জেলার রাখাইনদেরকে প্রচলিত অনেক বৌদ্ধ হিসেবে গন্য করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে আবার বিভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং এদের মধ্যে থেকে রাখাইনদের সংখ্যা নির্দেশ করা সহজ নয়।

আরাকানী কিংবদন্তী অনুসরণ করে Sir.A.P. Phayre লিখেছেন,---"প্রথম দিকের রাজারা বারানসীতে রাজত্ব করতেন এবং তাদের কোন এক পুত্রকে আরাকানের শাসনভার দেওয়া হতো, তিনি রামায়তী নগরে (সান্দাওয়ে বা চন্দ্রদ্বীপের নিকটর্তী রার্মব্যি বা রামরি দ্বীপে) রাজত্ব করতেন।"[৯৫] তৎপরবর্তী রাজাদের মধ্যে কপিলাবস্তু নগর থেকে সন্যাসী বেশে কোলাদাইন নদী তীরে আগত (আজুনা রাজার ঔরসে ও ইন্দামারুর গর্ভজাত সন্তান) রাজা মারায়ো (Marayo) এক নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে এর নাম ধান্যওয়াদী বা ধিন্যাওয়াদী (ধন্যবতী) রাখেন; এই নামে অতীতে আরাকান পরিচিত হয়েছিল। (Ibid, History of Burma, P. 43) রাজা মারায়োর অনেক অনেক পরে উত্তর বার্মার প্রাচীন তগং থেকে শাক্যবংশীয় আভিরাজার বড় ছেলে কানরাজাগিয্য উত্তর আরাকানের ক্যকপানদং পর্বত হয়ে আরাকানে প্রবেশ করে মারোয়া বংশের দুজন রাজকন্যা বিয়ে করে রাজত্ব করেন। স্যার এ.পি. ফেইরী লিখেছেন, "১৪৬ খ্রিস্টাব্দে চান্দাসুরিয়া (চন্দ্রসূর্য) নামে একজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজত্বকালে (আরাকানের বিখ্যাত মহামুনি নামক বুদ্ধমূর্তিটি করা হয়েছি।"

এ বিষয়ে ডি. জি.ই হল লিখেছেন, "উৎকীর্ণ লিপি থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি চন্দ্রবংশের নাম জানা যায়। এর রাজধানীর নাম (ওয়েথলী) ভারতের বৈশালী নগরের নামানুসারে করা হয়েছিল এবং এই বংশের তেরজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে হয়"।[৯৬] স্যার এ.পি.ফেইরী ওয়েথালী (Wethali) নগরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রাজা মহাতইং চন্দ্র (৭৮৮-৮১০ খ্রিস্টাব্দ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

আরাকান রাজা সুলতইং চন্দ্র ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে চট্রগ্রাম জয় করে সেখানে 'চিৎ-তঃ-গং' (Tsit-ta-gaung) নামে একটি শিলালিপি স্থাপন করেন; আপাতদৃষ্টিতে এ থেকে চট্রগ্রাম শহরের নামটি এসেছেবলে মনে করা হয়। (চিটাগাং ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ১৯৭৫) । ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাটির উল্লেখের কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের এই পূর্বাঞ্চলটি আরাকানীদের কাছে পরিচিত ছিল। এ বিষয়ে উল্লেখ যে, কেউ কেউ পূর্ববঙ্গের (সমতটের) চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সাথে আরাকানের (ওয়েথালীর) চন্দ্রবংশীয় রাজাদের নামের মধ্যে চন্দ্র শব্দের ব্যবহার এবং তাদের

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রাগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে উভয় রাজবংশের মধ্যে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। চন্দ্রবংশের পরবর্তী কালে শান, বর্মী ও মনদের আরাকানে বেশ কয়েক বছর অরাজকতার পর তা বার্মার .পগা সাম্রাজ্যের সম্রাট আনোয়ারাথ (Anawratha 1044-77 খিস্ট্রাব্দ)-এর অধীনস্থ হয়। (দ্বাদশ শতাব্দীতে ১১০২-০৩ খ্রিস্ট্রাব্দ?) লেত্যামেংনান নামে একজন আরাকানী রাজা পুনরায় তৎকালীন বর্মী সম্রাটের (ক্যানজিথা-এর) সহায়তায় আরাকানের রাজা হয়ে তার রাজধানী প্যারিন (Parin) এ স্থানান্তর করেন। একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, রাজ লেত্যামেংনান ১১০২ খিস্ট্রাব্দ বৌদ্ধজগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেন্দ্র গয়ারিত বোধিগয়া বিহারের সংস্কার সাধনে অবদান রেখেছিলেন। জনাব এ.কে.এম.শামসুল ইসলাম (১৯৮২) লিখেছেন যে, "হরিকেলদেব রণবঙ্কমল্লদেবের শ্রী ধাদিয়েরা (Sir Dhadi-eba) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ বর্মী কর্মকর্তা পাট্রিকেরা শহরে (ময়নামতীতে?) ১১২০ খিস্ট্রাব্দে একটি বৌদ্ধবিহারকে ভূমি দান করেন।" চতুর্দশ শতাব্দীতে আরাকানী রাজা মাঙথি (মেঙদি ১২৭৯-১৩৭৪) খিস্ট্রাব্দে আরাকানী উত্তর দিকে অভিযান চালায় এবং মহেশখালী দ্বীপে অবস্থান গ্রহণ করে (Ibid, D.G.E. Hall, 1985.P.412) । পরবর্তীকালে বর্মীরা পুনরায় আরাকান দখল করে । তখন আরাকানী রাজা নরমিখলা (Narameikhla) ভয়ে 'পুরতন' (সুলতান-এর শাসিত রাজ্য গৌড়?) এ পালিয়ে যান এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি গৌড়ের সুলতান নাজির শাহ্ (Nazir Shah) এর সাহায্যে ১৪৩০ খিস্ট্রাব্দে পুনরায় আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করতে সক্ষম হন এবং ম্রাউকউ নামক স্থানে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন । এটিই পরবর্তীকালে ম্রোহং (প্রাচীন শহর নামে পরিচিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর তার ভাই রাওখারি ১৪৩৪ খিস্ট্রাব্দে আরাকানের রাজা হয়ে 'আলী খান' উপাধি গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরাকানে একজন শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব ঘটে। তার নাম মঙবাগ্রি (Minbin or Mengbeng 1531-53)। তার আমলে উত্তর দিকে অভিযান প্রেরিত হয়। জলে ও স্থলে আরাকানী বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয় এবং শঙ্খনদীর মোহনার সন্নিকটে নৌযুদ্ধে (১৫৪০ খ্রীস্ট্রাব্দের প্রথম দিকে?) আরাকানী ইতিহাস গ্রন্থগুলোর মতে তলুখ্যং (খাল) এর অনতীদূরে;তলু নদী শঙ্খের উপনদী হওয়ায় শঙ্খের মোহনায় বা তৎসন্নিকটের যুদ্ধে) পর্তুগীজ ও সুলেইমান বাইশিয়ার নৌবাহিনীকে পরাজিত করার পর চট্রগ্রাম অধিকার করে।

চট্টগ্রামের উপর রাজা মঙবাগ্রি বা মেঙবেঙের অধিকারের কথা একটি রৌপ্যপাতে উৎকীর্ণ লিপি থেকে ও জানা যায়। [৯৭] উল্লেখ্য যে, মঙবাগ্রি এতদঞ্চলে ভ্রমণের মসয় প্যাওয়াম্রো (রামু শহর), দংব্যাং গতপালং (উখিয়া উপজেলা কুতুপালং) ইত্যাদি এলাকায় রাখাইদের বসতিগুলো সফর করেছিলেন। তিনি আরাকাানের সেনাবাহিনীতে পর্তুগীজদেরকে চাকরি দিয়ে অন্তভুক্ত করেন। তার আমলে বঙ্গোপসাগরের আরাকানী নৌবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করে। তবে তার এক শতাব্দীতে

Dhaka University Institutional Repository

অধিক সমকয়কাল পরে অরাকানী রাজা মাঙরাজাগ্রি (১৫৯৩-১৬১২) খিস্ট্রাব্দেএর আমলে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকানী নৌবাহিনী তৌঙুর বাহিনীর সাথে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ বার্মার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য পেগু (Pegu) দখল করেছিল। ১৬১২ খিস্ট্রাব্দে গেরার্ড মার্কেটের বেঙ্গলা (Bengla) নামক যে মানচিত্র আকেন তাতে গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরভূমির উপর এবং পেগুর উপর আরাকান (অৎধপধহ) শব্দটি পাওয়া যায়। তৎপরবর্তী আরাকানী রাজ মেঙখামং (Minikhamaung 1612-21 খিস্ট্রাব্দে) এর রাজত্বকালে "একসময় আরাকান (এতদঞ্চলের) নোয়াখালি ও বাখেরগ জেলা এবং সুন্দরবন বদ্বীপের অংশবিশেষ তার অধিকার রেখেছিল। মুখ্যত (এর উদ্দেশ্য ছিল) ক্রীতদাস সংগ্রভিযান এবং এর মাত্রা এক পর্যায়ে এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ঢাকা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এরং ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে (ঢাকা শহর) স্বল্পকালের জন্য অধিকারভূক্ত হয়" । বাঙালিরা আরাকানীদেরকে 'মগ' বা 'মঘ' বলে। ঢাকা শহরের মগবাজারা এখন ও সেখানে আরাকানীদের উপস্থিতির স্মৃতি হয়ে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সপ্তদশ শতাব্দীর সময় আরাকান রাজসভার দৌলত কাজী তার রচিত সতীময়না কাব্যে আরাকানের রাজবংশকে 'মগধ বংশ' বলে প্রশংসা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরাকান দুর্বল হতে শুরু করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে তার পতন চূড়ান্ত হয়।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বর্মরাজা বোধপ্রা (বোধপায়া)-এর পুত্রদের নেতৃত্ব বর্মীবাহিনী আরাকান অধিকার করে। ঐ সময় হাজার হাজার শরণার্থী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর পটুয়াখালিতে পাড়ি জমায় । তাহান (১৯৯৫) তার লিখিত "বরিশালের আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, "বিগত ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাখাইন জাতির স্বাধীনতা অস্তমিত হয়ে বর্মীদের বর্বর সামন্ত আধিপত্যবাদের নির্মম নিধনক্ষেত্রে (রূপান্তরিত হয়)। রাখাইনদের পৈতৃক ভূমি আরাকান ভূখন্ডটি কুরুক্ষেত্র পরিণত হলে স্বাধীনচেতা কতিপয় পদস্থ রাখাইন রাজকর্মচারীদের নেতৃত্ব একশত পঞ্চাশটি রাখাইন পরিবার সমুদ্র পথে পাড়ি দিয়ে বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বাখেরগঞ্জ জেলার সর্বদক্ষিণ সমুদ্র সৈকতবেষ্টিত জনবসতিহীন বন্য অরণ্যময় দ্বীপাঞ্চল উপকূলীয় এলাকায় আশ্রয় নেয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতি বিস্তৃত হয়ে তৎকালীন বাখেরগঞ্জ (বরিশাল প্রশাসনিক) জেলাধীন গলাচিপা, কলাপাড়া, আমতলা ও বরগুনা এ চারটি থানায় রাখাইনদের বিস্তার লাভ করে। " এ বিষয়ে জনাব মুস্তাফা মজিদ লিখেছেন,---"হার্ভে উল্লেখ করেন, '১৭৮৯ সালে বাংলায় ব্রিটিশরা মগ পরিবারদের সর্বদক্ষিণ গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাখেরগঞ্জের সুন্দরবন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধানী জমি দান করেছিলেন । তখন তা (বাখেরগঞ্জ) ছিল জনবসতিহীন জলা ও বন।" তৎপরবর্তী কালের রাখাইনদের সম্পর্কে ইংরেজদের রেকর্ডপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে আগত শরণার্থীদের সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকে রোগে, শোকে ও খাদ্যাভাবে মারা গিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এসময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্যাপ্টেন হিরাম কক্সকে তাদের সাহায্যে পাঠান; এখন ও তার নামে কক্সবাজার শহরটি রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরাকানী নেতারা দলবল নৌযান সহ কক্সবাজার জেলার হারবাং এসে উপস্থিত হন। আরাকানী নেতা চিনবিয়ান ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে গিয়ে আরাকানে রাজধানী ব্যতীত আরাকানের অধিকাংশ অঞ্চল করেন। তবে ঐ বছর জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের পরবর্তীকাল থেকে তার অভিযান ব্যর্থ হতে থাকে। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তা থেমে যায়। উল্লেখ্য এ সময়ে চিনবিয়ান কিছু সময় (১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে) পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে ও আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ আশ্রয় লাভের আশায় ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেলের নিকট একটি পত্র প্রেরন করেছিলেন। চিনবিয়ান অসুস্থ অবস্থায় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ শে জানুয়ারী তারিখ পোলং চরালের পাহাড়ী এলাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতঃপর রাখাইন নেতারা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার পর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ও দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে রাখাইনদের ছড়িয়ে পড়ার মোটামুটি এই হলো সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বর্তমানে কক্সবাজার শহরেই তাদের সংস্কৃতির উৎকর্ষতা ও ঔজ্জ্বল্য সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। কক্সবাজারের রাখাইন নাম অখ্যেছা ম্রো (ফালং ক্ষিম্রো) 'অখ্যেছা অর্থ শক্তি ও প্রগতি। বাংলাদেশের বর্তমান মারমা রাখাইন নামক বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তভূক্ত। এই জনগোষ্ঠী সাধারণত মিয়ানমার, দক্ষিণপূর্ব, এশিয়া, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। মিয়ানমার ও আরকান অঞ্চলের এই জনগোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং তাদের বাংলাদেশস্থ বংশধরগণ সাধারণভাবে বাঙালি ও ইউরোপীয়ানদের নিকট' মগ নামে পরিচিত । 'মগ' শব্দের উৎপত্তি নিয়ে পন্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ফারসী 'মুখ' (অগ্নি উপাসক) থেকে মগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ আরকানের অধিবাসীগণ প্রাচীনকালে জড় ভড় উপাসক ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মনে করেন সংস্কৃতি 'সগদু' (জলচর পক্ষি বা জল দস্যু) থেকে মগ শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক ডি. জি. ই হল মনে করেন মগ শব্দটি 'মঙ্গাল' বা 'মঙ্গোলীয়' শব্দের বিকৃতরূপ, কেননা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আরকান অধিবাসীদের চেহারাগত অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ড. গ্রীয়ারসেন উক্ত মত সমর্থন করে বলেন, মগ শব্দটি ইন্দোচীন জনগোষ্ঠী থেকে এবং আরকানীর হচ্ছে এই জনগোষ্ঠীর একটি শাখ। আবার কেউ কেউ 'মাঙ' (রাজ) শব্দ থেকে মগ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। অবশ্য এর স্বপক্ষে তারা কোনো যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন নি।

সপ্তদশ শতকের পর্যটকদের বিবরণী পাঠে জানা যায় ১৪৩৩ থেকে খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ম্রোহ বা মাউক (পাথর কিল্লা) ছিল আরাকান রাজ্যের রাজধানী । এই মোহঙ বর্তমানে সিটওয়ে বা আকিয়াব জেলায় অবস্থিত। বাঙালির এখানকার অধিবাসীগণকে মগ বলে। কর্ণেল

Dhaka University Institutional Repository

ফেয়ার মনে করেন, এই শব্দটি মগধ শব্দের অপভ্রংশ । আরকানবাসীগণ মগধ থেকে প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী বলে তারা মগ বাচা।

বাংলাদেশের রাখাইনরা আরাকান থেকে আগত আদি অধিবাসী। মায়ানমার(বার্মা) আরাকান থেকে তাদের আগমন ঘটে। সে অর্থে তারা আরাকানী। আরাকান চট্টগ্রামে দক্ষিণে একটি দেশ। আরাকান (বাংলায়), রাখাইন (আরকানীতে), রেংগ, রোয়াং, রোসাওন, রোহাওন, রুংগ, রাং, এয়াহকিন (বার্মিজ এ) [৯৮] আরাকান বর্তমানে মায়ানমার প্রজাতন্ত্রের একটি প্রাদেশিক রাজ্য হলেও আরাকান এক সময় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল। ১৭৮৪ সালে বর্মীরাজ বোদাপায়া আরাকান রাজা থামাদাকে পরাজিত করে স্বাধীন আরাকান ভূমি দখল করে নেয়। এই সময় বিপুল সংখ্যক আরাকানী শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়। আরাকানের অধিবাসীরা বাংলদেশে নিজেদের আরাকানী না বলে রাখাইন পরিচয় দিয়ে থাকে। আরাকানের প্রাচীন নাম রাখাইন প্রে এবং আরাকানের অধিবাসীরা নিজেদের রক্ষণশীল জাতি মনে করে। সে অর্থে রাখাইন হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি। তাই ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতদের মতে, রাখাইন > রাখাইং > রাখাইন শব্দের উৎস ও উৎপত্তি। (আদিবাসী *রাখাইন*, মুস্তাফা মজিদ (সম্পাদক), দেশ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠ-ভূমিকা) রাখাইনগণ নিজেদেকে রক্ষণশীল জাতি এবং রাকাইন বা রাখাইন বলে আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে। রাক্ষাইন জাতির রয়েছে কয়েক হাজর বছরের সভ্যতার ইতিহাস ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্য। রাখাইনরা অদিকাল থেকেই শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে এক সুসমৃদ্ধ জাতি। রাখাইনদের অতীত ইতিহাস আজ অনেকের কাছে অজানা।

চট্টগ্রামে ভ্রমণ বিবরণে ফ্রান্সিস বুখানন বলেছেন, বার্মিজরা আরাকানীদের দেশ দখল করলে ১৭৮৫ সালে আরাকানের উদ্বাস্তরা চট্টগ্রামে চলে আসে। রাখাইন, মারমা ও মগ এ তিনটি শব্দ বা জাতিসত্তা সম্পর্কে এখনো পণ্ডিত, গবেষক ও ঐতিহাসিক মহলে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার শেষ নেই। কেউ কেউ বলেন পৃথক পৃথক জাতিসত্তা আবার কারো মতে, একই জাতিসত্তা। "রাখাইন ও মারমা একই নৃগোষ্ঠির আর্য ও মঙ্গোলীয় সংমিশ্রাণ জাতি। ভাষা, বর্ণমালা, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনাচারের মধ্যে অজস্র মিল ও সাদৃশ্য থাকার কারনে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরুহ ব্যাপার। রাখাইনদের ইতিহাস ঘটনাবহুল ও বিস্তৃত। সাধারণত মারমারা বান্দরবান ও মানিকছড়িতে যথাক্রমে বোমাং বা প্রুরাজা এবং মানরাজা এর অধীনে একজাতি পরিচয়ে বাস করছে। তাদের পূর্ব পুরুষরা অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। প্রবন্ধ: মনিরুজ্জামান, প্রান্তিক সীমায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ভাষার অবস্থান ও সংযোগ প্রকৃতি: রাখাইন প্রসঙ্গ)

ইউরোপীয় পর্যটক ফ্রান্সিস বুখানন তাঁর দক্ষিণপূর্ব বাংলায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রামের পূর্বে উচু পাহাড়ে জুমা মগদের সর্দার কাউং-লা-পরুর দেশ। তাঁর কর্তৃত্বাধীন উপজাতিদের বাঙালিরা জম্মা বলে ডাকে। এই উপজাতি চল্লিশ বছর পূর্বে রোসাঙ বা আরাকান

Dhaka University Institutional Repository

থেকে এখানে এসেছে। এই জুম্মারা কোম্পানির করদ প্রজা এবং এরা চাকমা থেকে ভিন্ন; চাকমারা তাউব বুকা রাজার অধীন (চাকমা সর্দার)।[১১] তিনি লিখেছেন, চুনতী ও হারবাং পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমিতে রোমাং, রোহান, রোআং, রেনগ অথবা রাংদের অধিবাস; বাঙালিরা আরাকানদের এইসব নামেই ডাকে। (প্রাগুক্ত, দক্ষিণ পূর্ববাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, পৃষ্ঠা-৬২) তিনি চকরিয়ার মাতামহুরীর তীরের সমতল ভূমিতে এবং পার্শ্ববর্তী চকরিয়ার প্রধান জায়গা দো দোস্তি খানের হাটে আরাকানীদের বসবাড়ী দেখেছেন। এরা বাঙালির নিকট ঝুমিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু তারা রোয়াসা'র (ই-ওয়াথা, মামার স্থানীয় প্রধান) নেতৃত্বাধীন এবং কাউং-লা-পরুর নিকট পরাধীন ছিল। তারা মাতামহুরীর তীরে পূর্ব পাহাড়ে পর্বতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের জাতির নাম মা-রা-মা-গ্রি। এই পাহাড়ে প্রধানত ঝুমিয়া ও মুরংদের বসবাস। ঝুমিয়া সর্দারদের প্রধান উপাধি পো-মাংগ-গ্রি অর্থাৎ মহান নেতা।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ অধিকারের পরে 'বুমংর্সদার' আরাকানী পু-মিং-গি এবং ইংরেজীতে পোয়াং হিসেবে এ উপাধি চালু থাকে। তিনি কক্সবাজারের ঈদগাঁও, ভুজকূল বা জোয়ারিয়া, রামু, মহেশখালীতে রাখাইন পল্লী নিবাস দেখেন। নদীর তীরে বসবাসকারী লোকদের জীবননির্বাহ হয় মাছ ধরা, শুটকি তৈরি, নৌকা তৈরি, মাদুর তৈরি, বাঁশ কাটা, বুটে মাঝির কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে। ইতিহাস মতে মারমা ও রাখাইনদের আদি মূল এক। কিন্তু আসলে পুরোটা এক নয়। পটুয়াখালীর যে অংশের রাখাইনের সাথে কক্সবাজার ও রামু অঞ্চলের রাখাইনদের মিল পাওয়া যায়; শুধুমাত্র তাদের ইতিহাস এক ও অভিন্ন হওয়া সম্ভব। এ অঞ্চলের সপ্তদশ শতকের প্রধান ছিলেন কাউঙ-লা পরুর করদ প্রজা অধিকাংশ আরাকান থেকে আগত। আবার মানিকছড়ি ও বান্দরবানের মারমাদের ব্যবহৃত ভাষা রূপে যথেষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য আছে। রাখাইন ও মারমারা র‍্যামর‍্য ও মারৌও উপভাষায় কথা বলে। ধারণা করা হয় তারা মঙ্গোলীয় কোন উপভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। রাখাইন ও মারমা সম্প্রদায়ে ইতিহাস, ঐতিহ্য সংস্কৃতি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, জীবনাচার ও ভাষা নিয়ে জনাব আবদুস সাত্তার, ইতিহাসবিদ ড. আবদুল মাবুদ খান, ড. মুস্তাফা মজিদ, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, তাহান, মং বা অং আবদুল হক চৌধুরী, জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, সুগত চাকমা, ক্যথিং অং মং বা অং চেং থঁয়ে অং প্রমূখ গবেষণা করে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ রাখাইন বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়োশন, বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, কক্সবাজর রাখাইন বুডিডস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন, পটুয়াখালীর রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (The word) এর পরিচালক উ সিট মং, রাখাইন নারী নেত্রী রোজালিন, এথিন রাখাইন রাখাইনদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য 'মাইনরিটি সেল' নামে একটি সেল গঠন করেছেন। জাতির উন্নয়ন, শান্তি-শৃংখলা, সংস্কৃতি বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ সালে

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখলীতে ১১ টি প্রকল্প (৫.৫৫. ৯১৭ টাকা) এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে তালতলীতে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিকাশে কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। [১০০]

৪.১৭ রাখাইনদের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালিরা ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রায় সকল পরিচিত জাতিগোষ্ঠি, প্রধানত নিষাদ-ভেডিডড. মঙ্গোলীয়, অর্থে, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়ীয় প্রভৃতির মহামিশ্রণজাত একটি সঙ্কর জাতি হলেও তাদের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে এদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করছে রাখাইনদের মত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি (Micro-races)। [১০১] আদি মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠির রক্ষণশীল জাতি হিসেবে রাখাইনদের রয়েছে দীর্ঘ ছয় হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস। যে কারণে তারা মূল ভূ-খন্ডের আদি অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও মূলস্রোত বাঙালি জাতি হতে ক্রম বিচ্ছিন্নতার প্রবাহে বাহিত এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়েছে। তাদের ক্ষোভ ও অভিমান এক সময় তাদেরই পূর্বপুরুষদের হাতে গড়া জনপদে বাঙালিদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও কূটকৌশলে তাদের ভূমি গ্রাস। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে রাখাইনরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠিভূক্ত জনজাতি। ভাষাতাত্ত্বিক গ্রীয়ারসনের মতে, ভোট-বর্মী বা ভোট-চীনা। মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠি ছড়িয়ে আছে, তিব্বত, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া. কোরিয়া, চীন, জাপান, ইন্দোচীন, সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। বাংলাদেশের পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতিগণ সকলেই মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত।

মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠির (Mongoloid) দৈহিক গঠন বৈশিষ্ট্যগুলো চুল খাড়া. সোজা এবং কালো, মাথার আকার গোল, নাক মাঝারি ও চ্যাপটা, চোখের উপরের পল্লব ঝুলে থাকে সামনের দিকে, চোখের পাতায় থাকে ভাঁজ (Epicanthic Fold)। নাকের গোড়া অক্ষিকোটর থেকে যথেষ্ট উন্নত নয়, কপোলতলের হাড় প্রশস্ত ও উন্নত। এদের দাঁড়ি, গোঁফ থাকে কম. গায়ের রং পীতাভ বা পীতাভ-বাদামি, দেহাবয়ব খবাকৃতি। [১০২] সুগত চাকম লিখেছেন, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাখাইনদের অধিকাংশ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক। তাদের অনেকের মুখমন্ডলে গোলাকার, দেহের রং ফর্সা এবং চুলগুলো সোজা। তবে কারো কারো দেহের রং ঈষৎশ্যামলা। বাংলাদেশের প্রান্ত ঃসীমার বাখেরগঞ্জ বতর্মান বরিশালের শেষ ভূখন্ডের মধ্যে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া থানা ও গলাচিপা থানা এবং বরগুণা জেলার বরগুণা জেলার বরগুণা সদর ও আমতলী থানার সমুদ্র উপকূল জুড়ে রাখাইন জাতিগোষ্ঠির বসবাস। অপর দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূবাঞ্চলে চট্টগ্রামের কক্সবাজার জেলা সাগর, রামু. হীনা, টেকনাফ, চৌপরপন্ডী মহেশখালী, চকরিয়া, হারবাং, মানিকপুর এবং বাজালিয়া প্রভৃতি এলাকায় রাখাইনেদের বসবাস। এসব অঞ্চলে রাখাইন সম্প্রদায়ের ৫০ (পঞ্চাম) হাজার লোক বাস করে।

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালী রাখাইনদের নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের তথ্য কক্সবাজারের রাখাইন ও বান্দরবানের মারমা বলে পরিচয়বাহী রাখাইনদের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান এবং রাখাইনদের জীবনযাত্রার প্রণালী এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্যে উল্লিখিত তিনটি জেলার ভূ-প্রকৃতিগত পটভূমি জানার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে রাখাইনদের সংখ্যা ১,৫৫,৮৫৪ এর মতো। বান্দরবান জেলার পূর্বদিকে বর্মা (মায়ানমার) এবং লুসাই পাহাড়, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা, উত্তরে রাঙ্গমাটি জেলা এবং দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান অবস্থিত। সামগ্রিকভাবে জেলাটি পাহাড়, নদী ও ঢালু খাড়াই পরিবেষ্টিত এবং সর্বত্রই ঘন বনাঞ্চল ও ঝোপ-ঝাড় চোখে পড়ে। এখানে ১৩টির মতো জাতিগোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু জাতিসত্তার বসবাস বলে এ অঞ্চলটিকে দেশের নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এদের মধ্যে মারমারাই সংখ্যায় অধিক। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মারমাদের সংখ্যা ৫৯,২৮৮ জন। জেলার সদরদপ্তর বান্দরবান শহরটি সাংগু নদীর তীরে অবস্থিত। মারমা প্রধান এখানেই বসবাস করেন। সাংগু উপত্যাকায় রুমা ও থাঞ্চি নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার আছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও বাঙালি জাতির লোকেরা হাটবারে এই বাজারগুলোতে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও কেনাকাটা করেন। বান্দরবান জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে লামা ও আলীকদম নামে আরও দুটি বড় বাজার রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে খ্যাত কক্সবাজার জেলার সদর দপ্তরটির নামও জেলার নামে। জেলার পূর্ব দিকে বান্দারবান জেলা ও নাফ নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর দিকে চট্টগ্রাম জেলা। বসবাস অনুকূল জলবায়ুর কারণে এই জেলায়ও বেশ কিছু জাতিগোষ্ঠীর বসবাস বিদ্যমান। এদের মধ্যে প্রধান জাতিগোষ্ঠী স্থানীয় বাঙালিদের কাছে 'মগ' নামে অভিহিত এবং যারা নিজেদের রাখাইনব বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন। এখানে এদেরম সংখ্যা ৭,১৬৭ জন। কক্সবাজার শহরটি বাকখালী নদী ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী অসমতল বালুময় ভূমিতে অবস্থিত। এক সময় এটি ছিল প্রধানত রাখাইন বসতি। বর্তমানে রাখাইন বসতির সংখ্যা খুবই কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১,০১২ জনে। নাফ নদীর তীরে অবস্থিত হ্নীলা ও টেকনাফ এই জেলার অন্যতম দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। মহেশখালী ও কুতুবদিয়া এ জেলার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ। মহেশখালীতে পাহাড়ের চূড়ায় আদিনাথের একটি শিব মন্দির আছে। পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দিরের কাছেই রয়েছে একটি বৌদ্ধ মন্দির যা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণে বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলা অবস্থিত। জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই নদ-নদী ও খাল দ্বারা বিধৌত। জেলার ভূমি অত্যন্ত উর্বর। এই জেলায় বসবাসরত মগদের (রাখাইন) সংখ্যা, ৩,৫২০ জন। বলা হয় এদের পূর্ব পুরুষরা বহু কাল আগে থেকেই এখানে জনপদ গড়ে তুলেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১

বাংলাদেশে আরাকানী বা রাখাইন অধিবাসীদের পরিসংখ্যান

এলাকার নাম	বছর	মোট সংখ্যা
কক্সবাজার	১৭৯৯	১০,০০০ (ক)
	১৮৭২	৩,২০৫ (খ)
	১৯৮২	১,০১২ (গ)

উৎসঃ

ক) Pearn P.R in his article King Bearing JBRS XXII, 1933, p. 68 Quted: Khan, A Mabud. The Maghs, UPL, Dhaka, 1999, p-51

খ) Hunter, W.W.. in statistical Account of Bengal, VI, London, 1876. 0, 152: Quted: Ibid.

সারণি-২

এলাকার নাম	বছর	মোট সংখ্যা
বান্দরবান জেলা	১৯০১	১৬৬০৮ (ক)
	১৯৮১	৭৯৫১৮ (খ)
	১৯৯১	৫৯,২৮৮(গ)

উৎসঃ ক) Hutchinson, R. H.S., Eastern Bengal and Assam District Gazetteer: Chittagong Hill Tracts, Allahbad, 1909, p. 28 Quted: Khan, A. Mabud. Ibid

খ) বাংলাদেশের আদমশুমারী, ১৯৮১, পৃ. ৫৫

গ) ঐ, ১৯৯৯, বান্দবান, জেলা, পৃ. ১৫০।

সারণি-৩

এলাকার নাম	বছর	মোট সংখ্যা
বৃহত্তর পটুয়াখালী	১৯৫১	১২,২৭৮ (ক)
	১৯৬১	১৬৩৯৪ (খ)
	১৯৭৪	৪,২৯৩ (খ)
	১৯৭৪	৩৫২০(গ)

উৎস ঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) পাকিস্তানের আদমশুমারী, ১৯৫১, জেলা বাখেরগঞ্জ ১৯৫১, পৃষ্ঠ- ৫৩, সে সময় বৃহত্তর পটুয়াখালী বাখেরগঞ্জ জেলার মহাকুমা ছিল মাত্র।

খ) বাংলাদেশের আদমশুমারী, বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলাঃ ঢাকা, ১৯৮৪.

গ) খান, এ মাবুদ ১৯৭৯ সালের মে মাসে নিজ উদ্যোগে জনসংখ্যার একটি জরিপ পরিচালনা করেন। জরিপে উল্লেখিত সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। উৎসঃ খান, এ, মাবুদ, এর The Mahg. Ibid.।

সারণি-৪

পটুয়াখালীর রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা পরিসংখ্যান।

বছর	পুরুষ	মহিলা	মোট জনসংখ্যা
১৮৭২	২১৪০	১৯০৯	৪০৪৯
১৯১১	-	-	৮৬০০
১৯৫১	-	-	১৬৩৯৪
১৯৬১	৫৯৩৪	৬২৫৬	১২১৯০
১৯৭৪	-	-	-
১৯৭৯	১৮৮১	১৮৩২	৩৭১৩

শূন্যস্থানের পরিসংখ্যান সেন্সাস রিপোর্ট উল্লেখ নেই।

সারণি-৫

১৯৪৭-৪৮ সালে তৎকালীন বাখরগঞ্জ জেলার (বরিশাল) পটুয়াখালী মহাকুমার রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর এলাকাভিত্তিক পাড়া ও বাড়ির পরিসংখ্যান

ক্রমিক	স্থান/এলাকা	থানা/উপজেলা	পাড়ার সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা
১	কুঁয়াকাটা	কলাপাড়া	৫৪	১,৭৮৫
২	বালিয়াতলী	কলাপাড়া	২৯	৬৮৫
৩	টিয়াখালী	কলাপাড়া	১৭	৫৩০
৪	বড়বগী	আমতলী	৪৪	১,৩৮০
৫	বড় বাইশদিয়া (মৌডুবী)	গলাচিপা	১১	৪২০
৬	বড় বালিয়াতলী	বরগুণা	৯	৩৯০
মোট	৬	৬	১৬৪	১৯০

উৎসঃ The Rakhaing Reviw, Vol.II, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬

১৯৪৭-৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এর রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর এলাকাভিত্তিক পাড়া ও বাড়ির পরিসংখ্যান

ক্রমিক	জেলা	পাড়ার সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম	৪৬৭	২০,০০০
২	চট্টগ্রাম	১৪৫	১০,৫১০
৩	বাখেরগঞ্জ (বরিশাল)	১৬৪	৫১৯০
মোট	৩	৭৭৬	৩৫৭০০

উৎসঃ The Rakhaing Reviw, Vol.II, 1995. পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি মুস্তফা মজিদ, পৃষ্ঠা-৯৪

উল্লিখিত পরিসংখ্যানের দীর্ঘ ৪৪ বছর পর বৃহত্তর বাখেরগঞ্জ (বরিশাল) জেলায় অর্থাৎ বর্তমান পটুয়াখালী ও বরগুণা জেলাধীন রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর তুলনামূলক অবস্থান এবং ১৯৯১-৯২ সালের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সারণি-৭

সম্প্রতি পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর এলাকাভিত্তিক পাড়া ও বাড়ির পরিসংখ্যান

ক্রমিক	স্থান/এলাকা	থান/উপজেলা	পাড়ার সংখ্যা	বাড়ির সংখ্যা
১	কুঁয়াকাটা	খেঁপুপাড়া (পটুয়াখালী)	১৪	১৪৯
২	বালিয়াবতলী	কলাপাড়া	৮	৫০
৩	টিয়াখালী	ঐ	৬	৩৩
৪	বড়বগী	আমতলী (বরগুণা)	১৩	২৩৮
৫	মৌডুবী	গলাচিপা (পটুয়াখালী)	৫	১৯
৬	বড় বালিয়াতলী	বরগুনা (বরগুণা)	১	২৬
মোট			৪৭	৫১৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎসঃ The Rakhaing Reviw, Vol.II, 1995.রাখাইন জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ মং বা অং, পৃষ্ঠা-৭৬

এক নগরে বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় রাখাইন পাড়া সমুহের (অতীত/বর্তমান) বিবরণ:

সন ও সাসক পর্ব	কলাপাড়া থানা	আমতলী থানা	গলাচিপা থানা	বরগুণা থানা	মোট		
					পাড়া	বাড়ি	জনসংখ্যা
১৭৮৪-১৯০০ ব্রিটিশ শাসনকাল	১১৫	৬৯	২৯	২৪	২৩৭	-	৫০ হাজার
১৯০০-১৯৪৮ ব্রিটিশ শাসন ও পাকিস্তান সৃষ্টি পর্ব মূহুর্ত কাল	১০০	৪৮	১১	০৯	১৬৮	৫১৯০	৩৫ হাজার
১৯৪৮-১৯৯১ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ স্বাধীনতার উত্তর কাল	২৮	১৩	০৫	০১	৪৭	৫১৫	৩৫০০ জন
১৯৯১-২০০৪ বর্তমান	২৮	১৩	০৫	০১	৪৭	৬১৭	৪৫০০ জন

তথ্য সূত্র: পটুয়াখালী রাখাইন তাহান।

প্রখ্যাত রাখাইন ঐতিহাসিক ও গবেষক প্রয়াত উ উক্য এর মতে ব্রিটিশ আমলে দেশে রাখাইন বসতি নিম্নরূপ:

জেলার নাম	থানার নাম	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা
চট্টগ্রাম	ককসবাজার সদর	২৯	২২৮০
	রামু	৩৪	২০৫০
	মহেশখালী	২৩	১৪৪০
	চকরিয়া	২২	২৪৮২
	সাতকানিয়া	০১	৩০
	উখিয়া	০১	২০
	টেকনাফ	৩৩	৩,৩৩৯

বরগুণা	বরগুণা	১১	৪২০
পটুয়াখালী	খেপুপাড়া	৯০	২৭৬০
	আমতলী	৫৩	১৭৭১
	গলাচিপা	০৯	৩৯০
	মোট	৩০৬	১৬৮৮২

রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি এলাকা সমূহ পর্যালোচনা করলে এদের লোকসংখ্যা নিম্নভাবে দেখানো যায়।[১০৩]

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা	পরিবারের সংখ্যা
০১	কক্সবাজার	কক্সবাজার	৮৫,০০০
		রামু	
		চকরিয়া	
		পেকুয়া	
		মহেশখালী	
		টেকনাফ	
০২	বরগুণা	বরগুনা সদর	৬০০০
		আমতলী	
০৩	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৫০০০
		গলাচিপা	
		খেপুপড়া	
০৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাংগামাটি)		৫০,০০০
০৫	অন্যান্য জেলা		৪,০০০
সর্বমোট (আনুমানিক)			১,৫০,০০০

৪.১৮ রাখাইনদের বসবাস পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে

১৯৪৭-৪৮ সালে তৎকালীন বাখেরগঞ্জ জেলার (বরিশাল) বৃহত্তর পটুয়াখালী ও বরগুণাতে রাখাইন জাতিগোষ্ঠির সর্বমোট ১৬৪টি পাড়ায় মোট ৫১৯১টি বাড়ি ছিল। অনুমানিক লোক সংখ্যা প্রায় ৫১ হাজারো উপরে। কিন্তু ৪৪ বছর পর ১৯৯১-৯২ সালের পরিসংখ্যা মতে, ৪৭টি পাড়ায় সর্বমোট ৫১৫ বাড়ি আছে। কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যায় রাখাইনরা ৪ হাজারের মতো। অপর দিকে বহু রাখাইন

Dhaka University Institutional Repository

পাড়া আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বড় চাকমাদের পরেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জাতিগোষ্ঠি বান্দরবানের মারমারা অনেকের মতে, রাখাইন জাতিগোষ্ঠিরই একটি ধারা। তবে মারমারা নিজেদের রাখাইন জাতিগোষ্ঠির উত্তরাধিকার বলে মনে করেন না। তারা বার্মা থেকে আগত বর্মীরাজের উত্তরাধিকার বলে মনে করেন।

রাখাইনরা বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি। তারা মূলত ব্রিটিশ কলোনী বিস্তারের স্বার্থে শরণার্থী অধিবাসী হিসেবে বাংলাদেশে আগমন করেন। তারা চট্টগ্রামের কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে জঙ্গল কেটে জনপদ তৈরি করে। এর আগে এ অঞ্চলে কোন মনুষ্য বসতি ছিল না। সে অর্থে রাখাইনরা এ অঞ্চলে আদিম অধিবাসী আদিবাসী। রাখাইন যুবনেতা তাহান বলেছেন, "যিনি স্বীয় জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত, ঐতিহ্যগত, চরিত্রগত আদর্শকে রক্ষা করে, পালন করে তিনি রাক্ষাইন। রাক্ষাইন শব্দটি পালি ভাষার রক্খা হতে রক্ষাইন > রাক্ষাইন হয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে, এর মানে রক্ষণশীল জাতি। রাখাইন জাতির আবির্ভাব হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১৫ বৎসর হতে। তৎকালীন ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল আর্যগণের দ্বারা বিজিত হয়। শাক্যবংশীয় রাজ্য কায়েম করে বসতি স্থাপন করতে থাকা কালীন কদিলাবস্তুর রামা অর্জুন দেশত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তার সাথে শাক্যবংশীয় যুবতীর সাথে বিয়ে হয়। তাদের মারায়ু নামে একটি পুত্র সন্তান হয়। পরিণত বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন। বর্তমান বার্মার অন্তর্ভূক্ত আরাকান ভূখণ্ডের প্রথম ধান্যবতী নগরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন খ্রিষ্টপুর্বে ৩৩১৫ অব্দে এবং পর্যায়ক্রমে উক্ত ভূখন্ডের ওহফড় অংধহ এ্ররনবঃড় গড়ৎড়হম গোষ্ঠি শাক্যবংশীয় রক্ষণশীল জাতির দয়া পরিপূর্ণ হয়ে রক্ষাইন জাতি ও রাক্ষাপুর (রাখাইনদেশ) বলে পরিগণিত হয়। এরাজ্য ১৭৮৪ খিষ্টান পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ছিল।[১০৪] প্রবন্ধ, তাহান , বাংলাদেশের উপজাতিঃ রাক্ষাইন) বর্তমানে উক্ত ভূখণ্ডটি আরাকান নামে পরিচিত। ইতিহাস মতে, রাজা মারায়ু খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩১৫ অব্দে প্রথম ধন্যবতী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে রাক্ষাইন জাতির ইতিহাস সূচিত হয় এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ম্রাউকের (Mraikll) ২৭তম রামা বাদোপ্রা মহাসামন্তের দ্বারা রাক্ষাইন জাতির ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে সূচনা ও সমাপ্তির মাঝে দীর্ঘ পাঁচ হাজার নিরানব্বইটি বৎসর কাল। দ্বিতীয় ধান্যবতী যুগে ২৯ তম রাজা চান্দা সুরিয়ার আমলে বুদ্ধ আরাকানে আসেন। রাকাইন; রা-খেইন (ধান্যবতী (The Grain Country) রাখাইন ইতিহাস মতে, ধান্য ও শস্যের সমৃদ্ধতার জন্য এই এলাকাকে ধান্যবতী এবং সময়কালকে ধান্যবতী যুগ বলা হয়) বর্মী শব্দ 'মঙ' থেকে 'মগ' শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। মগ হতে বর্মীদের ধর্মীয় উপাধি। রাখাইদের শতকরা ৮০ ভাগ নামের আদি শব্দ পুরুষদের বেলায় মং (Moung) এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে 'মা' (ma) থাকে। পরিবারের জ্যেষ্ঠ ছেলে। মেয়ের নামের শুরুতে উ (U) অথবা শেষে উ (Oo) রাখতে হয়। আবার কনিষ্ঠ ছেলে/মেয়ের নামের যে কোন স্থানে থুই (Thwee) রাখতে দেখা যায়। প্রবন্ধ মং বা অং, ইতিহাসে মগ-মারমা-রাখাইন একটি বিতর্কিত অধ্যায়)

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর চেন থ অং বলেন, মগ শব্দটি মগধ শব্দেরই বিকৃত রূপ (মঘধ>মঘাই>মগ)। পণ্ডিত ড. এনামুল হক, চট্টল ইতিহাসবিদ আবদুল হক চৌধুরী এবং ইতিহাসবিদ প্রফেসর ড. আবদুল মাবুদ খান প্রমুখ এ মত পোষণ করেন। আবার অনেকে বলেন, আরাকানী বলতে রাখাইন (Rakhaing>Rekaine>rakhine) কেই বোঝায়। আরাকান শব্দটি রাখাইন শব্দেরই বিকৃতরূপ ঃ রাক্ষাইন > রাখাইন> রাখাইং> রাখাং>রাকাং> আরকান> আরাকান। আবদুল মাবুদ খানের মতে, আধুনিক আরাকান নামের উৎপত্তি হয়েছে শব্দের রূপান্তর (Rakhaine >Arkang>Araccan > Arakan) আরাকানী ভাষায় 'রাখাইন', কর্মিজ ভাষায় 'এয়া খাইন' আরা বাংলা ভাষায় ' আরাকান'। বাঙালিরা আরাকানীদের রোমাং, রোহান, রোআং, রেনগ বা রাং-দের অধিবা বলেন।[১০৫]

৪.১৯ রাখাইনদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার

বাঙালি বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক, জীবনবোধ, আচার সংহিতা এবং সমতলে বসবাসের দিক থেকে রাখাইনরা অনেকটা পরিপূরক। বড়ুয়া বৌদ্ধদের ধর্মীয় এবং দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে রাখাইনদের মতো আরাকানী ও বর্মী প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত দিকটা ভিন্ন। রাখাইনদের বাড়িগুলো সুসজ্জিত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারা সমাজে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু হলে নানা বৈচিত্রপূর্ণ আনন্দময় আচার অনুষ্ঠান করে থাকেন। রাখাইনদের প্রত্যেক সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধ ধর্মীয় বিধানানুসারে হয়ে থাকে। রাখাইনদের জন্ম ও জন্মোৎসব প্রবন্ধে রাখাইন লেখক উ ক্য থিন তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রাখাইনদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ভাষা, আচার সংহিতা সর্বোপরি সামাজিক জীবনবোধ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। রাখাইনরা অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, সৎ এবং পরিশ্রমী। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা অতীত থেকে নিষ্ঠার সাথে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণ করে আসছে। তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আঙ্গিকেই সৌকার্য্য মন্ডিত বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধমূর্তি গুলো তৈরি করে থাকে। রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীতে অবস্থানের কারণে সহজের দেশ বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা বিভিন্ন পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধ পূজা-অর্চণা ও অন্যান্য দানোৎসব করে থাকে। কক্সবাজারের অগ্গ মেধা ক্যাং সিনত্রোগি ক্যাংও ঠাকুরপাড়া ঐতিহাসিক বৌদ্ধ ক্যাং (প্যাগোডা/বৌদ্ধ বিহার) উল্লেখযোগ্য। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কুয়াকাটা এলাকায় মিত্রি পাড়ায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সর্ববৃহৎ বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। রাখাইনরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ঐতিহ্যবাহী আরাকান বর্মী সংস্কৃতির অনুরূপ পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। ক্য থিং অং এর রাখাইন সাংস্কৃতিক অনুসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা প্রবন্ধে তা উল্লেখিত হয়েছে। তারা বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং নিত্য জীবন যাত্রার এ পোশাক পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা লুঙ্গি শার্ট ও প্রাংখেং মেয়েরা থামি আংগি ও ওড়না ব্যবহার করে থাকে। [১০৬] রাখাইন মহিলারা হস্ত ও তাঁত শিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী তারা নিজের

Dhaka University Institutional Repository

কাপড় নিজেরা তৈরী করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্রেতা সাধারণের আগ্রহে বিক্রয় করে থাকে।[১০৭] রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ায় অধিকাংশ উৎসবই বৌদ্ধধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ দিনে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সাংগ্রেং পোরে (বর্ষবরণ উপলক্ষে জলকেলি উৎসব, লং প্রেইং পোয়ে নৌকা বাইচ, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এঞংরে লং পোয়ে (বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বোধিবৃক্ষ মূলে চন্দনের জল সঞ্চালন উৎসব) আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ধম্মচক্র গুনা দানোৎসব, ভদ্র-আশ্বিন মাসে মধুদানোৎসব, আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রবারণ উৎসব; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে কঠিন চীবর দানোৎসব; পৌষ মাঘ মাসে নৃত্য উৎসব; মাঘ-ফাল্গুণ মাসে রথোৎসব ও রাধা পোয়ে (নবান্ন) ইত্যাদি উৎসব উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধপূর্ণিমা তাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো সাং গ্রেং পোয়ে। এটি মূলত নববর্ষের জলখেলি উৎসব। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর কারণ হলো রাখাইনরা বর্মী বর্ষপঞ্জি (মঘা সন) অনুসরণ করে থাকে এ সময় রাখাইন তরুন-তরুনীরা ও যুবক-যুবতীরা তিন দিন ধরে রিলং পোয়ে বা পানি উৎসব (Water Festival) উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে।

(Thongran and rakhine culture, Saw tun Oo, In moung than aye and others (ed), The voice of Rakhine vol II, Rakhine Students organization of Bangladesh Chittagong) রাখাইনদের সাংগ্রেং এবং মারমাদের 'সাংগ্রাই' মুলত একই উৎসব । এ উৎসবের তিনটি দিক রয়েছে। যথা- (১) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন (২) আনন্দ উপভোগ (৩) রাখাইন সংস্কৃতির ধারায় সৃষ্ট কৃষ্টিকে লালন। রাখাইনদের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও সংগতি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোন অনুষ্ঠান ও শবদাহ ক্রিয়া উৎসবে রাখাইনরা বর্ণাঢ্য রথ বা আলং নৃত্য করে থাকে। জাদি উৎসব তাদের তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব।

বাংলাদেশের সমতলে ভূমিতে, সমুদ্র উপকুলে বসবাসরত অবস্থান ও পরিবেশের কারণে রাখাইনরা কৃষিভূমি ও মৎস্য বাণিজ্যে নির্ভরশীল। পটুয়াখালী বরগুণা জেলার রাখাইনরা কৃষি কাজের উপর নির্ভর; অন্যদিকে কক্সবাজার, মহেশখালী, চকরিয়া, হ্নীলা , টেকনাফ সমুদ্র উপকূলীয় বাসিন্দা রাখাইনরা অধিকাংশই জাল ও মাছের ব্যবসা, শুটকি প্রস্তুত ও শুটকির চালান এবং তাঁতের তৈরী বস্ত্র বাণিজ্যে জড়িত। বর্তমানে রাখাইনদের অনেকে পড়াশোনা করে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি ও লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। রাখাইন নারীরা পরিশ্রমী, কর্মঠ, হাটবাজারে যাতায়াত করে কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করে, একই রকম কাপড় পরে।

রাখাইন পরিবারে তাঁতে কাপড় বুনতে জানে না এমন মেয়ে বিরল। মেয়েরা তাঁত শিল্পে অত্যন্ত দক্ষ ও পারদর্শী । রাখাইন অর্থনৈতিক উৎসবে অন্যতম ভিত্তি হলো তাঁত শিল্প।

বাঙালিদের মতো রাখাইনরাও মাছে ভাতে রাখাইন। এদেশে আগমনের সাথে সাথে তারা বাঙালি সমাজের মতই স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তোলে।[১০৮] রাখাইন জাতিরা এক সময় জায়গা জমি, ধনদৌলতে

Dhaka University Institutional Repository

খুবই স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। রাখাইনদের প্রধান খাদ্য ভাত। মাছ, মাংস, হাঙ্গর, শুটকি, কাঁকড়, ব্যাঙ, শুকর, নাপ্পি বা সিদোল এবং সব রকম শাক সবজি তারা খাদ্য হিসেবে খায়। রাখাইনদের রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

রাখাইনদের পোশাক পরিচ্ছেদ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারা নিজেদের তৈরি লুঙ্গি (দোয়া), শার্ট (এনজ্যি), মেয়েরা লুঙ্গি (থাবিং), ব্লাউজ (বেদাই এনজ্যি), বক্ষবন্ধনী (রানভেই এনজ্যি), ব্রেসিয়ার (বদালী), ওড়না (পোছোপেইন) ইত্যাদি পরিধান করে। বৃদ্ধ পুরুষরা মাথায় পাগড়ি (গৌংপৌং) ও বৃদ্ধা স্ত্রী লোকেরা কোমরে জালি (খাগ্রো) ব্যবহার করে। বর্তমানে অনেকে ফতুয়ার উপর লুঙ্গি পরেন। পাগড়ি তাদের ঐতিহ্যের প্রতীকও বটে। মেয়েরা হাতে কানে, গলায়, কোমরে কারুকাজ খচিত নকশার সোনা রূপার অলংকার পরে। তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধমূর্তি, খাদ্যাভাসে ধর্মীয় প্রভাব অত্যাধিক।

রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি

বাংলাদেশে দুর্দীর্ঘ কাল থেকে বসবাস করে আসছে। ভৌগোলিক ও পেশাগত কারণে কয়েকটি জেলায় রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি। যেমন- ১) কক্সবাজার জেলা, ২) চট্টগ্রাম জেলা, ৩) বরগুণা জেলা, ৪) পটুয়াখালী জেলা, ৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা, ৬) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, ৭) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, ৮) ঢাকা জেলা।

রাখাইনদের পেশা

রাখাইন সমাজে কয়েকটি সাধারণ পেশার বিবরণ সংক্ষিপ্তকারে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১) তাঁত বুনন (Weaving), ২) কারিগরি পেশা (Teanical Job), ৩) কৃষিকাজ (Agriculture), ৪) শিক্ষকতা (Teaching), ৫) চাকুরিজীবী (Service Holder), ৬) নাপ্পি/হিদল তৈরী (Nappi Making), ৭) মৎস্য আহরণ (Fishing), ৮) মহাজনী পেশা (Money Lending), ৯) দোকান ব্যবসা (Shopping/Store Business), ১০) বেঁত সামগ্রী নির্মাণ (Handincrafting), ১১) শামুক/ঝিনুক মাংস বিক্রি (Selling Snail/Oyster meet), ১২) হাঁস-মুরগী পালন (Poultry Firm), এবং ১৩) অন্যান্য। পেশাভিত্তিক রাখাইনদের [১০৯] শতকরা হার নিম্নরূপ:

পেশা	শতকরা হার (৯%)
কারিগরি/ব্যবসা	৭০%
তাঁতী	১০%
চাকুরিজীবি	০২%
শিক্ষকতা	০২%
কৃষিজীবি	০২%
মৎস্যজীবি	০২%
অন্যান্য	০৪%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইনরা ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, স্বজাত্যবোধ রক্ষণে অত্যন্ত সংযতপ্রজ। নিত্য জীবনাচার, মূল্যবোধ, মনোবৃত্তি প্রয়াসে একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির পরিচয়েই শ্রেয় অভিব্যক্তি। বাংলাদেশের রাখাইন জাতিগোষ্ঠির শতকরা প্রায় একশ ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা থেরবাদী বৌদ্ধ আর্দশে পালি ত্রিপিটক প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ। রাখাইন সমাজে কেহ মারা গেলে মৃতদেহ পোড়ায়। বৌদ্ধ ভিক্ষুর অন্তে ্যষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে বাঁশ, কাঠ ও রঙিন কাগজ দিয়ে রাক্ষাইন ঐতিহ্য অনুসরণ করে রাখাইন বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য অনুযায়ী চিতা মঞ্চ, দোলনা মঞ্চ, সংস্কৃতিক মঞ্চ রথ টানা মঞ্চে তিন দিন তিন রাত নানা অনুষ্ঠান করা হয়। রাখাইনরা তাদের নিজস্ব ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করে আছে। বৃহত্তর বাঙালিদের সাথে দীর্ঘকাল সংস্পর্শ বজায় রেখে স্বকীয়তা ও স্বপরিচয় (Indentity) হারিয়ে ফেলেনি। তাদের সনাতন জীবন ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত ভাষা, পোশাক, খাদ্য, আচার আচরণ এবং বাসগৃহ নির্বাচনে সংরক্ষণশীল।[১১০]

বাংলাদেশে বসবাসরত রাখাইন ও মারমা জাতি গোষ্ঠির আদিনিবাস মায়ানমার (বার্মা)। দুই সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে উভয়ে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠির স্রোতধারার ভাষা ভোটব্রহ্ম। মারমারা বান্দরবনে ও মানিকছড়িতে বাস করে। তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ভুখন্ডে আগমন করে। বাংলায় রাখাইনরা আগমনের পর থেকে আদিবাসভুমি মায়ানমারের রাখাইনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং ভাষাগত সংরক্ষণ বাদিতা অনুসরণ করে মারমা প্রকৃতির (Character)। লিখিত রাখাইন ভাষা তারা বৌদ্ধ বিহার বা ক্যাং ও গ্রামের টোলের পাঠশালায় গ্রহন করে থাকে। এতে বৌদ্ধধর্মীয় নানা ধর্মীয় শিষ্টাচার ও ভাষা শিক্ষা দান করে ভিক্ষুরা। বর্তমানে শিক্ষিত রাখাইনরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে রাখাইন ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (R.D.F.) নামক রাখাইনদের সমন্বয়ে একটি এনজিও গঠন করে কাজ করে যাচ্ছে। এর পরিচালক উ সিট মং। রাখাইন জাতি গোষ্ঠি মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিকতায় বিবর্তিত হচ্ছে। রাখাইন জাতি গোষ্ঠির প্রথাগত আইনে সম্পত্তির অধিকার নারীপুরুষ সমান। রাখাইনদের মধ্যে বিবাহের পর মেয়ের বাড়িতে থাকার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পূর্বে রাখাইন সমাজে মাতৃপরিচয় থাকলেও বর্তমানে সন্তানেরা পিতৃপরিচয় স্বীকার করে নিয়েছে। নারী পুরুষ সকলেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কর্ণধার। বৌদ্ধধর্মীয় বিধান মতো রাখাইনদের মাঝে কুলগত অর্থাৎ চাচাতো, ফুপাতো ও খালাতো ভাই বোনদের মধ্যে বৈবাহিক সর্ম্পক নিষিদ্ধ। তবে মামাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হতে পারে। তাদের বিয়েতে পণ বা যৌতুক প্রথা নেই। তাদের কাছে বিয়ে অনুষ্ঠানটি মূলত একটি সামাজিক উৎসব ও পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

৪.২০ রাখাইন সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও প্রকাশনা

রাখাইন সম্প্রদায়ের সাহিত্য চর্চা ও প্রকাশনা অত্যন্ত সীমিত। রাখাইন শিক্ষাদীক্ষায় তেমন উন্নত নয়। রাখাইন সমাজে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, গবেষক ও ধর্মীয় পুরোহিতের (ভিক্ষুর) সমন্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বর্তমান ও নতুন প্রজন্মের কাছে রাখাইন জাতির গৌরবময় ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিষয়ে গবেষণাবধী লেখা প্রকাশে বেশ কয়েকটি সংগঠন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ARSB ও RDF বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিককালে যে সকল রাখাইন লেখক ও প্রাবন্ধিক ইংরেজী ভাষায় লেখালেখি করেন এমন কয়েকজন মধ্যে UU Tun Sein, U Saw Tun Oo, U maung Than Aye (Ven. U Bodhinyana), U Ushit Maung, U Pandita Mahathero, U Maung U Shan, Tun Nyo প্রমুখ। বাংলা ভাষায় লেখালেখি করেন এমন কয়েক জনের মধ্যে উ ক্যথিংঅং. উ মংউসাঙ. উ উক্যথিন, উ অংথিংমং, উ মংছেনচীং (মংছিন), উ মংবাঅং (মংবা), উ মংহ্লাপ্রু (পিন্টু), উ মংহেনছা (তাহান) প্রমুখ। রাখাইন ভাষায় লেখালেখি করেন এমন কয়েকজনের মধ্যে উ উসিট মং, উ মংছালু চৌধুরী, উ নাহিন্দা মহাথেরো, উ মংক্যথা, উ মংহ্লাচিং, উ মংহেনথা প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকা/সংকরনে আর্টিকেল লেখেছেন কো আথোয়াইন, মিস উএনু (প্রিয়াংকা), উ অংক্যচিন, মিস অংক্যচিন (হ্যাপি), উহ্লামং (সৈনিক), উ উবাচং, উ মংরীক্রু, চহ্লাপ্রু প্রমুখ। এছাড়া অনেক আছে যাঁরা কেবলই কবিতা লেখে থাকেন। রাখাইন কবিদের তালিকা দীর্ঘ হতে পারে বিধায় কারো নাম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না।

রাখাইন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকীর একটি তালিকা নিচে দেয়া হল:

ক্রঃ নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশক	সম্পাদক	প্রকাশকাল
০১	রাখাইন	রাখাইন ছাত্র সমাজ, কক্সবাজার	মংছেনচীং (মংছিন)	১৯৮০
০২	The pakhine ১ম সংখ্যা	Rakhine Publication Committee, Cox's Bazar	মংছেনচীং (মংছিন)	১৯/০২/৮১
০৩	The pakhine ২য় সংখ্যা	Rakhine Publication Committee, Cox's Bazar	মংছেনচীং (মংছিন)	০৮/০২/৮২
০৪	The Voice of pakhine ১ম সংখ্যা	Rakhine Students Organization of Bangladesh	মংউসাং	০৭/০৩/৮৭
০৫	The Voice of pakhine ২য় সংখ্যা	Rakhine Students Organization of Bangladesh	মং থেন এ	সেপ্টেম্বর ৮৯
০৬	অং খ্যোঁ ছা	Rakhine Buddhist welfare Association. Cox's Bazar Town Branch	খোঁ ক্রো	১১/১২/৯২

০৭	The pakhine review ১ম সংখ্যা	Rakhine Buddhist welfare Assocation	ক্যাখিংঅং	০১/০৩/৯৪
০৮	The pakhine review ২য় সংখ্যা	Rakhine Buddhist welfare Assocation	ক্যাখিংঅং	৩০/১১/৯৫
০৯	ধান্যবতী	Rakhine Students Organization of Bangladesh, Chittagong Divissional Branch	মংহ্লাপ্রু (পিন্টু)	১লা বৈশখা, ৯৭ বাংলা
১০	The pakhine review ৩য় সংখ্যা	Rakhine Buddhist welfare Assocation	মং বা অং	১২/১০/০২
১১	Arakaness Research Journal-Vol:1	Arakartess Research Soceity of Banglades	উ বোধিএান্দা	০৫/০৬/০১
১২	The Thun Gran	Rakhine Development Foundation	উখিংমং	১৭/০৪/০৫
১৩	The pakhine review ৪র্থ সংখ্যা	Rakhine Buddhist welfare Assocation	মংহ্লাপ্রু (পিন্টু)	১৮/০৪/০৫

এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রকাশনার নাম	প্রকাশক	সম্পাদক	প্রকাশকাল
০১	রাখাইন লোক কাহিনী	মিসেস লালাছেন, টেকপাড়া, কক্সবাজার	উক্যাখিন	জুন, ১৯৮১
০২	রাখাইন ইতিবৃত্ত	The Rakhine Welfare Society. Rice Market Road, Cox's Bazar	মংছেনচীং (মংছিন)	১৯/০১/৯৪
০৩	বাংলাদেশে রাখাইন সম্প্রদায়: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনধারা	গ্রন্থাকার	মং বা অং (মংবা)	১৭ এপ্রির, ২০০৩
০৪	রাখাইন জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ	উখিংনু (নুশাং)	মং বা অং	৩১ মে ০৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.২১ ম্রো বৌদ্ধ সম্প্রদায়

ম্রো আদিবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক দিয়ে চতুর্থ স্থানে ম্রো (Mro) উপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রায় সর্বত্র ম্রো জনগোষ্ঠি বসবাস করে। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক তাদের নাম ম্রু বলে উল্লেখ করেছেন। ম্রো রা নিজেদের কে মারুসা বলেন। মারু অর্থ মুরং আর সা অর্থ সন্তান বা লোক। রাখাইনরা তাদেরকে ম্রু (Mru), বর্মীরা ম্যু (Myoo), বাঙালিরা মুরুং (Moroong) বলে।[১১১] বাঙালিরা এদের মুরাং বলে, রাখাইনরা সুর চাকমারা মরু উচ্চারণ করে, বার্মারা ডাকে মেয়ো (মেইউন) বলে। নিজেদেরকে তারা বলে মু-রো-সা।[১১২] ম্রো জাতিসত্তা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। জাতি হিসেবে তার এখনো সেকালে এবং অনগ্রসর সেকারণে প্রকৃতি পূজারী এবং বর্তমানে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। ম্রোরা বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান, নাইক্ষ্যাংছড়ি, লামা, রোয়াংছড়ি, রুমা, আলীকদম ও থানছি সবকটি জেলায় বাস করে। বান্দরবান শহর থেকে চিম্বক পাহাড়ে লামার মেবেংজা এলাকায় ম্রোদের গ্রাম চোখে পড়ে। পূর্বে তারা রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলায় কাপ্তাই উপজেলার ভায়্যাভেলী মৌজায় ছিল। ম্রোরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরে বার্মার আরাকানেও ভারতে মিজোরাম, তিব্বত, ভিয়েতনাম, চীনে বাস করে। এখানে উল্লেখ যে, জনৈক Manlei Mro ১৯৮৫ সালের দিকে তাদের মাঝে ক্রামা (Krama) নামে একটি নিজস্ব ধর্মমত প্রচার করেন।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের আদম শুমারীর সময় বার্মায় ম্রোদের জনসংখ্যা ১৩,৭৬৬ জন ছিল। স্যার এ.পি. ফেইরি লিখেছেন যে, দশম শতাব্দীতে দুজন ম্রো রাজা আরাকানের সিংহাসনে আরোহন করে ৩৬ বছর আরাকানে রাজত্ব করেছিলেন।[১১৩]

ম্রো জতি ম্যাসু, মারু, মিয়ো নামে পরিচিত। ১৯৮১ সালে ম্রো ছিল ২০,০০০ জন। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে আদম শুমারী মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে ২২১৬৭ জ ম্রো রয়েছে। বর্তমানে ম্রোদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। বেসরকারী হিসেবে ১৯৯৫-৯৬ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭টি উপজেলায় ৫৯,৭৪৮ জন ম্রো বসবাস করে। ইতিহাস মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ম্রো দেরকে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বোমাং রাজার অধীনে ছিল বলে ফ্রান্সিস বুকানন উল্লেখ করেন। ম্রো সমাজের বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ম্রোদের মধ্যে বর্তমানে আনুমানিক ক্রামা ধর্মবিশ্বাসী প্রায় ৫৫%, বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসী ৩৫%, খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বাস ৫% প্রকৃতি পূজারী ৫%।

প্রাচীন ইতিহাস মতে, ম্রোরা আরাকানের ধন্যবতী (ধিন্যাওয়াদী) প্রাচীন জনগোষ্ঠি। আরাকান থেকে সপ্তদশ শতাব্দী কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসবাস করেন। ম্রোরা আরাকান থেকে আগত। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে দেহের গঠন বৈশিষ্ট্যে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি রাতে কিয়াংসার সর্দার আউং-সিও-সে তাম-মাঙ এর সাথে আররাপের পরে একজন পুরোহিত দেখলে (বৌদ্ধ ভিক্ষু)। তিনি মহামুণির দেবক। সে হিসেবে মনে করা হয় আদি হতে ম্রোরা

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ম্রো ও রাখাইনদের বসবাস ছিল, চকরিয়া মানিকপুর তৎপূর্বপাহাড়ী এলাকার। এখানে দেবতা বলতে রাখাইনদের বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি ছিল। যা আরাকান দখলের পর আমরা পুরায় (আভার টুইন শহর, বার্মার রাজধানী) স্থানান্তরিত হয়। ১৭৯৮ সালে ইউরোপীয় পর্যটক ডা. ফ্রান্সিস বুখানন দক্ষিণ পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম ভ্রমণ বৃত্তান্তে সাম-সিংমোসাং, উন্নর রাওসা, কিওভাই, পোমা-মা-কেই, লে-ক্র্যাং বনজু গিজ, দেনিয়া বুরং সহ অনেক মুরং এর কথা উল্লেখ করেছেন। পারিবারিক কাঠামোতে ম্রোরা পিতৃ প্রধান পরিবারের লোক। তাদের সমাজে পিতার সুত্র ধরে সন্তানের বংশ বা গোত্র পরিচয় নির্ধারণ করা হয়।

মাহামুণি প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় বুদ্ধমূর্তি, এটি ১৭৮৫ সালে আরাকান দখলের সময় রাজা বো-ধো হিপের সৈন্যরা নিয়ে যায়। এটি এখন সান্তালেতে মাহামুনি বিহারে স্থাপিত আছে। ম্রোদের ভাষা টিবেটো বর্মন গোত্রের একটি ভাষা। [১১৪] ম্রো সমাজে বহুদল ও গোত্র রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ জাতীয় কয়েকটি দল বা গোত্রের নাম হলো নারুয়া, নরিং চাহ, তাং, দেং, খউ, কানবক, প্রেনজু, নাইচাহ, ইয়মরে ইত্যাদি। এদের আবার বিভিন্ন উপদল বা গোত্র রয়েছে। ম্রো সমাজে একই গোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ।

অতীতে ম্রোদের সমাজ ব্যবস্থা দল ও গোত্র প্রধানদের দ্বারা গঠিত। তবে ১৯০০ সালের পর থেকে তাদের এলাকা গুলোতে হেডম্যান প্রথা এবং গ্রাম গুলোতে রোয়াজা পদ প্রচলিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে বর্তমানে গ্রাম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এদের সমাজে এখনো আধুনিক শিক্ষার আলো পৌছায়নি। হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষিত হচ্ছে এবং চাকরি করছে। ম্রো সমাজে ইরা ম্রো ও মেনলে ম্রো দুই আলোকিত মানুষ ম্রো সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি ইরাচান মুরুং (১৯৩৪-১৯৯৮) সড়ক ও জনপদ বিভাগে সাব এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকরি করে অবসর গ্রহন করেন। তিনি সাম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। তিনি সারা জীবন ম্রো সমাজে শিক্ষার্জনের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে গেছেন।

ম্রোরা লম্বা চুলের ঝুঁটি বেঁধে রাখে মাথার সম্মুখভাবে। তাদের কানে, নাকে, গলায় পিতলের অলংকার ঝুলে রাখে, কেউ কেউ রূপার অলংকার পরে আবার কেউ গলায় পুঁতির মালা পরে। ম্রো ভাষায় লিখিত ধর্মীয় গান, গল্প, আধাত্মিক তত্ত্বের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটে সংগৃহীত আছে। থুরাই লাই ক্লোউমি তংমি তিয়া প্রা চহ প্রভৃতি ম্রো হরফে মুদ্রিত ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। মেনলে ম্রো একজন প্রাতঃস্মরণীয় ম্রো সমাজ সংস্কারক। তিনি ১৯৮৪-৮৫ সালে পোড়া পাড়ায় 'ক্রামা' নামক ধর্মের প্রবর্তন করে তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়ে উঠেছেন। মেনলে ম্রো শুধু ধর্ম প্রচারেই করেননি; তিনি ম্রোদের ভাষা বিস্তারে ম্রো বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। ম্রো বর্ণমালা খুমী নৃ-গোষ্ঠিও ব্যবহার করে।

ম্রোরা নদী থেকে দূরে দুর্গম পাহাড়ের উপা তাদের গ্রামগুলি অবস্থিত। সাধারন তাদের গ্রামে ৮/১০ টি থেকে ২০/২৫ টি পর্যন্ত বাড়ি থাকে। এদের বাড়ি গুলো বাশেঁর খুটি বেড়া দিয়ে এবং শনের চাল দিয়ে তৈরি। ম্রোরা বাড়িকে 'কিম' বলে। ম্রোরা প্রধানত জুম চাষা ও শিকার করে জীবন নির্বাহ্ করে। তারা অত্যন্ত সহজ সরল এবং সত্যবাদী। ম্রোরা বৌদ্ধদের মতো সমাজে কারে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু হলে নানা ধরণের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। অনগ্রসর জনগোষ্ঠি হিসেবে অতিপ্রাকৃত, লৌকিক কুসংস্কার ও বৈদ্য তন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাসী। বিয়েতে তার নিজস্ব রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে থাকে। ম্রোদের মৃত্যু হলে বৌদ্ধ রীতিমতো মৃত দেহকে শ্মশানে দাহ্ করে। এছাড়াও ম্রোদের সামাজিক রীতি নীতি, আচার আচারণ, ভাষা, সংস্কৃতি, পূজা পাবর্ণ, পোষাক পরিচ্ছেদ, খাদ্যাভ্যাস, চাল চালন নিজস্ব এবং নানা বৈচিত্রপূর্ণ।

ম্রোদের সঠিক ইতিহাস জানা খুবই কষ্টকর। আরাকানের ইতিহাস মতে, মারাজ্যে রাজা থেকে শুরু করে শেষ রাজা পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ম্রো রাজাগণ আরাকান শাসন করেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আব্দুল হক চৌধুরী তাঁর প্রাচীন আরাকানে রোযাইঙ্গা হিন্দা ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিকারী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ব্রহ্মদেশের রাজোয়াং নামক কাহিনীর সূত্রে জানা যায় যেমন মারু (Mro) বংশীয় রাজাগণের সিংহাসন আরোহন কালে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ বছর পূর্বে। এই বংশের রাজাগণ বংশ পরম্পরায় ১৮৩০ বছর কাল আরাকানে রাজত্ব করেন।[১১৫]

ভারতের মিজোরামের প্রখ্যাত লেখক Mr. Vumson এর মতে, ম্রোরা পার্বত্য অঞ্চলে সর্বপ্রথম আগমন করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত ZO History নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

The Masho (Mru) were the first to come to there area. They settled in the north Arakan-Southern Zo Country during the 11th century. One Mashu was king of Arakan during the 14th century. Which suggests that they were powerful. The khami came and we with the Masho for about two centuries in the kuladan velly. By that time the Masho had grown weak and the khami droved some of them to the west.

ম্রোরা প্রধানত পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবন নির্বাহ করে। খাদ্য হিসাবে ভাত প্রধান মাংস হিসেবে বন্য পশু পাখি, মুরগী, শুকর তাদের প্রিয় খাদ্য। তারা এছাড়া ও বিভিন্ন জীবজন্তু, গরু, কুকুর, সাপ হরিণ গিরাগিটি প্রভৃতি খায়। রোগব্যাধি হলে বিভিন্ন জীব জন্তু বলি দিয়ে বৃক্ষপূজা, পাথর পূজা, দেবতা পূজা ও মানত করে থাকে এবং মুক্তি কামনা করে। মুরুংদের দেবতার নাম ওরেং এবং উৎসবের নাম মুৎসলোং। ম্রোরা নিজেদের বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসী বলে দাবি করলেও ধর্মের মতার্দশে বিশ্বাস, চর্চা ও বৌদ্ধবিহারে (ক্যাং) নেই বললেই চলে। তারা সাংগ্রাইং হলে অবশ্যই বৌদ্ধ বিহারে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ম্রোদের বিভিন্ন উৎসব রয়েছে। যেমন- সুরাইলা পই নিংসার কিয়োরী পই (নববর্ষ উৎসব), রামোলা পই / ত-থোয়াক পই (বনবাস উৎসব), লুদলা পই/ নিংমানাই খাং পই (বাৎসরিক বিশ্রাম উৎসব), প্রাতলা পই/ নিংচুর পই (বৎসর বিদায় উৎসব), তাংফুং (ধর্মীয় কৃত্য)। ফ্রান্সিস বুখানন বলেন, ম্রোরা ঈশ্বর, ঠাকুর রাম খোদার উপাসনা করে না, শুধু মহামুনির (বুদ্ধের) পূজো করে। [১১৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোফাজ্জলুল হক কর্তৃক ম্রো জনগোষ্ঠির কল্যানে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'ম্রোচেট'।

৪.২২ তনচঙ্গ্যা বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব প্রান্তের পাবর্ত্য অঞ্চলে যে সকল উপ্রজাতির বসবাস, তন্মধ্যে তংচুঙ্গ্যা উপজাতির রয়েছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সমাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতি নীতি পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বসবাস কারী উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে আদিবাসীদের মধ্যে পঞ্চম হলো তংচঙ্গ্যা (Tanchangya)। ১৮৬৯ সালে তংচঙ্গ্যা জনসংখ্যা ছিল ২৫,০০০ জন, ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এখানে তাদের সংখ্যা হলো ১৯,২১১ জন। ১৯৯৭ সালের হিসেব মতে, ২১,১৪০ জন তংচঙ্গ্যা রয়েছে। তংচঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে ভারতের ত্রিপুরা এবং মিজোরামেও বাস করে। নৃতাত্ত্বিক ভাবে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। নৃতাত্ত্বিকভাবে তংচঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যাংশে ককুলী নদীর উপনদী রাইংকং নদীর উপত্যকায় বসবাস করে। রাঙ্গামাটি হতে ঘাগড়া হয়ে সড়ক পথে কাপ্তাই যাওয়ার পথে ওয়াগগা ইত্যাদি মৌজা গুলোতে তংচঙ্গ্যা গ্রাম রয়েছে। রাঙ্গামাটির দক্ষিণ পশ্চিমে এর সন্নিকটে মানিক ছড়ি মৌজায়ও তংচঙ্গ্যা গ্রাম অবস্থিত।

ইতিহাস মতে, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন ও রিজলী তংচঙ্গ্যাদের সম্পর্কে লিখেন। হান্টার তনচঙ্গ্যাদের বানান Tanchangya লিখেছেন। ক্যাপ্টেন লুইন লিখেছেন, 'উপজাতিটির (চাকমা উপজাতির) তংচঙ্গ্যা অংশের ৪০০০ জন লোক ১৮১৯ সালে চীপ (রাজা) ধরমবক্স খানের আমলে চট্টগ্রামের পাহাড়গুলেতে এসেছিলেন। তারা জনৈক ফাপ্রু (Phaproo) কে তাদের প্রধান হিসেবে মানতো, কিন্তু ধরমবক্স খান তাকে তংচঙ্গ্যাদের প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ায় তাদের অধিকাংশ লোক আরাকানে ফিরে যায়।' [১১৭] রিজলী, টি এইচ লুইন সতীশ চন্দ্রঘোষ তনচঙ্গ্যাদের চাকমাদের একটি শাখা হিসেবে লিখেছেন। বর্তমানে তারা আলাদা একটি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃত। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে তংচঙ্গ্যা সমাজে সাতটি দল রয়েছে বলে জানা যায়। তারা দলকে গছা বা গোঝা (goza and clan) বলে। যেমন- মো গছা (mou-Gza), ধন্যা গছা (Dunya Goza), লাংগছা (lam bacha Goza), কার্বোয়া গাছা (Karua Goza), অঙ্য গাছা (Ongya Goza), মংলা গছা (Mongla Goza), এবং মেলং গছা (Millong Goza), ওয়া গছা (way Goza), লাপোঙ্গ্যা গছা সম্প্রতি পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা যতিন্দ্র প্রসাদ তংচঙ্গ্যা ও যোগেশ চন্দ্র তংচঙ্গ্যা তাদের ১২টি আছে গছা বলে জানান। প্রত্যেক দলে বিবিন্ন গোষ্ঠি রয়েছে। যোগেশ চন্দ্র তংচঙ্গ্যা তার তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি গ্রন্থে বলেছেন, তঞ্চঙ্গাদের ছয়টি দলে ৩৫টি গোষ্ঠি রয়েছে। যাহোক তংচঙ্গ্যারা মোটামুটি ১২টি গছায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক গছার সামাজিক রীতিনীতি অনেকটা পৃথক। পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোগত ভাবে ততচঙ্গ্যারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। পিতার সূত্র ধরে তাদের গোষ্ঠি বা বংশ পরিচয় নির্ণয় করা হয়। পূর্বে তাদের এক একটি দলে এক একজন প্রধান ব্যাক্তি ছিলেন। তাঁকে তারা "আমু" বলতেন। হান্টার লিখেছেন, "তঞ্চঙ্গ্যাদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান ব্যাক্তিকে "আহুন (ধয়ঁহ) বলা হয়।"[১১৮] মারমাদের মতে তংচঙ্গ্যারা গ্রামকে 'রোয়া' বলে। তারা গ্রামের প্রধানকে চাকমাদের মতো 'কার্বারী' বলে। রানী কালিন্দীর সময় (১৮৪৪-৭৩ইং) তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে ও চাকমাদের মত তালুকদার পদ প্রচলিত হয় এবং পরে তদস্থলে মৌজা প্রধান হিসেবে হেডম্যান পদের সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯৫ সালে চাকমা সার্কেলে সাতটি মৌজায় তঞ্চঙ্গ্যা হেডম্যান নিযুক্ত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯সালে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের তিনটি স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদে তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য যথাক্রমে ২টি ও ১টি সদস্য পদ নির্ধারান করা হয়। পোশাক পরিচ্ছেদ হিসেবে তংচঙ্গ্যা পুরুষেরা বর্তমানে লুঙ্গি ও জামা পরে এবং মেয়েরা শাড়ী ও ব্লাউজের ব্যবহার করে থাকে। তবে বয়স্ক লোকেরা এখন ঐতিহ্যবাতী ধুতি এবং মতিলারা পিনুইন, কোবেহি এবং মাথায় খবং ও কোমবে বন্ধনী কাপড় ব্যবহার করে।

প্রত্যেক সমাজের মত তংচঙ্গ্যা সমাজেও জন্ম, বিহার (সাভ) ও মৃত্যু সংক্রান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠনাদি রয়েছে। বৌদ্ধধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সকল কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। এদের বিবাহ প্রথায় তালাক নেই বললেই চলে। তারা মৃত দেহকে শ্মশানে পোড়ায়। বৌদ্ধনীতিতে মাঙ্গলিক কর্ম সম্পাদন করেন। জীবন জীবিকায় তনচঙ্গ্যা প্রধানত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠি সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন পদে চাকুরী করছে। এখন তাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তংচঙ্গ্যা সমাজের মধ্যে বীর কুমার তনচঙ্গ্যা, কার্তিক চন্দ্র তনচঙ্গ্যা বিক্রমাদিত্য, তনচঙ্গ্যা জ্ঞান বিকাশ তনচঙ্গ্যা, যতীন্দ্র প্রসাদ তনচঙ্গ্যা, যোগেশ চন্দ্র তনচঙ্গ্যা, তনচঙ্গ্যা উল্লেখযোগ্য ব্যাক্তি। তংচঙ্গ্যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তাদের সমাজে পরিবারিক মঙ্গলের জন্য 'চুমুলাঙ' পূজা, খবার সময় পড়িয় 'কে পূজা' গোষ্ঠির কেউ হিংস্র পশুর দ্বারা আক্রান্ত হলে 'বুরপারা' অনুষ্ঠান কারার রীতি প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও পূজা পার্বণ গুলোর প্যাশাপাশি বাংলা নববর্ষের শেষে ও নববর্ষের প্রথম দিনে বিজয় উৎসব পালন করে থাকে।

তংচঙ্গ্যারা মূলত চাকমাদের অন্তর্ভূক্ত জাতি। কিন্তু তংচঙ্গ্যারা তাদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দাবি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মগ সম্প্রদায় এদেরকে দৈংনাক বলে অভিহিত করে। আরাকান প্রদেশের দৈংনাক পাড়ার নামানুসারে তাদের দৈংনাক বলা হয়। আরাকানের পূর্বনাম 'রোয়াং'। এ কারনে

Dhaka University Institutional Repository

তংচঙ্গাদেরকে রোয়াঙ্গাও বলা হয়ে থাকে। আরাকান বাহিনী 'দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদুকং' নামক গ্রন্থে ও তংচঙ্গ্যা বা দৈংনাকদের উল্লেখ আছে।[১১৯] কথিত আছে যে, চাকমা রাজা অরুনযুগ (ইয়াংজ) এবং মগ রাজা মেংদির সঙ্গে ৬৯৫ মগাব্দ বা বাংলা ৭৪০ সালে বা ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে চাকমা রাজা পরাজিত হয়। তখন চাকমা প্রজারাই তংচঙ্গ্যা বা দৈংনাক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন উপজাতিই সেখানকার ভূমিজ সন্তান নয়। এদের সকলেরই আদিবাস ছিল আরাকান কিংবা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তংচঙ্গ্যারাও আরাকানের অধিবাসী ছিল। ইতিহাস থেকে অনুমান করা হয় যে, চর্তুদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তংচঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। আরাকানে মাইসাগিরি চাকমা রাজ্য ধ্বংস করে। সেখান থেকে চাকমা রাজ মারিক্যা (মরেক্যজ) তাঁর অধীনস্থ তংচঙ্গ্যা ও অন্যান্য প্রজাবর্গসহ বাংলাদেশাভিমুখে যাত্রা করেন এবং তংকালীন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা জালালুদ্দিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তিনি চাকমা রাজাকে মাতামুহুরী নদীর তীরবর্তী বারখানি গ্রাম প্রধান করে বসবাসের আদেশ দেন। বর্তমান বান্দরবন জেলার অর্ন্তগত আদিকদমে ১৪১৮-১৯ খ্রী. চাকমা রাজের রাজধানী স্থাপিত হয়। সেই থেকে তংচঙ্গ্যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আলীকদম কিংবা মাতামুহুরী নদী তীরবর্তী অন্যান্য এলাকায় বসবাস করে আসছে ।

ক্যাপ্টেন লুইন বলেছেন, চাকমা জাতির তিনটি শাখায় বিভক্ত: চাকমা, দৈংনাক ও তংচঙ্গ্যা। কিন্তু কর্ণেল ফেইরী বলেছেন, চাকমা ও তংচঙ্গ্যা বা দৈংনাকেরা ভিন্ন জাতি। এটা তংচঙ্গ্যারাও দাবি করে থাকে। স্যার রিজলী এদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্য দেখে প্রমাণ করেন যে এরা আদি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত জাতি।[১২০] ফ্রান্সিস বুখানন দক্ষিণ পূর্বে বাংলায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ভ্রমণ বিবরণীতে ও তনচঙ্গ উপজাতিকে চাকমাদের অন্তর্ভূক্ত সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তংচঙ্গ্যারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী কিন্তু তাদের ধর্মভাবে জড়োপাসনাধারা সম্পৃক্ত। ক্যাপ্টেন লুইন বলেছেন, Their religion is simple. It is the religion of nature. They worship the terrene elementsd, and have vague and undefined ideas of some divine power which over shadows all[121]

খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় অনেক উপজাতিই ধর্মান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু তংচঙ্গ্যারা এখনও সে মোহজলে আবিষ্ট হয়নি। কাজেই এরা এখনও আদিম সমাজভূক্ত হিসেবেই প্রাচীন বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যাকে ধরে রেখেছে।

৪.২৩ চাক বৌদ্ধ সম্প্রদায়:

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতি বৌদ্ধদের মধ্যে চাক সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। সাধারণত পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি থানার চাক (Chak)

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতি বসবাস করে। ১৯৯১ সালে আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে চাকদের জনসংখ্যা ২০০০ জন। ১৯৯৭ সালের হিসেবে ২১০০ এবং বর্তমানে প্রায় ২৫০০ জন। তবে চাক উপজাতীয় লোকেরা বার্মার (মায়ানমার) আরাকান অঞ্চলেও বাস করে।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে চাক'রা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক এবং ভাষার দিক থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অন্তর্গত। চাক উপজাতি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । তারা নিজেদেরকে 'আসাক' (Asak) বলে। বার্মার কাদু গানান এবং ভারতের মনিপুর রাজ্যের অধিবাসী আন্দ্রো উপজাতীয়দের ভাষার সাথে চাকদের ভাষার ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে। এমনকি চাকদের একটি দল বা গোত্রের নামও আন্দো।[১২২]

বর্মীরা চাকদেরকে সাক (Sak) বলে। তাদের মতে, সুদুর অতীতে বার্মায় যে তিনটি জনগোষ্ঠির বসতি ছিল তারা হল সাক (Sak) পিউ (Pyu) এবং কানরান (Kanran) [১২৩] প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে বলা যায় যে চাক সম্প্রদায় বার্মা থেকে আরাকান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে তারা বার্মা ও আরাকান সীমান্তবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানের নাক্ষ্যংছড়িতে বসবাস করে। "মিয়ানমার প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীন মায়ানমারে ব্রহ্ম, তৈলাং, কেরান, বিউ ও চাক নামক পাঁচটি প্রধান জাতি ছিল। এই চাকেরা উত্তর মিয়ানমারে বসবাস করত। মিয়ানমার প্রধান নদী ইরাবতীর একটি শাখার নাম চম্পা। চম্পা বা ইরাবতীর সঙ্গম স্থলে 'চম্পক' নামক একটি নগর ছিল। সেখানেই চাকরা বাস করতেন। এই চাকদের আদি নাম ঞংধশ মিয়ানমারী বা আরাকানী উচ্চারনে 'শাক' হয়ে গেল 'চাক' সম্ভবত কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে 'চাক' বংশজ লোকেরা এখনও বাস করে। এই 'চাক' শব্দ থেকে চাকমা শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে ধারণ করা হয়।" আরাকানী কিংবদন্তী মতে, আরাকানের প্রাচীন রামাবতী নগরে কোন এক সময়ে এই চাক সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। আজ ও আরকানের দক্ষিণাঞ্চলে এই চাক বা শাক সম্প্রদায়ের বসতি দেখা যায়। এ কারণে মনে করা হয়, থাইল্যান্ডের চম্বা বা মিয়ানমার ইরাবতী মোহনার প্রাচীন চম্পক নগরই চাকমা উপখ্যানের চম্পক নগর এবং চাকমারা সেখানকার অধিবাসী চাকদের উত্তরসূরী।

কর্ণেল ফেয়ার বলেছেন, চাক বা সাক শংকর সম্প্রদায়। আরাকানে আগত বণিক ও আরাকানী মহিলাদের বিয়ের ফলে এই শংকর চাক বা সাক / শেখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।[১২৪] চাক ভাষা টিবেটো বর্মন দলের সাক বা লুই দলভূক্ত ভাষা। চাকদের ভাষা মতে, সম্প্রতি মায়ানমারে চাকদের প্রাচীন বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতি সমূহের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের গোত্রগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাক সম্প্রদায়ের দুটি গোত্র রয়েছে। গোত্র দুটি হলো, আন্দ্রো (Ando) এবং ঙারেক (Ngarek)। তাদের সমাজে জন্ম বিবাহ, মৃত্যুর সময় এ দুটি গোত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। চাক সমাজের নিয়মনীতি অনুসারে সমগোত্রের অর্থাৎ একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে বিবাহ করে। এই জাতীয় রীতি চাকদের কেবল বিয়ে নয়; মৃত্যুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক গোত্রের লোকের মৃত্যু হলে অন্য গোত্রের লোককে মৃতদেহ দাহ (সৎকার) করতে হয়।[১২৫] চাকদের ধর্মীয় রীতিনীতি পূজা-পার্বণ বৌদ্ধধর্মের অনুসারে হয়ে থাকে। সামাজিক রীতি নিয়ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পোষাক, খাদ্যাভাস, জীবনযাত্রা, আচার আচরন, চাকমাদের সমপর্যায়ে।

চাকরা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে তবে তাদের স্বল্প সংখ্যক লোকের চাষযোগ্য জমি রয়েছে। পূর্বের তুলনায় চাকরা বর্তমানে সচেতন, সংস্কার প্রিয় এবং শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক উন্নত এবং আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের অনেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্য করছে। চাক সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদের মধ্যে প্রিয়তর চাক চেংখা, অংখ্যইং চাক, মংমং চাক, মংকিউ জাই চাক প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য।

৪.২৪ খিয়াং ও খুমি জাতিসত্তা

বাংলাদেশের পাবর্ত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত দুটি পৃথক জাতিসত্তা হলো খিয়াং (khyang) ও খুমী (khumi)। তারা কুকি ও চীন ভাষা ভাষী মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির লোক। তাদের ভাষাগুলো দক্ষিণ কুকি চীন দলের অর্ন্তগত। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পাবর্ত্য চট্টগ্রামে খ্যাংদের জনসংখ্যা হলো ১,৯৫৪ জন।[১২৬] তারা রাঙ্গামাটি পাবর্ত্য জেলায় তাম্বিসহ কয়েকটি মোজায় বসবাস করে। তবে বার্মায় বা মায়ানমারে খিয়াংদের অনেক লোক রয়েছে। খিয়াংরা নিজেদেরকে শো (Sho) বলে। এদের মধ্যে টোটেম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যকরা কযায়।

পাবর্ত্য চট্টগ্রামের এই উপজাতি গোষ্ঠি ধর্মে বৌদ্ধ এবং এরা আরাকান অঞ্চল থেকে আগত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠি। খুমী জনগোষ্ঠি আরাকানের কোলাডেং নদীর তীরে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় বাস করে। বাংলাদেশের খুমীরা ম্রো হরফ ব্যবহার করে থাকে। আবার মায়ানমারে খুমীরা ইংরেজী হরফ ব্যবহার করে থাকে। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে খুমিদের জনজনসংখ্যা হলো ১,২৪১ জন। ১৯৯৭ সালের হিসেব মতে, খুমি জনসংখ্যা ১,০৯১ জন। তারা বান্দরবান পাবর্ত্য জেলায় বিভিন্ন থানা ছিল। রোয়াংছড়ি ইত্যাদি থানায় বাস করে। এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বার্মার আরাকানের নদীর উপরাংশে বাস করে। জনশ্রুতি মতে, অতীতে আরাকানে ম্রোদের সাথে খুমিদের প্রচন্ড সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এর ফলে ম্রোদের একাংশের সাথে খুমিরাও পাবর্ত্য চট্টগ্রামে চলে আসে।[১২৭] উপজাতি খুমিরা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। তাদের কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমা-মারমাদের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে তাদের মধ্যে এখনো কিছু নিজস্ব পূজা ও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. চট্টগ্রামের ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি, আবদুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৬৪

২. প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, আবদুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১-২

৩. আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচিত্রা, ইতিহাস ও সাহিত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৩২

৪. আহমদ শরীফ, চট্টগ্রামের ইতিহাস (আদিপর্ব), আহমদ কবির ও আবুল হাসনাত সম্পাদিত, আহমদ শরীফ রচনাবলী-১, আগামী প্রকাশনী, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬২১

৫. প্রবন্ধ বিচিত্রাঃ ইতিহাস ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১, প্রবন্ধঃ আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য

৬. ইতিহাস পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৪, পৃষ্ঠা-৮৮, প্রবন্ধঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, চট্টগ্রামে মগ শাসন

৭. আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচিত্রাঃ ইতিহাস ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৫

৮. (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৮৪, প্রাগুক্ত, ইতিহাস পত্রিকা, পৃষ্ঠা-৮৯)

৯. সুকোমল চৌধুরী, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃষ্ঠা-১৫

১০. উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দি, বড়ুয়া জাতি, চট্টগ্রাম, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা-৭

১১. চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কৃষ্ণপদ গোস্বামী, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃষ্ঠা-১৩

১২. ড. সুকোমল বড়ুয়া, চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম ঃ সভ্যতা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, চট্টলশিখা, ২০০৩, ঢাকা

১৩. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সুকোমল চৌধুরী, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩৮০, পৃষ্ঠা- ৮৭

১৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৭৩

১৫. Hunter's statistical account of Bengal, Chittagong, page-193)

১৬. অহিতকুমার বন্দোপধ্যায় সম্পাদিত ১ম খন্ড) পশ্চিম বঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৭৩

১৭. প্রাগুক্ত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, সাধনকমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৯৪

১৮. প্রাগুক্ত, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন, সাধনকমল চৌধুরী, পৃষ্ঠা-৯৭

১৯. প্রাগুক্ত, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-১০

২০. প্রাগুক্ত, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-৭

২১. প্রাগুক্ত, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-৮

২২. সদ্ধর্মের পুনরুত্থান, পণ্ডিত ধর্মাধর মহাস্থবির, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৩

Dhaka University Institutional Repository

২৩. হাজার বছরের বাঙালি বৌদ্ধ, দীপক বড়ুয়া সৃজন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৭
২৪. হাজার বছরের বাঙালি বৌদ্ধ, দীপক বড়ুয়া সৃজন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৯
২৫. চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র তত্ত্বনিধি, গতিধারা, ২০০৪ ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩
২৬. বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১০
২৭. প্রাগুক্ত, দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, পৃষ্ঠা-৮৫
২৮. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সুকোমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩৮০, পৃষ্ঠা-৮৪
২৯. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২০৬
৩০. বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ
৩১. পূর্বোক্ত, চট্টগ্রামের ইহিাস, চৌধুরী পূর্নচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৭০
৩২. বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২০৮
৩৩. Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura, Heinz Bechart, 1967, Educational miscellany, Voi-IV, Nos-3&4
৩৪. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সুগত চাকমা, পৃষ্ঠা-১১, সমুজ্জল সুবাতাস, ২০০০, বান্দরবান, পৃষ্ঠা-১৪
৩৫. বিদ্রোহী পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি,মাহফুজ পারভেজ, সন্দেশ, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৩
৩৬. প্রাগুক্ত, বিদ্রোহী চট্টগ্রাম ও শান্তি চুক্তি, মাহফুজ পারভেজ পৃষ্ঠা-২৪
৩৭. The politics of nationalism the case of the Chittagong Hill Tracts, Amena Mohsin University Press Limited, 1997 Page-11
৩৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, সুগত চাকমা, রাঙ্গামাটি ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৫
৩৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা, হুমায়ন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩১-৩২
৪০. উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি, জাফার আহমাদ হানাফী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১
৪১. বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, ফেরদৌস হোসেন, নির্ঝর পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা-৭১ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, প্রদীপ্ত খীসা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৬
৪২. পার্বত্য শান্তি চুক্তি, গঙ্গাচুক্তি, ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, অজিত কুমার দাস, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১
৪৩. হাজার বছরের বাঙালি, দীপক বড়ুয়া সুজন, চট্টগ্রাম ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৬
৪৪. প্রাগুক্ত, ফেরদৌস হোসেন, পৃষ্ঠা-৭৮, প্রদীপ্ত খসী, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৫৩
৪৫. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
৪৬. চাটগাঁ, অভিষেক ২০০৫, চিটাগাং ইয়ূথ ফোরাম- ঢাকা, জুন-২০০৫
৪৭. পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৪-২৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. সিদ্ধার্থ চাকমা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১৩-১৪/ প্রাগুক্ত, বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি, পৃষ্ঠা-২৮

৪৯. মোঃ নূরুল আমিন ও অন্যান্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার একটি আত্নসামাজিক বিশ্লেষণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (সংখ্যা-৪২), ১৯৯২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫০. পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পাদিত), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-কথামুখ

৫১. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, সাইফুর রহমান চৌধুরী, calcutta, 1998, পৃষ্ঠা-১

৫২. পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৫

৫৩. বাংলাদেশের আদম শুমারী, ১৯৯১, উদ্ধৃতঃ ক্য শৈ প্রু, পার্বত্য উপজাতীয়দের ধর্মীয় প্রবণতাঃ প্রেক্ষিত বান্দরবান জেলা, সাংস্থ, উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা, বর্ষ-১, (৩য় খণ্ড), জুন ১৯৯৬

৫৪. সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, দীনেশ চন্দ্র সেন, ১৩৮৯, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-৩৯

৫৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, উ.সা.ই, রাঙ্গামাটি, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪১

৫৬. প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ড. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৯৭

৫৭. History and Culture of Bengal, Dr. A.K.Sur, Best Books, Calcutta, 1992, P. 19.

৫৮. সোসাইটিজ এণ্ড কমিউনিটিজ, নীলুফার বেগম নীলু, উপমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১

৫৯. প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, ড. রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৯৭

৬০. An Acconnt of Chittagong Hill Tracts, p.- 18, আবদুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে, পৃষ্ঠা-৩

৬১. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-২৫-২৬

৬২. ইতিহাস, বা.ই.প. ১০ বর্ষ, ১ম-৩য়, ঢাকা, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা-১

৬৩. বিরাজ মোহন রায়, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-১৫৫

৬৪. Sir A.P. Phayzre, History of Burma, London, 1883, P.79

৬৫. Willom Van. Schenel, Francis Buchanan in southeast Bengal (1798), University Press Ltd, 1992

৬৬. বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-২০৬

৬৭. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-২৩

৬৮. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, বিরাজ মোহন রায়, রাঙ্গামাটি, ১৯৬৯, পষ্ঠা-১২

৬৯. পূর্বোক্ত, উনিশ শতকে বাংলাদেশে সংবাদ সাময়িক পত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫৪

Dhaka University Institutional Repository

৭০. পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৮, প্রবন্ধঃ চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নন্দলাল শর্মা

৭১. সাইফুল রহমান চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৬

৭২ সুগত চাকমা, বাংলা দেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, চট্টগ্রাম, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৮

৭৩ দীপংকর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৪৮

৭৪. মারমা জাতিসত্তা, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭; ভূমিকা)

৭৫. প্রাগুক্ত, মারমা জাতিসত্তা,মুস্তাফা মজিদ, পৃষ্ঠা-৪৫, প্রবন্ধ- মং ক্য শোয়ে নু নেভী, মারমা সমাজ ও সংস্কৃতিঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

৭৬. আরাকানের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, আবদুল মাবুদ খান, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৯৭

৭৭. East Bengal & Assam District Gazettar: Chittagong thill tracts: P-97

৭৮. The linguistic survey of India, Dr. G.A. Grierson, Vol. III, Part III, P-341

৭৯. History Bengal, Jadunath sarker (ed), 2nd, Dhaka, p-19. 381.

৮০. Tribes & Castes of Bengal, Sir, M.H. Risely, Calcutta 1891, P-179

81. ভেলাম ভান সেন্দেল, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৮৭)

৮২. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৪৪

৮৩. A short thistory of south East Asia (4th Ed) D.G.E. Hall, Reprinted in 1985, Hongkong, 1955, P-291

84. Chittagong Hill Tracts District Gazetteer, RHS Hutchinson, Reprint Delhi 1978, Calcutta, 1909, P.

85. চাকমাজাতি, প্রতীক্ষা ঘোষ, ১৯০৯, পৃষ্ঠা-৩২

৮৬. পূর্বোক্ত, সতীশ চন্দ্র ঘোষ ১৯০৯, পৃষ্ঠা-৯৬

৮৭. আবদুল হক চৌধুরী, বৃহত্তর চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহের মঘ বা মারমা উপজাতি, প্রবন্ধ বিচিত্রা: ইতিহাস ও সাহিত্য বাংলা একাডেমী, বাংলা ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১২১ ও ১২৪।

৮৮. History of South East Asia, D.G.E. Hall, London, 1968, P. 388)

৮৯. Linguiastic Survey of India, G.A. Grierson, Vol.III, Part III, Calcutta, 1891, P.341

90. History of Barma, Col. A. Phayre. London, 1884, P. 48

৯১. History of Burma, G.E. Harvey, London, 1967, P.3

92. A statistical Account of Bengal, W.W. Hunter,Vol.V, London, 1875, P. 188,

Dhaka University Institutional Repository

93. বাংলাদেশের রাখাইন জাতিগোষ্ঠী, চেং থঁয়ে অং, পটুয়াখালীর রাখাইন জাতিসত্তা, মুস্তাফা মজিদ, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৪১-৪২
৯৪. History of Burma, Sir A.P Phayre, London,1883 P.41
95. Ibid, History of Burma, P. 42
96. A History of South-East Asia. D.G.E Hall, 4th ed, reprint 1985, Hongkong, P. 412
৯৭. A.History of Chittagong, Vol, L, Sumiti Bhushan Qangn, 1988, Chittagong,P, 183
৯৮. দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা), অনু. সালাহ উদ্দীন আইয়ুব, আইসিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৭৮
৯৯. দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা), আইসিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯
১০০. প্রাগুক্ত, আদিবাসী রাখাইন, পৃষ্ঠা-২৭, প্রবন্ধ আবদুল মাবুদ খান, পটুয়াখালী জেলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়
১০১. আদিবাসী রাখইন, মুস্তাফা মজিদ, দেশ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮৭, প্রবন্ধ, মুস্তাফা মজিদ, রাখাইন জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
১০২. Anthropology, E. A. hobel, the seedy of man, Mcgdraw thll Company, new youk,1966, PP.215-221
103. মং বা অং, রাখাইন জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৮৪)
১০৪. ময়নামতি, ৮ম, বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১,
১০৫. প্রাগুক্ত, দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, পৃষ্ঠা-৬২
১০৬. আদিবাসী রাখাইন, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), দেশ প্রকাশ, ঢাকা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮৪
১০৭. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৯৯
১০৮. আদিবাসী রাখাইন, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), দেশ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৯৮
১০৯. মং বা অং, রাখাইন জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৯৯
১১০. Government of Bangladesh, Bangladesh District Gazetter; Patuakhali, BG Press, Dhaka, 1982, P-48.
১১১. Franics Buchanon in South East Bengal (1798), Willem Van Schendal, Dhaka University Press Limited 1992, P-63, উদ্ধৃতিঃ বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৭৬
১১২. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮), ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পা), আইবিসিএস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯০

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. History of Burma, A.P. Phayre, London, 1883, P. 45, উদ্ধৃতি প্রাগুক্ত

১১৪. সমুজ্জ্বল সুবাতাস, ২০০০, বান্দরবান, পৃষ্ঠা-৯

১১৫. সমুজ্জ্বল সুবাতাস, ২০০৫, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৩৬, প্রবন্ধ:ম্রোদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সিং ইয়ং ম্রো

১১৬. দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, ভেলামভান সেন্দেল (সম্পা), আইসিবিএস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯০

১১৭. প্রাগুক্ত, সুগত চাকমা, পৃষ্ঠা-৭০, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১০৭

১১৮. Statistical Account of Bangal, Vol-VI, W.W. thmter, 1876, Trubner & co, london, P. 45

119. আব্দুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৭১

১২০. Sir H.H. Risely, Tribes and Costes of Bengal, Calcutta, 1891. Page-75

121. Captain T. H. Lewin, The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein. Calcutta 1869, Page-75).

১২২. বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, সুগত চাকমা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-১২৭

১২৩. Account of arakan, A.P. phayre, 1841 Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol-X, No-117

124. On the History of Arakans, A phayre, Journal of Asiatic soucty of bengal. No, 145, 1844, P-201-2

১২৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, সুগত চাকমা, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭২

১২৬. সমুজ্জ্বল সুবাতাস , ২০০০, পৃষ্ঠা-৯

১২৭. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের উপজাতি, ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, পৃষ্ঠা-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও বৌদ্ধমেলা

৫.১ ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়
৫.২ কুমিল্লার ময়নামতি
৫.৩ রাজশাহীর পাহাড়পুর
৫.৪ ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিহার
৫.৫ ঐতিহ্যবাহী চক্রশালা
৫.৬ রামু রামকোট বিহার
৫.৭ বুড়াগোসাই
৫.৮ সীতাকুণ্ড বৌদ্ধতীর্থ
৫.৯ দেয়াঙ্গ
৫.১০ দেব পাহাড়
৫.১১ মহামুনি পাহাড়তলী
৫.১২ বাংলাদেশের বৌদ্ধঐহিত্যের বৌদ্ধমেলা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও বৌদ্ধমেলা

বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য অত্যন্ত প্রাচীন। বাংলার ইতিহাস এবং বৌদ্ধ ইতিহাস একই বস্তে, তথ্য, উৎস এবং সাঙ্গীকরণে অভিন্ন। বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্যের কালজয়ী প্রভাব ছিল অভিসম্পাত। বাংলার তথা বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি; বৌদ্ধ ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত এবং অচিচ্ছেদ্য। বিশ্ব ইতিহাসে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও গৌরবকে ধারণ করে বাংলাদেশের বিস্তৃতি গৌরবোজ্জ্বল পরিচয়। বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে, ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিহার, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ময়নামতির শালবন বিহার, মহাস্থানগড়ের পুণ্ডবর্ধন বাসু বিহার, বিক্রমপুরের বিক্রমশীল বিহার ইতিহাস খ্যাত। (বিক্রমশীল মহাবিহারের বাঙালি পণ্ডিতগণ আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রীমিত্র, বজ্রাচার্য, অভয়াকরগুপ্ত, কমলশীল, হরিভদ্র প্রমুখ) পণ্ডিত শীলভদ্র চন্দ্রগোমিন, শান্তরক্ষিত, চর্যাকার লুইপা, কাহ্নপা, বাংলার সত্যসূর্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বৌদ্ধপাল রাজাদের গৌরব গাথা বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যে স্বমহিমায় একাকার হয়ে আছে।

প্রাচীন বঙ্গভূমির ঐতিহ্যবাহী জনপদ হরিকেল, সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন কিংবা প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। প্রাচীন বাংলা তথা আধুনিক বাংলাদেশ হলো বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্যের লীলাভূমি। প্রাচীন ভারতবর্ষোত্তর বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই বঙ্গভূমি।

কোন দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতি এক দিনে বা অতি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ একটি মাত্র মানবগোষ্ঠির চেষ্টায় গড়ে ওঠেনা। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি সুদীর্ঘকাল ক্রমবিকাশের ধারায় প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি তারই অনিবার্য অংশ। কোন জাতির যথার্থ পরিচয় তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা-আনন্দোৎসব, জীবন-জীবিকা ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। এই রীতি প্রথার অনুষ্ঠানাদি অনুসরণের মধ্যে দিয়ে জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সভ্যতা সংস্কৃতি ছাড়া কোন জাতির যথার্থ পরিচয় হতে পারে না। তাই বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধরণ ও করণের রূপরেখা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যসমুহ বৌদ্ধ নিদর্শন। বিহার, মহাবিহার, সংঘারাম, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতির পীঠস্থানগুলো বৌদ্ধযুগের কালজয়ী অবিস্মরণীয় অবদান। বাংলাদেশে এ যাবৎ আবিস্কৃত প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে ১) বগুড়ার মহাস্থানগড়ের বাসু বিহার ২) রাজশাহী পাহাড়পুর নওগাঁর সোমপুরী বিহার, হলুদ বিহার, জগদ্দল বিহার ৩) কুমিল্লা লালমাই ময়নামতির শালবন বিহার, ৪) চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার, ৫) পটিয়ার চক্রশালা, ৬) সীতাকুন্ড বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিহার ৭) কক্সবাজার রামুর রামকোট বিহার ৮) দিনাজপুরের সীতাকুট বিহার এবং ৯) যশোহর খুলনা অঞ্চলের ভরত ভায়না বিহার ১০) ঢাকা-মুন্সীগঞ্জের বিক্রমশীলা/ বিক্রমপুরী মহাবিহার।

বাংলার প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

৫.১ ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সবচেয়ে প্রাচীনতম স্থান মহাস্থানগড়। তৎকালীন বাংলা অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ছিল পুণ্ড্র। বর্তমানের বগুড়া শহর থেকে সাত/আট মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই হচ্ছে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। মৌর্যযুগের একটি শিলালিপিতে এ স্থানকে পুণ্ড্রনগরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে স্রোতস্বিনী করতোয়া (ক-লো-টু) নদীর তীরে পুণ্ড্রনগর গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে আর্যদের আগমনের পূর্বে পুণ্ড্র নামের জনগোষ্ঠিই ছিল আদি বাসিন্দা। এটি বৌদ্ধ শিক্ষা, বিদ্যায়তন ও ঐতিহ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিল। ইতিহাসে পুণ্ড্রবর্ধন সমগ্র বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগরী। এটি অনাদি কাল থেকে বাংলার প্রাণকেন্দ্র।

এতে আনু. ৩য়-২য় খ্রিষ্টপূর্ব থেকে খ্রিষ্টীয় ১৫ শতক পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।[২] এক সময় প্রাচীন বাংলার রাজধানী পুণ্ড্রনগরে চীনদেশের পর্যটক হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে (৬৩৮-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর বর্ণনায় সমৃদ্ধশালী ও ঐশ্বর্যশালী শহর পুণ্ড্রনগরের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন পুণ্ড্রবর্ধন ছিল এক কোলাহল মুখরিত জনাকীর্ণ বিশাল নগরী ও প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র। প্রাচীন সভ্যতায় গড়ে উঠেছিল প্রশস্ত পথঘাট, দুর্গ, সেনানিবাস, উচু দালান কোঠা, শিক্ষাকেন্দ্র, নৌবন্দর প্রভৃতি। বহুদূর দেশ থেকে এখানে আসতেন বিদ্যানুরাগী, সওদাগর এবং রাজদূত সহ নানা শ্রেণীর মানুষ।[৩] পুণ্ড্রনগর বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য মতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক থেকে ১৫ শ শতক পর্যন্ত মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও হিন্দু সামন্ত রাজবংশের আমলে এটি প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।[৪] মহাস্থান ছিল বৈশালী, পাটলিপুত্র কৌশম্বির মতো গাঙ্গেয় উপত্যকার আদি ঐতিহাসিক নগরসমূহের সমসাময়িক।[৫] হিউয়েন সাং পুণ্ড্রনগরের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি দুর্গনগরীর কাছেই এক বিরাট বিহার বা সংঘারাম দেখেছিলেন, যার নাম 'পো-শি-পো বিহার' (Po-shi-po) অর্থাৎ ইতিহাসে উল্লেখিত ভাসু বিহার। মহাস্থান গড় থেকে প্রায় ৩-৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে একটি বিস্তৃত প্রত্ন এলাকা জুড়ে ভাসু বিহার। হিউয়েন সাং উল্লিখিত পা-শি-পো বিহার হিসেবে কানিংহাম এ বিহার ঢিবিসমূহ শনাক্ত করেন। ১৯৭৯-৮৩ সালে বিহার ঢিবিতে উৎখনন পরিচালনার মাধ্যমে ৩৭টি কক্ষ বিশিষ্ট একটি ছোট আকারের বিহার (মঠ) আবিস্কৃত হয়। এতে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে ৬০টি ব্রোঞ্জের ক্ষুদ্র মূর্তি, ২৭টির

বেশি পোড়ামাটির ফলক এবং ২৫০ টিরও বেশি সীল।[৬] সম্রাট অশোক নির্মিত বুদ্ধের দেহ ভস্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্মারক স্তম্ভ ছিল।[৭] এই বিরাট সংঘারাম আয়তন, বরুজ ও পটমণ্ডলের উচ্চতার জন্য এর খুব খ্যাতি ছিল। এতে ৭০০ মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকতেন। ক্যানিংহাম সনাক্তকৃত মহাস্থান থেকে চার মাইল পশ্চিমে ৮০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৭০০ ফুট প্রস্থের বাস্তস্তূপ স্থাপনাটি ভাসু বিহার। ২০ শতকের শুরু থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত মহাস্থানে বেশ কয়েকটি উৎখনন কার্য চালানো হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রাচীন বিহার ও সংঘারাম ধ্বংস স্তূপটি ১৯২৮-২৯ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম খননকার্য শুরু করা হয়।[৮] এরপর পরই রগুড়ার আইনজীবি প্রভাষ চন্দ্র সেন ১৯৩৪-৩৬ সালে গোকুল মেড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালিয়ে বৌদ্ধ বিহারের সুউচ্চ বেদী বের করা হয়েছে। অত্যন্ত উঁচু ভিত্তি ভূমির উপরে বিহারটি নির্মিত হয়েছিল, এখন পর্যন্ত টিকে থাকা ভূমির উচ্চতা হচ্ছে ৪৩ ফিট। মূল বিহারে চারিদিকে মৌছাকের খোপের মতো ১৭২টি কক্ষ রয়েছে।[৯] এর কক্ষগুলি প্রতিটি আলাদা আলাদা আয়তনের এবং এগুলোতে কোন দরজা-জানালা নেই। বিহারে মোট ২৪টি ধার। গোকুল মেড় থেকে উদ্ধার করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সম্ভবত খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে এখানে একটি সুউচ্চ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই বৌদ্ধ স্তূপটি ভেঙ্গে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সেন শাসনামলে এখানে বর্গাকার উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়েছিল, যার প্রতিটি দিক বা বাহু ছিল ২৭ ফিট পরিমাপের। এটি তখন শিব মন্দির ছিল।[১০] এটিতে ২৬টি বাসোপযোগী কক্ষ ছিল এবং পূর্ব ও পশ্চিম নামে দুটি বিহার ছিল।[১১] বাসু বিহারে একটি লিপিযুক্ত সীলে দেবনাগরী হরফে লিখিত আছে- 'মহাশিবপুর মহাবিহার শ্রী ধর্মে আর্য ভিক্ষু সংঘস্য।'[১২] ইতিহাসে দেখা যায় পাশাপাশি অবস্থিত পুণ্ড্র ও মগধের মধ্যে বহুযুগ আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য। এছাড়াও বুদ্ধের সমসাময়িক কালে মগধ এবং প্রাচীন বাংলার একাংশ একই রাজ্যভূক্ত ছিল। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ ও ঐতিহ্যে প্রমাণ আছে যে, বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনে আগমন করেন এবং এখানে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করে ছিলেন। ভৌগোলিক ইতিহাস মতে, মহাস্থানগড় একটি দুর্গনগরী। এটি উত্তর দক্ষিণে এক মাইল লম্বা এবং পূর্ব পশ্চিমে এক মাইলের কিছু কম চওড়া। প্রায় ২৫৫০ বছর আগে এখানে নগরীর অস্তিত্ব ছিল। এতে বহু পুরাকীর্তি রয়েছে। যেমনঃ গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, খোদাই পাথর ভিটা, মানকালীর ভিটা, পরশুরামের প্রসাদ, জীয়ৎ কুণ্ড, বাসু বিহার, নরপতির ধাপ, পরশুরামের সভাবাটী, গোকুল মেড, লক্ষীন্দরের মেড় প্রভৃতি।[১৩] বর্তমানে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে মহাস্থানগড় মিউজিয়াম।

সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন নগরী, বৌদ্ধ স্থাপনা ও বিহার ধ্বংস হয়ে যায়, নামান্তর করা হয়, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি হয়ে যায় হিন্দু সভ্যতায়, মুসলিম ঐতিহ্যে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণিত হয়েছে নরপতির ধাপ, গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগী ভিটা, খোদাই পাথর ভিটা, বাসু বিহার,

Dhaka University Institutional Repository

গোকুল মেড, লক্ষীন্দরের মেড় ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, উপাসনালয় এবং স্তূপ। বেহুলা লক্ষীন্দরের কিংবদন্তি জড়িত গোকুল মেড় মহাস্থানগড় দুর্গ থেকে এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সুবিশাল এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটির অবস্থান মহাসড়ক থেকে দূরত্ব ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার।

খ্রিষ্টীয় বার-তের শতকের দিকে রচিত 'করতোয়া মাহাত্ম্য' নামের একটি সংস্কৃত পুস্তিকায় সর্বপ্রথম মহাস্থানের অবস্থান বিবরণসহ পুণ্ড্রকেন্দ্র (পুণ্ড্রদের স্থান) নামের উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক পৌরাণিক ও মহাকাব্য সাহিত্যে 'পুণ্ড্র' নামে একটি জাতি, এক প্রজাতির ইক্ষু ও পান্ডু রোগের উল্লেখ আছে। এছাড়াও গুপ্ত, পাল ও সেনদের বহু তাম্রফলকে পুণ্ড্রবর্ধনের (Pan-na-fa-an-na) উল্লেখ রয়েছে। এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে, পুণ্ড্র পদটি একটি জাতি বা প্রজাতির ইক্ষু অথবা পান্ডু নামে রোগের শহর বা নগর নির্দেশ করে। মহাস্থান নামের শব্দগত অর্থ রাজধানী বা 'তাৎপর্যময় স্থান'। ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ বলেছেন,'মহাস্থান' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিখ্যাত স্থান। বৌদ্ধ আমলে প্রাচীন ধর্মীয় পীঠস্থান হিসেবে মহাস্থান নাম অর্জন করে। ধারনা করা হয় এখানে প্রচুর পুণ্ড্র বা আখ পাওয়া যেত বলে নাম হয়েছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্র বা পুড বা পুন্দ শব্দের অর্থ আখ। পুণ্ড্র একটি জাতিরগোষ্ঠির নাম যা থেকে হয়েছে বর্তমান পোদ। 'পুণ্ড্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইক্ষু বা গুড়। ড. সুকুমার সেন বলেন, পুণ্ড্র শব্দের অর্থ এক জাতের আখ। পুণ্ড্র জাতি ও দেশ-উভয় সংজ্ঞার্থক শব্দ।

কোন কোন পণ্ডিতদের অভিমত 'মহাস্থানগড়' শব্দটি 'মস্তানগড়' নাম থেকে জন্ম নিয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এই গড়ের ভিতরে ও বাহিরে বেশ কিছু পুরাকীর্তি আবিস্কৃত হয়েছে, যেগুলো খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্যবাহী। নগর স্থাপত্যে মহাস্থানগড় রাজধানীর নগরীর কেন্দ্র স্থলে প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ ছিল। এর দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে গভীর পরিখা এবং পূর্বে করতোয়া নদী দ্বারা শহরটি সুরক্ষিত ছিল। বগুড়া জেলা সদর থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে জীর্ণ-শীর্ণ করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।

মহাস্থান নামটির সাথে 'গড়' শব্দটির পরে সংযুক্ত হয়। প্রচলিত অর্থে 'গড়' বলতে প্রাচীর বা পরিখা ঘেরা সুরক্ষিত স্থান বা প্রাচীন দুর্গ এবং নগরের বৈশিষ্ট্য। সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি পুরু প্রাচীন ইটের দ্বারা প্রাচীর বেষ্টিত দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফুট ও প্রস্থ ৪৫০০ ফুট এ প্রাচীন নগরটি ১৮৭৯ সালে ক্যানিংহাম পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন।[১৪] উনবিংশ শতক থেকে এ স্থানটি ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও বিদগ্ধ পণ্ডিতগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। এদের মধ্যে বুকানন হেমিলটন (Frances Buchanan Hamilton), ওভোনেল রেভারিজ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮০৮ সালে সর্বপ্রথম মি. বুকানন হ্যামিল্টন মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের বিবরণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম (Alexander Cunningham) ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড় ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করেন।[১৫] মূলত তার প্রতিবেদন থেকে এ স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তদানীন্তন ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ বিভাগ ১৯২০ সালে মহাস্থানগড়কে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে প্রজ্ঞাপন জারী করেন। এ গড়ের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে প্রায় ৭ কি.মি. (৪ মাইল) স্থান জুড়ে বিভিন্ন আকারে অসংখ্য প্রত্নকেন্দ্রে রয়েছে। ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম প্রত্নতাত্ত্বিকগণের (কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত) তত্ত্বাবধানে মহাস্থানগড়ের খনন কার্যে সূচনা হয়। ১৯৩১ সালে মহাস্থানগড়ে উদ্ধার করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে একটি চুনাপাথরে উৎকীর্ণ অশোকের ব্রাহ্মীলিপিতে ৬ লাইনের শিলালিপি। সর্বশেষ ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রত্নকেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে কয়েকদফা খনন কার্য পরিচালিত হয়েছে।[১৬] মহাস্থানগড়ে প্রায় সাড়ে ছয় কি.মি. উত্তর পশ্চিমে বাসু বিহার অবস্থিত। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪ এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৬৬ এই দুই পর্যায়ে মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালানো হয়।

মহাস্থাগড়ে প্রাপ্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননির্দশনের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি শিলালিপি ও মূর্তি। পালি জাতক, দিব্যাবদান, জৈনকল্পসূত্র, বোধায়ন ধর্মসূত্র, বৃহৎকথা মঞ্জরী, রাজত রঙ্গিনী, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণে পুণ্ড (পউনড্র) বা পুণ্ড্রবর্ধনে নামের উল্লেখ দেখা যায়।[১৭] প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহাম মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিস্কৃত ব্রাহ্মী হরফে লিখিত ছয়টি চরণ উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধার থেকে প্রমাণ করেছেন যে, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মৌর্য বংশের মহামতি সম্রাট অশোকের (২৭৩-২৩৩ খ্রিষ্টপূব) একটি রাজাদেশ। এতে বর্ণিত আছে যে, 'অজন্মার কারণে পুণ্ড্রনগরের প্রজারা দুর্ভোগের শিকার (বাংলায় প্রথম দূর্ভিক্ষ) হয়েছিল। অতএব পুডনগল বা পুণ্ড্রনগরের উপারিক (মহামাত্র) তাদেরকে রাজকোষ থেকে ধাণ্য গন্ডক ও কার্কণিক মদ্রা দিয়ে সাহায্য প্রদান করবেন। সুদিন ফিরে এলে প্রজারা মুদ্রা অথবা ফসলের মাধ্যমে এ ঋণ পরিশোধ করবে।' নির্দেশটি জারী হয়েছিল পুণ্ড্র নগরের মহামাত্যের উপর (প্রাদেশিক শাসনকর্তা)। ১৯৩১ সালে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে জমি চাষের সময় এক কৃষক এই লিপি খোদিত পাথরের টুকরা উদ্ধার করেন। পাঠোদ্ধারে প্রমাণিত হয়, এটি শুধু মহাস্থানের নয়, সারা বাংলাদেশের (পশ্চিমবঙ্গসহ) প্রাচীনতম লিখিত দলিল। বিভিন্ন আক্রমণ ও যুদ্ধ সংঘাতে খ্রিষ্টীয় সাত শতকে মহাস্থান ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

হিউয়েন সাঙ (৬২৯-৬৪৫) করতোয়া (ক-ল-তু) নদী পার হয়ে কামরূপ রাজ্যে গিয়েছিলেন। তিনি কর্ণসুবর্ণ(মুর্শিদাবাদ জেলা), তাম্রলিপ্তি (হুগলীজেলা) এবং সমতট অঞ্চল (কুমিল্লা জেলা) অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখেন। ৬৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে এদেশে ওয়ান চুয়াঙ (হিউয়েন সাঙ) চৈনিক বৌদ্ধ ভিক্ষু পুণ্ড্রবর্ধন (পুন-ন-ফ-তন) পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি বিরাট নগরের আশে পাশে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবরণে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন নামে একটি সামান্ত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। আর পুণ্ড্রনগরে বিশটি বৌদ্ধ বিহার এবং বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বাস করত। মহাস্থান গড়ের দুর্গের ৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে নাগর নদীর পাশে বিহার ও বাসু বিহার গ্রাম দুটি খননে বৌদ্ধ পুরাকীর্তির দুটি বিহার আবিস্কৃত হয়েছে। একটি বৌদ্ধ বিহারের

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণে হিউয়েন সাঙ বর্ণনা করেছেন এখানে ৭০০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু অবস্থান করতেন। তিব্বতী বৌদ্ধ ভিক্ষু লামাতারনাথের (১৬০৮ খ্রি.) বিবরণী এবং 'পাগ সাম যোন যঙ' (চধম-ঝধস-ঔড়হ-তধহম) নামক তিব্বতী সূত্রে এ সময় কালকে রাজাবিহীন বিশৃঙ্খল যুগ (মাৎস্যন্যায়) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাশ্মীরের রাজসভার ঐতিহাসিক পণ্ডিত কলহন এর রাজত রঙ্গিনীতে এ তথ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। অন্যএক সূত্রে, আট শতকে উড়িষ্যার শৈলবংশ (শৈলোদ্ভব) এব রাজা সৌধবর্ধন আনু: ৭২৫ খ্রি. পুণ্ড্রনগর আক্রমণ করে পুণ্ডরাজাকে হত্যা করেন। (প্রাগুক্ত, ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়, পৃষ্ঠা-৬৬)

মহাস্থান এলাকায় বিভিন্ন সময় খননের ফলে আবিস্কৃত প্রত্নসম্পদগুলো মহাস্থান জাদুঘরে রক্ষিত আছে। উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু হলো পোড়ামাটির চিত্রফলক তৈজসপত্রাদি, শিলালিপি, স্তূপ, স্থাপত্য, বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধমূর্তি, পাথর ও ব্রোঞ্জের দেবদেবী মূর্তি, অলংকৃত ইট, মূল্যবান পাথরের নকশী গুটিকা, সোনার অলংকার, সিলমোহর, লোহার তৈরি বর্শ্যাফলক, তীর, চাকু, তামার তৈরি আংটি, পদক, অষ্টধাতুর বালা, রৌপ্যমুদ্রা ও ছাচঢালা তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এছাড়াও খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকের শুঙ্গ টেরাকোটা ফলকের নির্দশন পাওয়া গেছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত মঞ্জুশ্রী দেবীর স্বর্ণমূর্তি (বর্তমানে বরেন্দ্র রিচার্স মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম, ঐতিহাসক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, ড. রমেশ চন্দ্র, মজুমদার, ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ড. বি.সি.ল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ, ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, ড. নীহার রঞ্জন রায়, ড. আব্দুল মমিন চৌধুরী প্রমুখ মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলালেখটি বাংলা অঞ্চলের অভ্যন্তরে ইতিহাসের সরাসরি লিখিত দলিল। [১৮] তাঁদের সকলের অভিমত পুণ্ড্রনগর পরবর্তীকালে পুণ্ড্রবর্ধন অভিধা লাভ করেছিল। ১৯৩১ সালে ৩০ নভেম্বর বগুড়ার বরু ফকির নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি শিলালেখ পায় মহাস্থানগড়ে। এর নাম 'মহাস্থান শিলালেখ'। মৌর্য বা মৌর্যোত্তর যুগের কোনো শাসনকর্তা পুডড়নগল (পুণ্ড্রনগরে)।

[মহাস্থান শিলালেখতে 'সমবঙগিয়াম' শব্দ দ্বারা ভান্ডারকর (Banderkar) বোঝাতে চান 'সমবঙ্গীয়' জনগোষ্ঠি। ডি.সি. সরকার এর মতে, এটি 'সমবর্গিয়েব্যা' এর দ্বারা বোঝায় 'সমবর্গ অঞ্চলের জনগণ'। ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে, শব্দটির 'ষড়বর্গিকানাম' যার দ্বারা বোঝায় বৌদ্ধ 'ষড়বর্গিক সম্প্রদায়'। পালি, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ড. বড়ুয়ার মত সঠিক বলে মনে হয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা অনুসারে 'সম' উপসর্গটি ক্রিয়াপদের আগে বসে অথচ একানে বসেছে 'জাতি' এবং 'নামবাচক' বিশেষ্যের আগে। (এরিয়ানাইজেশন অফ নর্থ বেঙ্গল (প্রবন্ধ), অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, [১৯] মহাস্থানে সুঙ্গ আমলের (খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫-১৪৯ অব্দ) পোড়ামাটির মূর্তিও পাওয়া গেছে। নোয়াখালীর শিলুয়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিরাট মূর্তির পাদ পীঠে ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত লিপি দেখে পণ্ডিতেরা মনে করে তা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। মহাস্থান কুষাণ আমলের (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতক) মুদ্রাও পাওয়া গেছে। [২০]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ শাসনামলের চন্দ্র মৌর্য গুপ্ত ও পাল পর হিন্দু রাজাদের শাসন বর্মন ও সেন বংশ এবং পরবর্তীতে মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খলজী (১২০৪-৫ খ্রিঃ) বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জয় করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কালে কালে মহাস্থানগড় পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ১৭৬৩ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি ফকির মজনু শাহ মস্তানা বুরহানার নেতৃত্বাধীন ফকির সম্প্রদায় এ স্থানকে তাদের কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র রূপে এবং নিভৃত আশ্রয় হিসেবে গড়ে তুলেছিল।[২১] ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্রে তাই মহাস্থানগড়কে মজনু শাহের দুর্গ হিসেবে উল্লেখ আছে। ২৬ জুন ১৭৭৬ সালে দিনাজপুরের প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অফ রেভিনিউ এসি ফান্সিস গ্লাডউইন এক চিঠিতে লিখেছেন, ১৭৭৬ সালে মহাস্থানগড়ে মজনু শাহ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কত রঙ্গ বঙ্গ এই বাংলার মহাস্থানগড় বৌদ্ধ> হিন্দু> ইংরেজ> মুসলিম। পরিশেষে পুণ্ড্রনগর নামের প্রাচীন শহরটি সর্বপ্রথম মৌর্যদের একটি বিভাগীয় শাসনকেন্দ্র হিসেবে তার যাত্রা শুরু করেছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় পাঁচ শত বছর করে গুপ্ত সম্রাটদের শাসনামলে এটি উপশহর বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টিয় শত শতকে শহরটি একটি ধর্মকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নাজিমুদ্দিন আহমেদ বলেন, মুসলিম শাসনামলে এর নাম হয় মস্তান নগর।[২২] বিভিন্ন সূত্রে প্রাচীন নগরীর নামটি আছে চুনাপাথরের ব্রাহ্মীলিপিতে পুণ্ড্রনগলতে এগার শতকের সন্ধ্যাকর নন্দী ও কলহনের বর্ণনায় নামটি 'পুণ্ডবর্ধনপুর' লিখা হয়েছে। 'করতোয়া মাহাত্ম্য' গ্রন্থে পুণ্ডনগর হিসেবে উল্লেখ আছে। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের ক্ষেমেন্দ্র ও গোবিন্দ সুবর্ণ বর্ষের ৮৫৫ শতকের সাঙুলি তাম্রপটে 'পুণ্ডবর্ধন নগর' হিসেবে স্থান লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে স্বাধীনতা হারানোর পর মৌর্য, গুপ্ত ও পাল আমলেও এর রাজধানীর মর্যাদা অটুট ছিল।[২৩]

৫.২ কুমিল্লার ময়না মতি

প্রাচীন বাংলায় সর্বপ্রথম যেসব স্থানে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো কুমিল্লা ময়নামতির লালমাই। এই ময়নামতি নাম লোকগাথা ও লোকগীতির প্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশীর রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মাতা কিংবদন্তীর রাণী ময়নামতির নাম জড়িত। এটি লালমাই বা রোহিত গিরি নামেও পরিচিত। প্রাচীন তাম্রশাসনে সমতট ও পট্টিকেরা নাম সমধিক উল্লেখ আছে। কুমিল্লা জেলা শহর হতে ৫-৬ মাইল পশ্চিমে,উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃর্ণ এলাকা নিয়ে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী অঞ্চল গঠিত। এখানে প্রলম্বিত আছে ছোট বড় পাহাড়শ্রেণী। এ পাহাড়শ্রেণীর উত্তরাংশের নাম ময়নামতি আর দক্ষিণাংশের নাম লালমাই। এ লালমাই ময়নামতির ইতিহাস ঐতিহ্যমণ্ডিত। এখানকার সমস্ত পাহাড়গুলিই প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে পূর্ণ। ১৮০৩ সালের প্রথম দিকে রণরঙ্কমল্ল হরিকালদেবের একটি তাম্রলিপি আবিস্কৃত হয়। ১৮ শতকের শেষে ফ্রান্সিস বুকানন এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৯১৭ সালে এন. কে. ভট্টশালী ময়নামতি ভ্রমণ করেন এবং Iconography of Buddhist and

Dhaka University Institutional Repository

Bratimanical Sulptrure in the Dacca Museum (১৯২৯) গ্রন্থে এ ভ্রমণ রিপোর্ট অন্তর্ভূক্ত করেন। [২৪] ১৮৭৫ সালে ইস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার রচনায় সময়েই এই বিস্তৃত এলাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। [২৫] লালমাই ময়নামতিতে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সেনানিবাস। ১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এ সেনানিবাস তৈরির সময় পাহাড় শ্রেণীতে থেকে মাটি কাটতে গিয়ে বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়।[২৬] Archaeology Survey of India এর সুপারিবন টেন্ডেন্ট টি. এন রামচন্দ্রন এ অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং তাঁর বিস্তারিত রির্পোটটি ১৯৪৬ সালে BC Law volume pt. II এ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু করে এখনও বিভিন্ন প্রত্নস্থল উৎখনন কার্য অব্যাহত রয়েছে। এতে জানা যায় এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য এবং উপমহাদেশের একেবারে পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য হারিয়ে যাওয়ার আগের ক্রমবিকাশের ধারা। আমেরিকার পণ্ডিত ব্যারী এম. মরিসন ২০ শতকের ষাটের দশকের শুরুতে এ অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করেন এবং এর ফলাফল ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ Lalmai@ A Cultural Center of Early Bengal-এ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ সমূহের সর্বাধিক সংগ্রহ এখানেই। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রমাণিত হয় যে, এই অঞ্চলটিই ছিল প্রাচীন বঙ্গ-সমতটের (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ হতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকাটি বৌদ্ধ সভ্যতা ও ধর্মের একটি কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। ময়নামতি এলাকাটি প্রাচীনকালে সমতট রাজ্য বলে পরিচিত ছিল। ময়নামতি বা (মদনামতি) নামটি চন্দ্রবংশীয় রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মায়ের নাম থেকে ময়নামতি হয়। এর পূর্ব নাম সমতট জনপদ। এই সমতট অঞ্চলে আদি থেকে বৌদ্ধ রাজ বংশের রাজত্ব ছিল। এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৪র্থ শতকের এলাহাবাদ পিলার লিপি হতে সমতট রাজ্যের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। [২৭] এখানে ৭ম-১৩শ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। বি.সি.ল ভল্যুম পার্ট-২ তে প্রকাশিত তাঁহার এই প্রবন্ধের ফলেই প্রাচীন সমতটের শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার সূত্রপাত হইয়াছে। [২৮] ঐতিহাসিকদের অভিমত এটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এখানে বিভিন্ন দেবদেবী, বিভিন্ন প্রকৃতির পোড়ামাটির চিত্রফলক, ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, ভাস্কর্য, মুদ্রা ইত্যাদি প্রাচীন দ্রব্যাদি আবিস্কৃত হয়। এ প্রত্নসামগ্রিগুলি অধুনালুপ্ত রামমালা যাদুঘরে রাখা হয়েছিল। [২৯] ঐতিহাসিক প্রাচীন বিবরণী মতে, এটি ক্রুশাকার কেন্দ্রিয় বিহার। যেমনটি ছিল পাহাড়পুর সোমপুরী বিহার ও কুমিল্লার শালবন বিহার। পরবর্তীতে ১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর প্রধান ড. ডি. আর ভান্ডারকার এই এলাকাটি পরিদর্শন করেন এবং জরুরী ভিত্তিতে পদেক্ষপ নিয়ে লালমাই ময়নামতি অঞ্চলে জরিপ কার্য চালিয়ে ৫৫ টিরও অধিক প্রত্নস্থলের সন্ধান পান এবং সংস্করণের জন্য নির্ধারিত করে। [৩০] প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, হিউয়েন সাং

Dhaka University Institutional Repository

আনুমানিক ৬৩৯ সালে এই এলাকা এসে সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত কীর্তিসমূহ দেখেছিলেন। তাঁর বর্ণনায় রাজধানী, রাজপথ এবং সংঘারামের উল্লেখ আছে। চীনা ভাষায় কিয়া-জলং কিয়া হলো কমলাংক বা কুমিল্লা নাম প্রমাণিত হয়েছে। তিনি তাঁর গুরু বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শীলভদ্রের জন্মস্থান সমতটের রাজধানী কর্মান্ত নগরে (বর্তমান কুমিল্লার বড়কামতা) এসে ৩০টি সংঘারাম ও ২০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেছিলেন। রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে সম্রাট অশোকের নির্মিত বৌদ্ধস্তুপ দেখেন। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিংও এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি যেসময় (৬৭৩ খ্রি.) সমতটে বড়কামতা এসে ছিলেন সে সময় খড়্গবংশীয় রাজা রাজভট্টের রাজধানী ছিল।[৩১] বাংলার ইতিহাসের খড়্গ রাজবংশ সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন (৬৩০ থেকে ৭০০ খ্রি.)।

ময়নামতি ঐতিহাসিক পটভূমি মতে প্রাচীন সমতট রাজ্যে মৌর্য, গুপ্ত, খড়্গ, দেব, রাত, চন্দ্র, বর্মণ পাল বংশের রাজারা সুদীর্ঘ কাল রাজত্ব করেন। শালবন বিহার খননের সময় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বৌদ্ধরাজ বংশ দেব ও খগড় বংশের রাজাদের নাম ও বংশানুক্রম এবং রাজাদের উপাধি ধর্মচক্রে অঙ্কিত শ্রী ভঙ্গাল মৃগাঙ্কস্য। দেব ও খড়্গ বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের সমস্ত তাম্রশাসনগুলিতে বৌদ্ধধর্মের সার্বজনীন প্রতীক 'ধর্মচক্রের উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট মৃগ' ব্যবহার করেছেন। শালবন বিহারে এ পর্যন্ত ৩য়-৮ম শতাব্দের বহু মুদ্রা, স্মারকাধার, তাম্রশাসন, ১৫০টির অধিক ব্রোঞ্জের মূর্তি, ব্রোঞ্জ ও বেলে পাথরের দেবদেবীর মূর্তি। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণে, রাজা রণবঙ্কমল্ল শ্রী হরিকেল দেব পট্টিকেরা নগরীতে এক বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমিদান করেন। পট্টিকেরায় ১১'শ শতাব্দীর 'অস্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞারমিতা' নামক একখানি প্রাচীন পুঁথি (১০১৫ খ্রিস্টাব্দে পুন লিখিত) পাওয়া যায়।[৩২]

ময়নামতি লালমাই এলাকায় যেসব দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বৌদ্ধ বিহার, ছোট বড় বৌদ্ধস্তূপ বা বিহার এবং দুর্গ বা আবাসগৃহ। এখানকার উল্লেখযোগ্য মূল্যবান পুরাকীর্তির মধ্যে রয়েছে- ১. শালবন বিহার ২. আনন্দ বিহার ৩. ইটাখোলা মুড়া ৪. রাণীর বাংলো, ৫. চারপত্র মুড়া ৬. কুটিলা মুড়া ৭. বৈরাগী মুড়া ৮. রূপবান মুড়া ৯. ভোজ বিহার ১০. আদিনা মুড়া ১১. ত্রিরত্ন মুড়া প্রভৃতি।[৩৩] আবিস্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন ও বাংলার বিহার ভিত্তিক আবাসিক বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঐতিহ্যবাহী শালবন বিহার (শালবন রাজার প্রাসাদ ঢিবি)। এটি কুমিল্লা শহরের ছয় মাইল পশ্চিমে পাহাড় শ্রেণীর পূর্বসীমা ঘেঁষে[৩৪] শালবনপুর গ্রামে বিহারটি আবিস্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপির সাক্ষ্যানুযায়ী এ বিহারটির প্রকৃত নাম ভবদেব মহাবিহার।[৩৫] শালবন বিহার প্রাপ্ত সীলে ধর্মচক্র এবং দু'পাশে দুটি মৃগের প্রতিকৃতি শিল্পীর সুসমৃদ্ধ শৈল্পিক জ্ঞানে পরিচায়ক। এ রাজকীয় প্রতীক চিহ্নের নিচে লেখা আছে

'শ্রী ভবদেব মহাবিহারীয় অরিয ভিক্ষু সংঘসস' এর অর্থ মহারাজ ভবদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারটি আগতানাগত ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো। সমতটের দেব বংশীয় রাজা

Dhaka University Institutional Repository

ভবদেব নির্মিত দুর্গাকার এ চতুষ্কোণ বিহারটির প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। বিহারে প্রবেশ পথ মাত্র একটি। এর অবস্থান উত্তর বাহুর ঠিক মধ্যস্থলে বিহারটিতে রয়েছে একটি ক্রুশাকৃতি কেন্দ্রিয় বিহার এবং চতুর্দিকে শিক্ষার্থীদের বাসোপযোগী ১১৫টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষের পরিমাপ ১২ফুট × ১২ফুট আয়তনে বর্গাকৃতির এবং ৫ ফুট প্রশস্ত দেওয়াল এবং দরজার প্রশস্ততা ৩ ফুট। ঘরগুলোর দেয়ালে বই, পুস্তক, প্রদীপ, দোয়াত কলম ও মূর্তি রাখার জন্য তিনটি করে কুলঙ্গি আছে। ছাত্রাবাসের কক্ষগুলোর সামনে আছে ৮ ফুট প্রশস্ত বারান্দা। এর পরই দেখা যায় আঙ্গিনা বা বিহারাঙ্গন। [৩৬] তথাগত বুদ্ধ এখানে সপ্তাহকাল অবস্থান করে দেবমানবের হিতার্থে ধর্মদেশনা করেছিলেন। মূলবিহারের উপরিভাগ তিনখানা আসন এখনও বিদ্যমান। মধ্যের আসনটি বুদ্ধাসন। ডানের আসন সারিপুত্রের, বামের আসন মোদগলায়নের। মৌর্য সম্রাট অশোক বুদ্ধের উপবেশন স্থানে অশোকস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। [৩৭] 'Sri Somapure Sridharmapaladeva Mahavihararia Bhikkhu Shanghasys' Historical Background এ পাহাড়পুর বা সোমপুর নামের উৎপত্তি দেখা যায়-Dharmpur>Locaity of Dharmapala, Omapura> Somapura>Locality of the moon and Gowalbhita>plat form of the milkman. [৩৮]

শালবন বিহারের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে বিহারাঙ্গনের পূর্বমূখী হলঘরটি উল্লেখযোগ্য।এছাড়া ভোজনালয়, রন্ধনশালা, পশ্চিমের দিকে পূজাকক্ষ এবং বিহারের অভ্যন্তরে চারিকোণার প্রত্যেক কোণে তিনটি অলংকৃত গোলাকার স্তম্ভ আছে। শালবন বিহারের প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে ব্রোঞ্জমূর্তি, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা, স্তূপের অনুকৃতি, নিবেদন স্তূপ, পোড়ামাটির সীল, ফলক, তাম্রলিপি, স্বর্ণালংকার ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য। শালবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে মহারাজ বন্যগুপ্ত, (আনু. ৫০৬-০৭ খ্রি.) খড়্গ, বলভট্ট, আনন্দদেব ও ভবদেব প্রমুখের সর্বমোট আটটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। দেব (আনু. খ্রি. অষ্টম শতক) ময়নামতি অঞ্চলে সর্বমোট ১৪টি তাম্রশাসন (৮টি শালবন বিহার), ৪০০টি স্বর্ণ, রোপ্য, তাম্র মুদ্রা (৩৫০ টি শালবন বিহারে), ১৯৯৪ সালে ভোজ বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত আনু. ১০-১১ শতকে নির্মিত ১.৫ মিটার উচ্চতা ব্রোঞ্জ নির্মিত বিশালাকার বজ্রসত্ত্ব মূর্তি এবং রূপবান কন্যা মুড়া থেকে প্রাপ্ত অর্ধটন ওজনের একটি ব্রোঞ্জের বিরাট ঘন্টা এবং বৈরাগী মুড়া টিবি থেকে প্রাপ্ত পূর্ণ আকারের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মাথা উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ইতিহাসের সোনালী অতীতের এই অমূল্য ঐতিহ্য পুরার্কীর্তির অবদান শুধু বৌদ্ধদের নয় বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে গৌরবের। জ্ঞান মনন ও বিদ্যাচর্চার সূতিকাগার প্রাচীন এ বৌদ্ধ পুরার্কীতি অসাধারণ কীর্তি বৌদ্ধ বিহার বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ রাজশাহীর পাহাড়পুর

বিশ্ববিখ্যাত সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেশ বিদেশের শত শত বিদ্যার্থীকে জ্ঞানদানের এবং সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এটি জ্ঞান সাধনার তীর্থ ও বাংলা ভাষা সৃষ্টির অন্যতম সূতিকাগার। বিদ্যা ও সংস্কৃতিচর্চার মূলকেন্দ্র এক কালে তা ধ্বংস হয় মানুষের হাতে। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাহাড়পুর বিহার তথা সোমপুর বিহার। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় স্থান লাভকারী প্রত্নস্থলের সংখ্যা চারশো এর অধিক ছিল। [৩৯] সুদীর্ঘকাল পরে বিহারটি জাতিসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি পায়। প্রাচীন পুরাকীর্তির অসাধারণ নির্মাণ শৈলী আর স্থাপত্য ও নান্দনিক শিল্পসুষমার জন্য পৃথিবীর পুরাকীর্তি তালিকায় স্থান পায়। এ বিহারটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অহংকার, আমাদের গর্ব, মানব সভ্যতার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনে একটা স্মারক চিহ্ন। [৪০] বাংলাদেশের উত্তর ভূখন্ডে অবস্থিত বরেন্দ্র অঞ্চল বহু শতাব্দীর পুরাতন জনপদ।

পৃথিবীর প্রাচীন বৃহৎ বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশের রাজশাহীর নাওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার উত্তর পূর্ব প্রান্তে, জয়পুর হাট থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পাহাড়পুরে ধ্বংসাবশেষ হিসেবে আবিস্কৃত ইতিহাসখ্যাত সোমপুর মহাবিহার। [৪১] উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খ্যাতিমান পণ্ডিত বুকানন হ্যামিলটন (Dr. Buchanan Hamilton) ১৮০৭ হতে ১৮১২ সালে পূর্ব ভারত পরিভ্রমণের সময়ে পাহাড়পুরের এ পাহাড় পরিদর্শন করেন এবং প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপনা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানান। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে সমগ্র উত্তর বাংলা মৌর্য সাম্রাজের অধীনে ছিল। মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মীলিপি এ অঞ্চলে মৌর্য শাসনের সাক্ষ্য বহন করছে। [৪১] ১৮৭৫ সালে মি. ই. ভি. ওয়েস্ট ম্যাকট (E.V. Westmacott) ১৮৭৮ সালে এইচ বেভারীজ (H. Behariz) সি.জে. ওডলেন, এবং ১৮৭৯ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের প্রধান বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম (Sir Alexander Cunningham) পরিদর্শন করেন এবং এ সম্পর্কে লেখা লেখি ও খনন কার্য শুরু করেন। [৪২] ভারতীয় উপমহাদেশে জারিকৃত ১৯০৪ সালে Moments preservation Act এর অধীনে ১৯১৯ সালে এটি পুরাকীর্তি সংরক্ষিত কীর্তি হিসেবে অভিহিত হয়। আবার প্রায় দীর্ঘ ৪৪ বছর পর বরেন্দ্র গবেষণা সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দিঘাপতিয়ার জমিদার শরৎ কুমার রায় এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট অধ্যাপক ডি আর ভান্ডারকারের তত্ত্বাবধানে ১৯২২-২৩ সালে পাহাড়পুরে সর্বপ্রথম প্রদ্ধতিগতভাবে খনন কার্য আরম্ভ হয়। ১৯২৫-২৬ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় এবং ১৯৩০-৩২ সালে Mr. G.C.Chandra এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে R.D. Benargee, Mr.

Dhaka University Institutional Repository

K.N. Dikshit এর পরিচালনায় পূর্ণাঙ্গ খনন কার্য চলে এবং সোমপুর বিহার প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়।

স্বাধীনতোত্তরকালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পাহাড়পুরে পুনরায় খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। দুই পর্বের এ খননের ১ম পর্ব ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৪-৮৫ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্বে ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত চালু থাকে। UNESCO World Culture Heritage site হিসেবে Development এর জন্য 5.6 million US$ বাজেট করে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মাস্টার প্রকল্পের অধীনে ১৯৮৭ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত উন্নয়ন কাজ চালায়।[৪৪] নিয়মিত খনন কার্যের সময় বর্তমানে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়তুল্য সোমপুর বিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে 'শ্রী সোমপুরে শ্রী ধম্মপালদেবা মহাবিহারীয অরিয ভিকখু সংঘস্য' লিপিসহ কিছু সীলমোহর পাওয়া যায়।[৪৫] আর সীলমোহরের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, মহাপরাক্রমশালী ন্যায়নিষ্ট বৌদ্ধরাজা ধর্মপাল (আনু. ৭৭৫-৮১০ বা ৭৮১-৮২১ কর্তৃক তাঁর রাজত্ব কালে অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে জনকভূ (পিতৃভূমি) বরেন্দ্র ভূমিতে এ বিহারটি নির্মিত হয়। তদুপরি পাহাড়পুরের দক্ষিণাংশের ওমপুর গ্রামটির এবং উত্তর দিকের ধর্মপুর গ্রামটি সোমপুর আর ধর্মপাল নামের কালের সাক্ষী হিসেবে এখনো বিরাজ করছে লামাতারা নাথ এবং তিব্বতী গ্রন্থ Page-Sam-Jon-Zang সোমপুর মহাবিহারের গৌরব গাথা উল্লেখিত হয়েছে। সহস্রাধিক কালের ঐতিহাসিক প্রাচীন সোমপুর মহাবিহার এককালে ভক্ত ও শিক্ষার্থীর কোলাহলে মুখরিত ছিল। কালের নির্মম ইতিহাসে বিশ্বখ্যাত সংঘারামী আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিত্যক্ত ও নিস্তব্ধ। খ্রিষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং প্রায় সমস্ত উত্তর বঙ্গই অধিকার করেন। মুসলমান সৈন্যকর্তৃক ভারত বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা প্রাণকেন্দ্র সোমপুর বিহার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

পাহাড়পুরের উৎখনন বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসে ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্ববহ। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সাড়ে চারশ বছর ব্যাপী বাংলাদেশের পাহাড়পুর সোমপুর মহাবিহারে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, সাহিত্যচর্চা, ব্যাকরণ, হেতুবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, গণির্তবিদ্যা,

চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থী সমবেত হতো। এ বিহারে অধ্যক্ষ ও পণ্ডিত অবস্থান করতেন করুণাশ্রী মিত্র, অদ্বয় বজ্র, অতুল্যপাদ, কাহ্নপা, লুইপা, রত্নকর শান্তি, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র প্রমুখ পণ্ডিতগণ।[৪৫] বিহারের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতী সাহিত্য মতে, খ্রিষ্টীয় ৯ম থেকে ১২ শ শতাব্দী পর্যন্ত সোমপুর বিহারে তিব্বতীয় বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থান ছিল।[৪৬] এসময় কালে সোমপুর বিহারটি ছিল একক বিহার হিসেবে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিহার। স্বাধীনতা পূর্ব যুগের খননের ফলে সোমপুর মহাবিহার শীর্ষক উত্তর দক্ষিণে ২৭৪.১৫ মি. ও পূর্ব পশ্চিমে ২৭৩.৭০ মি. পরিমাপ বিশিষ্ট এক বিরাট বৌদ্ধ

বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এটি প্রায় ৫৪ একর জমির উপর পোড়ামাটির ইটে কাঁদার গাঁথুনিতে দুর্গাকারে নির্মিত। এই বিহারের ভূমি নকশা চতুষ্কোণ প্রায় বর্গাকৃতির বিহারটি উত্তর দক্ষিণে ৯২২ ফুট লম্বা পূর্ব পশ্চিমে ৯১৯ ফুট প্রশস্ত। বিহারের চারদিকে ১৬ ফুট পুরু প্রায় ১২ হতে ১৬ ফুট উচুঁ একটি সীমানা প্রাচীর আছে এই বিহারে সর্বমোট ১৭৭টি কক্ষ [৪৭] নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, ১৮০টি কক্ষ। কক্ষ সারির সাথে ৮ থেকে ৯ ফুট চওড়া বারান্দা ছিল উত্তর পাশে ৪৫টি আর বাকী তিন পার্শ্বে ৪৪টি করে কক্ষ ছিল। প্রতিটি কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ফুট এবং প্রায় সাড়ে ১৩ ফুট, এসব কক্ষে বিদ্যার্থী ভিক্ষু ও পণ্ডিতগণ বসবাস করতেন। কক্ষগুলির বাইরে সরু এবং ভেতরের দিকে প্রশস্ত। বিহারে প্রবেশের প্রধান তোরণ ছিল উত্তর দিকে। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'সূচনায় বিহারের কক্ষগুলি বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হত সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ কক্ষের সমৃদ্ধ অলংকরণ দেখিয়া মনে হয়, পরবর্তীকালে আবাসিক ভিক্ষু সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সেই কক্ষগুলি বোধ হয় পূজাগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হইত।' [৪৮] বিশাল কেন্দ্রিয় বিহার অঙ্গনের (৯২২×৯১৯ ফুট) মাঝখানে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, পূর্বপশ্চিমে ৩১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি চওড়া। [৪৯] ধ্বংস হওয়ার কারণে বিহারটি প্রকৃত তল ও উচ্চতা জানা যায় না। আবিস্কৃত বিহারটি সমতল থেকে প্রায় ৭২ ফুট উচু। বিহারের চারদিকে বেষ্টিত বাইরের দেয়ালটি কারুকার্যময় শিল্পসুষমায় অতুলনীয়। দেয়ালের সর্বনিম্নে সারিবদ্ধ দেয়ালে ৬৩টি পাথরের মূতি এবং অসংখ্য টেরাকোটা ফলকচিত্র লাগানে আছে। বিহারের ভিতরে চারদিকে বড় চারটি কক্ষ আছে; সম্ভবত এ কক্ষ চারটির বেদীতে মূর্তি রেখে পূজা বা ধ্যান সাধনা করা হতো। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের বিশ্ববিখ্যাত 'বরোবুদুর', মায়ানমারের পালেম্বাং এবং কালাসান বৌদ্ধ বিহার, সোমপুর বিহারের নকশানুরূপ নির্মিত হয়েছে। বিহারের বাইরের সংশ্লিষ্ট স্থাপত্য নির্দশন হলো- শৌচাগার, স্নানঘাট, রন্ধনশালা, ভোজনালয়, হলঘর, উপাসনালয়, গন্ধেশ্বরী মন্দির, সত্যপীরের ভিটা ইত্যাদি।

পাহাড়পুর বিহার হতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী হলো ৬৩টি পাথরের মূর্তি (১টি বুদ্ধমূর্তি, বাকী ৬২টি হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি), পোড়ামাটির ফলকচিত্র সর্বমোট ৮০০, অলংকৃত ইট ২০০০,[৫০] তাম্রলিপি, ৪টি শিলালিপি, প্রচুর মুদ্রা, সিলমোহর, ধাতুর তৈরি মূর্তি, ১৩২টি নিবেদন স্তুপ, চুনবালির তৈরি বুদ্ধের ৪টি মস্তক, মৃৎপাত্র ও অন্যান্য দ্রব্য। বর্তমান বরেন্দ্র রিচার্স মিউজিয়াম ও পাহাড়পুর জাদুঘরে প্রত্নসম্পদগুলো সংরক্ষিত আছে। ১৯৮২ সালে আবিস্কৃত হয় বৃহদাকার ব্রোঞ্জ নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। আনু. ৯ শতকে নির্মিত একটি বিশালাকার (৪′-৩″) মস্তকবিহীন [৫১] বর্তমানে UNESCO World Culture Herritage এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে পাহাড়পুর বিহারে, ধ্বংসাবশেষসহ আশে পাশে এলাকা সংস্কার, সংরক্ষণ আর মেরামতের কাজ চলছে, বিহারের দেয়াল ও টেরাকোটা গুলোর পূর্বাব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়পুরস্থ সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রিয় বিহার সম্পর্কে কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিতের অভিমত উদ্ধৃত করে ড. নাজিমুদ্দিন আহমদ লিখেছেন 'পাহাড়পুর, বিহারের পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও বিহারে শীর্ষদেশ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এর বিভিন্ন আঙ্গিক সংযোজনগুলি সহজেই বুঝা যায়। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কে. এন. দীক্ষিত যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে, The plan of the Paharpur temple was the result of a premeditated development of a single central unit, in which future developmen was, in a sense, predetermined in a verticar direction.[৫২] ইতস্তত সংস্কার, সংযোগ ও পরিবর্ধনের কাজগুলি বিহারের মৌলিক পরিকল্পনাকে তেমন ব্যাহত করেনি। ৫৩ কানিংহাম ভ্রমণের পর প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে প্রমাণিত হয় এটি উপমহাদেশের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। (অতি সম্প্রতি বিক্রমশীলাকে পাহাড়পুরের চেয়ে কিছুটা বড় বলে দাবি করা হচ্ছে)। প্রাচীন ঐতিহ্যের সোমপুর বৌদ্ধ বিহার বাংলাদেশের প্রত্নশিল্প তথা ভারত উপমহাদেশের বৌদ্ধ শিল্প ইতিহাসে স্থাপত্য নয় সমগ্র বিশ্ব ইতিহাস ঐতিহ্যে এক অমূল্য নিদর্শন। উল্লেখ যে, ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাহাড়পুরের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রস্ফুটিত পদ্মের পোড়ামাটির ফলক জাতিসংঘকে উপহার দেন।

৫.৪ ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিহার

চট্টগ্রাম শহরের প্রাচীন নাম শ্রীচট্টল। খ্রিষ্টীয় নবম/দশম শতকে চট্টগ্রাম 'পণ্ডিত বিহার' নামে একটি বিখ্যাত তান্ত্রিক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল।[৫৪] প্রাচীন ইতিহাসে পণ্ডিত বিহার বাংলার চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত বৌদ্ধ বিদ্যায়তন। নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিহারের অবস্থান নির্ণয় করা আজো সম্ভব হয়নি। এর অবস্থান নিয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও; তিনটি স্থানকে নির্ভরযোগ্য বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, ধর্মপালের সময়েই চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বড় উঠানের ঝিউরি গ্রাম বা নিকটবর্তী বর্ধমানপুরে দেয়াং পাহাড়ে ১৯০৪ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে রৌপ্য মুদ্রা, প্রাচীন হস্তলিপি, ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি এবং মহাযান ও বজ্রযানী দেবদেবীর বিভিন্ন মূর্তি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর কিছু অংশ বর্তমান বৌদ্ধ বিহারে এবং বাকীগুলো কলিকাতা কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের ধারণা এখানেই পণ্ডিত বিহার অবস্থিত ছিল। এখানে বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেবের রাজধানী বর্ধমানপুরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন ও পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিহার বর্তমান গড়ে উঠা নগরীর মধ্যস্থলেই অবস্থিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। কারো কারো ধারণা রংমহল পাহাড় ও জুম্মা মসজিদের সংলগ্ন অঞ্চলেই পণ্ডিত বিহার অবস্থিত ছিল। আবার অনেকের মতে, জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতাল ও কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণকালে মাটি খননের সময় দু'টি সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তিসহ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা হয়, অনুচ্চ পাহাড়দ্বয়ের ঠিক মাঝখানে যে সুবিস্তৃত সমতল ভূমি সেখানেই পণ্ডিত বিহার ছিল। এখানে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিগুলি এখন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের পূর্বপার্শ্বের এনায়েত বাজারের বিহারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, যাকে বুড়াগোঁসাইর বিহার বলা হয়। বর্তমান দক্ষিণপূর্ব চট্টগ্রামের পটিয়া থানাস্থ চক্রশালা গ্রাম। এই চক্রশালা গ্রামেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ মহাবিহার পণ্ডিত বিহার। এই স্থানেই অবস্থিত ছিল বৌদ্ধ সামন্তারাজা শ্রী জয়চন্দ্রের (১৪৮৭ সালে) রাজধানী। ইতিহাস মতে, তিনি ঐতিহ্যময় পণ্ডিত বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। [৫৫]

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমান বন্দর সংলগ্ন কর্ণফুলী নদীর অপর তীরে দেয়াং পাহাড়ের নিচে পণ্ডিত বিহারের অবস্থান ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।' [৫৬] প্রবন্ধ: দেবপ্রিয় বড়ুয়া, প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণে বৌদ্ধ অবদান/ Bangladesh District Gazetteer. CTG. 1975. Pg- 59) পণ্ডিত বিহার প্রাচ্যের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল এবং বিশ্ব ইতিহাসে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন প্রজ্ঞাভদ্র। তাঁর পূর্ব নাম ছিল তিলিপা বা তিলোপা। মগধের প্রধান আচার্য 'নারোপা' পণ্ডিত বিহারে এসে প্রজ্ঞাভদ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চর্যা পদকর্তার অনেকেই এ বিহারে এসেছিলেন এবং চর্যা রচনা করেছিলেন। পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাভদ্র জ্ঞানগরিমা, সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পণ্ডিত বিহারের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও গবেষক মহলে মতভেদ রয়েছে।

রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র দাসের মতে, পণ্ডিত বিহারের অবস্থান চট্টগ্রামের রঙ মহল পাহাড়ে হতে পারে। পটিয়ার চক্রশালা ও দেয়াং পাহাড়, আনোয়ারার ঝিয়রী বা বড়উঠান এলাকা নিয়ে নবম শতকে দেব বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানী ও শাসন কেন্দ্র ছিল যা পরবর্তীতে কালে ধ্বংস হয়ে যায়। দেয়াং পাহাড়েই হলো পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। ইতিহাস গবেষক সুনীতি ভূষণ কানুনগো ও ঐতিহাসিক হন্টার বলেছেন, হিউয়েন সাঙ বর্ণিত নালন্দা থেকে ১০০ যোজন বা আটশ মাইল দূরে মেঘনা নদীর পূর্ব অববাহিকায় এই রাজ্যের রাজধানী বর্ধমান পুরে। পটিয়ার বড়উঠানেই হচ্ছে সেই রাজধানী। [৫৭]

আধুনিক যুগের পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মতে, পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, দশম শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রাম পাট্টিকারা চন্দ্রবংশের রাজাদের শাসনাধীর ছিল। পাট্টিকারায় চন্দ্রবংশের শাসনকালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ হিসেবে পণ্ডিত বিহার সীতাকুণ্ড পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত হতে পারে বলে ধারণা করা অত্যুক্তি হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

দশম পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের রাজত্বে (৯৭৭-১০২৭খ্রিঃ) নরপাদের গুরু প্রসিদ্ধ আচার্য প্রজ্ঞাভদ্র (টীকাঃ পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাভদ্র সংস্কৃত ও পালি মিশ্রিত ভাষায় ছায়টি গ্রন্থ রচনা করেনঃ (১) শ্রী সহজশাম্বর স্বাধীনষ্টান (২) অচিন্তা মহামুদ্রা নাম (৩) তত্ত্ব চতুরোপদেশ প্রসন্নদীপ (৪) দোহাকোষ (৫) ষড় ধর্মোপদেশ (৬) মহামন্ত্রোপদেশ।) (তৈলপাদ বা তিলোপা) এই পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। নবম শতকে পণ্ডিত বিহার ছিল চট্টগ্রামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র। পাল রাজারা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল এটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে অনুমান করা হয়। এ বিহারে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে ছিলেন।[৫৮] লামা তারানাথের 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থ মতে, দশম শতকের প্রখ্যাত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য তিলযোপী চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান ছিলেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ পণ্ডিত বর্ণরত্নসহ একটি দল নিয়ে তিব্বতে ধর্ম প্রচারে ও ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পণ্ডিত বিহারের প্রবীণ ভিক্ষু বলিরত্ন তিব্বতে ও ভুটানে মহাযানী তন্ত্রের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং তিব্বত থেকে বৌদ্ধভিক্ষু ও সাধকেরা পণ্ডিত বিহারে এসে অধ্যয়ন করতেন। পতুর্গীজ ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীদের গ্রন্থে 'ডায়েঙ্গা' নামক বন্দরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন হিন্দু পুঁথিপত্রে এটি 'দেবগ্রাম' নামে খ্যাত। দেয়াঙ্গ পাহাড়ে আরাকান সামন্ত বিসন রাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ও বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে।[৫৯] আবার আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, মুসলমান কর্তৃক পণ্ডিত বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে বহুমূল্যবান বৌদ্ধগ্রন্থ ও লিপি ধ্বংস করা হয়। উল্লেখিত এ সকল স্থানে অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালালে ঐতিহাসিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবে। বর্তমানে চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জে ১৯৭৮ সালে ২৪তম মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের কর্তৃক 'নব পণ্ডিত বিহার' স্থাপিত হয়ে অতীতের স্মৃতিসাক্ষ্য বহন করছে।

৫.৫ ঐতিহ্যবাহী চক্রশালা

দক্ষিণ চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জনপদ পটিয়ার চক্রশালা। চট্টগ্রামের প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মধ্যে পাটিয়া চক্রশালা একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ। চক্রশালার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বুদ্ধযুগে চক্রশালা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধপীঠ স্থান হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। চক্রশালা বিহারে বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ ও অশীত অনুব্যঞ্জন অঙ্কিত 'বুদ্ধচক্র' নামক পাষাণ স্থাপন এবং একটি সংঘারাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য পণ্ডিত শীলভদ্রের শিষ্য অতীশ দীপংকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেজন্য একে চক্রশালা বলা হয়। এই সংঘারামে বিক্রমপুরের বহু ভিক্ষু সম্ভবত ষাট হাজার ভিক্ষু অধ্যয়ন করতেন বলে এই গ্রামের নাম হাইদগাঁও হয়। অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রার প্রাক্কালে জাতিবর্গকে চক্রশালায় দেখতে এসেছিলেন। চক্রশালার ইতিবৃত্ত তিব্বতের 'তাঞ্জুর' গ্রন্থে

Dhaka University Institutional Repository

এবং ঐতিহাসিক ব্রহ্ম সাহিত্যে উল্লেখ আছে। মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধ সুবর্ণদ্বীপ তথা ব্রহ্মদেশে যাওয়ার সময় চক্রশালা বা হাইদগাঁও এ বিশ্রাম করে জনগণকে ধর্ম দেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ এখানে চংক্রমন করেছিলেন বলে এর নাম চক্রশালা নামে অভিহিত। সম্রাট অশোক কর্তৃক ব্রহ্মদেশে প্রেরিত সোন ও উত্তিয় ধর্ম প্রচারক ভিক্ষুদ্বয়ও চক্রশালায় ধর্মপ্রচার করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তাই বড়ুয়া বৌদ্ধরা চক্রশালাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'জিরানি খোলা', মুসলমানরা 'চাষখোলা' বলে থাকেন। চক্রশালার ধর্মশালায় ধর্মবিষয়ক বিহার ও সংঘরাম বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নির্মিত হয়েছিল। কালে কালে ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। চক্রশালা চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত একটি সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত পরগণা। কিন্তু ১৮৩৭-১৮৪০ খ্রিঃ এইচ. সিডান ইঞ্জিনিয়ার পরিচালিত সিডান জরিপ, ১৮৯১-১৮৯৮ খ্রি. সি. জি. এইচ. এলেন আই.সি.এস.পরিচালিত ক্যাডেস্ট্রাল জরিপ ও ১৯২৪-১৯২৮ খ্রি. রিভিসন জরিপ এবং বাংলাদেশ আমলে জরিপ রেকর্ডে চক্রশালা পরগণা মৌজার অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিক চক্রশালা নামটি লোকমুখে সুবিখ্যাত। [৬০]

প্রাচীনকালে বহু গ্রাম বা মৌজা নিয়ে চক্রশালা পরগণা গঠিত ছিল। বৌদ্ধযুগে, মৌর্যযুগে, পালযুগে আরাকানী, মোগল, নবাবি আমল এবং ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে চক্রশালা চট্টগ্রামের একটি প্রশাসনিক বিভাগরূপে পরিগণিত ছিল।

চক্রশালা রাজা কনিষ্কের সমকালীন বৌদ্ধ সৃষ্টি বলে ধারণা করা হয়। নদীর উভয় তীর তখন জলমগ্ন ছিল-ক্রমে নদী ভরাট হতে থাকে। এখানকার উচুস্থানে বৌদ্ধরা বাস করতো বলে অনুমান করা হয়। খ্রিস্ট্রীয় ১২ শতক হতে ১৬৬ পর্যন্ত শ্রীমতি নদীর তীরে চক্রশালায় মনি ভদ্র, রামভাই প্রমুখ রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। চক্রশালায় ১৪৮৭ সালের দিকে রাজা ছিলেন জয়চন্দ্র। তিনি আরাকান রাজার অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। শ্রীমতি নদীর তীরে এখনও রাজঘাট বিদ্যমান। এখানে মুকুট রায়ও রাজত্ব করে ছিলেন বলে জমা যায়। [৬১] ধর্মতিলক মহাস্থবিরের 'সদ্ধর্ম রত্নাকর', আরাকানি সামন্ত জয়চন্দ্রের সভাকবি দ্বিজ ভবানী নাথ বিরচিত 'লক্ষণ দিগ্বিজয়' কাব্য ও কবি সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' কাব্যে চক্রশালার বিবরণ আছে। এক সময় চট্টগ্রামের মুসলমানেরা চক্রশালাকে 'চাষখোলা' নামে খ্যাত করতেন। এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মতে, প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকমণ্ডলী যে স্থানে চক্রে বসে তন্ত্রমতে উপাসনা করতেন সে স্থানটি চক্রশালা নামে খ্যাত হয়। 'আরাকান, মোঘল, নবাবি আমল এবং ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে চক্রশালা চট্টগ্রামের একটি প্রশাসনিক বিভাগরূপে পরিগণিত ছিল'।

ইতিহাস মতে, মগধ দেশের অধিবাসী ছান্দমা আকিয়াবে বসতি স্থাপন করেন। আদিপুরুষ ছান্দমার দুই পুত্র, চেন্দি ও রাজমঙ্গল। চেন্দি ছিলেন গৃহী আর রাজমঙ্গল ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। গৃহী চেন্দির তিনপুত্র ছিল, কেজগ্রি, কেয়কচু ও বৃন্দাবন। তাঁদের বাসস্থান ছিল ঐতিহ্যবাহী চকরিয়া গ্রামে। তাঁদের মধ্যে কেয়কচু মগধবাসী দীপঙ্কর মহাস্থবিরের শিষ্য সরভূ মহাস্থবিরের নিকট ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। তখন তাঁর নামকরণ হয়েছিল চন্দ্রজ্যোতি। পরে তিনি ব্রহ্মদেশে বিশ বছর ধর্ম বিনয় ও অভিধর্মে শিক্ষা লাভ করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চকরিয়ার আদিপুরুষ চেন্দির পুত্র চন্দ্রজ্যোতি চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড চন্দ্রশেখর পাহাড়ে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করে ব্রহ্মদেশ থেকে আনিত ত্রিভঙ্গ মূর্তি স্থাপন করেন। পটিয়ার ধনাঢ্য ব্যক্তি হাইভ মজা কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে চন্দ্রজ্যোতি চকরিয়া নিবাসী চেন্দির পুত্র। তিনি রাজা চেন্দিকে তার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের খবর দিয়ে পটিয়ায় লোক প্রেরণ করে নিয়ে আসেন। চক্রশালার বিদগ্ধ পণ্ডিত তিলপাদ (প্রজ্ঞাভদ্র) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রাগবৌদ্ধযুগে চট্টলা, বৌদ্ধযুগে ইহা পরিবর্তিত হয়ে, 'চক্রশালা' হয়। চট্টগ্রাম বলতে কেবল চট্টগ্রামকেই বুঝা হত। রাখান বা আরাকানদের নিকট ইহা রম্য বা রম্যভূমি নামে অবিহিত।

আধুনিক চক্রশালা গ্রামটি অতি ক্ষীণ স্মৃতি বহন করছে। এই গ্রামটি অতি প্রাচীন, অনেক পুরাতন গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ আছে। স্বয়ং বুদ্ধ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬০-৪৮৩) এখানে আসিয়া আস্তানা করেছিলেন এবং 'ধর্মশালা' স্থাপন করে ছিলেন। এই জন্য ইহাকে 'চক্রশালা বলা হত। এখান হতে বুদ্ধ হস্তিতে চড়ে কুশীনগর গিয়েছিলেন। এজন্য গ্রামটির নাম হাইত গাঁও বা হস্তী গ্রাম। নালন্দার অধঃপতনের পর বাংলার চট্টগ্রাম বা চক্রশালা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় চক্রশালা বলতে সমগ্র চট্টগ্রামকেই বুঝা হত। এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লাভ করে এবং ক্রমে পণ্ডিত বিহার নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। এ সময় ধর্ম ও সংস্কৃতি চচংর ভাষার বাহন ছিল পালি। তাই চট্টগ্রামের ভাষায় পালি ভাষার প্রভাব রয়েছে। ইহাও সত্য যে, পুষ্যমিত্র এবং শশাঙ্কের বৌদ্ধ দলন নীতির প্রভাব মোটেই বাংলাদেশের চট্টগ্রামে পৌঁছায়নি। ইতিহাস মতে, পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে ১৪৮৬ খ্রি. রাখান রক্ষী খোজাগণ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় আরাকান রাজ সমস্ত চট্টগ্রাম অধিকার করে চক্রশালায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই শতাব্দীর শেষভাবে জয়চন্দ্র চক্রশালায় আরাকান রাজ প্রতিনিধি ছিলেন।[৬২] চক্রশালার ইতিহাস অতি প্রাচীন। চট্টলতত্ত্ববিদ আবদুল হক চৌধুরী লিখেছেন, 'দক্ষিণ চট্টগ্রাম অধিকাংশ কাল আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। আরাকানী আমলে দক্ষিণ চট্টগ্রাম চারভাগে বিভক্ত ছিল এবং চারজন শাসক শাসন করতেন। যথা-রামু, চকরিয়া, চক্রশালা ও দেয়াঙ্গ। দীনেশ ভট্টাচার্যের মতে, আরাকানী সামন্ত রাজা জয়চন্দ ১৪৮২-১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি কর্ণফুলী ও শংখ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের আরাকানী সামন্ত রাজা ছিলেন। চক্রশালা ছিল রাজা জয়চন্দের রাজধানী।[৬৩] এ সময় চক্রশালা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। পরবর্তীতে ১৮৫১ খ্রী. স্থানীয় জমিদার হাইডমাজার সাহায্যে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির চক্রশালার বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রশালা বৌদ্ধরাজা জয়চন্দ্রের রাজধানী ছিল। এখানে চন্দ্রজ্যোতি কর্তৃক আনীত বুদ্ধের চক্রাসন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁর পিতা চেন্দির আগমনকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকাল থেকে চক্রশালা মেলা হয়। ধর্মতিলক স্থবিরের মতে, ঐতিহ্যবাহী চক্রশালার মেলা পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই শুরু হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণমুখী এই বিহারের গায়ে খোদাই করে লেখা আছে; ফরাতারা স্তুপ ও বিহার ১৯৮৭ সালে নব পর্যায়ে সংস্কার করা হয়।

কালের বিবর্তনে চক্রশালা আদি বৌদ্ধ তীর্থ বিহারটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সংঘরাজ পূর্ণাচার ধর্মাধার চন্দ্রমোহন মহাস্থবির ও প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ জগৎচন্দ্র মহাস্থবিরের প্রয়াসে পুনঃনির্মিত হয়। এক সময়ের স্বপ্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাররর প্রাণকেন্দ্র ও বিখ্যাত জনপদ চক্রশালায় আর অতীতের গৌরব ও আকষর্ণ নেই। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিহার চক্রশালাতে ছিল বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। পটিয়া থানার শ্রীমতি নদীর তীরের বর্তমান ঈদগাঁও গ্রামকে চক্রশালা বলা হয়। এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ চৈত্য আছে, যা চক্রশালা চৈত্য নামে পরিচিত। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে চক্রশালা মেলা বসে, একে হাইদগাঁও এর ফরাচেঙ্গী মেলাও বলে। (ফরা অর্থ-প্রভূ, বুদ্ধ, আর চেঙ্গী অর্থ সংঘ অর্থাৎ বুদ্ধ সংঘের মেলা)।

৫.৬ রামু রামকোট বিহার

কক্সবাজারের নিকটবর্তী রম্যভুমি রামুর রামকোট বৌদ্ধ বিহার ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পীঠস্থান। ছোট সড় সতেরোটি পাহাড় বেষ্টিত রামকোট বনাশ্রস। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এ আশ্রমের পাশে ইটের স্তূপ, বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি পোড়ামাটির ফলক এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বর্তমান যে বিহারটি রয়েছে তা একটি অনুচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। বিহারটিতে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ৯৭২ ইঞ্চি। সম্পূর্ণ বিহারটি ৩৪১৯ বর্গফুট আয়তকার। এর চূড়ার উচ্চতা ৪০। [১৩] রামুর দক্ষিণ রাজারকুলের অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণীর বিস্তৃত এলাকায় রামকোট বনাশ্রম বিহার, স্তূপ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন বিদ্যমান। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে আবিস্কৃত ময়নামতি ও পাহাড়পুরস্থ বৌদ্ধ প্রত্নস্থলের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাহশ্য দেখা যায়। চট্টগ্রামে প্রাচীন ধর্ম প্রচারের প্রাণপুরুষ ছিলেন চর্করিয়া হারবাং এর চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির। শ্রদ্ধেয় চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির তার ধর্ম প্রচার অভিযানে রামুর পল্লীগ্রামে এসে উপনীত হন এবং সেখানে সাতটি ধর্মচৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে দুইটা ধর্মচৈত্য ছিল রামমানিক্য বাহাদুরের কিল্লার অভ্যন্তরের এবং দুইটা ধর্মচৈত্য ছিল রামমানিক্য পাহাড়ের উপর। অপর তিনটি বিভিন্ন স্থানে অতপর চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির রামু রামকোট চেঁন্দি রাজের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে একটা ধর্মচৈত্য স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাস আছে যে, রামু মেরেংলোয়া গ্রামে তিনি মোট সাতটি ধর্মচৈত্য স্থাপন করেছিলেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির চেঁদি রাজের রামু পল্লীগ্রামে অনেক বৎসর অবস্থান করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পযর্ন্ত চট্টগ্রাম আরাকান একটি অখণ্ডরাজ্য রূপে চন্দ্রসূরীয় রাজবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। ষষ্ঠশতকে চট্টগ্রাম সমতট রাজ্যভূক্ত হয় এবং সপ্তম শতক অবধি সমতটের খড়্গরাজ বংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। অষ্টম শতকে মহারাজ ধর্মপালের রাজত্ব কালে চট্টগ্রাম স্বল্প সময়ের জন্য পাল সম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিল। রাজা ধর্মপাল শাসিত বাংলার দক্ষিণ পুর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের রাজধানী ছিল রাহমী বা রাহমা। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

বৃহত্তর চট্টগ্রামের রামু। আধুনিক গবেষকদের অভিমত বৃহত্তর চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রামু অঞ্চলেই বাংলার পাল রাজবংশের উৎপত্তি। [৬৫] ইতিহাসে দেখা যায় সুপ্রাচীন কাল থেকে রম্যভূমি (রামু) তে বৌদ্ধ রাজাদের শাসন ছিল বৌদ্ধপাল রাজত্বের শাসনের পর দ্বাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্য শাসনের সূত্রপাত। এ সময় বহু বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস হিন্দুরা নিজ করে নেন। ত্রয়োদশ শতকে আসে মুসলিম আধিপত্য। পঞ্চদশ মতকে আরাকান রাজ্যের বৌদ্ধ নৃপতিদের সহায়তায় রামু, দেবং ও চক্রশালা প্রভৃতি স্থানে বহু বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। বার্মিজ ভাষী স্থানীয় বৌদ্ধরা রামুকে পেঁওয়া নামে অভিহিত করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত রামুর আদিনাম 'পেঁওয়া' বা হলুদ ফুলের দেশ থেকে কক্সবাজারের পূর্ব নাম পেঁওয়া হয়েছিল। পালি ভাষায় 'রাম্যা' অর্থ সুন্দর। সেই রম্যা থেকে এসেছে রম্যভূমি বা রামু। কিন্তু রম্য কণ্ঠ ১৯৮৮ থেকে জানা যায় 'রমাবয়াতি' থেকে রমাওয়াতি>রমাবতী>রম্যভূমি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তাঁর ইসলামাবাদ গ্রন্থে রামুকে 'রম্যস্থান' বলে উল্লেখ করেছেন।

মগ শাসনামলে এর নাম হয় রুম্মী বা রাম্রে। চাকমা ইতিহাস থেকে জানা যায়, এককালে রামু ছিল চাকমা রাজাদের অধীন। আজও রামুর নিকটবর্তী বহু স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান। যেমন-চাকমার কুলর, রাজার কুল, চাকমার বিল, ফতে খাঁর কুল ইত্যাদি। শরৎ চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর পালিসাহিত্য হতে আবিষ্কার করেছেন যে, বৌদ্ধযুগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল। তখন চট্টগ্রাম রম্যস্থান নামে অভিহিত। বর্তমান ক্ষুদ্র 'রামু'ই রম্যস্থান এবং তৎকারীন বৌদ্ধ গৌরবের শেষ চিহ্ন স্বরূপ বর্তমান রয়েছে।' প্রবন্ধঃ ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, রম্যভূমি 'রাম' ও (বৌদ্ধ ঐতিহ্য) ঐতিহ্যবাহী রামুতে বৌদ্ধ ঐতিহ্য রামকোট বিহার লামার পাড়া বৌদ্ধ বিহার অত্যন্ত প্রাচীন। লামাপাড়া বিহারে রয়েছে পিতলের ঘন্টা এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। এই বিহারকে কেন্দ্র করে এক সময় এ অঞ্চলে বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। রামু রামকোট বিহার ও দুর্গ চট্টগ্রামের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্মারক নিদর্শন। টলেমির ভূগোল বিবরণে রামুর বিবরণ পাওয়া যায়। গবেষক ও ঐতিহাসিকদের মতে, রামুকোট সধাতুক বড় বৌদ্ধ বিহার সম্রাট অশোকের দ্বারা নির্মিত। ৮৪ হাজার ধাতু চৈত্যের মধ্যে একটি রামু চৈত্য। সম্রাট অশোকের ধর্মরাজিক চৈত্য বঙ্গোসাগরের পূর্ব উপকূলে স্থাপিত হয়। জানা যায় যে, মহারাজ ধর্মপাল ঐতিহাসিক রামকোট বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালে ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু জগৎচন্দ্র মহাথের শ্রীলংকায় উদ্ধারকৃত একখানি শিলালিপিতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অনুসন্ধান ও খনন কার্য চালিয়ে এ সুবৃহৎ সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করেন। এ বুদ্ধমূর্তি বর্তমান রামকোট বনাশ্রম বিহারে সংরক্ষিত আছে। বিহারের চতুর্দিকে প্রাপ্ত বেলে পাথরের নির্মিত ভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধের দু'টি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও হস্তাপদাদি ভগ্ন ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বুদ্ধমূর্তি অন্যতম। অরণ্য বেষ্টিত বনাশ্রম বিহারটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এখানকার সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। ঐতিহ্যময় সংঘারামটি সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে আরাকান ও সমতটের গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিনিময় হতো। সর্বশেষ তথ্য মতে, চন্দ্রজ্যোতির আরাকানের রাজার রাজত্বকালে দ্বাদশ শতকে এখানকার সর্বশেষ সংঘারামটি নির্মিত হয়। এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রতি বছর ঐতিহাসিক রামকোট মেলা বসে। এই প্রত্নস্থল ও প্রাচীন বৃহৎ বুদ্ধমূর্তি দর্শনে স্বদেশী বিদেশী অনেক পর্যটক এখানে আসেন। এখানে রামুকোট বৌদ্ধ বিহার ও তৎসংলগ্ন জগতজ্যোতি শিশুসদন (১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত) এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির। এটি বর্তমানে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও তীর্থের অনন্য পুণ্যতীর্থ ভূমি।

৫.৭ বুড়াগোসাই

চট্টগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যের অমর একটি তীর্থ হল বুড়াগোসাই। এটি পটিয়া উপজেলার সদর পশ্চিমে ঠেগরপুনিতে অবস্থিত। ধনাঢ্য ব্যক্তি হাইডমজা ঠেগরপুনি নিবাসীর বংশজাত। ঠেগরপুনিতে পূর্বে লোক বসতি ছিল না। হাইডমজার পূর্বপুরুষ ছাদ প্রু নামক ব্যক্তি বাঘ শিকার করে ঐস্থানে আবাদ করেন। কালক্রমে হাইদগাঁও হতে এসে লোকজন ঠেগরপুনি বা বাঘমারাতে বসতি স্থাপন করেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের (১৭০৯-১৮০১) পিতৃব্য রাজমঙ্গলে মহাস্থবির বাঘমারা অর্থাৎ ঠেগরপুনিতে বিহার নির্মাণ করে অবস্থান করেন। তিনি কাঠের ঘর তৈরি করে বোধিমণ্ডপ স্থাপন করেন। উক্ত কাঠের বিহারে চন্দজ্যোতি মহাস্থবির ব্রহ্মদেশ থেকে আনীত ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। [৬৫] পরবর্তীতে কাঠের বিহারটি ভেঙ্গে গেলে বুদ্ধমূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। কথিত আছে যে, অনেক বৎসর পর বাকখালী নিবাসী শ্রীধন বড়ুয়ার স্ত্রী প্রয়াতা নীলাকুমারী বড়ুয়া স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে নিধিকুম্ভসহ বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার করে করল নিবাসী ভগ্নীপুত্র ভন্তে আরাধন মহাস্থবিরের কাছে ভার অর্পণ করেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তিনি সেখানে পূর্বমুখী বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। [৬৬]

উদ্ধারকৃত বুদ্ধমূর্তিটির মধ্যাংশটি বিলিন হয়ে যায়। উদ্ধাংশ ও নিম্নাংশের সংযোগে নামকরণ হয় বুড়াগোঁসাই। এ ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠাকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় ঠেগরপুণি মেলা হয়। আঞ্চলি ভাষায় এটাকে ঠেয়াঁফইরের মেলা বলা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে ১৮৫৫ সাল থেকে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বুড়াগোসাইর বিহারে ঠেগরপুণির মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

ঠেগরপুণির বুড়াগোসাই বুদ্ধমূর্তি ও মেলার সুপ্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে বর্তমানে ১৮৫০ বৎসর (১৫০+৩৫) পূর্বে বাকখালী নিবাসী শ্রীধন বড়ুয়ার স্ত্রী নীল কুমারী এক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন। তদানুসারে পটিয়া থানার ঠেগরপুণি গ্রামে একটি ত্রিভঙ্গ কাল পাথরের মূর্তি আবিস্কৃত হয়। বাকখালী নিবাসী হারাধন ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় ১৮৫৫ সালে নির্মিত বিহারে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্তির নামকরণ করা হয় বুড়াগোঁসাই। এ মূর্তিটির মধ্যাংগের সংযোগ মাত্র। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে এ স্থানে তিনদিন ব্যাপী মেলা হয়। [৬৭] ড. রামচন্দ্র বড়ুয়া ও পণ্ডিত ধর্মাধার

Dhaka University Institutional Repository

মহাস্থবিরের মতে, এই ঠেগরপুনি মেলা ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু হয়। চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত জনপদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিতে মেলা প্রাঙ্গণ এখানে প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে মুখর হয়ে বটে। এই মেলা সম্বন্ধে কবি লিখেন-

মাঘী পূর্ণির্মা দিনেতে ঠেগরপুনির বৌদ্ধ মেলা,

সেথায় সকল নর-নারী মিলি হাসে গায় করে খেলা।

৫.৮ সীতাকুণ্ড বৌদ্ধতীর্থ

বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ মেলার মধ্যে সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ মেলার নাম করা যায়। প্রাচীন ইতিহাসে সীতাকুণ্ডে বৌদ্ধ সভ্যতা ও ঐতিহ্যের উল্লেখ আছে। সীতাকুণ্ড এক সময় বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষার পীঠস্থান ছিল। সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড় ছিল প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থস্থান। এক সময় চট্টগ্রামের সাথে সীতাকুণ্ড ও বাড়ব কুণ্ডের তাৎপর্য রয়েছে। ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের মতে, আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি (কেঁয়জু) মহাস্থবির সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একটি বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধ মেলা ও ঐতিহ্যের মধ্যে সীতাকুন্ড চন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের এই প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগোমিন কে নিয়ে অনেক কথা ও কাহিনী এখনো বতর্মান। সপ্তম শতকের বৌদ্ধ পণ্ডিত তথা রাজকুমার বর্তমান রাজশাহী জেলাই এই চন্দ্রগোমিন পিতার আদেশ অমান্য করায় নির্বাসিত হয়ে সীতাকুন্ড পাহাড় শীর্ষে সাধনাকেন্দ্র ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এটি একটি বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হয়। [৬৮]

পণ্ডিতদের অভিমত পঞ্চদশ শতাব্দীতে চন্দ্রগোমিন বা চন্দ্রজ্যোতির নামানুসারে চন্দ্রশেখর পর্বত মুখে (বর্তমান চন্দ্রনাথ) বুদ্ধমূর্তি ও বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির মগধরাজ ধৈম্যের বংশধর ছান্দমা রাজার প্রপৌত্র ছিলেন। ছান্দমা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আকিয়াবের 'ফণীমুড়া' নামক পাহাড়ী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের বংশধরেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। চন্দ্রজ্যোতি ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচার বের হয়ে ক্রমে তার সঙ্গীদের নিয়ে চট্টগ্রামের উত্তর-পশ্চিম অংশে পাহাড়ী অঞ্চলে সীতাকুণ্ড পাহাড় এলাকায় পরিবেশ লক্ষ্য করে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও ধ্যান, সাধনার উপযুক্ত স্থান ভেবে একটি কুটির নির্মাণ করেন এবং একটি ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রনাথের পাহাড় শীর্ষে এখনো তা বিদ্যমান আছে। পূর্বে এখানে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলার আয়োজন হতো; বর্তমানে এখানে বৌদ্ধ মেলার পরিবর্তে শিব চতুদর্শী মেলা হয়ে থাকে। আহমদ শরীফের মতে, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, শিব মূলত বৌদ্ধদেবতা তা নামেই প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৮ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার সলিমপুর গ্রাম হতে বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেবের দু'খানি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়েছে। [৬৯] ইতিহাস মতে, পরবর্তীকালে আচার্য পুন্নাচার এখানে অবস্থান করে সাধনা করেন। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মর্তব্য, 'চট্টগ্রামের বর্তমান হিন্দু আদিনাথ (মহেশখালী) ও চন্দ্রনাথ (সীতাকুন্ড) এক সময় বৌদ্ধ তীর্থ ছিল।' ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দূর অতীতে এই চন্দ্রনাথ ছিল বুদ্ধমূর্তিসহ বৌদ্ধ বিহার আর চন্দ্রনাথ জানা না গেলেও সবিশেষ উল্লেখ্য ইংরেজ গেজেটিয়ারে আছে, চন্দ্রনাথ আগে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল, সেখানে রক্ষিত ছিল বুদ্ধের পায়ের ছাপ। বর্তমানে চন্দ্রনাথ মন্দিরের পাশে মাটিতে স্থাপিত এক অষ্ট ফলকে আছে--'These ancient Beddhistic relics uere dugot for destruction by iconoclast, they were reinstalled by J. Chaudharik, Bar-at-law, dedicated to Gautm Buddha in memory of his beloved son Joydeb, professor of Bengal Engineeing college who attained Nirvana on 3rd August, 1933, in his memory 30th year, 14.9.1936.'

যা দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন প্রশ্ন রাখের-'তাহলে কি গেজেটিয়ারে উল্লেখিত বৌদ্ধ বিহারটি ভেঙ্গে এখানে শিবমন্দিরটি করা হয়েছিল?' ১৩৪৬ সালে শারদীয় পাঞ্চজন পত্রিকায় প্রকাশিত 'চট্টগ্রামে বৌদ্ধ বিহার এখন নাই সত্য, কিন্তু কে বলিবে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলি কালে হিন্দুরা অধিকার করিয়া বসে নাই এবং বুদ্ধকে শিবরূপে, তারা মাতাকে কালি মাতারূপে রূপান্তরিত করিয়া পূজা করিতেছে না।' [৭০] ফ্রান্সিস বুখানন ১৭৯৮ সালে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সীতাকুন্ড পাহাড়ে গিয়ে ছিলেন। সেখানে অনেক হিন্দু ঠাকুরের পূজা ও দান দখিনা দিচ্ছে। শিব বা শিবলিঙ্গের পূজা হয়। তিনি দেখলেন মন্দিরের পাথর গুলোর মধ্যে মধ্যে গর্ত। এসব গর্তে লোহার গাথুঁনি ছিলো এবং সেই গাথুঁনি দিয়ে মন্দির বানানো হয়েছিলো। মন্দিরের উপবিভাগ সম্প্রতি কালের নিমার্ণ; ইট-পলেস্তরা সে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখানে বোধ হয় ইতিপূর্বে গৌতম বুদ্ধের পূজা হতো। [৭১]

৫.৯ দেয়াঙ্গ

বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেবগ্রাম চট্টগ্রাম শহরের পতেঙ্গা এলাকা সংলগ্ন কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে দেয়াঙ্গ পাহাড় অবস্থিত। বতর্মানে এই পাহাড়টি দু'ভাগে বিভক্ত। এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে আনোয়ারা এবং উত্তর-পূর্বাংশে পটিয়া থানা।

দেয়াঙ্গ পরগণার প্রাচীন দলিল পত্রে ও কবি মুক্তারাম সেনের সারদা মঙ্গল কাব্যের আত্ম পরিচিতিতেও দেবগ্রাম নামের উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগে পর্তুগীজ বণিক, ঐতিহাসিক ও

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণকারীদের গ্রন্থে 'ডায়েঙ্গ' নামে বন্দরের উল্লেখ আছে, প্রাচীন হিন্দু পুঁথিপত্রে সেটি 'দেবগ্রাম' রূপে উল্লেখিত হয়েছে। হরিকেল রাজ্যের রাজাদের দেব পদবির স্মারকরূপে তাদের অবস্থান দেবগাম নামে খ্যাত হয়। পরবর্তীকালে দেবগ্রাম>দেবগাঁ> দেয়াঙ্গ হয়। এই শতকের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী দেয়াঙ্গ পটিয়া থানা 'বড়উঠান' অঞ্চলে নবম শতকের হরিকেল রাজ কান্তিদেবের 'বর্ধমানপুর' এ উৎকীর্ণ একটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হয়। এ তাম্রশাসনে হরিকেল রাজ কান্তিদেব তাঁর পিতা ও পিতামহের নাম উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ বর্ধমানপুর সম্ভবত হরিকেল রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'হরিকেল রাজ্যের রাজধানী বর্ধমানপুর চট্টগ্রাম বিভাগের কোন স্থানে ছিল।' প্রমোদ নাথ পালের মতে, শ্রীহট্টই প্রাচীন হরিকেল রাজ্য। অনুমান করা যায় যে, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম নিয়ে প্রাচীন হরিকেল রাজ্য গঠিত ছিল। রাজা কান্তিদেবের তাম্রশাসন আবিস্কৃত বড়উঠান অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরের ২/৩ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। চৈনিক পর্যটক ইউ হের বর্ণনা মতে, হরিকেল নালন্দ থেকে ৮০০ মাইল দূরত্বের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কুমিল্লার সামগ্রিক ভূখণ্ডের দূরত্ব মিলে যায়। চট্টগ্রামের ইতিহাস গবেষক, ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেন যে, প্রাচীন হরিকেল রাজ্যের সমুদ্র নিকটবর্তী রাজধানী বর্ধমানপুর হলো দেয়াঙ্গের 'বড়উঠান' নালন্দার সন্নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান।[৭২] অশিক্ষিত লোকমুখে বর্ধমান বিকৃত হয়ে "বড়উঠান" হয়েছে। সুতরাং বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা নিয়ে প্রাচীন হরিকেল রাজ্য গঠিত ছিল। এবং তার রাজধানী বর্ধমানপুর ছিল চট্টগ্রমের প্রাচীন দেয়াঙ্গ পরগরণার অন্তর্গত আধুনিক পটিয়ার বড় উঠান। হরিকেলের বৌদ্ধদেব বংশীয় রাজাদের আবাসস্থান দেবগ্রাম>দেবগাঁ>দেয়াঙ্গ। হরিকেল রাজ্য ও বর্ধমানপুরের ভৌগোলিক অবস্থান বিতর্কিত। পরবর্তী বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য বলেন, হরিকেলের রাজা দেবাতিদেব নামক খাশা উপজাতিভুক্ত অনার্য বৌদ্ধ রাজা ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ বিহারে ভূমিদান উপলক্ষে একটি তাম্রাধার লিপি উৎকীর্ণ করেন। চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হরিকেল মণ্ডলের নবম শতকের বৌদ্ধ রাজা কান্তিদেব রাজধানী বর্ধমানপুর থেকে রাজ্য শাসন করতেন। এই তম্রধার লিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাজা দেবাতিদেব রাজা কান্তিদেবের পূর্বে ৮ম শতকের মধ্যবর্তী কালে চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করতেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো এবং আবদুল হক চৌধুরী চট্টগ্রামের ইতিহাস এবং বড়উঠানের ঐতিহ্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বড়উঠান বৌদ্ধরাজা কান্তিদেবের রাজধানী ছিল। পণ্ডিত বিহার, বড়উঠান এবং ঝিউরী গ্রামের পার্শ্ববর্তী পাহাড়কে আজো দেয়াং পাহাড় বলা হয়। এই দেয়াং পাহাড় বর্তমান আনোয়ারা থানা এবং কিছু অংশ পটিয়া থানায় অবস্থিত। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, এই দেয়াং পাহাড়েই আরাকানের পূর্বে বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানী ও পণ্ডিতগণের আস্থানা ছিল। বড়উঠান ও দেয়াং পাহাড় এলাকা নিয়ে নবম

Dhaka University Institutional Repository

দশম শতকের দেব বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানী ও শাসন কেন্দ্র ছিল। দেয়াং পাহাড় নিয়ে একটি বড় জিজ্ঞাসা আছো বর্তমান।[৭৩] প্রচলিত জনশ্রুতি মতে, দেয়াঙ্গের বড় উঠানে অতি প্রাচীনকালে বিস্মমূড়া পাহাড় এলাকায় বিসম রাজা নামে খ্যাত এক রাজার বাড়ি ছিল। উক্ত বিসম রাজার নামের স্মারক রূপে বড় উঠান গ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়ের একটি অংশের নামকরা হয়েছে বিস্মমূড়া। জনশ্রুতি মতে, বিসম রাজা আরাকানি সামন্ত ছিলেন। উক্ত এলাকায় রাজবাড়ির প্রাচীন ইট দেয়াল ও ৬ ইঞ্চি থেকে ৪ ইঞ্চি লম্বা বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তীকাল থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী কালের মধ্যে সাময়িক বিরতি ছাড়া চিরকাল চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভূক্ত ছিল। এখন আরাকান সীমান্ত রাজাদের দ্বারা চট্টগ্রাম শাসিত হত। নবম শতকে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দশম শতকের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিহার ঐতিহাসিকদের মতে, দেয়াঙ্গ পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মন্তব্য স্মতব্য চট্টগ্রামের বর্তমান হিন্দু আদিনাথ (মহেশখালী) ও চন্দ্রনাথ (সীতাকুন্ড) এক সময় বৌদ্ধতীর্থ ছিল।

৫.১০ দেব পাহাড়

বৌদ্ধ ঐতিহ্যের একটি ঐতিহাসিক স্থান দেব পাহাড়। পাল রাজত্বের পর ও পূর্ববঙ্গে কয়েকটি বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধদেবগণ চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। শ্রী পুরুষোত্তমদেব, মধুসুদনদেব, বাসুদেব, দামোদরদেব ক্রমান্বয়ে রাজাগণ রাজত্ব করেন। দামোদর দেবের বংশধর হতে ত্রিপুরা রাজ রত্নমানিক্য ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এই দেবগণের বাসস্থান দেবগ্রামই বর্তমানে 'দেবাং বা দেয়াং' এ পরিণত হয়েছে। এর অবস্থান চট্টগ্রাম নগরীতে বা পতেঙ্গার কর্ণফুলী নদীর অপর তীরে দেয়াং পাহাড়ে হতে পারে। তবে চট্টগ্রাম শহরের দেব পাহাড় তাঁদেরই স্মৃতিবহন করে। বর্তমানে দেব পাহাড়ে পূর্ণাচার আর্ন্তজাতিক বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত।

৫.১১ মহামুণি পাহাড়তলী

বাংলাদেশে প্রাচীন ইতিহাসে রাউজানের মহামুণি পাহাড়তলী বৌদ্ধধর্মের ও সমাজের একটি ঐতিহ্যবাহী গৌরবময় স্থান। এটি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম আদিপীঠ স্থান। ড. আহমদ শরীফের মতে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের দিকে চট্টগ্রামে আরাকানে বৌদ্ধ প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। এ শতকেই সম্ভবত কোন চন্দ্রবংশীয় রাজা মহামুণি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহ্য মতে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৮০৫ সালে মহাত্মন চাইঙ্গা ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদশীয় বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে আরাকানী শিল্পীর দ্বারা একটি মহামুণি মূর্তি (বিগ্রহ) ও বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহামুণি

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতি চৈত্র মাসে এখানে একমাস বা পক্ষকাল মেলার আয়োজন হয়। [৭৪] কারো কারো মতে ১৮১৩ সালে বৌদ্ধ বিহার ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ড. রামচন্দ্র বড়ুয়ার চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস গ্রন্থ মতে, সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার এক বছর পর ১৮১৪ সাল হতে এ মূর্তির স্মরণে বিষুব সংক্রান্তিতে মহামুণি মেলা হয়ে থাকে। এটি বৌদ্ধদের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীন বৌদ্ধমেলা। জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া বলেন, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ মেলা আয়োজন করা হয় এবং অদ্যাবধি বহাল আছে। এই মেলায় বড়ুয়া, চাকমা, মারমা সকলের সমাগম হয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের নব জাগরণের অগ্রপথিক সংঘরাজ সারমিত্র মহাস্থবিরের নেতৃত্বে 'হাঙ্গার ঘোণা' হতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের জাগরণ সূচিত হয়। মহামুণি পাহাড়তলী বাঙালি বৌদ্ধদের বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তির জন্মতীর্থ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পাহাড়তলী (তৎকালীন কদলপুর) গ্রামের মহাত্মা চাইঙ্গা ঠাকুর (বৌদ্ধ ভিক্ষু) উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনে আরাকান যান। সেখানে তিনি মহামুণি বুদ্ধমূর্তি দেখে তার অবিকল বিরাট এক মহামুণি মূর্তি ১৮১৩ সালে আরাকানের শিল্পী দ্বারা নির্মাণ করান এবং বিগ্রহটি বিহারে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সর্ম্পকে একটি ছড়া আছে-

"ছোট খাট চাইঙ্গ ঠাকুর এত বুদ্ধি জানে

রোসাঙ্গের মহামুণি কদলপুরে আনে।"

প্রথমে মহামুণি মূর্তির বিহার ছিল বাশের তৈরী। এটি দৈবাৎ পুড়ে গেলে 'মানরাজা'দের পূর্বপুরুষ পালং সম্প্রদায়ের নেতা মাননীয় কুঞ্জ ধামাই এক গম্বুজ বিশিষ্ট পাকা মন্দির নির্মাণ করে দেন। উপরপাশে তীর্থযাত্রীদের 'ধামাই দীঘি' খনন করে দেন। একই ভাবে 'রোমাংয়ের পুকুর' খনন করা হয়।

এছাড়াও কুঞ্জ ধামাই বিহারের অনতি দূরে পাহাড়ের পাদদেশে একটি ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ভিক্ষুসীমাই চট্টগ্রামের প্রথম ভিক্ষুসীমা। এটি হাইঙ্গারঘোণা ঠাকুর (ভিক্ষু) গড়ানী (সীমা) নামেই সমাধিক প্রসিদ্ধ। [৭৫] মং উষা খোয়াই বলেছেন, ১৭৮৫ সালে দিকে আরাকান থেকে আগমনের পর মং রাজবংশের প্রথম রাজা কং জয় বাহাদুর সর্বপ্রথম পাহাড়তলী নামক স্থানে মং রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠিত করে বসবাস শুরু করেন এবং তিনি পাহাড়তলীতে মহামুণি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের পশ্চিম দিকের এক বিশাল দীঘি অতীত স্মৃতি তারই সাক্ষী। মূলত এ মহামুণী মেলা উপজাতীয়দের জন্যই বলা চলে। [৭৬] ফ্রান্সিস বুখানন ১৭৯৮ সালে কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, আদিকাল থেকে বর্তমানেও চকরিয়ার হারবাং ও মানিকপুরে রাখাইন জাতি বসবাস করে। রাখাইনদের এখানে বৃহৎ মহামুণি বুদ্ধমূর্তি (বৌদ্ধ প্রতিমা) ছিল। যা আরাকান দখলের পর অমরাপুরায় (আভার টুইন শহর, বার্মার রাজধানী) স্থানান্তরিত হয়। অন্য

Dhaka University Institutional Repository

মতে, মহামুণি প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় বুদ্ধমূর্তি, এটি ১৭৮৫ সালে আরাকান দখলের সময় রাজা বো-ধো-হিপের সৈন্যরা নিয়ে যায়। এটি এখন মান্ডালেতে মহামুণি (গৌতম বুদ্ধ) বিহারে স্থাপিত আছে।

কালিকিংকর মুৎসুদ্দি সম্পাদিত প্রাচীন 'বৌদ্ধবন্ধু' পত্রিকার প্রথম বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যার প্রবন্ধ 'মহামুণি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' যা ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত থেকে জানা যায়, ১৮১৩ সালে মহামুণি মূর্তি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সালে চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে ধর্মপ্রাণ কুঞ্জ ধামাইয়ের উদ্যোগে মহামুণি মেলার সুত্রপাত হয়।

মহামুণি মেলা সম্পর্কে কবি লিখেছেন -

'বৌদ্ধমেলা যে মহামুণি গ্রামে বর্ষের শেষভাগে

সকল জাতির নরনারী সবে মেলে হেথা অনুরাগে।'[৭৭]

সেই দিন চিরদিন। চট্টলভূমি এক সময় বৌদ্ধধর্মের অসাধারণ কীর্তি ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ ছিল। স্মরণাতীত কাল হতে চট্টগ্রামের প্রতিস্থানে বৌদ্ধদের কোননা কোন চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল। লোকাকীর্ণ জনপদে নিভৃত পল্লীতে, উচ্চ পর্বত শিখরে, গভীর অরণ্য গুহায়, সাগর নদীর কূলে সর্বত্রই বৌদ্ধধর্ম ও ঐতিহ্যের নিশান দেখা যেত। চট্টগ্রামের টারশিয়ারী যুগের পাহাড়গুলো বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শনে পূর্ণ। বৌদ্ধদের চৈত্যগ্রাম, হিন্দুদের চট্টলা, ইংরেজদের চিটাগং (Chittagong), মুসলমানদের চাটিগ্রাম, ফত্‌হ-ই-আবাদ, ইসলামাবাদ বর্তমান চাটিগাঁও বা চট্টগ্রাম।

৫.১২ বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের বৌদ্ধমেলা

আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ মেলা। মেলার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবমণ্ডিত তাৎপর্য্যের ইতিহাসে বৌদ্ধমেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মেলার শাব্দিক অর্থ হল মিলন ক্ষেত্র, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সম্মিলিত হয়ে পরিণত হয় তীর্থ মেলা। এই মিলন মেলায় পারস্পারিক সৌহাদ্য ও সম্প্রীতির মেল বন্ধন সৃষ্টি হয়। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারায় ধর্মীয় আবহে সহস্রাধিক বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বেই মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ কাহিনীতে মেলার উল্লেখ আছে। বর্তমান নববর্ষের বৈশাখী মেলা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী মেলা। বাঙালি কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সাথে মেলার সম্পৃক্ততা সার্বিকভাবে স্বীকৃত। প্রাচীন মেলাগুলো কোন কোন ধর্মীয় আবহকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয়।

বৌদ্ধমেলা বৌদ্ধিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অঙ্গ। বৌদ্ধমেলাগুলি সাধারণত বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা, বুদ্ধমূর্তি, পুতাস্থি ও চৈত্যের প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রাজা ও জমিদারদের

ঐতিহ্যের স্মরণে আয়োজিত হয়ে থাকে। ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়ার, চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস (১৯৫০ খ্রি.) এবং শ্রীমৎ ধর্মতিলক মহাস্থবিরের 'সদ্ধর্ম রত্নাকর' (১৯৩৬ খ্রি.) গ্রন্থে বৌদ্ধমেলার ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধমেলাগুলোর সর্বাধিক সংখ্যক আয়োজিত হয়ে থাকে। নোয়াখালী, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবনে প্রবন্ধ: প্রফেসর প্রীতিকণা বড়ুয়া, বৌদ্ধমেলা ও ধর্মে ইহার গুরুত্ব) এবং প্রাচীনকালে ভারত ও বাংলায় ছিল বৌদ্ধধর্মের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা কালের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম নানা কারণে হিন্দু ও মুসলিম শাসকশ্রেনীর দলন নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, ক্ষমতায়ন, ধর্মের প্রভাব, বিহার ও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস, ধর্মান্তর, বর্ণ, বৈষম্য ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবন রক্ষায় বৌদ্ধ শুধু কতক পুঁথিপত্র নিয়ে নেপাল, সিকিম, ভুটান, তিব্বত ও বার্মায় পালিয়ে যায়।

ভারত ও বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের গৌরবোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিবে গেলও তার একটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীনতর শিখা বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের চট্টগ্রামে কিছুটা আরাকানীদের সক্রিয় সহযোগিতায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। বলা যায় বর্তমানেও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রামেই বৌদ্ধধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি সগৌরবে দেদীপ্যমান। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসন কালে ইংরেজরা কৌশলগত কারণে অপর ধর্মের উপর উদার হওয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির সুপ্ত প্রাণের জাগরণ আরম্ভ হলো। বৌদ্ধরা নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উৎসব, তীর্থ-মেলার দিকে পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠল। এ সময় বাংলার বৌদ্ধ সমাজে বিভিন্ন উৎসব তীর্থ মেলা ও পূজা-পার্বণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে লাগল। তার মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় আয়োজন বৌদ্ধমেলা।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বৌদ্ধতীর্থ, প্রচার-প্রসার, বুদ্ধের জীবন ভিত্তিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ স্মৃতিবিজরিত দিবসে বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, ফাল্গুণী পূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রান্তি, মহাপুরুষের জন্ম-মৃত্যু তিথিতে বৌদ্ধ বিহার বা খোলা মাঠ বা বৃক্ষ তলায় মেলাগুলো বসতো। মেলার মাধ্যমে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। বৌদ্ধমেলা বাংলার আবহমান লোকসংস্কৃতি অনন্য উপাদান। অনেক মেলা প্রাচীন বৌদ্ধযুগের, কোন মেলার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীতে, কিছু মেলা বিংশ শতাব্দীতে এবং কোন কোন বৌদ্ধমেলার প্রচলন শুরু থেকে শেষ বর্তমানে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের মেলার সাথে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন কালে মেলা ছিলো ধর্মাশ্রয়ী, বর্তমানে তার পাশাপাশি ইতিহাস-ঐতিহ্য স্মরণে বা আধুনিক কালে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মেলা সংগঠিত হয়। মেলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বৌদ্ধমেলা প্রাচীনত্বের দাবিদার। সহস্রাধিক বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে বৌদ্ধমেলাগুলো সংঘটিত হয়ে আসছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য, ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকের মতে, সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালের (২৩৭-১৩২ খ্রীষ্টপূর্ব) কলিঙ্গ অনুশাসনে ভাদু ও তুষু নামে দুইটি প্রাচীন মেলার উল্লেখ আছে। পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এর ভ্রমণ কাহিনীতে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান

Dhaka University Institutional Repository

নগরে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নগরে প্রবেশের যাত্রা উপলক্ষে পক্ষকাল ব্যাপি মেলা আয়োজনের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ: বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ঃ বৌদ্ধ মেলা, শিমুল বড়ুয়া) বাংলাদেশে সুপ্রাচীন কাল হতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পালা-পার্বণ, উৎসব, পূর্ণিমা তিথি বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনা ও ঐতিহ্যকে ঘিরে কয়েক হাজারের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলা মানে আনন্দ। ধর্মীয় চেতনা ঐতিহাসিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, সার্বজনীন সম্প্রীতি ভ্রাতৃত্ববোধ, বাঙালির ঐতিহ্য ও স্বাদেশিকতাবোধের প্রেরণা থেকে বাংলাদেশে মেলার উৎপত্তি হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বৌদ্ধধর্মীয়, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে বৌদ্ধ রাজা ও সংঘ প্রধানের উদ্যোগে ও বদান্যতায় বৌদ্ধমেলা আয়োজিত হত। বর্তমান আধুনিক কালে মেলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বাহক ও ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। যেমনঃ বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, বিজয় মেলা, শিক্ষা মেলা, পুস্পমেলা, কম্পিউটার মেলা, শিল্প মেলা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবতঃ খোটান বৌদ্ধদের রথযাত্রার অনুকরণ এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বৌদ্ধ ত্রিমূর্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রা তথা বর্তমান রথযাত্রার মেলা গুপ্ত যুগের বুদ্ধযাত্রার মেলারই অনুকরণ মাত্র। সম্রাট হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ত্রিবেণী সঙ্গমে এক ধর্মীয় মেলার আয়োজন করতেন। এতে রাজকোষে সঞ্চিত সম্পদ রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণে বিতরণ করতেন। এলাহবাদে বর্তমান কুম্ভমেলা সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্মৃতিকে স্মরণ করে দেয়। সপ্তম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক শেঙ চি ভ্রমণ বিবরণীতে লিখেন, 'প্রাচীন বঙ্গদেশে সমতটের খড়্গবংশীয় রাজা রাজভট্ট ত্রিরত্নের ভক্ত উপাসক ছিলেন। তিনি বুদ্ধের সম্মানে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পুরোভাগে রেখে এক শোভা যাত্রা পরিচালনা করতেন এবং সম্মিলিত মেলায় মুক্ত হস্তে দান করতেন।' (অনোমা, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০১, প্রবন্ধ: বাংলাদেশের প্রাচীন ঐহিত্যঃ বৌদ্ধমেলা, শিমুল বড়ুয়া)

প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রবর্তিত বৌদ্ধমেলা উৎসব ক্রমে আরো ব্যাপক ভিত্তিক যেমন- তীর্থ, পূজা-পার্বণ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘকাল পরিক্রমায় বৌদ্ধমেলাগুলো আর আগের মতো নেই। কিছু মেলা শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এবং কিছু মেলা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। আধুনিক কালের মেলাগুলো বিশেষত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সূচনা হয়েছে। প্রাচীন ধর্মীয় ঐহিত্যবাহী মেলাগুলো আগের মতো মানুষকে আকর্ষণ করে না। কোন রকমে অস্তিত্ব ঘোষণা করে লোক সমাজে টিকে আছে মাত্র। বৌদ্ধ মেলার ইতিহাস সংগ্রহ ও রচনায় প্রবিষ্ট হওয়ায় উল্লেখ করতে হয়-

Dhaka University Institutional Repository

রুডিয়ার্ড কিপলিং এর বিখ্যাত ধাঁধা কবিতাঃ I keep six honest serving men, They taught me all I know; Their names are 'What' and 'Why' and 'When' and 'Where' and 'Who' and 'How'.

বস্তুত প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই এই কি, কেন, কখন, কোথায়, কে এবং কিভাবে এই ছয়টি রহস্য ভেদ হলেই সত্যিকারের মীমাংসা পাওয়া সম্ভব।[৭৮] প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের আলোচনায় সীতাকুণ্ড মেলা, পাহাড়তলী মহামুণি মেলা, চক্রশালা মেলা, রামকোট মেলা, ঠেগরপুণি মেলা আলোচিত হয়েছে। এখানে অন্যান্য প্রাচীন ও বর্তমান মেলাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গুরুত্ব তোলে ধরা হলো-

সাতবাড়ীয় মহামুনি মেলা

চন্দনাইশ থানার সাতবাড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী বেপারীপাড়া গ্রামে ১৭৬০ সালে নবরত্ন বিহার (বর্তমান রত্নাংকুর বিহার) প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে পক্ষকাল এ মেলা হয়। এ মেলা আয়োজনে বেপারী বংশের এবং আধুনিক বৌদ্ধ সমাজের পথিকৃৎ নাজির কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরীর অবদান রয়েছে। ১৯৮৫ সালে বৌদ্ধধর্মের পরম সাধক শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির (১৯১২-১৯৯৪) এর নেতৃত্ব বিহারটির নামকরণ হয় রত্নাংকুর বৌদ্ধ বিহার।

হাইদচকিয়া মেলা

চট্টগ্রাম জেলা ফটিকছড়ির পাইনন্দং এ হাইদচকিয়া গৌতমাশ্রম বিহার অবস্থিত। এটি অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের তৃতীয় দশকের (১৭৩০-৩৫খ্রি.)। বর্তমান বিহারটি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গার নিবাসী দো অং চৌধুরীর প্রপিতামহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ফটিকছড়ি থানার হাইদচকিয়া গ্রামে ১২২৭ মঘাব্দে/ ১৯১৩ সালে খাগড়াছড়ি নিবাসী স্বধর্মপ্রাণ দোঅং চৌধুরী মহামুণি বিহারে ভূমি স্পর্শ মুদ্রায় শান্ত সৌম্য একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহার ও বুদ্ধমূর্তির প্রতিষ্ঠার উৎসর্গ কালে চৈত্রসংক্রান্তি দিবসে এ মেলা আয়োজন হয়ে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি অনুষ্ঠিত মহামুণি মেলা পক্ষকাল স্থায়িত্ব হয়ে থাকে।

মানিকপুর শাক্যমুণি মেলা

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার বৌদ্ধজনপদ মানিকপুরের বিজয়ানন্দ বিহারে (বর্তমান মাতাহুরীর জলে ধ্বংস প্রাপ্ত) পঞ্চবর্গীয় শিষ্যবেষ্টিত নির্বাণ শয্যার বুদ্ধমূর্তি ও বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী শাক্যমুণি মেলা বসে থাকে। এ সময় ধর্মীয় পূজা ও আলোচনা সভা হয়ে থাকে। মেলায় বড়ুয়া ও উপজাতি মার্মা রাখাইন ও অন্যান্য লোক সমাগম হয়।

চেঁদিরপুনী মেলা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার চেঁদিরপুনী গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে চেঁদিরপুনী ধাতু চৈত্য মেলা বসে। এটি তীর্থস্থানও বটে। এই মেলা সৃষ্টির ইতিহাস খুবই প্রাচীন। ধর্মতিলক স্থবিরের 'সদ্ধর্ম রত্নাকর' গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

মতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মগধাগত ছান্ধমার দুই পুত্র ছিল। তার মধ্যে চেন্দি (গৃহী) ও রাজমঙ্গল (ভিক্ষু) ছিলেন। চেন্দি চকোরিয়ায় বসবাস করতেন। তাঁর ছিল তিন পুত্র কেজগ্রি, কেয়কচু ও বৃন্দাবন। এদের মধ্যে পরে কেয়কচু ভিক্ষু হয়ে নাম হয় চন্দ্রজ্যোতি। বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির দীর্ঘ দিন ব্রহ্মদেশে উচ্চতর বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মদেশ হতে আনীত বুদ্ধ পুতাস্থি তাঁরই পিতা রাজা চেন্দি কর্তৃক সাতকানিয়ার হরিণা নামক স্থানে বিহার ও বুদ্ধ পুতাস্থি প্রতিষ্ঠাকে স্মরণ করে চেঁদির পুনীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটি বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসের অনন্য পূণ্যভূমি। এই মেলা তিন চারদিন চলত। বর্তমানে পূর্বের ন্যায় কোন মেলা আর বসে না।

ঢেমশা শাক্যমুণি মেলা

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার ঢেমশা গ্রামের শাক্যমুণি বিহারকে কেন্দ্র করে ১৯৩১ সাল হতে ফাল্গুণী পূর্ণিমাতে অত্র মেলা হয়। সদ্ধর্ম সাধক শ্রীমৎ সোমানন্দ মহাস্থবির কর্তৃক ১৯৩০ সালে ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার) থেকে আনীত সুবিশাল শাক্যমুণি বুদ্ধমূর্তি ফাল্গুণী পূর্ণিমার শুভ তিথিতে বিহারে প্রতিষ্ঠা করাকে কেন্দ্র করে অত্র মেলার নামকরণ করা হয় ঢেমশা শাক্যমুণি মেলা। সেই ধারাবাহিকতায় এখনো ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলা অত্যন্ত জাকঝমক ও ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। এ মেলা পরবর্তীতে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের বৌদ্ধ কৃষ্টি সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে এই মেলার গুরুত্ব অত্যধিক। পরবর্তীতে শ্রীমৎ বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির মেলার প্রচার প্রসার ও জন সমাগম বৃদ্ধির জন্য কবিগান ও বৌদ্ধধর্মীয় কীর্তনের আয়োজন করেন। সপ্তাহব্যাপী মেলার স্থায়িত্ব হলেও বর্তমানে ১/ ২ দিন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আয়োজিত হয়। বর্তমান সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এবং ২০০৬ সালে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় একুশে পদক প্রাপ্ত প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং গ্রামবাসীর সহযোগিতায় বৃহত্তর পরিসরে মেলায় স্মৃতিসভা, আলোচনা সভা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

আবুরখীলে মাঘী পূর্ণিমা মেলা

চট্টগ্রাম জেলার রাউজেনের আবুরখীল গ্রামের সূর্য বৈদ্যের বিহারে রেঙ্গুণ থেকে আনীত শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় মেলা অনুষ্ঠিত হয় । এই মেলা ১৯০০ সাল হতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। (আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১২), মেলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়ে থাকে। এছাড়া বগাহারায় বুড়াগোঁসাই মেলা, আহলায় সত্যসিংহ (শাক্য সিংহ) মেলা, চূড়ামণিতে মাঘী পূর্ণিমাসীতে মেলা বসে ইতিহাসে উল্লেখ আছে।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

হাইদগাঁও ফোরা চেঙ্গী মেলা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির হাইগাঁও এ ফোরা চেঙ্গী বৌদ্ধমেলা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যমণ্ডিত মেলা। ফোরা (প্রভু/বুদ্ধ) ও চেঙ্গী (সংঘ) বুদ্ধ সংঘ চেঙ্গী, সংঘ শব্দের অপভ্রংশ অল্পপ্রাণ শব্দের উচ্চারণে চঙ্গ ও পরে চেঙ্গী হয়েছে। এখানে প্রতি বৎসর বিষুব সংক্রান্তি দিনে মেলা বসে ও বুদ্ধপাদে বৌদ্ধগণ পিণ্ডদান করেন। এই মেলার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাওয়া যায় না, তবে বৌদ্ধ শাসনামলে এ মেলার প্রচলন হয় বলে সর্বজন প্রসিদ্ধি রয়েছে।

চুলামণি/বুদ্ধ মেলা

রাউজান থানার ডাবুয়া লাঠিছড়ি গ্রামের চুলামণি বিহারে মাঘী পূর্ণিমাতে যে মেলা হতো তার নাম চুলামণি বা বুদ্ধ মেলা। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের মতে, উক্ত গ্রামের জমিদার অভয়াচরণ চৌধুরী ১৮৮৮ সালে পাকা বিহার ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন। বিহার প্রাঙ্গণে মাঘী পূর্ণিমাতে মেলার আয়োজন করেন। মেলা ও বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সম্পত্তিও রেখে যান। সেই অবধি অনেক বছর পর্যন্ত এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে চুলামণি মেলা আর বসে না

বরিয়া ধাতু মেলা

অতীত ইতিহাসে হারিয়ে যাওয়া একটা মেলার নাম বরিয়া ধাতু মেলা। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমার পর শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পটিয়া থানার অন্তর্গত বরিয়া গ্রামের মনোরঞ্জন বিহার প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলা তিনদিন স্থায়ী হতো। পণ্ডিত ভদন্ত শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির এই মেলার প্রতিষ্ঠিত বিহারে একটি পরিনির্বাণ মূর্তি আছে। মেলা প্রথম কখন আরম্ভ হয়েছিল জানা যায় না। তবে অনেকে বলেন, আজ থেকে ২০/২২ বৎসর আগে এই মেলা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যূহচক্রের আয়োজন মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

পঞ্চরত্ন স্মৃতি মেলা

পটিয়া থানার জোয়ারা খানখানাবাদ গ্রামে প্রতি বৎসর ৪ঠা মাঘ পঞ্চরত্ন স্মৃতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমৎ ভবানন্দ মহাস্থবির স্বনাম খ্যাত পাঁচজন সমাজসেবী খাদে রাউলী, বেপারী মাথে, ধর্মরশ্মী মহাস্থবির, বসন্ত মাথে এবং জয়রাম মাথের পূণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে পাঁচটি বিহার নির্মাণ করেন এবং পঞ্চরত্ন স্মৃতি মেলার আয়োজন করেন। এই মেলা উপলক্ষে মহাসংঘদান এবং পঞ্চরত্নের স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখনো ছোট পরিসরে মেলা বসে।

কৌশল্যারবাগ বোধিদ্রুম মেলা

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার সোনাইমুড়ী কৌশল্যারবাগ গ্রামের ডা. অনন্ত কুমার চৌধুরী (বড়ুয়া) আনুমানিক ১৯৫৯ সালে বুদ্ধগয়ার একটি বোধিবৃক্ষের চারা স্থানীয় ত্রিরত্ন শরণ বিহারে (বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত নাম) থেকে সামান্য পূর্ব দিকে বোধিচারাটি রোপণ করা হয়। দিন দিন এ

Dhaka University Institutional Repository

বৃক্ষটি বাড়তে থাকে এবং বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে এ বোধিবৃক্ষকে কেন্দ্র করে ডা. অনন্ত কুমার চৌধুরীর প্রচেষ্টায় প্রতি বছর বৈশাখী পূর্ণিমাতে বোধিদ্রুম মেলা অনুষ্ঠিত হত। কয়েক বছর পর এ মেলা বন্ধ হয়ে যায়।

মিঞাপুর বৌদ্ধমেলা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার মিঞাপুর বৌদ্ধমেলা শতাব্দীর প্রাচীন। জানা যায় যে, মগধেশ্বরী পূজাকে কেন্দ্র করে এ মেলা শুরু হয়। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে শ্রীলংকা থেকে আগত একজন ভিক্ষু এ পূজা বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের মূলনীতির পরিপন্থী বলে মত প্রকাশ করলে পূজার আবেদন ক্ষুন্ন হয় এবং পরবর্তীতে মেলা বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানে প্রতি ১লা পৌষ সেবা খেলার পাশে এখনো মেলা বসে।

ফতেনগর বোধিদ্রুম মেলাঃ

শতাব্দীর প্রাচীন চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার ফতেনগর মহাবোধির রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। স্থানীয়ভাবে এটি মহাবোধি বা মহাবোধি তীর্থ নামে পরিচিত। এখানে প্রতি বছর ফাল্গুণী পূর্ণিমা তিথিতে চন্দনাইশ থানার ফতেনগর গ্রামে মহাবোধি মেলা বসে। প্রাচীন বোধিবৃক্ষকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ও হিন্দু জনগোষ্ঠী এই মেলার আয়োজন করে থাকে। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত বোধি বৃক্ষকে পূজা করে, বাতি জ্বালায়, আশা পূরণে মানত করে। তাই বোধিবৃক্ষ বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। বৌদ্ধ ও মুসলিম বিবাদে সাম্প্রদায়িক কারণে মুসলমানরা বোধিবৃক্ষটি কেটে ফেলে। পরে একই স্থানে আবার অমাবশ্যা তিথিতে বোধিবৃক্ষের বিশাল শাখা-প্রশাখা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে মহিরুহ রূপলাভ করে এবং বৃক্ষটি পুনরায় মহাবোধি নামে খ্যাত হয়।[৮০] বর্তমানেও এখানে মেলাটি আয়োজিত হয়ে থাকে।

ইছামতি ধাতুচৈত্য মেলা

বুদ্ধের ধাতুঅস্থি বৌদ্ধদের কাছে অতীব পবিত্র। রাঙ্গুনিয়ার ইছামতির শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাজগুরু ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির (১৮৬২-১৯৫২) কর্তৃক বার্মার সংঘ কাউন্সিল থেকে বুদ্ধের পুতাস্থি ও শ্বেতপাথরের দুইটি সুদৃশ্য বুদ্ধমূর্তি আনয়ন ও প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ইছামতি গ্রামের বিহারে ফাল্গুণী পূর্ণিমায় ধাতুচৈত্য মেলা বসে আসছে। এ মেলায় বৌদ্ধধর্মের পুর্নজাগরণের নন্দিত সাংঘিক প্রতিভা শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির স্মরণে স্মৃতিচারণ সভা হয়।

রাজবিলা জাদি মেলা

বৌদ্ধধর্মে জাদী বা বেদী পবিত্রময়। প্রতিবছর ফাল্গুণী পূর্ণিমা তিথিতে বান্দরবান জেলার রাজবিল মৌজার ঐহিত্যবাহী উদাল বনিয়া বৌদ্ধ বিহারে জাদী মেলা হয়। এখানে বাঙালি বড়ুয়া ও উপজাতি পাহাড়ীরা অংশগ্রহণ করেন। মহাসমারোহে সুদীর্ঘ কাল হতে ৩/৪ দিন ধরে মেলা বসে।

Dhaka University Institutional Repository

দীঘিনালা চিন্তামুণি মেলা

১৯৩১ সালে বাবুছড়া মৌজার অভিরথ চন্দ্র চাকমা বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন। খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থানার বাবুছড়ায় বৌদ্ধ বিহারকে উপলক্ষ করে ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে উপজাতীয়রা চিন্তামুণি মেলা আয়োজন অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৩১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মেলা চলে আসছে। ১৯৭০ সালে মেলা বন্ধ হয়ে যায়। শান্তিচুক্তির পর ১৯৯৭ সাল থেকে মেলা পুনরায় শুরু হয়।

ফরাচিং মেলা

'ফরা' ব্রহ্মদেশীয় শব্দ, এর অর্থ বুদ্ধ। পাহাড়তলী মহামুণি মেলার বহু পূর্বেই ফরাচিং মেলা রাউজানের বাগোয়ান গ্রামে আয়োজিত হয়ে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস' লেখক ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়ার মতে, ১২৬৭ মঘাব্দের ১২০ বছর পূর্বে (১৭৮৫ খ্রি.) বদু নামক এক চাকমা ফরাচেইন বিহার ও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা হতে ফরাচিং মেলা প্রচলিত হয়। এই বিহারটি অত্যন্ত প্রাচীন। সমগ্র চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের নিকট এটি ফরাচিন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকদের মতে, এখানে প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা বসত। পরবর্তীতে পাহাড়তলীর (কদলপুর) চাইঙ্গা ঠাকুর রোসাঙ্গী (আরাকান) থেকে মহামুণির প্রতীকি বুদ্ধ স্থাপন করে ফরাচিং মেলার অতীতকে ধারণ করেছে। [৮১] বর্তমানে এ বিহারটি তীর্থভূমি হিসাবে বৌদ্ধ সমাজে সমাদৃত।

বৈদ্যপাড়া বোধিদ্রুম মেলা

১৮৭৮ সালে মহাথের রাধাচরণ ঠাকুর বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ হতে একটি শাখা এনে বৈদ্যপাড়া গ্রামের রোপন করেন এবং বোধিবৃক্ষের নামানুসারে বিহারের নাম হয় বোধিদ্রুম বিহার। ১৯৬৩ সালে বিহার নির্মাণ হয়। এতে অষ্টধাতু বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধাস্থি স্থাপিত হয়। বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত বৈশাখি পূর্ণিমাতে এই বোধিবৃক্ষকে উপলক্ষ করে প্রতিবছর এ মেলা বসে। বোধিবৃক্ষটি এখানো বর্তমান।

শীলঘাটা জাদিচৈত্য মেলা

অতীতের জাদি মেলা বর্তমানে সাতকানিয়া থানার শীলঘাটা পরিনিবার্ণ মেলা। প্রাচীনতম জাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর ১৯১৪ সালে এ বিহার প্রতিষ্ঠা করে ১৯৩১ সালে পরিনির্বাণ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন ঐতিহ্য জাদির স্মরণে সাতকানিয়ায় শীলঘাটা গ্রামে পরিনির্বাণ মেলা বসে। প্রতি বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে এ জাদি মেলা হত। মেলা উপলক্ষে সংঘদান, ধর্মসভা ছাড়াও অন্যতম আকর্ষণ ছিল যাত্রাগান। মেলায় চাকমা, মারমা, মুরং, ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা সমবেত হয়।

নবাবগঞ্জের তপর্ণ ঘাট মেলা

উত্তরবঙ্গের নবাবগঞ্জের তপর্ণ ঘাট একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। লোকমুখে এখানে বাল্মীকিমুণি তপর্ণ করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসে একথার কোন মৌলিক ভিত্তি ও সত্যতা নেই। এখানে প্রাচীন কালে বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ শাসনামলে এটি একটি প্রসিদ্ধ

স্থান ছিল । এখানে প্রতি বৈশাখ মাসে একটি মেলা বসে। আদিতে সম্ভবত পাল শাসনামলে বৈশাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে এ উৎসব হতো। এ বৌদ্ধমেলার স্মরণীয় তিথি ছিল গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব, সিদ্ধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণ দিবস্ বৌদ্ধ রাজত্বের পতনের পর এই বৌদ্ধমেলা সেন বংশীয় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের স্নানের মেলায় পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশে এভাবে বহু বৌদ্ধধর্মীয় বিহার, উৎসব ও মেলা লৌকিক উৎসবে বিবর্তিত হয়েছে। আবার অনেকের ধারণা এখানকার বিহার, স্তূপ ও মেলার ইতিহাস খুব সম্ভবত সীতাকুট বিহারের নিমার্ণের যুগে (৫ম বা ৭ম শতাব্দী) বা কিছু কাল পরে হতে পারে।[৮২]

বিনাজুরি পরিনির্বাণ মেলা

রাউজান থানার বিনাজুরী গ্রামের পরম পুরুষ যোগাচার্য ধর্মকথিক মহাস্থবিরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন জমিদার চৌধুরী প্রদত্ত জমির উপর ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্মশান বিহার' ১৮৯৭ সালে বিহারাধ্যক্ষ ধর্মকথিক মহাস্থবিরের অনুপ্রেরণায় শ্মাশান বিহারে একটি বুদ্ধের পরিনির্বার্ণ মূর্তি স্থাপন করা হয়। ১৮৯৮ সালে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে এই পরিনিবার্ণ মূতি উৎসর্গ করা হয়। এ উপলক্ষে এক বিরাট মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর মেলার আকষর্ণ হলো অত্র এলাকায় প্রথম বুদ্ধের পরিনিবার্ণ মূর্তি আর বৃ্যহচক্র। মেলা সাত দিন ব্যাপী স্থায়ী হত। জনশ্রুতি মতে, ১৮৯৮ সাল হতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত প্রতি মাঘী পূর্ণিমায় সাতদিন ধরে মেলা চলতো। মেলার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পর মেলা আর বসে না।[৮৩]

টাঙ্গাইল বারতীর্থ মেলা

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানা হতে প্রায় ৬-৭ মাইল উত্তরে শেষ প্রান্তে একটি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও জলাশয় আছে। এখানকার একটি প্রাচীন জলাশয়কে বারতীর্থ বলে। এই পুকুরে বারেমাস পানি থাকে। এই পুকুরের ঢালুতে একটি পাকা কুয়ো আছে। এখানে বৈশাখ মাসের অমাবস্যায় একটি মেলা বসে। এ সময় পুণ্যার্থীরা বারতীর্থ কুয়োর পানিতে স্নান করে। হিন্দুদের বিশ্বাস এ দ্বারা সর্ব পাপ দূর হবে। স্থানীয় প্রবাদ মতে, ভগদও নামক এক রাজা এই জলাশয় খনন করে দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে পানি এনে জলাশয়টি পূর্ণ করেন এ জন্যই নাম হয় বারতীর্থ। প্রাচীন ইতিহাসে একটি মতে, ভগদত্ত নবম শতাব্দীর নৃপতি। অন্যমতে, তিনি দশম একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন। এখানে তাঁর রাজধানী বলে কথিত।[৮৪]

প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস গবেষক আ.কা.মো. যাকারিয়া মনে করেন 'প্রাচীন কালে খুব সম্ভব বারতীর্থ একটি বৌদ্ধধর্মকেন্দ্র ছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এটি হিন্দু বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীদের ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়।' আর এ বারতীর্থকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে মেলা হয়। এটি প্রাচীন বৌদ্ধ মেলার ইঙ্গিত বহন করে। বৈশাখী পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রধান তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ লাভের স্মৃতি জড়িত। পূর্ণিমা উপলক্ষে এটি একটি বৌদ্ধ উৎসব ও

Dhaka University Institutional Repository

মেলা ছিল। বৌদ্ধযুগের অবসানের পরে হিন্দুরা তাদের সময় এই মেলা অমাবশ্যায় স্থানান্তরিত হয়। এই মেলা প্রাচীন এবং পালযুগের হওয়া সম্ভব।' [৮৫]

উনাইনপুরা বুদ্ধপদ মেলা

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার উনাইনপুরা গ্রামের লঙ্কারাম বিহারে স্থাপিত বুদ্ধপদ চিহ্নকে স্মরণ করে এ মেলা বসে। ইতিহাস মতে, ১৫৩০ খ্রি. মাং বংশীয় যোগীমার বা যোগী খাইংয়ের বংশধর জয়ধর রাউলী বিহারটি নির্মাণ করেন। কিন্তু ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া বলেন, এ বিহারটি ১৮৮৫ সালে নির্মাণ করা হয়। [৮৬] উনবিংশ শতকে (১৮৮২ খ্রি.) আচার্য ধর্মধারী চন্দ্রমোহন ভিক্ষু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিহারে এই বুদ্ধপদ চিহ্নটি স্থাপন করা হয়। ১৯২৬ সালে গ্রামের কৃতি সংঘমণীষা পণ্ডিত জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের তত্ত্বাবধানে বুদ্ধপাদ স্থাপন করা হয়। এই বুদ্ধপাদ চিহ্ন পূর্ণাচার মহাস্থবির এবং কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবিরের সমাধি মন্দির দ্বারা বেষ্ঠিত বলে এই মেলা নাম আচারিয়া মেলা। এ বুদ্ধপাদ মেলা ১৮৮৩ খ্রি. হতে আয়োজিত হয়ে আসছে। এছাড়া উনাইনপুরায় ফাল্গুণী পূর্ণিমাতে ও আর একটি মেলা হয় বৌদ্ধ ইতিহাসের সৃতিকাগার উনাইনপুরায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মেলা ও তীর্থ। বর্তমানে উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহারের মহাধ্যক্ষ দ্বাদশ সংরাজ পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবির অবস্থান করেন।

মছদিয়া চৈত্যমেলা

বর্ষবরণ ও বর্ষবিদারের দিনে লোহাগাড়া থানার মহদিয়া গ্রামে এই চৈত্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও বোধিবৃক্ষকে উপলক্ষ করে এ মেলা বসে। ইতিহাস মতে, অতি প্রাচীন খাঁ দীঘির উত্তর পাড়ে বৌদ্ধ বিহারটির ইতিহাস প্রায় দেড়শতাধিক বছর। জনসমাগম, বলিখেলা ও ব্যূহচক্র ফাঁদ এ মেলা আকর্ষণ।

ব্যূহচক্র মেলা

ব্যূহচক্র মেলা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাচীন এবং তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যূহচক্র অর্থ চক্রাকারে আবিষ্ট জাল। যার মধ্যে গমন ও প্রস্থান অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ব্যূহচক্র মেলার আয়োজন করে থাকে। বৌদ্ধমেলার অনুষঙ্গ হিসেবে বা পরিবাস ব্রত উপলক্ষে এই ব্যূহচক্র তৈরী করা হয়।

বাঁশের ঘেরা দিয়ে খুব কৌশলে বিস্তৃত ভূখণ্ডে ব্যূহচক্র তৈরী করা হয়। প্রবেশ পথ থেকে ব্যূহচক্রের আঁকাবাঁকা বিভিন্ন মুখী রাস্তা দিয়ে কেন্দ্রে পৌঁছতে হয়। কেন্দ্রে থাকে মঞ্চের উপর বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধরা এই ব্যূহচক্রকে সংসার চক্রের সাথে তুলনা করে থাকে। সংসার চক্রের প্রতীক ব্যূহচক্র। বৌদ্ধমতে, সংসার চক্রে কার্যকারণ তত্ত্বে মানুষ ঘুরছে। সংসার দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান প্রতীকি এই মেলা।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলা হয় চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে। বৃহচক্র একটি গোলক ধাধা বিশেষ। একবার ঢুকলে লক্ষ্যস্থলে যাওয়া যেমন কঠিন আবার বের হয়ে আসাও কঠিন। এক বিস্তৃত ভুখণ্ডে বাঁশের ঘেরা দিয়ে আঁকাবাঁকা করে এবং মাঝে দু'মুখী, তিনমুখী এবং চতুর্মুখী রাস্তা করে ব্যূচক্র করা হয়। ঠিক মাঝখানে বুদ্ধমূর্তি। যারা ঠিক ঠিক পৌঁছতে পারে তারা ফুল ও প্রদীপাদি দিয়ে বুদ্ধপূজা করে আবার ফিরে আসে। কিন্তু শেষপর্যন্ত লক্ষ্যস্থল পৌঁছতে পারে খুব কম ব্যক্তিই। ব্যূহচক্র সংসারারণ্যের প্রতীক মাত্র। ব্যূহচক্রের ন্যায় মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে সংসারে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগ করেও মুক্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধ নির্দেশিত অষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ করলে মানুষ জীবনে মুক্তি লাভ করতে পারে এটা বুঝাবার জন্যই বৃহচক্র মেলার আয়োজন করা হয়।[৮৭]

রামু ব্যূহচক্র মেলা

কক্সবাজার জেলার ঐতিহ্যবাহী রম্যভূমি রামুর মেরেংলো, রাজার কুল, হাজারীকুল, শ্রীকুল, অষ্টকাটা গ্রামে এবং উখিয়া, পালং ও কক্সবাজার সদরে প্রতি বছর ব্যূহচক্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়। একে আঞ্চলিক ভাষার প্যাচঘরও বলা হয়। এটি রামুতে একটি ঐতিহ্যবাহী মেলায় পরিণত হয়েছে। প্রাচীন রম্যভূমি রামুর গৌরবময় ইতিহাসে বৌদ্ধদের বিভিন্ন উৎসব মেলা ও অনুষ্ঠান অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

রাউজান পরিনির্বাণ মেলা

চট্টগ্রামের রাউজান থানার রাউজান গ্রামের মহাপরিনির্বাণ বিহারে সিংহশয্যায় বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠাকরণ করা হয়। উক্ত গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী গোলক চন্দ্র বড়ুয়া, মহেশচন্দ্র বড়ুয়া ও জয়চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখের যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯০৮ সালে বিহার প্রতিষ্ঠা ও বিহার অভ্যন্তরে ২৭ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০ ফুট উঁচু বুদ্ধের একটি পরিনির্বাণ মূর্তি স্থাপন করা হয়। এ বিহারাঙ্গনের উত্তরদিকে বিহারে অভয়মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি, দক্ষিণপাশে শ্বেতপাথরে খোদিত বুদ্ধের কৃত্রিম পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠা, অন্য একটি বিহারে ধ্যানাসনে আর্যমিত্র বুদ্ধের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিহার ও বুদ্ধমূর্তি উৎসর্গের দিন হতে প্রতি মাঘী পূর্ণিমাতে মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমাতে ৫/৬ দিনব্যাপী মেলা বসে।

গোবিন্দ ঠাকুরের মেলা

রাউজানের ইদিলপুর গ্রামের মহান সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীমৎ গোবিন্দ্র ভিক্ষুর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতি রক্ষায় মাঘী পূর্ণিমা দিনে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জীবনে সাংঘিক জীবন যাপন করলেও পরবর্তীতে গৃহী ধর্মে প্রবেশ করে গোবিন্দ্র ঠাকুর নামে পরিচিত হন। তিনি সাধনা বলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানের নিকট তিনি গুরু ঠউর নামে সুপরিচিতি লাভ করেন। গ্রামের বিত্তবান ও চিত্তবান ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্যোগে তাঁর স্মৃতি উদ্দেশ্যে এ মেলার আয়োজন। সাধক পুরুষ ইদিলপুর গ্রামে ১৯৪৪ সালে মৃত্যুর পর শাক্যমুণি বিহারের দক্ষিণপাশে তাঁর দেহ সৎকার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই তাঁর সমাধি মন্দির তাঁর প্রতিকৃতি নিমার্ণ করা হয়। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পূণ্যার্থীরা সমবেত হয়, মানত করে এবং স্মৃতিপূজা করে। প্রতিমাঘী পূর্ণিমায় স্মৃতিসভা, অতিথি ভোজন এবং মেলার আয়োজন হয়ে থাকে।

ছাব্বিল ছড়ি বৌদ্ধমেলা

এ মেলাটি শতাব্দীর প্রাচীন। লামা থানা হেডকোয়ার্টার থেকে পৌণে দুই মাইল পূর্ব-দক্ষিণে ছাব্বিলছড়ি বৌদ্ধ বিহার প্রাঙ্গণে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্ত এই মেলা বসে। পূর্বের মতো এখনো এক সপ্তাহ পর্যন্ত মেলা চলে। মেলায় পাহাড়ী উপজাতি, বড়ুয়াবৌদ্ধসহ অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। উপজাতীয় নাচ-গানে মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। মেলার প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় না। এখনো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মেলা বিপুল সমাগমের মাধ্যমে আয়োজিত হয়ে থাকে।

রাঙ্গুনিয়া শাক্যমুণি মেলা

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া রাজা নগরে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজ বিহার অবস্থিত। এই বিহারে প্রথম মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮১), দ্বিতীয় সংঘরাজ পূর্ণাচার ধর্মাধারী এবং চন্দ্রমোহন মহাস্থবির, ভগবান মহাস্থবির এবং ধর্মরত্ন মহাস্থবির অবস্থান করেছিলেন। রাঙ্গুনিয়া থানার রাজানগরে ধরম বক্স রাজার রাজ্ঞী কালিন্দা রাণী ১৮৫৭ কিংবা ১৮৬৬ সালে একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করে মহামুণি বুদ্ধমূর্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে শাক্যমুণি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৬৯ সালে রাজনগর থেকে চাকমা রাজার রাজধানী রাঙ্গামাটি স্থানান্তর হয়ে যায়। বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ এই দুটি তিথির ঐতিহ্য বাঙালির আবহমান কালের। রাঙ্গুনিয়ার শাক্যমুণি মেলার মতো অনেক বৌদ্ধিক মেলা এ চৈত্রসংক্রান্তিতে হয়ে থাকে। এই মেলার নাম শাক্যমুণি মেলা। বা রাজা প্রতিষ্ঠিত মেলা প্রাচীন পাহাড়তলী মহামুণি মেলার ন্যায় এ মেলাও জাঁক-জমকপূর্ণ হয়। এ মেলা প্রারম্ভিকে স্থায়িত্ব ১৫ দিনে (মেলার স্থায়িত্ব একমাস) হলেও বর্তামানে রাজবাড়ী বিহারে ২/৩ দিন পর্যন্ত মেলা চলে। মেলায় চাকমা, মারমাসহ সমতলী বড়ুয়া বৌদ্ধদের সমাবেশ হয়। বিহার কেন্দ্রিক এ বৌদ্ধমেলাগুলোতে প্রধানত বৌদ্ধধর্মীয় চিন্তা চেতনা এবং জনগণের ভাববিনিময়ের মাধ্যমে মৈত্রী, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়।

আবদুল্লাহপুর শাক্যমুণি মেলা

ফটিকছড়ি থানার আবদুল্লাপুর গ্রামের শাক্যমুণি বিহারের পার্শ্ববর্তী খোলা মাঠে প্রতি মাঘী পূর্ণিমাতে অর্থাৎ চাপাল চৈত্যে বুদ্ধের পরিনির্বাণ দিবস ঘোষণা স্মরণ উপলক্ষে এই মেলা বসে। জনশ্রুতি মতে, ১৯১৬ কিংবা ১৯১৮ সালে এ মেলা শুরু হয়। মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল বৃহচক্র, কবিগান এবং যাত্রাগান। শুরু থেকে ৪০/৪৫ বৎসর পর্যন্ত মেলা জাঁক-জমক ভাবে মেলা চলে। বর্তমানেও ২/৩ দিন ব্যাপী মেলা স্থায়ী হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চীৎমরম মেলা

শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গামাটির কাপ্তাই চন্দ্রঘোনার কাপ্তাইর রায়খালী নামক স্থানে চীৎমরম বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত। বিহারটি কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ১৯১২ সালে উ পরাকখম মহাথের এর প্রচেষ্ঠায় ঐতিহাসিক চীৎমরম বিহার ও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে এ বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন উ পণ্ডিত মহাথের। এ বিহারটি বিহারের ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তিকে উপলক্ষ করে সুদীর্ঘকাল থেকে চীৎমরম মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চাকমা, মারমা, বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধসহ অসংখ্য মানুষ এই মেলায় সমাগম হয়। জনশ্রুতি আছে যে, ১৯২৫ সালে চীৎমরম বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই মেলা শুরু হয়। আবার অনেকের মতে, বিহার প্রতিষ্ঠার পূর্বে মেলা প্রচলিত ছিল। প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে ১/৩ দিনের জন্য এ মেলা এখনো বসে। এ চীৎমরম বিহার ও মেলা বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যময় তীর্থস্থানও।

ঐতিহ্যবাহী রাজপুণ্যাহ

তিন পাবর্ত্য জেলার বসবাসকারী উপজাতীর প্রধান তিন সার্কেলের (চাকমা, বোমং, মং সার্কেল) রাজাগণ প্রজাদের কাছ থেকে প্রতিবছর খাজনা আদায়ের উপলক্ষে রাঙ্গামাটির রাজবাড়িতে চাকমা রাজা, খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির রাজদরবারে মং সার্কেল চীফ এবং বান্দরবান রাজবাড়ির মাঠে বোমাং সার্কেল চীফ শীতকালীন প্রতিবছর এ রাজপুণ্যাহ উৎসব ও মেলা আয়োজন করে। পাহাড়ী আদিবাসীদের জন্য রাজপুণ্যাহ সার্বজনীন অনুষ্ঠান। পুণ্যাহ শব্দের মৌলিক অর্থ পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত ও মাঙ্গলিক দিন। কিন্তু বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় 'জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরের খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সূচক'। পুণ্যাহ অনুষ্ঠান অনেকটা খালখাতা'র অনুষ্ঠান। এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠান আদিবাসীদের একটি ঐতিহ্য। [৮৮] 'সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মোঘল, পর্তুগীজ, আরাকান ও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক রাজা-প্রজা, জমিদার, তালুকদার, রোওয়াজা, ফাইনসী দ্বারা পরিচালিত কর প্রদানের রীতিনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এই পার্বত্য অঞ্চলে রাজপুণ্যাহ নামক রাজকীয় প্রথার প্রবর্তন। পরবর্ততে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1990 তথা Hill Tracts M annual বা শাসন বিধি জারির মাধ্যমে 'রাজকুণ্যাহকে' প্রশাসনিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি বিশেষ অংশ হিসেবে সূত্রপাত ঘটায়।' [৮৯] উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় চীফ বা রাজা, হেডম্যান ও কার্বারীগণ নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি রাজবংশের সবচেয়ে বড়ো ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক অনুষ্ঠান রাজপুণ্যাহ উৎসব ও মেলা। পার্বত্য অঞ্চলে তিন রাজাবংশের রাজ্য শাসন ও জমিদার প্রথা অতীতের মতো বর্তমানেও বিদ্যমান। বংশ পরম্পরায় বোমাং, চাকমা ও মং সার্কেলের তিন রাজাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আনুমানিক

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠদশ শতকের এই রাজাকে সার্কেল চীফ করলেও সাধারণ মানুষের কাছে তারা রাজা বা রাজা বাহাদুর হিসাবে পরিচিত। জুমকর, ভূমি উন্নয়ন করসহ সরকারী অন্যান্য কর আদায়ের জন্য রাজার পক্ষ থেকে রাজপুণ্যাহ উৎসব ও মেলার আয়োজন করা হয়। তিনটি পাবর্ত্য জেলা শহর বা রাজদরবারে। অনুষ্ঠানের দিন পার্বত্য অঞ্চলের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ কর বা খাজনা প্রদানের জন্য ও রাজা বাহাদুরকে সশরীরে দেখার জন্য সমবেত হয়। এ উপলক্ষে ৩ দিন থেকে ৭ দিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী মেলা বসে, যাকে রাজপুণ্যাহ মেলা বলে। ইতিহাস মতে, ১৭২৭ সাল হতে বান্দরবানের বোমাং সার্কেলের ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক রাজপুণ্যাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি মং সার্কেলে বিগত ১৫ বছর এবং রাঙ্গামাটি চাকমা সার্কেলে বিগত ২৫ বছর ধরে রাজপুণ্যাহ উৎসব হচ্ছে না বিভিন্ন কারণে। [৯০]

দশবল রাজ বৌদ্ধ বিহার মেলা

ফটিকছড়ির দীঘিনালা থানার বড় মেরুং এ ১৯১৬ সালে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়ের উদ্যোগে বোয়ালখালী দশবল রাজ বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় আর এই বিহারে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ব্রোঞ্জ ও শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমাতে মেলা বসে। ঐতিহ্যবাহী এ মেলা উপলক্ষে ২/৩ দিন ধরে ব্যূহচক্র মেলা হত। পরবর্তী ১৯৩৬ সালে হতে চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের এবং হেডম্যান মনোরঞ্জন দেওয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলার প্রসারতা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৭ সাল থেকে এ মেলা বন্ধ হয়ে যায়।

বৈসাবি উৎসব ও মেলা

বৈসাবি আদিবাসীদের অন্যতম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ও মেলা। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে জাতীয় ভিত্তিক বৃহৎ মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি এবং নববর্ষের দিনে তিন পার্বত্য জেলায় এই বৈসাবি উৎসব ও মেলা হয়ে থাকে। চাকমাদের বিঝু উৎসব (বিহু), মারমাদের সাংগ্রাই এবং টিপারাদের বৈসু পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহৎ এই তিন জাতিগোষ্ঠির উৎসবে যৌথ সমন্বয়ে সম্মিলিতভাবে বর্তমানে বৈসাবি উৎসব উদযাপন করা হয়। পহেলা বৈশাখে এই উৎসব পালন করা হয়। এটি মূলত বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণের নববর্ষ উৎসব। কক্সবাজার ও পটুয়াখালীর রাখাইন বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'সাংগ্রেং' (চৈত্র সংক্রান্তি) নামে নববর্ষ ও জলকেলি উৎসব নামে পালন করে থাকে। [৯১] এটি বর্তমানে পাহাড়ী উপজাতির একটি ঐতিহ্যবাহী আনন্দময় উৎসব।

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার

বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম বৌদ্ধ বিহার ও ধর্মীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম বৌদ্ধ বিহার। রাজবন বিহারের পূর্বে রাজ বাড়ি, পশ্চিমে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, দক্ষিণে রাঙামাটি স্টেডিয়াম অবস্থিত।১৯৬১ সালে চাকমারাণী কালীন্দিরাণীর পুত্র ত্রিদীব রায় রাজবন বিহারের জন্য ৬ একর

Dhaka University Institutional Repository

জায়গা দান করেন। রাজা ভুবন মোহন রায় ১২৬৭ মগাব্দের (১৯০৫ সালে) বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। [৯২] আধ্যাত্মিক মহান সাধক সংঘ মনীষা বনভান্তের সাধনতীর্থ রাঙামাটির বন বিহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মনোরম বন, পাহাড় ও স্রোতসিনী নদী, লেক, ঝর্ণায় ঘেরা দেশের অনিন্দ্য একটি আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র। প্রতিদিন অগণিত ভক্ত, দর্শনার্থী, দেশ-বিদেশী পর্যটক আসছেন, যাচ্ছেন। এতে আসে শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তের) বাসভবন, ভিক্ষু শ্রমণদের আবাস কক্ষভবন, আধুনিক স্থাপত্য কৌশলে রাজবন বিহারে নির্মিত স্বর্গ ভবন (৫ তলা), অতিথি ভবন, দায়ক-দায়িকা রন্ধনশালা ও নিবাস, উপাসক-উপাসিকাদের অফিস, অডিটোড়িয়াম ও মুক্তমঞ্চ, উত্তর প্রান্তে বনভান্তের ভোজন ও সাধন কুটির। আছে ফুলের বাগান, বিশাল বোধিবৃক্ষ, কৃত্রিম ঝর্ণা, ফোয়ারা, ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধের ত্রিমাত্রিক ধাবত ভাস্কর্য, সম্প্রতি ২০০৪ সালে ভাস্কর ডি, কে দাস নির্মিত অনুপম স্থাপত্য শৈলীতে বনভান্তের প্রতিকৃতি ভাস্কর্য। রাজাবন বিহার পরিচালনার পরিষদের তত্ত্বাবধানে মালিক ছবিতে ভাবনাকেন্দ্র। [৯৩] চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলার রাঙামাটি রাজবন বিহার বর্তমান বাংলাদেশী বৌদ্ধদের পুণ্যতীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) এর আগমনের পর হতে এই স্থানটি বৌদ্ধতীর্থ স্থানে রূপ লাভ করেছে। সর্বগুণে গুণান্বিত সাধক প্রবর শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির সর্বপ্রথম এই রাজবন বিহারে প্রতি বছর পালি সাহিত্যে বুদ্ধ প্রবর্তিত নিয়মনীতিতে বিনয় সম্মত ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুলো থেকে সুতা কেটে, কাপড় বুনে, রং করে চীবর তৈরী করে। 'কঠিন চীবর দান' প্রবর্তন করেন। বর্তমানে প্রতিদিন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিক, ভক্ত ও দর্শনার্থী রাজবন বিহারে এ মহাপুণ্য পুরুষকে শ্রদ্ধা ও দর্শন করতে এবং ধর্মদেশনা শ্রবণ করতে সমবেত হন। বর্তমানে এ রাজবন বিহারে শতাধিক ভিক্ষু শ্রমণ রয়েছে।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বুদ্ধগয়া বিহারের চমৎকার কারুকার্য খচিত অনুকৃতি এবং মায়ানমার থেকে আনিত সর্ববৃহৎ ব্রোঞ্জমূর্তি এ বিহারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজবন বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে) একজন সাধক পুরুষ।

মহাসুখ প্রার্থনা পূরক বুদ্ধধাতু জাদী

পার্বত্য জেলা বান্দরবানের পুলপাড়া মহাসুখ প্রার্থনা পূরক বুদ্ধধাতু জাদী, সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধতীর্থ। ১৯৯৫ সালে ভিত্তি প্রস্তর এবং ২০০০ সালে শ্রীমৎ উপঞ্ঞা জোত থের এ জাদী চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেন। চমৎকার কারুকার্য এবং মায়ানমারের বৌদ্ধ ক্যাং বা জাদির অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত জাদির উদ্বোধন করেন মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রী। এটি 'দি ওয়াল্ড বুদ্ধ শাসন সেবক সংঘ' দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। শ্রীমৎ উপঞ্ঞা জোত থের এ আদিবাসী ধর্মপিতা। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধ সমাজের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রতিবছর এই অলৌকিক ঋদ্ধিসম্পন্ন জাদীতে উৎসব ও মেলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বান্দরবান শহর থেকে বালাঘাটা হয়ে ২ কিলোমিটার গেলেই ৩০০ ফুট পাহাড়ের চূড়ায় চোখ পড়বে একটি সোনালী কারুকার্য খচিত বুদ্ধ ধাতু জাদি। ১৩২ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠলে অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও নানা কারুকার্য খচিত এ জাদি ক্যাং। বান্দরবানের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বুদ্ধধাতু জাদি ক্যাং অন্যতম। বিহারাধ্যক্ষ উপঞ্ঞওয়া জোত থের মায়ানমারের শোয়েগ্রাগন প্যাগোড়া, সুলে প্যাগোড়া, শোয়েডং নিয়াত প্যাগোড়াসহ ৫টি প্যাগোড়ার অনুকরণে বান্দরবানের এই বুদ্ধ ধাতু জাদিটি নিমার্ণ করেন। এটি মূলত মায়ানমার সরকারের অনুদানে এবং শিষ্যবৃন্দের অনুদানে নির্মিত। এটি দেশী-বিদেশী পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের নিকট দর্শনীয় তীর্থস্থান হিসেবে রূপ লাভ করেছে। জাদি বিহারটিতে ভিক্ষু শ্রমণ সহ মোট ২০/৩০ জন অনাথ রয়েছে। এতে নির্মিত হয়েছে, বৌদ্ধ মিউজিয়াম, লাইব্রেরী ও অন্যান্য স্থাপনা। মায়ানমারের বিখ্যাত কারিগরদের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তৈরি করা হয়েছে সকল বুদ্ধমূর্তি ও কারুকার্য খচিত নির্মাণশৈলীগুলো। [১৪]

রাখাইন রাধাপোয়ে বা রথোৎসব

রাখাইন সাংস্কৃতিক উৎসব সমূহের 'রাধপোয়ে' (রথোৎসব) একটি অন্যতম উৎসব। প্রাচীন আরাকান রাজ্যের গৌরবময় বৌদ্ধযুগের সোনালী অধ্যায়ের বৌদ্ধ রাখাইন জনগোষ্ঠি। কালের ইতিহাসের বৌদ্ধধর্মের ও ইতিহাসের অনেক বিষয় আজ প্রচ্ছন্ন ও অজ্ঞাত। পূর্বেকার দিনে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের নন্দিত জাতিসত্তা রাখাইন সম্প্রদায়। রাখাইন বৌদ্ধদের মধ্যে এই উৎসব বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হত। কিন্তু বাংলাদেশী রাখাইন সমাজে রাধাপোয়ে উৎসব বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ইদানিং কালে শুধুমাত্র প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র মায়ানমারের রাখাইনদের আরাকান রাজ্যে প্রচলন আছে। রাধা'র বাংলা প্রতিশব্দ 'রথ' এবং পোয়ের অর্থ 'উৎসব বা মেলা'। সুতরাং রাধপোয়েকে বাংলায় রথোৎসব বা রথের মেলা বলা হয়। [১৫] প্রবন্ধ রাখাইন রাধাপোয়ে বা রথোৎসব, মংছেন চাঁনং (মংচিন)।

এ রথের মেলার/উৎসবের সাথে বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় দিক ওতপোতভাবে জড়িত। রথ টানা উৎসব প্রাচীন বৌদ্ধ মেলারই একটি অংশ। এদের প্রায় লোকই Tug of war মেলার সাথের কম বেশি পরিচিত। এই রাধাপোয়ে বা Tug of war রাখাইন জাতীয় খেলাও। এই উৎসব বৌদ্ধধর্মীয় পবিত্র দিন মাঘী পূর্ণিমার সময়ে উদযাপিত হয়ে থাকে। এই রথোৎসব মাঘী পূর্ণিমায় বাধ্যতামূলক হলেও অন্যান্য বৌদ্ধ পার্বণ ও পূর্ণিমার সময়ও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রাখাইন ৯৬০ অব্দে রাখাইন কবি উত্তক্কাপ্যেং প্রত্যেক উৎসর অনুষ্ঠিত এই রথোৎসব সম্বন্ধে বলেছিলেন যে,

কুম্ভরাশি, মাঘী মাসের জের
মুখরিত মহানন্দেঃ
সমাগমিতে, ফি বৎসরেঃ
প্রত্যাশিত ফি রথোৎসব।

Dhaka University Institutional Repository

রাখাইন ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের জাদি উৎসব

পর্যটন নগরী কক্সবাজার জেলায় বড়ুয়া বৌদ্ধ ও রাখাইন জাতিগোষ্ঠির ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ জাদি। যা এ অঞ্চলের এক মহামূল্যবান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপত্য সম্পদ এবং নন্দন সংস্কৃতির উৎসব। কক্সবাজার জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে কতুবদিয়া ছাড়া অবশিষ্ট ৬টি উপজেলায় জাদি রয়েছে।

প্রতিটি জাদি বিহারকে কেন্দ্র করে পূর্ণিমা তিথি বা স্মরণী দিনে ধর্মীয় উৎসব ও মেলা হয়। কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া ও উখিয়া টেকনাফে বিশেষ করে জাদি উৎসব ও মেলা আয়োজিত হয়। প্রাচীনকালে এসব অঞ্চল ছিল আরাকান বৌদ্ধ রাজা শাসিত রাজ্য। এসব প্রাচীন জাদিগুলো সর্ব প্রথম কখন নিমার্ণ হয় এবং কখন থেকে জাদি উৎসব বাংলাদেশে প্রচলন হয় তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। তবে ইতিহাস থেকে অনুমান করা হয় তৎকালীন সপ্তদশ শতাব্দী হতে আরাকান রাজ শ্রী সুধর্মার সময় কালে জাদি নির্মাণ ও উৎসব প্রচলিত হয়েছিল। কক্সবাজার কাছারী পাহাড় তথা কোর্ট বিল্ডিং এলাকা এবং রামু রাজার কূল পাহাড়ে প্রাচীন জাদি ছিল। সম্ভবত ১৮০০ সালে ব্যাপকভাবে বড়ুয়াবৌদ্ধ ও রাখাইনরা এদেশে এসব জাদি নির্মাণ ও উৎসবের আয়োজন করে থাকে।

কক্সবাজার জেলার অনুরূপ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলা এবং পটুয়াখালী ও বরগুণায় জাদি রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশের অধিক জাদি রয়েছে। জাতি ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে পাহাড় চূড়ায় জাদি ও বিহারের উৎসব উদযাপিত হয়। প্রতিবেশী বৌদ্ধরাষ্ট্র মায়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনের ঐতিহাসিক গোল্ডেন প্যাগোড়া (The great shwe Dagon Pagoda) বিশ্ব জাদি। চৈত্য শব্দ থেকে জাদি শব্দের উদ্ভব হয় বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। এ ধরনের চৈত্য নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম সম্রাট অশোক। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সম্রাট অশোক ৮৪ হাজার চৈত্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন।

বৌদ্ধমেলা বৌদ্ধদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির অংশ। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অতীত ঐতিহ্যের শেকড় সন্ধানে বৌদ্ধমেলার পুনর্জাগরণ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিকাশে বৌদ্ধমেলাগুলির গুরুত্ব ও অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। হাজার বছরের বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বৌদ্ধমেলা ও ঐতিহ্যের গৌরবময় ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাসকে বৈচিত্র্যতায় সমৃদ্ধ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. অরিত্র, ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা পৃষ্ঠা-৮৫, প্রবন্ধ; ফরিদুল আলম, মহাস্থানগড়

২. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯০

৩. বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৯৪

৪. মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১

৫. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৮

৬. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯০-৯১

৭. অরিত্র, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৮৬

৮. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১২

৯. Mahasthan, Nazimuddin Ahmed, 1981, 3rd Ed, Dacca, P. 50

১০. অরিত্র, ডিসেম্বর, ২০০৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮৮

১১. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, পৃষ্ঠা-৬২

১২. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু বিহার, ড.সুনীথানন্দ ভিক্ষু, পৃষ্ঠা-১৫৬

১৩. পূর্বোক্ত, অরিত্র, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭

১৪. Archaeological Survey of India, Annual Report,Vol-xv, 1950, p-105, পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, পৃষ্ঠা-১৫৩

১৫. Mahasthan, Nazimuddin Ahmed, Third Edition, Dhaka, 1981, P.1

১৬. প্রাগুক্ত, ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়, পৃষ্ঠা-১২

১৭. প্রাগুক্ত, ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়, পৃষ্ঠা-৬৪ প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠি, কাবেদুল ইসলাম, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৬৯)

১৮. বাংলা অঞ্চলে ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩১

১৯. Early Historical Prespective of North Bengal, P.38-39

২০. পূর্বোক্ত, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩৩

২১. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, পৃষ্ঠা-৪

২২. Mahasthan, Nazimuddin Ahmed, 3rd Ed, Dacca, 1981, P. 7

২৩. পূর্বোক্ত, বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা-৯৪

২৪. বাংলা পিডিয়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯১

২৫. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি, পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২৬. বাংলা পিডিয়া, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪

২৭. A. K M. Shamsul Alam, Mainamati ,1982, p.7

28. ইটাখোলা বিহার, হাবিবুর রহমান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১

২৯. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-৬৩

৩০. পূর্বোক্ত, বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা-১৪৩) এর মধ্যে ২৩টি প্রত্নকেন্দ্রের মধ্যে শতাব্দীর প্রাচীন পুরাকীর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। (পূর্বোক্ত, চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪২

৩১. Mainamati, Dr. A.K.M. Shamsul Alam, Department of Archaeology and Museums, Dhaka, 1982, 2nd ed., P.8

32. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-৬৬

৩৩. পূর্বোক্ত, বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীতি, পৃষ্ঠা-১৪৪

৩৪. পূর্বোক্ত, ম.ম.পা, ড. নাইমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-৭৭

৩৫. প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, মোঃ মোশারফ হোসেন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২০১

৩৬. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-৬৮

৩৭. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৬

৩৮. Paharpur, Md. Moharraf Hossain & Md Shafiqul Alam, Department of Archaeology, Dhaka, 2004, P-1

39. পূর্বোক্ত, প্রত্নতত্ত্ব, পৃষ্ঠা-১৭৩

৪০. প্রাগুক্ত, অনোমা, ২০০১, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৫৭

৪১. বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীতি, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, শিখা প্রকাশীন, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১০১

৪২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলা পিডিয়া, ৫ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৮৮

৪৩. Paharpur, M.A.A Qadir, Archaeology Department of Bangladesh, Dacca, 1980, P.1

৪৪. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, পৃষ্ঠা-১৬০

৪৫. বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৩২

৪৬. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-১১২

৪৭. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, ড. নাজিমুদ্দিন, পৃষ্ঠা-১০৩

৪৮. বাঙালির ইতিহাস, নীহার রঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, দ্বিতীয় সং, ১৪০২, পৃষ্ঠা-৬৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. পূর্বোক্ত, বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকীর্তি, পৃষ্ঠা-১৩৫

৫০. OP.cit, Paharpur, P. 30

৫১. বাংলাপিডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৯

৫২. পূর্বোক্ত, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর,ড. নাজিমুদ্দিন আহমেদ, পৃষ্ঠা-১০৩

৫৩. পাহাড়পুর, নাজিমুদ্দিন আহমদ, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪

৫৪. চট্টল শিখা- ২০০৩, ঢাকা, প্রবন্ধ ড. সুকোমল বড়ুয়া, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম ঃ সভ্যতা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

৫৫. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৫৮

৫৬. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৬১ / অনোমা, ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৪,

৫৭. উপালি, বাঁশখালি, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৭৯

৫৮. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ড. সুকোমল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৭

৫৯. আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচিত্রাঃ ইতিহাস ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫,পৃষ্ঠা-৮২

৬০. প্রবন্ধ বিচিত্রাঃ ইতিহাস ও সাহিত্য, আবদুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৬

৬১. রম্যভূমি রামুর ইতিহাস, বোধিমিত্র বড়ুয়া, চারুলতা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯৮

৬২. বৃহত্তর চট্টল, এম, নূরুল হক, চট্টগ্রাম, ১ম সং, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

৬৩. প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, আবদুল হক চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১১১

৬৪. অনোমা, ১৯৯৬, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬,

৬৫. প্রাগুক্ত, সদ্ধর্ম রত্নাকর, ধর্মতিলক স্থাবির, রেঙ্গুন, ১৯৩৬

৬৬. বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, ড. সুনীথানন্দ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৮৭

৬৭. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ড. সুকোমল চৌধুরী, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮০, বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৮১

৬৮. বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, ড. সুনীথানন্দ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১০০

৬৯. আহমদ শরীফ রচনাবলী, আগামী প্রকাশনী, ২০০০, ঢাকা, চট্টগ্রামের ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃষ্ঠা-৬২৩

৭০. অনোমা, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১১৪

৭১. দক্ষিণপূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন, ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্প), আইসি বি এস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৫২

৭২. প্রাচীন হরিকেল রাজ্যের অবস্থান, ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, ঢাকা, ১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

৭৩. পাহাড় বছরের বাঙালী বৌদ্ধ, দীপক বড়ুয়া সৃজন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৪০

৭৪. প্রাগুক্ত, চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫০, বড়ুয়া জাতি, উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, চট্টগ্রাম, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা-১৩

৭৫. বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষুজীবন, ড. সুনীথানন্দ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৮৬

৭৬. মারমা জাতিসত্তা, মুস্তফা মজিদ (সম্পা), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫৯

৭৭. মেলা পার্বণ/অম্বিকা চরণ চৌধুরী, চট্টলা / অনোমা, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০৪

৭৮. বরেন্দ্র অঞ্চলের লোক মেলা ও উৎসব, আশরাফ সিদ্দিকী, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১১৬৭

৭৯. চট্টগ্রামের ইতিহাস, চৌধুরী পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা তত্ত্বনিধি, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১৫০

৮০. ফতেনগর মহাবোধি- সুমন বড়ুয়া, সম্যক, ৮ম বর্ষ, ৯ অক্টো ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৩

৮১. প্রাগুক্ত, চারুলতা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০২, পৃষ্ঠা-২১

৮২. বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও প্রত্নসম্পদ, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, অরিত্র, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫

৮৩. প্রাগুক্ত, অনোমা, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০৫

৮৪ বৃহত্তর চট্টল, এম, নুরুল হক, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা -১২১

৮৫. বাংলাদেশের বিহার ও প্রত্নসম্পদ, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, অরিত্র, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭০

৮৬. পূর্বোক্ত, চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস, ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রাম ১৯০৫, পৃষ্ঠা-২০

৮৭. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ড.সুকোমল চৌধুরী, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮০, বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা-৮১

৮৮. মনীষা মঞ্জুষা, ৩য় খণ্ড, ড. এনামুল হক, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৪)

৮৯. মারমা জাতিসত্তা, মুস্তাফা মজিদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৭১, প্রবন্ধঃ মং ক্য শোয়ে নু নেভি, বোমাং রাজপুণ্যাহর ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

৯০. অনোমা, ১৯৯৯, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০৭, প্রবন্ধ, বাংলাদেশের বাঙালী ও উপজাতীয় বৌদ্ধ উৎসব, শিমুল বড়ুয়া

৯১. আদিবাসী রাখাইন, মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), দেশ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৩০

৯২. চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, বিরাজ মোহন দেওয়ান, রাঙামাটি, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-২০৮-২০৯

৯৩. বনভান্তের সাধনাতীর্থ রাঙামাটি বনবিহার, ভাস্বর ডি, কে দাস, সম্যক, ২০০৫, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১৪-১৫

৯৪. ত্রৈমাসিক ত্রিরত্ন, ২৭ অক্টোম্বর ২০০৪, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৯

৯৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পাদিত), দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মদর্শন ও সাহিত্যচর্চার ধারা

৬.১ বাংলাদেশে পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম দর্শনচর্চা

৬.২ বাংলাদেশে বৌদ্ধ পত্রিকা-সাময়িক পত্র

৬.৩ বৌদ্ধ সংঘ মণীষার মায়ানমান সরকার প্রদত্ত উপাধিলাভ

৬.৪ বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত একুশে পদক প্রাপ্তদের জীবন ও কর্মাবদান

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মদর্শন ও সাহিত্যচর্চার ধারা

সুদীর্ঘ কাল থেকে বাংলায় ও বাংলাদেশের বৌদ্ধদের জ্ঞান, মনন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক বৌদ্ধধর্ম ও ভাষা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস গৌরবের। বাংলা ভাষার জন্ম এবং বাংলায় সাহিত্য চর্চার ধারা বৌদ্ধদের সৃষ্ট। বৌদ্ধরাই বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চায় সূত্রপাত হয় বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মাধ্যমে। মূলত অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বাংলা ভাষার উদ্ভব কাল। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এ চারশ বছর ছিল বাংলায় পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চার এক অন্ধকার যুগ।[১] এ সময়কার সঠিক বৌদ্ধ ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ইতিহাসে দেখা যায় বৌদ্ধ পাল রাজত্বের অবসানের পর বৌদ্ধদের উপর নেমে আসে চরম অমানবিক নির্যাতন ও নিপীড়ন। বৌদ্ধধর্মীয় শাস্ত্র, বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয় এবং বিনষ্ট করা হয় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে। এতদসত্ত্বেও আমাদের পূর্বসূরীরা কোন প্রকারে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখে ছিলেন এ বাংলা অঞ্চলে। আমরা তাঁদের নিকট চিরঋণী। সেন আমলে সংস্কৃত এবং মুসলিম যুগে আরবী, ফারসী, উর্দু চর্চার ফলে বৌদ্ধদের বাংলা ভাষাচর্চা ও সাহিত্য রচনা বন্ধ হয়ে যায়।

সুদীর্ঘ কয়েক শতক অবধি বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চা স্তিমিত থাকার পর বিশেষ করে ইংরেজদের আগমনের ফলে বৌদ্ধদের মধ্যে পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-চর্চার স্বর্ণযুগ হল উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে। বৌদ্ধরা আবার নতুনভাবে পালিভাষা সাহিত্য ও ধর্মীয়চর্চা আরম্ভ করে। চট্টগ্রাম মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামজাত প্রফেসর ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল Indian Philosophy: its origin and growth from vedas to the Buddha. এশিয়ার মধ্যে তিনিই ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি-লিট। এতে আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত।[২]

বাংলার ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ ছিল রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। বাঙালি সমাজে আধুনিকীকরণ পরিবর্তন উন্নয়ন সমন্বয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সাহিত্যচর্চার অগ্রযাত্রা। এই পরিবর্তনের নেতৃত্বে ছিলেন সুশিক্ষিত, মানবতাবাদী, সমাজকর্মীদের বৃহৎ শ্রেণী। প্রধানত তাঁদেরই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের নবজাগরণের সূচনা হয়। বৌদ্ধধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠা, সমাজ সংস্কার এবং ভাষা সাহিত্য ও দর্শন চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট সময়। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের বহু প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিক বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই শতাব্দীতে যে সকল বাঙালি বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিষয়ে সাহিত্য রচনা করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

ক) বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে বহু ছিলেন, যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ মহানায়ক অগ্রসার মহাথের (পূর্বগুজরা হোয়ারপাড়া সুদর্শন বিহার), ফুলচন্দ্র বড়ুয়া (নোয়াপাড়া বৈদ্যপাড়া), ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া (আবুরখীল), পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (আবুরখীল), পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া (বৈদ্যপাড়া), কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (আবুরখীল) কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির(১৮৬৫-১৯২৬), সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির(১৮৩৮-১৯২৭), সংঘনায়ক ধর্মদর্শী মহাথের, সমন পুন্নানন্দ স্বামী, প্রফেসর ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, রাজগুরু ভগবান মহাস্থবির (১৮৬৪-১৯৫৫), অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির (১৮৭২-১৯৩৯), ডা. ভগীরথ বড়ুয়া (১৮৫৬-১৯০৪), আচার্য পূর্ণাচার ধর্মধারী চন্দ্র মোহন (১৯৭৭-১৯০৮), বিমলানন্দ মহাস্থবির, বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি, ধর্মরত্ন মহাস্থবির, পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, অগ্‌গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, ধর্মাতিলক মহাস্থবির, ধর্মানন্দ মহাস্থবির, জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু, বংশদীপ মহাস্থবির, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, সংঘরাজ ধর্মাধার মহাস্থবির, সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির, জিনবংশ মহাস্থবির, ধর্মকীর্তি মহাথের (সিংহলী হলেও বাঙালি সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী), মহানায়ক আনন্দমিত্র মহাথের, আর্যবংশ মহাথের, কর্মবীর জিন রতন মহাথের, সংঘনায়ক জ্ঞানলোক মহাথের, সংঘনায়ক প্রিয়ানন্দ মহাথের, অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, শান্তপদ মহাস্থবির, বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, সুগতবংশ মহাস্থবির, ড. ধর্মবংশ মহাথের, ড. বুদ্ধদত্ত মহাস্থবির, অমৃতানন্দ মহাথের, প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, জ্যোতিঃপাল মহাথের, বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, সুগতানন্দা মহাথের, অধ্যক্ষ প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, প্রফেসর ললিত কুমার বড়ুয়া, প্রফেসর সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া, প্রফেসর রণধীর বড়ুয়া, প্রফেসর ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, ড. অরবিন্দ বড়ুয়া (১৯০২-১৯৭৫), গিরীশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, নীলাম্বর বড়ুয়া, ড. জিনানন্দ বড়ুয়া, ভিক্ষু অনোমদর্শী, শাক্যবোধি মহাস্থবির, ভিক্ষু শীলভদ্র, ড. শরণংকর ভিক্ষু, অধ্যাপক মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া, লোকেন্দ্র লাল বড়ুয়া, উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি (উকিল), পূর্ণানন্দ মহাস্থবির, নীরোদ রঞ্জন মুৎসুদ্দি ও ভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দি, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, শ্রী ধর চন্দ্র বড়ুয়া, সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া, অধ্যক্ষ জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, নূতনচন্দ্র বড়ুয়া, কবিয়াল ফণী বড়ুয়া, জগতজ্যোতি বড়ুয়া প্রমুখ আরো অনেকেই রয়েছেন। তাঁরা পালিভাষা, সাহিত্য চর্চা, গবেষণা, ত্রিপিটকের গ্রন্থ রচনা, অনুবাদে, সদ্ধর্ম প্রচার প্রসারে এবং মানব কল্যাণে অশেষ অবদান রেখে গেছেন।[৩] বর্তমানে যাঁরা পালিভাষা সাহিত্য-চর্চা, গবেষণা, ত্রিপিটক গ্রন্থাদি রচনা ও অনুবাদে দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে প্রসারে এবং মানবকল্যাণে অবদান রেখে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন: পরম শ্রদ্ধাভাজন সংঘরাজ ধর্মসেন মহাথের, সংঘনায়ক সৌগত ধর্মপাল মহাথের, মহানায়ক ধর্মপাল মহাথের (ভারত), ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের, অনুনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের, ড. শাসন রক্ষিত মহাথের, সত্যপ্রিয় মহাথের, অধ্যাপক ধর্মরক্ষিত মহাথের, অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, সাধনানন্দ মহাথের (বনভান্তে), উ. পঞ্‌ঞাজোত থের, আচার্য ভিক্ষু করুণা শাস্ত্রী, ড. করুণানন্দ থের, ড.

Dhaka University Institutional Repository

সংঘপ্রিয় থের, ড. জিনবোধি থের, প্রজ্ঞাবংশ থের, ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু, ড. সত্যপাল ভিক্ষু, ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু প্রমুখ।

আর গৃহীদের মধ্যে হলেন- শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. দীপক কুমার বড়ুয়া, ড. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, ড. সুকোমল চৌধুরী, হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া, প্রফেসর ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, প্রফেসর ড. বেনুপ্রসাদ বড়ুয়া, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, সাহিত্যিক বিমলেন্দু বড়ুয়া, প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, প্রফেসর ড. বিকিরিণ প্রসাদ বড়ুয়া, অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া, ড. রণজিত কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া, অধ্যাপক তপনজ্যোতি বড়ুয়া, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, সাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া, সাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া, ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র বড়ুয়া, ডা. প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, ড. জয়কেতু বড়ুয়া, ড. অমল বড়ুয়া, ড. শুভ্রা বড়ুয়া, বিজয়কৃষ্ণ বড়ুয়া, শিক্ষাবিদ সলিল বিহারী বড়ুয়া, ড. সুনন্দা বড়ুয়া, অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দী, ড. পিন্টু মুৎসুদ্দি, এডভোকেট প্রেমাঙ্কুর বড়ুয়া, অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া, ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, জ্ঞানবিকাশ বড়ুয়া, ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া, সুগত বড়ুয়া, সুদর্শন বড়ুয়া, এডভোকেট দীপক কুমার বড়ুয়া, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, অর্থদর্শী বড়ু য়া প্রমুখ আরো অনেকেই রয়েছেন।

৬.১ বাংলাদেশের পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম দর্শনচর্চা

বাংলাদেশে পাল, চন্দ্র, খড়গ, দেব এবং অন্যান্য সমসাময়িক রাজবংশের শাসকগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম বিশ্ব জুড়ে প্রচার প্রসার লাভ করে। শিক্ষানুরাগী বৌদ্ধ পাল রাজা ধর্মপালের পৃষ্টপোষকতায় সোমপুর, জগদ্দল (রাজশাহী) এবং পণ্ডিতবিহার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিদ্যায়তনে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত এখানে অধ্যয়ন করেন। নালন্দ ও ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়েও দশ হাজার ভিক্ষু-শ্রমণ, দেড় হাজার আচর্য একত্রে আবাসিকরূপে অবস্থান করতেন। মহীপাল ও জয়পালের সময় বিক্রমশীলা ও সোমপুরী বিহার প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ছাড়া হলুদ বিহার, রাজা ভবদেব প্রতিষ্ঠিত ময়নামতির শালবন বিহার, বগুড়ার ভার্সবিহার, ত্রৈকুট বিহার, পণ্ডিত বিহার ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উচ্চ পীঠস্থান। পাল রাজত্বের শেষ যুগে নালন্দার পর চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়।[৪] এ বিহারে অধ্যয়নের জন্য চীন, তিব্বত, সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অনেক ছাত্র আসত। মহাপালের সময়ে পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্যপ্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপা বা তিলপাদ)।[৫] পাল রাজত্বের সময় 'অষ্টসহস্রিকা' মহাযানী ধর্মগ্রন্থ অত্যন্ত পবিত্র রত্নাকর হিসেবে বিবেচিত হত। পাল ও সমসাময়িক রাজন্যবর্গ মহাযান ধর্মের অনুসারী ছিলেন বটে, কিন্তু তারা মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রি. ১০ম-১২শ শতকে রচিত বৌদ্ধ চর্যাপদ ও দোহকোষ গভীর ধ্যান-ধারনার ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুভূতি প্রোজ্জ্বল ছিল। বর্তমান বিশ্বে বাংলা এক সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলা ভাষার এ বন্ধুর পথযাত্রায় যাদের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণীয় তাঁরা হলেন 'চৌরাশি সিদ্ধা' নামে খ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য। তাঁরা দোহা গীতিকা ও সাধনভূমির গ্রন্থাদি প্রণয়ন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহান ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সময়ে শান্তিদেব, শান্তিপাদ, কমলশীল, সরোরুহ বজ্র (পদ্মবজ্র), শান্তরক্ষিত, কুক্কুরিপাদ, শবরীপাদ, নাগবোধি, জেতরি, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানশ্রী-মিত্র, অভয়াকর গুপ্ত, বোধিভদ্র, প্রজ্ঞাবর্মা প্রভৃতি বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ তথা বাংলা সাহিত্রভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কালচক্রের নিষ্ঠুর আবর্তে এই মহামনীষীদের অধিকাংশ গ্রন্থ হারিয়ে গেলেও তাঁদের জীবনচর্চা, আদর্শ ও কর্ম-কৃতিত্ব আজও আমাদের এবং অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের পথের দিশারী হয়ে থাকবে। অতীত বর্তমান সময়কালে বৌদ্ধরাই পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন। প্রাচীন কালে নানা বিদ্যায় পারদর্শী বৌদ্ধ শিক্ষা দীক্ষায় চরম উৎকর্ষতা লাভ করে ছিলেন। সে সময়ে 'পঞ্চবিদ্যা' পাঠের ব্যবস্থা ছিল। পঞ্চবিদ্যা পাঠ হলো-

১. শব্দবিদ্যা- ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্ব, ২. শিল্পস্থান বিদ্যা-শিল্প বিদ্যা ও কারুশিল্প, ৩. চিকিৎসা বিদ্যা-রোগ নিরাময়শাস্ত্র, ৪. হেতু বিদ্যা-যুক্তিবিদ্যা, ৫. আধ্যাত্মবিদ্যা-দর্শনশাস্ত্র ও অধিবিদ্যা। বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সামঞ্জস্য পূর্ণ গ্রন্থ রচনায়ও বৌদ্ধরা সমধিক খ্যাতি লাভ করে।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে পালিভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ ছিল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাল আমলে। এর পর খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত-এ চরশ বছর ছিল বাংলায় পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চার এক ঘোর অন্ধকার যুগ। বস্তুত এ সময় এ উপ-মহাদেশে বৌদ্ধধর্মের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। মূলত পাল রাজত্বের অবসানে বাংলায় সেন বর্মন বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তৎপূর্বে গৌড়বাজ শশাঙ্কর বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। পরবর্তীতে তুর্কী আক্রমণ বৌদ্ধদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে চরম আঘাত করে। তাদের আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশ্ববিখ্যাত বিরাট পাঠাগার আগুনের লেলিহান শিখায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।[৬] দীর্ঘ কয়েক শতক বুদ্ধচর্চা স্তিমিত থাকার পর বৌদ্ধদের জীবনের পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে বুদ্ধবাণী চর্চার স্বর্ণযুগ হল উনবিংশ শতক। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের পথপ্রদর্শক এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৬১৯ শতকে ১৪তম লুইসের রাজদূত সিমন ডে লওবেরে (Simon De laubere) ফরাসী ভাষায় বুদ্ধের জীবন ও কিছু জাতক কাহিনী পালি থেকে অনুবাদ করেন। তখন থেকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বুদ্ধ ও বুদ্ধবাণীর কিছুটা ধারণা লাভ করেন। পরে আলেকজান্ডার সোমা ডি, কোরাস (Alexander csona de Koros-1782-1842) 'শাক্যপুত্র গৌতম' নামে তিব্বতী

Dhaka University Institutional Repository

লেখা কঞ্জুর ও তঞ্জুর থেকে ১৮৩৬-১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি জীবনী প্রকাশ করেন। মাইকেল জিন প্রানকোস ওরে (Mickel Jean Francois Ozray) তার গবেষণাকর্ম জার বুদ্ধউ (Zur Buddhow) প্যারিস থেকে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বস্তুত এ মূল্যবান সংগ্রহই প্রাচ্য তথা পাশ্চত্যে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়নের সুযোগ করে দেয়। ফলে পশ্চিমা পণ্ডিত ওইন্টারনিচ, ই.বারনফ, ফৌজবল, এইচ. কার্ন, ওলডেনবার্গ, পৌজিন, ডক্টর ও মিসেস রীচ ডেভিডস, ডব্লিউ. স্টিভ, মিস আই, বি. হরনার, কে. আর. নরমেন, ই. লেমোট, এডইন আরনল্ড প্রমুখ গবেষকগণ পালি ও বৌদ্ধধর্ম চর্চায় এগিয়ে আসেন। ফলে বাঙালি বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লেখার প্রেরণা লাভ করেন। উল্লেখ্য পালি বিশেষজ্ঞ টি. ডব্লিউ. রীচ ডেভিডস ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডনে পালি টেক্স সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে রোমান অক্ষরে পালি ত্রিপিটক ও ইংরেজী অনুবাদ, টীকাগ্রন্থ, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যেগুলো বর্তমানে বৌদ্ধ দেশসমূহে পালি ভাষা শিক্ষার একমাত্র আন্তর্জাতিক মাধ্যম। তাতোনুপ্রাণিত হয়ে শরৎচন্দ্র দাসের পৃষ্টপোষকতায় ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় বুডিডস্ট টেক্স সোসাইট আত্মপ্রকাশ করে। একই উদ্দেশ্য মিশনারী প্রতিষ্ঠান মহাবোধি সোসাইটি ১৮৯১ সালে বিশ্বব্যাপী কর্মতৎপরতা শুরু করে। অনাগারিক ধর্মপাল এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থাদি অনুবাদ করে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চট্টগ্রামের উনাইনপুরা গ্রামজাত কৃপাশরণ মহাস্থবির ১৮৯২ সালে কোলকাতায় বেঙ্গল বুডিডষ্ট এসাসিয়েশন স্থাপন করে বাঙালি বৌদ্ধদের পুরোধা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতমানের সাময়িকী জগজ্যোতি তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধদের অনেক উন্নয়ন সমৃদ্ধি, প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিক ও সমাজ সেম্বকের আর্বিভাব ঘটে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ঐতিহ্যাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সকংলন করেছেন। চট্টগ্রামের অঞ্চলে যাঁরা পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চায় প্রথমে এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে নোয়াপাড়া ফুলচন্দ্র বড়ুয়া , আবুরখীল রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২) ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), বৈদ্যপাড়া নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-১৮৯৬), অগ্রসার মহাথের (১৮৬৩-১৯৪২), আবুরখীল কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার (১৮৭০-১৯০৮ খ্রি.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অজ্ঞাত লেখকের 'মঘা খমুজা'ই আধুনিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ। বৌদ্ধ রঞ্জিকা, পাদিমুখ (প্রাতিমোক্ষ), বেশ্বন্তর জাতক এ তিনটি রচনা ফুলচন্দ্রের। ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়ার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চারটি হল শ্রমণকর্তব্য (১৯৩১), অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (১৯৪১), নির্বাণদর্শন কর্মস্থান (১৯৪২) এবং মহাসতি পট্ঠান সুত্ত (অপ্রকাশিত)। ধর্মরাজ বড়ুয়া ছিলেন বহুগুণে শক্তিশালী ও দক্ষ লেখক।[৭] তিনি পালি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকল্পে ছ'বছর সিংহলে (শ্রীলংকায়) এবং তিন বছর শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ড) অতিবাহিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে সূত্রনিপাত (১৮৮৭), সিঙ্গালোবাদ (১৮৮৯), হস্তসার (১৮৯৩)গুশ্যামাবতী, জ্ঞানসোপান, সত্যসার। নবরাজ বড়ুয়ার গ্রন্থ সমূহ বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হর

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধালংকার, নীতিরত্ন, প্রসেনজিতোপাখ্যান, প্রাথমিক বৌদ্ধ শিক্ষা, অভিধানপ্পদীপিকা, বুদ্ধ পরিচয়, উবুকশীল, শিক্ষাসার, প্রকৃত সুখী কে এবং পালি ব্যাকরণ। ধর্মরাজ নবরাজের পূর্ববর্তী কিন্তু দুজনেই একজন চৌত্রিশ বছর বয়সে, অন্যজন ঊনত্রিশে মৃত্যুবরণ করেন্ তাঁদের জীবন দীর্ঘ না হলেও অমূল্য। দুজনেরই আদর্শ চরিত্র, সদ্ধর্মে গভীর আস্থা এবং গ্রন্থ রচনায় ও কাজে উভয়েই লোকশিক্ষক। (Hemendu Bikash Chowdhury ed; Hundred Years of the Buddha Dharmankur Sabha (1892-1992), Calcutta, 1993, P. 100) সর্বানন্দ বড়ুয়া বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের অদ্বিতীয় কবি। ইংরেজ কবি স্যার এডুইন আর্নল্ড বুদ্ধকে নিয়ে দি লাইট অফ এশিয়া এবং যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে দি লাইন অফ দি ওয়ার্ল্ড নাম দিয়ে দুখানি চরিতকাব্য লিখেছিলেন। সেই দুটির প্রথমটি বাংলা পদ্যানুবাদরূপেই রচিত হয়েছিল নবীনচন্দ্র সেনের অমিতাভ বা চৈতন্য চরিত। ভগবান বুদ্ধ শুধু এশিয়ার আলো এবং যীশুখ্রীষ্টই জগতের আলো আর্ণল্ডের এই তুলনাগত প্রভেদে মনোব্যথা পেয়ে সর্বানন্দ 'জগজ্জ্যোতি' নাম দিয়েই দি লাইট অফ এশিয়া চরিতকাব্যের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। কবি নবীন চন্দ্র সেন সেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন "সর্বানন্দ, তুমি তোমার জগজ্জ্যোতি লিখিবে জানিলে আমি আমার অমিতাভ লিখিতাম না।[৮] অগ্রসর মহাথের-র প্রধান গ্রন্থ হল 'বুদ্ধভজনা'। অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে গাথাসংগ্রহ, পালি শব্দ সংগ্রহ (পালি বাংলা অভিধান) পূজাবলী, ধম্মপদট্ঠকথা। বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ছিলেন মূলত কবি ও দার্শনিক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে অভিধম্মার্থ সংগ্রহ, উপোসথ সহচর, প্রতীত্যসমুৎপাদ, ধম্মপদ এবং রূপারূপ বিভাগ। াভিধর্ম পিটকের সারাংশ নিয়ে রচিত এবং অচার্য অনুরুদ্ধকৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ অভিধম্মার্থ সংগ্রহ একটি চমৎকার দার্শনিক উপহার। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে অনূদিত ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র বড়ুয়ার অভিধম্মার্থ সংগ্রহ হতে অনেক সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। প্রসঙ্গক্রমে বাংলায় বুদ্ধ কীর্তন এবং বৌদ্ধগান রচয়িতা, পথ-প্রদর্শনও গায়কের কথা স্মরণ করতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মের জটিলও দুরূহ তত্ত্বকথা, বুদ্ধজীবন নাটক ও কীর্তনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বোঝানো সহজ উপায়। সম্ভবত এজন্য বৌদ্ধ সংস্কৃত কবি অশ্বঘোষ ভিক্ষু হয়েও গ্রামে গঞ্জে ধর্মীয় গান ও নাটক মঞ্চস্থ করে ঘুরে বেড়াতেন। বৌদ্ধগান ও অধ্যাত্ম গীতিগাথার ধারা বহু প্রাচীন। ভারতীয় আর্যসংস্কৃতির ইতিহাসে ঋক ও সামের পরই পালি থের-থেরী গাথার স্থান। এই গীতি-গাথাসমূহে তালপুট ও অম্রপালীর গাথাগুলি সরতাল ও লয়যুক্ত অধ্যাত্মভাবের গান। পরবর্তী চর্যাপদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যোগ ও তন্ত্রসাধনার কথা, বৌদ্ধধর্মকথা নিয়ে রচিত চর্যাপদের শ্লোকগুলো সহজিয়া বৌদ্ধগণ গানের সুরে সরস জীবনের উপাদান অসামান্য বাণীরূপে প্রচার করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালি বৌদ্ধগণের ঘরে পঠিত হত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। সেই ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে উত্তরণের জন্য এবং বৌদ্ধ ভাবধারা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার বৌদ্ধ সমাজে বুদ্ধসংকীর্তন, বৌদ্ধগান ও নাটক রচনা আরম্ভ হয়েছিল। এক্ষত্রে সর্বানন্দ বড়ুয়া ছিলেন পথ প্রদর্শক এবং তাঁর শ্রী শ্রী বুদ্ধচরিতামৃত কে বুদ্ধকীর্তন ও বৌদ্ধগানের

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা নমুনা বলা চলে। ত্রেফ মগধ (ঠেগরপুনি) বেশ্বন্তর জাতকের কাহিনী অবলম্বনে সেকালের যাত্রার ধরনে উইচান্দ্রা নাটক লিখেছিলেন। আধুনিক কালে তারই অনুকরণে কিরণবিকাশ মুৎসুদ্দি (মহামুনি পাহাড়তলী) পঞ্চাঙ্ক নাটক বেশ্বন্তর রচনা করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বম্ভর বড়ুয়া (আবুরখীল) অনেক গুলো 'বুদ্ধসংকীর্তন' লিখেন যেগুলো মুদ্রিত হয়নি।

অনুরূপভাবে মতিলাল তালুকদার গান ও কীর্তনযুক্ত নাটিকা শীলরক্ষিত লিখেছিলেন। পাহাড়তলী নিবাসী মাস্টার মোহনচন্দ্র বড়ুয়া বুদ্ধের জন্ম, নিবাহ, সন্যাস ও মারবিজয় এ চার স্তরে বিন্যস্ত করে স্বরচিত বুদ্ধ সংকীর্তন ছাপিয়ে ছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গী ও সুরসমস্তই বৈষ্ণব ধরনের, বলতে গেলে অবিকল নিমাই সন্নাসের মত। উনিশ পঞ্চাশ শতকেও চট্টগ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে রচনাটি যাত্রার অনুরূপ মঞ্চস্থ করা হত। বৌদ্ধ সঙ্গিতাচার্য (পাঁচখাইন) উপেন্দ্রলাল চৌধুরীও বিভিন্ন সুরে ও রাগারাগিনীতে বৌদ্ধগান লিখেছিলেন অনেকটা বাঙলা থিয়েটারের অনুকরণে তাঁদের রচিত কীর্তনগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। তবুও স্বস্তি এই যে, শাক্যমিত্র বড়ুয়া (চট্টগ্রাম) পমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী এই সংসকীর্তনের ধারাকে ধরে রেখেছেন। বৌদ্ধ ভক্তিমূলক গান ও সংকীর্তনের তাঁর বেশ কিছু ক্যাসেট রয়েছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাতকড়ি বড়ুয়া, মুক্তিবিকাশ বড়ুয়া ও সুবোধচন্দ্র বড়ুয়ার নামও উল্লেখযোগ্য।[৯] মুক্তিবিকাশ বড়ুয়া বৌদ্ধ ভক্তিগীতিকে বাউল সংগীতের আঙ্গিকে রচনা করে বৌদ্ধ বাউল গান নামে একটি সঙ্গীত সংকলন প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজেও বুদ্ধকীর্তন পরিবেশন করেন। খড়গপুর থেকে সুবোধচন্দ্র বড়ুয়া বুদ্ধ প্রশস্তি নামে বৌদ্ধসঙ্গীতের অন্য একটি সংকলন এবং শিলিগুড়ি থেকে জ্ঞানজ্যোতি স্থবির সিদ্ধার্থচরিত্র নামে পালাকীর্তন প্রকাশ করেছেন। অগ্নমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় পালি ত্রিপিটকের অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট এই গ্রন্থের মূল্য পরিসীম। প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের (১৮৭৮-১৯৭০) মতো একাধারে এতো বড় পণ্ডিত, শীলবান, সুবক্তা, লেখক,সমালোচক, গ্রন্থপ্রণেতা, সমাজ সংগঠক, অক্লান্ত কর্মী, সর্বত্যাগী ও সাধক যেকোন সমাজে বিরল। তিনি বাংলার বৌদ্ধধর্ম ও সমাজকে একশত বৎসর এগিয়ে দিয়েছেন। মায়ানমার (ব্রহ্মদেশ) ১৯৫৬ ইংরেজীতে অনুষ্ঠি ষষ্ঠ সঙ্গতিতে তথাকার সরকার তাঁর প্রজ্ঞার জন্য তাঁকে অগ্নমহাপণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত করেন। বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে সংঘশক্তি নামক বৌদ্ধ পত্রিকাও প্রকাশিত হত। তাঁর রচনা ও সম্পাদনায় বৌদ্ধ মিশন প্রেস থেকে নিম্নের গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হয়ঃ মিলিন্দ পঞহো, প্রতীত্য সমুৎপাদ, সম্মবাচা, ধম্মপদ, থেরগাথা, সুত্তনিপাত, ভিক্ষু পাতিমোকখ, ধর্মসংহিতা, ভিক্ষু কর্তব্য, বৌদ্ধ যোগসাধনা, দানমঞ্জুরী, অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, লোকনীতি, সদ্ধর্মরত্নাকর, দানমঞ্জুরী, বুদ্ধের ধর্মপরিচয়, গৃহীকর্তব্য, কঠিনচীবর দাননিসংস, রত্নমালা বিশোধনী, তেলকটাহ গাথা, পালি ত্রিপিটক, নামরূপ, বুদ্ধবাদ, সতিপট্ঠানভাবনা, আর্যসত্য পরিচয়, পালি পঠমসিকখা, সুত্তবিভঙ্গ, আচার্য পুন্নাচার জীবনী প্রভৃতি। দুঃখের বিষয়, গত ২য় বিশ্বযুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

বোমার আঘাতে মিশন প্রেসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি ছিলেন বৈদ্যপাড়া গ্রামের স্বনামখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক নবরাজ বড়ুয়ার সহোদর। সমকালের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বংশদীপ মহাস্থবির (১৮৮০-১৯৭১) বাঙলা ভাষায় পালি সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তিনি শুধু চীবরধারী শীলবান ভিক্ষু ছিলেন না, পালি ভাষায়ও দক্ষ সুপণ্ডিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত তাঁর পালি সবৃত্তিক কচ্চায়ন ব্যাকরণ, বালাবতার (১ম ও ২য় খণ্ড), নাম পদমালা সেকাল ও একালের উচ্চশিক্ষার্থীদের পালি ভাষায় জ্ঞানাহরণের পথ সুগম করে দেয়। এছাড়া ধর্মসুধা বুদ্ধভাবনা, প্রজ্ঞাভাবনা, ভিক্ষু পাতিমোক্ষ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর প্রায় সমসাময়িক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির পালিভাষাও শিক্ষার প্রসারে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর পালি প্রবেশ ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে অসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত। ওই বইখানি কোলকাতা, গৌহাটি, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থ পালি বুত্তোদয় (ছন্দ প্রকরণ) সংযোজনে গ্রন্থটির মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, পালি বাংলা অভিধান, প্রাতিমোক্ষ, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ উনাইপুরা লংকারামে সংরক্ষিত আছে। তিনি শুধু একজন পালি ভাষাবিদ ছিলেন না, কালের সর্বশে বিদর্শন সাধকও ছিলেন। বলতে গেলে, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বংশদীপ মহাস্থবির, জ্ঞানীশ্বর তিনজন মনীষী বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারে যেমন ভূমিকা রেখেছিলেন, তেমনি পালি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে পথপ্রদর্শক ছিলেন। ভিক্ষু শীলভদ্র (১৮৮৪-১৯০৫) বুদ্ধচর্চায় আর এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর মৃত্যর চার বছর আগে কম্বোডিয়ার অঙ্কোরবাত মন্দিরে উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গৃহীনাম ছিল কমলকৃষ্ণ রায়। বুদ্ধবচনের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধার ফলে তিনি ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে। পালি ভাষায় যেমন তাঁর দখল ছিল তেমনি তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও কৃতবিদ্য তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে দীর্ঘনিকায় (৩ খণ্ড), থেরীগাথা, সুত্তনিপাত, ধর্মপদ, ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র, বাঞ্চিতের সন্ধানে, বুদ্ধবাণী ও বৌদ্ধনীতি শিক্ষা।[১০] প্রবন্ধঃ সুনীতিকুমার পাঠক, বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য (১৩৫১-১৪০০ বঙ্গাব্দ) এক বিহঙ্গম পরিচারণ) উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে ক'জন মনীষী ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে ভারত তথা বাংলাদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮) ছিলেন অগ্রগন্য। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধসংস্কৃতি উদ্ধার করাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পালি সাহিত্যের তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সবক্ষেত্রে তাঁর মনীষা ছিল গবেষণামূলক। তিনি ১৮৮৮ খ্রিঃ ৩১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কালে এ বাঙালি মনীষীই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পালি ও বৌদ্ধধর্মের গবেষক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে সর্বশ্রেষ্ট আসনটি অলংকৃত করেছেন। তিনি কৃপাশরণ মহাস্থবির এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপধ্যায়ের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রচেষ্টায় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ডক্টর ও মিসেস রীস ডেবিডস এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর এম ডব্লু টমাসের অধীনে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও ভারত দর্শনের ওপর গবেষণা করে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল-Indian philosphy its origin and growth from vedas to the Buddha এই গবেষণায় তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক ধর্ম প্রচারকদের মতবাদে অনেক নতুন তত্ত্ব সংযোজন করেছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণা গ্রন্থটি A History of Pre-Buddhistic Indian philosphy' নাম দিয়ে ১৯২১ সালে প্রকাশ করে। এখানে উল্লেখ্য, এশিয়াবাসীদের মধ্যে ডক্টর বড়ুয়াই সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট ডিগ্রী লাভের গৌরব অর্জন করেন। জ্ঞান চর্চায় নিবেদিত প্রাণ ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি, শিলালিপি, ভাস্কর্য, প্রত্নতত্ত্ব এবং বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে ইংরেজীতে ১৮টি গ্রন্থ, বাংলায় ৭টি গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকায় ইংরেজীতে ৮৬টি প্রবন্ধ ও বাংলায় ২২টি প্রবন্ধ রচনা করে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মৌলিক গবেষণা ও মনীষার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।[১১] বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ও বুদ্ধভক্ত বাঙালিদের মনে বুদ্ধবিষয়ক চিন্তার আরো বিকাশ ঘটেছে। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশ বাঙালির জনজীবন ও সংস্কৃতিকে করেছে প্রভাবিত। এপার ওপার দুই বাংলর গবেষক, অধ্যাপক, পণ্ডিত ব্যক্তি ও প্রাজ্ঞ স্থবির মহাস্থবিরগণ পালি ভাষা ও সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ধর্মচর্চায় সমান আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎচন্দ্র দাস, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যক্ষ পি.আর. বড়ুয়া, ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, ড. সুকোমল চৌধুরীসহ অনেকে বৌদ্ধ সাহিত্য সাধনায় গবেষক ও পাঠকদের দুর্গম পথ সহজ করেছেন। পালি শিক্ষার প্রসারে নীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দি, ভুপেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, রোকেন্দ্র লাল বড়ুয়া, নতুন চন্দ্র বড়ুয়া, নীলাম্বর বড়ুয়া প্রমুখ শিক্ষকগণ পালি পাঠ্যপুস্তক, ব্যাকরণ, অনুবাদ গ্রন্থ লিখে শিক্ষার্থীদের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। এতে ছাত্রছাত্রীরা বিধিবদ্ধ বৌদ্ধবিদ্যার (বুডিস্ট স্টাডিজ) অনুশীলন ও পঠন পাঠনের সুযোগ পেয়েছে। যে সমস্ত স্থবির মহাস্থবিরগণ অনাগরিক ভিক্ষুজীবনের বিমুক্তি সাধনায় আত্মনিয়োগ করেও পালি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও বৌদ্ধধর্মের জটিল ধর্মতত্ত্বের উদঘাটনে সফল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, শীলালংকার মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, জ্যোতিঃপাল মহাথের, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, জিনবংশ মহাস্থবির, সুগতবংশ মহাস্থবির প্রমুখ অন্যতম।[১২] শিক্ষাবিদ ও গবেষক নন অথচ তাদের মধ্যে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, শীলালংকার মহাস্থবির, ধর্মাধার মহাস্থবির, জ্যোতিঃপাল মহাথের শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, জিনবংশ মহাস্থবির, সুগতবংশ মহাস্থবির প্রমুখ অন্যতম। শিক্ষাবিদ ও গবেষক নন অথচ তাঁরে লেখনীতে বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধ জীবনচর্চা সরলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। পালি ও বুদ্ধচর্চা বিষয়ক যে সকল লেখক ও গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

Dhaka University Institutional Repository

লেখক	গ্রন্থের নাম
পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া	হস্তসার
সুবলচন্দ্র বড়ুয়া	কর্মফল, নামরূপ
বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি (১৮৯৫-১৯৬২)	অভিধর্মার্থ সংগ্রহ
গোবিন্দচন্দ্র বড়ুয়া,	প্রেতসূত্র
সমন পুন্নানন্দ সামী (১৮৭০-১৯৩১)	রত্নমালা (সংকলিত), বিশুদ্ধিমার্গ (আংশিক অনু)
কালি কিংকর মুৎসুদ্দি	চট্টল উল্লাস, কুমুদিনী
শ্রী দ্বারিকা মোহন মুৎসুদ্দি	দাঠাবংসো
শীলানন্দ মহাস্থবির,	ভক্তিশতক
উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি,	মাতৃপূজায় মানবধর্ম, বিশ্বে বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সভ্যতার দান, বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব এবং হিন্দু ধর্ম হইতে ইহার পার্থক্য
গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া বিদ্যাবিনোদ (১৮৯১-১৯৬০)	অন্ধের দৃষ্টি (১৯৪৫), আর্যপথ (১৯৫০) ভুলের বোঝা (১৯৫৮), ধর্মপদ (১৯৫২), প্রতীত্যসমুৎপাদ (১৯৫৭), জাতকের কথা (১৯৬০), মদন মোহন, বিবিধ বিধি, খোলাকথা
শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির	মহাপরিনির্বাণ সূত্র
ধর্মতিলক স্থবির,	সারসংগ্রহ, কায়বিজ্ঞান সারিপুত্র চরিত, বুদ্ধবংশ, গৃহীনীতি, সদ্ধর্ম রত্নাকর
শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া (১৮৮৯-১৯৫৩)	বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ (১৩৪১), অভিসম্বুদ্ধ (১৩৫৭)
বিমলাচরণ লাহা,	The History of Buddha's Religion (Reprient 1986), The Buddhist Conception of Sipirits (Reprint 1997) Asvaghosa, Chronicles of Ceylon, History of Pali Literature, Vols. 1 & 11, Geogrpah of Early Buddhism
ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, (১৮৮৮-১৯৪৮)	A Prolegmena to a History of Buddhist Philosophy (1918), The Ajivakas (1920), A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy (1970), Prakrit Dhammapada (Jointly with Sailendra Nath Mitra, 1921) Barhut Inscription in the Udayagiri and Khandagiri (1926), Asoka Edicts in New Light (1926), Gaya Buddhagaya (1931), Brahmachari Kulananda (1986), Inscriptions of Asoka, Part 1 (1986), The Religion of Asoka, Asoka and Hist Inscriptions, Philosoph of Progress (1948),

Dhaka University Institutional Repository

	Studies in Buddhism (1974), Chakma Taras from CTG Hill Tracts, Manuscripts of Dharma Samuccaya and karandavyuka, Burmese Manuscripts of later pal works are also mentioned in the Hundred years of the University of Calcutta, 1957.
	লোকনীতি (১৯১২), মনিরত্নমালা (১৯১৩), গৃহীবিনয় (১৯১৩), মহাসতিপট্ঠান সুত্ত (১৯১৪), বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি (১৯২৩), বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ (১ম ভাগ, ১৯৩৬), মধ্যম নিকায় (১৯৪০) ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ, ধর্মপদ (প্রাকৃত)।
নীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দি ও ভূপেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দি	পালি ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা
ভূপেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দি (১৯০৬-১৯৮৬)	নটিয়া পূজা
প্রজ্ঞানন্দ স্থবির	বিনয় মহাবগ্গ (মূল ও অনুবাদ), বুদ্ধের অভিযান
রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির	মহাপরিনির্বাণ সূত্র (১৯৪১), দীর্ঘনিকায় ২য় খণ্ড, শীলস্কন্ধ বর্গ, অনুবাদ, ১৯৬২, সিগালোবাদ সূত্র মহাসতি পট্‌ঠান সূত্র
শীলালংকার মহাস্থবির (১৯০০-২০০০)	ধম্মপদটঠকথা (১ম ভাগ, ১৯৬২), আনন্দ, বিমান বত্থু, বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ নারী, বিনয় পারাজিকা, বৌদ্ধনীতি মঞ্জুরী, মহাশান্তির অন্তরালে, জীবক, বিশাখা, অজাতশত্রু (১৯৩২), রাহুলচরিত।
পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (জন্ম ১৯০১)	ধম্মপদ (১৯৫৪), শাসনবংশ (১৯৬২), মধ্যম নিকায়, ২য় খণ্ড, (১৯৫৮), বৌদ্ধদর্শন (মূল রাহুল সাংকৃত্যায়ণ, ১৯৫২), সদ্ধর্মের পুনরুত্থান (১৯৭৪), মিলিন্দ প্রশ্ন (১৯৭৪), বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন (১৯৭৪), অধিমাস বিনিশ্চয়, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম।
জিনবংশ মহাস্থবির (১৯০০-১৯৯০)	ইতিবুত্তক (অনুবাদ), ধম্মসঙ্গণি (অনুবাদ-অপ্রকাশিত) নেত্তিপ্রকরণ, পালি-বাংলা অভিধান (প্রকাশের পথে) বৌদ্ধ সাধনানীতি, চরিয়া পিটক, পালি সূত্র সংগ্রহ, সদ্ধর্মরত্নচৈত্য, গৃহীবিনয়রত্ন মালিকা, প্রব্রজিত্যের ব্রতরাশি।
অন্নদা চরণ বড়ুয়া	ধর্মার্থ সংগ্রহ
অরবিন্দ বড়ুয়া (১৯০২-১৯৯৫)	ধর্ম ও জাতীয়তা
সুরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি	বৌদ্ধ নাটিকা
সাত কড়ি বড়ুয়া	পটাচারা, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, নাগলীলা।
কালিকুমার মহাস্থবির (১৮৭৫-১৯১৪)	চন্দ্রকুমার জাতক
সুস্নিগ্ধা বড়ুয়া	জ্যোর্তিমালা, ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া (জীবনী গ্রন্থ)
শরৎ চন্দ্র বড়ুয়া	বৌদ্ধ মঙ্গল, বৌদ্ধ পরিনয় নীতিশাস্ত্র (১৮৮৭)
জ্যোতি: পাল মহাথের	বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা (১৯৬১) পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি (১৯৬৩), বোধিচর্যাবতার (১৯৭৭), ব্রহ্মবিহার, পঞ্‌ঞাভূমি নিদ্দেস

Dhaka University Institutional Repository

(১৯১৪-২০০২)	(১৯৮১), (সানুবাদ), কর্মতত্ত্ব (১৯৫৫), সাধনার অন্তরায়, (১৯৭৮), ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন (১৯৮৪), রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি (১৯৬৮), বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম (১৯৭৬), মালয়েশিয়া ভ্রমণ (১৯৬৮), গুরুদেব গুণালংকার (জীবনী) (১৯৮৫), চর্যাপদ (১৯৯১), ভক্তিশতকম (১৯৯৯)।
ধর্মপাল মহাথের, (জন্ম-১৯২৫)	সদ্ধর্ম রত্নমালা, জাতক নিদান কথা।
শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (জন্ম-১৯০৭)	সম্বোধির পথে, মহাশান্তি মহাপ্রেম (তিন খণ্ড), কর্মবীর কৃপাশরণ, অমৃতধারা,সংঘসান্নিধ্যে, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা, মঙ্গলতত্ত্ব, অভিধর্ম দর্পণ, অন্তলোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ, সংযুক্ত নিকায় (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড), কর্মযোগী কৃপাশরণ।
ভিক্ষু জিনানন্দ (১৯১০-১৯৮৯)	বুদ্ধোদয়
দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া (১৯০৫-)	চরিয়াপিটক অটঠকথা
ড. দীপক কুমার বড়ুয়া (জন্ম-১৯৩৮)	Budhagaya Temple: Its History, Viharas in Ancient India, An Analytical Study of the four Nikayas, ধর্মসঙ্গণি, রূপরূপ বিভাগ।
ড. সুধাংশুবিমল বড়ুয়া (১৯৩৪-)	রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, Studies in Tagore and Buddhist Culture, বিদর্শন ধ্যান
অধ্যক্ষ পি. আর. বড়ুয়া ঃ (১৯১৮-১৯৯৪)	Early Buddhism and the Brahmanical Doctrines (1967), বৌদ্ধধর্ম অনিত্যবাদ, বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ, প্রাকৃত প্রবেশিকা (১৯৬৮), A New Pali Reader (1968), Matriculation Pali Selections (1961), Intermedite Pali selections (1961) পালি প্রবেশিকা (১৯৬১), বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা (যৌথ লেখক) (৯ম-১০ম শ্রেণী), The Life and teachigs of the Buddha.
অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া (১৯১৮-১৯৮৮)	ভগবান বুদ্ধ (১৯৫৬), মহামানব বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, বোধি সন্ধানী।
ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া (১৯৩৩-১৯৯০)	মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংকলন (১৯৬৬), কথায় ধর্মপদ (১৯৬৮), মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), The Theravada Sangha.
ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৯৩১-)	মধ্যম নিকায় (৩য় খণ্ড), বৌদ্ধ সাহিত্য, পালি অলংকার।
ড. সুকোমল চৌধুরী (জন্ম ১৯৩৯-)	A Critaical Study on Abhidharmakosa, contemporary Buddhism in Bang, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির	সীবলী ব্রতকথা, মারবিজয়, অশোকচরিত (পদ্য), প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়।
ভিক্ষু অনোমদর্শী	ধর্মপদ (যুগ্ম লেখক, ১৯৫৩)
অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী (১৯১৪-১৯৮৯)	আগম শাস্ত্র মহাযান বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম, চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম, ইসিপতন, সারনাথ তীর্থ, বুদ্ধগয়া, বুদ্ধ বন্দনা (বাংলা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম, ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, ১৯৮৬, চট্টগ্রাম)
বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো (১৯০৯-১৯৯৪)	রক্তঝরা দিনগুলো, সিংহল ভ্রমণ, Buddhism in Bangaldesh, এবং বৌদ্ধ দর্শনে সত্যদর্শন, ভক্তিশতক।
প্রকৌ. বিদর্ভ রঞ্জন বড়ুয়া (১৯৩৪-১৯৮১)	পাহাড়ী মালঞ্চ, ভারত মালঞ্চ, Pilgrims Poem, Buddha and His dhamma
শান্তপদ মহাথেরো (১৯১৫-১৯৮৭)	কুশলকর্মের তাৎপর্য, কর্মবাদ, শীলার্থ দীপনী, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ।
নীলাম্বর বড়ুয়া,	বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা, সদ্ধর্ম কৌমুদী, সদ্ধর্ম সুধা, খুদ্দক পাঠো (যৌথ লেকক), First Pali Reader, Secnd Pali Reader.
কবি অশোক বড়ুয়া (১৯৩১-১৯৭০)	মানস কবি, উৎপলবর্ণা, সপ্তপর্ণী, বিশাখা।
শশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া (১৯১৭-১৯৮৯)	কাব্যে ধর্মপদ, দাও ত্রিশরণ
সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া (১৯১৮-১৯৯০)	বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ মহয়সী নারী, বোধিসত্ত্বচর্যা ও বুদ্ধোৎপত্তি, বুদ্ধপথ, সদ্ধর্ম নীতিমালা, বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন, খুদ্দকপাঠ, ধর্মপদ (কবিতা), অভিধর্মার্থ সংগ্রহঃ বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান (মুলঃ নারদ থের)।
কবি সুগত বড়ুয়া (১৯৩২-১৯৯৩)	অন্য কোন নামে, কয়েকটি কবিতা, (কাব্যগ্রন্থ), কাছে দূরে (সংকলন)।
রাজগুরু অগ্রবংশ মহোথের (জন্ম-১৯২১-)	সমবায় বুদ্ধোপসনা, শ্রমণ কর্তব্য, পরিণাম (নাটক)
ড. অমল বড়ুয়া (জন্ম-১৯৩৭-)	গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধগয়া।
হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী (জন্ম-১৯৪৮-)	রক্তিম ও বৃত্তে রক্তে আলোক বৃত্তে আলোক বৃত্তে (কাব্য), সম্পাদনা বুদ্ধ প্রণাম (কবিতা সংগ্রহ), জগজ্জ্যোতি (বুদ্ধচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন), ভারত তত্ত্ববিদ নলিনাক্ষ দত্ত, বেণীমাধব বড়ুয়া, রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন, অশোক, আম্বেকর, (স্মারক)।
রত্না বড়ুয়া	নৈরঞ্জনা থেকে রাইন

Dhaka University Institutional Repository

ড. শভ্রা বড়ুয়া	Monastic Life of the Early Buddhist Nuns
বুদ্ধ রক্ষিত মহাস্থবির	সর্বদর্শনে ধর্মপদ
ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির	মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্ম, বিনয়াচার্য বংশদীপ, বাংলার সত্যসূর্য অতীশ দীপংকর, ময়নামতির ইতিকথা।
ড. ভিক্ষু শাসনরক্ষিত	ভাষাতত্ত্ব সার, আর্যপথ।
ধর্মকীর্তি মহাস্থবির	বুদ্ধের জীবন ও বাণী, ধম্মপদট্ঠকথা (অপ্পমাদ বগ্গ)
ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের	An Expostion of Karmma and Kebirth, The Glory of Buddhagaya, Pali studies in Bengal, Peace through Vipassana Meditation, Conception of Gods in the Pali Tipitak, Buddhism stands on Rebirth, A Buid to the Mind Purificaton, নালন্দা ও রাজগীর, খুদ্দক শিক্ষা (পালি), বারো বেশি না তের বেশী।
জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির (১৮৮৭-১৯৭৪)	পালি প্রবেশ (পাণ্ডুলিপি পালি বাংলা অভিধান, প্রাতিমোক্ষ, অভিধমার্থ সংগ্রহ)
ডা. সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া (১৯৪৪-২০০৪)	বৌদ্ধ সাহিত্য চিকিৎসা ব্যবস্থা, খুদ্দক পাঠ, আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ, চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস, ধাতুকথা, চরিয়াপিটক ও দশপারমী, ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার জীবন দর্শন, বৌদ্ধ পারিবারিক আইন, দুই হাজার সালে বৌদ্ধ ধর্ম, সরণং গচ্ছামি।
নূতনচন্দ্র বড়ুয়া	প্রবেশিকা সহজ পালি ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা, চট্টগ্রামে বৌদ্ধজাতির ইতিহাস।
লোকেন্দ্রলাল বড়ুয়া	পালি পাঠমালা, পালি ব্যাকরণ
শাক্যবোধি মহাস্থবির	পারমিতা, মহাশান্তির অন্তরালে
ড. নীরুকুমার চাকমা	বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম দর্শন
সুদর্শন বড়ুয়া	ত্রিপিটক পরিচিতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
গুণালঙ্কার মহাস্থবির	ধর্ম প্রসঙ্গ
বিমলানন্দ স্থবির	সদ্ধর্ম দীপিকা, বেশ্বন্তর (পালাগান), বিশাখা চরিত্র, সদ্ধর্ম শিক্ষা, কর্মবাচা
আনন্দমিত্র মহাস্থবির (১৯০৮-১৯৯৯)	আমার সমাজ, আদর্শ বৌদ্ধ জীবন, সত্য সংগ্রহ, অমৃতের সন্ধানে, আনন্দালোকে, ধর্মসুধা, মহামঙ্গল, বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম
ধনঞ্জয় বড়ুয়া	কর্মফল
ভিক্ষুশীলভদ্র (১৮৮৪-১৯০৫)	সুত্ত নিপাত (১৩৪৮ অনূদিত), ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, থেরীগাথা (১৩৫৭) দীর্ঘনিকায় (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), বুদ্ধবাণী, বঞ্চিতের সন্ধানে

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতির্মালা চৌধুরী (১৯০৩-১৯৮১)	সন্ধানে, বিলেত দেশটা মাটির, রক্তগোলাপ, শকুন্তলার স্বপ্ন, ইরাবতী, মৃত্যুদ্বীপ তারার প্রতাপ, রাজভিখারী, জোনাকি।
ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া	চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস
উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দি	বড়ুয়া জাতি
প্রজ্ঞালোক স্থবির	পাতিমোকখ, আর্যসত্য পরিচয়, সতিপট্ঠান ভাবনা
আর্যবংশ মহাস্থবির (১৯১৫-১৯৯৪)	সুবোধালঙ্কার (বঙ্গানুবাদ ১৯৪৮), Buddhism and world peace.
পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের	অভিধর্মার্থ সংগ্রহ স্বরূপ দীপনী, বিনয়াচার্য আর্যবংশ, চুল্লবর্গ (অনুবাদ)
মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া	গঙ্গামালা (নাটিকা ১৯৩৫)
কবিরত্ন প্রিয়দর্শী মহাস্থবির	সমাজ চিন্তা, নির্যাতিত পিতা
প্রফেসর ললিত কুমার বড়ুয়া	লোকনীতি ও গৃহীবিনয়, ১ম ও ২য় খণ্ড
পণ্ডিত প্রবর বংশদ্বীপ মহাস্থবির (১৮৮০-১৯৭১)	বালাবতার, কচ্চায়ন ব্যাকরণ, ভিক্ষু পাতিমোক্ষ (১৯৩৭), নামপদমালা, প্রজ্ঞাভাবনা, সদ্ধর্মসুধা (পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ, বিহার ও ভিক্ষু জীবন, পৃষ্ঠা-৩৩৬)
সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া	নিত্যপাঠ্য ধর্মপদ (মূল ও পদ্যানুবাদ, ১৯৬৬)
ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া	Buddhist Councils and Development of Buddhism (1997), দীপবংস (অনু. যৌথ) , স্কুল ও কলেজের কয়েকটি পাঠ্যবই রচনা করেন।
ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া (জন্ম-১৯৫০-)	বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব, পালি সাহিত্যে ধর্মপদ (যৌথ লেখক), আমার ভালবাসা, সম্রাট অশোক (সংকলন), দস্যু অঙ্গুলিমাল, হে মহাজীবন হে মহামরণ
ড. সুনন্দা বড়ুয়া	বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান
সুমঙ্গল বড়ুয়া	অঙ্গুত্তর নিকায়(১ম খণ্ড-অনুবাদ), দীপবংস (অনু. যৌথ)
ড. রণজিৎ কুমার বড়ুয়া	বৌদ্ধধর্মেরর ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের অবদান।
ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া	বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, সদ্ধর্ম দিশারী, দীপবংস (অনু. যৌথ)
ড. সুকোমল বড়ুয়া (জন্ম ১৯৫২)	কোশল ও মারসংযুক্ত, পালি ভাষা ও সাহিত্য ছন্দ ও অলংকার, পালি সাহিত্যে ধর্মপদ, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (যৌথ লেখক)।
প্রিয়ানন্দ মহাথের	বিমুক্তিমার্গ, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান। (যৌথ)
বিপ্রদাশ বড়ুয়া	গৌতমবুদ্ধ: দেশকাল ও জীবন (যৌথ লেখক), শ্রামণ গৌতম, বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও প্রত্ন সম্পদ, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি (সম্পা), দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, গাঙচিল, স্বপ্নমিছিল, যুদ্ধজয়ের গল্প, নদীর নাম

Dhaka University Institutional Repository

	গণতন্ত্র, সাদা কফিন, ইয়াসমিন, সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের গল্প সমগ্র, ভালোবাসা নির্বাসন, আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি সহ ৬০টি গ্রন্থ।
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী (১৯০৬-১৯৭৯)	আমার কথা, বৌদ্ধ সভ্যতা যেভাবে ধ্বংস হলো
গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া (১৮৯১-১৯৬০)	অন্ধের দৃষ্টি, মদন মোহন
অগগ মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৮-১৯৭০)	ধর্মপদ, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, দান মঞ্জুরী, রত্নমালা বিশোধন, কুড়ি সহস্রাধিক পালি-বাংলা অভিধান, মিলিন্দপ্রশ্ন, থেরগাথা (১৩৩৫), লোকনীতি (১৯৩২) তেলকটাহ গাথা, বুদ্ধের যোগনীতি, বিদর্শন ভাবনা ও সুত্ত বিভঙ্গ (সম্পাদনা) ধর্ম সংহিতা, সুত্তনিপাত, বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়
অগ্রসার মহাস্থবির (১৮৬৩-১৯৪২)	বুদ্ধ ভাজনা (১২৫৫ মগাব্দ), গাথা সংগ্রহ (১২৫৬ মগাব্দ), পালি শব্দ সংগ্রহ (১২৬০ মগাব্দ) (পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষুজীবন, পৃষ্ঠা-৩৩৭) ধর্মপদ অটঠকথা সানুবাদ, পালি বাংলা অভিধান।
দেবপ্রিয় বড়ুয়া (জন্ম-১৯৩২-)	বেণীমাধব বড়ুয়া, সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবির (জীবনীগ্রন্থ), Bangladesh-China Relationship from Buddhist perspective, বাঙালি বৌদ্ধদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
ড. সুমনপ্রিয়ানন্দ ভিক্ষু (জন্ম- ১৯৫৬-)	বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভাস্কর্য
ড. করুণানন্দ ভিক্ষু	পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগরজীবন
অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের (জন্ম-১৯৪০-)	বোধিমালা, বিমুক্তি রূপায়নে বৌদ্ধ ধর্ম, গাথাগুচ্ছ , ধর্মপদ, প্রিয়দর্শী অশোক, জগজ্জ্যোতি বুদ্ধ, বুদ্ধবাণী পরিচয়
ড. জিনবোধি ভিক্ষু	তথাগত বুদ্ধের বোধিবিধি, পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রাহ্মচারী, জ্ঞানতাপস পুন্নানন্দ স্বামী, পণ্ডিত, ধর্মাধার, বিদর্শনাচার্য দীপার মা, জ্ঞানতাপস শান্তরক্ষিত,সদ্ধর্ম মঞ্জুরী, ননীবালার জীবনী,
সুমন কান্তি বড়ুয়া	ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (যৌথ লেখক)
আনন্দমিত্র মহাস্থবির,	সত্যসংগ্রহ
বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা,	ত্রিরত্ন মঞ্জরী, চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস।
অমৃতানন্দ মহাথের,	ধর্ম দীপকা, সদ্ধর্মামৃত সুধা,
অশোক কুমার দেওয়ান,	চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার
মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া,	কবিতা মঞ্জুরী
প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির (জন্ম-১৯৩৯-)	পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সতিপট্ঠান সূত্র, স্মৃতিকথা, ফেলে আসা দিন গুলি।
বিমলেন্দু বড়ুয়া (জন্ম ১৯৩৩)	পাষাণের মৌনতটে, সংঘরাজ শীলালংকারের জবিনালেখ্য,

Dhaka University Institutional Repository

	মেকং নদীর তীরে, কোরিয়ায় কিছু দিন রুশমংগোলের দেশে, স্বপ্নময়ী শ্যামদেশ, বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, জাতক প্রেমকথা, আচার্য ভগবান চন্দ্র, মহাস্থবির, কিভাবে পরিত্রাণ পাবেন, জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃপাল১
বিরাজ মোহন দেওয়ান	চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত
ডা. রাসবিহারী চৌধুরী	বৌদ্ধ ধর্ম প্রসঙ্গে
কোণ্ডঞো ভিক্ষু (নাহার বড়ুয়া)	পঞ্চসার নীতি, প্রশ্নোত্তরে বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ সহচর, বিনয়াচার্য জিনবংশ, তথাগতের অন্তিম অবদান, শাসনধ্বজ প্রজ্ঞাতিষ্য, বৌদ্ধধর্মে বিশ্বমৈত্রী ও ত্রিশরণ, বৌদ্ধ জীবন দর্শন, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক, যোগাচার্য প্রজ্ঞাজ্যোতি, থেরী অবদান, বৌদ্ধগল্প সুধা। (জগজ্জ্যোতি, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮০)
ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া	গন্ধবংস (অনু./সম্পা), বৌদ্ধ রশ্মিকা (যৌথ সম্পাদনা)
ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া (জন্ম ১৯৩৪)	মহাথেরকে যেমন দেখিছি, বৌদ্ধ আচরণ বিধি, অতীশ দীপংকর, মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বিশুদ্ধানন্দ জীবনী (ইংরেজী)
ড. শরণংকর ভিক্ষু	মানব কতরূপে, ধর্ম কোন পথে, অর্হৎ পূজা, মানুষ তোমার পরিচয় কি?
ড. সত্যপাল ভিক্ষু	তেলকটাহ গাথা (অনু), পালি ব্যাকরণের কচ্চায়ন বৃত্তি (সম্পা)
ড. বরসম্বোধি থের	বৌদ্ধ তীর্থ পরিক্রমা, মৃত্যুর পরে,
ভিক্ষু সুমন্দ প্রিয় ও হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী (১৯৪৮-)	বুদ্ধ ভাবনার গল্প সংকলন
মনিকা বড়ুয়া (১৯৫৮-)	মেঘের আড়াল থেকে, রক্তে দাও অমৃত ও আগুন, প্রতিরোধ, রক্তে গড়া
ধর্মসেন মহাস্থবির,	ত্রিরত্ন বন্দনা
স্মৃতি মিত্র ভিক্ষু,	বুদ্ধ বচনামৃত
ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া	প্রিয়ানন্দ মহাজীবন
দীপক বড়ুয়া	হাজার বছরের বৌদ্ধ বাঙালা
হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া	বাংলাদেশী বৌদ্ধদের ইতিবৃত্ত
তাপস তালুকদার	বৌদ্ধ গ্রামকুঞ্জ (১ম ও ২য় খণ্ড)
সুদর্শন বড়ুয়া	ত্রিপিটক
জয়কেতু বড়ুয়া	বুদ্ধ-বুদ্ধকথা-ধর্মকথা
সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া	বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া	বনভন্তের দেশনা, ১ম , ২য়, ৩য় খন্ড, প্রবাসের পথে, কুশলতত্ত্ব সংগ্রহ (অনু)
অরুণ বিকাশ বড়ুয়া (১৯৪০-১৯৯৫)	চতুর্থ বিশ্ব এবং বৈশাখী, পূর্ণিমা (কাব্য), বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট, এখানে আকাশ (কাব্য), আজো আমি বিপ্লবী, বৌদ্ধিক জীবনের নব দিগন্ত, মহাকবি অশ্বঘোষ, উজ্জ্বল দিন আসে, সিদ্ধার্থ তোমাকে নমস্কার।
অমিতাভ বড়ুয়া	গল্প ১৩৭৭, গীতশতক, বহ্নি শিখা (কবিতা), জ্ঞানতাপস মোহন চন্দ্র বড়ুয়া (জীবনী)।
বাদল বড়ুয়া	অন্য এক নামে, মায়ের চিঠি, মহাজীবন, দীর্ঘনিকায় (অনুবাদ)।
রুবি বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া	গৌতম বুদ্ধঃ দেশকাল ও জীবন।
বিপুল বড়ুয়া	নীলক্ষেতের দুপুর (গল্প গ্রন্থ), নোটন নোটন (ছড়া)।
বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া ডাঃ	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।
বোধিপাল শ্রমণ, বিদর্শনাচর্য	বিদর্শন পূর্ণ শান্তি ও সমাধান সূত্র, লোকোত্তর প্রদীপ।
উৎপল কান্তি বড়ুয়া	বাকুম বাকুম বাক (ছড়া), বুদ্ধের ছড়া।
জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া	শান্তি (অনুবাদ), শান্তির জন্য নির্বেদিত (অনুবাদ)।
ধর্মদীক্ষিত মহাস্থবির	বুদ্ধের জীবন ও বাণী।
কামিনী কুমার দেওয়ান	দীন সেকবের কাহিনী
বিরাজ মোহন দেওয়ান	চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত।
সঙ্গীতাচার্য জগদানন্দ বড়ুয়া (জন্ম-১৯২০-)	সংগীত দীপিকা(১৯৬৪), সংগীত মুকুল (১৯৮১), সংগীত পারিজাত(১৯৮৩), সংগীত ভাস্কার (১৯৯৭), নৃত্যমুকুল, সংগীত রত্নাকার, অংকের ম্যাজিক, তবলা বিজ্ঞান, নৃত্য বিজ্ঞান, আবৃত্তি বিজ্ঞান, লোকসংগীত, চারু ও কারু শিল্প
নীরু কুমার চাকমা	বুদ্ধ ও তার ধর্মদর্শন।
নীহার বড়ুয়া	বৌদ্ধ সহচর।
নতুন চন্দ্র বড়ুয়া	চট্টগ্রামে বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস।
প্রদীপ্ত খীসা	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা।
প্রিয়ানন্দ মহাথের ও এস, ধর্মপাল মহাথের	বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান।
প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির	সংজ্ঞায়নে বিমুক্তি মার্গ, ধর্মপদঅট্ঠকথা (অনু)
ডা. রবীন্দ্রনাথ বড়ুয়া	মহাজীবন (বক্তিা সংকলন), শান্তি সুধা, ডা. শান্ত কুমার চৌধুরীর জীবন চরিত।
রণজন বড়ুয়া	বিমিশ্র অনুভব (কাব্য)

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিরক্ষিত মহাস্থবির (১৯০৪-১৯৯৭)	ইতিবুত্তক, ধর্মসঙ্গনী ও নেত্তি প্রকরণ (অনুবাদ), বুদ্ধের প্রধান প্রথম দুইটি বাণী, বৌদ্ধ সাধনা নীতি, বিদর্শন ভাবনায় স্মারক, প্রাথমিক পালি শিক্ষা, পালি ব্যাকরণ
শিশির বড়ুয়া	বন্ধন খোল পায়রার (কবিতা), সংঘপ্রাণ বঙ্কিম চন্দ্র (জীবনী)।
সলিল বিহারী বড়ুয়া (জন্ম-১৯৪৫-)	বিদর্শন ভাবনা পদ্ধতি (অনুবাদ), বৌদ্ধধর্মে অনিত্যবাদ, মহেন্দ্রের আগমন (অনুবাদ), প্রবন্ধ সম্ভার, ভরংফড়স (অনুবাদ), মহাকবি আর্নল্ড
সনজীব বড়ুয়া (জন্ম-১৯৫৯-)	নিঃসঙ্গ পদাবলী (কবিতা)
সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)	সুত্ত নিপাত, বনভন্তের দেশনা (৩ খণ্ড)
চিন্ময় মুৎসুদ্দি	অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম।
সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া	মহাকারুণিক বুদ্ধ, প্রার্থনা পদ্ধতি ও প্রতিপাল্য নীতি, যে আমি ওই ভেসে চলে (আত্মজীবনী), আধুনিক যুগ প্রেক্ষিতে বুদ্ধবাণী।
সুমেধানন্দ ভিক্ষু	কম্মবাচা।
সুগতবংশ মহাস্থবির (১৯১০-১৯৯৯)	সমবায় বৌদ্ধ উপাসনা, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দর্শন, ধর্ম প্রসংগ, বৌদ্ধ গল্পগুচ্ছ, সীবলী চরিত, যশোধরা দেবী, পথের পরিচিতি, কোশলের অমর কাহিনী, বৌদ্ধ উপাসনা নীতি, গৌতম চরিত, ধর্মপ্রসঙ্গ, সুমেধ তাপস, পারমিতা।
সুগত চাকমা	পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, চাকমা পরিচিতি, চাকমা-বাংলা অভিধান, চাকমা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার।
সুমনতিষ্য মহাস্থবির	বুদ্ধের জীবন কথা।
সুকুমার বড়ুয়া (জন্ম-১৯৩৮-)	চুসটাস, নদীর মেলা, ভিজে বিড়াল, এলোপাতারি, চন্দনা, রঞ্জনার ছাড়া, নানা রঙের দিন, কিছু না চিচিং ফাঁক, সুকুমার বুড়য়ার বুদ্ধচর্চা বিষয়ক ছড়া কিছু না কিছু, সুকুমার প্রিয় ছড়া শতক, সুকুমার বড়ুয়ার ১০১টি ছড়া।
সুব্রত বড়ুয়া (জন্ম-১৯৪৫-)	জোনাকি শহর (গল্প), অনধিকার (গল্প), গ্রহণের লাল (গল্প), আত্ম চরিত্র ও অন্যান্য গল্প, বিজ্ঞানের ইতিকথা, সন্ধানী মানুষ, বিদ্যুতের কাহিনী, কচা কোয়ান্টাম থিওরি, অশোক বড়ুয়া (জীবনী), এমিলের গোয়েন্দা কাহিনী (অনুবাদ), শঙ্খচিল (অনুবাদ), এশিয়ার গল্প (অনুবাদ), দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় (কিশোর উপন্যাস), অরক্ষিত নগরী (উপন্যাস) দস্ত রভর্কাস (আলোচনা), হলুদ বিকেলের গান(কবিতা), কাঁচপোকা (গল্প), ভালোবাসা ভালোবাসা, বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং তৃণা (গল্প)।
হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া	আমার জীবন কথা (আত্মজীবনী), বাংলাদেশী বৌদ্ধদের ইতিবৃত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া	অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, বৃক্ত হোক জীবনের জয় (আত্মজীবন গ্রন্থ)
ধর্মাধিপতি শুদ্ধানন্দ মহাথের (জন্ম-১৯৩৩-)	ডা. ভগীরথ জীবনী, ব্যক্ত হউক সব
বিবেকানন্দ মুৎসুদ্দি (জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু)	আধুনিক প্রগতিশীল যুগে বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজ
সুজন বড়ুয়া (জন্ম-১৯৫৯-)	বাড়ির সংগে আড়ি (কবিতা), আমার সাগর আমার (কবিতা), আজ সারাদিন আমরা স্বাধীন (কবিতা), ভূত রাক্ষস ও দৈত্যের গল্প (গল্প), রং মাখা রূপ কথা (রূপকথা), আলোর পাখি নাম জোনাকি (কবিতা), সীমান্ত গান্ধী গাফফার খান (জীবনী)।
দর্পণ বড়ুয়া	কিনে নিন ঘোড়ার ডিম (ছড়া), শোক নয় প্রতিশোধ (কবিতা), সময় আবার যুদ্ধে যাবার, মুজিব মানে একটি কথা, ইচকি মিচকি লেড়কা লেড়কি।
দীপক বড়ুয়া	অন্যরকম ভালবাসা (গল্প), তোমার চোখে চোখ রেখেছি (কবিতা), এলোমেলো, কাণ্ড দেখো ভূতের।
অপু বড়ুয়া	যুগল বন্দী প্রেম (কবিতা), আকাশে রঙিন ঘুড়ি (কবিতা)।
মোহন চন্দ্র বড়ুয়া	মার বিজয় (কীর্ত্তন)।
মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া	কবিতা মঞ্জুরী (কবিতা)।
সুগতানন্দ মহাথের	বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার ইতিবৃত্ত।
ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া	রাগ সুধাকর কেলি (শাস্ত্রীয় সংগীত)।
সুভাষ কান্তি বড়ুয়া	অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রবক্তা আম্বেদকর, ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইতিবৃত্ত।
আশীষ বড়ুয়া	কষ্টে কাঁপে স্মৃতির মিনার (ছড়া)।
অজিত বড়ুয়া	বৌদ্ধ ধর্ম কেন (অনুবাদ), অগগ মহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির (জীবনী), শেষ প্রণতি (জীবনী), দীপন, আপনিই দায়ী (অনুবাদ)।
গীতা চৌধুরী	বুদ্ধের একযান (অনুবাদ)।
ডাঃ প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া	জীবন দর্শন (অনুবাদ)।
বিনয় ভূষণ বড়ুয়া	স্মৃতিপট্ঠান সূত্র এবং আধুনিক যুগে তার প্রয়োগ (অনুবাদ)
নীহার রঞ্জন বড়ুয়া	শরণ, বাণী গুচ্ছ।
মনিন্দ্র লাল বড়ুয়া	আমিত্বে বিপত্তি (অনুবাদ)।
প্রেমাংকুর বড়ুয়া, এডভোকেট	বহুধর্মী সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম (অনুবাদ)।
সুমন বড়ুয়া	নির্বাচিত কিশোর গল্প।
মিশু বড়ুয়া	আমাকে হৃদয়ে তুলে ধর (কবিতা)।
ভিক্ষু ধর্মেশ্বর	সেই ধন্য নরকূলে (জীবনী)।

Dhaka University Institutional Repository

বোধিসত্ত্ব বড়ুয়া	ভোর হল দোর খোল (সম্পাদিত)।
সতীশ চন্দ্র ঘোষ	চাকমা জাতি
রাজা ভুবন মোহন রায়	চাকমা রাজবংশের ইতিহাস
যোগেশ চন্দ্র তনচংগা	তনচংগা উপজাতি
বীর কুমার তনচংগা	তনচংগা পরিচিতি
বিরাজ মোহন দেওয়ান	চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত
মং বা অং (মংবা)	রাখাইন জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ
সাধনা বড়ুয়া	বঙ্কু অনুধ্যান ও সময়ের প্রহরগুলি (সম্পা)
রুবী বড়ুয়া	ছোটদের গৌতম বুদ্ধ
সম্বোধি মহাস্থবির	শ্রদ্ধাবতী সুভদ্রা, বন্দনামালা
তাহান	রাখাইন জাতিসত্তার ইতিহাস
সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া নেপাল	ময়নামতি পরিচয়, আম্বেদকর

স্বাধীনতোত্তর/মুক্তিযুদ্ধোত্তর বৌদ্ধ লেখক ও গ্রন্থাবলী

প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ সময়ে আমরা বৌদ্ধ লেখকদের মধ্যে চারটি ধারা লক্ষ করেছি।

ক) ধর্মীয় লেখক খ) সনাতনী ধারা গ) হিন্দু মতাদর্শ ঘ) সার্বজনীন ধারা

দুই শতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব থেকে যাঁরা বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে লিখেছেন এবং স্বাধীনতোত্তর অর্থাৎ ১৯৭১ এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল বৌদ্ধ লেখকের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এখনো লিখে চলেছেন তাঁদের রচনাবলীকে প্রধানত তিন বিভাজন করা যায়। যথা- (১) ধর্মীয় ও বৌদ্ধ সমাজ জীবন বিষয়ক লেখক। এ ধারার লেখকগণ সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, বৌদ্ধ ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, বৌদ্ধ জাতীয় সমস্যা ও বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী লিখেছেন। (২) সার্বজনীন- এ শ্রেণীর লেখকদের জীবন-জিজ্ঞাসা কোন ধর্ম নয়, সম্প্রদায় নয়, এদের জীবনাভূতি ধর্ম বর্ণ গোত্রের বাইরে। আপামর জনসাধারণের পাঠযোগ্য। গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ও নাচ গান বিষয়ক রচনাবলীকে আলোচ্য ধারায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। (৩) মিশ্র ধারা- ধর্মীয় ও সার্বজনীন ভাবধারার সমন্বয়ে এ ধারার লেখকবৃন্দ লিখেছেন এবং অনেকে তা অব্যাহত রেখেছেন।[১৩] ১৯৪৭ পূর্ব বৌদ্ধ কবি লেখকবৃন্দকে তিনটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ৭০ পর্যন্ত আমরা দু'ধারার লেখক পাই। এরা হলেন-ধর্মীয় ও সার্বজনীন। এদের মধ্যে যারা খ্যাতি লাভ করেছেন তারা হলেন- অনিল বড়ুয়া (উপন্যাস), অমিতাভ বড়ুয়া (উপন্যাস), উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, কিরণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী (মাষ্টার), অধ্যক্ষ প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, অশোক বড়ুয়া, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, পণ্ডিত গিরিশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া আরো অনেকে। উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, গিরিশ বাবু (উপাধি প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

লেখক), অনিল বড়ুয়া, অমিতাভ বড়ুয়া ও বিশ্বেশ্বর চৌধুরীকে আমরা সার্বজনীন লেখক বলতে পারি। অশোক বড়ুয়া হলেন মিশ্র ধারার।

আর আলোচ্য লেখায় সুকুমার বড়ুয়া, সুব্রত বড়ুয়া, সুজন বড়ুয়া, অপু বড়ুয়া, দর্পন বড়ুয়া, দীপক বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়াকে চিহ্নিত করা যায় সার্বজনীন লেখক হিসাবে। অনুরূপ লেখক জগদানন্দ বড়ুয়া, ডা. সুরেশ চন্দ্র বড়ুয়া, বিমলেন্দু বড়ুয়ার রেখার মধ্যে দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও জীবনী, তৎসঙ্গে ভ্রমণ কাহিনী। তাই তাদের মিশ্রধারার লেখকে বলা যায়। সুকুমার বড়ুয়া, সুব্রত বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া বহু পদক, পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্ত লেখক। অন্যরা বৌদ্ধধারার লেখক। মুনীন্দ্র বড়ুয়া বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ কর্তৃক সাহিত্যরত্ন উপাধি প্রাপ্ত। বিশেষ করে বৌদ্ধ সমাজের লেখক ও সাহিত্যিকগণ বেশি বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিষয়ক বেশি লেখালেখি করেন।

বৌদ্ধ সমাজের কবিগণ হলেন - কবি ফুলচন্দ্র বড়ুয়া, পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া, রামচন্দ্র বড়ুয়া, কবি ধনঞ্জয় বড়ুয়া, কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া, কবি বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, বিমল বিনোদ বড়ুয়া, শশাঙ্ক মোহন বড়ুয়া, গৌতম প্রসাদ বড়ুয়া, সুবোধ চন্দ্র বড়ুয়া, কবি নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া, মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া, কবি জ্যোতির্মালা চৌধুরী, কবি রণধীর বড়ুয়া, কবি নিরঞ্জন প্রসাদ বড়ুয়া, কবি বিমলেন্দু বড়ুয়া, কবি অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া, ড. দীপক কুমার বড়ুয়া, সুব্রত বড়ুয়া, কবি সুনন্দা বড়ুয়া, কবি ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, কবি হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী, কবি অরূপ রতন চৌধুরী, কবি অলক কুসুম বড়ুয়া, কবি সাধন বড়ুয়া, কবি সঞ্জীব বড়ুয়া, কবি অরুন বিকাশ বড়ুয়া, কবি সুজন বড়ুয়া, উৎপল কান্তি বড়ুয়া, বিপুল বড়ুয়া, দীপক বড়ুয়া, অপু বড়ুয়া, দর্পণ বড়ুয়া, সুপলাল বড়ুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১৪]

৬.২ বাংলাদেশে বৌদ্ধ পত্রিকা-সাময়িক পত্র

সাহিত্য কিংবা পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী একটি জাতির দপর্ণ। এ সকল প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয় জাতি, ধর্ম, সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠি ও ব্যক্তির সামগ্রিক পরিচয়। জাতির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় সাহিত্য এবং পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অবিসংবাদিত। দীর্ঘকাল পরিক্রমার ইতিহাসে অমূল্য ফলক হিসেবে বর্তমান থাকে এ প্রকাশনা। জাতি-ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডের প্রতিফলন বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা, চর্যা, মনন, চিন্তন, ঐক্য- সম্প্রীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, পূর্ব ও উত্তর জাতিসত্তার বহিপ্রকাশ ঘটে সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উত্তর-আধুনিকতার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলায় বৌদ্ধদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস থাকলেও বাংলাদেশে নব প্রয়াসে রেনেঁসার যুগে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার স্বর্ণযুগ (Golden

Dhaka University Institutional Repository

age) বলে আখ্যায়িত। বাংলায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উত্তরাধিকার বৌদ্ধদের। সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনায় বৌদ্ধরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানেও নানা বিষয়ে এদেশের বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান প্রতিভাত হয়। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য এবং পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজ সংগঠন অনেক এগিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজের পুনজাগরণের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-সংগঠন বিষয়ক অনেক পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে; করছে এবং বৌদ্ধ সমাজে বহু পণ্ডিত, সাহিত্যিক, লেখক ও গ্রন্থাকারের আর্বিভাব ঘটেছে। সাহিত্যচর্চায় বৌদ্ধরা অনেক এগিয়েছে। তাঁরা লিখছেন এবং প্রকাশ করছেন নানা পুস্তক, পত্রিকা এবং সাময়িকী।

বৌদ্ধ ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সংস্কৃতি, সংগঠন এবং জাতির বৌদ্ধিক মনন, সৃজন, চিন্ত-চেতনা-ঐক্য, সাম্য প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে বৌদ্ধ সাময়িকপত্র পত্রিকার অবদান অনেক বেশি। অতীতে এবং বর্তমানে যে সকল বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয় সেগুলোর বেশির ভাগের কেন্দ্র ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম।[১৫] পরবর্তীকালে ঢাকা থেকেও এরূপ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। বৌদ্ধ সমাজে পূর্বে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা কালের স্রোতে সময়ের ধারা গতিতে অনেকগুলোই বর্তমানে বিলুপ্ত। বর্তমান নতুন ও পুরাতন মিলে বেশকয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা প্রকাশিত হচ্ছে। এটা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দী থেকে অদ্যাবধি বৌদ্ধ সমাজে যে সকল পত্র পত্রিকা নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল তার সব সংগ্রহ করাও এখন অত্যন্ত দুষ্কর। সে কারণে বাঙালি বৌদ্ধদের পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। তবে যতটা পাওয়া গেছে এবং তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।[১৬]

আধুনিক কালে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য হলেও বর্তমান বাংলাদেশে বা তৎকালীন বাংলায় প্রকাশিত বৌদ্ধ পত্রিকা-সাময়িকপত্র নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণা হয়নি। বাঙালি বৌদ্ধদের নব জাগরণে, এমনকি বর্তমানও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পত্র পত্রিকা গুলো যে অনবদ্য অবদান রেখেছে এবং এখনো রেখে চলেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিভিন্ন প্রকারের পত্র-পত্রিকার মধ্যে ধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকার সাহায্যে স্ব স্ব ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, ইতিহাস, সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায় এবং জাতি সমাজ ও ধর্মের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।[১৭] বৌদ্ধ পত্রিকা সম্পর্কে প্রায় কোন তথ্যই জানা যায় না, এর আগে জাতীয়ভাবে কোথাও এর উল্লেখ বা আলোচনা হয়নি। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রেঙ্গুন এবং কলিকাতা থেকে বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্রিকা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উন্নতি ও সংরক্ষণ। অনেকেই স্বধর্ম ও স্বজাতির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ পত্রিকা ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হয়েছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

সাধ্যানুরূপ স্বজাতি সেবায় আত্মোৎসা করেছিল। [১৮] বিনয়ঘোষ (১৯১৭-৮০),এর পূর্বে জেমসলভ (১৮১৪-৮৭), কেদারনাথ মজুমদার (১৮৭৩-১৯৩০) এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮১৯-১৯৫২) বাংলার সাময়িক পত্র বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এছাড়া ও আনিসুজ্জামান, মুনতাসীর মামুন, আবদুল হক (১৯২১-৯৭) মুস্তাফা নুরুউল ইসলাম প্রমুখ অবদান রাখেন। বৌদ্ধ পত্রিকা-সাময়িকপত্র বিষয়ে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত, সাহিত্যিক উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকার সংকলন, পরিচয় এবং তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হলো ড. সুকোমল চৌধুরী, জীতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ড. সুকোমল বড়ুয়া, প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া প্রমুখ। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনস ও চিন্তাধারার বিকাশে সাহিত্য পত্র বা সাময়িকী সংকলন অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। বাংলার তথা বাংলাদেশে কালে কালে বহু বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় দুই শতক ধরে বৌদ্ধধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পত্রিকা-সাময়িকপত্র গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব পত্র-পত্রিকার বৈশিষ্ট্য গুণগতমান বিষয়বস্তুর স্বকীয়তার মূল্যায়ন সম্প্রদায়গত দিক থেকে নয় বরং শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া অপরিহার্য।

বৌদ্ধ পত্রিকা-সাময়িকী প্রকাশের সেকাল-একাল পর্যায়ে অনেক জ্ঞানী গুণী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি, সংস্কৃতিসেবী এবং প্রকাশক, সম্পাদক সংগঠক ও পাঠক সমাজ জড়িত ছিলেন। এ সকল প্রকাশনায় সব সময় সমষ্টিক চিন্তাধারা, জাতি, ধর্ম ও সমাজ পরিপ্রেক্ষিত প্রাধান্য পেয়েছে। সামগ্রিক জীবন, জনমত, সমাজচিত্র, মানসভাবনা আত্মচেতনাবোধ ও নব জাগরণে পত্র-পত্রিকা ভূমিকা তাৎপর্যময়। ধর্মীয় ও সামজিক সংস্কার ও আন্দোলন সময়ের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে সংস্কার মূলক আন্দোলন প্রকট ছিল এবং সফলও হয়েছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমাজে সামাজিক আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আর্দশ। বহুজনের চিন্তা চেতনা ও সর্বজনীন আর্দশে বহুমাত্রিকা পরিবর্তন ও উন্নয়ন। এর তিনটি রূপ হতে পারে সংস্কার, পরিবর্তন এবং বিপ্লব; বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজে উনিশ শতক ছিল সংস্কার মূলক এবং বৌদ্ধদের পুনর্জাগরণের সঞ্চারনী ধারা। সামাজিক আন্দোলন হলো-সমাজের একটি সংগঠিত অংশের লক্ষ্য ও আদর্শের ওপর ভিত্তির করে মোবিলাইজেশনের সাহায্যে সমাজে আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনলা হলো সামাজিক আন্দোলন।

[১৯] হিকি (ঐরপশু) সাহেবের 'দি বেঙ্গল গেজেট' প্রথম মুদ্রিত সংবাদ পত্র। প্রকাশকাল ১৭৮৯- এর ২৯ জানুয়ারী। বাংলায় সাময়িক পত্র বের করে শ্রীরাম পুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন। নাম-দিগদশন। সম্পাদক জন ক্লার্ক মাশম্যান। তারপর থেকে প্রভাবক, বঙ্গদর্শন, সাধনা, তত্ত্ববোধনী, ভারতী, ঢাকা প্রকাশ, সোম প্রকাশ, ভারতবর্ষ, হিন্দু রঞ্জিকা, বিংশ শতাব্দী, শনিবারের চিঠি, সাওগত, ধুমকেতু, মোহাম্মদী প্রভৃতি নানা পত্রিকার সমাবেশ। এই রেনেসাঁয় নতুনকে জানবার মুহূর্তে এদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাস্বল্প বৌদ্ধ সম্প্রদায় নির্জীব বসে থাকেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকে। যে সমস্ত পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, দ্বিবার্ষিক ও বার্ষিক পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে এবং বর্তমানেও নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে এগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রবিষ্ট করা হলো।

প্রভাত

চকরিয়া হারবাং এর কবি গুণাকর ও নবীন চন্দ্র দাসের উদ্যোগেহ চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম 'প্রভাত' নামে ১৮৬০ সালে বৌদ্ধদের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাহাড়তলীর কবি কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দি তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরে বৌদ্ধ বন্ধু পত্রিকারও (১৮৮৯) সম্পাদক ছিলেন।[২০]

বৌদ্ধবন্ধু

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সালে। বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কোরিয়ার হারবাং এর মহান সংঘপুরুষ পণ্ডিত গুনমেজু মাহথেরো এবং সাধারণ সম্প্রাদক বাঙালি বৌদ্ধদের নবজাগরণের অগ্রদূত, বৌদ্ধ সমাজের নন্দিত সমাজনেতা সাতবাড়ীয়ার নাজির কৃষ্ণ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে কালী কিংকর মুৎমুদ্দির সম্পদনায় বৌদ্ধ সমিতির মুখ পত্র হিসেবে মাসিক বৌদ্ধ বন্ধু পত্রিকা ১৯৮৭ প্রকাশিত হয়।[২১] বৌদ্ধ বন্ধু বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের প্রথম মাসিক পত্রিকা। এটি বাংলা ও ইংরেজী সংস্কারণ প্রকাশিত হতো। ড. মুনতাসীর মামুন বলেছেন, বৌদ্ধ বন্ধু ১৯৮৪ সালে (বৈশাখ ১২১৯) চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম, শিক্ষা ও চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম শিক্ষা ও সম জের উন্নতি সাধান।[২২] কয়েক বছর প্রকাশের পর বৌদ্ধ বন্ধু বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কিছুদিন সম্পাদনা করে ছিলেন এবং এক বছর পর আবার বন্ধ হয়ে যায়।

ভারত বাংলায় পত্র-পত্রিকায় গবেষণা ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ১৯০৬ সালে নবপর্যায়ে বৌদ্ধ বন্ধ প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম সমিতির উদ্যোগে। ড. সুকোমল চৌধুরী লিখেছেন ড. ভাগীরথ বড়ুয়া ও সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া বৌদ্ধ বন্ধুকে পুনরায় জাগরিত করেন। এরপরে ১৯১৫ সালে (১৩২২ বঙ্গাব্দে) সমন পুন্নানন্দ সমীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে জয়দ্রথ চৌধুরী ও প্রফুল্ল কুমার বড়ুয়ার যুগ্ম সম্পাদনায় বৌদ্ধ বন্ধু পুনর্জীবন লাভ করে। কিন্তু এক বছর পর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তাই ভারততত্ত্ববিদ ড. বেনীমাধব বড়ুয়া বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষে বৌদ্ধ অবদান প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন যে, বৌদ্ধ বন্ধু বহুবার মরিয়া বহুবার বাঁচিয়েছে।[২৩] বাঙালি বৌদ্ধদের প্রথম প্রকাশিত বৌদ্ধবন্ধু পত্রিকা বৌদ্ধদের পুনর্জাগরনে ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিকাশে ও সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ পত্রিকা

মাসিক বৌদ্ধ পত্রিকা ১৯০৬ সালে প্রথমে চট্টগ্রামের পটিয়ার পাচুঁরিয়া গ্রামের সুপণ্ডিত মাস্টার বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া এবং পরে রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামের ডাক্তার সর্বানন্দ বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধবন্ধু পত্রিকার সূত্র ধরে বৌদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি দুই বছর প্রকাশিত হয়েছিল। এর কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন সাতবাড়িয়ার জমিদার হর কিশোর চৌধুরী। [২৫] বৌদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হতো চট্টগ্রামের অনাথ বাজার /এনায়েত বাজার বৌদ্ধ বিহার বা বর্তমান চট্টগ্রামের নন্দ কানন বৌদ্ধ বিহার ভবন থেকে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল তিন আনা, বার্ষিক দেড় টাকা। [২৬] বৌদ্ধ পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, এই সময় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ প্রচারিনী নামক একটি সমিতি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ ধমীয় গ্রন্থ প্রকাশ।

আবারো

ডা. ভগীরথ চন্দ্র বড়ুয়ার উদ্যোগে সতীশ চন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় আবারো ১৯০৬ সালের দিকে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এটি অল্পকাল পরে বন্ধ হয়ে যায়।

দি মহাবোধি

ভারতবর্ষে অনাগরিক ধর্মপাল কর্তৃক ১৯৯২ সালে মহাবোধি প্রতিষ্ঠিত হয়। [২৭] মহাবোধি সোসাইটির মুখপত্র মাসিক ' দি মহাবোধি' ১৮৯২ সাল থেকে ধর্মপাল মহাথের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। (আত্মঅন্বেষা: বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১৭)

জগজ্জ্যোতি

জগজ্জ্যোতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, পৃষ্টপোষক ও পরিচালক ছিলেন কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬ খ্রি.) এটি ১৯০৮ সালে (১৩১৫ বঙ্গাব্দে) কলিকাতা ধর্মাঙ্কুর সভার (Buddhist Association) মাসিক মুখপত্র হিসেবে কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও অধ্যাপক সমন পুন্নানন্দ সামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠা, প্রচার, বাঙালি বৌদ্ধদের মাঝে ধর্ম শিক্ষাদান, পালি সাহিত্যের বুদ্ধ বাণী ও বৌদ্ধধর্মের গভীরতত্ত্ব বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য অনুবাদ ও প্রচার ছিল জগজ্জ্যোতি পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য। বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্মদর্শন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে অতীত বর্তমান বহু জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক লেখকদের লেখায় জগজ্জ্যোতির প্রতিটি সংখ্যা ছিল ঋদ্ধ, সমৃদ্ধ।[২৮] এরপর সম্পাদনা করেন রমনী রঞ্জন বিদ্যাবিনোদ। [২৯] পরবর্তী ১৯১৭ সালে অধ্যাপক সমণ পুন্নানন্দ সামী (১৮৭০-১৯৩১ খ্রি.) ও প্রখ্যাত বৌদ্ধ মনীষা যুগ্ম সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতি প্রকাশিত হয়। এ সময়টা হলো জগজ্জ্যোতির প্রথম বর্ষ (১৯০৮-১৯২১)। এরপর প্রায় তিন দশক জগজ্জ্যোতির প্রকাশনা বন্ধ ছিল। ১৯৫০ সালে জগজ্জ্যোতির দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশনা শুরু হয় পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর (জন্ম ১৯০৭খ্রি) সম্পাদায়, ড অরবিন্দ বড়ুয়া, জ্ঞানানন্দ ভিক্ষু ও পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের (১৯০১ জন্ম) পৃষ্টপোষকতা প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আবার ১৯৫৮ সালে এটি বন্ধ হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৫৯) আবার প্রায় একযুগ পর ১৯৭০-৭৭ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীপক কুমার বড়ুয়ার (জন্ম-১৯৩৮ খ্রি.) সম্পাদনায় বেঙ্গল বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জগজ্জ্যোতি বার্ষিক স্মৃতি পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয় বর্তমানে ধর্মপাল মহাস্থবিরের (জন্ম- ১৯২৫ খ্রি.) তত্ত্বাবধানে ১৯৮০ সাল থেকে কবি প্রাবন্ধিক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর সুসম্পাদনায় দ্বিবার্ষিক (বাংলা-ইংরেজী) পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে। (প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-১১৮) এ সময়ে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাগুলো রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংখ্যারূপে বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাগুলোর মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর জন্মসহস্র বার্ষিক সংখ্যা (১৯৮৩), ড. বেণীমাধব বড়ুয়া জন্মশত বার্ষিক সংখ্যা (১৯৮৯), কৃপাশরণ মহাসের ১২৫ জন্মবার্ষিক (১৯৯০) ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা (১৯৯১), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কর সভাশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ (১৯৮২-১৯৯২), মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন জন্মশত স্মারক গ্রন্থ (১৯৯৪), জগজ্জ্যোতি: বুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন (১৯৯৫), অশোক ২৩০০ (১৯৯৭), সংঘনায়ক ধমপাল মহাথের অভিনন্দন গ্রন্থ (২০০০), অধ্যাপক কাজুও আজুমা অভিনন্দন গ্রন্থ (২০০১), প্রভৃতি অন্যতম।[৩০]

ব্রহ্ম বাঙালী: বর্মী ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিপ্লবী অজয় সিংহ বড়ুয়া কর্তৃক ১৯৩৯ সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় ব্রহ্ম বাঙ্গালী।

উদয়: ১৯২৪ সালে আবুরখীলবাসী নির্মল চন্দ্র বড়ুয়ার সুসম্পাদনায় উদয় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্বোধি : গজেন্দ্র লাল চৌধুরী রায় বাহাদুর ও ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৯২৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে মাসিক সম্বোধি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটিও কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয় মাত্র।[৩১]

বৌদ্ধবাণী : বৌদ্ধবাণী পত্রিকা চট্টগ্রামের করল নিবাসী নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া ও বৈদ্যপাড়ার নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এটি কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।[৩২]

তরুণ বৌদ্ধ : ১৯২৬ সালে রেঙ্গুন থেকে নগেন্দ্র নাথ বড়ুয়ার সম্পাদনায় বার্ষিক তরুণ বৌদ্ধ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

ছাত্রসংঘ: ছাত্রসংঘ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ মিশন প্রেস রেঙ্গুন থেকে জ্যোতিষ রঞ্জন বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

সংঘশক্তি : অগগ্ মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৮-১৯৭০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন এর মুখপত্র সংঘশক্তি ১৯২৮ সালে সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংঘশক্তির সম্পাদক ছিলেন আর্যবংশ মহাস্থবির (১৮৯৪-১৯৬৮), শীলালংকার মহাস্থবির (১৮৯৯-১৯৯৯) জ্যোতি:পাল মহাথের (১৯১৪-২০০১)[৩৩] রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া[৩৪] প্রমুখ। এটি ১৯৪২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া বলেন, ত্রৈমাসিক সংঘশক্তি ১৯২৯ সালে আশ্বিনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধ মিশনের মুখপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ পায়। এর প্রতিষ্ঠাতা বিনয়াচার্য অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। সংঘশক্তি পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন আর্য বংশ মহাস্থবির। পরবর্তীতে শীলালংকার মহাস্থবির ও দ্বারিকা মোহন মুৎসুদ্দি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সংঘশক্তি পত্রিকায় বৌদ্ধ লেখকদের লেখা স্থান লাভ করত। বৌদ্ধ লেখক সৃষ্টিতেও সংঘশক্তির অনন্য অসাধারণ ভূমিকা সর্বমহলে সমাদৃত। এতে বহু বৌদ্ধ খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ লেখক-সাহিত্যিকরা নিয়মিত বৌদ্ধধর্ম, ধর্মীয় চেতনা, শিক্ষা প্রসার, সমাজ উন্নয়ন ও সংস্কার এবং ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে লিখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যদের বোমার আঘাতে বৌদ্ধ মিশন প্রেস ধ্বংস হয়ে গেলে বৌদ্ধ মিশনে সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়; সে সাথে মুখপত্র সংঘশক্তিও বন্ধ হয়ে যায়। এ যুগেও অধিক কাল ধরে এটা বৌদ্ধদের জাগরণে ভূমিকা রেখেছে, তা বৌদ্ধ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৩৫]

জাগরণী : বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি মুখপত্র 'জাগরণী' ১৯৩৯ সালে কলকাতা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দির সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশকাল ছিল অত্যান্ত স্বল্প।[৩৬]

বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়া : ত্রৈমাসিক 'বুদ্ধিস্ট ইন্ডিয়া' ১৯২৭ সালে রেঙ্গুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার সম্পাদনা প্রথম প্রকাশিত হয়।[৩৭] । পরে বুডিভষ্ট ইন্ডিয়া ১৯৩৪ সালে ড. বেনীমাধব বড়ুয়া ও নেপাল অধিবাসী ধর্মাদিতা ধর্মাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৩৮]

বিশ্ববাণী : ত্রৈমাসিক বিশ্ববাণী পত্রিকা প্রথম ১৯২৭ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত। পরে ১৯৫৪ সালে ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্য ও স্বামী অভেদানন্দ এ পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

বৌদ্ধভারত: ১৯৩৪ সালে ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্য এর সম্পাদনায় বৌদ্ধ ভারত কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কিছু কাল প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্ণিমা : ত্রৈমাসিক পূর্ণিমা ১৯৫১ সালে নলিনীরঞ্জন বড়ুয়া'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর স্থায়িত্বকাল সীমিত।

গৌরিক : ১৯৩৬ সালে রাজমাতা বিনীতা রায়ের পৃষ্টপোষকতায় রাঙ্গামাটি থেকে সাহিত্য পত্রিকা গৌরিক সলিল রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য মানসম্পন্ন লেখায় এটি প্রকাশিত হতো।

বিশ্ববৌদ্ধ : কলিকাতা থেকে 'বিশ্ববৌদ্ধ' ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি পর্যায়ক্রমে সম্পাদনা করেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বাগীশ বন্ধু মুৎসুদ্দি, পরে জ্ঞানতিলক শ্রমণ (অমল বড়ুয়া) ও ড. অরবিন্দ বড়ুয়া। বিশ্ববৌদ্ধ পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু।[৩৯]

কৃষ্টি : বাংলাদেশ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মুখপত্র 'কৃষ্টি' ১৯৫৬ সালে ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এটির প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভার ২৪তম সংঘনায়ক আন্তর্জাতিক সংঘমনীষা সদ্ধর্মভানক শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো (১৯০৯-১৯৯৪)। 'কৃষ্টি' পত্রিকা শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাথেরোর সম্পাদনায় প্রথম ১৯৫৬ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে ঢাকা থেকে কৃষ্টি প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে

Dhaka University Institutional Repository

বিমলেন্দু বড়ুয়ার সম্পাদনার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ পেত। ১৯৭৯ সালে উক্ত পত্রিকা ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া ও সুগতানন্দ মহাথেরোর সম্পাদনার বের হয়। তারপর চট্টগ্রামে এটির সম্পাদনা বন্ধ হয়ে গেলে ঢাকা থেকে অনিয়মিত বের হতে থাকে অনুনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের এর সম্পাদনায়।[৪০] বৌদ্ধ সমাজে প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে এটি সরকারের প্রকাশনা অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত একটি মাসিক সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ক পত্রিকা। বর্তমানেও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি অনুনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথেরোর সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে।[৪১] বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির উপর বাঙালি বৌদ্ধ সহ হিন্দু মুসলিম বিদগ্ধ লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখায় সমৃদ্ধ একটি অন্যতম নিয়মিত মাসিক পত্রিকা। কৃষ্টি পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যা ও স্মারক সংখ্যা পণ্ডিত সমাজে প্রশংসনীয় ও সমাদৃত হয়েছে।

নব সমতট : চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় নব সমতটের প্রতিষ্ঠাতা মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং প্রধান সম্পাদক ধর্মাধিরাজ সুগতানন্দ মহাথের। এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৮১ সালে। কয়েক বছর পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। সুগতানন্দ মহাথের অধুনালুপ্ত মাসিক তক্ষশীলা ও অগ্রসার নিউজ লেটার (সাপ্তাহিক) নামে আরো দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

মিশন দপর্ণ : কলিকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'মিশন দপর্ণ' সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ মিশনের মুখপত্রহ। এটা ১৯৮৭ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুখেন্দু বিকাশ বড়ুয়ার সম্পাদনায়।[৪২]

বুদ্ধ জয়ন্তি বুলেটিন: ত্রিপুরা বুদ্ধ জয়ন্তী কমিটির প্রচার পত্র এটি ১৯৫৬ সাল থেকে কয়েক বছর বুদ্ধ পূর্ণিমার প্রকাশিত হয়েছিল।

নিরঞ্জনা : কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির বাংলা ভাষার মুখপত্র নিরঞ্জনা। বনবিহারী গোস্বামীর সম্পাদনায় এটি ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এর কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন জ্ঞানতিলক ভিক্ষু (অমল বড়ুয়া)।

বিশ্ববাণী : ১৯৫৪ সালে সাপ্তাহিক বিশ্ববাণী ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন সাংবাদিক সাহিত্যিক বিশ্বেশ্বর চৌধুরী। ১৯৬৩ সালের পরবর্তীতে এটি সম্পাদনা করেন শীলব্রত চৌধুরী।[৪৩] **নালন্দা :** কলিকাতা, নালন্দা বিদ্যাভবনের মুখপত্র। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের (জন্ম ১৯০১খ্রি.) সম্পাদনায় এবং কর্মাধ্যক্ষ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের সহায়তায় ১৯৬৬ সালে/১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ত্রৈমাসিক নিয়মিত প্রকাশিত হয়। নালন্দা বৌদ্ধধর্ম ও ভারত সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা।[৪৪] ১৯৭৫ সাল থেকে ড. সুকোমল চৌধুরী এবং ১৯৮৪ সাল থেকে বর্তমান ড. অমল বড়ুয়া সম্পাদনা করছেন। এতে খ্যাতনামা বহু লেখক, সাহিত্যিক প্রাবন্ধিকের লেখা ও কবিতা এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়।[৪৫]

বোধিভারতী : কলকাতা বাঙালী বৌদ্ধ ছাত্র ও যুবকদের ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বোধিভারতী। এর দ্বিবার্ষিক মুখপত্র ড. সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার সম্পাদনায় বোধিভারতী নামে ১৯৭০ সালে প্রথম

নিয়মিত কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৬] ১৯৭৩ সালে ড. সুকোমল চৌধুরী এবং এরপর সমর বড়ুয়া সম্পাদনা করেন। বর্তমান এর সম্পাদক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী।[৪৭] প্রতি বছর ধারাবাহিক ভাবে বাংলা ইংরেজী প্রকাশিত হয়। বোধিভারতী বার্ষিকীতে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক লেখা ছাড়াও গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি প্রখাশ করা হয়। তবে লেখক বৌদ্ধ হওয়া চাই। এটা সার্বজনীন বৌদ্ধ বার্ষিক পত্রিকা বলা হয়।

তরুণ দীপ্তি : বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর উদ্যোগে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে ধনঞ্জয় বড়ুয়া ও দেব প্রসাদ বড়ুয়ার সম্পাদনায় হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'তরুণ দীপ্তি' প্রকাশিত হয়।

বিশ্বমৈত্রী : তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ষাটের দশকে ও স্বাধীনতাত্তোর কয়েকটি সংখ্যা বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মুখ পত্র রূপে চট্টগ্রাম থেকে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সম্পাদনা করেন অরুন বিকাশ বড়ুয়া ও অশোক বড়ুয়া। ১৯৭০ সালে সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়ার সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া। কিছুকাল পর এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়[৪৮]

বুদ্ধবাণী : বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পক্ষ থেকে বদ্ধবাণী চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার থেকে রেবত প্রিয় ভিক্ষুর (ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া) সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪৯]

পারমিতা : সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া ও বিমলেন্দু বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। বর্তমান বিলুপ্ত।[৫০]

শালবন : ইয়ংম্যান্স বুডিডস্ট এসোসিয়েশন কুমিল্লার বার্ষিক স্মরণিকা শালবন প্রকাশিত হয়। কুমিল্লায় ১৯৬১ সালে সম্বোধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাধি: রাঙ্গুনিয়া পোমরা জ্ঞানাঙ্কুর ভাবনা কেন্দ্র এর বার্ষিক মুখপত্র 'সমাধি'। বিদর্শনাচার্য তদন্দ শাসনপ্রিয় থের ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। সমাধি ১৯৯৮ সালে হতে বিপুল জ্যোতি ভিক্ষুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এটি বিদর্শন ভাবনা বিষয়ক বার্ষিক সাময়িকী। এর সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে নিয়মিত।

ঐক্য : সাতকানিয়া-লোহাগড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম এর বার্ষিক মুখপত্র ঐক্য। ১৯৮৯ সালে সংগঠন প্রতিষ্ঠা কাল থেকে ঐক্য প্রকাশিত হয়। এটি বর্ষে বর্ষে গঠিত নির্বাহী পরিষদের সম্পাদক সম্পদনা করেন। সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ, সর্বজনের সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াসে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে ঐক্য এর অগ্রযাত্রা।[৫১]

মোক্ষ : চর্যা প্রকাশনীর বৌদ্ধধর্ম দর্শন বিষয়ক পত্রিকা। এটি ২০০০ সাল থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক কবি ছড়াকার দীপক বড়ুয়া মোক্ষ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

চৈত্যগ্রাম: বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুখপত্র হিসাবে এটি প্রকাশিত হয়। প্রায় তিন দশকের অধিক কাল ধরে বৌদ্ধ সমাজ সংস্কৃতির অনন্য প্রকাশনা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

The Thungran (থাংগ্রেং): রাখাইন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (R.D.F) এর থাং গ্রেং স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকে। এটি প্রকাশিক হয় কক্সবাজার থেকে। সম্পাদক উ কিং মং (২০০৫)।

বহুরূপী : ১৯৩১ সালে পাক্ষিক বহুরূপ বের হয় চট্টগ্রাম থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন এন.সি বড়ুয়া। এক বছরের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৫২]

অর্ঘ্য : বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির বার্ষিক মুখপত্র হিসেবে প্রতি বছর নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ সমিতির মুখপত্র পূর্বে অন্যনামে প্রকাশিত হত। বর্তমানে 'অর্ঘ্য' নামে সৃজন মনন সমাজসেবী শ্রীমান বড়ুয়ার সম্পদনায় প্রকাশিত হয়।

জ্যোতি : পালি বুক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়ার সম্পাদনায় বার্ষিক জ্যোতি ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে জ্যোতি দ্বিবার্ষিক হিসেবে প্রকাশিত হয়।[৫৩] বৌদ্ধধর্ম সমাজ, সংস্কৃতি, গবেষণা মূল সাহিত্যমান সম্পন্ন লেখা সুদীর্ঘ তিনদশক ধরে নিয়মিত প্রখাশিত হয়ে আসছে। (জ্যোতি, ২০০৫, চট্টগ্রাম) স্মারকাটি পণ্ডিত ও সাহিত্যিক সমাজে সমাদৃত হয়েছে বর্তমানে জ্যোতি প্রাবন্ধিক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সলিল বিহারী বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[৫৪] **অনোমা :** ১৯৭৭ সালে অরুণ বিকাশ বড়ুয়ার সম্পাদনায় অনোমা চট্টগ্রাম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে অনোমার সম্পাদক অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া। এটি অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির একটি সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক মুক্ত চিন্তার বার্ষিক পত্রিকা। বিগত তিন দশকে অনোমা বেশ কয়েকটি স্মারক সংকলন ও বর্ষপূর্তি সংখ্যা প্রকাশ করে।

দি ফাউন্ডেশন : বাংলাদেশ বুডিডস্ট ফাউন্ডেশন ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মুখপত্র হিসেবে দি ফাউন্ডেশন নামে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানেও প্রকাশিত হচ্ছে।

মৈত্রীবাণী : পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘের মুখপত্র মৈত্রীবাণী ড. নিরু কুমার চাকমার সম্পাদনায় ১৯৮১ সালে শাক্যমুনি বিহার ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর সম্পাদক ছিলেন বিমল তিষ্য ভিক্ষু।

দীপঙ্কর : বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের বার্ষিক মুখপত্র 'স্মরণিকা' (বর্তমান দীপংকর) ড. সুকোমল বড়ুয়ার সুসম্পাদনায় ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ তিন দশক কাল ধরে ড. বড়ুয়ার চিন্তা চেতনা ও সম্পদনায় বিভিন্ন পণ্ডিত, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কবি-ছড়াকারে কবিতা ও সাহিত্যমান সম্পন্ন বৌদ্ধধর্ম ইতিহাস ঐতিহ্য ও সমাজ সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়। বর্তমান দীপংকর পত্রিকার সম্পাদক রাজীব কান্তি বড়ুয়া।

বৌদ্ধ একাডেমীর জার্নাল : একটি অসাম্প্রদায়িক, সর্বজনীন জার্নাল। ১৯৮৯ সালে সম্পাদক ছিলেন। তপন জ্যোতি বড়ুয়া, ১৯৯৪ সালে সম্পাদক ছিলেন অধ্যক্ষ নীলোৎপল বড়ুয়া। বর্তমানে বৌদ্ধ একাডেমীর জার্নাল, শ্রীমৎ বনশ্রী মহাথেরোর (পরিচালক) তত্ত্বাবধানে অধ্যাপক শিশির বড়ুয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ইংরেজী সংস্করণে সাহিত্য মানসম্পন্ন লেখা নিয়ে সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।[৫৫] **বোধিপত্র :** দশম সংঘরাজ জ্যোতি: পাল মহাথেরোর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম বোধিপত্র সত্তর এর দশকে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বশান্তি প্যাগোড়া : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ ছাত্রদেরদের ছাত্রাবাস হাট হাজারীর বিশ্বশান্তি প্যাগোর মুখপত্র হিসেবে জ্যোতি:পাল মহাথেরোর সম্পাদনায় ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।

সম্বোধি : সম্বোধি পত্রিকা অধ্যাপক প্রিয়তোষ বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৯৯৬ সাল থেকে অনিয়মিত হলেও বৌদ্ধধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মননশীল লেখার প্রকাশিত হয়।[৫৬] **বোধিবার্তা :** বোধিবার্তা ১৯৯৫ সালে মুকুল রতন বড়ুয়া সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বোধিবার্তা বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিকাশে বোধিবার্তা একটি উদ্বোধন।

সৌগত : ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয় এর সম্পাদনায় ১৯৯৬ সালে ঢাকা থেকে সৌগত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। সৌগত এর প্রকাশনায় বিশেষ সংখ্যা ও সাহিত্য ভিত্তিক প্রকাশনা ও প্রকাশিত হয়। এটি মান-সম্পন্ন লেখায় সকলের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সৌগত জ্ঞান, মনন ও বৌদ্ধ চিন্তার একটি অনবদ্য প্রকাশনা।

ময়নামতি : ময়নামতি, পত্রিকা ১৯৯৭ সালে সনৎ কুমার বড়ুয়া সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে সুব্রত বড়ুয়া এটি সম্পাদনা করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি ও পালি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক বিমানচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়া।

চারুলতা : চারুলতা মননশীলতার ত্রৈমাসি পত্রিকা ১৯৯৮ সালে ডা: অসীম রঞ্জন বড়ুয়ার নির্বাহী তত্ত্বাবধানে উত্তমকুমার বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। চারুলতা বর্তমান ২০০৬ থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে সম্পাদনায় আছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক তরুণ গবেষক জগন্নাথ বড়ুয়া। এটি বর্তমানে চারুলতা পরিষদের মুখপত্র হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বৌদ্ধধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজমুখী বহু লেখার চারুলতা পাঠক সমাজে নন্দিত হয়েছে। চারুলতা প্রকাশনার পাশাপাশি প্রতিথযশা বৌদ্ধ গুণিজন সম্মাননা, কৃর্তিমান সংবর্ধনা, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও তরুণ লেখক পুরস্কার, শিশু কিশোর মেধা বিকাশ প্রকল্প এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সম্যক : বৌদ্ধ ধর্মীয় সমাজ সংস্কৃতিমূলক মুখপত্র সম্যক পত্রিকা চট্টগ্রাম থেকে স্বপন কুমার বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৯৯৬ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বহু প্রসিদ্ধ লেখকের লেখায় সুসমৃদ্ধ সৌষ্ঠবে প্রকাশিত ত্রৈম্যাসিক সম্যক পাঠক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অমিতাভ : অমিতাভ ২০০১ সাল থেকে শ্যামল চৌধুরীর সম্পাদনায় নিয়মিত চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এটি বৌদ্ধ সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

মৈত্রেয় : বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি যুব এর মুখপত্র হিসেবে চট্টগ্রাম থেকে বার্ষিক প্রকাশিত হয়। এর স্থায়িত্ব কাল অতি স্বল্প।

নৈরঞ্জনা : বৌদ্ধধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্কারবাদী পত্রিকা হিসেবে ত্রৈমাসিক নৈরঞ্জনা ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকান্ত বড়ুয়া, সম্পাদক মিলন কান্তি বড়ুয়া। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর প্রত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

আর্য্য : ত্রৈমাসিক আর্য্য পত্রিকা ১৯৯৮ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ পায়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রূপব্রত বড়ুয়া। পরে প্রদ্যোত রাসেল এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বর্তমান দীপংকর বড়ুয়া পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ত্রৈমাসিক আর্য্য পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি সরোজ কুমার বড়ুয়া মিল্টন।

ধর্মবংশ : বৌদ্ধধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্রিকা 'ধর্মবংশ' ২০০৩ সালে বি. সুনন্দ থের এর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

মুক্তকথা : দীপক কুমার বড়ুয়া সৃজন সম্পদিত 'মুক্তকথা' ২০০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে।

ত্রিরত্ন : ত্রৈমাসিক 'ত্রিরত্ন ' পত্রিকা ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত।

মুক্তি : বর্তমান ২০০৫ সালে প্রথম যাত্রা ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে। নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয় ও সংবাদ প্রকাশের অঙ্গীকার নিয়ে 'মুক্তি' পথ চলা শুরু করেছে। সম্পাদক প্রদ্যোত রাসেল।

বৌদ্ধ বার্তা : ত্রৈমাসিক প্রবাসী বৌদ্ধবার্তা সাগর বড়ুয়ার সম্পাদনায় ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে পথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

পার্বত্য বাণী : রাঙ্গামাটি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিরাজ মোহন দেওয়ান। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা ত্রিদিব রায়।[৫৭] তিন বছর প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

ঝরণা : সত্তর দশকের শেষ দিকে বান্দরবান থেকে প্রকাশিত হত। ঝরণা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুনীত বিকাশ চাকমা।

ধম্মচক্ক : বাংলা বাইরে দিল্লীতে বৌদ্ধ চিন্তার প্রসারের উদ্দেশ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিক্ষু সত্যপালের সম্পাদনায় ধম্মচক্ক নামে একটি বৌদ্ধ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

কাছে দূরে : কবি সুগত বড়ুয়া সম্পাদিত কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বৌদ্ধ কবিদের কবিতা নিয়ে কাব্য সংকলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, পরে ত্রৈমাসিক হিসেবে বের হতো।

রাখাইন : ত্রৈমাসিক পত্রিকা। কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মং ছিন। পত্রিকাটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত।

উচ্চারণ : বান্দরবান থেকে মারমা ওয়েলফেয়ার এর প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ ও সম্পাদকের নাম জানা যায়নি। বাংলায় প্রকাশিত হত ।

পাত্তলি : চাকমা ভাষায় প্রকাশিত কবিতা পত্রিকা। সম্পাদক বীর কুমার চাকমা। এটি খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত হয়।

চৈত্যগ্রাম : চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত অনিয়মিত পত্র। এটি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

অর্ঘ্য : বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির মুখপাত্র। এটি সদীর্ঘ কাল থেকে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এটি শ্রীমান বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বোধন : ১৯৭২ সালে বৌদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ো স্মরণিকা বোধন পত্রিকা প্রকাশিত হয় বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ সলিল বিহারী বড়ুয়ার সুসম্পাদনায়। এটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

সমুজ্জ্বল সুবাতাস : পাহাড়ি ও সমতলি সংস্কৃতি চর্চায় ছোটো কাগজ ১৯৯০ সাল থেকে বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি একটি রুচিশীল মান সম্পন্ন সাহিত্য পত্রিকা। চৌধুরী বাবুল বড়ুয়া ও হাফিজ রশিদ খান এটি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেন।

বোধিচরিয় : কোলকাতার শিশু করুনা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বিমল তিষ্য ভিক্ষুর উদ্যোগে বোধিচরিয়া পত্রিকা ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রজ্ঞা : আসামের ডিব্রুগড় থেকে রতন বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়। এটি আসাম বড়ুয়া বৌদ্ধ ফেডারেশনের মুখপাত্র। [৫৯]

কণিকা : ধর্মরাজিক সাহিত্য আসর, ঢাকা এর সাহিত্য পত্রিকা ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হতো আশির দশকে এটি শিশু কিশোরদের একটি সুখপাঠ ছিল। এর মূল কার্যালয় ছিল ধর্মরাজিক মহাবিহার। বর্তমানে কণিকা প্রকাশিত হয় না; অনিয়মিত এর উদ্যোগে দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়।

অন্তিকা : অন্তিকা মাসিক পত্রিকা সাহিত্যিক সত্য প্রসন্ন বড়ুয়ার সম্পাদনার প্রঞ্চাশের দশক থেকে বেশ কিছু কাল প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। বর্তমানেও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। [৬০] এ পত্রিকায় ধর্মীয় লেখা ছাড়াও প্রকাশ পেত অন্যান্য গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা। মুদ্রিত হতো অন্তিকা প্রেস চট্টগ্রাম থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

মৈত্রী : মৈত্রী মাসিক সাহিত্য পত্রিকারূপে চট্টগ্রাম থেকে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৭ সালে। প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের। সম্পাদক ছিলেন কর্মবীর সুগতানন্দ মহাথের (১৯৩৩-২০০৫)। এটির আয়ুকাল ছিল স্বল্প।

ধর্মায়তন : সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক নিয়মিত প্রচারিত বার্ষিক পত্রিকা। এটি শিশু কিশোরদের উৎকৃষ্ট পত্রিকা।

বোধি : বোধি আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র এর মুখপত্র এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২৫৪৪ বুদ্ধাব্দ, ২০০১ সালে চট্টগ্রামে। এই বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক ও সভাপতি বিদর্শনাচার্য শ্রী তেমিয়ব্রত বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক সাধক আশীষ বড়ুয়া, তত্ত্বাবধানে সম্পাদক সাধক শুভাশীষ বড়ুয়া সম্পাদনায় নিয়মিত বোধি প্রকাশিত হয়।

প্রদীপ্ত : পূর্ণাচার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, দেবপাহাড় চট্টগ্রাম এর বার্ষিক মুখপত্র প্রদীপ্ত। সুদীর্ঘকাল থেকে শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাথের এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্বাহী কমিটির পক্ষে চন্দ্রজ্যোতি শ্রামণ (২০০৩) এটি সম্পাদন করেন।

ঐতিহ্য : বাংলাদেশ সংঘরা ভিক্ষু মহাসভা'র মুখপত্র হিসেবে ঐতিহ্য প্রকাশিত হয়। সংগঠনের পক্ষে ড. জিনবোধি ভিক্ষু (২০০১) ঐতিহ্য সম্পাদনা করেন। এটি চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ধর্ম, সমাজ, সংগঠন ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়।

সমাধি : এটি সম্পাদনা করেন ভিক্ষু ধর্মালংকার। বর্তমানে পোমরা জ্ঞানাঙ্কুর ভাবনা কেন্দ্র, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

সম্যক সদ্ধর্ম সাধনা : এ সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রকৌ. মৃণাল কান্তি বড়ুয়া। এটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

চারিকং : এটি সম্পাদনা করেন শাসন রক্ষিত ভিক্ষু। এটি বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধাণা কেন্দ্র কমপ্লেক্স এর বার্ষিক মুখপত্র, কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা ও প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পটিয়া সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম পলি টেকনিকেল ইন্সটিটিউট ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও স্মরণিকা নিয়মিত প্রকাশ করে থাকে। কম্পিউটার ও মুদ্রণ শিল্পের অগ্রগতির কারণে পত্রিকা নতুন আকর্ষণীয় আঙ্গিকে প্রকাশ করে।

শরণ : চট্টগ্রাম সিটি কলেজ বৌদ্ধ ছাত্র সংঘ (১৩৭৪ বাংলা) বাদল চৌধুরী সম্পাদিত একটি অনবদ্য এবং সর্বপ্রথম (?) ছাত্র সংগঠন প্রকাশনা। [৩১]

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতিকা : চট্টগ্রাম কলেজের বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র। চট্টগ্রাম কলেজে পালি শিক্ষার প্রবর্তনে ভূমিকা রাখেন ডা. ভাগীরথ বড়ুয়া ১৯০৫ খ্রি.। চট্টগ্রাম কলেজের প্রথম অধ্যাপক ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ ভিক্ষু। ১৯০৮ সালে চট্টগাম কলেজের পালি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন ধর্মবংশ মহাস্থবির, এ বছর মহিমারঞ্জন বড়ুয়াও পালির শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এর পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া পিন্সিপাল হিসেবে কলেজে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় জ্যোতিকা সাময়িকী প্রকাশিত হয়।[৬২] দীর্ঘদিন ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে জ্যোতিকা সঞ্চালিত হয়েছে। বর্তমানে অর্থদর্শী বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখাপত্র হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হয় হচ্ছে।

সৌম্য : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের 'মুখপত্র'। সৌম্য বার্ষিক মুখপত্র হিসেবে ১৯৮৮ সালে সম্পাদনা করেন গীতাঞ্জলি বড়ুয়া। প্রকৃত পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ছাত্র ছাত্রীদের উদ্যোগে বিভিন্ন পূর্ণিমা ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে সত্তর এর দশক থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ সালে প্রথম ম্যাগাজিন সম্পাদক ছিলেন সনজয় বড়ুয়া। বার্ষিক সৌম্য বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এটি নিয়মিত সংগঠনের সাহিত্য সম্পাদক সম্পাদনা করেন। সর্বশেষ ২০০৫ সালে সম্পাদক ছিলেন অমিত বড়ুয়া।

প্রজ্ঞা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র। এটি ১৯৯০ সাল থেকে বার্ষিক প্রকাশিত হয়। প্রজ্ঞা'র প্রথম থেকে নিয়মিত সাহিত্য সম্পাদক সম্পাদনা করেন। ২০০৪ সালে সম্পাদক ছিলেন- নিবেদিতা বড়ুয়া। এটি বিশেষ করে সম্পাদনা পরিষদের সদস্য দ্বারা সম্পাদিত হয়।

গৈরিক : চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের বার্ষিক মুখপত্র। ১৯৭৬ সাল থেকে গৈরিক চট্টগ্রাম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। গৈরিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন গকুল বড়ুয়া। বর্তমানেও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

সারথী : পটিয়া সরকারী কলেজ বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ এর বার্ষিক স্মরণিকা সারথী। এটি প্রতি বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়। সারথী (২০০০) সম্পাদনা করেন হোটন বড়ুয়া।

পারমী : চট্টগ্রাম পলি টেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদ মুখপত্র পারমী। এটি অনিয়মিত প্রকাশ পায়।

স্বস্তিকা : চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ বার্ষিক স্মরণিকা। ১৯৯১ ও ১৯৯২ নিয়মিত প্রকাশের পর বর্তমান অনিয়মিত প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও নির্বাণ, কিশালয়, অহিংসা সিদ্ধার্থ, দিগদর্শী, সাপ্তাহিক বনভূমি, দপর্ণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা। প্রায় একশ পঁচিশ বছরের অধিক কাল ধরে (১৮৮৪-২০০৬) বৌদ্ধরা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সংগঠনের মুখপত্র হিসেবে স্বউদ্যোগে অসংখ্য পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করে আসছে। এ সুদীর্ঘ প্রকাশনার ইতিহাসে বহু লেখক, সাহিত্যিক, কবি, ছড়াকার সাংবাদিক,

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক, সংগঠক ও সংস্কৃতি সেবীর আবির্ভাব ঘটেছে বৌদ্ধ সমাজে, ইহা আমাদের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে; গৌরবান্বিত করেছে। বর্তমানে বেড়েছে লেখক, পাঠক, সংগঠন, বাড়ছে পত্র পত্রিকা-সাময়িকী এবং বৃদ্ধি পায়নি প্রকাশনার মান ও উৎকর্ষতা। সৃষ্টি হয়নি জাতীয় সংগঠন, জাতীয় প্রকাশনা। চলমান বৌদ্ধ ইতিহাসে অতীত বর্তমানের সেতুবন্ধন এ সকল পত্র পত্রিকার জাগরণী ভূমিকা ও সঞ্চালন অতীব প্রশংসার্হ। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি ও সংগঠন ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনা থাকলেও আজোও পর্যন্ত বৌদ্ধ সমাজে স্বীকৃতি মানের কোন জাতীয় পত্রিকা নেই; নেই কোন গবেষণা জার্ণাল। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অথচ বর্তমান বৌদ্ধ সমাজ পূর্বাপেক্ষা অর্থ-বিত্তে, শিক্ষা-দীক্ষা এবং উন্নয়ন সচেতনায় কম্পিউটার ও প্রচার মুদ্রণে অনেক উন্নতি ও এগিয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট। এ কল্যাণ ট্রাস্ট বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ বিহার ও সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিন যাবৎ বৌদ্ধদের জন্য সপ্তপর্নী নামে একটি সাহিত্য, গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বর্তমানে তা ফাইল বন্দী হয়ে আছে। এ গবেষণা পত্রিকার প্রকাশ বৌদ্ধধর্ম ও সমাজে জন্য অত্যন্ত জরুরী। আজ সময়ের দাবি বৌদ্ধ সমাজে একটি মানসম্মত নিরপেক্ষ ধর্ম, সমাজ, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক জাতীয় পত্রিকা এবং স্বীকৃতি মানের গবেষণা পত্রিকা।

পত্র-পত্রিকার উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, বৌদ্ধ সমাজে বিগত সোয়াশত বছরের অধি সময়ে বৌদ্ধধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সংগঠনে মুখপত্র হিসেবে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিকবহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হয়েছে এবং হচ্ছে। তন্মোধ্যে অধিকাংশ পত্রিকার প্রকাশ কাল অত্যন্ত সীমিত; কয়েক সংখ্যা বা কয়েক বছর প্রকাশর পর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। দু'একটি পত্রিকা শুধুমাত্র দীর্ঘকাল দরে প্রকাশনা ও মান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাকী সব পত্রিকা ও সাময়িকী পরিকল্পনা বিহীনভাবে বিহনী প্রকাশিত হচ্ছে এবং স্বরূপ সময়ে বন্ধ হয়ে গেছে। দেশ বিভাগের পূর্বে মায়ানমার রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত সংঘশক্তি কিংবা কলিকাতা থেকে প্রকাশিত জগজ্জ্যোতি, বোধিভারতী, নালন্দা পত্রিকার মতো বর্তমান মানে বাংলাদেশে কোন পত্রিকার আঙ্গিক গড়ে উঠেনি। দেশ বিভাগের পর কিংবা বাংলাদেশ স্বাধীনতোত্তর। তবে বর্তমান প্রকাশনার মধ্যে আনোমা, কৃষ্টি, জ্যোতি, দীপঙ্কর উল্লেখযোগ্য।[৩৬] বৌদ্ধ সমাজের এই মুখপত্রগুলি ছাড়াও পাশাপাশি বিভিন্ন দৈনিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্র পত্রিকায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে এবং নিয়মিত হচ্ছে। তবে মোটের উপর বলা যায় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতিচর্চা যে বেড়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ভিত্তিক জাতিগত মানস গঠনে বৌদ্ধ সমাজের গতিশীল প্রকাশনা ও সাধু প্রয়াস অব্যাহত থাকুক; সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা প্রসারিত হোক। তৎকালিন বৌদ্ধ বন্ধু বৌদ্ধ পত্রিকার একটি আলোচনা সংকলন করা হলো।[৬৪]

৬.৩ বাংলাদেশে বৌদ্ধ সাংঘিক মনীষার মায়ানমার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি লাভ

ব্রহ্মদেশ মায়ানমার থেরবাদ বৌদ্ধদের অন্যতম একটি দেশ। ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিক্ষক ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রতি বছর উপাধিগুলো প্রদান করে থাকে। বিশ্ববৌদ্ধ সংঘমনীষাদের ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বহুমুখী অবদানের জন্য এ উপাধি প্রদান করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্মানজনক উপাধি।

মায়ানমার সরকার যে বিষয়ের উপর বিভিন্ন উপাধি প্রদান করা হয়। যেমন- ১) পাণ্ডিত্য ২) সাহিত্যিক ৩) শিক্ষক ৪) ভাবনা (ধ্যান) ৫) সমাজ ও বৌদ্ধ শাসনের উন্নয়ন ৬) চিকিৎসক এবং ৭) বয়োবৃদ্ধদের প্রতি বছর উপাধিগুলো প্রদান করে থাকে।

যে উপাধিগুলো দেওয়া হয়:

১। অগ্গ মহাপণ্ডিত সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ

২। অগ্গ মহাপণ্ডিত

৩। অগ্গ মহাশাসন জ্যোতিকা ধ্বজ

৪। অগ্গ মহাপ্রাণ্ডিত আচারিয ধ্বজ

৫। অগ্গ মহাসদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ

৬) সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ সহ অনেক উপাধি প্রতি বছর মার্চ এপ্রিলের মধ্যে প্রদান করে থাকেন।

আবেদন করার সময় ও প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ: সাধারণত উপাধিগুলো পাওয়ার জন্য প্রতি বছর জুন-জুলাই মধ্যে নিজ দেশের অবস্থানরত মায়ানমার রাষ্ট্রদূত বরাবর আবেদন করতে হয়। আবেদন করার সময় (ক) সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণজীবন বৃত্তান্ত খ) যে কোন বিষয়ের উপর নিজ লেখার বই এর কতার পৃষ্ঠা ফটোকপি এবং সে বই গুলো, গ) ৬"×৪" সাদা কালো ছবি ৩ কপি, ঘ) ৬"×১১/২" সাদা কালো ছবি ৩ কপি সহ তার পক্ষ হয়ে অন্য কেউ আবেদন করতে পারেন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে ২য় সপ্তাহে কারা কোন দেশ থেকে কি উপাধি পেল তা দেশের টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। বিশ্ববৌদ্ধ সমাজ ও ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রচার প্রসার ও জাতির শিক্ষা দীক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নে এ রাষ্ট্রীয় সম্মান ও উপাধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুগণ ইতিহাসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিগত ১৯২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন পণ্ডিত মনীষীরা এ উপাধি পেয়ে আসছেন। সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্যায়ক্রমে তাঁদের জন্ম কর্মস্থল, জীবন, প্রাপ্ত উপাধির নাম গুলো তোলে ধরা হলো :

১। পণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির, অধ্যক্ষ (প্রথম অধ্যক্ষ), চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম। জন্ম: ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭২ ইং, বৌবাজার, কলিকাতা, ভারত, মহাপ্রয়ান: ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ইং, সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম উপাধি প্রাপ্তি: ১৯২৭ সাল, উপাধির নাম: অগ্গ মহাপণ্ডিত।

বিশিষ্ট গবেষক ও শিক্ষানুরাগী, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট ও চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের প্রথম প্রভাষক। শিক্ষাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাননীয় ধর্মবংশ মহাস্থবিরকে মায়ানমার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় উপাধি, অগ্গ মহাপণ্ডিত, তাঁর কর্মদক্ষতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এ উপাধি প্রদান করেন।[৬৫] তিনি ১৮৯০ সালে বৌবাজার নবীন বিহারে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৯২ সালে মৌলমেন বৈজয়ন্তী বিহারের অধ্যক্ষ উঃ সাগর মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি বিদ্বান, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ হিতৈষী সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

২। পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাথের, অধ্যক্ষ, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার ও সভা, কলিকাতা, ভারত তাঁর

জন্ম: ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ, বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম এবং মহাপ্রয়ান: ১১ মে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে উপাধি প্রাপ্তি: ১ জানুয়ারী ১৯৫৪ সাল, উপাধির নাম: অগ্গমহা পণ্ডিত।

১৯০০ সালে তিনি আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে আসেন এবং স্বগ্রামের শাক্যমুনি বিহারে শ্রামণ্য ও উপসম্পদা লাভ করেন। সুপণ্ডিত, বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও বহুগ্রন্থের অনুবাদক, ৬ষ্ঠ সংগীতি কারক, 'রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস' এর প্রতিষ্ঠা (১৯২৮), 'সংঘশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরকে মায়ানমার (বার্মা) বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে অগ্গমহাপণ্ডিত উপাধি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদান করা হয়।

এছাড়া তাঁকে ১৯৩১ সালে ৩১ ডিসেম্বর মিয়ানমার ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক বুদ্ধ শাসনবীর্যস্তম্ভ, শাসন ধ্বজ উপাধি প্রদান করা হয়।[৬৬] তার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ- ধর্মপদ, ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, দান মঞ্জুরী, রত্নমালা বিশোধন, কুড়ি সহস্রাধিক পালি-বাংলা অভিধান, মিলিন্দপ্রশ্ন, থেরগাথা (১৩৩৫), লোকনীতি (১৯৩২) তেলকটাহ গাথা, বুদ্ধের যোগনীতি, বির্দশন ভাবনা ও সুত্ত বিভঙ্গ (সম্পাদনা) ধর্ম সংহিতা, সুত্তনিপাত, বুদ্ধের ধর্ম পরিচয়।

৩। ভদন্ত উ পণ্ডিতা মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি। তাঁর জন্ম: ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৯০২ ইংরেজী, গ্রাম: চিৎমরম বড়পাড়া, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি। উপাধি লাভ: ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী, উপাধি নাম: অগ্গমহা সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে মহান সংঘমনীষার মহাপ্রয়ান হয়।

উপণ্ডিতা মহাস্থবির একজন আদর্শবান ন্যায় পরায়ণ বিনয়শীল, সদাচারী সদ্ধর্ম সেবক ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালে ২রা মার্চ প্রব্রজা ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সূত্র বিনয় ও অভিধর্মের উপর শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে ৫ ই মার্চ উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মারমা বৌদ্ধ সমাজের এবং ভিক্ষুকূলের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ভিক্ষু ছিলেন। পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বিনয় ও ধর্ম প্রচারে অসামান্য অবদানের জন্য মায়ানমার সরকার তাঁকে এ উপাধি প্রদান করেন।

৪। অষ্টম সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, শান্তিধাম বৌদ্ধ বিহার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। তাঁর জন্ম: ২১ শে জুন ১৯০০ ইংরেজী, গ্রাম: নানুপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম। উপাধি লাভ: ১৯৯৯ সালে, উপাধি নাম: অগ্গমহা সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ, তাঁর মহাপ্রয়ান হয় ২৩ শে মার্চ ২০০০ সালে।

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নানুপুর গ্রামের জয়ধন বড়ুয়া ও শ্যামাবর্তী বড়ুয়ার দ্বিতীয় সন্তান সহদেব বড়ুয়া ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের নির্দেশে আরাকানিজ পণ্ডিত ভিক্ষু উ. সুমঙ্গল স্থবির সহদেব বড়ুয়াকে প্রব্রজ্যা প্রদান করে নাম রাখেন শীলালংকার। ১৯২১ সালে নভেম্বর বার্মার সোয়েজাদি বিহার সীমায় অধ্যক্ষ উ তেজারাম মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষার্থে শ্রীলংকা গমন করেন। তিনি ১৯২৮ সালে রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস ও সংঘশক্তি পত্রিকার দায়িত্ব ও বিহারধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে বৈদ্যপাড়া শাক্যমুণি বিহারের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৬৭ সাল থেকে আমৃত্যু হাটহাজারীর মির্জাপুর শান্তি ধাম বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন।[৬৭] শীলালংকার মহাথের (১৯০০-২০০০) শতাব্দীব্যাপী ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এবং থেরবাদী আদর্শ প্রচারে অসামান্য অবদান রাখেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৯৯ সালে মায়ানমার সরকার তাঁকে অগগ্মহা সদ্ধম্ম জ্যোতিকাধবজ উপাধিতে ভূষিত করেন। ২০০০ সালের ২৬ মার্চ তাঁর শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা সংঘরাজ শীলালঙ্কারকে মরণোত্তর "অগগ্মহা পণ্ডিত' অভিধায় ভূষিত করেন।

১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরুর হিসেবে সংঘরাজ এবং সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সভাপতি পদ লাভ করেন। ১৯৮২ সালে এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে শ্রীলংকা থেকে প্রকাশিত The World Buddhist Directory তে সংঘরাজের জীবনপঞ্জী প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত শাসন ও সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন, ১৯৯৬ সালে প্রজ্ঞালোক জিনবংশ স্বর্ণপদক লাভ, ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক শান্তিতে গুণীজন সম্মাননা ক্রেস্ট লাভ করেন।[৬৮] ১৯৯৬ সালে ২৪ জুন মহামান্য সংঘরাজ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মায়ানমার সরকার তাঁকে 'অগ্‌গমহা সদ্ধম্ম জ্যোতিকা ধ্বজ' উপাধি প্রদান করেন। ২০০০ সালে ১২ মার্চ ভিক্ষু মহাসভা কর্তৃক অগ্‌গ মহাপণ্ডিত উপাধি লাভ করেন। ২৩ শে মার্চ ২০০০ শতাব্দীর কৃতিপুরুষ অষ্টম সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবিরের মহাপ্রয়ান হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলো-রাহুল চরিত (১৯৩১), অজাতশত্রু (১৯৩২), ধর্মপদার্থকথা (১৯৪৩) পারাজিকা (১৯৩৭), বিমানবত্থু (১৯৩৮), জীবক (১৯৬৪), বৌদ্ধ নীতি মঞ্জুরী (১৯৬৫), আনন্দ (১৯৬৭), বিশাখা (১৯৭১), বুদ্ধযুগে বৌদ্ধনারী (১৯৯০), মোট ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

৫। ভদন্ত উ সুমঙ্গল মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, বান্দরবান উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবান, পার্বত্য জেলা। জন্ম: বান্দরবান জেলা, উপাধি লাভ: ২০০০ ইংরেজী, উপাধি নাম: অগ্‌গ মহাসদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ। পণ্ডিত উ সুমঙ্গল শতাধিক বৎসর বয়সে মহাস্থবির মহোদয় বান্দরবান জেলার উজানীপাড়া বৌদ্ধ বিহারে সুদীর্ঘকাল অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন। বর্ষিয়ান সংঘমনীষা মারমা বৌদ্ধ সমাজের তথা বৌদ্ধ ভিক্ষুকূলে একজন শীলবান প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু। প্রবীণ অবস্থায়ও তিনি এখনো বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের উন্নয়নে কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন।

৬। ভদন্ত দশম সংঘরাজ জ্যোতি:পাল মহাথের, অধ্যক্ষ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। তাঁর জন্ম: ৫ই জানুয়ারী, ১৯১৪ সালে, গ্রাম: কেমতলী, লাকসাম, কুমিল্লা। উপাধি লাভ: ২০০১ সাল, উপাধি নাম: অগ্‌গমহা সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ, এ মহান সংঘপুরুষ ১২ এপ্রিল ২০০২ সালে মহাপ্রয়ান লাভ করেন। বহুমুখী গুণের অধিকারী পণ্ডিত জ্যোতি:পাল মহাথের ১৯৩২ সালে গুণালংকারের মহাস্থবির উপাধ্যায়ত্বে শ্রামণ্য গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ সালের ১৪ জুলাই উপসম্পদা লাভ করেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা মুক্তিযোদ্ধা দশম সংঘরাজ জ্যোতিপাল মহাথের মহোদয় ১২ এপ্রিল বোম্বাই একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের বিকাশে কাজ করেছেন। তিনি বাঙালি বৌদ্ধ সমাজকে বিশ্ব অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন।

পণ্ডিত, গ্রন্থপ্রণেতা ও অনুবাদক, বিশ্বশান্তি প্যাগোড়া চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বরইগাঁও কমপ্লেক্স এর প্রতিষ্ঠাতা, ভদন্ত জ্যোতি:পাল মহাথের স্বাধীনতার পর শিক্ষা, শান্তি, সাহিত্য ও সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য ১৯৭৯ সনে এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা মঙ্গোলিয়া কর্তৃক আন্তর্জাতিক শান্তিস্বর্ণ পদক লাভ করেন।[৬৯] তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ: বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা (১৯৬১), পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি (১৯৬৩), বোধিচর্যাবতার (১৯৭৭), ব্রহ্মবিহার, পঞ্ঞাভূমি নিদ্দেস (১৯৮১) (সানুবাদ), কর্মতত্ত্ব (১৯৫৫), সাধনার অন্তরায়, (১৯৭৮), ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন (১৯৮৪), রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি (১৯৬৮), বাংলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম (১৯৭৬), মালয়েশিয়া ভ্রমণ (১৯৬৮), গুরুদেব গুণালংকার (জীবনী) (১৯৮৫), চর্যাপদ (১৯৯১), ভক্তিশতকম (১৯৯৯)।

Dhaka University Institutional Repository

৭। ভদন্ত উ কোসলা মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, কমলছড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহার, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, জন্ম: ৫ জুন ১৯০৭ ইংরেজী, গ্রাম: ছাংখ্যা সেদাই পাড়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি

উপাধি লাভ: ২০০২ ইংরেজী, উপাধির নাম: অগ্‌গমহা সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ, মহাপ্রয়ান: ৬ আগষ্ট ২০০২ ইংরেজী।

উ কোসলা মহাস্থবির একজন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শীলগুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম মারমা সম্প্রদায়ের ৬ষ্ঠ তম সংঘরাজ ছিলেন। পণ্ডিত মহাস্থবির সমাজ ও ধর্মের জন্য বহু অবদান রাখতে সক্ষম হন। তিনি নিজ বিহারে ৬ আগষ্ট ২০০২ সালে পরলোক গমন করেন। ধর্মভান্ত ারিক ও সদ্ধর্ম প্রাণ পণ্ডিত উ কোসলা মারমা সমাজ ও ভিক্ষু একজন নন্দিত ও পণ্ডিত ধর্মসেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৮। ভদন্ত উ পঞ্ঞা জোত থের, অধ্যক্ষ, বান্দরবান রাজ বিহার, বান্দরবান, জন্ম: ২১ ডিসেম্বর ১৯৫৫ ইংরেজী, গ্রাম: বান্দরবান, পাবর্ত্য জেলা, উপাধিলাভ: ২০০২ ইংরেজী, উপাধিরনাম: সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ। শ্রদ্ধেয় থের মহোদয় একজন রাজবংশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহী জীবন অবস্থায় জজের চাকুরী পদ থেকে ত্যাগ করে ১৯৯০ সালে ৭ই জুন প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ সালে উপদাম্প লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধগৃহী সমাজে ধর্ম প্রচার ও প্রসাবে এবং মানব কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বান্দবান মহাপূরক জাদী দৃষ্টিদর্শন রূপে তৈরি করেছেন। এটি বাংলাদেশে বৌদ্ধতীর্থ স্থানে রূপলাভ করেছে। তাঁর সম্প্রতি 'গুরুভন্তের সদ্ধর্ম দেশনা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

৯। শ্রীমৎ সত্যপ্রিয় মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, রামু সীমা বিহার, রামু, কক্সবাজার জন্ম: ১০ ই জুন ১৯৩০ ইংরেজী, গ্রাম: মেরোংলোয়া, রামু, কক্সবাজার, উপাধি লাভ: ২০০৩ ইংরেজী, উপাধিরনাম: অগ্‌গ মহা সদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ। বহুগ্রন্থের প্রণেতা পণ্ডিত সত্যপ্রিয় মহাথের ১৯৫০ সালে শ্রামণ্য ধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাঙালি বৌদ্ধ সমাজে একজন মহানসংঘমনীষা। বিনয়শীল ও অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, চিন্তাশীল, বিনয়ী, সদালাপী এবং অভিধর্ম দিশারী। তিনি বহু ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের ষষ্ঠ সংগীতি সভায় যোগদান করেন। বর্তমান বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের কল্যাণে দক্ষিণ চট্টলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের নিবেদিত প্রাণ সাংঘিক ভিক্ষু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে তাঁর অভিধর্ম তাত্ত্বিক গ্রন্থ 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ স্বরূপ দীপনী' প্রকাশিত হয়। বিনয়াচার্য আর্যবংশ গ্রন্থ এবং রাঙ্গামাটি বনভন্তের প্রকাশনী থেকে বিনয় পিটকের 'চুল্লবর্গ' গ্রন্থ অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০। ভদন্ত দ্বাদশ সংঘরাজ ধর্মসেন মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার, পাটিয়া, চট্টগ্রাম। জন্ম: ১৩ জুন ১৯২৮ সাল, গ্রাম: উনাইনপুরা, পাটিয়া, চট্টগ্রাম। উপাধি লাভঃ ২০০৪ ইংরেজী, উপাধির নাম: অগ্গ মহাসদ্ধর্ম জ্যোতিকা ধ্বজ। সংঘরাজ মহোদয় ১৯৪২ সালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সালে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর মহাথেরর উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা লাভ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের স্বনামধন্য বৌদ্ধ সংঘমণীষা। তিনি বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের মঙ্গল, জাতির উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও বিকাশে সুদীর্ঘকাল বিভিন্নভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু। তিনি ভিক্ষু ও গৃহীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও বিনয়শীলতার জন্য 'ত্রিরত্ন বন্দনা' গ্রন্থ রচনা করেন।

১১। ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের, সভাপতি ও বিদর্শনাচার্য, আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র-বুদ্ধগয়া, গয়া, বিহার, ভারত জন্ম: শীলকুপ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম উপাধি লাভঃ ৫ মার্চ ২০০৪, উপাধির নাম: অগ্গমহা সদ্ধর্ম জ্যোতিক ধ্বজ। মায়ানমার (বার্মা) সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রের সভাপতি এবং বিদর্শনাচার্য, বহু গ্রন্থ প্রণেতা শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক ও গবেষক ড. রাষ্ট্রপাল মহাথেরকে ৫ মার্চ ২০০৪ তারিখে রেঙ্গুনে সম্মান জনকভাবে অগ্গমহা সদ্ধম্ম জ্যোতিক ধ্বজ সর্বোচ্চ ধর্মীয় উপাধি মায়ানমার সরকার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ভাবে পণ্ডিত ভিক্ষু হিসেবে জনপ্রিয় এবং বাংলা-ভারত উভয়ে একজন বিদর্শনাচার্য ও পণ্ডিত সাংঘিক ভিক্ষু হিসেবে পরিচিত। তিনি ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার ভূষিত করে।

উপরে উল্লেখিত বাংলার বৌদ্ধ সাংঘিক দিক পাল ও পণ্ডিত মনীষীদের যেভাবে উপাধি প্রদান করে থাকেন তেমনিভাবে ভবিষ্যতে ও মায়ানমার সরকার বাংলাদেশের মনীষীদের উপাধি প্রদান করবেন এই প্রত্যাশা করি। বাংলাদেশ ও মায়ানমার অতীতে যেভাবে সেতু বন্ধনস্বরূপ ছিল ভবিষ্যতেও অটুট থাকুক।

রাষ্ট্রীয় একুশে পদক লাভ

একুশে পদক একটি গৌরবময় ও মহান সম্মানজনক পুরস্কার। প্রতি বছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একুশে পদক প্রদান করেন । বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশী জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা, গবেষণা, শিল্পী, সাংবাদিক, সমাজসেবা, সাংগঠনিক সহ প্রভৃতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য আদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদত্ত পদকগুলোর মধ্যে একুশে পদক অন্যতম। পুরস্কারের মান তিন ভরি ওজনের স্বর্ণপদক ও ৪০ হাজার টাকা এবং একটি সার্টিফিকেট।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে এ পর্যন্ত যাঁরা এই অনন্য অসাধারণ মহান একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ২০০১ সালে কবিয়াল ফণী বড়ুয়া, ২০০২ সালে শিক্ষাবিদ প্রতিভা মুৎসুদ্দি, ২০০৪ সালে মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং ২০০৮ সালে প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া। তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্মাবদান আলোকপাত করা হলো:

কবিয়াল ফণী বড়ুয়া

ফণী বড়ুয়া একজন প্রতিথ যশা বাংলার খ্যাতিমান কবিয়াল, সংস্কৃতিপ্রেমী এবং জাগরণের কবি। তিনি ১৯১৫/১৬ সালে চট্টগ্রামের রাউজানে পাঁচ খাইনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০১ সালে ২২ জুন ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পিতা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নন্দকুমার বড়ুয়া, মাতা শ্যামা বড়ুয়া। কবিয়াল ফণী বড়ুয়ার পাঁচ ছেলে ও দু'মেয়ে, সহধর্মীনি সুরুচি বড়ুয়া। তাঁর বিশ্ববীক্ষা, স্বদেশ প্রেম, মানবতা, ইতিহাস চেতনা, আধুনিক মনস্কতা, যুগসচেতনতা, শ্রেণীচেতনা, মানব বন্দনা, জাগরণ ও সংগ্রামী ভূমিকা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, সর্বোপরি গণমানুষের জীবনমুখী আন্দোলন কবি ও কবিগানের কিংবদন্তী মহানায়ক হিসেবে চিরকাল উজ্জ্বল। রমেশ শীলের সমকালীন এবং এ সময়োত্তর বৌদ্ধ সমাজ তথা উপমহাদেশের বিস্ময়কর এক কবি ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি দেদীপ্যমান। শুধু তাই নয়, বাংলার গণমুখী লোকগান ও লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে ফণী বড়ুয়া চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কবিয়াল ফণী বড়ুয়া আমাদের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকার। বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোককবি ফণী বড়ুয়া বৌদ্ধদের গর্ব।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাস্টার সূর্যসেন, প্রীতিলতা, কবিয়াল সম্রাট রমেশ শীল সমকালীন স্বশিক্ষিত (প্রাইমারী তৃতীয় শ্রেণী) অনন্য প্রতিভাধর কবিয়াল ফণী বড়ুয়া। কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ প্রশংসা ছড়িয়েছেন; কর্ম জীবনে তিনি ছিলেন ঘড়ি মেকানিক এবং পেশাধার কবিয়াল। ১৯৩৮ সালে গঠিত কবিয়ালদের সংগঠন 'রমেশ উদ্বোধন কবি সংঘ' এর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৪৩ সালে গঠিত 'চট্টগ্রাম জেলা কবি সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক। চট্টগ্রাম উদীচীর উপদেষ্টা ছিলেন। চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মাননা, 'সম্মানিত সদস্যপদ' প্রদান করে। ২০০১ সালে ১৫ জানুয়ারীতে শৈবাল চৌধুরী পরিচালিত ও চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্র নিবেদিত ফণী বড়ুয়ার জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র 'দীপ্ত পদাবলী' নির্মিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালে ২০ ফেব্রুয়ারী তাঁর সারা জীবন ব্যাপী লোকসংস্কৃতি, লোকগান, স্বদেশীকতা, স্বাধীনতা, প্রগতিশীল ভাবধারা, গণমানুষের মুক্তির সংগ্রাম কবিগানের মাধ্যমে অনন্য অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন।

কবিয়াল ফণী বড়ুয়ার কবিতা ও গানের সংখ্যা দশ হাজারের অধিক রচিত তাঁর পাঁচটি গানের বই প্রকাশিত; স্বাধীনতোত্তর ৩টি ও স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে দুটি এবং আরো বহু অপ্রকাশিত রয়ে যায়। তাঁর বিপ্লবী জীবন ও গান নিয়ে ১৯৯৭ সালে একশ একান্নটি রচনা সংকলন 'কবিয়াল ফণী

Dhaka University Institutional Repository

বড়ুয়ার' জীবন ও রচনা নামে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। কবিয়াল ফণী বড়ুয়াকে নিয়ে চট্টগ্রামের অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির অনোমা ১৯৮৬ সালে কবিয়াল ফণী বড়ুয়া সংবর্ধনা স্মারক এবং চারুলতা পরিষদের, চারুলতা গণ কবিয়াল ফণী বড়ুয়া সংখ্যা ২০০১' প্রকাশ করে। তিনি স্বদেশ ও বিদেশে বহু কবি গানে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নির্মিত বাংলার কবিয়াল এর মহরত অনুষ্ঠান ফণী বড়ুয়া অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে রাউজানের বাগোয়ান গ্রামের বিরাট কৃষক সম্মেলনে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং ১৯৮৫ সালে জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ এর জাতীয় সম্মেলন চট্টগ্রাম অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন। বর্ষীয়ান কবি গায়ক হিসেবে জীবনে তিনি বহু সংবর্ধনা, সম্মাননা, পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। জাতীয় গণ সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠি, চট্টগ্রাম ১৯৭৪ সালে ফণী বড়ুয়াকে প্রথম সংবর্ধনা প্রদান করে।

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি চট্টগ্রাম জেলা, ১৯৮৬ সালে অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, চট্টগ্রাম, ২০০০ সালে চারুলতা পরিষদ, ঢাকা, ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্রসংসদ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন কবিগানের পথিকৃৎ, একজন প্রাতঃস্মরণীয় কিংবদন্তী কবিয়াল। জ্ঞান-গরিমা, পাণ্ডিত্য আর সম্মানে তিনি পরিণত হয়েছেন জাতীয় ব্যক্তিত্বে।

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের

মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ১৯০৯ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের রাউজান থানার পূর্বগুজরা হোয়ারাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালে ২ মার্চ ৮৬ বছর বয়সে এই অমিত কর্মাধিপাত মহাপ্রয়ান লাভ করেন। পিতা কর্মধন বড়ুয়া ও মাতা চিন্তামতী বড়ুয়ার ৬ষ্ঠ সন্তান শশাংক বড়ুয়া। তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াপাড়া হাইস্কুল এবং পাহাড়তলী মহামুণি এ্যাংলো পালি হাইস্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে ১৬ বছর বয়সে সংঘনায়ক অগ্রসার মহাথেরের কাছে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে ভিক্ষু জীবনের ব্রত উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ মানবতা ও বিশ্বমৈত্রীর উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপৃত হয়ে, প্রতিষ্ঠা করেন অনেক শিক্ষা, সেবা ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।[৭০] ১৯৫৪ সালে তিনি মহাথের অভিধায় ভূষিত হন। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মহান ধর্মীয় নেতা মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের'র জীবন সমগ্র উপমহাদেশের বৌদ্ধধর্মের সমকালীন ইতিহাসে অতুলনীয়। এ মহাজীবন ও মহাসত্ত্ব জীবন তিনি সদ্ধর্ম, সমাজ ও মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেন।[৭১] ১৯৩৪-৩৭ সালে তিনি শ্রীলংকায় উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেখানে দুই বছর অধ্যয়ন করে বিদ্যালংকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'সদ্ধর্মভানক' উপাধিতে ভূষিত হন।

সুদীর্ঘকালে তাঁর জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সমন্বয়বাদিতা, মানবতা, শিক্ষা, সমাজসেবা ও সংগঠন সমতা সহ বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে তিনি রূপলাভ করেছে। দেশবরেণ্য আন্তর্জাতিক সাংঘিক ব্যক্তিত্বে। তিনি ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্বপাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। বর্তমান বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ নামে পরিচিত।[৭২] ১৯৫০ সালে বাংলার বৌদ্ধ প্রতিনিধি হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সহকারে বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলনে শ্রীলংকায় প্রথম যোগদান করেন। ঐ সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশীপ (WFB) এ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পদ লাভ করে।

১৯৭৯ সালে ২৪তম মহাসংঘনায়ক পদে অভিষিক্ত হন। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায় ধর্মরাজিক অনাথাল ও ধর্মরাজিক উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯৪৩ সালে চট্টগ্রামের অগ্রসার অনাথালয় ও বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম মহানগরীতে নবপণ্ডিত বিহার। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তিনি নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনগণকে রক্ষার জন্য অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ সালে সরকার কর্তৃক প্রথম গঠিত বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সহসভাপতি মনোনীত হন এবং এ পদে তিনি আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাথের বিশুদ্ধানন্দের সমাজসেবা ও আন্তঃধর্মীয় কর্মকান্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৯৬২ সালে টি কে (তমগা-ই-খেদমত) ও ১৯৬৫ সালে টি পিকে (তমঘা-ই-পাকিস্তান) উপাধি ও স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাকে সমাজসেবা ও মানবকল্যাণের জন্য মরণোত্তর একুশে পদক প্রদান করে। এছাড়াও তাঁর সাংঘিক জীবনের অসামান্য কর্মাবদানের স্বীকৃতি রূপে লাভ করেছেন দেশ বিদেশের অসংখ্য পুরস্কার, পদক ও অভিজ্ঞান পত্র। তিনি বহু সেমিনার, বৈঠক, সম্মেলন ও প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বাঙালির এই অনন্য প্রতিথযশা গৌরবদীপ্ত ব্যক্তিত্ব মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের স্মরণে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ ২০০১ সালে প্রবর্তন করে 'বিশুদ্ধানন্দ স্বর্ণপদক'।

মহাথেরর নেতৃত্বে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বুদ্ধের আড়াই হাজারতম পরিনির্বাণ জয়ন্তী, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডে পালি শিক্ষা প্রশস্ত করেন, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রাউজানে জাতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ কৃষ্টির প্রচার সংঘের রজত জয়ন্তী, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মহাথের আন্তর্জাতিক মর্যাদায় জন্মজয়ন্তী, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চীন থেকে বাংলার বরেণ্য সন্তান অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানের দেহভস্ম আনয়ন উৎসব, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে অতীশ দীপংকরের সহস্রতম জয়ন্তী, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মহাথের হীরক জয়ন্তী, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রচার সংঘের পুনর্মিলনী উৎসব, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পাহাড়পুর সভ্যতা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বৌদ্ধ জাতীয় সম্মেলন, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে মহাথের প্লাটিনাম জয়ন্তী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সম্মেলনে তৎকালীন রাষ্ট্র পতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শতশত বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বিদেশি প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন। মহাথের নিজে বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের দেড় শোতাধিক দেশ সফর এবং এক হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক সম্মেলন-সমাবেশে যোগদান করে স্বদেশের কৃষ্টি, ঐতিহ্যের গৌরবদীপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন মনীষী তাঁকে এ যুগের অতীশ দীপংকর ও বোধিসত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বলে অভিহিত করেছেন এবং এদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারি কর্মকর্তারা মহাথেরকে পরম শ্রদ্ধায় ভ্রাম্যমান শান্তি-দূত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। চীন, জাপান, ভূটান, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, প্রভৃতি বৌদ্ধদেশের সাথে বাংলাদেশের সৌহার্দ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় মহাথের বিশুদ্ধানন্দ অনবদ্য অবদান রেখেছেন। বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশীপ ছাড়াও এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলন সংস্থা (এবিসিপি), বিশ্বধর্ম ও শান্তি সম্মেলন সংস্থা (ডব্লুসিআরপি) ইত্যাদি আন্ত র্জাতিক সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার প্রধান হিসেবে মহাথের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। বিশ্বশান্তি ও আন্তঃধর্মীয় সংহতি প্রচারে মহাথেরের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মহাথের বিশুদ্ধানন্দ ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা মঙ্গোলিয়া থেকে এবিসিপি'র আন্তর্জাতিক শান্তি স্বর্ণপদকে এবং ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে নরওয়ের ওসলোতে অবস্থিত এম কে গান্ধী পীস ফাউন্ডেশনের আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।[৭৩]

তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে রক্তঝরা দিনগুলিতে [৭৪] ১৯৮৪ সালে Buddhism in Bangladesh, ১৯৮৯ সালে স্মৃতিকথা, সত্যদর্শন প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পালি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান বেতার ও ঢাকা কেন্দ্র থেকে তিনি ত্রিপিটক পাঠ শুরু করেন। সেই থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত ত্রিপিটক পাঠ হয়।

শিক্ষাবিদ মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দি

ভাষা কন্যা শিক্ষাবিদ মিস প্রতিভা মুৎসুদ্দি ১৯৩৫ সালে ১৬ ডিসেম্বর মহামুনি পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দি ও মাতা স্বর্গীয় শৈলবালা মুৎসুদ্দি। তিনি ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি থেকে বি.এ (সম্মান) এবং ১৯৫৮ সালে এম. এ এবং বি.এড ডিগ্রী লাভ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি অবিবাহিত। তিনি ১৯৫৫ সালে বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে প্রথম ডাকসু মহিলা মিলানায়তন সম্পাদিকা নিবার্চিত হন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন্স হল ইনিয়নের (বর্তমান রোকেয়া হল) প্রথম ভি.পি. নির্বাচিত হন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৬০ সালে কক্সবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, ১৯৬২-৬৩ সালে জয়দেবপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা, ১৯৬৩-১৯৬৫ সালে ভারশ্বেরী হোমস এর অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষিকা, ১৯৬৫-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ভারতেশ্বরী হোমস এর অধ্যক্ষ এবং ১৯৭২ সাল থেকে অদ্যাবধি কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অন্যতম পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি চারুলতা পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি (সম্মাননা) স্বরূপ তিনি ২০০২ সালে শিক্ষাবিদ হিসেবে একুশে পদক এ ভূষিত হন। নারী শিক্ষা, সমাজসেবা ও জনহিতকর কর্ম অবদানের জন্য তিনি বহু স্বীকৃতি ও সম্মাননা লাভ করেন। প্রাপ্ত স্বীকৃতির মধ্যে ১৯৮৭ সালে বেইস (BACE) এর আজিজুর রহমান পাটোয়ারী পদক, ১৯৯৫ সালে অনন্যা শীর্ষদশ '৯৫ পদক, ১৯৯৮ সালে লায়ন নজরুল ইসলাম স্বর্ণপদক ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ গুণীজন সম্মাননা, চারুলতা পরিষদ আলোকিত নারী প্রতিভা মুৎসুদ্দিকে, ১৯৯৯ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গুণীজন সংবর্ধনা প্রদান করে। বৌদ্ধ মননশীলতার উৎকর্ষধর্মী প্রকাশনা চারুলতা তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচিত নারী প্রতিভা মুৎসুদ্দি সংখ্যা প্রকাশ করে ১৯৯৯ সালে। ২০০০ সালে রোটারী ফাউন্ডেশনের **Paul Harris Fellow** এওয়ার্ড, ২০০১ সালে বৌদ্ধ একাডেমী (চট্টগ্রাম) থেকে বৌদ্ধ একাডেমী পুরস্কার, ২০০১ লায়ন্স ক্লাব (চট্টগ্রাম) এর বিশেষ সংবর্ধনা, ২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক সংস্থা International Brother Hood Mission প্রদত্ত ধর্মদূত পদক এবং ২০০৬ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের বিশুদ্ধানন্দ স্বর্ণপদক লাভ করেন।

প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া

ড. সুকোমল বড়ুয়া বাংলাদেশের সমকালীন বৌদ্ধ সমাজের শীর্ষস্থানীয় অতি সুপরিচিতি একটি নাম। বিদ্যা জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, ধর্ম ও সমাজ বিনির্মাণে তিনি ঋদ্ধ। ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার ঐতিহ্যবাহী ঢেমশা জনপদে তাঁর জন্ম। পিতা স্বর্গীয় ডা. গণেশ চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা স্বর্গীয়া বুদ্ধিমতী বড়ুয়া উভয়ই ছিলেন শিক্ষানুরাগী।

গ্রামের পাঠশালাতেই প্রফেসর বড়ুয়ার প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরবর্তী ঢেমশা হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, সাতকানিয়া কলেজ হতে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ডিগ্রী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বর্ণপদক নিয়ে এম. এ এবং ১৯৮৬ সালে ভারতের কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'Psychological Attitude: A study of Mind in Early Buddhist Texts' অভিসন্দর্ভের উপর পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড হতে কৃতিত্বের সাথে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম উপাধি ও লাভ করেন।

প্রফেসর বড়ুয়া ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগে পালির লেকচারার হিসেবে নিয়োগ লাভের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।[৭৫] ২০০০ সালে তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের নির্বাহী সভাপতি। শিক্ষাজীবনে ড. বড়ুয়া 'সারদা রঞ্জন মেমোরিয়াল স্কলারসীপ' এবং 'বংশদীপ স্মৃতি স্বর্ণপদক' লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে ভারতের শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

'All India International Seninar'- এ তিনি Viswaprakash (বিশ্বপ্রকাশ) উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রফেসর বড়ুয়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ২৬ টি সেমিনারে অংশগ্রহণসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকা,সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকায় ১০০টির ও অধিক নিবন্ধ লিখেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি, বাংলাদেশ সমিতি, চট্টগ্রাম ইতিহাস সমিতিসহ দেশ-বিদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু খ্যাতনামা গবেষাণা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার আজীবন ও সাধারণ সদস্য। ড. বড়ুয়া অধ্যাপনা ও গবেষণা কর্মের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িত আছেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট স্কলারর্স ফোরাম, বাংলাদেশ পালি সমিতি ও সৌগতসহ বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সামাজিক ও প্রকাশনা সংগঠন-সংস্থার সক্রিয় সদস্য। প্রফেসর বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of Arts এর সম্পাদনামন্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং ফেডারেশনের বার্ষিক মুখপত্র 'দীপঙ্কর' এর সাবেক সম্পাদক।

প্রফেসর বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পালি-বাংলা অভিধান' ও ত্রিপিটক অনুবাদ বোর্ডের অন্যতম সম্পাদক। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ' এর অন্যতম এন্ট্রি লেখক। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রাচীন পান্ডুলিপি ও পুঁথি-পুস্তকসংগ্রহ কমিটির তিনি আহবায়ক। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ সংখ্যা ০৭। সবকটি গ্রন্থ বাংলা একাডেমী এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয় এবং বিদ্বৎ সমাজে প্রশংসিত হয়।

প্রফেসর বড়ুয়া ঢাকা আন্তর্জাতিক বিহারের রূপকার ও স্বপ্নদ্রষ্টা । ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার আজ তাঁর স্বপ্নের সৃষ্টি। এই বিহারের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি মেধা, শ্রম ও অসামান্য যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ১৯৯৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি জনাব হাবিবুর রহমান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহবুদ্দীন আহমদ, ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২০০১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং ২০০৪ সালের ১০ অক্টোবর মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজ উদ্দীন আহমেদ-এর সঙ্গে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে সৌজন্য সাক্ষাতের প্রতিনির্ধিত্ব করেন। তিনি জাপানের Aichi Gakuin University এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর তাডাকা কোইডে এম.ডি এবং ২ জুন ২০০১ তারিখে থাইল্যান্ডের Mahachulalangkornrajvidyalaya University এর রেক্টর Phrathepsophon এর সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাত করেন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য scholar in pali উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

২৬ মে ২০০১ সালে জাপানের Aichi তে The Society for the study of pali and Buddhist Culture কর্তৃক Successful Chairman সম্মাননা লাভ করেন। এছাড়াও তিনি জীবনে বহু সম্মাননা, সংবর্ধনা, উপাধি, প্রশংসাপত্র ও পদক লাভ করেন। প্রফেসর বড়ুয়া ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ভারতের আসাম রাজ্যের The International Brotherhood Mission-Dibrugarh প্রফেসর বড়ুয়াকে 'Dhammajyoti' (ধম্মজ্যোতি) এওয়ার্ড অব অনারে ভূষিত করেন। দু'দশকের ও অধিকাল ব্যাপী প্রফেসর বড়ুয়া ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, শান্তি, সম্প্রীতি ও জনকল্যাণমূলক কাজে অসামন্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে এ বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সম্প্রতি তিনি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে নিউ দিল্লীতে 'Intrenational Conclave on Buddhism শীর্ষক আন্তর্জাতিক Conference- এ যোগদান করেন এবং ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে আব্দুল কালাম-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

ড. বড়ুয়া শিক্ষা ও প্রাচীন বিদ্যালিপিতে বিশেষ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড.ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক অতীশ দীপঙ্কর কংগ্রেস এ্যাওয়ার্ড ২০০৪ স্বর্ণপদক লাভ করেন। এছাড়াও শিক্ষা, শান্তি ও সংহতিতে বিশেষ অবদানের জন্য ড. বড়ুয়াকে বাংলাদেশ ফেডারেশন সাংস্কৃতিক পরিষদ ডেমোক্রেসি এ্যাওয়ার্ড ২০০৪ প্রদান করেন। ১৯৭৯ তে মাস্টার্স পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টিতে সর্বোচ্চ নাম্বার পাওয়ার জন্য ১২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে তাঁকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক চ্যান্সেলর এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বশেষ প্রফেসর বড়ুয়াকে রাষ্ট্রীয় একুশে পদক ০৬ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯ ফেব্রুয়ারী ০৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ পদক আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত ত্রিপিটক পাঠক। তিনি জাপান, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভূটান, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, হংকং ও মিয়ানমারসহ ভারতের বহু রাজ্য সফর করেন। প্রফেসর বড়ুয়া পাণ্ডিত্যে, বিদ্যায়, ধর্ম ও সমাজ উন্নয়নে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব।

বৌদ্ধদের মধ্যে যাঁরা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সম্মাননা ও পদক প্রাপ্ত হয়েছেন-

এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা মঙ্গোলিয়া ১৯৭৯ সালে বিশ্বশান্তিতে অবদান রাখার জন জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে আন্তর্জাতিক শান্তি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তিনি আমেরিকার একটি সংস্থা থেকে বিশ্বনাগরিক উপাধি লাভ করেন। একই সংস্থা ১৯৮২সালে মঙ্গোলিয়া রাজধানী উলান বাতরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থা (ABCP) কর্তৃক বিশ্বশান্তিতে অবদান রাখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

শান্তপদ মহাথের ও ডি.পি বড়ুয়াকে যুগ্মভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য অতীশ দীপঙ্কর রিচার্স কাউন্সিল ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক ডি.পি. বড়ুয়াকে অতীশ দীপঙ্কর শান্তি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। [৭৫] বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা তাঁকে প্রথমে 'বিশ্ব শান্তিদূত' ও পরে ২০০১ সালে 'বিদ্যাবারিধি' অভিধায় ভূষিত করেন। ভারতে চট্টগ্রামে বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত জ্ঞান তাপস পন্ডিত ধর্মাধার মহাথের (১৯০১) বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও দর্শনে পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিশেষ অভিধায় ভূষিত হন। [৭৬] সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করে সাহিত্য অবদান রাখার জন্য বাঙালি বৌদ্ধ লেখক সাহিত্যিক ও ছড়াকারদের মধ্যে খ্যাতিমান ছড়া সম্রাট ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া, কথাসাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া, বিরজপ্রজ্ঞ প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সাহিত্যে অবদানের জন্য সম্মাননা ও পদক লাভ করেন। কবি ছড়াকার সুজন বড়ুয়া, ছাড়াকার দীপক বড়ুয়া, ছাড়াকার উৎপল কান্তি বড়ুয়া, ছড়াকার বিপুল বড়ুয়া প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রফেসর জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়াকে ১৯৯৫ সালে এবং ২০০৪ সালে ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়াকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক ও সনদ প্রদান করেন।

বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ধর্মাধিপাত শুদ্ধানন্দ মহাথের ভারত থেকে ধর্মাধিপাত অভিধা, শান্তির জন্য গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন নরওয়ে থেকে প্রশান্তি পত্র, সদ্ধর্মসেবায় অবদানের জন্য সিলোন বুড্ডিস্ট কংগ্রেস শ্রীলংকা থেকে প্রশংসা পত্র, ইউনিসেফ ও বাংলা একাডেমী থেকে সমাজকর্মের অবদানের জন্য প্রশান্তিপত্র লাভ করেন।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মহাসচিব ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া ভারত থেকে শান্তিপদক ও ধর্মদূত উপাধি লাভ করেন। সমাজ কর্মের জন্য বৌদ্ধ সভ্যতা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার পাহাড়পুর থেকে স্বর্ণপদক, অল সিলোন বুড্ডিস্ট কংগ্রেস শ্রীলংকা থেকে সমাজসেবার জন্য সম্মাননা পত্র, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পদক লাভ করেন। [৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. অনোমা, ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, ২০০১, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৫২
২. অনোমা, ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, ২০০১, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৫২
৩. চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৪৩, প্রবন্ধঃ বৌদ্ধ প্রকাশনাঃ একটি সমীক্ষা, ডা. ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া
৪. আলী ইমাম, প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ বিহার, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪০
৫. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, পৃষ্ঠা-৪৮)
৬. Prof. P.V. Bapat ed; 2500 years of Buddhism, New Delhi, Reprint 1997)
৭. Hemendu Bikash Chowdhury ed; Hundred Years of the Buddha Dharmankur Sabha (1892-1992), Calcutta, 1993, P. 100)
৮. চারুলতা, ২০০০, বাংলাদেশে পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চা, পৃষ্ঠা-২৬)
৯. পূর্বোক্ত, চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৬
১০. জগজ্জ্যোতি, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭৫,
১১. পূর্বোক্ত, চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৭
১২. কৃষ্টি, নবপর্যায়, ১৩শ বর্ষ, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৮,
১৩. জ্যোতি, ২১ বর্ষ, চট্টগ্রাম, ১৯১৯, পৃষ্ঠা-৩১, প্রবন্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বৌদ্ধ লেখক ও গ্রন্থাবলী, শিশির বড়ুয়া
১৪. অনোম, ১৯৯৩, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৫২-৫৩, প্রবন্ধ শিশির বড়ুয়া
১৫. ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৭
১৬. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সুকোমল চৌধুরী, কলকাতা, ১৩৮০, পৃষ্ঠা-৫৭
১৭. বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকাঃ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রফেসর ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অভিজ্ঞান, অনুনায়ক ধর্মাধিরাজ সুগতানন্দ মহাথের জাতীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উদ্‌যাপনী কমিটি, চট্টগ্রাম, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৫
১৮. উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র, ৭ম খণ্ড, মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২০
১৯. উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ, সাময়িক পত্র ৪র্থ খণ্ড, মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৯
২০. জগজ্জ্যোতি, ধর্মপাল সংখ্যা, কলিকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৫/জ্যোতি, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-২৭
২১. পূর্বোক্ত, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১১৭

Dhaka University Institutional Repository

২২. উনিশ শতকেবাংলাদেশে সংবাদ সাময়িক পত্র, মুনতাসীর মামুন, বাংরঅ একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২০

২৩. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠা-৫৮

২৪. বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিয়সক পত্র-পত্রিকায়; সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রফেসর ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অভিজ্ঞান, চট্টগ্রাম, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১২৫

২৫. পূর্বোক্ত, উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ পত্র সাময়িক পত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০-২১

২৬. পূর্বোক্ত, উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ পত্র সাময়িক পত্র, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০-২১

২৭. বাংলাদেশে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৬

২৮. জগজ্জ্যোতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১৫

২৯. শতবর্ষে বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা, শিশির বড়ুয়া, জ্যোতি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৭

৩০. বাংলা ভাষায় বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকা: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রফেসর ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, অভিজ্ঞান, ২০০৬, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১২৬

৩১. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-১১৮

৩২. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৫৯

৩৩. অনোমা, ২৫ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২০০১, পৃষ্ঠা-২০৫

৩৪. জ্যোতি, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৭

৩৫. পূর্বোক্ত, অভিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১২৭

৩৬. প্রাগুক্ত, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১১৭

৩৭. বেনীমাধব ও ফনীভূষণ স্মরক বক্তৃতামালা (৩), চট্টগ্রাম, ২০০৫, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী

৩৮. পূর্বোক্ত, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১১৮/ অভিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১২৭

৩৯. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৫৭

৪০. শতবর্ষের বৌদ্ধ পত্র পত্রিকা, শিশির, বড়ুয়া, জ্যোতি, ১৯৯৮, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-২৮

৪১. প্রাগুক্ত, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১১৮

৪২. কৃষ্টি, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫২

৪৩. চারুলতা, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪০, / পূর্বোক্ত অভিজ্ঞান, চট্টগ্রাম, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১২৭

৪৪. পূর্বোক্ত, চারুলতা, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪০

৪৫. পূর্বোক্ত, অভিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১২৭

৪৬. চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪০

৪৭. অভিজ্ঞান, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১২৭

৪৮. চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪০, জ্যোতি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৮

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৬২

৫০. বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পা), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১৩

৫১. ঐক্য, বৃত্তি প্রদান স্মারক, সম্পাদনায়, তুষার বড়ুয়া, ১৯৯৮

৫২. অনোমা, ১৯৯৫, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০২

৫৩. চারুলতা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪০

৫৪. পূর্বোক্ত ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১১৮

৫৫. পূর্বোক্ত, জ্যোতি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৮

৫৬. চারুলতা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৭

৫৭. পূর্বোক্ত, জ্যোতি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৮/অনোমা, ১৯৯৫, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০২)

৫৮. জগজ্জ্যোতি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৮০

৫৯. কৃষ্টি, নবপর্যায় ১৩শ বর্ষ, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আনন্দ মিত্র সংখ্যা-২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫২

৬০. পূর্বোক্ত, অভিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১২৮ /জ্যোতি, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৮

৬১. বৌদ্ধ প্রকাশনা: একটি সমীক্ষা, ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া, চারুলতা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪২

৬২. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সুকোমল চৌধুরী, সারাস্বত লাইব্রেরী কলিকাতা, ১৩৮০, পৃষ্ঠা-৪০

৬৩. পূর্বোক্ত, অভিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১২৯

৬৪. বৌদ্ধ বুদ্ধ পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি-১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩১২

ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

গত ৩০ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথিতে বহুকাল মুমূর্ষপ্রায় চট্টলবাসী বৌদ্ধবাসী বৌদ্ধগণ যেন এক সঞ্জীবনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত লইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান অভূতপূর্ব্ব অভিনব দৃশ্য সন্দর্শনে পরম পুলকিত হইল। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়, যুগান্তপ্রলয় বাদ্যবঃ নগরের বক্ষ কম্পিত করিয়া বেন্ড বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সহস্র ২ লোক আকুল ও উদগ্রীব হইয়া সমারোহের পশ্চাৎ ২ ছুটতে লাগিল! সর্ব্বঙ্গে বাদ্যকরগণ তৎপশ্চাতে নগ্নপদে স্থানীয় বৌদ্ধগণ সুসজ্জিত, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত, সুশোভন রূপ আপনারা নিজেই আকর্ষণ করিয়া চলিতেছিল দেদীপ্যমান মূর্তিমান প্রীতি, ভক্তি ও উৎসাহ যেন তাহাদের প্রত্যেকের চোখ মুখ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহাদের পশ্চাতে গৈরিক চীবর পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক, নগ্নপদ প্রশান্ত সৌম্য স্মিত আনতানন শ্রমণগণ ধীরপদবিক্ষেপে রথের অনু গমন করিতেছেন। পশ্চাতে জনতা স্রোত, কোথাও নৃত্যপরায়ণ নদীস্রোতের ন্যায়, কোথাও ঝটিকা বিক্ষিপ্ত উর্ম্মিমালার ন্যায় প্রশান্ত ও

Dhaka University Institutional Repository

অধীর হইয়া চলিতেছে। রথের পুরোভাগে ষটরশ্মি সমাকীর্ণ বোধি জ্যোতির অনুকরণে গঠিত বিচিত্র বোধিধ্বজ ও জাতীয় পতাকা হস্তে বৌদ্ধ বালকগণ সর্বাগ্রে ও সাগ্রহে অগ্রসর হইতেছিল। বলা বাহুল্য এই সমারোহ অনার্থ বাজার বৌদ্ধ মন্দির হইতে নিক্রান্ত হওয়ায় সম্ভমহল পাহাড়ের অভিমুখের ছুটিতেছিল রঙমহল শৈলে আরোহণ করিয়া অসংখ্য দর্শকগণের সভক্তি আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনির মধ্যে বৌদ্ধগণ তাহাদের প্রাণের আরাধ্য প্রাণরাম ভগবনবুদ্ধমূর্তি সন্দর্শনে নরনারী আবালবৃদ্ধ জাতিবর্ণ অস্তিত্ব হারাইয়া সকলেই এক হইয়া গেল। সকলেই বোধ করিতে লাগিল চিন্ময় ভগবনমূর্তি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও কিছু নাই, নিজেরাও নাই সকলেই তন্ময় হইয়া চিন্ময় ভগবনমূর্তিই দেখিতেছে ভগবনমূর্তিতেই মিশিয়া গিয়াছে।

পুনঃ প্রলয়ঙ্কর বেণু বাদ্য বাজিয়া উঠিল। বৌদ্ধগণ ভগবানের রথ টানিয়া চলিল। অগ্রে ২ জাতীয় পতাকা উড়িতে লাগিল। গায়ক গায়িকা গণ প্রাণ খুলিয়া উচ্চকণ্ঠে ভগবনমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অসংখ্য ২ দর্শকগণ জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। মহা জনতাস্রোত প্রতিকুলগামী ক্ষুদ্র জনতাস্রোতকে নিজের অনুকুল করিয়া ভাসাইয়া লইয়া চলিল। শহরে অভূতপূর্ব দৃশ্য হইল।

ঘন ব্যোমধ্বনিতে ভূতল গগণ বিদীর্ণ ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধগণের হস্তস্থিত আলোকমালায় নগর আলোকিত হইয়া হাসিতে লাগিল। বয়স্ক প্রাচীন শিক্ষিত বৌদ্ধগণও সুকুমার বালকবৎ বালকগণের নৃত্য গীতে যোগদিয়া মানব প্রাণের স্বাভাবিক প্রথমাবস্থা লাভ করিল। রাত্রি ৮ ঘটীকার সময় ভগবানের মূর্তি অনাথ বাজার বৌদ্ধ মন্দিরে স্থাপিত হয়। ভগবানমূর্তির এই অভিনব দৃশ্য সার্দ্ধদ্বিসহস্য বৎসর পূর্বে রাজকুমার সিদ্ধার্থের রথারোহণে প্রমোদ-উদ্যান পরিদর্শন ও মহাভিনিষ্ক্রমণের কথা হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে।

ভারত জননীর ধন-ধান্য সুধৈশ্বর্য পূর্ণ সেই প্রাচীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে!!

হায়! সর্ব্বধ্ব-সকর কাল! তুমি কি না করিতেছ? প্রকৃতি লীলাভূমি চট্টলরাজ্য, প্রকৃতির প্রিয় পুত্র মগধারজগণের মগধ বংশীয়গণের শাসনাধীন কতই উন্নত, গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত ছিল। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে এই বৌদ্ধরাজগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালের বিচিত্র গতিতে মুসলমানেরা এই শৈলশিখরে তাঁহাদের বিলাসিনী ঘোষিত বৃন্দের উদ্দাম বিলাস বাসনা চরিত্রার্থের জন্য সাধের রঙমহাল নির্মাণ করেন। কালের বিচিত্র গতিতে এতদিনে পুনরায় ইংরেজ বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের ভিত্তি খননের সময় পবিত্র ভগবানমৃতি ঘমনূর্ত্তি লোকনেত্রের গোচরীভূত হইল। মূর্ত্তি বহুকাল ভূগর্ভে ধ্যান স্তিমিত নয়নে বীরাসনে আসীন ছিলেন। প্রাণারাম বৌদ্ধদেব! প্রভো! তোমার পূর্বপ্রতিষ্ঠাতা মগধগণের কথা মনে করিয়া আমরা যে তাঁহাদের বংশধর, তুমি এ কথা বুঝিতে পারিবে কি? আর নিজে না বুঝিলে আমরা তোমাকে বুঝাইতে পারিব কি? বুঝিবে কিনা, বুঝাইতে পারিব কিনা, প্রভো! তুমিই তাহা জান! প্রভো! মগধগণের হৃদয়ে বল দাও, তোমাকে

Dhaka University Institutional Repository

দেখার পূর্বে ইহারা কাষ্ঠ পুত্তলিকা ছিলেন, আশীর্বাদ কর তোমাকে দেখিয়া তোমাকে চিনিয়া, তোমাকে শিখিয়া, তাঁহারা পুনর্জীবিত হউন। আগে অন্তরালে ছিলে, এখন সংস্পর্শে আসিলে, দেখি তোমার সংসর্গে তোমার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, ইহাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় কিনা!

৬৫. বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৩১০

৬৬. আত্মঅন্বেষাঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩৬

৬৭. জ্যোতি, বার্ষিক স্মরণিকা, ২০০০, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৪০

৬৮. সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৪৫

৬৯. চারুলতা, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০১, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৯

৭০. কৃষ্টি, নবপর্যায়, ১৮ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮

৭১. কৃষ্টি, নব পর্যায়, ১৫ বর্ষ, অতীশ দীপঙ্কর ও বিশুদ্ধানন্দ স্মারক শান্তি স্বর্ণপদক সংখ্যা, ২০০৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৪

৭২. বাংলা পিডিয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৩

৭৩. কৃষ্টি, নবপর্যায় ১৫ বর্ষ, অতীশ দীপংকর ও বিশুদ্ধানন্দ স্মারক শান্তিপদক সংখ্যা, ২০০৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৬

৭৪. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, পৃষ্ঠা-৩২৭

৭৫. Bangladesh – China Relationship From a Buddist Perspective, D.P. Barua, NYMPhea, Publication , Dhaka, 2004, P.64

৭৬. ডি পি বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা -১২৫

৭৭. কৃষ্টি, নবপর্যায়, ১৭ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ২০০৩, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-২২

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের শিক্ষা-সমাজ-সংগঠন

৭.১ বাঙালি বৌদ্ধদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

৭.২ সংস্কৃতি কথা

৭.৩ বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

৭.৪ বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

৭.৫ বৌদ্ধ নিকায়ের ইতিকথা

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের শিক্ষা-সমাজ-সংগঠন

৭.১ বাঙালি বৌদ্ধদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের ইতিহাসে দু'শতকের অধিক কালের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট অর্থাৎ অতীত থেকে বর্তমান বিষয় আলোচনা করা সত্যিই একটি দুঃসাহসিক কঠিন কাজ; এটি গবেষণামূলক ও সময় সাপেক্ষ বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে শুরু হয় রেঁনেসা আন্দোলন। এই আন্দোলনের অভিসম্পাতি প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের এক বৈপ্লবী পরিবর্তন এনেছিল এই রেনেসা বা নবজাগরণ। উন্নয়ন সমন্বয়, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা, ধর্মচর্চা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, জীবন ও জীবিকায় সে প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল এক অনন্ত উদ্যোগ ও প্রেরণা। পটিয়া থানার ছত্তর পিটুয়া গ্রামের প্রয়াত নীল কমল বড়ুয়ার তৃতীয় পুত্র প্রয়াত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ এক সুবর্ণ অধ্যায়ে পদার্পণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ইংরেজী শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজও এ শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে। বৌদ্ধ সমাজে আদি শিক্ষিতদের মধ্যে নোয়াপাড়া ফুলচন্দ্র বড়ুয়া (লোথক) চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার স্কুলের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি কবি ফুল চন্দ্র বড়ুয়া নামে খ্যাত হন, তাঁর রচিত বৌদ্ধ রঞ্জিকা (১৮৭১) প্রথম গ্রন্থ। ধর্মরাজ বড়ুয়াও (১৮৬০-৯৪) বৌদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনে বিশেষ ভাবে পরিচিত। পণ্ডিত ধর্মরাজ রচিত হস্তসার ও সুত্তনিপাত তৎকালীন বৌদ্ধদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলে। নবরাজ বড়ুয়া (১৮৮৬-৯৬) বৌদ্ধদের মধ্যে এক নবচেতনার সূত্রপাত করেন। তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। স্বল্পকাল বয়সে তিনি বৌদ্ধ নীতিরত্ন, শিক্ষাসার ও বৌদ্ধালঙ্কার গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ সমাজে এক জাতীয় চেতনা আনয়ন করেন।

বৈদ্যপাড়ার মহেন্দ্র বড়ুয়া সাবরেজিস্ট্রারের পুত্র লক্ষ্মীচরণ বড়ুয়া প্রথম জীবনে দোতাষী ছিলেন। পরে তিনি সাবরেজিষ্ট্রার হয়েছিলেন। পাহাড়তলীর জয়লাল বড়ুয়া (মুন্সী) কর্তৃক নিজ গ্রামে জয়লাল মুন্সীর হাট প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় ড. রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২) অভির্ধমার্থ সংগ্রহ (১৮৯১), শ্রমণ কর্তব্য (১৯৩১), চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস (১৯০৫) গ্রন্থ বিখ্যাত ছিল। শ্রী সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯৯৮) 'জগজ্জ্যোতি' কাব্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী (১৮৪৪-১৯১৮) চট্টগ্রাম সাতবাড়ীয়া দেওয়ানজি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ আমলে আদালতে তিনি নাজিরের পদ লাভ করেছিলেন।[১] তিনি বিদ্যাৎসাহী ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯১৭ সালে সাতবাড়িয়ায় মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৮৭ সালে চট্টগ্রাম শহরে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী।[২] নীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দি বলেছেন, পাহাড়তলীর হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দি সর্বপ্রথম ওকালতির সনদ লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধ সমাজে প্রথম আইনজ্ঞ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন, তিনি অবশ্য ওকালতি করেননি। তিনি শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পিতা কালী কিঙ্কর মুৎসুদ্দির উদ্দ্যোগে পাহাড়তলী গ্রামে মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। পাহাড়তলীর কালী কিঙ্কর মুৎসদ্দি বৌদ্ধদের মধ্যে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম নর্মাল স্কুল থেকে পাশ করেন।

চকরিয়া হারবাং এ মডেল স্কুল স্থাপন করে গুণমেজু মহাথের এবং পণ্ডিত গুণাকর মহাথের। ১৮৬৮-৭০ সালের মধ্যে পাহাড়তলী গ্রামের পণ্ডিত গোবিন্দ চন্দ্র বড়ুয়া সর্বপ্রথমে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। ১৮৭৮ সালে পাহাড়তলীর ঈশান চন্দ্র বড়ুয়া (ড. অরবিন্দু বড়ুয়ার পিতা) এবং দক্ষিণা রঞ্জন মুৎসুদ্দি (নীরদরঞ্জন মুৎসুদ্দির জ্যেষ্ঠভ্রাতা) সর্বপ্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ঈশান চন্দ্র বড়ুয়া সরকারী চাকুরী পান এবং চট্টগ্রামের সরকারী অফিসের হেড ক্লার্করূপে অবসর গ্রহণ করেন। গগণ চন্দ্র বড়ুয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি স্কুল ইনসপেক্টররূপে ঐ জেলার শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দি ১৮৮২-৮৩ সালে বৌদ্ধদের মধ্যে তথা সমগ্র চট্টলবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হন। পাশ করে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন।

পরে রাঙ্গুনীয়ার বিদর্ভরঞ্জন বড়ুয়া সর্বপ্রথম বিলাত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পিতা শুভঙ্কর বড়ুয়া মুহুরী নামে খ্যাত ছিলেন। সাতবাড়িয়া দেওয়ানজি পাড়ার হরকিশোর চৌধুরী কলকাতার ~~[illegible]~~ Fine Arts School এর (১৯০৪) ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি সরকারী চাকুরী লাভ করেন। বৌদ্ধ সমাজে তিনি ড্রইং মাস্টার নামে খ্যাত হন। নগেন্দ্র লাল চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া, সুরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, ধনঞ্জয় বড়ুয়া, আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বি এ ও বি কম কোর্সের পরীক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরা কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেননি। বৌদ্ধ সমাজে সর্বপ্রথম ১৯০৮ সালে বি এ পাশ করেন অধ্যাপক মহিমচন্দ্র বড়ুয়া। বৌদ্ধদের মধ্যে রেবতী রমন বড়ুয়াই সর্বপ্রথম বি এল পাশ করেন এবং পরে সরকারী চাকুরী লাভ করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

জ্যোতির্মালা দেবী চৌধুরী ১৯০৩ সালে চন্দ্রনাইশ কলেজের সাতবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। চট্টগ্রামের পড়ালেখা সমাপ্তিতে ইয়াংগুন গমন করেন। ইয়াংগুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। ১৯২৪ সালে পাশ করে তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট রূপে স্বীকৃত হন।[৩] ১৯২৪ সালে যান বিলাত সংবাদিকতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য। সে হিসেবে তিনিই চট্টগ্রামের প্রথম নারী গ্রাজুয়েট ও বিলাত যাত্রী। তিনি তিরিশের দশক থেকে শুরু করে সাহিত্য সাধনা। তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত রক্তগোলাপ, বিলাত দেশটা মাটির, শকুন্তলার স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহুকবিতা একসময় বাঙালি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীরদ বরণ তালুকদার (কুমার নীরদ বরণ) ১৯০৩ সালে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ঘাটচেক গ্রামে তাঁর জন্ম। কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও পরে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে আই এ পাশ করেন। চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি এডিনবার্গ যান। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৪-১৯২৯) থেকে এম বিসি এইচ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই চট্টগ্রামে মধ্যে প্রথম ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড কেমিস্ট্রি বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন।[৪] নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া ৯ এপ্রিল ১৯১১ সালে আবুরখীলে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য এবং এ ডি এম পদে উন্নীত হয়েছিল। সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া ১৩ নভেম্বর ১৯২১ সালে ফটিকছড়ির হাইদচকিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাত্র ৪৯ বছর বেঁচে ছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি রাজকীয় বিমান বাহিনী, ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি এবং বিভিন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি লাভ করেন। তাঁর ৩৬টি গল্প, ১০১টি কবিতা, ৭টি অনুবাদ ও ১১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

নারী শিক্ষার বিষয়ে রাঙ্গুনীয়ার ডাক্তার নীরদবরণ তালুকদারের মাতা হরজায়া বড়ুয়া (গগণচন্দ্র বড়ুয়া ভগিনী) এবং দক্ষিণারঞ্জন মুৎসুদ্দি প্রমুখ বৌদ্ধ মহিলার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা দুজনেই সর্বপ্রথম (১৯১০) প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে সাতবাড়িয়ার সুরবালা বড়ুয়া ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং স্কুল থেকে সর্বপ্রথম পাশ করে শিক্ষিকার পদ লাভ করেন।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হবার পূর্বে বৌদ্ধদের মধ্যে আবুরখীলের রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২) ও নয়াপাড়ার পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়া (ডাক্তার ধীমান বড়ুয়ার পিতামহ) চিকিৎসা বিদ্যায় লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া পরে আরাকানে সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হন। রামচন্দ্র হাট তিনি ০নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র বড়ুয়া বহু বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। রাঙ্গুনীয়ার নীরদ বরণ তালুকদার বিলাত থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেই বসবাস করেন। শিশু চিকিৎসায় বৌদ্ধ চিকিৎসকগণই চট্টগ্রামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। করুলডেঙ্গার কুলবৈদ্য ও পাঁচখাইন নিবাসী প্রাণহরি বৈদ্য শিশু চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। রাঙ্গুনিয়ার গুরুদাশ বৈদ্য রোগ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর অভ্রান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য চন্দ্রঘোনার মিশন হাসপাতালের ডাক্তার টাচম্যান তাঁর প্রশংসা করেন।[৫] বৌদ্ধ সমাজের তৎকালীন প্রসিদ্ধ খ্যাতিমান ডাক্তারদের মধ্যে ডা. নীরদ বরণ তালূকদার এমবিবিএস এইচ (এডিনবার্গ) , ডা. রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া (মির্ডফোর্ড হাসপাতালের ডেপুটি সুপার), ডা. বঙ্কিম বড়ুয়া, ডা. মনোহরি বড়ুয়া, ডা. রেবতী রমন বড়ুয়া, ডা. ফণীভূষণ বড়ুয়া, ডা. শিশির বড়ুয়া,ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া, ডা. বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, ডা. অমলেন্দু বিকাশ চৌধুরী, ডা. নবীন চন্দ্র বড়ুয়া, ডা. নেত্ররঞ্জন বড়ুয়া, ডা. প্রিয়দর্শন চৌধুরী (বৃহত্তর পটিয়াতে তিনিই প্রথম এমবিবিএস পাশ) ডা. কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া, ডা. অসীত কুমার বড়ু য়া, তিনি বিদেশ থেকে এমএ, এমএস ডিগ্রী প্রাপ্ত। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করেছিলেন আবুরখীল

Dhaka University Institutional Repository

ও পাহাড়তলী ডা. কিরণ চন্দ্র বড়ুয়া, হাজারীচরের ডা. চারুচন্দ্র বড়ুয়া আবুখীলের ডা. রেণুকণা বড়ুয়া, মাদার্শার ডা. রমেশ চন্দ্র বড়ুয়া, আধার মানিকের ডা. অরুন কুমার বড়ুয়া চৌধুরী উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ আমালে বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে একটি সেনাদল গঠিত হয়েছিল। এই সেনাদলের অন্তর্ভূক্ত একটি পল্টনে পাহাড়তলীর নিমাইচাঁদ মুৎসুদ্দি এডজুটেন্টের পদ, মোহন সিং সুবেদার মেজরের পদ এবং ভাই সিং সুবেদারের পদ লাভ করেন। তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও বার্মাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য মেজর মোহন সিং ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে মেডেল প্রাপ্ত হন।

ঢাকাখালীর সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯০৮) পাহাড়তলীর সতীশচন্দ্র বড়ুয়া এবং কার্তালার ললিতমোহন বড়ুয়া আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উৎকর্ষ সাধন করে। তাঁর সর্বানন্দ বড়ুয়া রচিত 'জগজ্জ্যোতি' কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়তলীর উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ওকালতী ব্যবসা শুরু করেন। তাঁরই উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহরে বৌদ্ধ আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্থাপিত হয় এবং তাতে বহু বৌদ্ধ ব্যবসায়ী টাকা লগ্নী করে উপকৃত হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর অরবিন্দ বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যারিষ্টার হন। পরে অবিভক্ত বাংলার বিধান পরিষদের তিনি এম এল সি হন। পরে রায়বাহাদুর ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া পাকিস্তান সরকার কর্তৃক Pakistan Constituent Assembly তে সভ্যপদে মনোনীত হন। আবুরখীলের ক্ষীরোদ প্রসাদ বড়ুয়া সর্বপ্রথম আই এ এস এবং তড়িৎ কান্তি মুৎসুদ্দি সর্বপ্রথম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে প্রধান বিচারক নিযুক্ত হন। রাঙ্গুনিয়ার ঘাটচেকের মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার এবং পাঁচরিয়ার রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া। (বিপিন মাষ্টারের পুত্র) সিভিল সার্জনপদে উন্নীত হন। ১৯৩৬ সালে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির সর্বপ্রথম ত্রিপিটক বিশারদ রূপে খ্যাত হন।

কর্ণফুলী নদী ও আরাকানের পেলেটুয়া নদীর উজানে বড় বড় বাজার গঞ্জে বৌদ্ধরা ব্যবসা শুরু করেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুনে সাঙ্গুভেলী কোম্পানী স্থাপন করে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী আকিয়াবে ব্যবসায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন এবং প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁর সাঙ্গুভেলী টনিক খুবই বিখ্যাত ছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পুলিনবিহারী চৌধুরী সাঙ্গুভেলী টি (Tea) কোম্পানী নামে ধর্মতলা স্ট্রীটে চায়ের দোকান খোলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পাঁচরিয়ার দেবেন্দ্রলাল বড়ুয়া কাটার কেক প্রস্তুত করেন। তাঁর বড়ুয়া কেক বাঙালি মহল্লায় বেশ পরিচিতি লাভ করে। পরে সাতবাড়িয়ার মনোরঞ্জন বড়ুয়া 'বড়ুয়া বেকারী' নামে ৭ নং শাঁখারি-টোলা লেনে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ছোট্ট কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কারখানা পরে ১২৩ এ ধর্মতলা স্ট্রীটে (বর্তমানে লেলিন সরণী) ঐ একই নামে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বড়ুয়া বেকারীর সত্ত্বাধিকারীগণের মধ্যে বর্তমানে তিন ভ্রাতা আছেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বৈলতলী গ্রামের গৌরচন্দ্র বড়ুয়া ও নুতনচন্দ্র বড়ুয়া 'ফেভারিট কেবিন' নাম দিয়ে মির্জাপুর স্ট্রিটে

Dhaka University Institutional Repository

(সূর্য সেন স্ট্রিট) সর্বপ্রথম নিরামিশ চায়ের দোকান খোলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কাছাকাছি কলেজসমূহের অধ্যাপকগণ স্বচ্ছন্দে উক্ত দোকানে যেতেন। পরে কলকাতায় সাঙ্গুভেলী নামে বহু বড়ুয়ারা চায়ের দোকান করেন। পাহাড়তলীর বেণীমাধব বড়ুয়া রেঙ্গুন মিসলেনীর প্রস্তুত কালি ও গঁদ প্রস্তুত করে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ফরেস্টার নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। নগেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত রেঙ্গুন কেমিক্যালের ডো না হেয়ার অয়েল ব্রহ্মদেশে খুবই সমাদৃত হত। জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরীর স্থাপিত সাঙ্গুভেলী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ও কানাইলাল বড়ুয়া রেঙ্গুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস এবং আগগমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির কর্তৃক স্থাপিত বৌদ্ধ মিশন প্রেস (১৯২৮) মুদ্রণ ব্যবসায়ে বৌদ্ধদের অর্থাগমের পথ সুগম করে দেয়।[৬] নবজাগৃতির যোগ্য সন্তান। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পাস করেন। তাঁকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (গোল মেডেল) পাস করান তাঁরই বড় ভাই জ্ঞান তাপস পুন্নানন্দ সামী।

১৯২৬-২৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার কার্য নির্বাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ১৯২০ সালে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষা, বিলাতী পণ্য বর্জন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন মুক্ত করে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপক হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া। যোগদান করেন, সে সুবাদে তিনি লাভ করেন দেশবন্ধুর একান্ত সাহচর্য। সকল প্রকার বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন বিশেষত পালি সাহিত্য প্রচার, পালি শিক্ষা বিস্তার, বৌদ্ধ ভারতের ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধগণের ইতিহাস সঙ্কলন, সকল প্রকার বৌদ্ধগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রচার, বাঙালা ভাষায় পালি অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন ইত্যাদি মহান উদ্দেশ্য সাধনে সমন পুন্নানন্দ সামীর উদ্যোগে সৃষ্টি হয় 'বৌদ্ধ অনুসন্ধান সমিতি'। এই সমিতির যুগ্মভাবে সুপারিটেনডেন্ট নির্বাচিত হন সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া। অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ বড়ুয়া কংগ্রেসের প্রথম সারীর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯২৩ সালে ১৭ নভেম্বর বাঙালী বৌদ্ধ যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ সম্মেলন নামে একটা সংস্থা গঠন করা হয়। এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া। এদের প্রচারপত্র 'তরুণ বৌদ্ধ' পত্রিকা ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।[৭] ১৯২৬ সালে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত সাতবাড়ীয়া শান্তিধাম বিহার প্রাঙ্গণে বঙ্গ ভাষাভাষী এবং অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের সংহতি, ঐতিহ্য এবং সধর্ম ও সমাজের কল্যাণ এবং বার্মা, সিংহল, থাইল্যান্ড, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের ভিক্ষু সংঘের মধ্যে সৌহার্দ্য গড়ে তোলা। সংগঠনের নাম রাখা হয় 'জম্বুদ্বীপ ভিক্ষু মহামণ্ডল'। এর প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া। চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানুরাগী, সধর্মপরায়ণ, সমাজ হিতৈষী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া কানুগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন উপাধ্যক্ষ। রাঙ্গুনীয় থানার শিলক গ্রামের প্রয়াত নীলম্বর বড়ুয়ার একমাত্র সন্তান অধ্যাপক প্রয়াত মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া। ১৯১২ সালে সার্কেল স্কুল পাঠ শেষে মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া মহামুনি এ্যাংলোপালি ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হন এবং ১৯১৮ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে ১৯২২ সালে পালি ভাষা ও সাহিত্যে সম্মান সহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২২ সালে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের দিকপাল রসরাজ অমৃত লাল বসুর সাহচর্যে আসেন মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে অমৃতলাল বসুর সহায়তায় শ্যামবাজারের এ.ডি. স্কুলে সদ্য স্নাতকোত্তর মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া শুরু করেন তাঁর শিক্ষকতার জীবন। শিক্ষক অবস্থায় 'তরুণ বৌদ্ধ', 'বৌদ্ধ বন্ধু', 'জগজ্জ্যোতি' ও সংঘশক্তি' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। এ ছাড়াও মাসিক 'বসুশ্রী', 'বসুমতী' ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রবন্ধ। দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সবার। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি চলে আসেন স্বদেশে। ১৯৬৯ সালে কানুনগোপাড়াস্থ স্যার আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনার আহ্বান লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে গ্রহণ করেন অবসর। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার পিঙ্গলা গ্রামের গৌরকিশোর বড়ুয়া ও সরসী বালা বড়ুয়ার পুত্র প্রয়াত অধ্যক্ষ প্রমোদরঞ্জন বড়ুয়ার জন্ম ১৯১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। তাঁর ৬ সন্তান (৫ মেয়ে ও ১ পুত্র)। ১৯৩৫ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক এবং ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই এ এবং ১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে অনার্সসহ বি.এ. ও ১৯৪১ সালে এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) পাস করেন। ১৯৫৫ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিসিস গ্রুপে তিনি লাভ করেন এম.এ. ডিগ্রি। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের ক্যাডারভূক্ত তিনি প্রথম বাংলাদেশী বৌদ্ধ। এখানে উল্লেখ্য যে বড়ুয়াদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করতে সক্ষম হন।[৮] এরপর ১৯৪৩ সালে ২২ শে মার্চ তিনি তাঁর শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন চট্টগ্রাম কলেজের পালি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসাবে। ১৯৪৭ সালে ঐ কলেজের পালির অধ্যাপক এবং ১৯৬৪ সালে উপাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে চট্টগ্রাম কলেজ, রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ ও হাজী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা বিভাগ খোলার জন্য অবদান রাখেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৮৫ সালে তাঁর 'পালি প্রবেশিকা' মূল্যবান ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকাশিত ১৯৬৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি

থেকে আর্লি রঙ্কিভজম এন্ড দি ব্রাক্মানিকেল ডকট্রিন্স সহ সর্বমোট ১৬টি গ্রন্থ ও ৪০টির অধিক প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেন।

রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দীর তৃতীয় সন্তান প্রতিভা মুৎসুদ্দী ১৯৪১ সালে শিক্ষা জীবনের সূচনা। ১৯৫১ সালে ডাঃ খাস্তগীর গার্লস স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫৩ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাস ও ১৯৫৬ সালে তিনি অর্থনীতিতে বিএ সম্মান ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে কারাবরণ করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন্স হলের প্রথম ভি.পি নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে পাস করেন এম.এ.। বেছে নেন শিক্ষকতার জীবন। ১৯৬০ সালে চাকুরী জীবনের শুরুতে কক্সবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হয়েছিলেন প্রধান শিক্ষিকা। ১৯৬১ সালে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন জয়দেবপুর বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৬৩ সালে ভারতেশ্বরী হোমসে অর্থনীতির প্রভাষিকা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে তাঁকে অধ্যক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ১৯৭২ সালে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক (শিক্ষা) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখার জন্য রোটারী ইন্টারন্যাশনাল তাঁকে 'পল হ্যারিস ফেলো এওয়ার্ডে' ভূষিত করেন। ২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে করে ভূষিত। এছাড়া তিনি আরো বহু সম্মান ও সংবর্ধনা লাভ করেন। রাউজান থানার আবুরখালী গ্রামের প্রয়াত প্রফুল্ল কমল বড়ুয়ার পুত্র ড. প্রণব কুমার বড়ুয়ার জন্ম ১৯৩৪ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং পালিতে ডাবল এম.এ. করে শিক্ষকতা শুরু করেন রাঙ্গুনীয়া কলেজে। পরে উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন কুন্ডেশ্বরী আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে। সর্বশেষে অগ্রসার আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'পালোত্তর যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম' শিরোনামে গবেষণা করে তিনি লাভ করেছেন ডক্টরেট ডিগ্রি। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের তিনি মহাসচিব। বহু আন্তর্জাতিক ও স্বদেশী বৌদ্ধ সংগঠন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। বক্তা ও লেখক হিসাবে তাঁর রয়েছে খ্যাতি, বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের বাঙালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অতীশ দীপঙ্কর, বিশুদ্ধানন্দ জীবনী (ইংরেজী), বৌদ্ধ পরিনয় পদ্ধতি, বৌদ্ধ আচরণবিধি সহ বেশ কয়েকটা গ্রন্থ ও প্রচুর প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন।[৯] ১৯২৬ সালে রাউজানের রামধন স্মৃতি ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও বৌদ্ধদের ইতিহাসে একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। এ স্মৃতি ভান্ডার শ্রীলংকা ও ব্রহ্মদেশে পালি ভাষা সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বহু ভিক্ষু সুযোগ লাভ করেন।[১০]

চন্দনাইশ থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত মুনীন্দ্র চন্দ্র বড়ুয়ার চতুর্থ সন্তান বিনয় রতন বড়ুয়া ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৬০ সালে ইন্টারমিডিয়েট, ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব

বিজ্ঞানে অনার্স এবং ১৯৬৪ সালে লাভ করেন এম.কম ডিগ্রি। ১৯৬৭ সালে প্রাদেশিক শিক্ষা সার্ভিসে যোগদান করে প্রথমে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে বিভিন্ন সরকারী কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৯১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েল পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৯২ সালে তিনি প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসাবে যোগদানের আগে বিভিন্ন সরকারী কলেজে তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাউজান থানার আবুরখালী গ্রামের প্রয়াত অনুভব কুমার বড়ুয়ার কন্যা প্রীতিকণা বড়ুয়া পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এস.সি সরকারী কলেজের প্রভাষক হিসাবে শুরু করেন তাঁর অধ্যাপনার জীবন। তিনি হলেন বৌদ্ধ মহিলা কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রফেসর এবং আলমা সরকারী মহিলা কলেজ, কুষ্টিয়া, অধ্যক্ষা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বৌদ্ধ মহিলা। সেখান থেকে তিনি নোয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ এবং পরে চন্দনাইশ থানার গাছবাড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ সামাজিক কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দীর্ঘদিন যাবৎ। সুযোগ পেলে লেখালেখিও করেন। বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহিলা সমিতি ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ মহিলা শাখার সভানেত্রী হিসাবে বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে বাংলাদেশের বৌদ্ধ নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[১১]

রাঙ্গুনীয়া থানার নজরটিলা গ্রামের সুমঙ্গল মুৎসুদ্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এস.সি. করেন। শিক্ষাজীবন শেষে পেশাজীবী হিসাবে বেছে নেন সরকারী কলেজগুলোর অধ্যাপনা। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার পর প্রফেসর হিসাবে পদন্নোতি পেয়ে চট্টগ্রাম মহসীন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রথম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি বান্দরবন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষর দায়িত্ব লাভ করেন। এখানে চাকুরীরত অবস্থায় সেরা কলেজ শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পান এবং পরে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে কুমিল্লা মহিলা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন অনিল কান্তি বড়ুয়া। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।[১২]

উখিয়া থানার রত্নাপালং অধিবাসী প্রয়াত কালীধন বড়ুয়ার পুত্র জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ থেকে একাউন্টিং-এ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন ও ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিং-এ লাভ করে মাস্টার ডিগ্রি। শিক্ষাজীবন শেষে সরকারী কলেজগুলোতে অধ্যাপনা। হুলাইন সালেহনুর কলেজ থেকে শুরু হয় তাঁর অধ্যাপনার জীবন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রফেসর হিসাবে পদন্নোতি লাভ করে অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পান মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে। এরপরই তিনি নিয়োজিত হন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের পরিচালক। এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সেরা

Dhaka University Institutional Repository

কলেজ শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত লাভ করেন। বাঙলা একাডেমী থেকে 'বীমা', 'হিসাববিজ্ঞান' ও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, ইতিহাস সংক্রান্ত কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'আত্মঅন্বেষণ: বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়' একটি অমূল্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। অধ্যক্ষ সুকোমল বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ পাস করে সদীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে তিনি বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের সচিব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। অধ্যাপক ড. সনজয় বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে সত্তর এর দশকে পাস করে প্রথমে সাংবাদিকতা এবং সুদীর্ঘকাল ধরে সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অধ্যাপনা করছেন। সাতকানিয়া করিয়ানগরের প্রিয়বর্ধন বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে এম.কম পাস করে যোগদান করেন শিক্ষকতা পেশায়। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা এবং কক্সবাজার সরকারী কলেজ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তেমনি সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেছেন অধ্যাপক ভবতোষ চৌধুরী সুদীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে নরসিংদী সরকারী কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া চট্টগ্রাম কলেজে পালির সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। তিনি কক্সবাজার সরকারী কলেজ থেকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক সম্মাননা লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এবং দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ পাঠ করে। অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির মুখপত্র অনোমার সম্পাদক অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা থেকে পাশ করে অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনা করে খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তিনি বর্তমানে বৌদ্ধ একাডেমী জার্নালে সম্পাদক। সরোজ বড়ুয়া ইংরেজী বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। লোহাগড়ার বড়হাতির সন্তোষ কুমার বড়ুয়ার সুযোগ্য কণ্যা অধ্যাপিকা অঞ্জলি বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক সম্মান ও এম.এ ডিগ্রি অর্জন করে বিসিএস শিক্ষায় যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন। ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া ও ড. সুনন্দা বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যা গীতাঞ্জলি বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী বিষয়ে সম্মান ও এম.এ পাশ করে বিসিএস শিক্ষা, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক। সম্প্রতি তিনি অষ্ট্রেলিয়া থেকে এম.এস করেন। এছাড়াও বিসিএস এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দর্শনের সহকারী অধ্যাপক পূর্ণিমা বড়ুয়া এবং সিলেট এমসি কলেজের পরিসংখ্যানের সহকারী অধ্যাপক তুষার কান্তি বড়ুয়া সিলেট এম সি কলেজে অধ্যাপনা করছেন সাধন কৃষ্ণ বড়ুয়া, চট্টগাম মহসিন কলেজের উদ্ভিদ বিভাগের প্রধান সুচারু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজের পদার্থ

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করছেন সুব্রত বড়ুয়া, কক্সবাজার সরকারী কলেজে গণিতে অধ্যাপনা করছেন দীপক কুমার বড়ুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে যারা সরকারী কলেজে অধ্যাপনারত তাদের মধ্যে চন্দনাইশ থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত সুধীর চৌধুরীর কন্যা ড. সুনন্দা বড়ুয়া ২০০৩ সালে প্রফেসর হিসাবে পদন্নোতি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে সর্বশেষ টাঙ্গাইল করোটিয়া সা'দাত কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ২০০৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ড. সুনন্দা বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ মাস্টার্স করেন এবং পালি ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৫ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।[১৩] ড. সুনন্দা বড়ুয়া দীর্ঘদিন লেখালেখি করেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দেশ বিদেশী বহু সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর পিএইচডি'র অভিসন্দর্ভ 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান' বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার মহামণি পাহাড়তলী গ্রামের মৃত শিশির কুমার বড়ুয়া ও বিদ্যুৎ বালা বড়ুয়ার কনিষ্ঠা কন্যা ঝরণা বড়ুয়া ১৯৬৮ সালে দর্শন বিষয়ে অনার্স ও ১৯৬৯ সালে এম. এ. পাশ করে ১৯৭০ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী প্রথমে টাংগাইলের কুমুদিনী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ২০০৩ সালে তিনি প্রফেসর পদে পদন্নোতি লাভ করেন এবং ২০০৩ সালে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দর্শণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৯৭৫ সালে পি. এস. সি'র মাধ্যমে সরকারী কলেজে যোগদান করেন দীর্ঘ ৩৪ বসর অধ্যাপনার পর ২০০৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

রাঙ্গুনীয় থানার পদুয়া গ্রামের প্রয়াত জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী চট্টগ্রাম সরকারী শিক্ষা প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল সংস্কৃতি ও পালি বিভাগে প্রফেসর হিসাবে কর্মরত রয়েছেন কাঞ্চনগরে প্রয়াত সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া পুত্র ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, তিনি ভারতের বেনারস থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন। Buddhist council and Development of Buddhism তাঁর, পিএইচ ডি অভিসন্দভ ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি তিনি যৌথভাবে দীপবংস গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ড. সুকোমল বড়ুয়া ১৯৫২ সালে সাতকানিয়ার ঢেমশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত গণেশ চন্দ্র বড়ুয়া শিক্ষানুরাগী। তিনি ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি বিষয়ে এম.এ (স্বর্ণ পদক) এবং ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৬ সালে পিএইচডি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে ১৯৮৫ সালে যোগদান করে অতি অল্প সময়ে অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়ে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. বড়ুয়া

বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৯৭ সালে পালি সাহিত্যে ধর্মপদ, ১৯৯৮ সালে কোশল ও মার সংযুক্ত, ১৯৯৯ সালে পালি সাহিত্যে ছন্দ ও অলংকার, যৌথভাবে ২০০০ সালে ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশে তার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শিক্ষা জীবনে তিনি বিশ্ব প্রকাশ উপাধি ও অতীশ দীপঙ্কর এওয়ার্ড অর্জন করেন। তিনি ২০০৫ সালে শিক্ষায় অবদানে স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক লাভ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেণুপ্রসাদ বড়ুয়া, পদার্থ বিজ্ঞানের বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, ইংরেজী বিভাগের তপন জ্যোতি বড়ুয়া এবং প্রাচ্যভাষা বিভাগে প্রফেসর হিসাবে কর্মরত রয়েছেন ড. রণজিৎ বড়ুয়া, চকরিয়া মানিকপুরের কৃতি সন্তান ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, তিনি ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য যেসব বিষয়ে যারা ডক্টরেট করেছেন তারা হলেন, উখিয়া থানার রত্নাপালং এর প্রয়াত রাসমোহন বড়ুয়ার পুত্র অনোমদর্শী বড়ুয়া, পরিসংখ্যানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে প্রথম শ্রেণীতে তিনি প্রথম হন এবং একই বিভাগে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পান। পরে স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিসন্দর্ভর জন্য গবেষণা করেন।

রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত ভূপতিরঞ্জন বড়ুয়ার প্রথম পুত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর রেণুপ্রসাদ বড়ুয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে প্রফেসর বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। রাউজান থানার গহিরা গ্রামের প্রয়াত বিপিন বিহারী বড়ুয়ার পুত্র তিনকড়ি বড়ুয়া ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্য বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বৌদ্ধদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থপতি। ১৯৭৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম বৌদ্ধ শিক্ষক। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকননি ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দ্য ইমপ্যাকট অব ফার্ম এ্যান্ড নন-ফার্ম ইনকাম অন এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডওনারশিপ স্ট্রাকচার এ্যান্ড রুরাল ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন : স্টাডি অব এ্য ভিলেজ ইন বাংলাদেশ' অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি ঢাকাস্থ বিশ্ব ব্যাংকে সিনিয়র সোসিওলজিস্ট হিসাবে কর্মরত আছেন। বিশ্ব ব্যাংকে উর্ধতন কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেছেন তিনি প্রথম বাঙালী বৌদ্ধ।[১৪]

রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত পীযুষ বড়ুয়ার পুত্র প্রফেসর সাগরময় বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করছেন। তিনি ১৯৯১ সালে Study on Relation Between Vitamin 'A' and Iron metabolism' বিষয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন।[১৫] বোয়ালখালী থানার চরণদ্বীপ গ্রামের সুরেশ বড়ু

Dhaka University Institutional Repository

য়ার মেজো ছেলে সুবর্ণ বড়ুয়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে বিশেষ গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীন উচ্চপদে তিনি কর্মরত। রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত প্রজাপতি বড়ুয়ার পুত্র বিজয় প্রসাদ বড়ুয়া সম্প্রতি কানাডা থেকে সোসিওলজিতে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন।

রাঙ্গুনীয় থানার ইছামতি গ্রামের দেশপ্রিয় বড়ুয়ার প্রথম পুত্র প্রণবেশ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স করে ভারতের খড়গপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে ডক্টরেট করেছেন। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিংগাপুর ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, সুকুরা, জাপান-এ পোস্ট ডক্টরাল থিসিস করছেন। রাঙ্গুনীয়া থানার শিলক গ্রামের সুশান্ত বড়ুয়ার মধ্যম পুত্র বিকাশ বড়ুয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে কানাডা থেকে স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ওপর অভিসন্দর্ভের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে নিজ বিদ্যায় কনসালট্যান্ট হিসাবে কানাডায় কর্মরত রয়েছেন। রাউজান গ্রামের প্রয়াত মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র প্রবাল বড়ুয়া মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: উন্নয়ন এবং বাস্তবায়ন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন সম্প্রতি। বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষী প্রয়াত ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার প্রথম পুত্র ড. অরুণ বড়ুয়া, বোস রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। মধ্যমপুত্র ড. অশোক বড়ুয়া, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের পরিচালক। প্রথম কন্যা ড. অনিতা বড়ুয়া ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব কেমিকেল বায়োলজির ডেপুটি ডাইরেক্টর। কনিষ্ঠ কন্যা ড. মাধুরী বড়ুয়া, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের প্রফেসর।

চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার শিলকুপ গ্রামের প্রয়াত বৃকোদর বড়ুয়া ও কুলরাণী বড়ুয়ার একমাত্র সন্তান প্রয়াত ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া। তিনি ১৯৩৩ সালে ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় মাস বয়সে মাতৃহারা হন। তিনি ১৯৯০ সালে ৩১ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে স্নাতক পর্যায় লেখাপড়া শেষ করে পালি ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) পাস করেন ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা শিক্ষা পরিষদ থেকে ত্রিপিটক বিশারদ হন। তাঁর সহধর্মীনি ছিলেন প্রফেসর ড. সুনন্দা বড়ুয়া। ১৯৫৮-৫৯ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনো-টিহোল রিসার্চ স্কলার হিসাবে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল থেরোবাদী বৌদ্ধধর্ম ও ভিক্ষু জীবন। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেলোশিপ পেয়ে ঐ গবেষণা কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। এই ফেলোশিপের অধীনে ধর্মের ইতিহাস, অস্তিত্ববাদ, ভারতের ধর্ম, ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, চৈনিক ভাষা ইত্যাদিতে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯৬১ সালে University of London, W.E.I Languam এ.পি. এইচ.ডি. কোর্সে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর সিনিয়ার লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে (সংযুক্ত পালি) যোগদান করেন। ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

সালে 'The Theravad Sangha' অভিসন্দর্ভের জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম বৌদ্ধ শিক্ষক। তাঁরই একক প্রচেষ্টায় পালি সার্বসিডিয়ারী, পালি প্রিলিমিনারী, মাস্টার্স ও অনার্স কোর্স গড়ে ওঠে। (সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৯) ১৯৭০ সালে সংস্কৃত ও পালি বিভাগের সৃষ্টি হয়। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালে প্রথম পালি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। (International Encyclopaedia of Buddhist (Pakistan), Vol-54. Negendra Kr. Singh, (ed), New delhi, India, 1998, P-85) তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ১০টি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কথায় ধর্মপদ (১৯৬৮), মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা ও সংকলন (১৯৬৬), মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য (১৯৭০), The Theravada Sangha (1978), পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য়) (১৯৮০, ১৯৮৮) এবং প্রকাশিত ৪টি গ্রন্থ রয়েছে। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সেমিনারে পঠিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। এছাড়াও স্কুল পর্যায় বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার পাঠ্য বই তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। (সৌম্য, ২০০৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩০) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগে পালির পঠন পাঠন এবং উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখেন প্রফেসর রণধীর বড়ুয়া, প্রিন্সিপাল প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, শীলাচারশাস্ত্রী প্রমুখ। ((Ibid, International Encyclopaedia of Buddhist, P.86) চন্দনাইশ থানার দক্ষিণ জোয়ারা গ্রামের প্রয়াত রণজিৎ বড়ুয়ার পুত্র প্রয়াত গিরিশচন্দ্র বড়ুয়ার পালি, বাংলা, সংস্কৃতে সম্পাদিত 'ধর্মপদ' 'জাতকের গল্প', বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। জানা গেছে তাঁর আরও চব্বিশটা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

বিগত শতকের ৬০-এর দশকে অনিল বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী কথা শিল্পী। তাঁর লেখা উপন্যাস সাহিত্য মূল্য বিচার করার সময় বা সামর্থ আমাদের নেই। তবে তার উপন্যাস বিক্রি হত। 'বেস্ট সেলার' ঘোষণার যুগ তখনও বাংলা সাহিত্যে আসেনি। অন্তত বাংলাদেশে। তবে যতটুকু জানা যায় অনিক বড়ুয়া উপন্যাস রচনা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নাম-গোত্রহীন এই লেখকের প্রায় গ্রন্থে বৌদ্ধ চরিত্র থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মা থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু বাঙালীদের পথকষ্ট, জীবন বাঁচানোর জন্য দেশে ফিরে আসার উদগ্র বাসনা, নিরাপত্তার, মানবিক অনুভূতি নিয়ে অনিল বড়ুয়ার রচিত গ্রন্থ সে সময়ের পাঠকদের মনে দাগ কেটেছিল। সে সময়কার পাঠকরা ছিটে ফোঁটা আজও তাঁর কথা স্মরণ করেন। আজকের প্রজন্মের কাছে অনিল বড়ুয়া সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা। শিশির বড়ুয়া লিখেছেন, তিনি দশ থেকে বারটি উপন্যাস রচনা করেন এবং তাঁর বাড়ি সাতকানিয়া ঢেমশা গ্রামে। (অনোমা, ২০০১, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১২৫)

১৯৪৩ সালে নিরুদ্দিষ্ট পিতা সর্বানন্দ ছিলেন রাউজান থানার মধ্য বিনাজুরী গ্রামের অধিবাসী। মাত্র তিন বছর বয়সের সুকুমার বড়ুয়া তখন এতিম প্রায়। সেই শিশু বিগত শতকের ৬০ -এর দশকে জন্মগত ভাবেই হয়ে গেছে ছড়াকার। ছড়ায় তিনি দিয়েছেন নির্মল শিশুভোলা আনন্দ, তীব্র তির্যক

Dhaka University Institutional Repository

খোঁচা, অবিশ্বাস্য ছন্দ মাখা। দখল করে নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে ছড়াকারের শূন্য আসন। উভয় বাংলায় তাঁর মত সফল ছড়াকার নেই। বাংলা সাহিত্যে ছড়া জগতে ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া শীর্ষখ্যাতি লাভ করেছেন। দশ থেকে বারটির মত ছড়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার, তিনি লাভ করেছেন আজীবন জনকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার; পেয়েছেন অসংখ্য সম্মাননা ও সংবর্ধনা।

ফটিকছড়ি থানার ছিলোনিয়া গ্রামের প্রয়াত অন্নদা বড়ুয়ার পুত্র সুব্রত বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ১৯৬৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে ছিলেন প্রশাসক, জীবনের প্রিয় আনন্দ লেখা। তাঁর রচিত গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, কবিতা, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশটিরও বেশী। বিজ্ঞান বিষয়েও সুখপাঠ্য বেশ কয়েকটা তথ্য বহুল গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। সাহিত্যিক সুব্রত বড়ুয়া বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার (তিন বিষয়ে তিনবার) বিজ্ঞান চর্চায় অবদানের জন্য চট্টগ্রাম বিজ্ঞান পরিষদ স্বর্ণপদক, পেয়েছেন সম্মাননা। তিনি একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। রাঙ্গুনীয়া থানার ইছামতি গ্রামের প্রয়াত ডা. অরুণ কুমার বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র বিপ্রদাশ বড়ুয়া। চাকরী করেছেন। কিন্তু সাহিত্য সেবাটাই তাঁর মূল কর্ম। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স সহ স্নাতক, ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯৬৮ সালে সালেহ নুর কলেজ, পটিয়া, শুরু করেছিলেন অধ্যাপনা, তিনি ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনার পর ব্র্যাক-এর গণ-কেন্দ্র পত্রিকায় চাকুরী করেন ১৯৭৬-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৭ সালে সহকারী পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন শিশু একাডেমী এবং ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৭৬ সাল তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গবেষণা, শিশুতোষ গ্রন্থ, প্রকৃতি বিষয়ক গ্রন্থ, জীবনী, নাটক, পাঠ্যপুস্তক ও সম্পাদনা করেন সত্তরটির অধিক গ্রন্থ। সাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া পুরস্কার পেয়েছেন বেশ কয়েকটা, কথাশিল্পী সাহিত্য পুরস্কার, আন্তর্জাতিক যুববর্ষ পদক, অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক। তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান উপন্যাসিক ও লেখক। এছাড়াও সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া (১৯২১-১৯৬৮) চট্টগ্রামের ফটিক ছড়িরতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধদের ক্ষণকালে এক সরব প্রতিবাদী প্রগতিশীল সৃজনশীল লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত গল্প, নাটক, উপন্যাস প্রশংসা লাভ করে। তিনি পারমিতা ও বিশ্বমৈত্রীর সম্পাদক ছিলেন (বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-১৩) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চাকরীরত কবি ছড়াকার সুজন বড়ুয়া, দীপক বড়ুয়া, বিপুল বড়ুয়া, উৎপল কান্তি বড়ুয়া শিশু সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। বাংলাদেশে কবিয়াল রমেশ শীল ছিলেন কবিগানের দিকপাল। তার জুড়ি, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফনী বড়ুয়া। একজন তরুণ কবিয়াল ফনী বড়ুয়া কবি গানে

Dhaka University Institutional Repository

গানে হয়েছিলেন পরিণত, প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে একুশ পদক দেওয়ার পর হঠাৎ করেই যেন তিনি হয়ে উঠলেন বরেণ্য। ১৯১৫ সালে রাউজান থানার পাঁচখাইন গ্রামে ফনী বড়ুয়ার জন্ম। পিতা প্রয়াত নন্দকুমার। শৈশবে মাতৃহারা কবিয়াল অনাদর ও অবহেলায় প্রাথমিক পর্যায় গিয়েই তাঁর শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হয়। রাঙ্গুনীয়া থানার পদুয়া গ্রামে গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিন বছর প্রব্রজ্যা জীবন কাটিয়ে ভাগ্যান্বেষণে চলে যান বার্মা। সেখানেই তিনি পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন কবিয়াল শেখ আহমদ, নিবারণ শীল ও মতিয়াল বড়ুয়ার। দোহার হিসাবে কবিগানে নিয়মিত অংশগ্রহণ শুরু করেন কবিয়াল মতিয়াল বড়ুয়ার উৎসাহ আর উদ্দীপনায়। ফিরে আসেন দেশে। তিনি রচনা করেছেন গীতি কবিতা, যার মধ্যে 'হাল জামানার গান', 'দেশের ডাক', 'জনতার গান' প্রকাশিত হয়েছে।

রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের শিক্ষক মোহনচন্দ্র বড়ুয়ার প্রথম পুত্র জগদানন্দ বড়ুয়া। ১৯২০ সালে ২৬ নভেম্বর তাঁর জন্ম। স্বগ্রামের মহামুনি এ্যাংলো পালি ইনষ্টিটিউশনে যথারীতি ও যথাসময় শিক্ষা জীবনের শুরু। পিতা প্রয়াত মোহনচন্দ্র বড়ুয়া প্রধান শিক্ষক। ১৯৩৬ সালে পাস করেন ম্যাট্রিকুলেশান। ১৯৪১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে অনার্স নিয়ে পাস করেন স্নাতক। ১৯৪৭ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে পাস করেন বি.টি.। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করলেও তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে সঙ্গীত, তাঁর মূল ভুবনে। প্রায় মাঝ বয়সে এসে ১৯৭৪ সালে সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য চলে যান ভারত। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সঙ্গীত সাধনায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বাঁশী ও জলতরঙ্গে। সুগায়ক না হলেও সঙ্গীতে তিনি পণ্ডিত। তিনি রচনা করেছেন সঙ্গীতের ১৭টি গ্রন্থ। ১৯৭৯ সালে তিনি শুরু করেন 'ধ্রুব পরিষদ' ধ্রুব পরিষদ বাংলাদেশে সঙ্গীতে পরীক্ষা গ্রহণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সারা বাংলাদেশ জুড়ে চলছে এর কর্মকাণ্ড। চর্চার সঙ্গীতকে তিনি তুলে ধরলেন অধ্যয়নের পর্যায়। এছাড়াও স্বনামখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতাচার্য ওস্তাদ অমিতাভ বড়ুয়া, ওস্তাদ মনোরঞ্জন বড়ুয়া, ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া, নন্দিত কণ্ঠ শিল্পী ও কীর্তনীয়া শাক্যমিত্র বড়ুয়া। গত শতাব্দীর '৬০ দশকে আবুরখীল রাউজানের শেলু বড়ুয়া, শিখা বড়ুয়া, ভাস্বতী বড়ুয়া, রুমি বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়া নজর টিলার অনামিকা বড়ুয়া, সমর বড়ুয়া, সমীরন বড়ুয়া, পীযুষ বড়ুয়া এবং বর্তমানে ত্রিদিব কুসুম বড়ুয়া, জীবক বড়ুয়া, তাপশ বড়ুয়া, সাগর বড়ুয়া, শরণ বড়ুয়া, অশ্রু বড়ুয়া, লিটন বড়ুয়া মত অনেকেই রেডিও-টেলিভিশনে গান পরিবেশন করতে শুরু করেছেন। তাদের মত আরও অনেকেই কিন্তু সঙ্গীত পরিবেশন করেও হয়ে ওঠেনি পেশা। কেউ কেউ সঙ্গীত শিক্ষক হয়েছেন কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ হয়নি কেউ। সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন নিয়ে ধর্মদর্শী বড়ুয়া ও মীনা বড়ুয়া বেতারে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রশাসনিক। মীনা বড়ুয়া খন্ডকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু রাঙ্গুনীয় থানার ইছামতি গ্রামের বিমল বড়ুয়ার পুত্র পার্থ বড়ুয়া সঙ্গীতে পেয়েছেন জনপ্রিয়তা, গ্রহণ করেছেন জীবিকা হিসাবে। সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, সঙ্গীত প্রযোজনা করছেন আবার করেছেন সঙ্গীত রেকর্ডের

Dhaka University Institutional Repository

স্টুডিও। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তুখোড় হাওয়াইয়ান গিটার বাদক রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত মুকুন্দ রাঘব বড়ুয়ার প্রথম পুত্র মানবেন্দ্র বড়ুয়ার কথা আমরা বোধ হয় স্মরণও করতে পারবনা। ওস্তাদ নীরদবরণ বড়ুয়ার কথা কেই বা স্মরণ করছি। কেউ বা তুলে আনছি তাঁকে আমাদের মেধাবী সমাজে। অথচ সঙ্গীত ভুবনে উভয়ের ছিল দৃপ্ত পদচারণা।

অবিভক্ত ভারবর্ষে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের এক তরুণ ভাগ্যান্বেষণে চলে গিয়েছিল কোলকাতা। নিজের দক্ষতার স্থান করে নিয়েছিল কোলকাতা মোহনবাগান ফুটবল চলে। তখনও চার তিন চার বা তিন চার চার বা টোটাল ফুটবল আসেনি দক্ষিণ এশিয়ায়। ফুটবলে ভারতবর্ষের সেরা দল ছিল মোহনবাগান, এখনও আছে। সেই টিমের রাইট স্টপার ব্যাক হিসাবে খেলত এক বাঙালী বৌদ্ধ যুবক। পি.বড়ুয়া বা জুম্মাইয়া বলে, তাঁর আসল নাম পূর্ণেন্দু মুৎসুদ্দী। ডেপুটি ক্যাপ্টেন হয়ে ছিলেন মোহনবাগান দলের। পশ্চিমবঙ্গের লিগ খেলার সাফল্যে আপন যোগ্যতায় স্বাধীন ভারতের জাতীয় দলের পেয়েছিল রক্ষণভাগের দায়িত্ব। ভারতীয় জাতীয় দলের হয়ে এশিয়ার তৎকালীন প্রতাপশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে খেলে বেরিয়েছেন দেশান্তরে। পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এই রাইট স্টপার ব্যাক ছিল মোহনবাগান ও ভারতীয় জাতীয় দলের সদস্য। ষাটের দশক পর্যন্ত কোন বাঙালী বৌদ্ধ মাঠে এতবড় দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। প্রত্যক্ষ খেলা থেকে তিনি অবসর নিয়ে টাটা ফুটবল দলের ছিলেন কোচ ও পরে ম্যানেজার। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। ভারতের সেরা দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া বৌদ্ধদের গর্ব।

রাঙ্গুনীয়া থানার বেতাগী গ্রামের প্রয়াত ডা. সুনীল কান্তি বড়ুয়ার পুত্র সুহাস কান্তি বড়ুয়া গত শতাব্দীর '৭০ থেকে '৮০ দশকের খেলোয়াড়। স্কুল জীবনেই তাঁর ফুটবল খেলার সূচনা। চট্টগ্রামের স্কুল ও ক্লাব পর্যায় অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে তাঁর খেলা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি চলে আসেন ঢাকায়। ১৯৮১ সালে আবাহনী ক্রীড়া চক্রের গোলরক্ষক হিসাবে খেলতে শুরু করেন। জাতীয় যুব দলের তিনি ছিলেন গোলরক্ষক। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য হিসাবে কিংস কাপ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে এশিয়ান ইয়ুথ ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইরানে। জাতীয় দলের সদস্য হিসাবে তিনি এ খেলায় অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালে আবাহনী ক্রীড়া চক্রের ফুটবল দলের সদস্য হিসাবে নেপালও গিয়েছিলেন। কক্সবাজার রামুর কৃতি ফুটবলার বিজন বড়ুয়া জাতীয় দল হয়ে গোল রক্ষক হিসেবে সুনামের সাথে খেলেন। তিনি উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে ক্রীড়া ফুটবল জগতের একজন স্বনামখ্যাত ফুটবলার। এছাড়াও দেবাশীষ বড়ুয়া, কাঞ্চন বড়ুয়া উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সংবাদপত্র ও সংবাদ সাহিত্য শতবর্ষ অতিক্রম করলেও পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্রসেবীরা বৌদ্ধ সমাজে ষাটের দশকেও স্বীকৃতি পায়নি। দৈনিক পত্রিকা বা সাপ্তাহিকীর পাঠক সমাজে গড়ে উঠলেও সাধারণের কাছে সাংবাদিকতা বা সংবাদ পত্রসেবীরা অচেনা ও অজানা

Dhaka University Institutional Repository

কর্মী। রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত ডা. রমেশ চন্দ্র চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র প্রয়াত বিশ্বেশ্বর চৌধুরী ১৯৪২ সালে বাংলা সংবাদপত্র জগতের নবীন পর্যায় সাংবাদিকতা শুরু করেছেন এবং পেশা হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। তিনিই প্রথম বাঙালী বৌদ্ধ সাংবাদিকতায় এসেছেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর সাংবাদিকতা করেন। তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত সৌরীন্দ্র মুৎসুদ্দীর তৃতীয় পুত্র প্রয়াত রামেন্দু মুৎসুদ্দী অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছিলেন। মাতুল প্রয়াত বিশ্বেশ্বর চৌধুরীকে অনুসরণ করে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির সমর্থন 'দৈনিক লোকসেবক' পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন ১৯৫০ সালে। সহ-সম্পাদক থেকে কর্মজীবন শুরু করে ক্রমশ বার্তা সম্পাদক ও পরবর্তীতে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দৈনিক লোকসেবকের নিয়মিত কর্মচারী থাকাকালেই ফিন্যান্সার হিসাবে ইংরেজী দৈনিকেও তিনি লিখতেন। ১৯৯৫ সালে মৃত্যুবরণ করার আগে পর্যন্ত তিনি করে গেছেন সাংবাদিকতা। মহামুনি পাহাড়তলীর ফণিভূষণ বড়ুয়ার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা পার্থপ্রতীম বড়ুয়া স্বাধীনতার পর পূর্বাঞ্চলের প্রথম বাংলা দৈনিক অমর বাংলার প্রকাশক ও সম্পাদক ছিলেন।

এই এক পথ ধরে রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত ডা. তেজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার একমাত্র পুত্র দেবপ্রিয় বড়ুয়া, ডি.পি. বড়ুয়া নামে অধিক পরিচিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. করার সময় থেকে ১৯৫৫-৫৮ সালে শুরু করেছিলেন তৎকালীন 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় সাংবাদিকতা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রথমে ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও পরে এই দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ডি.পি. বড়ুয়ার নামের পাশে লেখা হত বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক। অথচ প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার অনেক অনেকদিন আগে থেকে তিনি শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতা। আমাদের সৌভাগ্য ডি.পি. বড়ুয়া তাঁর পেশাজীবনের পরিচয় পেলেন। যে কোন মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাঁর দিয়ে। বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁর সমাজকর্ম জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেন। এছাড়া দেশ-বিদেশে বহু সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদান করেন প্রতিনিধিত্ব করেন। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধী ইনস্টিটিউটের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৬০ দশকে রাঙ্গুনীয়া থানার নজরটিলা গ্রামের প্রয়াত ডা. সামন্তভদ্র মুৎসুদ্দীর একমাত্র পুত্র চিন্ময় মুৎসুদ্দী, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সনসালটেন্ট, ইউ এন ডি পি, প্রধান উপদেষ্টা সম্পাদক, সাপ্তাহিক বিনোদন বিচিত্রা; বোয়ালখালীর প্রিয়নাথ বড়ুয়ার বড় ছেলে বিমলেন্দু বড়ুয়া, আজাদীর সহ সম্পাদক, ফটিকছড়ি থানার মির্জাপুর গ্রামের অজয় বড়ুয়া, ক্রীড়া সাংবাদিক ও সহব্যবস্থাপক সংবাদ ; রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত জ্যোর্তিময় বড়ুয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র শীলব্রত বড়ুয়া, সিনিয়র সাব

Dhaka University Institutional Repository

এডিটর ইত্তেফাক: রাউজান থানার বাগোয়ান গ্রামের প্রয়াত ভূপতিরঞ্জন বড়ুয়ার প্রথম পুত্র মনোজ বড়ুয়া জনকণ্ঠ এবং বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, বাঁশখালী জলদীর সমীর কান্তি বড়ুয়া সাংবাদিকতা শুরু করেছেন। আজও এরা সাংবাদিকতা করছেন। রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত সৌরীন্দ্র মুৎসুদ্দীর মধ্যমপুত্র নিখিলন্ধু মুৎসুদ্দী পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতায় চারুশিল্পী হিসাবে জীবনযাপন করেছেন সসম্মানে। অর্জন করেছেন খ্যাতি। রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত ব্যারিস্টার ড. অরবিন্দ বড়ুয়অর স্ত্রী অতসী বড়ুয়া ভারতীয় শিল্পধারা অবলম্বন করে হয়েছেন চারুশিল্পী। গৃহিনী হলেও অজন্তা ইলোরা ধারায় তাঁর অঙ্কিত জাতক কাহিনী প্রশংসিত।

ফটিকছড়ি থানার জাহাপুর গ্রামের সরোজ বড়ুয়ার প্রথম পুত্র অরূপ বড়ুয়া ঢাকা চারুকলা ইনষ্টিটিউট থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। পরে দিল্লী থেকে চারুকলায় এম.এস. করে এসেছেন। ঢাকার একটা প্রখ্যাত ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে রয়েছেন কর্মরত। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন চট্টগ্রাম আর্ট ইনষ্টিটিউট থেকে চারুকলায় এম.এফ.এ করে একই প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক হিসাবে কর্মরত। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা থেকে ফটিক ছড়ি থানার কোর্টের পাড় নিবাসী বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুনীল কান্তি বড়ুয়া একমাত্র পুত্র পল্লব বড়ুয়া, ১৯৯৯ সারে এমএ ফাইনালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। রাউজানের সচীন্দ্র লাল বড়ুয়ার পুত্র কল্লোল বড়ুয়া অতি সম্প্রতি ঢাকা চারুকলা ইনষ্টিটিউট থেকে পাস করেছেন।

ইংরেজ সরকার বৌদ্ধদের প্রতি সহানুভতি সম্পন্ন ছিল। ব্রিটিশ সরকার থেকে রাউজানের রাজপ্রতাপ বড়ুয়া এবং আবুরখীলের রামচন্দ্র বড়ুয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে লেখাপড়ার জন্য শিক্ষাবৃত্তি লাভ করেন।[১৫] রাউজান থানার গুজরা বৈদ্যপাড়া গ্রামের প্রয়াত ডা. দীনবন্ধু বড়ুয়ার পুত্র ডা. ধীমান বড়ুয়া।[১৬] চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে এল.এম.এফ. পাস করেন এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন লেক মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৯৪৯ সালে। ১৯৫৬ সালে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কিং জর্জেস মেডিকেল কলেজথেকে স্বর্ণপদকসহ লাভ করেন এম.ডি. এবং এফ আর সি ডিগ্রি। ১৯৪৯-৫৪ সাল পর্যন্ত কোলকাতা মেডিকেল কলেজের ছিলেন প্রভাষক। ১৯৫৬-৬০ সাল পর্যন্ত ইনষ্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল এ্যান্ড রিসার্চের ছিলেন সহকারী অধ্যাপক ও পরবর্তীতে রিভার; কোলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে প্রথম ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক এবং পরে অধ্যাপক। জেনেভাস্থ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্টাফ মেম্বার হিসাবে কাজ করেছেন ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত পরে ঐ একই সংস্থার কনসালট্যান্ট হিসাবে কাজ করেছেন ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৭৪ ও ১৯৯২ সালে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কলেরা সম্পর্কিত। চিকিৎসা জগতে বড়ুয়া 'থিয়োরী (ORS) এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক কলেরা ও উদরাময়

গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ, কর্তৃক আয়োজিত ডায়রিয়া ও পুষ্টি সংক্রান্ত দশম এশিয়ান সম্মেলনে 'লাইফটাইম এচিভমেন্ট- ২০০৩' প্রদান করা হয় ডা. ধীমান বড়ুয়াকে।[১৭]

পটিয়া থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের ডা. দেব প্রসাদ বড়ুয়া প্রফেসর হিসাবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এম.ফিল করেন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। ডীল অব ফ্যাকালটি মেডিসিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য এবং ইনস্টিটিউট অব এপ্লাইড হেলথ এবং ইউ এস টি সির পরিচালক ছিলেন। ফটিকছড়ি থানার কোটেরপাড়া গ্রামের ডা. অরবিন্দ বড়ুয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস করেন এবং এম.আর.জি.ও.জি করেন ইংল্যান্ড থেকে। প্রফেসর হিসাবে মেডিকেল কলেজসমূহে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনি গাইনী বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা বিষয়ক লেখক। বাঁশখালী থানার জলদী গ্রামের সোমেশ চন্দ্র বড়ুয়ার প্রথম পুত্র ডা. প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাস করেন। ১৯৮৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলো হিসাবে ভারতে পণ্ডিচেরী থেকে মেডিকেল কলেজ শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করেন বিশেষ প্রশিক্ষণ। ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে কম্যুনিটি মেডিসিনে লাভ করেন মাস্টার্স ডিগ্রি। সম্প্রতি বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ সমূহের মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে পেয়েছেন পদোন্নতি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে প্রফেসর হিসেবে কর্তব্যরত আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে ডাক্তারী পেশায় সাফল্য পেয়েছেন চট্টগ্রাম বোয়ালখালী কধুর খীল এর প্রফেসর ডা. বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া (ডা. বি.বি বড়ুয়া)। তিনি ১৯৩৯ সালে ২রা জুন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি Fellow WHO (জেনেভা) এবং সম্প্রতি ২০০৫ সালে আমেরিক থেকে Family Medicin এ Ph.D ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বর্তমানে রেডিয়েন্ট কলেজে মেডিকেল টেকনোলজি প্রিন্সিপাল এবং আল্ট্রাসাউন্ড এন্ড ইমেজিং এর ডাইরেক্টর। প্রফেসর ড. বি বি বড়ুয়া মেডিকেল বা ডাক্তারী বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে Elementary Human Embryology, Text Book of Fundamental Faimly Medicine, Text Book of Reporductive Health, Induced Abortion, ফেমিলি মিডিসিন, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি। বাঙালি বৌদ্ধদের গৌরব ডা.বি.বি. বড়ুয়ার বড় ছেলে ডা. রজত সুব্র বড়ুয়া সিলেক্টেড ফর পোষ্ট ডক্টরেট ফেলো শিফ কার্ডিওলজি বিষয়ে ২০০২ সালে আমেরিকা থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর ছোট ছেলে ডা. শঙ্কর সুব্র বড়ুয়া অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি ফেলো হিসেবে অধ্যয়নরত।

চিকিৎসা শাস্ত্রে বাঙালী বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত সুমেধ মুৎসুদ্দী বিগত শতাব্দীর '৪০ দশকে প্রথমে এল.এম.এফ এবং পরে এম.বি.বি.এস করে চিকিৎসক হয়েছিলেন। একই ধারায় এরপর রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত কিরণ বিকাশ মুৎসুদ্দীর চতুর্থ কন্যা প্রয়াত মীরা মুৎসুদ্দী, রাঙ্গুনীয়া থানার বেতাগী গ্রামের প্রয়াত দ্রোণ বড়ুয়ার মধ্যম কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

রেনু কণা বড়ুয়া এবং রাউজান থানার আবুরখালী গ্রামের প্রয়াত বিভূতি ভূষণ বড়ুয়ার কন্যা রেণু কণা বড়ুয়া হয়েছেন চিকিৎসক। তিনি মহিলা মুক্তিযোদ্ধা পদকে ভূষিত। সরাসরি এম.বি.বি.এস কোর্সে ভর্তি হয়ে প্রথম বৌদ্ধ মহিলা চিকিৎসক হয়েছেন রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত বসুভূতি মুৎসুদ্দীর কনিষ্ঠ কন্যা ডা. দর্পণা মুৎসুদ্দী। তিনি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মহাপরিচালকের দফতরে উপ-পরিচালক হিসাবে কর্মরত। প্রায় একই সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে রাঙ্গুনীয়া থানার নজরটিলা গ্রামের প্রয়াত চাণক্য মুৎসুদ্দীর দ্বিতীয় কন্যা নন্দিতা মুৎসুদ্দী হয়েছেন চিকিৎসক। পটিয়ার প্রথম এম.বি.বি.এস ডাক্তারি পাস এবং গাইনিতে এফ.সি.পি.এস লাভকারী প্রথম বৌদ্ধ মহিলা ডা. শিউলী চৌধুরী ছন্দা। দ্বিতীয় পর্যায়ে এফ.সি.পি.এস পাস করেন ডা. দীপি বড়ুয়া। মীরসরাই গ্রামের ডা. শুভঙ্কর বড়ুয়া ও সুখদা বড়ুয়ার চতুর্থ কন্যা ডা. দীপি বড়ুয়া। তিনি ১৯৫৯ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক, ১৯৭৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৮৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন এবং ইন্টার্নীশীপ শেষে সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে মিডফোর্ড হাসপাতালে স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিদ্যার উপর ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে এম.সি.ড়ি.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৪ সালে ঢাকা হ্যালি ফ্যামিলি হাসপাতালে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সময় Course in Ultra Sonography ট্রেনিং গ্রহণ, ১৯৯৫ সালে IPGMR এ DGO, ১৯৯৭ সালে নেপালে MRCOG. Part-I উত্তীর্ণ হন ২০০০ সনে FCPS ডিগ্রী অর্জন করে। বর্তমানে তিনি MS Final পর্বে অধ্যায়নরত। তাঁর স্বামী চারুলতার নির্বাহী উপচেষ্টা ডা. অসীম রঞ্জন বড়ুয়া। তাঁর তিন মেয়ে, অন্তরা বড়ুয়া অপি (মেডিকেলে অধ্যয়নরত), অনি ও আনিকা স্কুল পড়ুয়া। তিনি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োজিত আছেন। মীরেরসরাই দমদমার এর ডা. শুভাঙ্কর বড়ুয়ার ছেলে ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিওরোলজী বিষয়ে ডাক্তারি পেশায় থেকে সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি ২০০৩ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

চট্টগ্রাম রাউজানের সমাজসেবক শিক্ষাব্রতী নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া ও নীলিমা বড়ুয়ার ছেলে ডা. সিতাংশ বিকাশ বড়ুয়া। তাঁর জন্ম ১৯৪৪ সালে এবং মৃত্যু ২০০৪ সালে ২৭ মে, তিনি ১৯৬৭ সালে এমবিবিএস ও ১৯৭২-১৯৭৭ সালে ঢাকা পিজি হাসপাতাল থেকে এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। বৌদ্ধদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এফসিপিএস এবং প্রথম শল্য চিকিৎসক।[১৮]

তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিসিয়ান এন্ড সার্জন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে এনাটমি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ১৯৭৬ সালে ঢাকা মিটফোর্ট হাসপাতাল (রেজিষ্ট্রার), ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক এবং অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। তিনি Family Planning Certificate Course,

Dhaka University Institutional Repository

Atomic Energy Training Certificate Course, Acu-Functure Training Certificate প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি এফ আর সি এস সার্জারীতে স্বনামখ্যাত ছিলেন।

তিনি পেশায় শল্য চিকিৎসক। নেশায় লেখক, গবেষক, অনুবাদক, সংগঠক, সমাজসেবক। তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের পণ্ডিত। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অর্ধশতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ-নিবন্ধ। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো চট্টগ্রামের ইতিহাস (১৯৮২), দশপারমী ও চরিয়াপিটক (১৯৮৮), ধাতুকথা (সানুবাদ, ১৯৯০), আর্য মৈত্রেয় বুদ্ধ (১৯৯৫), বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা (১৯৯৫), বৌদ্ধ পারিবারিক আইন (১৯৯৭), Buddhism in Bangladesh (1990) প্রভৃতি। ডা. বড়ুয়া সহধর্মীনি রোমিলা বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যায় থেকে এম. এ, বিএড, শিক্ষিকা। তিন কন্যা সন্তানের জনক। প্রথম কন্যা ডা. নিরুপমা বড়ুয়া, এম আর সি এস ডিগ্রী লাভ করেন; দ্বিতীয় কন্যা ডা. অনুপমা বড়ুয়া এম.বিবিএস লন্ডনে এফসিপিএস এবং এম আর সিএস অধ্যায়নরত, তৃতীয় কন্যা ডাঃ তিলোত্তমা বড়ুয়া। সরকারী মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস ডাক্তার হিসাবে ডা. নীহার রঞ্জন বড়ুয়া, ডা. পুলক কান্তি বড়ুয়া, ডা. পারমিতা বড়ুয়া, ডা.নীহারেন্দু বড়ুয়া, ডা. মির্নতি প্রভা বড়ুয়া, ডা. বসুবন্ধু বড়ুয়া, ডা. পুণ্যবর্ধন বড়ুয়া, ডা. উত্তম বড়ুয়া, উল্লেখ যোগ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্যাথলজি ডাক্তারী পেশা ও শিক্ষকতায় সাফল্য লাভ করেন মীরেরসরাই তুলাবাড়ীয়ার প্রয়াত ডা. নির্মলেন্দু বড়ুয়ার পুত্র ডা. অসীম রঞ্জন বড়ুয়া। তিনি এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। বর্তমানে চারুলতা পরিষদের নির্বাহী উপদেষ্টা। চন্দনাইশ থানার দক্ষিণ জোয়ার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়ার পুত্র ডা. অসীম কুমার বড়ুয়া সম্প্রতি ২০০৫ সালে বেসরকারী মেডিকেল ইউএসটি সি এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে যোগদান করেন। ফটিকছড়ি ছিলোনিয়া ডা. যদুনাথ বড়ুয়া, ডা. ভাগ্যধন বড়ুয়া, ডা. সলিল কুসুম বড়ুয়া, ডা. অরুন কুমার বড়ুয়া, ডা. সুমেধ বড়ুয়া, ডা. ধর্মদর্শী মুৎসুদ্দি, ডা. অনুপম বড়ুয়া, ডা. অশীতি রঞ্জন বড়ুয়া, ডা. প্রবোধ চন্দ্র বড়ুয়া, ডা. নীহার কুসুম বড়ুয়া, ডা. চৌধুরী চিরঞ্জীব বড়ুয়া, ডা. মিহির বরণ বড়ুয়া, ডা. কল্যাণ বড়ুয়া, ডা. প্রীতিপ্রসুন বড়ুয়া, ডা. অলক বড়ুয়া, ডা. সন্তোষ বড়ুয়া, ডা. ইন্দু ভূষণ বড়ুয়া, ডা. সুদর্শন বড়ুয়া, ডা. মৃনাল কান্তি বড়ুয়া, ডা. প্রিয়দর্শন চৌধুরী, ডা. পলাশ বড়ুয়া, ডা. জয়ন্ত চৌধুরী, ডা. রনজিত বিকাশ বড়ুয়া, ডা. পিসি বড়ুয়া, ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, ডা. বিদ্যুৎ বড়ুয়া, ডা. ভূষণ চন্দ্র বড়ুয়া,ডা. তরুন তপন বড়ুয়া,ডা.প্রীতিশ বড়ুয়া, ডা. সুজন বড়ুয়া, ডা. মৃগাংক বড়ুয়া, ডা. প্রণব বড়ুয়া, ডা. সমর বড়ুয়া, ডা. শ্যামল কান্তি বড়ুয়া, ডা. সনৎ বড়ুয়া, ডা. দেবযানী বড়ুয়া, ডা. নীলকমল বড়ুয়া, ডা. নন্দিতা বড়ুয়া, বড়ুয়া, প্রমুখ।

এছাড়া এরপর সরাসরি এম.বি.বি.এস কোর্সে লেখাপড়া করে চিকিৎসক হয়েছেন ডা. প্রকৃতি বড়ুয়া, ডা. নিরুপমা বড়ুয়া, ডা. রমা বড়ুয়া, ডা. স্নিগ্ধা বড়ুয়া, ডা. প্রীতি বড়ুয়া, মেমন হাসপাতাল। বর্তমার

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তারী পেশায় উল্লেখ করার মত অনেক ডাক্তার আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পঞ্চাশের দশকের অর্থনীতি থেকে পাস করা পীযুষ কান্তি বড়ুয়া, কুমিল্লা বার্ডের পরিচালক ছিলেন। একই ভাবে পরবর্তীতে কুমিল্লা বার্ডের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন বিজয় বড়ুয়া। ব্যাংকিং-এ কাজ করতে শুরু করেছিল বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের স্বল্প কিছু মানুষ। ব্যাংকিং পেশাটা বেশ অভিজাত ছিল। আমাদের সমাজে প্রথম দিকে যারা ব্যাংকার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন, রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামের প্রয়াত সুখেন্দু বিকাশ বড়ুয়া। ১৯৪৮ সালে লয়েডস ব্যাংকে তিনি জুনিয়র অফিসার হিসাবে শুরু করেছিলন তাঁর কর্মজীবন। জাঁদরেল অফিসার হিসাবে অবসর নিয়েছিলেন ১৯৮০ সালে। চন্দনাইশ থানার গাছবাড়িয়া গ্রামের সন্তোষ কুমার বড়ুয়া লয়েডস ব্যাংকে যোগদান করেন ১৯৫৫ সালে। সেখানে থেকে চলে আসনে ইউনাইটেড ব্যাংকে আবার সেখান থেকে জনতা ব্যাংকে যোগদান করেন। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৯১ সালে। চন্দনাইশ থানার গাছবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত ভারতচন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র সুদত্ত বড়ুয়া জনতা ব্যাংকে যোগদান করে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। অগ্রণী ব্যাংকের এজিএম অব. জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া, বেতাগী। রাহুল কান্তি বড়ুয়া সিটি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাউজান আবুরখিলের ইঞ্জিনিয়ার যীশু কুমার বড়ুয়া, শিল্প ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার, জনতা ব্যাংকের সিনিয়ার প্রিন্সিপাল অফিসার কৃষ্ণ প্রসাদ বড়ুয়া, জনতা ব্যাংকের সাবেক ডিডিএম ছিলেন সন্তোষ কুমার বড়ুয়া, অটল বিহারী বড়ুয়া, রূপালী ব্যাংকের অব. সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার।

রাঙ্গুনীয়া থানার বেতাগী গ্রামের প্রয়াত কালী মোহন বড়ুয়ার পুত্র জ্ঞানবিকাশ বড়ুয়া ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম পাস করে ডি.এ.আই.বি.পি প্রথম পর্ব করেছেন। ১৯৫৮-৬০ সাল পর্যন্ত কুমিল্লার ফয়েজুন্নেসা কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬০-১৯৬৩ পর্যন্ত ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের সাব-এ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৬৩-১৯৭২ কমার্স ব্যাংক লি. -এর ছিলেন এ্যাকাউন্টেন্ট ও ম্যানেজার। ১৯৭২-৮৬ জাতীয়করণকৃত অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও হেড অফিসে সিনিয়ার প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৮৭-৮৮ তিনি ছিলেন আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান। ১৯৮৯-৯৫ মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসাবে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন।

ব্যাংকিং সংক্রান্ত অনেকগুলো ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন ও পরিচালনাও করেন। অগ্রণী ব্যাংকের মুখপত্র 'অগ্রণী দর্পণে' তিনি নিয়মিত লিখেছেন প্রবন্ধ। বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধ। গল্প ও অনুবাদ। বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত চারটি গ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য মার্কেন্টাইল ব্যাংক এর বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রজ্ঞাজ্যোতি বড়ুয়া, রাউজান আবুরখীলের অরিন্দম বড়ুয়া শেলু ন্যাশনাল ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সোনালী ব্যাংকের এজিএম সীতাকুন্ডের দুলাল বরণ বড়ুয়া, রাউজানের উত্তম বড়ুয়া উত্তরা ব্যাংকের এজিএম সোনালী ব্যাংকের

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার রাঙ্গুনিয়া ঘাটচেক এর সচীন্দ্রলাল বড়ুয়ার পুত্র মুকুল রতন বড়ুয়া । তিনি বোধিবার্তা পত্রিকার সম্পাদক। সাতকানিয়া ঢেমশার মনীন্দ্রলাল বড়ুয়ার পুত্র রিপন বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়া রাজানগরের রাজেন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র নিরুপম বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়া সৈয়দবাড়ী বেনুতোষ তালুকদার, রাঙ্গুনিয়া নজরটিলার মিনতি বড়ুয়া, বেতাগীর সুনির্মল বড়ুয়া, উনাইনপুরার স্নেহরূপ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বৈদ্যপাড়ার মাধুরী বড়ুয়া, মহামুনি পাহাড়তলী স্বপন কুমার বড়ুয়া, অগ্রণী ব্যাংকের সহকারী মহাপরিচালক, রাউজান বিনাজুরীর রবীন্দ্রলাল বড়ুয়া, অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়ার অফিসার, রাঙ্গুনিয়া শিলকের শিখা বড়ুয়া, অগ্রণী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, মরিয়ম নগর, রাঙ্গুনিয়ার মধুমিতা চৌধুরী বড়ুয়া, অডিট এন্ড একাউন্ট অফিসার এজিবি, ঢাকা, রাউজান আবুরখীল রাউজানের অর্পিতা বড়ুয়া ডেপুটি ম্যানেজার,মেঘনা পেট্রোলিয়াম লি. ঢাকা প্রমুখ। গত শতকের '৬০ দশকের শেষ দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আই.বি.এ। উখিয়া থানার রত্নাপালং গ্রামের প্রয়াত কালীচরণ বড়ুয়ার পুত্র প্রবীন বিহারী বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম আই.বি.এ-র চতুর্থ ব্যাচে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে পাস করেছেন। এই বিষয়ে তিনি প্রথম বাঙালী বৌদ্ধ। এম.বি এ ১৯৭৬ সালে পেট্রোবাংলায় অফিসার হিসাবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের মার্কেটিং বিভাগে উপ মহাব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করেন। এরপর এনজিও মাইডাসের হয়েছিলেন চীফ প্রোগ্রাম অফিসার। চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ম্যানেজিং এজেন্সী হিসাবে কাজ শুরু করলেন। ১৯৮০ সাল থেকে করছেন পেইড কনসালটেন্সি। ম্যানেজমেন্টের ওপর বিশের অধিক নিবন্ধ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি বর্তমানে ইমপেক্ট রিচার্স গ্রুপের পরিচালক।

এরপর অনেক বৌদ্ধ যুবক এম.বি.এ. করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিং এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজিৎ বড়ুয়া এম.বি.এ-তে প্রথম স্থান দখল করেছিল। পরে আই বি এর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে আমেরিকায় ফেলোশীপে উচ্চতর গবেষণায় রত। হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামের পুলিন বিহারী বড়ুয়ার পুত্র দীপাল চন্দ্র বড়ুয়া মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থায় নবদিগন্তের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুসের সূচনা লগ্ন থেকেই সহকর্মী। নিজের কর্মশক্তি দিয়ে হলেন গ্রামীণ ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপক এবং 'গ্রামীণ' শক্তির ব্যবস্থাপনা পরিচালক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ করা দীপাল বড়ুয়া সম্প্রতি 'গ্রামীণ ব্যাংকের' উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছেন। এছাড়া ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাকরী করছেন শিমুল বড়ুয়া, প্রশিকার একাউন্টস ম্যানেজার হিসেবে অমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়া কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছেন।

ব্যাংকিং সেক্টরে বাঙালী বৌদ্ধ মহিলাদের অংশগ্রহণ সীমিত। নবীন কিছু মহিলা বিভিন্ন ব্যাংকে যোগদান করলেও ব্যাংকিং-এ অফিসার হিসাবে যার নাম অগ্রগণ্য তিনি হলেন রাঙ্গুনীয়া থানার শিলক

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের সুশান্ত বড়ুয়ার প্রথম কন্যা জ্যোৎস্না বড়ুয়া। ভারতেশ্বরী হোমস থেকে তিনি এস.এস.সি পাস করেন, চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে এইচ.এস.সি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ। ১৯৮০ সালে অগ্রণী ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৭ সালে পদোন্নতি পান সিনিয়র অফিসার হিসাবে। ১৯৯২ সালে হন প্রিন্সিপাল অফিসার এবং ২০০৪ সালে হয়েছেন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার।

প্রকৌ. বিদর্ভ রঞ্জন বড়ুয়া (১৯০৪-১৯৮১) রাঙ্গুনিয়ার কদমতলী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ১৯২৮ সালে এডিনবরা থেকে মেকানিক্যাল ডিগ্রী ও লন্ডন থেকে এ.এম.আই.সি.ই. এর সদস্যপদ লাভ করেন। তিনিই প্রথম বিলাতে বৌদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রথম বৌদ্ধদের মধ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক গ্রন্থের লেখক। তাঁর প্রণীত 'যন্ত্র আবিষ্কার পরিচিতি' পাহাড়ী মালঞ্চ, ভারত মলঞ্চ ও পীলগ্রিম'স পোয়েমস। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় তখন ছিলনা। ছিল আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছিল এই একটা প্রকৌশলী শিক্ষায়তন। পরবর্তীতে '৬০ দশকে ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য করা হয়েছিল বেশকিছু পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট। '৭০ দশকে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বেড়ে গেলে সৃষ্টি করা হয় বিআইটি। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। বিআইটিগুলোও রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে। প্রকৌশলী হিসেবে সরকারী উচ্চপদ থেকে দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া। তিনি সড়ক ও জনপথ বিভাগেরসহ পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রকৌশলী হওয়ার আকাঙ্খা যাদের জেগেছিল ভারতবর্ষ বিভক্তির পর তাদেরকে ছুটে আসতে হয়েছে ঐ আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। রাঙ্গুনীয়া থানার বেতাগী গ্রামের প্রয়াত দ্রোন বড়ুয়ার প্রথম পুত্র প্রয়াত অনিল কুমার বড়ুয়া '৫০ দশকে শুরুতে প্রকৌশলী হওয়ার বাসনায় ভর্তি হয়েছিলেন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। ডিগ্রি লাভের পর করাচী ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নগর পরিকল্পকের চাকরী নিয়ে তিনি চলে যান তৎকালীন পাকিস্তানের রাজধানী করাচী। সেখান থেকেই কানাডা থেকে তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন এবং নগর পরিকল্পনা দফতরে যোগদান করেন। অল্প কিছু দিন পর সিংগাপুর নগর পরিকল্পনা দফতরে চাকুরী পেলে চলে যান। আমৃত্যু তিনি সিংগাপুর নগর পরিকল্পনা ছিলেন। প্রায় একই সঙ্গে রাউজান থানার আবুরখালী গ্রামের অশোক কুমার বড়ুয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন করেন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিভাগের চীপ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তিনি পদোন্নতি পেয়েছিলেন এবং ঐ পদ থেকেই অবসর গ্রহণ করেছেন। প্রকৌ.সুদত্ত রঞ্জন বড়ুয়া, বিপিডিবি এর সাবেক প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। এর পর এক ঝাঁক বৌদ্ধ তরুণ আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত, শিক্ষায়তনে পড়তে এসেছেন। তাদের মধ্যে প্রয়াত দেবপ্রসাদ বড়ুয়া, মৃগাংক বিকাশ বড়ুয়া, সুদত্ত বড়ুয়া, ড. বিকাশ বড়ুয়া অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিভাগ চালু হলে এ বিভাগে প্রথম ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলেন প্রকৌ. ড. তিনকড়ি বড়ুয়া ও পরে বিধান চন্দ্র বড়ুয়া। প্রকৌশলী হিসেবে পরিতোষ কুমার বড়ুয়া, প্রকৌ. সনৎ কুমার বড়ুয়া, প্রকৌ. অনিল বড়ুয়া, প্রকৌ. আশুতোষ বড়ুয়া, পিডিবি মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক পরিচালক উখিয়ার রত্নাপালং এর তরণী মোহন বড়ুয়ার পুত্র প্রকৌ.জগৎবন্ধু বড়ুয়া। সীতাকুণ্ড পান্থশালার প্রয়াত নলিনী রঞ্জন চৌধুরীর পুত্র ইঞ্জিনিয়ার দিব্যেন্দু বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া। তিনি সুদীর্ঘ দুই দশকের অধিক কাল ধরে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি সুপারেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রজেক্ট ডাইরেক্টর সিলেট ১৫০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। প্রকৌ.কমলাংশু বড়ুয়া তিনি বুড্ডিস্ট ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি ছিলেন। রাঙ্গুনিয়া ইছামতির প্রকৌ. সুভাষ বড়ুয়া, প্রকৌ. সরোজ কুমার বড়ুয়া, প্রকৌ.শ্যামল বিকাশ চৌধুরী, প্রকৌ.জয়কেতু বড়ুয়া, প্রকৌ.মৃগাঙ্ক প্রসাদ বড়ুয়া, প্রকৌ. প্রভাস চন্দ্র বড়ুয়া, প্রকৌ.স্বপন কান্তি বড়ুয়া । মিরসরাই দমদমা ডা. শুভঙ্কর বড়ুয়ার পুত্র প্রকৌ. দীপক বড়ুয়া। তিনি দেশের প্রথম ও একমাত্র বৌদ্ধ ফ্লাইট ইঞ্জিরিয়ার। পটিয়া উনাইনপুরার প্রকৌ. মৃণাল কান্তি বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়া শিলকের প্রকৌ. মৃগাংক বিকাশ বড়ুয়া বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর সাবেক সদস্য (বিতরণ)। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। রাউজান আবুরখীল এর শক্তিপদ বড়ুয়ার ছেলে প্রকৌ. জ্যোতিস্ময় বড়ুয়া বাংলাদেশ চিনিকল কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী। পটিয়া মুকুট নাইট এর প্রকৌ. সাথী প্রিয় বড়ুয়া, উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু বৌদ্ধ ছাত্রী অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা হলেন ঃ সর্বাগ্রে পটিয়া থানার হুতর পিটুয়া গ্রামে প্রয়াত মার্তণ্ড প্রতাপ বড়ুয়ার কন্যা বর্ণালী বড়ুয়া। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ১৯৮৮ সালে পাস করেছেন। রাঙ্গুনীয় থানার শিলক গ্রামের নীরদবরণ বড়ুয়ার কন্যা নিরুপমা বড়ুয়া ১৯৯৪ সালে ইলেক্ট্রোনিকসে গ্রাজুয়েশন করেছেন এবং ১৯৯৭ সালে স্কলারশিপ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে এম. এস করেছেন। স্থাপত্য বিভাগে দুজন এক সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। এঁরা হলেন ফটিকছড়ি থানার ছিলোনিয়া গ্রামের সুব্রত বড়ুয়ার একমাত্র কন্যা সুস্মিতা বড়ুয়া ও সীতাকুণ্ড থানার পান্থশালা গ্রামের সরোজ বড়ুয়ার কন্যা অনিন্দিতা বড়ুয়া। এরা উভয়ই ২০০১ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্য বিদ্যায় স্নাতক হয়েছেন। এর পর ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সরকারী চাকরী করছেন আবুরকীল রাউজানের দেবপ্রসাদ বড়ুয়ার পুত্র স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, প্রকৌশলী সাথীপ্রিয় বড়ুয়া, প্রকৌশলী রক্তিম বড়ুয়া, (স্থাপত্য অধিদপ্তর) উপাবিভাগীয় প্রকৌশল গণপূর্ত বিভাগ। প্রকৌশলী সত্যপ্রিয় বড়ুয়া অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশলী তপন বড়ুয়া বিসিআইসির নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশলী রবি বড়ুয়া, প্রকৌশলী সত্যজিৎ বড়ুয়া, বৈদ্যপাড়া প্রকৌশলী, চিত্তরঞ্জন বড়ুয়া, প্রকৌশলী রূপায়ন বড়ুয়া, প্রকৌশলী নীরদ বরণ বড়ুয়া, রাউজানের মহামুণি পাহাড়তলীর

প্রকৌশলী সৌমিত্র মুৎসুদ্দি, সৌমিত্র বড়ুয়া, রাউজানের প্রকৌশীল ইন্দ্রনীল বড়ুয়া, উপপরিচালক বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য।

তৎকালীন পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সিভিল সার্ভিসে বাঙালী বৌদ্ধরা যোগদান শুরু করেন। সর্বপ্রথম রাউজান গ্রামের প্রয়াত বিভীষন বড়ুয়ার পুত্র শহীদ সুপতি বড়ুয়া সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে একাউন্টস সার্ভিস পেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ইপিআইডব্লিউটিসি বা পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন করপোরেশনে ডেপুটি চীফ এ্যাকাউন্স পদে নিয়োগ পান এবং পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের ডেপুটি চীপ এ্যাকাউনটেন্ট হন। ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী তাঁর বাংলো থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। এরপরই তাঁরই শ্যালক, রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামের প্রয়াত বিভূতি ভূষণ বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র তরুণ কান্তি বড়ুয়া সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসে যোগদান করেন। কক্সবাজার রামুর ধনঞ্জয় বড়ুয়া সাবেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় পাক বাহিনীর কর্তৃক তাঁর বাড়ি অগ্নি সংযোগ করা হয়।[১২]

মৃগাঙ্ক বিকাশ বড়ুয়া, তাঁর পিতা, প্রয়াত অধ্যাপক মুনীন্দ্র লাল বড়ুয়া, মাতা-আশারানী বড়ুয়া, জন্মস্থান গ্রাম-শিলক,থানা- রাগুনীয়া, জেলা-চট্টগ্রাম। জন্মতারিখ-০১/০৭/১৯৪৭ ইং, শিক্ষা ঃ ক) ম্যাট্রিকুলেশন-১ম বিভাগ, শিলক হাই স্কুল খ) এইচ.এস.সি ১ম-বিভাগ, স্যার আশুতোষ কলেজ। গ) বি.এস.সি. ইঞ্জিনিয়ারিং ১ম শ্রেণী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ঘ) ডিষ্ট্রিবিউশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর যুক্তরাজ্যে ৮ (আট) মাসের ট্রেনিং। কর্মক্ষেত্রঃ ১৯৭০ ইংরেজিতে তদানীন্তন ওয়াপদা সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে বিভিন্ন পদে বিভিন্ন দফতরে নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ০৫-০৯-০২ ইং তারিখে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে সদস্য (সঞ্চালন ও সিঃ অঃ) এর চলতি দায়িত্বে যোগদান। বিদেশ ভ্রমন ঃ দাপ্তরিক কাজে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর,শ্রীলঙ্কা, ভারত, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স সফর। বৈবাহিক অবস্থাঃ বিবাহিতা। স্ত্রী রত্না বড়ুয়া, গৃহিনী। একমাত্র সন্তান মীতেশ বড়ুয়া, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর শেষ বর্ষের ছাত্র।

রসায়ন শাস্ত্রের কৃতি ছাত্র তুষার কান্তি বড়ুয়া চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত অনেক জ্ঞানীগুনী মনিষীর জন্মস্থান ও জ্ঞানতাপস জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের কর্মস্থান ঐতিহ্যবাহী উনাইনপুরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৪৬ সনের ডিসেম্বরে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতা বাবু নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া এলাকার একজন আদি শিক্ষিত সমাজসেবক যিনি দীর্ঘকাল দেশে বিদেশে বিখ্যাত বিদেশী সুইসফার্মে চাকুরীর পর বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। তাঁর মাতা স্বর্গীয়া শেফালিকা বড়ুয়া বোয়ালখালী থানধীণ বৈদ্যপাড়া গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অত্যন্ত অমায়িক, দয়ালু ও সুগৃহিনী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তুষার কান্তি বড়ুয়া বিশেষ সুপেরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচ হিসেবে ১৯৭৩ সনের মধ্য ভাগে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। চাকুরীকালে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সহকারী কমিশনার, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী পরিচালক (পল্লী উন্নয়ন), সচিব (জেলা পরিষদ), মহকুমা প্রশাসক ইত্যাদি মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এন ই সি/ একনেক উইং- এ কর্মরত থেকে দীর্ঘদিন দেশের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর পর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তিনি উপসচিব (Deputy Secretary) হিসারে দীর্ঘ সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্ব পালন করেন। পরবর্তিতে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ন সচিব(Joint Secretary) হিসাবে পদোন্নতি পান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) হিসাবে কর্মরত আছেন। তাঁর চাকুরী জীবন সর্বত্র সুনাম ও সততার জন্য সর্বজনবিদিত। তিনি দেশে ও বিদেশে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষন গ্রহণ করেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পেজিয়াম, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, ষ্টাডি ট্যুর ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি জেনেভা, লন্ডন, প্যারিস, বেইজিং, সিংগাপুর, ব্যাংকক, কুয়ালালামপুর, জাকার্তা, বালি,নয়াদিল্লী, কোলকাতা, হায়দ্রাবাদ, ব্যাংগালোর, ম্যাংগালোর, ওদিপি, মনিপাল, চেন্নাই, কাঠমান্ডু, ইত্যাদি সফর করেন। চাকুরীর পশাপাশি তিনি এলাকায় আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। তাঁর স্ত্রী পামিতা বড়ুয়া একজন সুগৃহিনী। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক তুষার কান্তি বড়ুয়া দুই পুত্র ও এক কন্যার গর্বিত জনক। তিনি একজন সংস্কৃতি সেবী ও সংগীত শিল্পী। তিনি ২০০২ সালে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

প্রাক-ভারত উপমহাদেশের লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির ও থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের উদগাতা দ্বিতীয় সংঘরাজ আচার্য পূর্ণাচার চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের পূত জন্মভূমি চট্টগ্রামের পটিয়া থানার উনইনপুরা গ্রামে এক আদর্শ পরিবারে ১৯৪৭ সালে বাবু কনক কান্তি বড়ুয়া জন্মগ্রহন করেন। তিনি পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রয়াত শিক্ষক ধীরেন্দ্র লালা বড়ুয়ার দ্বিতীয় ছেলে। একজন স্বনামধন্য আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁর পিতার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাঁর মাতা মঞ্চ বড়ুয়া একজন সুগৃহিণী ও পুণ্যশীলা রমনী ছিলেন। কিশোর জীবনে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে কনক কান্তি বড়ুয়া পিতার স্কুল পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। স্কুল জীবন শেষ করে কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পটিয়া থানার দাউরডেঙ্গা হাই স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে তিনি কর্ম জীবন শুরু করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সুপেরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৭৩ সালে সিভিল সার্ভিসে যোগদেন। ১৯৭৬ সালে তিনি বিশিষ্ট সমাজদরদী, সংগঠক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশনের অন্য পৃষ্ঠপোষক, রাউজান থানার বাগোয়ান নিবাসী প্রয়াত সাবরেজিষ্টার জ্যোতিষ চন্দ্র বড়ুয়া তৃতীয় কন্যা বিভা বড়ুয়ার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক। বাবু কনক কান্তি বড়ুয়া বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করতঃ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে সুনাম অর্জন করেছেন তন্মধ্যে মহকুমা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপ-সচিব-মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, উপ-সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য। তিনি এলাকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। ২০০১ সালে তিনি পদোন্নতি লাভ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। কর্মজীবনে তিনি দেশে ও বিদেশে বেশ কিছু সেমিনার , সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি সমাজ হিতৈষী, সংস্কৃতিমনা, সদালাপী ও বিনয়ী স্বভাবের একজন লোক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফাউন্ডেশনের একজন আজীবন সদস্য। বর্তমানে তিনি বিশ্ব ব্যাংক সহায়তা পুষ্ট (Rose) প্রকল্পে উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত আছেন।

চির রঞ্জন বড়ুয়া ১৯৪৮ সনের ২০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার মধ্যম জোয়ারা। পিতা শহীদ চিত্ত রঞ্জন বড়ুয়া এবং মাতা শ্রীমতি সুচরিতা বড়ুয়া। ৫ ভাই ৪ বোনের মধ্যে সবার বড় মিঃ চির রঞ্জন বড়ুয়া ১৯৭০ সনে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করে ১৯৭২ সনে চট্টগ্রামের হাফিজ জুট এন্ড টেক্সটাইল মিলে পরিসংখ্যান কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সনের ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে সিলেটে যোগদান করেন। কর্মজীবনে তিনি ১ম শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেট, নেজারত,ডেপুটী কালেক্টর, রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, সচিব, জেলা পরিষদ, মহকুমা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিনিয়র সহকারী সচিব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা মেজিষ্ট্রেট, জেলা প্রশাসক ও উপ-সচিব হিসেবে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করেন। ২০০২ সনের ১৩ই জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তিনি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকল্প পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রাক্তন ও অর্থ এবং যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বিগত ৩১/১২/ ০৫ তারিখে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন করেন। কর্মকজীবনে সরকারীভাবে বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও ষ্টাডি ট্যুর তিনি ভারত, নেপাল, ফিলিফাইন, থাইল্যান্ড,শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া সফর করেছেন। ১৯৭৬ সনের ৭ মার্চ তিনি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের স্বর্গীয় সুনীল কান্তি চৌধুরী ও স্বর্গীয় রুবি চৌধুরীর চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি কণিকা বড়ুয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং বর্তমানে তিনি ২

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের জনক। বড় ছেলে অনুপম বড়ুয়া বিবিএ পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য অপেক্ষারত এবং কনিষ্ঠ ছেলে অমিত বড়ুয়া বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে গ্র্যাজুয়েশনে পড়াশুনা করছেন।

মনুলাল বড়ুয়া, জন্ম ৩০শে জুন ১৯২৭, পিতা-স্বর্গীয় শ্রী উপেন্দ্রলাল বড়ুয়া। মাতা- স্বর্গীয় শ্রীমতি অর্পণা বড়ুয়া। জন্মস্থান- দমদমা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম। ভাইবোন ঃ ৪ ভাই-প্রেমলাল পরলোকগত), শচীন্দ্রলাল (পরলোকগত), এডভোকেট সনজীবচন্দ্র বড়ুয়া ৪ বোন-মল্লিকা (পরলোকগত), রেখা (পরলোকগত), বালিকা, ও কনিকা বড়ুয়া।

শিক্ষা জীবনে তিনি মেট্রিকুলেশন, আবুতোয়াব হাই স্কুল থেকে লেটারসহ প্রথম বিভাগে (১৯৪৭),এইচ.এস.সি. বিজ্ঞান কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগ (১৯৫০), বি.কম.স্নাতক, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজ থেকে (১৯৫৪), তাঁর সহধর্মীনি- ঃ শ্রীমতি শুভা বড়ুয়া, পুত্রকন্যাঃ ৪জন ঃ(প্রকৌ. শৈবাল বড়ুয়া কংকু, সৌমেন বড়ুয়া শংকু, শম্পা বড়ুয়া, ডা. সোমা বড়ুয়া)। কর্মজীবনঃ প্রথমে শিক্ষকতা, সরকার হাট এন.আর. উচ্চ বিদ্যালয়, মিরসরাই, চট্টগ্রাম (১৯৫০); ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে চাকুরি (১৯৫১) ; স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান, ঢাকা (১৯৫৪); ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, ফরিদপুরের কালেক্টরেটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৫৬); এস.ডি.ও (১৯৬০) নাটোর, বরিশাল (১৯৬৪) ও সুনামগঞ্জ; এ.ডি.সি (দেশ স্বাধীনতার পর); একই সঙ্গে ঢাকায় এ.ডি.এম, এ.ডি.এম জেনারেল, এ.ডি.সি রেভিন্যু হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৭২); ডেপুটি সেক্রেটারী (১৯৭৩); পদোন্নতিতে এডিশন্যাল ডিভিশন্যাল কমিশনার হিসেবে রাজশাহী বিভাগে নিয়োগ লাভ (ঢাকা ত্যাগে অনিচ্ছুক)

কর্মজীবনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঃ ভূমি, কৃষি,যোগাযোগ ও পরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। তিনি অবসর গ্রহন করেন ১৯৯১ সালে। দেশ ভ্রমন ঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য (১৯৭৪), জাপান, থাইল্যেন্ড (১৯৭৮), হংকং, থাইলেন্ড (১৯৭৯), জাপান, থাইল্যেন্ড, হংকং (১৯৮০), ফিলিপিন্স, নেদারল্যান্ড, ইতালি, জার্মান, (১৯৮২) মায়ানমার (২০০৩) ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সফর (১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪), পুনরায় ভারতের সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমন (এপ্রিল,২০০৪)

তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সহ-সভাপতি (১৯৮২-১৯৯৩), সভাপতি (১৯৯৪-২০০৪ আমৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন)। তিনি আজীবন সদস্য ঃ বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন,চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা।

কর্মজীবনে তাঁর অবদান ঃ ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা (১৯৮০-২০০৪), বরিশাল ঝালকাটি কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৯৬২-৬৩)। রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণঃ মাহমান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে (১৯৯১), তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে (১৯৯৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি

Dhaka University Institutional Repository

হাবিবুর রহমানের সঙ্গে (১৯৯৬),মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহবুদ্দিন আহমেদ এর সঙ্গে (১৯৯৬),তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে (১৯৯৭,১৯৯৮,২০০০), মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ এর সঙ্গে (২০০৪), বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে (২০০৪), ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে আবদুল কালামের সঙ্গে (২০০৪), মৃত্যুঃ ১৯শে জুন ২০০৪, বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা সজ্ঞানে,নিজ বাসভবনে, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা- তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

এরপর যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্বপালন করে অবসর গ্রহণ করেন চন্দনাইশের বিশ্বপতি বড়ুয়া। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি। পটিয়া থানার অন্তর্গত হুতর পিটুয়া গ্রামের প্রয়াত অধ্যাপক সুরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার প্রথম পুত্র প্রয়াত মার্তন্ড প্রতাপ বড়ুয়া ইপিসিএস দিয়ে সহকারী সচিব হিসাবে যোগদান করে বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ করার পর অবসর গ্রহণ করেছিলেন। এই দুজনের পর ১৯৬৬ সালে ইপিসিএস পরীক্ষা দিয়ে রাঙ্গুনীয়া থানার নজরটিলা গ্রামের প্রয়াত লোকেন্দ্র মুৎসুদ্দীর পুত্র অমিয় মুৎসুদ্দী সহকারী সচিব হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালে উপসচিব এবং ১৯৯১ সালে যুগ্মসচিব হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হিসেবে আছেন প্রশান্ত কুমার বড়ুয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হিসেবে আছেন ফটিকছড়ির সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়ার ছেলে সম্পদ বড়ুয়া, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক হিসেবে আছেন যুগ্মসচিব রনজিৎ বড়ুয়া উল্লেখযোগ্য। রাঙ্গুনিয়ার প্রয়াত হিমাংশু বিমল বড়ুয়ার ছেলে কাজল প্রিয় বড়ুয়া, উপসচিব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদের মধ্যে সিনিয়র সহকারী সচিব প্রবণ চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী সচিব চট্টগ্রাম আনোয়ারার তিশরীর বিমান বিহারী বড়ুয়া চৌধুরী সফলতার কাজ করে যাচ্ছেন।

এদেশের বিচার বিভাগে বাঙালী বৌদ্ধরা যোগদান করেছেন অত্যন্ত কম সংখ্যক ব্যক্তি। যারা বিচার বিভাগে ছিলেন তারা অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান আমলে বা তারও পূর্বে ব্রিটিশ আমলে। রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজ সংগঠক প্রয়াত উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দির প্রথম পুত্র প্রয়াত তড়িৎ কান্তি মুৎসুদ্দি জেলা জজ হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে অপসন দিয়ে তিনি ভারতে চলে যান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৌদ্ধ ছাত্র ছিলেন।[২০] বোয়ালখালী থানার দৈব্যপাড়া গ্রামের প্রয়াত রায়বাহাদুর ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়ার পুত্র প্রয়াত শীলব্রত বড়ুয়া মুন্সেফ হয়েছিলেন ১৯৪৯/৫২ সালে এবং জেলা জজ হয়েছিলেন বাংলাদেশ আমলে ১৯৭২/৭৩ সালে। এ পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। রাউজান থানার আবুরখীল গ্রামের প্রয়াত ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিরোদ বড়ুয়ার পুত্র অরুণাভ বড়ুয়া বর্তমানে কোলাকাতায় হাইকোর্টের বিচারপতি। ব্রিটিশ আমল থেকেই বৌদ্ধরা পুলিশ সার্ভিসে নিয়মিত যোগদান করেছে। তবে অধিকাংশই ছিল নিচের পর্যায়। অফিসার পর্যায় ছিল গনণ্য। ব্রিটিশ আমলে এবং পরবর্তী স্বাধীনকালে যে কয়েকজন

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ অফিসার হয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্য, রাউজান গ্রামের প্রয়াত গিরীশ চন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র প্রয়াত মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়া। ১৯২৭ সালে তিনি রাউজান আরআরএসি একাডেমী থেকে এন্ট্রান্স এবং ফেনী কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ পাস করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে তিনি এম.এ পাস করেন। এম.এ পাস করার পর কোলকাতায় একটা কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৩৬ কসালে তিনি ব্রিটিশ পুলিশ সার্ভিসে যোগদান করেন। সততা ও দক্ষতার জন্য তিনি লাভ করেন 'কুইন্স মেডেল'। ১৯৬৬ সালে সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার হিসাবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত অল ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট কনফারেন্সে যোগদান করেছিলেন। রাউজান আর্যমৈত্রের বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯-৭০ সালে গহিরা শান্তি দ্বীপ কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

নোয়াখালী বেগমগঞ্জে সোনাইমুড়ী কৌশল্যার বাগ এর সাবরেজিষ্ট্রার জ্যোতিষ চন্দ্র বড়ুয়ার তৃতীয় পুত্র হীরেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। তাঁর ১৯৪২ সালে ৩১ডিসেম্বর জন্ম, ১৯৯৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু বরণ করেন। তিনি নোয়াখালী চৌমুহনী কলেজ থেকে আইএ পাশ এবং বি এ পাশ করেন সাবরেজিষ্ট্রারে যোগদান করেন। তাঁর পিতা ও তিনি বুড্ডিস ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।[১১] নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানার কৌশল্যারবাগ গ্রামের প্রয়াত জ্যোতিষ চন্দ্র চৌধুরীর পুত্র শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি এম.এ. পাস করেন ১৯৫৯ সালে। ১৯৬০ সালে পাস করেন এল.এল.বি। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিস ক্যাডারে এ.এস.পি হিসাবে যোগদান করেন। প্রথমে ফরিদপুরে অতিরিক্ত এস.পি এবং পরে বাংলাদেশ রেলওয়েতে এস.পি. হিসাবে চট্টগ্রামে কাজ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজশাহী পুলিশ একাডেমীর ভাইস প্রিন্সিপাল। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডি.আই.জি হিসাবে নিয়োগ পান। ১৯৮২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি বার কাউন্সিলের সনদপত্র অর্জন করে আইনজীবী হিসাবে নবতর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

পটিয়া থানার মুকুটনাইট গ্রামের উপন্দ্রে লাল বড়ুয়ার পুত্র প্রকৃতি রঞ্জন বড়ুয়া। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে এম.এসসি করেন ১৯৬৭ সালে। এরপর এক বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকরী করেছিলেন কিছুকাল। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশে) এ.এস.পি হিসাবে যোগদান করেন। পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ফোর্স সাপ্লাই ও টেলিকম সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসাবে কাজ করেন। সারদা পুলিশ একাডেমীর উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত ডি.আই.জি হিসাবে। এবং সারদা পুলিশ একাডেমীর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন ডি.আই.জি হিসাবে। ১৯৮৪ সালে যুক্তরাজ্যে ওভারসিজ কমান্ড কোর্স করেন। ১৯৮৮ সালে ওয়ারলেস ট্রেনিং অন সিসটেম ম্যানেজমেন্ট ও রেডিও মেইনটেনেন্সের উপর দু'সপ্তাহের কোর্স করেন

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তরাজ্য থেকে। ২০০০ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আশির দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা, বাঁশখালী শিলকুপ গ্রামের অমূল্য ভূষণ বড়ুয়া বিসিএস জেনারেল পাস করে পুলিশে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডি আই জি হিসেবে কর্মরত আছেন। পটিয়া উনাইনপুরার প্রভাস রঞ্জন বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সাবরেজিষ্টার হন এবং পরে বাংলাদেশ নিবন্ধন অধিদপ্তরে সহকারী মহাপরিদর্শক (AIGR) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করে বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা মেট্রো পুলিশ কোর্টের প্রাক্তন সহকারী পুলিশ কমিশনার ছিলেন স্থিতধী বড়ুয়া। ১৯৯৮ সালে কক্সবাজার রামুর শচীন্দ্রলাল বড়ুয়া ও ভাগ্যবতী বড়ুয়ার ছোট ছেলে বিদ্যুৎ বড়ুয়া পুলিশ সার্জেন হিসেবে চাকুরীতে আছেন। রাউজানের সুধাংশু বিমল বড়ুয়া তৎকালীন সময়ে ক্যাপ্টেন ছিলেন। রাউজানের প্রভাত বড়ুয়া সাবইন্সপেক্টর। বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে হিসাব-নিকাশ এবং অডিটর হিসেবে সুনাম অর্জন করেন হাতে গোনা কয়েকজন। তাঁরা হলেন, চন্দ্রনাইশ থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত ভুপেন চৌধুরীর পুত্র প্রয়াত নীলরতন চৌধুরী আমাদের সমাজের প্রথম অডিটর বা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন বিদেশে। রাউজান গ্রামের প্রয়াত মুনীন্দ্রলাল বড়ুয়ার মধ্যম পুত্র হীরালাল বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে প্রথম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট পেশায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস-এ শিক্ষানবীস হিসাবে যোগদান করেন। নানা প্রতিকূলতার কারণে অবশ্য একটু দেরিতে যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি এ্যাকাউন্টেন্ট হিসাবে গড়ে তুলেছেন তাঁর অডিট ফার্ম 'সাহা এন্ড কোং'। উল্লেখ্য চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেসীতে যোগ্যতা অর্জন ছাড়াও চার্টার্ড সেক্রেটারি হিসাবে তিনিও যোগ্যতা অর্জন করেন। সুদীর্ঘকাল সেনাবাহিনী চাকুরী করে অবসর গ্রহণ করেন কর্ণেল ডা. মৃণাল কান্তি বড়ুয়া।

রাঙ্গুনিয়া থানার শিলক গ্রামের সুশান্ত বড়ুয়ার প্রথম পুত্র সুহৃদ কুমার বড়ুয়া একজন যোগ্য চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিসাববিজ্ঞান থেকে পাস করে প্রথম দিকে কিছুদিন চাকরী করলেও তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর নিজস্ব অডিট ফার্ম। 'বড়ুয়া এন্ড কোং' তাঁর প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে আজ প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভক্ত উপমহাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে পর এতদ অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় ছিলনা। তাই শিক্ষার্থীরা ছুটে এসেছে ঢাকায়। বৌদ্ধ সমাজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার জন্য প্রথম এসেছিলেন বোয়ালখালী থানার বৈদ্যপাড়া গ্রামের প্রয়াত রায়বাহাদুর ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়ার পুত্র যোগব্রত বড়ুয়া ১৯৫০ সালে। অনার্সে তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল রসায়ন। মাষ্টার্স করেছেন প্রাণ-রাসায়নে। একটা সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তিনি গবেষণার কাজ করেছেন অবসর নেওয়ার আগের দিন পর্যন্ত। রাউজান কদলপুরের উদয়ন বড়ুয়া তিনি এডিশনাল কমিশনার কাস্টমস একসাইজ এন্ড ভ্যাট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। নাটক ও চলচিত্রে বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ করেন অভিনেতা অমলেশ বড়ুয়া। তিনি অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করেন। উল্লেখযোগ্য হলো-সারেং বউ ইত্যাদি বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় জগতে পর্দাপন করেন অভিনেতা পরেশচন্দ্র বড়ুয়া (আনন্দ)। তিনি ১৯৩০ সালে রাউজান থানার রাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৫ সালে ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলো মধ্যে 'এইতো জীবন' ও 'এ কালের রূপকথা' উল্লেখযোগ্য। । সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেন। বর্তমানে নাটক ও অভিনয় জগতে জড়িত আছেন শতদল বড়ুয়া বিলু এবং চন্দনাইশ থানার দক্ষিণ জোয়ার স্বর্গীয় যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়ার পুত্র স্বনামখ্যাত কাস্টম সুপারিটেনডেন্ট নাট্যাভিনেতা অশোক বড়ুয়া জীবনে সাফল্য ও পরিচিতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। বাঁশখালী জলদীর নেপাল বড়ুয়া বর্তমানে কাস্টমস অফিসার হিসেবে আছেন। ফিল্মি মেকার, ভিডিও গ্রাফার্স, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও ক্যামেরা ম্যান হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে আছেন অজয় বড়ুয়া, বড়ুয়া প্রনোজিত ইমন। তিনি ভারত থেকে এ বিষয়ে উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রিও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারে বিসিএস ক্যাডার থেকে যোগদান করে চাকুরীরত আছেন রাউজানের দুলাল কান্তি বড়ুয়া। তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি। বৌদ্ধদের মধ্যে আদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাঙ্গুভেলী। চন্দনাইশ সাতবাড়িয়ার জমিদার বংশের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাঙ্গুভেলী বাংলাদেশ ও বার্মার রেঙ্গুনে বিস্তৃত ছিল। এই প্রতিষ্ঠা সমাজ হিতৈষী জমিদার নগেন্দ্রলাল চৌধুরী সাঙ্গুভেলী কোম্পানী ও সাঙ্গুভেলী এস্টেট পরিচালনা করতেন।

ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল সাধারণত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পরবর্তীতে দেখা যায় বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ আকিয়াবে বা বার্মায় ছোটখাট ব্যবসা করেছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসা পরিণত রূপ পায়নি বা হয়নি বিস্তৃত। কেবল একটা ব্যবসায় বাঙালী বৌদ্ধ বিপুল পুঁজি নিয়ে প্রয়া একচেটিয়া ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন অনেকে। সেটা হল শুটকী মাছের ব্যবসা। '৭০ দশক পর্যন্ত এ ব্যবসায় বাঙালী বৌদ্ধদের প্রতাপ থাকলেও আজ তা ম্রিয়মান। এই ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আমার কাছে নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকায় বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করতে পারলাম না বলে স্বীকার করছি আমার অক্ষমতা। এ ছাড়া ঔষুধ ব্যবসায় রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত গগণচন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র প্রয়াত মুকুন্দরাঘব বড়ুয়ার 'বেঙ্গল বার্মা ট্রেডিং কোম্পানীর' কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালি ও আঠার ব্যবসা নিয়ে, বল কলম আসার আগের দিন পর্যন্ত, রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের পরিতোষ বড়ুয়া 'ডায়মন্ড কেমিকেলস' ক্ষুদ্র হলেও উল্লেখ্য। '৬০ দশকে অত্যন্ত ভীরু ও সন্তর্প পায়ে ইনডেনটিং ব্যবসায় এসেছিলেন বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম রাউজান থানার মহামুনি গ্রামের প্রয়াত অতুলচন্দ্র বড়ুয়ার কনিষ্টপুত্র প্রয়াত সুমেধ প্রসাদ বড়ুয়া। একনিষ্টতা ও মানসিক দৃঢ়তার ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আঙ্কেল নেফিউ কোম্পানী' পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাঁর পুত্র সুরজিত বড়ুয়া রুকুর

Dhaka University Institutional Repository

একাগ্রতায় সেই প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা আজ বলিষ্ঠ ও তেজীয়ান। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদের সভাপতি। আনোয়ারা রুকুরার অমুরথ বড়ুয়া ও শেপালী বড়ুয়ার পুত্র নেত্রসেন বড়ুয়া 'নিউচট্টলা কনফেকশনারী'র সত্ত্বাধিকারী। তিনি রাজধানী ঢাকায় ব্যক্তিমালিকাধীন ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের ট্রেজারার ও চারুলতা পরিষদের সহ-সভাপতি হিসেবে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। চট্টলা বেকারীর সত্ত্বাধিকারী পটিয়ার লায়ন মনোরঞ্জন বড়ুয়া সুদীর্ঘকাল ঢাকায় ব্যবসা করে সাফল্য লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং বিকল্প ধারা বাংলাদেশ এর অন্যতম সংখ্যালঘু নেতা। তিনি দেশ-জাতি ও সমাজে সেবায় নিয়োজিত। চট্টগ্রাম রাউজান, বড়পাড়ার বিশিষ্ট সমাজ হিতৈষী অনঙ্গ মোহন বড়ুয়া ও রেনু বড়ুয়ার বড় পুত্র বটন কুমার বড়ুয়ার জন্ম ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে ম্যানপাওয়ার ও মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায় তিনি আসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। তিনি বি.কি.বি গ্রুপের সত্ত্বাধিকারী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বর্তমানে তিনি চারুলতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। শিল্প উদ্যোগে বাঙালী বৌদ্ধদের অংশগ্রহণে '৭০ দশক পর্যন্ত ছিল শূন্য। ১৯৭৯ সালে চন্দনাইশ থানার পূর্ব সাতবাড়িয়া বেপারী পাড়া গ্রামের প্রয়াত প্রিয়দর্শী বড়ুয়ার পুত্র ডি.কে. বড়ুয়া সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন 'রাঙ্গামাটি ফুড প্রডাক্টস' নিয়ে। ১৯৮১ সালে উৎপাদন শুরু করে 'রাঙ্গামাটি ফুড প্রোডাক্টস'। ২০০২ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের শেয়ার বাজারে তাদের শেয়ার ছাড়ে এই প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি সি.এন.এফ এবং গার্মেন্টস শিল্প ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করেছেন চন্দ্রনাইশের দক্ষিণ জোয়ারার রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া, বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি। পূর্ব সাতবাড়িয়া বেপারীপাড়ার প্রানেশ কান্তি বড়ুয়া জয় ট্রেডার্স এর সত্ত্বাধিকারী এবং সিএনএফ ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। প্রয়াত অপূর্ব রঞ্জন বড়ুয়া চৌধুরীর ছেলে জেম্‌স ইন্টারন্যাশনাল এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞানে অনার্স সহ এম.এ পাস করে প্রথমে কেডিএস গ্রুপে চাকরী শুরু করেন, পরবর্তীতে নিজে ব্যবসায় এসে সাফল্য লাভ করেন। বর্তমান তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ঢাকা এর সাধারণ সম্পাদক। এর পরে মীরেরসরাই এর মনোজ কুমার বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মান সহ এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথমে গার্মেন্টস এ মার্জেন্টডাইজার এবং পরে যৌথ উদ্যোগে ইউনি স্টার গ্রুপ নামে গার্মেন্টস ও বাইং হাইজ ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করেন। ব্যবসায়ী সাফল্যপান কেমিকো কর্পোরেশন ও বায়াশিপিং লাইন এর সত্ত্বাধিকারী ও গার্মেন্টর্স ব্যবসায়ী লায়ন অনোমাদার্শী বড়ুয়া। পটিয়া তেকোটার স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী এবং মুকুট নাইট পটিয়ার নৃপতি রঞ্জন বড়ুয়া উভয়ে প্যাসিফিক পেপার প্রডাক্টস লিঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক। নিপতি রঞ্জন বড়ুয়া বুদ্ধ জ্যোতি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশ চ্যাপটারের পরিচালক। এরপর জ্যোৎস্না বিকাশ চৌধুরী ছেলে প্রকৌশলী অরূপ রতন বড়ুয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে গার্মেন্টস ব্যবসায় এসে সাফল্য লাভ করেন। তিনি বর্তমানে ওয়াস পয়েন্ট এর সত্ত্বাধীকারী। ১৯৯৮ সালে

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গুনীয়া থানার ইছামতি গ্রামের পরেশচন্দ্র বড়ুয়ার পুত্র পলাশ বড়ুয়া 'ইইসি-বাংলা এ্যাপরেলস', 'ইউসি-বাংলা নিটওয়ার' এবং 'তন্ময় ও তন্বী নিট ওয়ার লি.' নামে তিনটা নিটওয়্যারের কারখানা চালু করেন। এই তরুণের একক প্রচেষ্টায় শিল্প উদ্যোগে এগিয়ে আসা আমাদের তরুণদের অনুকরণীয়। তাঁর সাফল্য একটা আদর্শ। বর্তমানে তিনি সাংগঠনিকভাবে বৌদ্ধ যুব পরিষদ ঢাকার সভাপতি। রাউজান থানার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামের প্রয়াত আইনজীবী ফনী ভূষণ বড়ুয়ার পুত্র লায়ন রুপম কিশোর বড়ুয়ারযৌথ উদ্যোক্তা হিসাবে কনফিডেন্স সিমেন্ট লিঃ এর ফিন্যাস ডাইরেক্টর। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক।

সি এন এফ ও ক্লেয়ারিং ফরওয়ার্ডিং ব্যবসায় সাফল্য লাভ করে পটিয়ার প্রেয়াত মতিলাল তালুকদারের ছেলে শীলব্রত তালুকদার। তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক তালুকদার ট্রেডার্স। পূর্বাশা ইন্টারন্যাশনাল লি. এর সত্ত্বাধিকারী রাউজানের বিকাশ কুসুম বড়ুয়া। তিনি ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন। সি.এন.এফ ব্যবসায় খ্যাতি ও সাফল্য লাভ করেন। ফাল্গুণী ট্রেডার্সএর সত্ত্বাধিকারী হাজারীচরের প্রমথ বড়ুয়া। তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের অর্থ সচিব। গার্মেন্টস ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন শিল্পপতি লায়ন বাদল বড়ুয়া, এম জে এফ। তিনি এ্যাপোলো সুয়েইং এন্ড গার্মেন্টস লিঃ চট্টগ্রাম এর পরিচালক। রাউজান বৈদ্যপাড়ার সুজিব বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি রাঙ্গামাটি ফুর্ড প্রোডাক্টস লিঃ এর পরিচালক এবং ম্যানেজিং পার্টনার নেটকম। গার্মেন্টস ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেন চকরিয়া নিজপান খাণীর লোকনাথ বড়ুয়া, তিনি নিউ ফ্যাশন লিঃ চট্টগ্রামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি সুদীর্ঘ এই ব্যবাসয় জড়িত। তিনি প্রথম দিকে ইমাম গ্রুপ অফ ইন্ডাস্টিজ এর ডাইরেক্টর ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ইন্টারন্যাশনালের সত্ত্বাধিকারী পটিয়াকরল এর অমল কান্তি চৌধুরী। বৌদ্ধদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদে চাকুরীরত আছেন অনেকেই। এদের নাম উল্লেখ করে শেষ করা যাবে না। তবুও উল্লেখযোগ্য হলোঃ চন্দনাইশ সাতবাড়িয়া বেপারী পাড়ার প্রিয়দর্শী বড়ুয়ার ছেলে পুণ্যবর্ধন বড়ুয়া। তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন থেকে পাশ করেন। তিনি বর্তমানে পারটেক্স গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার। তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সহ সভাপতি। অমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়া ডং বেং টেক্সটাইলস লিঃ এর জেনারেল ম্যানেজার। কিং সুয়েটার ইন্ডাস্টিজ লিঃ ও কিং ফ্যাশন লিঃ এর জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে আছেন রাঙ্গুনিয়াং পরিতোষ বড়ুয়া। তিনি চারুলতা পরিষদের সহ সভাপতি। বেঙ্গল গ্লাস লি. এর এডমিনিষ্ট্রেটিব ম্যানেজার হিসেবে আছেন, সাতকানিয়া ঢেমশার অমরেন্দ্র লাল বড়ুয়া ও নীলাবতী বড়ুয়ার বড় ছেলে দয়াল কুমার বড়ুয়া। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যা থেকে অনার্স ও স্নাতকোত্তর এবং পরে ইসলামী ইউনিভার্সিটি থেকে এম বি এ ডিগ্রী লাভ করেন। বিধান বড়ুয়া রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উপ-পরিচালক হিসেবে আছেন। খগেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি গ্লাক্সো ওয়েলকাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ লি. এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপক ছিলেন। শিবু প্রসাদ চৌধুরী ইস্পাহানী লি. এর ব্যবস্থাপক। ড.প্রণব কুমার বড়ুয়া বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনীতি পর্যালোচনা ভিত্তি রচনা-আরাকান, মোগল ও ব্রিটিশ আমল 'ফিরে দেখা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অতীত নিয়ে বর্তমান; বর্তমান নিয়ে ভবিষ্যত। সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যত গঠনের জন্য অতীতের শিক্ষা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' (কৃষ্টি, নব পর্যায়, ১৮ বর্ষ, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৩০)

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অতীত ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ও গৌরবময়। বর্তমানে বৌদ্ধরা দেশে-বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ ও গবেষণা করে স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে তাদের চিরস্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে অনেকে স্বীয় মেধায় সমুজ্জ্বল। বর্তমান এদেশে বৌদ্ধদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা প্রতিভাত হয়।

তৎকালীন পাহাড়তলীর কিরণ বিকাশ বড়ুয়া উকিল ছিলেন। উকিল উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দি, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি উকিল ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরী, হোয়ারাপাড়ার এডভোকেট রোহিনী রঞ্জন বড়ুয়া, আবুরখীলের এডভোকেট সারদা প্রসাদ বড়ুয়া, মৈতলার উকিল অন্নদাচরণ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বৈদ্যপাড়ার শীলব্রত বড়ুয়া সুদীর্ঘকাল সরকারী জুডিসিয়াল সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে জেলা জজ এ পদোন্নতি লাভ করে অবসর গ্রহণ করে। বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টে আইনপেশায় জড়িত আছেন। চট্টগ্রাম জজ কোর্টে আইন পেশায় জড়িত আছেন-ফটিকছড়ি নানুপুরের হর কিশোর বড়ুয়ার ছেলে এডভোকেট মনোতোষ বড়ুয়া। তিনি ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম বারের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রাঙ্গুনিয়া রাজানগরের এডভোকেট হিমাংশু বিমল বড়ুয়া। তিনি চট্টগ্রাম বারের সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে আইন পেশায় জড়িত। মিরসরাই দমদমার এডভোকেট সনজীব বড়ুয়া, তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি। চন্দনাইশ সাতবাড়িয়ার সজিত চৌধুরী ছেলে এডভোকেট গুনেন্দ্র চৌধুরী, এডভোকেট প্রেমাংকুর বড়ুয়া, তিনি বর্তমানে অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির সভাপতি। চন্দনাইশ দক্ষিণ জোয়ারার এডভোকেট অনুপ বড়ুয়া, লাখেরার এডভোকেট ননী গোপাল বড়ুয়া, বোয়ালখালী শাকপুরার এডভোকেট দীপক কুমার বড়ুয়া, কক্সবাজারের সুশোভন বড়ুয়া, এড. সুনীল কুমার বড়ুয়া, কক্সবাজার জজ কোর্ট। এডভোকেট জয়শান্ত বড়ুয়া, তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি যুব সাধারণ সম্পাদক। এডভোকেট প্রভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, কক্সবাজার জজ কোর্টে এডভোকেট হিসেবে আছেন রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া।

আনোয়ারা তিশরীর নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া ও মিহার কণা বড়ুয়ার তৃতীয়পুত্র এড. পীযুষকান্তি বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি থেকে পাশ করে আয়কর আইনজীবি পেশায় নিয়োজিত। তিনি ১৯৭৬ সাল থেকে আইন পেশা জড়িত। তিনি লায়ন ডিস্ট্রিক ৩১৫/বি লায়ন প্রগ্রেসিভ সাউথ ক্লাবের

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট। বাঁশখালী মিনজিরীতলার এড. করুণারঞ্জন বড়ুয়া, শীলকুপ এর এড. আশীষ বরণ বড়ুয়া।

বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে রাজনীতির সাথে জাতীয় নেতৃত্বে জড়িত আছেন মিরসরাই দমদমার ডা. শুভঙ্কর বড়ুয়া ও সুখদা বড়ুয়ার বড় ছেলে কমরেড দিলীপ বড়ুয়া। তিনি সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক। মহামুনি পাহাড়তলীর বিপ্লব বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন থেকে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর পাশ করে বিএসএস'র মাধ্যমে বর্তমান খাগড়াছড়ির জেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। বিসিএস সমবায় এ আছেন অশীষ কুমার বড়ুয়া। সাতকানিয়া বাকরআলী বিলের তুষার কান্তি বড়ুয়া, চট্টগ্রামে ইনকামটেক্স এ কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও জনপদ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়ার পুত্র দেবনীক বড়ুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের পারডু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যারোনটিক্স ও এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং এ ২০০৪ সালে সমাপ্ত গ্রাজুয়েশন কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইয়েস্ট ডিস্টিংশন নিয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। দেবনীক বড়ুয়া ১৯৯৭ সালে ঢাকা গভ. ল্যাবরেটরী হাই স্কুল থেকে এস এস সি এবং ১৯৯৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন। দেবনীক বড়ুয়ার এ কৃতিত্বের জন্য আমেরিকার বিখ্যাত বোয়িং বিমান কোম্পানী তাদের নতুন ৭৭৭ বোয়িং বিমান নির্মাণ প্রকল্পের জন্য তাকে নির্বাচিত করেছে।[২২]

করুণা রঞ্জন বড়ুয়া সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি অতীশ গণ উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি. এর সভাপতি ছিলেন। মিরসরাই তুলাবাড়িয়ার ইন্দ্রজিৎ বড়ুয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম এর উপ-পরিচালক, উত্তর সুন্দরপুর, ফটিকছড়ির অমলেন্দু বড়ুয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম এর উপ-পরিচালক, পটিয়া কর্তলার শীলব্রত বড়ুয়া সহকারী ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম। সাতকানিয়া ঢেমশার মৃত শশাংক বড়ুয়া বড় ছেলে প্রকৌশলী তাপস বড়ুয়া, মেঝমেয়ে ড. শুভ্রা বড়ুয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির অধ্যাপক। মহামুনি পাহাড়তলীর মৃত সুগত প্রসাদ বড়ুয়া ও ঝরণা বড়ুয়ার মেঝ মেয়ে সুদীপা বড়ুয়া, শান্তিনিকেতন ভারত থেকে বাংলায় পাশ করে বর্তমানে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের বাংলার প্রভাষক। কুমিল্লা কলেজে খন্ডকালীন পালি ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করেন ধর্মরক্ষিত মহাথের।

রাজীব বড়ুয়া ইউনিলিভার বাংলাদেশ এর জেনারেল ম্যানেজার (প্রোডাকশন) এর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ডা. অতীশ বড়ুয়া, প্যানরোমা হাসপাতালের ডাইরেক্টর হিসেবে আছেন। ডা. নিশীরঞ্জন বড়ুয়া, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালীর পরিচালক, ডা. সুপ্রিয় বড়ুয়া পঙ্গু হাসপাতাল ঢাকার পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। রাঙ্গুনিয়া নজরটিলা সুবর্ণ ভদ্র মুৎসুদ্দি, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ টিএন্ডটি বোর্ড, ফটিকছড়ির হাইদচকিয়ার, প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়া, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম, কানাইমাদারী, চন্দনাইশের নিখিল কান্তি বড়ুয়া সহকারী ব্যবস্থাপক

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম। ডা. যদুনাথ বড়ুয়ার ছেলে ড. গৌতম বড়ুয়া উচ্চপদে চাকুরীরত আছেন। রাউজান আধার মানিক এর জোতিষ চন্দ্র বড়ুয়ার ছেলে লায়ন আদর্শ কুমার বড়ুয়া মুন নাইট ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর সত্ত্বাধিকারী। তিনি বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

বাঁশখালী জলদীর অরবিন্দ বড়ুয়া সাবেক ম্যাজিস্ট্রেড ছিলেন। চট্টগ্রামের আনোয়ার তিশরীর কৃতি সন্তান বিমান বিহারী চৌধুরী বড়ুয়া বিসিএস থেকে প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে আছেন। মায়া প্রকাশ বড়ুয়ার ছেলে অনুপম বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে বরগুণায় নিয়োজিত আছেন। এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে। রিতেশ বড়ুয়া সম্প্রতি বিসিএস ক্যাডারে পাশ করে পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত আছেন। মিসেস সিমেন্টএর জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে আছেন প্রকৌশলী বিশ্বজিৎ বড়ুয়া। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেন। অনুপ বড়ুয়া, উত্তরা মটরস এর ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োজিত আছেন। পটিয়া নাইখাইন এর প্রদীপ বড়ুয়া কোকা ইন্ডাস্ট্রিস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। পটিয়া উনাইনপুরার অজিত রঞ্জন বড়ুয়া, প্যারামাস সিপিং এজেন্সী লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি বুদ্ধজ্যোতি আন্তর্জাতিক সংস্থার চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চ্যাপ্টার। পটিয়া উনাইন পুরার দিলীপ বড়ুয়া, মডেল বেকারী ইন্ডাস্ট্রিস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালক দেশ প্রিয় বড়ুয়া। তিনি আন্তর্জাতিক সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার দেব পাহাড় এর সাধারণ সম্পাদক। ফটিকছড়ি কোটের পাড়ের করুণা কান্তি বড়ুয়া, মেসার্স দীনবন্ধু এন্ড সন্স লি. এর সত্ত্বাধিকারী। তিনি ত্রিরত্ন পরিষদ চট্টগ্রামের সভাপতি। চট্টগ্রাম রাউজানের প্রকৃতি রঞ্জন বড়ুয়ার ছেলে রতন কুমার বড়ুয়া বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরিচালক। মিরসরাই দমদমার নতুন চন্দ্র বড়ুয়ার ও শ্রীমতি সুবাশী বালা বড়ুয়ার ছেলে প্রকৌ. জ্ঞানবিকাশ বড়ুয়া, ফেনী পলিটেকনিক্যাল থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার পাশ করেন। তিনি জেলা ত্রাণ ও পুনবাসন কর্মকর্তা চাঁদপুর দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সিতাকুন্ড মিরসরাই সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি। চট্টগ্রাম রাউজানের জয়দত্ত বড়ুয়া দীর্ঘদিন ইনকাম টেক্স এর চাকুরিরত কর্মরত আছেন। রাঙ্গুনিয়া বেতাগীর যাত্রা মোহন চৌধুরী ও যজ্ঞেরশ্বরী বড়ুয়ার ছেলে প্রবীন চন্দ্র বড়ুয়া সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে উপ-সচিব হিসেবে ছিলেন। বর্তমানে তিনি অবসর প্রাপ্ত। তিনি মহামুনি পালি এ্যাংলো উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএস সি পাশ কানুনগো পাড়া কলেজ থেকে আই কম এবং সরকারী কমার্স কলেজ থেকে বি কম পাশ করে। পটিয়া পাইরোল এর প্রয়াত জ্ঞানদা রঞ্জন বড়ুয়ার ছেলে সুমল কান্তি বড়ুয়া (এস কে বড়ুয়া) বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও রপ্তানী) হিসেবে নিয়োজিত থেকে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তিনি চট্টগ্রাম সমিতি, ঢাকার উপদেষ্টা পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। দি ঢাকা জুট মিলস লি এর উপ সচিব হিসেবে আছেন বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া।

Dhaka University Institutional Repository

সাতকানিয়া ঢেমশা গ্রামের অতুল বড়ুয়ার বড় ছেলে সুকুমার বড়ুয়া বিএসসি ও এলএলবি পাশ করে পিএসসি'র মাধ্যমে সহকারী জজ হিসেবে যোগদান করেন। পরে সাব জজ হিসেবে পদোন্নতি লাভ করে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম রাউজানে বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া ও প্রীতিকণা বড়ুয়ার বড় ছেলে উত্তম বড়ুয়া ১৯৮২ সালে অর্থনীতিতে এমএসএস এবং ১৯৮৪ সালে ঢাকা ল' কলেজ থেকে এলএলবি পাশ করেন। বর্তমানে ঢাকা জজ কোর্টে এডভোকেট হিসেবে আইন পেশায় নিয়োজিত আছেন। রাউজানের বেনীমাধব বড়ুয়া ও কমলা বড়ুয়ার পুত্র শিবির বিচিত্র বড়ুয়া মুন্না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা থেকে পাশ করে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করে। মিরসরাই এর প্রিয়নাথ বড়ুয়া (বিদর্শনাচার্য) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে বি এস সি (অনার্স) এম.এস.সি পাশ করে বিসিএস এর মাধ্যমে উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা হিসেবে রাঙ্গামাটিতে চাকুরিরত আছেন। চট্টগ্রাম রাউজানে বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া ও প্রীতিকণা বড়ুয়ার তৃতীয় পুত্র আশীষ কুমার বড়ুয়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ থেকে বিএসসি (এজি) অনার্স, এমএসসি (এজি) পাশ করে বিসিএস ক্যাডারে যোগদান করে বর্তমানে আনোয়ার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত। প্রকৌশলী জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়ার ছেলে দেবনীক বড়ুয়া অনীক আমেরিকায় প্রকৌশলে পড়াশুনা করে সম্প্রতি আমেরিকার স্বনাম ধন্য বিমান নির্মাতা কোম্পানীতে উচ্চ পদে প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি লাভ করেন। চট্টগ্রাম চন্দনাইশের দক্ষিণ হাসিমপুরের জিনদত্ত বড়ুয়া ও স্মৃতিকনা চৌধুরী বড়ুয়ার বড় মেয়ে সুতপা বড়ুয়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ইন্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিকেল), এমএস করে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি গবেষণায়রত।

চট্টগ্রাম রাঙ্গুনীয়ার শিলক গ্রামের কৃতি সন্তান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ও পালি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া সম্প্রতি জাপানের আইচি গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে পিএইচডি (The Cultual Herritage of Buddhism in Bangladesh) এবং The Syneritism of Buddhism in Bangladesh বিষয়ে পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।[২৩] তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশ বিদেশী জার্ণালে প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম জোবরা গ্রামের ভদন্ত ড. জ্ঞানরত্ন থেরো জাপানের আইচি গাকুইন বিশ্ববিদ্যারয় থেকে সাফল্যের সাথে এম.এ.,পি.এইচডি. (The Origin of Abidhamma and its Development) এবং এম.এ.ডি. লিট (The way of Parcticing Meditation in Teravada Buddhism) ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যাললেয় জাপানীজ কালচারাল স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে নবজাগ্রত বাঙালি বৌদ্ধরা থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অনুগমন এবং প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাঙালি বৌদ্ধলি বৌদ্ধদের পালি ভাষা শিক্ষিত ও ধর্মানুরাগী করার জন্য মহামুনিতে সর্বপ্রথম পালি টোল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরে রাঙ্গুনিয়া রাজানগর ও পূর্বসাতবাড়িয়া এবং উনাইনপুরাতে পালি টোল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৫] ১৮৬৮ সালে বৌদ্ধ গ্রাম চকরিয়ার হারবাং, সাতবাড়িয়া, মহামুনি পাহাড়তলীতে তিন মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় উদ্যোক্তা ছিলেন চকরিয়ার গুণমেজু মহাথের, সাতবাড়িয়ার নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, রাউজানের ডা. ভাগীরথ চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ। এ সময় এ্যাংলো পালি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০২ সালে সারানন্দ নামক সিংহলী ভিক্ষু পাহাড়তলী মহামুনিতে পুনরায় পালি টোল প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার অধ্যাপক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ১৯০১ সালে সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম এম.এ পাস করেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজ এবং চট্টগ্রাম কলেজে পালি শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয়।[২৬] ১৯০৮ সালে মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পালি বিষয়ে অনার্সসহ উত্তীর্ণ হন। তিনি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময় পালির অধ্যাপক ছিলেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাসাগর কলেজে পালির প্রথম অধ্যাপক অমূল্যচন্দ্র ঘোষ। ১৯০৯ সালে রেবতী রমন বড়ুয়া পালিতে অনার্সসহ বিএ ডিগ্রী লাভ করেন।

চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম পালির অধ্যাপক ছিলেন প্রাণ কৃষ্ণ ভিক্ষু। ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম কলেজে পালির অধ্যাপক হন ধর্মবংশ মহাস্থবির ও মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া। পরে সরকারী প্রশাসন শিক্ষা প্রসাশন ক্যাডারে সরোজ ভূষণ বড়ুয়া পালি অধ্যাপক হন। তিনি ১৯০৮ সালে প্রেসিডেন্ট কলেজ থেকে পালিতে বিএ অনার্স পাশ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট হন এবং তিনি চট্টগ্রাম কলেজে পালি শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর চট্টগ্রাম কলেজে পালি অধ্যাপক হন ১৯৪৩ সালে প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, ১৯৫০ সালে রনধীর বড়ুয়া, পরে অনোমদর্শী ভিক্ষু, ১৯৭৭ সালে ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া এবং ১৯৯৬ হতে অর্থদর্শী বড়ুয়া পালির বর্তমান সহকারী অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন। সম্প্রতি যোগদান করেছেন সুদীপ্তা বড়ুয়া। বিংশ শতকেবর প্রথম দশকে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পালি খোলা হয়। এ কলেজ থেকে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া পালিতে অনার্সসহ বি এ পাশ করেন। বাঁশখালী থানার মিজ্জিতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন অনোমদর্শী বড়ুয়া। তিনি ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রফেসর ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ভারত, বাংলাদেশসহ এশিয়ার পণ্ডিত সমাজে পালি ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক হিসেবে তিনি পরিচিত।[২৭] ভারত বাংলায় পালি ও বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা ও সাহিত্যে বিভাগ খোলা হয়। ১৯০১ সালে

Dhaka University Institutional Repository

সতীশ চন্দ্র বিদ্যা ভূষণ পালি থেকে সর্বপ্রথম এম এ ডিগ্রী লাভ করে পালির অধ্যাপক হন। বৌদ্ধদের মধ্যে ১৯১৭ সালে পালি বিভাগে অধ্যাপনা করেন ড.বেণীমাধব বড়ুয়া, সমন পুন্নানন্দ, ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, নলিনাক্ষ দত্ত, ড. দীপক কুমার বড়ুয়া, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, তাঁরা সবাই অবসর প্রাপ্ত। বর্তমানে বৌদ্ধদের মধ্যে ড. সুকোমল চৌধুরী ও ড. শুভ্রা বড়ুয়া অধ্যাপনা করছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিক্ষু জিনানন্দ (১৯১০-১৯৮৯) বৌদ্ধবিদ্যা (বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ) বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে পালি বিভাগে আছেন ড. সত্যপাল ভিক্ষু।

১৯২৬-২৭ সালে নোয়াখালী জেলার ফেনী কলেজেও পালি খোলা হয়। এখানে পালির প্রথম অধ্যাপক ছিলেন ললিত কুমার বড়ুয়া। ১৯৩২ সালে কলকাতা সিটি কলেজে নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া পালির অধ্যাপক হন। ১৯৩৪ সালে নীরদ রঞ্জন মুৎসুদ্দি বিদ্যাসাগর কলেজে পালির অধ্যাপক হন। বাঙালিদের মধ্যে পালি শিক্ষার প্রসারে নীরদ রঞ্জন মুৎসুদ্দি কঠোর পরিশ্রম করেন।[২৮] ১৯৩৪ সালে মনীন্দ্রনাথ কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয়। প্রভাস চন্দ্র মজুমদার অধ্যাপন হন। ১৯৩৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে (রিপন কলেজ), ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয়।

এ কলেজে সুরেন্দ্র বড়ুয়া প্রথম পালির অধ্যাপক ছিলেন। পরে মাতঙ্গ প্রতাপ বড়ুয়া ও মনীন্দ্র লাল বড়ুয়া অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৮ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয়। এতে ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী ও ড. সুকোমল চৌধুরী এবং সাধন চন্দ্র সরকার পালির অধ্যাপক হন। বর্তমানে ড. শুভ্রা বড়ুয়া অধ্যাপনা করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে পালি ভাষায় উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাস ও সাবসিডিয়ারী) ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রাম কলেজ ও রাঙ্গামাটি কলেজ এ দুটো সরকারী কলেজ এবং ১৫ থেকে ২০টি বেসরকারী কলেজে আই এ এবং ডিগ্রী পর্যায়ে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।[২৯] বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ড এর অধীনে পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম আদ্য, মধ্য ও উপাধি বিষয়ে শিক্ষার জন্য পালি টোল ও কলেজ রয়েছে। বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা যায় যে, বাংলাদেশে পালি টোল ও কলেজের সংখ্যা ৯৬টি এবং শিক্ষক শিক্ষিকা-১২২ জন। ড. শাসন রক্ষিত মহাথের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত ও পালি বিভাগ থেকে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কয়েক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে তাঁর রচিত ভাষাতত্ত্বসার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘকাল নোয়াপাড়া কলেজে পালি বিষয়ে অধ্যাপনা করে অবসর গ্রহণ করেন শ্রীমৎ বনশ্রী মহাথের। তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ, গ্রন্থ ও পাঠ্যবই রচনা করেন। তিনি বর্তমানে বৌদ্ধ একাডেমীর পরিচালক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে অধ্যাপনা করেন ড. রবীন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় বড়ুয়া, অনোমদর্শী বড়ুয়া, ড. ভিক্ষু শাসনরক্ষিত। বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া, প্রফেসর ড. সাগরময় বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মিসেস বেলুরাণী বড়ুয়া, মি. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, মি. সুমন কান্তি বড়ুয়া, মি. অভিজিত বড়ুয়া।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে অধ্যাপনা করেন পিআর বড়ুয়া, অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, অনিল বড়ুয়া। বর্তমানে অধ্যাপনা করছেন প্রফেসর ড. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, প্রফেসর ড. রনজিত কুমার বড়ুয়া, প্রফেসর ড. বেণুপ্রসাদ বড়ুয়া, প্রফেসর তপন জ্যোতি বড়ুয়া, প্রফেসর ড. বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া, অধ্যাপক জ্যোতিষ বড়ুয়া, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. জিনবোধি থের, ছন্দা বড়ুয়া, মি. পল্লব বড়ুয়া।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন রাউজানের ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, কক্সবাজার চকরিয়া পৌরসভার জগন্নাথ বড়ুয়া (এম. ফিল. অভিসন্দর্ভের বর্তমান গবেষক)।

রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে ১৯৭৯ সালে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সুদীর্ঘ কাল পর ১৯৯৬ সালে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে পালির প্রভাষক হন শান্তিময় চাকমা। রাঙ্গামাটি মহিলা কলেজে পালি প্রভাষক হিরেন চাকমা। নোয়াপাড়া কলেজে পালি বিভাগে বনশ্রী মহাথের ও প্রভাস কুসুম বড়ুয়া অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৩ সালে রাঙ্গুনিয়া কলেজের প্রথম অধ্যাপক ছিলেন আচার্য মহাস্থবির ধর্মকীর্তি ও ড. ভিক্ষু শাসন রক্ষিত। এখন বিভাগীয় দায়িত্বে আছেন ড. পিন্টু মুৎসুদ্দি, সৌমিত্র শেখর বড়ুয়া।

সমসাময়িক কালে রাউজানের ইমাম গাজ্জালী কলেজেও পালি বিভাগ খোলা হয়। এতে প্রভাষক হিসেবে আছেন বিবেকানন্দ বড়ুয়া ও বিপুলানন্দ থের। (প্রবন্ধঃ ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, বাংলাদেশে পালি শিক্ষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চাঃ একটি সমীক্ষা) এছাড়া পালি ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকতা করছেন কল্পনা মুৎসুদ্দি ও আশুতোষ বড়ুয়া অগ্রসার মহিলা কলেজ রাউজান, সুপ্রিয়া বড়ুয়া হাসিনা জামান মহিলা কলেজ রাউজান, রত্না বড়ুয়া ও শান্তপদ বড়ুয়া পদুয়া কলেজ রাঙ্গুনিয়া, মানবমিত্র বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়া মহিলা কলেজ, স্মৃতি বড়ুয়া, শাহ আলম কলেজ-রাঙ্গুনিয়া, সুদর্শন বড়ুয়া ও রাঙ্গুনিয়া সৈয়দবাড়ীর মিনাক্ষী প্রভা বড়ুয়া, কর্ণফুলী কলেজ-কাপ্তাই, প্রিয়তোষ বড়ুয়া রাজস্থলী কলেজ-কাপ্তাই, সত্যানন্দ বড়ুয়া ও সুদীপ বড়ুয়া, হুলাইন ছালেহ নূর কলেজ পটিয়া, রঞ্জু বড়ুয়া, অলি আহমেদ (বীর বিক্রম) কলেজ, কুমকুম বড়ুয়া, নুরুল হক মহিলা কলেজ, গৌরিকা চাকমা, কাচালং কলেজ-রাঙ্গামাটি, উপানন্দ থের, চাঁদগাও কলেজ, সুমেধানন্দ থের, তৃপ্তি বড়ুয়া, সমীর কুমার তালুকদার, স্মৃতি বড়ুয়া, রাউজান হোয়ারা পাড়া কলেজ। সুমেধ বড়ুয়া, কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ সরকারী কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের প্রভাষক। নীলোৎপল বড়ুয়া নাক্ষ্যংছড়ি কলেজের

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজীর প্রভাষক, পরীক্ষিৎ বড়ুয়া, চকরিয়া ডুলাহাজারা কলেজের বাংলা প্রভাষক। এছাড়াও বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে অধ্যাপনা পেশায় জড়িত আছেন এমন উল্লেখযোগ্য- সনজীব বড়ুয়া, পটিয়া হুলাইন ছালেনুর কলেজের অধ্যাপনা করেন। পদ্মলোচন বড়ুয়া, বাংলার সহকারী অধ্যাপক চকরিয়া কলেজ, কনক কান্তি বড়ুয়া পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক চকরিয়া কলেজ। ইন্দ্রজিৎ বড়ুয়া ইতিহাসের প্রভাষক, চকরিয়া কলেজ। সরোজ কুমার বড়ুয়া, রাউজান কলেজের ইংরেজীতে অধ্যাপনা করেন। বাঁশখালীর জলদীর শ্যামল বড়ুয়া, প্রফেসর কামাল উদ্দিন চৌধুরী কলেজের বাংলা প্রভাষক। দীপক বড়ুয়া, ভাইস প্রিন্সিপাল, রামু ডিগ্রী কলেজ। সুনীল বড়ুয়া সহকারী অধ্যাপক রামু কলেজ। অগ্রসার গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা রত্না বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়া কলেজের ইংরেজী বিভাগীয় প্রধান সহকারী অধ্যাপক তরুণ কান্তি বড়ুয়া, নোয়াপাড়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক প্রভাস কুসুম বড়ুয়া, চন্দনাইশ ফতেনগর এর কৃষ্ণা বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন থেকে পাশ করে চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের দর্শনের সহকারী অধ্যাপক। তৃপ্তি বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে, ঢাকা আবুজর গিফারী কলেজের দর্শনের সহকারী অধ্যাপক, মিরসরাই নিজামপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক শিমুল বড়ুয়া। তিনি বর্তমানে অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির মহাসচিব ও সুলেখক। রাউজান ফতেনগর চন্দ্রমোহন বড়ুয়া ও বেলা রাণী বড়ুয়ার বড় ছেলে স্বপন বড়ুয়া, রাঙ্গুনিয়ার সুমন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম মহসিন কলেজে অর্থনীতি সহকারী অধ্যাপক। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে গণিত বিষয়ে ফেনী কলেজের প্রভাষক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন। রাঙ্গুনিয়া পদুয়ার প্রাণবেশ চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে সরকারী সিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইংরেজীর সহকারী অধ্যাপক। মহসিন কলেজের অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে অধ্যাপনা করেন সুমন বড়ুয়া। মনিকা দেবী বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী, রায়খালী চন্দ্রঘোনার সহকারী অধ্যাপক স্মৃতি কণা বড়ুয়া। রাউজানের ছাদার খিলং এর সুব্রত বরণ বড়ুয়া গাছ বাড়িয়া কলেজের পদার্থবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক। শ্যামলী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের দর্শনের সহকারী অধ্যাপক, কৃষ্ণ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন থেকে পাশ করে চট্টগ্রাম সিটি কলেজে দর্শনের সহকারী অধ্যাপক। কক্সবাজার উখিয়ার অর্নিবান বড়ু য়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী সাহিত্য থেকে পাশ করে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে ইংরেজীর প্রভাষক হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ু য়া ও শিক্ষিকা সুশান্তি বড়ুয়ার প্রথম কন্যা সুদীপ্তা বড়ুয়া সম্প্রতি বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে চট্টগ্রাম কলেজে পালির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিএ সম্মান ২০০০ এবং এম এ পালি ২০০১ উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। মিরসরাই দমদমার প্রকৌশলী জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া ও দীপ্তি বড়ুয়ার ছোট ছেলে মৃন্ময় বড়ুয়া ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সেমিষ্টারের সকল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ গ্রেড অর্জন করায় চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বাংলাদেশ বেতারের অবসর প্রাপ্ত সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক ধর্মদর্শী বড়ুয়া ও প্রখ্যাত লোকগীতি শিল্পী মীনা বড়ুয়ার একমাত্র ছেলে গৌতম বড়ুয়া 'দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ' এ ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করছেন। উল্লেখ্য তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সালে এম এ ফাইনাল পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের একজন নিয়মিত ইংরেজী সংবাদ পাঠক ও ইংরেজী অনুষ্ঠানের উপস্থাপক।

মহামুনি পাহাড়তলীর প্রমা অবন্তী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম টিভির নৃত্যশিল্পী। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। কিরণ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তিনি রবীন্দ্র বিশ্বভারতী থেকে পাশ করেন। রাউজান আবুরখীল এর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালির প্রাক্তন অধ্যাপক অনিল বড়ুয়ার বড় পুত্র রূপেন বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। বর্তমানে তিনি বিসিএস পাশ করে পটিয়া সরকারী কলেজের গণিতের সহকারী অধ্যাপক। প্রভাস বড়ুয়া, সজল বড়ুয়া, সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া, সৌরভ কুমার বড়ুয়া, মনিকা দেবী বড়ুয়া, অভিজিৎ বড়ুয়া মানু, দোর্দন্ড প্রতাপ বড়ুয়া, উত্তম বড়ুয়া, রুপেন বড়ুয়া, সুব্রত বরণ বড়ুয়া, সজল বড়ুয়া, শ্যামল কান্তি বড়ুয়া, কুসুম বিন্দু বড়ুয়া, তরুণ বড়ুয়া, অনোমদর্শী বড়ুয়া, জ্ঞানরত্ন মহাস্থবির, রিন্টু কুমার বড়ুয়া প্রমুখ উল্লেযোগ্য। বৌদ্ধদের মধ্যে অধ্যাপনা করে অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর নিয়েছেন অধ্যক্ষ নীলোৎপল বড়ুয়া, অধ্যক্ষ সুরোধরঞ্জন বড়ুয়া, অধ্যক্ষ সুমঙ্গল মুৎসুদ্দী, অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র বড়ুয়া, অধ্যক্ষ উদয় প্রসাদ বড়ুয়া প্রমুখ।

লোহাগড়া কালাউজানের মাস্টার তরুনী সেন বড়ুয়ার বড় ছেলে কনক বরণ বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন থেকে বিএ অনার্স ও এম এ ডিগ্রী লাভ করে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে বর্তমান ফেনি কলেজে রসায়নের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আছেন। সাতবাড়িয়া বেপারীপাড়ার রঞ্জন বড়ুয়া কক্সবাজার সরকারী কলেজের ইংরেজীর প্রভাষক, পটিয়া মুকুটনাইট এর প্রদীপ বড়ুয়া সাতকানীয়া সরকারী কলেজের প্রভাষক, ফটিকছড়ির আবদুল্লাপুরের কনক বড়ুয়া চৌদ্দগ্রাম সরকারী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার প্রভাষক। পূর্ব সাতবাড়িয়া বেপারী পাড়ার সরোজ বড়ুয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স ও এম এ পাশ করে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে ইংরেজী প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম রাউজান কদলপুরের সাধন বড়ুয়া ও দীপালি রাণী বড়ুয়ার দ্বিতীয় পুত্র সুভানল বড়ুয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.কম (অনার্স), এম কম একাউন্টিং থেকে পাশ করে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে একাউন্টিং এর প্রভাষক হিসেবে অধ্যাপনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ের এক ঝাঁক মেধাবী বৌদ্ধ তরুণ তরুণী প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় মেধার স্বাক্ষর রেখেছে এবং মেডিকেল, প্রকৌশাল, টেকনোলজি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে।

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক ১২ লক্ষ। তন্মধ্যে পার্বত্য এলাকায় ৭ লক্ষ ও সমতলে ৫ লক্ষ। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায় সংখ্যাগত দিক দিয়ে ক্ষুদ্র হলেও (১৯৭৪ সালের আদম শুমারী অনুসারে বড়ুয়া বৌদ্ধদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার যা বেড়ে বর্তমানে বিশ বছরে পাঁচ লক্ষে পৌছায়)।[৩০] কক্সবাজার জেলায় প্রায় ৮০/৯০ হাজার বৌদ্ধ বাস করে। বৃহত্তর চট্টগ্রামে বাস করে প্রায় আড়াই লক্ষ বৌদ্ধ।

১৯৯১ সালের আদম শুমারী মতে, ৬,২৩০০০ জন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ বিহার বা ক্যাং এর সংখ্যা ২০০০ (দুই হাজার)এর অধিক। ভিক্ষু ও শ্রমনের সংখ্যা অনধিক ২৫০০ জন। (কৃষ্টি, নবপর্যায় ১৭ বর্ষ, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২২) ১৯৯৭ সালের বাংলাদেশ পরিসংখ্যানে বৌদ্ধদের সংখ্যা ৬২৩৪১০ জন। বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব বেশি। বাংলাদেশে বৌদ্ধদের শিক্ষার হার ৯০ ভাগের বেশি।

৭.২ সংস্কৃতি কথা

বর্তমান কালে 'সংস্কৃতি' শব্দটির বহুল ও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃতি শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসেবে Culture শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। কালচার শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্য সমাজের সাথে মেলা মেশার ফলে গঠিত মার্জিত রুচি ও পরিশোভিত আচরণ। কালচার এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত মানস সম্পদ। বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বোঝায়, যে কারণে এ সর্ম্পকে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন, 'সংস্কৃতি' শব্দটি চলতিও নয় লৌকিকও নয়। আমরা শিক্ষিতরা ঐ শব্দটি ইংরেজী কালচার শব্দের অনুবাদ হিসেবেই গ্রহণ করেছি, বলা যায় অপব্যবহার করেছি।[৩১]

বাংলা সংস্কৃতি শব্দে একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠির ভাব-সাধনা ও জীবনচর্চার সমগ্রতা সূচিত হয়। এর মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজবোধ ও জীবন দশর্নের একত্রীভূত নির্যাস নিহিত আছে। "মানুষের সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গোপাল হালদার উল্লেখ করেছেন, 'মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।" (গোপাল হালদার, সংস্কৃতির রূপান্তর, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৩) মানুষের জীবনের কার্য বলতে গেলেই আসে জীবিকা, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সাহিত্যের কথা। কাজেই বলা যেতে পারে মানবসমাজ তথা জনগোষ্ঠীর যাবতীয় কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মানুষের সংস্কৃতি।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি মানুষের পরিচয়। নৃতত্ত্ববিদ হারস্কোভিট সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেছেন, A culture is a way of life of a people.[৩৩] কোন ব্যক্তির বা জন সমষ্টির পরিশীলিত জীবন চেতনাই সংস্কৃতি। মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির উৎস ও প্রসূন বীজ ও ফল। "বাংলাদেশের ইতিহাসে সংস্কৃতি মিশ্রিত, একক নয়। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-আদিবাসী নানা পর্যায়ে সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে সে ইতিহাসে অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। বহুমাত্রিক সংস্কৃতি, উৎসব ও মেলা বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য। আবহমান বাংলার লোক মেলা ও লোক উৎসবের কথা উঠলেই, 'সংস্কৃতি' কথাটি আসে।

দর্শনকোষ এ সংস্কৃতি শব্দটির বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'মানুষের সর্বপ্রকার বৈষয়িক এবং আত্মিক সৃজন ও সম্পদের ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। অনেক সময়ে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, সামাজিক আচরণ ও নীতি অর্থাৎ মানুষের ভাবগত সৃষ্টি কর্মকে কেবল সংস্কৃতি বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টির সম্পূর্ণ অর্থে আর্থিক ও কারিগরি সৃজনকর্ম এবং তার ফসল এবং উৎপাদিত বৈষয়িক সম্পদ ও সৌধকেও মানব সমাজের সংস্কৃতি হিসাবে গণ্য করা উচিত। পার্থক্য বৈষয়িক সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা বলে। ... সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌথ ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই সংস্কৃতির উদ্ভব।[৩৪] সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী সংজ্ঞা থেকে বলা যায় যে, মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডেই সংস্কৃতি, মানুষের অতীত কৃতিত্বই সৃষ্টি করে সংস্কৃতি। আর মানুষের এই অতীত কৃতিত্বই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাই ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ এমন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যে একক অপর থেকে পৃথক করে চিন্তা করা যায় না। নীহার রঞ্জন রায়ের ভাষায়- এই প্রাকৃতিক সীমা বিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড় পুণ্ড্র-বরেন্দ্র-রাঢ়-সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কারের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্মকর্ম নর্মভূমি।

এই ভৌগোলিক ভাগ্যকে শিরোধার্য্য করেই বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি (Culture) হচ্ছে কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠি ও সভ্যতার বুদ্ধিগত, নৈতিক, শিল্পকলা এবং সমষ্টিগত আচার আচরণ সংক্রান্ত যাবতীয় জীবচর্চার অভ্যন্তরিন ও বাহিক বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ অবস্থা বা Type কালে কালে সংস্কৃতি বহুমাত্রিকতা লাভ করে। সব সংস্কৃতিই এর অভিন্নতাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট সঞ্চারিত করতে চায়।[৩৫] সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ একটি উপাদান। অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগে এবং সকল মান সমাজে স্বতন্ত্র। সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।

সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টাইলরের উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য: Culture is that complex whole which inludes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habils acquired by man as a member of society.[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত সংস্কৃতি হলো নিয়ন্তর সংস্কারের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানবগুণ। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার বুদ্ধি, আচার অনুষ্ঠান জীবনযাত্রা রীতি নীতি প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মার্জিত রূপকেই সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে।

ড. আহমদ শরীফ বলেছেন-জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান, কাল এবং গোষ্ঠিগতও। মানব সংস্কৃতি এ কারণেই বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও নানামুখী। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি (Cultural diffusion), ধরণ (Pattern), বৈশিষ্ট্য, প্রপঞ্চ (Phenomenon) ভিন্ন। বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির জ্ঞানে, মননে ও আধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বরাবর প্রবল রয়েছে।[৩৭] জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম প্রয়াস ও আবরণ আবর্তনধর্মী হয়েই জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে। তাই আমাদের সংস্কৃতি উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও মজ্জা আজো আদিম। আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

'আচার-আচরণ, ন্যায়-অন্যায়, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য-শ্রেয়বোধ, সংস্কার চেতনা, জীবনের মূল্যবোধ মূখ্যত ধর্মমত থেকেই জাগে। তাই আজো হিন্দু মুসলিমের মধ্যে বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি কিংবা অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় ঐতিহ্যের ও আচরণের অনেক কিছুরই রেশ দেখতে পাই।' (প্রাগুক্ত, বাঙালি বাঙলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩) জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রীস্টান এবং ইসলাম গ্রহণ করেও বাঙালি তার আদিম ঐতিহ্য কখনো সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারেনি। তাদের জাত, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, শাস্ত্র সমাজ, সাহিত্য ও ঐতিহ্য চেতনা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। বস্তুত যে কোন ধর্মদর্শন, তত্ত্ব বা মতবাদ বাস্ত বতার ভিত্তিতেই প্রচার প্রসার লাভ করে। বাস্তব প্রেক্ষাপট তৈরী করে ধর্মদর্শনের পটভূমি, আবার ধর্মদর্শনও বদলায় বাস্তব প্রেক্ষাপটেই। লেভি-স্ট্রাউস (Claude levi-strauss) জগতের একজন সেরা নৃতত্ত্ববিদ। তিনি বলেন- 'নৃতত্ত্ববিদরা হচ্ছে একটা উদ্ভুত জাত। তারা পরিচিত বিষয়বস্তুকে রহস্যময় ও জটিল করে তোলেন।' (Anthropologists are a strange breed, they like to make even the familiar look mysterious and complicated.)[৩৮] এক কথায় মানুষের সামগ্রিক জীবন যাত্রার সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন জাতি বা কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মানুষের পরিণত হতে পারে না। বস্তুগত ও মানসিক উপাদানের সমন্বয়ে মানব সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। তাই ব্যক্তি সমাজের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। Culture is a way of life that ..... is transmitted from generation to generation অর্থাৎ সংস্কৃতি একটি জীবন পদ্ধতি যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা সংস্কৃতি হচ্ছে, একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, কিংবা সামাজিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ। এটি অতীতের সাথে যুক্ত থাকে এবং আদর্শায়িত অর্জিত গুণ হিসেবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মানব সংস্কৃতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল; গতিশীল। তাই সংস্কৃতির থাকে একটি প্রবহমান ধারা। নৃবিজ্ঞানী ক্লার্ক উইজলার (Clark wissler) সংস্কৃতির নয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এবং সমাজ বিজ্ঞানী কিমবল ইয়াং সংস্কৃতির কাঠামোগত তেরটি সর্বজনীন উপাদান উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

আমাদের বিভিন্ন মেলাগুলোকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) ধর্মীয় ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমা, শ্রাবণী পূর্ণিমা, প্রবরেণা পূর্ণিমা মাঘী পূর্ণিমা, (২) ধর্ম নিরপেক্ষ ঃ বিভিন্ন লোকায় উৎসব পুণ্যাহ, নববর্ষ, পোষ মেলা চৈত্রমেলা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে মিলনের যে আয়োজন তা থেকেই মেলা শব্দটির উদ্ভব হয়ে থাকবে। এটা অনস্বীকার্য যে শতবর্ষ পূর্বে বিভিন্ন মেলায় যে আদিম সংস্কার জাত **(Ritual)** রূপ ছিল আজকালের মেলায় তার রূপ বদলেছে। মেলাগুলি আজ অধিকাংশই মানবতামুখী এবং ধর্মীয় ভাবের পরিবর্তে এ গুলির ব্যবসায়িক দিকটিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তার সঙ্গে অবশ্যই আছে উৎসব অনুষ্ঠান। তদানীন্তন ব্রিটিশ বাংলায় জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক মি. বেন্টলী মেলার সংজ্ঞা দিয়েছেন, A Periodical gathering of a large number of people for religious or other lowful purposes.[৪০]

আবহমান কালের উৎসব ও মেলার রূপ আজকে বদলে গেছে। ঐতিহাসিক অনেক মেলা ও উৎসব আজ বিলুপ্ত বা হারিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নতুন মেলার উদ্ভব হয়েছে। জি. এম. গমও যে কোন লোক উৎসব বা সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, I belive that every single item of folklore, every folktale, every tratition, every custom and superstition has its origin in some definite past; in the history of man's past.[৪১] নৃতত্ত্ববিদ নির্মল কুমার বসুর মতে, Though the history of a particular cultural trait we can learn many things about the cultural history of a religion.[৪২]

দেশ-কাল-ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র কোনটাই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ামকও নয়। সব কিছুর দানে, প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশকালের উপযোগী হয়েছে।[৪৩] মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) লিখেছেন, ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নত জীবন সম্বন্ধে চেতনা সৌন্দর্য আনন্দ ও প্রেম সম্পর্কে অবহিত।[৪৪] "সংস্কার থেকে যা উদ্ভূত তাই সংস্কৃতি (Culture)। সংস্কার হৃদয়ের বিশ্বাস, বলা যায় গভীরতম বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

আমার জীবনের সংস্কার বলতে তাই বুঝি, যা আমি বিশ্বাস করি, পোষণকরি, চর্চা করি এবং জীবনের সামগ্রিক মূল্যবোধের উপর যার ভিত্তি।

ইংরেজী cult অর্থ ধর্মীয় পদ্ধতি, A system of religions belief. কোন কিছুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভক্তি। তা থেকে Culture সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। তাই বলা হয় Culture is a particular type or form of intellectual development. The state of civilization among a people developd by cultivation or training of religions faiths.[৪৫] সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদির সূক্ষ্ম চর্চাকেই বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। সংস্কৃতি হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সমাজের মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাষা, ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ, জীবনাচার প্রভৃতি যা স্বীয় সমাজভুক্ত জনসাধারণ বংশানুক্রমে অর্জন করে তাকে এবং যা এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে অতি সহজেই প্রবাহিত হয়। সংস্কৃতি হচ্ছে বংশ পরম্পরা একটি জীবনধারা। গোপাল হালদার মানুষের জীবন সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টাকেই সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ম্যাকাভোর এবং পেজের মতে, মানুষ যা করে তাই তার সংস্কৃতি (Culture)। ইংরেজী Culture শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। অভিধানের অর্থে কৃষ্টি শব্দের ব্যুৎপত্তি 'কর্ষণ' থেকে, এবং কর্ষণ শব্দের মূলার্থ 'হাল চালনা'। মূলত সংস্কৃতি কথাটা এসেছে সংস্কার সাধন থেকে। অভিধানের অর্থানুযায়ী সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ সাধন করা। অতএব কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি উভয় শব্দবাচক ব্যাপারই মানুষের কর্মভিত্তিক। তাই সংস্কৃতি হলো মানুষের কর্মকৃতি থেকেই সৃষ্ট সম্পদ, তার অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, চিত্রে, মানস ভাবনায় তথা সমগ্র জীবনাচরণে। ড. আহমদ শরীফ বলেছেন, জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয়, কেবল স্থান কাল এবং গোষ্ঠিগতও। মানব সংস্কৃতি একারণেই বৈচিত্র্য বিভিন্নতা, বিবর্তন ও নানামুখী।[৪৬] বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অষ্ট্রিক দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় জ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির জ্ঞানে, মননে ও আধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখযোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বরাবর প্রবল রয়েছে। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম-প্রয়াস ও আচরণ আর্বতনধর্মী হয়েই জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখে। তাই আমাদের সংস্কৃতি উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও মজ্জা আজো আদিম। আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্থুল কিংবা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক পার্থক্য কিংবা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আচার-আচরণ, ন্যায়-অন্যায়, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য-শ্রেয়বোধ, সংস্কার চেতনা, জীবনের মূল্যবোধ মূখ্যতা ধর্মমত থেকেই জাগে, তাই আজো হিন্দু মুসলিমের মধ্যে বৌদ্ধযুগের ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতি কিংবা অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় ঐতিহ্যের ও আচরণের অনেক কিছুরই রেশ দেখতে পাই। সংস্কৃতি চর্চা যেকোন জনগোষ্ঠি বা জাতীয় সপ্রাণতার চলমান লক্ষণ। সম্মুখ পথে চলমান জগত ও জীবনকে

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্দি করতে না পারলে, আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক মনন-চিন্তাকে ধারণ করে যুগমানসে নতুন ও পরিবর্তন জীবনের প্রয়াসে সংস্কৃতিচর্চা অপরিহার্য। সংস্কৃতিকে সরল ভাষার বলা যায়, মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ম, রীতিনীতি ও সংস্কার পালন করে সেটাই তার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সংস্কৃতি শব্দটি মূলত আধুনিক কালে রবীন্দ্র নাথের সময়ে প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃতি একটি জাতির প্রাণ স্পন্দন স্বরূপ। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতির অনেক কিছুকে বুঝায়। সংস্কৃতি শব্দের প্রতিশব্দ কৃষ্টি উভয়ের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Culture. এর সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ 'কৃষ্টি'। কৃষ্টির চেয়ে সংস্কৃতি বেশী গ্রহণ যোগ্য সুন্দর ও মানানসই। ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পৃক্ত। মানুষের সমস্ত কিছুর মূলকেন্দ্র বিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সংজ্ঞায়ন এক দূরহ ব্যাপার। রুচিবোধ, চেতনা এবং মননের নিরিখে সংস্কৃতি নানাভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। মুলত সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জীবন গঠনে বিচিত্ররস সঞ্চারণ করে। সমাজতত্ত্ববিদগণ মনে করেন জাতির জীবনাচার মাত্রই জাতির সংস্কৃতি। ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে পার্থিক ও অপার্থিক ব্যাপারে বহু বিচিত্রি সংস্কারের অনুবর্তী করেছে। আর এগুলো থেকেই উৎপত্তি লাভ করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, উৎসব ও সংস্কৃতি। ধর্মে মানব জীবনের এমন কোনো পর্যায় নেই যার সঙ্গে সরাসরি সংস্কৃতি যুক্ত নয়।

হিউয়েন সাঙ এর ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ আছে, বাঙালি সংস্কৃতির পৌরানিক স্তরের অন্তরালে এখনো বৌদ্ধ সংস্কৃতি বহমান। কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আজও সক্রিয়। বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সহজে পৃথক করা যায় না।[৪৭] বড়ুয়া বৌদ্ধদের সংস্কৃতির বিধিবিধান, নিয়মকানুন তৈরী হয় দীর্ঘকাল আগে থেকে। একদিনে সেই রীতিনীতি চালু হয়নি। একদিনে তা ভাঙাও যায়না। এর জন্য দীর্ঘ সময়ের বোঝাপড়া দরকার।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার। বৌদ্ধ সংস্কৃতি বঙ্গ সংস্কৃতির মাঝে একাকার হয়ে গেছে। বৌদ্ধযুগের বাঙালি জাতিসত্তার অতীতের সাফল্য গৌরব, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্মরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতকে গড়তে হবে রচনা করতে হবে নতুন ইতিহাস, সন্ধান করতে হবে উৎসকে, খোঁজতে হবে অস্তিত্বের শেকড়। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিপর্যয়। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হলেও একমাত্র চট্টগ্রামেই তার দীপশিখাটি স্বগৌরবে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। (অনোমা, ২০০১, চট্টগ্রাম, প্রবন্ধ: ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া, বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিসত্তা) নবজাগরণের ফলে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজ একটি প্রগতিশীল সমাজের রূপান্তরিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় বৌদ্ধ সমাজের এই কালজয়ী ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন

শ্রেণীচেতনা ও সংঘবদ্ধ মনোভাব থেকে সভা-সমিতি গঠন করা হয়। সাধারণত সমশ্রেণীর সমমনা মানুষ এরূপ সংগঠনের ছত্রচ্ছায়ায় একত্র হয় এবং কতক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ সংগঠন আছে। সমাজে বিদ্যমান সংকট সমস্যা কাটিয়ে উঠে একটা সুন্দর জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে এরূপ আশা-আকাঙ্খা থেকে এ ধরণের সংগঠনের জন্ম হয়। পূর্বকালে ব্যক্তি ছিল, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ছিল না, শ্রেণী ছিল, শ্রেণী-চেতনা ছিল না। এ জন্য সে যুগে সভা সমিতিও ছিল না। সোসাইটি, এসোসিয়েশন, সংঘ, ফেডারেশনে, গিল্ড, ইউনিয়ন, সমিতি, পরিষদ, সংসদ একাডেমী, ফোরাম ইত্যাদির গঠন রূপায়ণ ব্যক্তিত্ববোধ ও শ্রেণীস্বার্থে উজ্জীবিত শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সভা-সমিতি সম্পূর্ণ আধুনিক কালের ফসল।

সভা-সমিতি বর্তমান কাল তরঙ্গের শিরোভূষণ। পূর্বকালে এক একজন বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়া কেহবা ধরণীতে, কেহবা এক এক দেশে, এক এক বিষয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করিয়াছেন। বর্তমান যুগের বিধান দশজনে মিলিয়া কাজ করা। পূর্বে যে ক্ষেত্রে একজন মাত্র ছিলেন, এখন সে ক্ষেত্রে দশজন দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সেখানে দশজন সমকক্ষ, সেখানে একজনের সাবৃভৌমত্ব বিধিবিহিত নয় কাল ধর্ম সে অদ্বিতীয়ত্ব চূর্ণ করিয়াছে। পূর্বে দশজন ছিলনা, বলিয়াই একজনের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকিত। সভাতে ঐক্য সংহতি ও ভাবের বিনিময়ে, চিন্তা ও মানসিক শক্তি সমূহের উন্মেষ ও বিকাশে জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত হয় ও কার্যশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সভা সমিতির বাল্যাবস্থা; সভাগুলি এখনও কার্যক্ষমতারূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই।[৪৮] বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন, সভা-সমিতির সকল বিষয়েই মোটের উপর সন্তোষ্ট নয়।

প্রাচীন কালে আজ থেকে আড়াই হাজার বৎসর অধিক পূর্বে মহামানব বুদ্ধের সৃষ্ট 'ভিক্ষু সংঘ' শ্রেণীচেতনা, একতা ও সংগঠিত হওয়ার প্রথম সংগঠন। ইতিহাসে বুদ্ধের এ উদ্যোগ ছিল আদি এবং সর্বপ্রথম তৎপরবর্তীতে আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায় গঠিত 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) ছিল এরূপ প্রথম সংগঠন; এটি সামাজিক সংগঠন ছিল। এরপর ধর্মীয় সভা 'ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮২৯), সামাজিক রাজনৈতিক ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন (১৮৩১), সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তত্ত্ববোধনী সভা' (১৮৩৮) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রথম ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন ছিল 'আঞ্জুমান ইসলামী' (১৮৫৫) এর পরে নবাব আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে মহামেড়ান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) ও সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে 'কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মহামেড়ান এসোসিয়েশন' (১৮৭৮) গঠিত হয়। এগুলো সবই কলিকাতায় স্থাপিত হয়। একই ভাবে ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন পিপলস এসোসিয়েশন নামে হিন্দু প্রধান সংগঠন ও স্থাপিত হয়।[৪৯]

আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধ সংগঠন, কোথায়, কখন, কিভাবে, কেন কি ধরণের সভা-সমিতি গড়ে উঠেছে, সেগুলোর লক্ষ্য উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড কিরূপ ছিল সেসবের পরিচিতি মূলক একটি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধানী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষার উন্নতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে বৌদ্ধ 'সভা-সমিতি ও ক্লাব-সোসাইটি-এসোসিয়েশন হল এ যুগের মানুষের সামাজিক জীবনের অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয় অপরিহার্য সহচর। আদিম মানব সমাজেও ক্লাব- সোসাইটি ও এসোসিয়েশন ছিল। কোথায়ও বয়সভেদে, কোথায়ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে, এমনকি কোথাও কোথাও মর্যাদা ভেদেও সেগুলি গড়ে উঠত এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্যও ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সঙ্গে তার বিরোধও ছিল কোথাও কোথাও ব্যক্তি, পরিবার ও ক্লাব প্রত্যেকটি ইউনিটের সঙ্গে বিরোধ।[৫০]

সভ্য সমাজের সভা সমিতির বৈশিষ্ট্য হল, তার গোষ্ঠিগত ও শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য। এই জাতীয় সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই তার প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার ঘাত-প্রতিঘাত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত বদলে যাচ্ছে।[৫১] দান (Donation), উপহার (Gift), উত্তরাধিকার (Inheritance) ইত্যাদি সার্বজনীন প্রথা ও ঐতিহ্যগত বিষয়। জাতীয় সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ তথা পরিশীলিত জীবনবোধ সৃষ্টির জন্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিনয় ঘোষ বলেছেন, সামাজিক সংঘাতের তীব্রতার মধ্যেই সভা-সমিতির বিকাশ হয়। এটা আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও তা-ই দেখা যায়। সামাজিক ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি বিবরণ বা বর্ণনা । সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির বিবরণই সামাজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য। সমাজগঠন শব্দটি বর্ণনামূলক, তাত্ত্বিক কোন সংজ্ঞা নয়। সমাজ গঠন বলতে আমরা নির্দিষ্ট একটি সমাজের কথা বুঝি যার অবস্থান নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র বা ভৌগোলিক সীমায় এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিতে। সমাজ ও সমাজ গঠন অনেক সময় একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।[৫২]

বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে বহু সভা-সমিতি সংগঠনের জন্ম হয়েছে বটে; প্রকৃত অর্থে সংগঠনের যে প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ সেরূপ হয়নি। সর্বাংশে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে পুঁজি করে হীন আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রকাশের ব্যস্ততা সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, জাতি, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সামষ্টিক প্রচেষ্টার আন্দোলন উপেক্ষিত হয়েছে। বাঙালি বৌদ্ধদের সমকালীন ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে ভেতরকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ, অনৈক্য, সিদ্ধান্তহীনতা, ব্যক্তিস্বার্থ, জাতীয় উন্নয়ন পরিপন্থী কার্যক্রম, সামগ্রিক বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি স্বার্থে আঘাত এনেছে। আদিম সমাজ ছিল ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে; সর্বজনীন বিস্তৃত চেতনা সম্পন্ন। অফিস সমাজ ছিল সহযোগিতার সমাজ। ঐক্য সংহতিবোধও ছিল বেশ তীব্র।[৫৩]

যৌথ বা দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে লাভজনক, সহায়ক ও সমৃদ্ধি সূচক। আত্মসামাজিক ধর্মীয় কুসংস্কার, কুপ্রথা, অনাচার, সমস্যা দূরীকরণ জনগোষ্ঠির স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্যে মানবদরদি ও সমাজহিতৈষী, চিন্তাবিদদের প্রচেষ্টায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রথাগত (Conventional) সমাজ সংস্কার আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

(Social Reform movement) সমাজ সংস্কারক (Social Reformer). সমাজ সংস্কার হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস কিংবা সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যান্য কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধনের উপায়।[৫৪] সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত নিযাতিত ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির স্বার্থ সংরক্ষণ, পরিকল্পনা, আধুনিকীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যে কোন সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমান ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। ধর্মীয় ও সমাজকল্যাণে সমাজ সংস্কার আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম একটি মৌল ও সার্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধদের মধ্যে সংগঠন চেতনা সজীব ও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে ধর্ম। ধর্ম সর্বত্র একটি অন্যতম ঐক্য, সংহতি ও সংঘবদ্ধতার মৌলিক প্রতিষ্ঠান। ধর্মের সঙ্গে হৃদয় ও বিশ্বাসের যোগসূত্র নিবিড়। প্রগতিশীল, সংস্কারবাদী ও অসাধারণ জনপ্রিয় নেতার নেতৃত্বে জাতি, ধর্ম, সমাজের কল্যাণে সংস্কার উন্নয়নে জনহিতকর কাজে উদ্যোগী হতে হয়।

জ্ঞাতি সম্পর্ক (Kinship) সামাজিক সংগঠনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনেই সমাজ-সংগঠনের সৃষ্টি। মানুষ সামাজিক এবং স্বার্থ-সম্পত্তি চেতনা সম্পন্ন জীব। যার মধ্যে জ্ঞাতি চেতনা ও সম্পত্তি চেতনা নেই সে হয় আত্মবিস্মৃত নতুবা অতিমানব।[৫৫] সামাজিক ইতিহাস হচ্ছে রাজনীতি ব্যতিরেকে একটি জাতির ইতিবৃত্ত।[৫৬]

একটি জাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠন ও মূল্যায়ণ সহজসাধ্য নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের চেয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিধি অনেক বিশাল ও ব্যাপক। একটি দেশ তথা জাতির প্রকৃত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস হচ্ছে অতীতের দৈনন্দিন জীবনে এর সকল মানুষের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড। সমাজের ব্যক্তিচিন্তা ও কর্মকাণ্ড রূপ লাভ করে ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জাত, প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, অভ্যাস, নীতিবোধ, সভা-সমিতি, দল, শিক্ষা, জীবন সমগ্রতায় । এর মূল্যায়ণ থেকে পরিস্ফুট হয়ে উঠে বিশেষ সমাজের গতিধারা।

'সামাজিক সত্তা ও সংগঠনে চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে সকল পরিবর্তন এবং পরিবর্তন আনয়ন কারী ব্যক্তিত্বসহ সকল আন্দোলন, বিপ্লব ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের সব সদস্য সমান মেধা ও কর্মক্ষমতার অধিকারী নয় এবং সবার রুচি-অভিরুচি, আকাঙ্খা-অভিলাষ ও একমাত্রিক নয়। অতএব পেশাগত ও মেধাগত বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সমাজ সম্পর্ক ও সংগঠনে যে পরিবেশ পরিস্থিতি, অস্থিরতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে তাও সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিষয়। .... এক কথায় সামাজিক ইতিহাসের ছায়া পড়ে সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ সত্তার সর্বক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাস, জাত, শ্রেণী, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সমিতি-সংগঠন, সংস্কার-আন্দোলন, সাহিত্য, সঙ্গীত, আনন্দ উৎসব, স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প, লোকগাথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃ শ্রেণী সম্পর্ক, দল ও দলাদলি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছেদ, খেলাধুলায়।

Dhaka University Institutional Repository

এসবই সামাজিক ইতিহাসের আওতাভুক্ত। পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে হলে এসব উপাদানের কোনটাই বাদ দেয়া যায় না।'[৫৭]

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশ কোন নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু ও শেষ হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নানামাত্রিক সময়ের প্রয়োজনে এক বা একাধিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। 'উনিশ শতকে বাংলার ইতিহাসে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে (বৌদ্ধধর্ম সংস্কারবাদী আন্দোলন, যা ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছিল। এসব পরিবর্তনকেই রেনেসাস নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইংরেজ কর্তৃক এদেশ দখল এবং তারপর চিরায়ত সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার যে সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তা থেকেই উনিশ শতকের বৌদ্ধধর্ম সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব।

ইংরেজ রাজত্বের শুরু (১৭৫৭ সাল) থেকে আরম্ভ হয় বৌদ্ধদের পুরাতন ঐতিহ্য অনুসন্ধানের ইতিহাস। এ সময় ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের আদি ও প্রাচীন সংগঠন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার চকরিয়ার হারবাং এর প্রাণপুরুষ গুণমেজু মহাথের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং চট্টগ্রাম সাতবাড়িয়ার নাজির কৃষ্ণ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।[৫৮] বিদ্যাবিনোদ কালিকিঙ্কর মুৎসুদ্দির সম্পাদনায় সমিতির মাসিক পত্রিকা বৌদ্ধবন্ধু প্রকাশিত হয়।

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর (১৯০৯-১৯৯৪ খ্রি.) নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বঙ্গীস বড়ুয়া (বঙ্গীস ভিক্ষু)[৫৯] বিশ্ববৌদ্ধদের সাথে বাংলাদেশের বৌদ্ধদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সুযোগ ঘটে ১৯৫০ সালে। ১৯৫০ সালে কলম্বোতে পৃথিবীর সকল বৌদ্ধদের একটি সংস্থায় সংঘবদ্ধ করার জন্য প্রথম বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আর্থিক সহায়তায় তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কলম্বো বিশ্বসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হলেন- বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, সহসভাপতি উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি ও সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীস ভিক্ষু। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাঙালি বৌদ্ধদের আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ধর্মীয় আন্দোলনের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হয়। এ সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে World Fellowship of Buddhist (WFB) নামে বৌদ্ধদের বিশ্বসংস্থা গঠিত হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ WFB এর আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৬০] ১৯৫৪ সালে জাপানে বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলন, ১৯৫৭ সালে দিল্লিতে সর্বধর্ম সম্মেলন, ১৯৬০ সালে চীনের পিকিং এ অনুষ্ঠিত এশীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের এবং অন্যান্য সদস্য বৃন্দ বৌদ্ধ প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করে বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশী বৌদ্ধাদের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

তদানীন্তন মিয়ানমার প্রধানমন্ত্রী উনুর উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী রেঙ্গুনে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দু'বছর ব্যাপী ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপিটকের বুদ্ধবাণীসমূহ বিশুদ্ধ ভাবে সংরক্ষণের জন্য সমগ্র বিশ্বের থেরবাদী বৌদ্ধগণ অংশগ্রহণ করে। ষষ্ঠ বৌদ্ধ সংগীতিতে বাংলাদেশ থেকে যোগদান করেছিলেন, গুণালংকার মহাথের ধর্মরত্ন মহাথের, শীলালঙ্কার মহাথের, আর্যবংশ মহাথের, বুদ্ধরক্ষিত মহাথের, বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, শান্তপদ মহাথের প্রমুখ।

এর পরবর্তীতে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি ১৯৮০ সালে বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোসিফের আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্বীকৃতি লাভ করে। বৌদ্ধ ইতিহাসে সম্রাট অশোকের (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) রাজকালে ত্রিপিটক ভারত বর্ষের সীমা অতিক্রম করে এশিয়া ও ক্রমে প্রাচ্যের বহুদেশে প্রচারিত হয়। এবং ত্রিপিটক অনূদিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চায় অনুরাগী ইউরোপীয় পালি পণ্ডিত Prof. T.W. Rhys Davids, ১৮৮১ সালে লন্ডনে Pali Text Socity প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ভারতীয় পণ্ডিতেরা ১৮৯৪ সালে Pali ext Society প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রামের বৈদ্যপাড়ার অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯২৮ সালে রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক প্রকাশ ও রচনায় ভূমিকা রাখেন। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র দাশের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮২ সালে কলিকাতায় Buddhist Text Society প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ সমাজে নব জাগরণের যুগে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

১৮৯৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অণুপ্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলা হয়। এর পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয়। বাংলা ভাষায় ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য গঠন করা হয় যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ফাণ্ড। অধরলাল বড়ুয়া ছিলেন এর সম্পাদক। সর্ব প্রথম ১৯৩৭ সালে এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার অনুবাদকৃত মধ্যম নিকায় (১ম ভাগ) ১৯৪০ সালে, পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির অনুবাদকৃত মহাবর্গ, ১৯৩৭ সালে ১৯১৩-১৯২৯ সাল পর্যন্ত ঈষাণ চন্দ্র ঘোষ জাতক (৬ খণ্ড) অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু পণ্ডিত জ্ঞানী গুণী, সাহিত্যিক বাংলায় ত্রিপিটক ও পালি ভাষা সাহিত্য চর্চার গতিধারা বহু গুণ বৃদ্ধি করেন।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে শ্রলংকার অনাগরিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩০ খ্রি.) এর নেতৃত্বে গড়ে উঠে 'মহাবোধি সোসাইট'। এরপর ১৮৯২ সালে চট্টগ্রামের কৃতি পুরুষ, মনস্বী, কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬ খ্রি.) এর নেতৃত্বে, ও গুণালংকার মহাস্থবিরের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (Bengal Buddhist Association)। এদুটি সংগঠনই ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার বার্ষিক সাময়িকী সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় 'জগজ্জ্যোতি' এর বর্তমান সম্পাদক সৃজন, মনন, কবি সাহিত্যিক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী। বাঙালী বৌদ্ধদের

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠাতা কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবিরের সার্থক উত্তরসাধক সভার বর্তমান সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত ধর্মপাল মহাথের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[৬১] ১৮৯৯ সালে ডা. ভগীরথ চন্দ্র বড়ুয়া কর্তৃক চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার। ১৯০৩ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধ ধর্মের জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯১৯ সালে বৌদ্ধদের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমবায় অবদান ব্যাংক নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালে খ্যাতিমান সমাজ হিতৈষী উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধ সমাগম নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬২]

সংগঠন বিষয়ক আলোচনায় বলতে হয় বাংলাদেশের প্রথম ও প্রধান সংগঠন হল 'বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমিতি' প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৮৭ সাল। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন গুণমেজু মহাস্থবির ও সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী বা নাজির কৃষ্ণ। এই দুইজন তৎকালীন সমাজ নেতা দিগ্বপাল সমাজ হিতৈষী ছিলেন। বাংলাদেশে বড়ুয়া, চাকমা, মার্মা, রাখাইন, চাক, তনচঙ্গ্যা, প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বাস করে। প্রাকৃতিক পরিবেশে, আঞ্চলিক প্রভাব, ভাষা ও পোষাকের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক বাহক। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে ৯৫০টি বৌদ্ধ বিহারের মধ্যে ৯০০টি বিহার সংঘরাজ নিকায়ের অধীনে। সম্প্রতি তথ্যমতে, ২০০০ এর বেশী বৌদ্ধ বিহার আছে। সবদিক বিচার করলে বাংলাদেশে বর্তমানে ভিক্ষু ও শ্রমণের সংখ্যা প্রায় ২৫০০ থেকে ৩০০০ জন ভিক্ষু ও ৫০০ থেকে ৭০০ জন শ্রমণ রয়েছে। সংঘরাজ নিকায়ের প্রয়াত সংঘরাজ শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বশান্তি প্যাগুডায় অবস্থান করেছিলেন। ১২ এপ্রিল ২০০২ তিনি মহাপ্রয়ান লাভ করেন। বর্তমান বিশ্বে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে বৌদ্ধধর্মকে পালন করছে। বাংলাদেশে প্রথমে হীনযান (থেরাবাদ) বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এরপর পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হলে ও থেরাবাদ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পরে আবার থেরাবাদে ফিরে আসে। বর্তমানে সবাই থেরবাদী। সারমিত্র মহাস্থবির বাংলাদেশের বৌদ্ধদের জাগরণের অগ্রদূত এতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম পুনরুত্থান লক্ষনীয় হলেও এটা সমাজের অল্প সংখ্যক চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ।[৬৩]

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা প্রায় বার লক্ষ। এ দেশীয় বৌদ্ধদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- আরাকানী বৌদ্ধ, উপজাতীয় বৌদ্ধ এবং বাঙালি সমতলী বৌদ্ধ। ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া বলেন, বর্তমানে আরাকানী বৌদ্ধদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। তারা কয়েক শতাব্দী পূর্বে আরাকান বা আকিয়াব হতে এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করেছে। কক্সবাজার, বরিশালের বরগুণা ও পটুয়াখালীতে তারা বেশী সংখ্যায় বাস করে। বাঙালি বৌদ্ধরা প্রধানত, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, কক্সবাজার, নোয়াখালী ও লাকসামে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বাংলায় বৌদ্ধদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মনন চর্চায়

Dhaka University Institutional Repository

এক গৌরবময় সুদৃঢ় অবস্থান ছিল। বৌদ্ধদের অসংখ্য বই ও পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে । বাংলায় বৌদ্ধ মনীষাদের জ্ঞান গরীমা ও পান্ডিত্যের বিশ্বময় খ্যাতি ছিল। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙালি অতীশ দীপঙ্করের নাম সর্বাধিক উল্লেখ্য ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ শীলভদ্রের পান্ডিত্যের খ্যাতি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল । শীলভদ্র ছাড়াও অপর দুই বাঙালি শান্তরক্ষিত ও চন্দ্রগোমিন নালন্দা মহাবিহারের আচার্য্যপদে নিযুক্ত হন। ওরিয়েন্ট লংম্যান কিশোর প্রিয় গ্রন্থমালায় বলা হয়েছে। রামমোহন রায় প্রথম বাঙালি বিশ্ব মানব নয় ; অতীশ দীপঙ্কর হলেন প্রথম বাঙালি ইউনির্বাসালম্যান।[৬৪] বৌদ্ধ সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন বৌদ্ধ সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তৎকালীন জিলা স্কুল পরিদর্শন শ্রী গগণ চন্দ্র বড়ুয়া ১৯০৩ সালে পাহাড়তলী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত Anglo Pali Institution সম্ভবত প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯১৩ রেনেসাঁসের যুগে উচ্চ শিক্ষিত বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম স্নাতক/ গ্রাজুয়েট ছিলেন মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া এবং রেবতী রমণ বড়ুয়া। তাঁদের একটু পরেই আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে। পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেনভ। বৌদ্ধ সমাজের প্রথম এমবি ডাক্তার ছিলেন জ্যোতিষ রঞ্জন বড়ুয়া। জয়নাল মুন্সীর কণিষ্ঠ পুত্র রেবতী রমন বড়ুয়ার প্রচেষ্টায় প্রথম নাথ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে বেণীমাধন বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮খ্রিস্টাব্দ) ও রেবতী রমন বড়ুয়া কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে এম এ পাশ করেন। ১৯৭১ সালে বিশ্বমনীষা ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথম এশিয়ার ডক্টর অব লিটেরাচার (ডি, লিট) ডিগ্রী লাভ করেন। ধর্মবংশ মহাস্থবির সর্বপ্রথম বাংলা-ভারত উপমহাদেশে অগ্রমহা পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙালি বৌদ্ধ নারীদের মধ্যে জ্যোর্তিমালা দেবী ও ছেলেদের মধ্যে মহিমা রঞ্জন বড়ুয়া ১৯০৮ সালে সর্ব প্রথম বৌদ্ধ সমাজের বি এ পাশ বা গ্যাজুয়েট। দক্ষিণা রঞ্জন বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম প্রকৌশলী। দর্পণা মুৎসুদ্দি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম এম বি বি এস পাশ। বৌদ্ধ সমাজে বড়ুয়াদের মধ্যে সর্বপ্রথম এন্ট্রাস পাশ করেন। নয়াপাড়া বৈদ্যপাড়া গ্রামের ঈষাদ চন্দ্র বড়ুয়া। তিনি ময়মনসিংহ কেন্দ্র থেকে ১৮৮৫ সালে এন্ট্রাস পাশ করেন। এর পরবর্তী বছর ১৮৮৬ সালে এন্ট্রাস পাশ করেন মহামুনি গ্রামের দক্ষিণা রঞ্জন বড়ুয়া।[৬৫] শিউলী চৌধুরী ছন্দা বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নারীদের মধ্যে প্রথম এফ সি পি এস ডিগ্রী লাভ করেন এবং নিরদ তালকুদারের মাতা খ্রিস্টীয় দশ সালে বৌদ্ধরে মধ্যে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বৌদ্ধ সমাজে সামরিক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন পটিয়ার সুমন বড়ুয়া। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বর্তমানে ল্যাপ্টনেন্ট পদে রয়েছেন। তেমনি বিচার বিভাগে জজ হিসাবে আছেন সাতকানিয়া ঢেমসার সুকুমার বড়ুয়া। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অতীত ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ও গৌরবময়। বর্তমান বৌদ্ধরা দেশে-বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ ও গবেষণা করে স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে তাদের চিরস্থায়ী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই স্বীয় মেধায় সমুজ্জ্বল। বর্তমানে এদেশের বৌদ্ধদের অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক নানা

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে তাদের অংশগ্রহণ ও বলিষ্ঠ বিচরণ প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদের সকল বিভাগে কর্মে নিয়োজিত আছেন।

সাহিত্য চর্চায়ও বাঙালি বৌদ্ধরা অনেকদূর এগিয়েছে। অনেকেই বহুল প্রসংসা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার তাদের অবদান বৌদ্ধ সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রকাশনা বিষয়েও বৌদ্ধ প্রকাশনা প্রাচীন কাল থেকে বহুল সমৃদ্ধ। সেই গৌরবময় অধ্যায় ধরে আজও বৌদ্ধরা প্রকাশনার ধারাকে বেগবান রেখেছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। নিম্নে প্রধান প্রধান কয়েকটি নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোলে ধরা হলো-

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি

বৌদ্ধদের প্রথম ও প্রাচীন সংগঠন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি। বিভিন্ন দিক থেকে বাংলা অঞ্চলের পশ্চাদপদ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির ধর্ম, সমাজ,শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐক্য ও জাগৃতির প্রয়াসে এর আত্মপ্রকাশ। ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি সামাজিক - সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রথমে এর নাম ছিল চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি, পরে স্বাধীনতোত্তর নতুন নাম হয় বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি। শুরু থেকেই সমিতির প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত, তবে কক্সবাজার, পার্বত্য জেলা ও রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরেও এর শাখা কার্যালয় রয়েছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বৌদ্ধধর্মীয় গুরু বৌদ্ধদের ধর্মদিশারী, আলোকবর্তিকা কক্সবাজার চকরিয়া হারবাং গ্রামের গুণমেজু মহাস্থবির এবং সাধারণ সম্পাদক চন্দনাইশ সাতবাড়িয়ার বাঙালি বৌদ্ধদের প্রাণপুরুষ, দূরদর্শী সমাজনেতা নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী। এদুই জন মহৎ প্রাণ ব্যক্তি, অগ্রসেনানী, হিসেবে অনগ্রসর বৌদ্ধদের উন্নয়ন, বিকাশ, ঐক্য ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে পথিকৃৎ ভূমিকা পালন করেন। গুণমেজুর মৃত্যুর পর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বাঙালি বৌদ্ধদের প্রথম সংঘরাজ পূর্ণাচার ধর্মাধারী চন্দ্রমোহন মহাথের (১৮৭৭-১৯০৮)। ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামের এনায়েত বাজারে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য একখন্ড জমি ক্রয় করা হয় এবং বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয় । এ সময় ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ও ১৯০৫ সালে চট্টগ্রাম কলেজে পালি বিভাগ খোলা হয়। ১৯০৪ সালে সমিতির উদ্যোগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার সড়কের পাশে নির্মিত হয় বর্তমান চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার। ১৯০৮ সালে পূর্ণচারের মৃত্যুর পর সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ অগ্গমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির (১৮৭২-১৯৩৯)। তাঁর প্রচেষ্টায় 'চিন্তামণি লাইব্রেরী ' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পণ্ডিত বিহারের কিছু মূল্যবান প্রত্ন সংগ্রহ নিয়ে একটি ক্ষুদ্র যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয় । (বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ডি.পি. বড়ুয়া জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬,পৃষ্ঠা-১০২) প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ নাজিরের ১৮৯৪ সালে মৃত্যুর পর তেজস্বী সমাজকর্মী ডা. ভগীরথ বড়ুয়া (১৮৫৬-

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬) সম্পাদকের দায়িত্বে সমাসীণ হয়ে বাঙালি বৌদ্ধদের আত্মসচেতন ও প্রত্যয়ী করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৬ সালে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ডা. ভগীরথ বড়ুয়া মৃত্যুর পর সমাজহিতৈষী নগেন্দ্র লাল চৌধুরী সম্পাদক হন এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুর পর ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর আইনজীবি ও সমাজকর্মী উমেশ চন্দ্র মুচ্ছদী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এ সময় সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম ও শাখা বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রামে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩৯ সালে ধর্মবংশ মহাস্থবীরের মৃত্যুর পর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথেরকে (১৯০৭-১৯৮১) চট্টগ্রাম বিহারের স্থায়ী বিহারাধ্যক্ষ ও সমিতির আজীবন সভাপতি করার সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে মতবিরোধ দেখা দেয়।

এই সমিতির অনুপ্রেরণায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে জাগরণ ঘটে তার ফলে বেণীমাধব বড়ুয়া, নলিনাক্ষ দত্ত, রায় বাহাদুর ধীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া (প্রাক্তন এম.পি) প্রমুখের ন্যায় অনেক বৌদ্ধ জ্ঞানি-গুণীর আবিভাব ঘটে। বর্তমানে এই সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে চট্টগ্রাম পালি কলেজ, ধর্মবংশ ইনস্টিটিউশন এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড। এছাড়া শীলাচার ভবন এবং ডি,বি ইনস্টিটিউশন ভবনও এই সমিতির উদ্যোগেই নির্মিত হয়। শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি দেশের ভাবমূর্তি বিকাশে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করছে। ১৯৩৬ সালে আসামের ডিব্রুগড়ে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠায় সমিতির সভাপতি ধর্মবংশ মহাথেরোর উল্লেখযোগ্য ভূমিক ছিল। ১৯৫৬ সালে বার্মায় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বার্মা সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সমিতির সভাপতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাথেরো পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে সঙ্গীতিতে যোগদান করেন। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার সুরক্ষিত বুদ্ধের কেশধাতু দেশের এক অমূল্য সম্পদ। এর কিয়দংশ ১৯৫৮ সালে শ্রীলঙ্কা, ১৯৬৪ সালে জাপান এবং ১৯৭৯ সালে থাইল্যান্ড সরকারকে সে দেশের জনগণের পূজার জন্য বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে অর্পণ করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ঐসব দেশের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৩১] বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘ (WFB) বিশ্বের বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দের মিলনতীর্থস্বরূপ। এ সংস্থার বিভিন্ন কর্মকান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি জড়িত হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শ্রীলঙ্কার সরকার সমিতিকে উপহার প্রদত্ত বোধিবৃক্ষের চারা ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক বর্ণাঢ্য উৎসবের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার চত্বরে রোপণ করেন। উল্লেখ্য যে, বোধিবৃক্ষের এই চারাটি বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বৃক্ষের বংশোদ্ভূত। ১৯৯০ সাল থেকে সাংগঠনিক বিভিন্ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, দানবীর ও সমাজসেবক রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক আদর্শ কুমার বড়ুয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বৌদ্ধ সমিতি ঢাকা অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে আছেন ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক স্বপন বড়ুয়া চৌধুরী।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি যুব এর সভাপতি সুদীপ বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আয়কর আইনজীবি জয়শান্ত বড়ুয়া দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি মহিলা শাখার সভাপতি লিলি বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক অঞ্জলি বড়ুয়া দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি আমেরিকা, কোরিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, অস্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে দেশের ভাবমূর্তি বিকাশে অবদান রাখেন।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠার লগ্নে আচার্য পুর্ণাচারের শিষ্য কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬) কোলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের নবজাগৃতিতে অসাধারণ অবদান রাখেন। কৃপাশরণ তাঁর জন্মস্থান উনাইপুয়ার লক্ষারাম বিহার থেকে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কোলকাতাকে তাঁর কর্ম ধারার কেন্দ্র হিসেবে বেচে নেন।[৬৭] বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্মীয় একটি প্রতিষ্ঠান: প্রতিষ্ঠাতা কৃপাশরণ মহাস্থবির। ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ এবং বৌদ্ধ সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্য ১৮৯২ সালের ৫ অক্টোবর এটি প্রতিষ্ঠত হয়।[৬৮] এ সভার উদ্যোগেই কলকাতায় নির্মিত হয় ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১৯০৩ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে যার উদ্বোধন হয় এবং এর সঙ্গে যুক্ত থেকেই খ্যাতি অর্জন করেন বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ বেণীমাধব বড়ুয়া ।

কৃপাশরণ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহামহোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখের সহায়তায় পালি ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন প্রচলন করেন। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয় সভার মুখপত্র জগজ্জ্যোতি। এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন গুণালঙ্কার স্থবির এবং সমণ পুণ্নানন্দ স্বামী। বেণীমাধব বড়ুয়াও কিছুকাল এর সম্পাদানার দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটি বারকয়েক বন্ধ থাকার পর ১৯৭০ সালে দীপককুমার বড়ুয়ার সম্পাদনায় পুনপ্রকাশিত হয় এবং ১৯৮০ সাল থেকে তা দ্বিভাষিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ধর্মাঙ্কুর সভার মুখপত্র হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার বহুমুখী কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে সভা, সম্মেলন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, গুণিজন সম্বর্ধনা ইত্যাদি। ১৯৯০ সালে তিব্বতের ধর্মগুরু ত্রয়োদশ দালাই লামাকে এ সভা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ১৯২৪ সালে সভা বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করে। এছাড়া কৃপাশরণ (১৯৬৫), বি,আর আম্বেদকর (১৯৯১), বেণীমাধব বড়ুয়া (১৯৮৮) প্রমুখ মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৮৬ সালে বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন ছিল ধর্মাঙ্কুর সভার একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মাঙ্কুর সভা জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে গুণালঙ্কার লাইব্রেরী। আকিয়াব থেকে আনীত অস্টধাতুর বুদ্ধমূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া একটি নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। বেণীমাধব বড়ুয়ার প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় পালি শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র নালন্দা বিদ্যাভবন। শেঠ যুগলকিশোর বিড়লার সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিতল আর্য বিহার। এখানে রয়েছে কয়েকটি শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃপাশরণ কন্টিনেন্টাল ইনস্টিটিউশন (১৯৬৭), কৃপাশরণ হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় (১৯৭৩) এবং অতীশ ভবন (১৯৮৭)। এসবের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে এক গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। কলকাতার বাইরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এর শাখা আছে।

মহাবোধি সোসাইটি

মহাবোধি সোসাইটি বৌদ্ধধর্মীয় একটি প্রতিষ্ঠান। শ্রীলঙ্কা ও ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনজাগরণ এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন কল্পে শ্রীলঙ্কা পণ্ডিত অনাগরিক ধর্মপাল ১৮৯১ সালের ৩১ মে শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহরে 'মহাবোধি সোসাইটি অব শ্রীলঙ্কা' গঠন করেন। তারই ভারতীয় শাখা হিসেবে ১৮৯২ সালে মে মাসে কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সাধারণ সম্পাদক অনাগারিক ধর্মপাল। কলকাতার ২০/১. গঙ্গাধর বাবু লেনের অস্থায়ী কার্যালয়ে এর কর্মকান্ড শুরু হয়। অনাগারি ধর্মপাল ও কৃপাশরণ পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রায়ই অবলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের মর্মবাণী আবার ভারতবর্ষে ধ্বনিত হলো। কৃপাশরণ চট্টগ্রাম থেকে কোলকাতায় এসে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। ১৯২০ সালের ২০ নভেম্বর বুদ্ধের পবিত্র অস্থিধাতু প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সোসাইটি কলকাতার ৪-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিটে ধর্মরাজিক চৈত্য বিহার উদ্বোধন করে সোসাইটি বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধদের হৃত অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠাসহ সমগ্র ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে ১৯০০ সালে ভারতের বুদ্ধগয়া, মাদ্রজ ও কুশীনগর এবং শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুরে সোসাইটির চারটি শাখা স্থাপন করা হয়। সোসাইটির উদ্যোগে বুদ্ধগয়ায় একটি বিহারও নির্মিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সোসাইটির আন্দোলনের ফলে বুদ্ধগয়া বিহার পরিচালনা পরিষদে চারজন বৌদ্ধ সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সম্প্রতি ভারত সরকার বুদ্ধগায় পরিচালনার দায়িত্ব একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর ওপর অর্পণ করে। সোসাইটির উদ্যোগে বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সারনাথের মূলগন্ধকুটি বিহার নির্মিত হয় এবং ধর্মশালা, গ্রন্থাগার, ফ্রি ডিসপেনসারি, স্কুল, কলেজ, বুদ্ধিস্ট ইনস্টিটিউট, ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। সারনাথের ঐতিহাসিক ধামেকস্তুপ তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব ও সোসাইটির ওপর ন্যস্ত হয়।[৬৯]

১৯২২ সালে বোম্বাইতে একটি বিহার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঐ অঞ্চলে মহাবোধি সোসাইটির কর্মতৎপরতা শুরু হয়। ত্রিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয় সোসাইটির দিল্লি শাখা যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

করেন জাপানের তৎকালীন কনসাল জেনারেল এবং দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন মহাত্মা গান্ধী। পর্যায়ক্রমে লুম্বিনী, লাক্ষ্ণৌ, নতনওয়া, আজমীর, সাঁচী, ভূবনেশ্বর ও রাজস্থানসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব শাখা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সোসাইটি সমগ্র ভারতব্যাপী বুদ্ধেরবাণী, শিক্ষা ও আর্দশ প্রচার করে। সোসাইটির পক্ষ থেকে অনাগরিক ধর্মপাল আমেরিকার শিকাগো ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও মর্মবাণী তুলে ধরেন। এতে বিশ্ব পরিমন্ডলে সোসাইটি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

১৯৪৯ সালের ১৩ জানুয়ারী বুদ্ধের দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়নের পবিত্র অস্থিধাতু লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট মিউজিয়াম থেকে স্বদেশে ফিরেয়ে এনে সাঁচীতে পুনপ্রতিষ্ঠা করা সোসাইটির এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এছাড়া বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচারে সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রকাশ করে সোসাইটি জনসাধারণের নিকট বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনেরতত্ত্ব পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এতে মাতৃভাষার ত্রিপিটক পাঠের ফলে জনসাধারণের মধ্যে নিকট বুদ্ধবাণী সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সংস্কৃতি প্রচারের পাশাপাশি মহাবোধি সোসাইটি বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কাজেও অংশগ্রহণ করে। ১৮৯২ সালে থেকে সোসাইটি মহাবোধি নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করে। এটি শতাব্দীকাল ধরে সোসাইটির মুখপত্র হিসেবে এর কর্মকান্ড ও বুদ্ধবাণী প্রচার করছে এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ

বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ একটি বৌদ্ধধর্মীয় ও সমাজসেবা মূলক সংগঠন। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে বৌদ্ধদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে রাউজানের আবুরখীল গ্রামে ১৪ নভেম্বর এবং পরবর্তীতে ৪ ডিসেম্বর পটিয়ার লাখেরা অভয় বিহারে 'পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ' নামে এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি বর্তমান নামে পরিচিত হয়। এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রীমৎ ধর্মদর্শী মহাথেরো ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ বংগীশ ভিক্ষু। এসময় বিশুদ্ধানন্দ স্থবির ও জিনরতন স্থবির সহ সভাপতি হয়। একই সময়ে বিশিষ্ট বৌদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সংঘের পৃষ্টপোষক এবং একটি ট্রাস্টি বোর্ডও গঠন করা হয়।

১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধদের সম্যক পথ নির্দেশক হিসেবে রাঙ্গুনিয়া থানার শিলক গ্রামে এক মহাসম্মেলন আহবান করা হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তদানীন্তন সময়ে বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নমূলক স্বার্থ রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ নাম নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিশুদ্ধানন্দ মহাথের, দুই জন সহ সভাপতি যথাক্রমে উমেশ চন্দ্র মুচ্ছুদ্দী ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া এবং

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীশ ভিক্ষু। একই বছর ১৯৫০ সালে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টির প্রচার সংঘের পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে সর্বপ্রথম বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে অংশ গ্রহন করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভাপতি বিশুদ্ধনন্দ স্থবির, সহ-সভাপতি উমেশচন্দ মুচ্ছুদী ও সাধরণ সম্পাদক বঙ্গীশ ভিক্ষু। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে থেরবাদ মহাযান নির্বিশেষে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও নেতারা সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার ড.জি.পি. মালালশেখরকে সভাপতি নির্বাচিত করে World Fellowship of Buddhists (W.F.B) নামে বিশ্বসংস্থা গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টির প্রচার সংঘ এই সম্মেলনে বিশ্ব সংস্থার আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ভারতের বাঙালি বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠান কলকাতার বঙ্গীয় বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভা বা Bengal Buddhist Association এর সম্পাদক ড. অরবিন্দ বড়ুয়া এই বিশ্ব সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রচার সংঘ বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ, প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য উদ্ঘাটন ও সংরক্ষণ, বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন জাতীয় ছুটি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগ খোলা এবং বেতার ও টিভিতে ত্রিপিটক পাঠ প্রচলনসহ অন্যান্য দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করেন। যার সুফল বর্তমান বৌদ্ধ সমাজ ভোগ করছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সমতলীয় বৌদ্ধদের জন্য একটি এবং পার্বত্য বৌদ্ধদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসন ছিল। এতে সমতলীয় বৌদ্ধদের মধ্যে সুধাংশু বিমল বড়ুয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কামিনী মোহন দেওয়ান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন মাসব্যাপী ২৫০০তম বুদ্ধ জয়ন্তী পালনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় নবজাগৃতি সৃষ্টি হয়। ১৯৬০ সালে সংঘের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় কমলাপুরে ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সংঘের প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্থানান্ত র করা হয় পরবর্তীতে এ বিহারকে কেন্দ্র করে ধর্মারাজিক অনাথালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় , দাতব্য চিকিৎসালয়, মেডিটেশন সেন্টার, বোধিঅঙ্গন ও আন্তর্জাতিক মানের একটি উপাশনালয় গড়ে ওঠে। রাজধানী ঢাকায় সর্বপ্রথম বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের বিরাট কীর্তি। ১৯৬১ সালে সরকার তখনকার প্রায় নির্জন কমলাপুর এলাকায় প্রথমে দুই একর ও পরে আরো আড়াই একর জমি তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতকারের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯৬২ সালে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বঙ্গীশ ভিক্ষুর স্থলে দেবপ্রিয় বড়ুয়া সংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি একাধিক্রমে ১৫ বছর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৪ সালে নেপাল, ১৯৫৬ সালে জাপান এবং ১৯৬১ সালে কম্বোডিয়ায় সংঘের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহন করেন। ১৯৬২ সালে এখানে সংঘের পক্ষ থেকে থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল ও রাণী সিরিকিতকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংবর্ধনার মাধ্যমে থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যকার মৈত্রী সুদৃঢ় হয়। ১৯৬৩ সালে সংঘের তৎকালীন সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনির্ধিদল চীন সফরে যায় এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অতীশ দীপঙ্করের দেহভস্ম বাংলাদেশ আনয়ন ও সংরক্ষণের প্রস্তাব করে, যা ১৯৭৮ সালে কার্যকর হয়। ১৯৬৪ সালে বিশুদ্ধানন্দ মহাথের ও দেবপ্রিয় বড়ুয়া কলম্বোতে অনুষ্ঠিত অনাগারিক ধর্মপালের জন্মশতবার্ষিকীতে যোগদান করেন।

স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে সংঘ বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেসবের মধ্যে ১৯৮৩ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহস্রতম জন্মবার্ষিকী পালন, ১৯৮৭ সালে 'পাহাড়পুর বৌদ্ধ সভ্যতা' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন উল্লেখযোগ্য। এতে ইউরোপ আমেরিকারসহ বহু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সাল থেকে প্রচার সংঘ নিয়মিতভাবে বার্ষিক শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছে এবং ১৯৫৬ সাল থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিভাষিক মুখপত্র কৃষ্টি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করছে। সংঘের চট্টগ্রাম শাখা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে চৈত্যগ্রাম একটি পত্রিকা। বর্তমানে কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ধর্মাধিপতি শুদ্ধানন্দ মহাথের এবং সাধারণ সম্পাদক ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া। কৃষ্টি প্রচার যুব শাখা সভাপতি দেবপ্রিয় বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার বড়ুয়া আনন্দ। বৌদ্ধ কৃষ্টি সংঘের মহিলা শাখার সভানেত্রী অধ্যক্ষ প্রফেসর প্রীতি কণা বড়ুয়া।

বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে রাজধানী ঢাকায় আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৯৮১ সালে মহামান্য সংঘরাজ শীলালংকার মহাথেরো এবং বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত মাননীয় শান্তপদ মহাথের এর প্রেরণায় শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ ভিক্ষু (বর্তমান ড. সুকোমল বড়ুয়া) ঢাকায় আসেন। তাঁর আহবানে ঢাকাবাসী কতিপয় বিশিষ্ট বৌদ্ধ সুধীদের নিয়ে ১৯৮১ সালে ২০ জুলাই খিলগাঁও মালীবাগস্থ ডি আই জি এস কে চৌধুরীর বাসভবনে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেইদিনই 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটি' এবং স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ ভিক্ষুকে আহবায়ক করে ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটি নামে একটি এডক কমিটি গঠন করা হয়। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডি আই জি এস কে চৌধুরী, মনুলাল বড়ুয়া, মাতর্ভ প্রতাপ বড়ুয়া, বিশ্বপতি বড়ুয়া, ডি পি বড়ুয়া, হীরালাল বড়ুয়া, তিমির বরণ তালুকদার, পরিমল মুৎসুদ্দি, সুসেন বড়ুয়া, পি সি বড়ুয়া, নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া, মাষ্টার জীবনানন্দ বড়ুয়া, সুনীল বড়ুয়া, বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সেই বৈঠকে সকলের সিদ্ধান্ত ক্রমে মালিবাগ রেল ক্রসিং এর পাশে ১১৫/এ বাসাটি অস্থায়ী বিহার এবং ঢাকাবাসী সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ভাড়া নেওয়া হয়। ১৯৮২ সালের ১০ অক্টোবর দিনটি ঢাকাবাসী বৌদ্ধদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে স্মরণীয় । শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় ঐদিন ঢাকাবাসী বৌদ্ধদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় তেজগাঁও কলেজে । ঐ সভায় শ্রীমৎ শান্তপদ মহাথের (প্রয়াত) ও শ্রীমৎ অজিতানন্দ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এস কে চৌধুরীকে সভাপতি ও বিশ্বপতি বড়ুয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কমিটি' গঠন করা হয়। এর পর ১৯৮৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর এক সভায় আন্তর্জাতিক মানের বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। এতে

Dhaka University Institutional Repository

এসকে চৌধুরী, এম এল বড়ুয়া, এমপি বড়ুয়া, জীবনানন্দ বড়ুয়া, প্রকৌ. দিব্যেন্দু বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৪ সালে ১৬ নভেম্বর সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের এক সভায় খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হয়। মিঃ এস কে চৌধুরীকে সভাপতি, মিঃ মনুলাল বড়ুয়া, মিঃ মার্তন্ড প্রতাপ বড়ুয়া, সুষেন চন্দ্র বড়ুয়া, মিঃ বিশ্বপতি বড়ুয়াকে সহ-সভাপতি, প্রকৌ. দিব্যেন্দু বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া সাধারণ সম্পাদক, মিঃ তিমির বরণ তালুকদার কোষাধ্যক্ষ, মিঃ রায়মোহন বড়ুয়া, সাংগঠনিক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সদস্য করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন এর নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধদের বিভিন্ন পেশাজীবী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বৌদ্ধদের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই তত্ত্বাবধানে ১৯৮১ সালে ঢাকার মেরুল বাড্ডায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার। বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, সাম্য ও করুণার বাণী প্রচার, বাংলাদেশর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সদ্ধর্ম প্রচার, জাতীয় আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং ধর্মীয় শিক্ষাসহ নানাবিধ জনহিকর কর্ম সম্পাদন এর কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত। 'দীপঙ্কর' নামে এর একটি বার্ষিক মুখপত্র রয়েছে, এটি পূর্বে স্মরণিকা নামে প্রকাশিত হত। ফেডারেশনের যুব সংগঠনও রয়েছে ন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইয়ুথ ফেডারেশন।

পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার পূর্ণাঙ্গ বিহার নির্মাণের জন্য এক বিঘা জমি বরাদ্দ করে । বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব থেকে অবসর প্রাপ্ত মনুলাল বড়ুয়া বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ নির্বাচনে যুগ্ম সচিব বিশ্বপতি বড়ুয়া সভাপতি ,প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া নির্বাহী সভাপতি এবং অশোক বড়ুয়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্তমান বিহারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ থের।

১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম কয়েকজন প্রগতিশীল সমাজকর্মীর আন্তরিক প্রয়াসে অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্য ও সংস্কৃতিতে সামগ্রিক বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিবেদিত সংগঠনের রূপকার সভাপতি অরুন বিকাশ বড়ুয়া (১৯৪১-১৯৯৫) এবং সম্প্রতি অকাল প্রয়াত সম্পাদক জগৎজ্যোতি বড়ুয়া বিশেষ অবদান রেখেছেন। বর্তমানে এর সভাপতি এড. প্রেমাংকুর বড়ুয়া এবং শিমুল বড়ুয়া সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করছেন। সংস্থার মুখপত্র অনোমা এর সম্পাদক বাদল বরণ বড়ুয়া এবং অঙ্গ সংগঠন বৌদ্ধ একাডেমী বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধারা তৈরী করেছেন। এর পরিচালক শ্রীমৎ বনশ্রী মহাথের এবং জার্নালের সম্পাদক সাহিত্যিক শিশির বড়ুয়া। এই সংস্থা বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের কেন্দ্র হিসারে স্বীকৃত।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ। এর বর্তমান সভাপতি ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথের এবং সাধারণ সম্পাদক জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা দায়িত্ব পালন করে পার্বত্যবাসী বৌদ্ধ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। এ সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মৌনঘর এবং ঢাকায় শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মারমা বুদ্ধিস্ট এসোসিয়েশন এটি মারমাদের জাতীয় সংগঠন। বর্তমানে এর সভাপতি এম.কিউ মং। রাখাইন বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। বর্তমানে এ সংগঠনের সভাপতি মংক্য মান এবং সাধারণ সম্পাদক মং হলা চিং। বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ একটি বৌদ্ধ যুব সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কৃতির বিকাশ মূলক সংগঠন। এটি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা থেকে বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থার আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত। এটির বিভাগীয় শহরে কয়েকটি শাখা রয়েছে। বৌদ্ধ যুব পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান সরজিত বড়ুয়া এবং মহাসচিব উদয়ন বড়ুয়া। বৌদ্ধ যুব পরিষদ ঢাকা অঞ্চলের সভাপতি পলাশ বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক চিন্ময় বড়ুয়া রিন্টু।

আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র (ভারত) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের বিশ্বধ্যান সমাধির প্রধানকেন্দ্র রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি চট্টগ্রামের শিলকুপের বিদর্শনাচার্য কৃতি সাংঘিক ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের (নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট প্রাপ্ত) এবং সাধারণ সম্পাদক ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭০ সালে এটি বুদ্ধগয়ার বাঙালি বৌদ্ধ তথা ভারতীয়দের একমাত্র ঠিকানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৭০]

এশিয় বৌদ্ধ আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থা (ABCP) শাখা সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। এর সভাপতি ডি.পি.বড়ুয়া এবং মহাসচিব হীরালাল বড়ুয়া। বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফাউন্ডেশন বৌদ্ধ ছাত্র ছাত্রী মেধাবিকাশ ও শিক্ষা উন্নয়নে বৃত্তি, কৃতি সংবর্ধনা ও অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান বেনীমাধব বড়ুয়া, সভাপতি সনজীব বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. মৃগাঙ্ক প্রসাদ বড়ুয়া। আবুরখীল জনকল্যাণ সংস্থা চট্টগ্রাম রাউজানে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠনের কার্যক্রম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশ্ববৌদ্ধ সংস্থার সদস্য। এ সংস্থার বর্তমান সভাপতি প্রফেসর বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া এবং পরিচালক প্রকৌ.পরিতোষ কুমার বড়ুয়া। বাংলাদেশ বৌদ্ধ নাগরিক ফোরাম বৌদ্ধ জাতীয় ইস্যু, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে এ সংগঠনের আহবায়ক ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, যুগ্ম আহবায়ক অংথা কীউ রাখাইন এবং সদস্যসচিব প্রসেনজিত বড়ুয়া অলক।

চারুলতা পরিষদ বৌদ্ধ মননশীলতা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশে ১৯৯৬ সালে এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এটি মূলত সাহিত্য প্রকাশনা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বর্তমানে চারুলতা পরিষদের সভাপতি অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব চিররঞ্জন বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবক বটন কুমার বড়ুয়া।

বুদ্ধজ্যোতি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংগঠনের একটি আঞ্চলিক শাখা সংগঠন। বর্তমানে অজিত রঞ্জন বড়ুয়া সভাপতি ও রাহুল কান্তি বড়ুয়া মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশ স্কলার ফোরাম এক দশকের অধিক কালধরে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য ভিত্তিক কাজ করে আসছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যক্ষ জ্যোস্না বিকাশ বড়ুয়া চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ড. রেবত প্রিয় বড়ুয়া। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিষদ বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম সভাপতি ছিলেন দুলাল কান্তি বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক সুপ্ত বড়ুয়া। পরবর্তীতে ছিলেন সভাপতি দুলাল কান্তি বড়ুয়া এবং সমর বড়ুয়া সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে দোলন কান্তি বড়ুয়া দায়িত্ব পালন করছেন। রিসসো কোসেই কাই অব বাংলাদেশ জাপান

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিক একটি বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংগঠন। এটি গৌতম বুদ্ধের আর্দশ চেতনার একটি ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রধান কেন্দ্র চট্টগ্রাম। এটির প্রধান বি.কে.বড়ুয়া ও জেনারেল সেক্রেটারী কাঞ্চন বড়ুয়া। সম্প্রতি অশোক বড়ুয়া ও পলাশ বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে ঢাকায় একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বোধিজ্ঞান ভাবনা কেন্দ্র ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আসিন জিন রক্ষিত থের। ত্রিরত্ন বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ এর বর্তমান সভাপতি সুব্রত বরণ বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ বড়ুয়া বিজয়। বৌদ্ধদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করছে বৌদ্ধ সঞ্চয় সমিতি ও অতীশ গণউন্নয়ন সংস্থা-ঢাকা।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বাংলাদেশী বৌদ্ধদের ধর্মীয় উন্নয়নকল্পে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮৪ সালে গঠিত একটি স্থায়ী প্রকল্প। এর উদ্দেশ্যে বৌদ্ধদের ধর্ম পালন ও উপাসনালয় সমুহ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে পদাধিকার বলে ধর্মমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে তিন বছর মেয়াদি সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ট্রাস্টের দাপ্তরিক কাজকর্ম ধর্মমন্ত্রণালয়েই সম্পন্ন হতো: পরে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে ট্রাস্টের তহবিলে ছিল এক কোটি টাকা পরে তা দুকোটি টাকায় উন্নীত হয়।[৭১]
ট্রাস্ট ১৯৮৯ সালে ত্রিপিটক অনুবাদ ও প্রকাশনার উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গ্রহন করে। এছাড়া ১৯৯৫ সালে শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত পালি-বাংলা অভিধান প্রকাশেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুযায়ী বর্তমানে প্রথম খন্ড অভিধানটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ট্রাস্টের উদ্যোগে ঢাকা ট্রাস্ট কার্যালয়, চট্টগ্রাম নবপন্ডিত বিহার, রাঙ্গামাটি আনন্দ বিহার, খাগড়াছড়ি সিবলি বৌদ্ধ বিহার এবং বান্দরবান রাজবিহারে পাঁচটি বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পালি টেক্সট সোসাইটি অফ লন্ডন (পি.টি.এস) কর্তৃক প্রকাশিত সমগ্র ত্রিপিটক ও অট্ঠকথা সমুহের রোমান হরফে মুল পালিসহ ইংরেজি অনুবাদের গ্রন্থাবলিও ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ক্রয় করা হয়। এছাড়া ট্রাস্ট বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে ও ভারতে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি লেখা বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষ ও অভিধানসহ নানাধরণের প্রায় সাত শতাধিক গ্রন্থ ক্রয় করে। ট্রাস্টের তথ্যাসূত্র মতে, বর্তমানে ট্রাস্ট কর্তৃক রেজিস্ট্রার্ভুক্ত বিহারের সংখ্যা প্রায় ১৫০০। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য রয়েছেন সচিবসহ চারজন কর্মকর্তা-কর্মচারী। ট্রাস্টের বার্ষিক খরচ আনুমানিক ৩ থেকে ৫ কোটি টাকা। প্রায়ই দু'দশকের অধিক কাল ধরে ট্রাস্ট এ দেশের বৌদ্ধদের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন বাংলাদে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের। এরপর ১৯৯০ সাল থেকে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া। ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়াকে ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট্য একটি কমিটি গঠন করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান, সম্মানিত সদস্য- ডি.পি.বড়ুয়া, চন্দ্র গুপ্ত বড়ুয়া, সনৎ তালুকদার, ম্যামাচিং অংথা কিউ এবং সচিব অধ্যক্ষ সুকোমল বড়ুয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৪ বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

বাঙালি বৌদ্ধদের নবজাগরণ ও সমৃদ্ধির ইতিহাস সুপ্রাচীন কালে হলেও পাশ্চাত্য মনীষিদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে জাগরণ ও নৈপুণ্য অর্জন তা উনিশ শতকে। উক্ত শতকে আমাদের আয়াস সাধ্য প্রচেষ্টা এবং অন্বেষার ইতিহাস অদ্যাবধি অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও শিল্পচেতনার নবজাগরনের (Renaissance) পশ্চাতে পূর্বতন ও সমকালীন শিক্ষায়তন সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান।

মৌলিক সন্ধিসায় উনিশ শতক বাঙালি বৌদ্ধদের পুনর্জাগরণ যুগপৎ অন্বেষনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, দূরদর্শী চিন্তাচেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মৌলিক প্রতিফলন প্রতিভাত হয়। পরবর্তী কালে বাঙালি বৌদ্ধদের জীবনবোধ, জাতীয়তাবোধে বৌদ্ধশাসনের পটভূমি (Background of Raddhist rule) সাহিত্যিক ভাষায় (Literary Speech) অনেক বেশি পশ্চাদ পদ হয়ে আছে। প্রতিরূপ দেসবাসো চ পূব্বে চ কত পুঞ্ঞতা অত্ত সম্মাপনিধি চ এতং মঙ্গল মুত্তমং। (মঙ্গল সূত্র ৩নং শ্লোক) অর্থাৎ প্রতিরূপ দেশে বাস। পূর্বজন্মে কৃত পুণ্য, আত্মহিত ও পরহিতের জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া অথবা শীল, সমাধি ও বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ করা উত্তমমঙ্গল। প্রতিরূপ দেশ বলতে সদ্ধর্ম বিরাজমান দেশ। এ প্রসঙ্গে The Buddha and his Teachings গ্রন্থে পণ্ডিত নারদ মহাথের বলেছেন, Any place Where Bhikkhus, Bhikkunis, Vpasakas and Upasikas continually reside, where pious people are bent on the performance of the ten meritorious deeds, and where the Dhamma exists as a living principle.[৭২]

বৌদ্ধ মাত্রেই একটি আর্দশিক জীবন বিধান। ত্রিপিটক সাহিত্যে মহামানব গৌতম বুদ্ধ আর্দশ জীবন গঠনে নিদের্শন দিয়েছেন। বৌদ্ধদের উচিত মাঙ্গলিক কর্মদ্বারা বৌদ্ধ প্রতিরূপদেশ, বৌদ্ধিক সমাজ ও পরিবার গঠন করা। আজকের বৌদ্ধ পরিবার বা সমাজের যে অবস্থা রীতিনীতি, আচার আচরণকে কোনভাবেই আর্দশ বৌদ্ধ জীবন পদ্ধতি বলা চলে না। এ পরিস্থিতে ধর্মভিত্তিক সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন, বিকাশ ও প্রতিপালন আবশ্যক। বৌদ্ধ সমাজের অনেক প্রথিতযশা, সমাজ হিতৈষী, ব্যক্তিত্ব দীর্ঘ সময়কালে আন্তরিকতার সাথে বিভিন্নভাবে সমাজ পরিবর্তনের কাজ করেছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক, জাতি, ধর্ম ও সমাজ চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণ সমাজ পরিবর্তনে যুগান্তর কারী অবদান রাখতে সক্ষম। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কার, আন্দোলনের নব্য পদক্ষেপ প্রয়োগ এবং রক্ষা দরকার। প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে সংযত সংহতি হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ পরিবর্তনে আমরা যদি সমাজের সামগ্রিক ও গভীরতম বিশ্লেশণ উপলব্ধি করি তাহলে বৌদ্ধ সমাজ সর্ম্পকে সম্যক জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় বিধি বিধান প্রয়োগ ও কার্যপদ্ধিতির সর্চ্চজ্ঞান দরকার। আলোচনায় প্রেক্ষিতে সমাজ নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর সমম্বয়ে গঠিত। ১। ব্যক্তি ২। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ধ্যান ধারনা বা বিশ্বাস ৩। জনগণের সাধারণ বিশ্বাসপ্রসূত আবেদগ অনুভূতি ৪। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়মপদ্ধতি এবং তা বাস্তাবায়ন ও বক্ষা করা জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ। মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন, The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling lass.(প্রতি যুগেই যেসব ভাব ধারনা আদিপত্য করেছে সেগুলি চিরকালই তখনকার শাসকশ্রেণীরই ভাব-ধারনা।) একমাত্রিক (monolithic), আনুভূমিক (horizontal), অন্তগোষ্ঠী (in group), বহিগোষ্ঠী(out group) সমাজে গঠন ও সামষ্টিক জীবন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে সমুপস্থিত সমগ্র মানবগোষ্ঠী। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় চরমশীর্ষে পৌছে গেছে মানব সভ্যতা। তথ্য প্রযুক্তি আর কম্পিউটারের রিমোট কন্টোলের যুগের উৎকর্ষতায় বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। পরিশেষে ইতিহাসের উদ্ধৃতি ও তথ্য প্রমাণ হতে বলা যায় যে, সুপ্রাচীন কাল হতে এ ভূখণ্ডে বৌদ্ধদের অবস্থান ছিল। সম্রাট অশোক, কণিষ্ক এবং বাংলার কিংবদন্তী রাজন্যবর্গ ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতি পাল রাজাদের শাসনকালে বাংলায় বৌদ্ধ কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিক স্বর্ণযুগ ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশের শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়। তবে বাংলাদেশে পাহাড়পুর, ময়নামতি, পুণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থানগড় ও রামকোট বৌদ্ধকীর্তির এক গৌরবোজ্জ্বল নির্দশন।

উনিশ শতকের বাংলায় বৌদ্ধধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রধান দুটি পর্যায় ছিল:

১) থেরবাদী ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও

২) নব্য বৌদ্ধ আন্দোলন

গোটা উনিশ শতক জুড়েই ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় ধরণের সংস্কারকদের কাছেই সমাজ সংস্কার একটি প্রধান বিষয় ছিল। সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির, গুণমেজু মহাস্থবির ও নাজির কৃষ্ণ চৌধুরী ছিলেন এই সময়ের তিনজন সর্বপ্রধান ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। তাঁদের দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাউলি ভিক্ষুরা। তারা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের ধারণা প্রবর্তন করেন। বাঙালি বৌদ্ধরা বুদ্ধিবৃত্তিক রূপান্তরের ইতিহাস এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার যথাযোগ্য মূল্যায়ণ এখনো সম্ভব নয়। তবে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের নিয়ন্ত্রক উপাদান ছিল বৌদ্ধদের চিন্তাধারায় কতিপয় ব্রহ্মদেশীয় মৌলিক ধর্ম ও দর্শনতাত্ত্বিক ধর্মীয় নীতি আচার সংহিতা। তখন বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই মূখ্য বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের বৌদ্ধ জাগরণ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বাংলায় বৌদ্ধ সমাজ ও ধর্ম চিন্তার ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বাংলায় পুনরুজ্জীবিত হয় বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, সচেতনতা, সমাজ সংগঠন প্রভৃতি। প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ্য, "অতীত কর্মকাণ্ডের ফল হচ্ছে বর্তমান এবং বর্তমান আবার অলক্ষ্যে সৃষ্টি করে চলেছে ভবিষ্যতের রূপরেখা।

৭.৫ বৌদ্ধ নিকায়ের ইতিকথা

আলোচনার আলোকে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ও সাধন মার্গকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। (ক) থেরবাদ, খ) মহাযান (গ) তন্ত্রযান।

ক. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টার প্রথম শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই পাঁচ শতাধিক বৎসর হীনযানের অভ্যূদয় কাল।

খ. খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই সাতশ বৎসর মহাযানপন্থী বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিপত্তি।

গ. অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই পাঁচশ বৎসরের বজ্রযান বা তন্দ্রযানের প্রার্দুভাব কাল নিরূপিত হয়েছে।

এই ত্রিবিধ যানেরই বিরাট সাহিত্য সাধক পরম্পরা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব বিদ্যমান। হীনযানী শাস্ত্র পালিভাষায় এবং মহাযানী ও তন্ত্রযানী শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। বাংলার মাটিতে একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধধারা পরবর্তীতে টিকে রইল; এরা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা দূরীভূত হতে দেখা যায়। সে সময় একদিকে ধর্মশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্রগুলি যেমন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে দক্ষ ভিক্ষুসংঘের একান্ত অভাব ছিল। বৌদ্ধ গৃহী ও বৌদ্ধ পুরোহিতরা শনি লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি হিন্দুপূর্জা পার্বণ শুরু করে। প্রজ্ঞার উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভূলে গেল। শূণ্যবাদ, বিজ্ঞানবাদত ও করুণাবাদ ভূলে গেল। ভূলে গেল শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিনয় ধর্ম। অনগ্রসর বৌদ্ধেরা হিন্দুদের তান্ত্রিক আচার এবং মুসলমানদের সত্যপীর ও সিন্নিদান প্রথা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের পুনজাগরণের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম বলতে হয় বাংলার মহাযান অধ্যুষিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে উন্নীত ও ১৮৫৬ সালে নবজাগরণের প্রধান পুরোহিত পরমপুরুষ মহামান্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের(১৮০১ হতে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ) আগমন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নবজাগৃতির যুগ। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৪ সালে সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরর সংস্কার আন্দোলন বৌদ্ধদের তন্ত্রবাদ প্রভাবান্বিত ধর্ম থেকে থেরবাদের মৌলিক ধর্ম বিনয় প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

রাউলী পুরোহিতরা ছিলেন তৎকালে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম ধারক বাহক। তিনি প্রথম হাঞ্চারঘোনা নামক স্থানে সাতজন প্রখ্যাত রাউলীকে উপসম্পদা প্রদান করেন। উক্ত সাতজন বৌদ্ধ পুরোহিত হলেন- পাহাড়তলীর লালমোহন ঠাকুর ও কমলা ঠাকুর, ফিরিঙ্গি খিলের হরি ঠাকুর, মির্জাপুরের সুখচান ঠাকুর, গোমনমর্দ্দনের যুবরাজ ঠাকুর, দমদমার অভয়াচরণ ঠাকুর এবং বিনাজুরীর হরি ঠাকুর। এই সময় আরাকানী ও সারমেধ স্থবিরের সংশ্রয়ে এসে বাংলার বৌদ্ধগণ পূর্বমত ছেড়ে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা সম্পূর্ণরূপে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।[৭৩]

বাংলাদেশে বৌদ্ধ জাগরণের প্রাণপুরুষ ছিলেন কক্সবাজার চকরিয়ার হারবাং এর প্রধান দু'জন সংঘমনীষী প্রথম সংঘরাজ সারমেধ মহাথের এবং গুণমেজু মহাথের। বৌদ্ধ সমাজের আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রতিদিন দলে দলে রাউলী পুরোহিত নতুন ভাবে উপসম্পদা গ্রহণ করে। আমাদের অতীত ইতিহাস অতি উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত। কিন্তু কালের উত্থান-পতননীতিতে আজ আমরা আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হয়েছি। ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বড়ই বিচিত্র। বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের যখনই এই শোচনীয় অবস্থা তখন আরাকান বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য অতি উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। আরাকানী শাসন কালেও বাঙ্গালি বৌদ্ধরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ছিল। আরাকানবাসী সংঘরাজ সারমেধ ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার কয়েকজন তান্ত্রিক বৌদ্ধ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ভিক্ষুসংঘ নিয়ে চট্টগ্রামে আগমন করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভিক্ষুসংঘ গঠন করার দিকে উদ্যোগী ছিলেন। কেননা ভিক্ষুসংঘ ব্যতিত বৌদ্ধধর্ম টিকে থাকতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। আচার্য পূর্নাচার ধর্মাধারী চন্দ্রমোহন (১৮৭৭-১৯০৮) শ্রীলংকার পালি ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা করে চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর সারমিত্রের প্রেরণায় থেরবাদী আদর্শ প্রচারে নেতৃত্ব দিলেন। ১৮৮৪ সালে তিনি বাঙালিতে প্রথম সংঘরাজ নিকায়ের সংঘরাজ হন। তাঁর পর বর্তী সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির (১৮৩৮-১৯২৭) একযোগে ধর্ম ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখেন। ১৯০৯ সালে জ্ঞানালংকার মহাস্থবির সংঘরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা নবজাগরণ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পৃথিকৃতের অনুষারী হন।

নিম্নে বাংলাদেশে সংঘরাজ নিকায়ের মহামান্য সংঘরাজগণের নাম প্রদত্ত হল।[৭৪]

(১) সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির (১৮৬৪-১৮৭৭)

(২) সংঘরাজ পূর্ণাচার ধর্মধারী চন্দ্রমোহন (১৮৭৭-১৯০৮)

(৩) জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির (১৯০৮-১৯২৭)

(৪) বরজ্ঞান মহাস্থবির (১৯২৭-১৯৩৬)

(৫) তেজবন্ত মহাস্থবির (১৯৩৬-১৯৪২)

(৬) ধর্মানন্দ মহাস্থবির (১৯৪২-১৯৫৭)

৭) অভয়তিষ্য মহাস্থবির (১৯৫৭-১৯৭৫)

৮) সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবির (১৯৭৫-২০০০)[৭৫]

৯) নাগসেন মহাস্থবির (১৯৯০-১৯৯৮)

১০) শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের (২০০১-২০০২)

১১) শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাথের (২০০২-২০০৩)

১২) শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাথের (২০০৩- ......)

বাংলাদেশে নিকায় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নানা পর্যায় ও পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে সম্রাট অশোকের সময় থেরবাদী, কনিষ্ক ও পাল আমলে মহাযানী ধারা। সর্বশেষ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুন জাগরণ সূচিত হয় অষ্টাদশ শতকে। পরবর্তীতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সংঘরাজ সারমে মহাথেরো ধর্মসংস্কারের পর গঠিত ভিক্ষু সংঘের নাম সংঘ সম্মিলনী।[৭৬] কয়েক বছর পর শিক্ষিত ভিক্ষুর উদ্যোগে জিন শাসন সমাগম নামে এক নতুন সংস্থা গঠিত হয়। চলতে থাকে বিনয় অবিনয় দ্বন্দ্ব। পরবর্তী বাংলাদেশ-ভারত ও অন্যান্য দেশের ভিক্ষুগণের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। জম্বুদ্বীপ ভিক্ষু মহামণ্ডল। ১৯২৩-২৪ সালে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বংশদ্বীপ মহাস্থবির, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, ধর্মানন্দ মহাস্থবির এবং বিশুদ্ধানন্দ মহাথের প্রধান উদ্যোগী হয়ে গঠন করা হয়। 'সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল'। এর সভাপতি হন বরজ্ঞান মহাস্থবির, হিসাব পরীক্ষক হন ধর্মাধার মহাস্থবির, ১৯৩৩ সালে সম্পাদক হন, ধর্মাধার মহাস্থবির। এর পরে গঠিত হয় চট্টল ভিক্ষু সংঘ। এই সমিতিতেও পণ্ডিত ধর্মাধার মাহস্থবির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩৮ সালে প্রস্তাব করন ভিক্ষু মহাসভা গঠন করেন। ১৯৩৯ সালে অগগ্ মহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির লোকান্তরিত হন এবং তিনি চট্টল বৌদ্ধ সমিতির স্থায়ী সভাপতি হন। সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রজ্ঞানন্দ স্থবির ও পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ভিক্ষু মহাসভা গঠন করার জন্য সাতবাড়িয়া, পাহাড়তলী, গাইরা, চকরিয়া, কক্সবাজার, রাঙ্গুনীয়া, কর্তলা, উনাইনপুরা প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রামে মহাস্থবিরদের মতামত ও সংলাপ করেন। আলোচনা হয়, সংঘ সম্মিলনী, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি, জম্বুদ্বীপ ভিক্ষু মহামণ্ডল, চট্টল ভিক্ষু সংঘ প্রভৃতির সাথে। এর মধ্যে ভিক্ষু সংঘ তিন দলের বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এ সময়, দ্বিধা বিভক্তে ভিক্ষুরা গঠন করেন সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা, সংঘরাজ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, ভিক্ষু মহামণ্ডল। ১৯৪৭ দেশ বিভাগ। বাংলাদেশে বৌদ্ধ সমিতি সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা এবং বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ। মহাস্থবির নিকায়দের নিয়ে গঠিত বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা ভিক্ষু সংঘের মধ্যে নতুন বলয় সৃষ্টি করে। সূচিত নতুন অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মহাস্থবির নিকায়ের সংঘনায়কগণের নামের তালিকা

মহাস্থবির নিকায়ের প্রথম সংঘনায়ক ছিলেন শ্রদ্ধেয় চাইন্দা মহাস্থবির। নিম্নে মহাস্থবির নিকায়ের সংঘনায়কদের নাম।[৭৭]

সপ্তদশ শতকের সংঘনায়কদের নাম

প্রথম	শ্রীমৎ	চাইন্দা	মহাস্থবির
দ্বিতীয়	"	নাইন্দা	"
তৃতীয়	"	অঙচান	"
চুতর্থ	"	কঙলা	"

অষ্টাদশ শতকের সংঘনায়কদের নাম

পঞ্চম	শ্রীমৎ	সুরিয়	মহাস্থবির
ষষ্ঠী	"	অঙথা	"
সপ্তম	"	সোহান	"
অষ্টম	"	ঝালা	"

উনিশ শতকের সংঘনায়কদের নাম

নবম	শ্রীমৎ	রাধাচরণ	মহাস্থবির	(রাধু মহাস্থবির)
দশম	"	রামদাশ	"	
একাদশ	"	ত্রিরতন	"	(তিতন মহাস্থবির)
দ্বাদশ	"	কেশরী	"	
ত্রয়োদশ	"	পঞ্ঞাসার	"	(ক্ষেত্র মোহন মহাস্থবির)
চতুর্দশ	"	অভয়াচরণ	"	
পঞ্চদশ	"	অমরচান	"	
ষোড়শ	"	রামধন	"	
সপ্তদশ	"	দ্যুবরাজ	"	

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতকের সংঘনায়কদের নাম

অষ্টাদশ	শ্রীমৎ	অগ্রসার	মহাস্থবির	
উনিশতম	"	জয়সুমন	"	(জয়ধন মহাস্থবির)
বিংশতম	"	সুমনতিষ্য	"	(শশী মহাস্থবির)
একুশতম	"	প্রজ্ঞালংকার	"	
বাইশতম	"	চন্দ্রজ্যোতি	"	(পূর্ণ মহাস্থবির)
তেইশতম	"	ধর্মদর্শী	"	(অন্তবর্তী কালীন শ্রীমৎ ধর্মপাল মহাস্থবির)
চব্বিশতম	"	বিশুদ্ধানন্দ	"	
পচিশতম		জ্ঞানালোক	"	(পনি মহাস্থবির)
ছাব্বিশতম		প্রিয়ানন্দ	"	
সাতাশতম		এস ধর্মপাল	"	

উনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের যুগ হিসেবে পরিগণিত। এ সময় বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ বিবর্তনে সংস্কার আন্দোলন প্রকট রূপে প্রভাবিত করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী বাংলা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম আদি ধর্ম দর্শন হিসেবে প্রচার প্রসার ও বিকাশমান থাকলেও সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার নবজাগরণ ও সংস্কার একান্ত প্রয়োজন ছিল। বৌদ্ধধর্মের সংস্কার আন্দোলন, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদেশগুলো শ্রীলংকা, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৭৮] ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সম্রাট অশোক অগ্রগণ্য। বৌদ্ধধর্মের ঐক্য সংহতি ও প্রচার প্রসারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ও অবদান বিশ্বের ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল।

বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের জনসমষ্টির উপর আরাকানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে ব্রহ্মদেশ প্রধান ভাবে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ও সংস্কার সাধনে নব্য পদক্ষেপ প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক কাল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বৌদ্ধদের কোন সঠিক ইতিহাস নেই। এই যুগকে বৌদ্ধধর্মের অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করা। কেননা তখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বৌদ্ধধর্মের অনুকূলে ছিল না। রাজানুগ্রহ লাভে ব্যর্থতা, বৌদ্ধদের উপর হিন্দুধর্মের অত্যাচার, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের (বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান) উদ্ভব প্রভৃতি কারণগুলি বৌদ্ধধর্ম অবনতির জন্য দায়ী বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭৯] ধর্মতিলক স্থবির বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের এই দুর্যোগের সময় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের

Dhaka University Institutional Repository

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যে বহু তান্ত্রিক ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করার সুযোগ ঘটে। বৌদ্ধ বিনয়ের পাতিমোক্ষ, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা, উপোসথ ও কর্মবাচা সম্বন্ধে ভিক্ষুদের ধারণার একান্ত অভাব ছিল। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীরা শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালি প্রভৃতি হিন্দুদের দেবদেবী পূজা অর্চনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিত, রাউলী, সন্ন্যাসী ও ঠাকুর নামে খ্যাত হয়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এই চরম শোচনীয় অবস্থায় কক্সবাজার চকরিয়া হাররাং এর জন্মজাত আরাকানে কর্ম বিস্তৃত জীবন গঠন করে আরাকান সংঘরাজ সারমেধ মহাথের ধর্ম সংস্কারে ১৮৫৬ সালে প্রথম তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে আগমন করেন, তখন চাকমা রাণী কালিন্দী তাঁকে পুনরায় সংঘরাজ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।[৮০] এ সময় তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন বৌদ্ধ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৫৭ সালের রাজপুন্যাহ উপলক্ষে সংঘরাজকে তিনি রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করেন। এর কিছুদিন পর সংঘরাজ সারমেধ আবার আরাকানে চলে যান। ১৮৬৪ সালে সংঘরাজ সারমেধ আবার একদল ভিক্ষু নিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে সাতজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ রাউলী ভিক্ষু লালমোহন ঠাকুর, কমল ঠাকুর, হরিঠাকুর, অভরচরণ ঠাকুর, হরিঠাকুর, সুখচাঁদ ঠাকুর ও দুবরাজ ঠাকুর সংঘরাজ সারমিত্র মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে পুনরায় পাহাড়তলী মহামুনির দক্ষিণে 'হাঞ্জার ঘোনা' সীমাঘরে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এসময় বৌদ্ধ সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দলে দলে অন্যসব ভিক্ষুরা উপসম্পদা গ্রহণ করে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে জীবন পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে ভিক্ষুসমাজে মতবিরোধও শুরু হয়। চট্টগ্রামের ভিক্ষুসমাজ প্রধান দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়; একটির নাম সংঘরাজ নিকায় এবং অন্যটির নাম মহাস্থবির নিকায়, চাকমা, মারমা ও রাখাইন বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও তখন সংঘরাজ নিকায়ে যোগ দেন। বেশি ভাগ বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘরাজ নিকায় প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮১] দুই বৎসর পর তিনি আরাকান ফিরে যান। সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের কার্যাবলী বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে প্রথম সংস্কার আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু রামদাস মহাস্থবির, তিতন দাস মহাস্থবির ও রাধাচরন মহাস্থবির এ তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক রাউলী ভিক্ষু সংঘরাজ সারমিত্র মহাস্থবিরের কাছে উপসম্পদা গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এঁদের মাধ্যমেই গঠিত হয় মহাস্থবির নিকায়।[৮২]

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিনয় কর্ম সম্পাদন বিষয়ে সামান্য মত বিরোধ থাকলেও উভয় নিকায় ভুক্ত গৃহীদের মধ্যে ধর্মীয়-সামাজিক ইত্যাদি কার্য সম্পাদনে কোন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশের ভিক্ষুদের মধ্যে বর্তমানে সংঘরাজ নিকায়, মহাস্থবির নিকায়, সুধর্ম্মা নিকায় এবং মারমা বুড্ডিস্ট কাউন্সিল নামে চারটি নিকায় রয়েছে। বাংলাদেশের সকল বৌদ্ধ থেরবাদ মতাদর্শের অনুসারী।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামন্ডল, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিক্ষু সমিতি, উকিয়া ভিক্ষু সমিতি, মিরসরাই ভিক্ষু সমিতি, রাখাইন মারমা সংঘ কাউন্সিল, রাঙ্গুনিয়া ভিক্ষু সমিতি বাঁশখালী ভিক্ষু সমিতি, সাতকানিয়া লোহাগড়া ভিক্ষু সমিতি, চকরিয়া ভিক্ষু সমিতি প্রভৃতি রয়েছে। বৌদ্ধ গৃহীদের প্রধান প্রধান সংগঠন গুলো হলোঃ বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি (১৮৮৭), বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ (১৯৪৯), পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ (১৯৬৭), বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন (১৯৮৪), অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি, বুড্ডিস্ট ফাউন্ডেশন উল্লেখ্যযোগ্য। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার উনাইনপুরা নিবাসী চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের (পুর্নাচার-ধর্মাধারী) নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। সংঘরাজ সারমিত্র মহাস্থবিরের পর পুর্নাচার ধর্মাধারী ১৮৭৭ সালে সংঘরাজ নির্বাচিত হন। তিনিই প্রথম বাঙালি সংঘরাজ। সুদীর্ঘ কাল ধরে বাংলাদেশে রেনেঁসা উত্তর ধর্মসংস্কার ও ক্রমবিকাশের ধারা বিরাজমান।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. Syrcretism in Bangladeshi Buddhism, Dr. Dilip Kumar Barua and Dr. Mitsuru Ando, Gromt-in-Aid for JSPS, Japan, 2002, P.76

২. জগজ্জ্যোতি, ২০০৫, ধর্মপাল সংখ্যা, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১১৪

৩. জগজ্জ্যোতি, ধর্মপাল সংখ্যা, কলিকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৫

৪. অনোমা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ১২৪, প্রবন্ধ, শিশির বড়ুয়া, কতিপয় বিস্তৃত প্রায় বৌদ্ধ কবি সাহিত্যিক

৫. পূর্বোক্ত, জগজ্জ্যোতি, ধর্মপাল সংখ্যা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৭

৬. পূর্বোক্ত, জগজ্জ্যোতি, ধর্মপাল সংখ্যা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১১৭

৭. সাম্য, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ-ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৫, প্রবন্ধঃ শীলব্রত চৌধুরী, স্মর্তব্য

৮. জ্যোতি, বুদ্ধপূর্ণিমা, স্মরণিকা, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, প্রবন্ধঃ অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া, শিক্ষাব্রতী অধ্যক্ষ পি.আর. বড়ুয়া

৯. কৃষ্টি, নব পর্যায়, ১৭ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ২০০৩, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-২৩

১০. পূর্বোক্ত, কৃষ্টি, নবপর্যায়, ১৮ বর্ষ, ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৮

১১. সাম্য, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৭

১২. সুস্নিগ্ধা বড়ুয়া, রবীন্দ্র বড়ুয়া (জীবনীগ্রন্থ), বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৭১

১৩. পূর্বোক্ত, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, সুস্নিগ্ধা বড়ুয়া, পৃষ্ঠা-১৩

১৪. সাম্য, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৮-২৯, প্রবন্ধ শীলব্রত চৌধুরী, স্মর্তব্য

১৫. কৃষ্টি, নব পর্যায়, ১৮ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা , ২০০৬, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৫

১৬. চট্টলশিখা, ২০০৫, চট্টগ্রাম, সমিতি, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৫

১৭. সাম্য, ২০০৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৬

১৮. স্মৃতি সম্পুট, ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া নাগরিক স্মরণসভা কমিটি, চট্টগ্রাম, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৭

১৯. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, পৃষ্ঠা-১৫০

২০. সৌম্য, ২০০৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩০

২১. জ্যোতি, ৯৬, ১৮ বর্ষ, পৃষ্ঠা-৬১

২২. চারুলতা, ৮ম বর্ষ, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩১

২৩. গন্ধবংশ, ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, (অনু) আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-প্রচ্ছদ

২৪. বুদ্ধের শিক্ষা, ড. জ্ঞানরত্ন থেরো, কোশিও প্রিন্টিং কা. লি. টোকিও, জাপান, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২৬৭

২৫. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৪৭

২৬. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৪৭

২৭. জীবনী গ্রন্থমালা রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, সুস্মিতা বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩

২৮. পূর্বোক্ত, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৪৯

২৯. পূর্বোক্ত, পালি সাহিত্যে ধর্মপদ, পৃষ্ঠা-পূর্বকথা

৩০. সম্যক, ২০০১, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-০৬

৩১. আবুল ফজল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-১০

৩২. ড. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোক সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২

৩৩. Man and his Works, P-15

৩৪. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আব্দুল মমিন চৌধুরী, বর্ণায়ন, ঢাকা ২০০২, পৃষ্ঠা-১০২

৩৫. প্রাচীন পৃথিবী, ২য় খণ্ড, এ.এফ.এম. শামসুর রহমান, রাজশাহী, ২০০২, পৃষ্ঠা-৬)

৩৬. উদ্বৃতি, প্রারম্ভিক সমাজ বিজ্ঞান, ড. রঙ্গলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১২৭

৩৭. প্রাগুক্ত, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১১

৩৮. হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, ড. অতুল, সাহিত্য লোক, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৯

৩৯. প্রাগুক্ত, প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান, পৃষ্ঠা-১৩৩

৪০. Fairs and Festivals in Bengal, chas Benaley, M. B, D. P. H., D. T. M., & H. Director of public Heath, Bengal, 1921, Calcutta, Pg-

৪১. ড. দুলাল চৌধুরী, বাংলার লোক উৎসব, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৩০

৪২. প্রাগুক্ত, বাংলার লোক উৎসব, পৃষ্ঠা-৩৩

৪৩. আহমদ শরীফ, স্বদেশ অন্বেষা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং ১৩৭৭, পৃষ্ঠা-৩, উদ্ধৃতঃ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২১

৪৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতি কথা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা-১, উদ্ধৃত-পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০

৪৫. ইতিহাস ঐতিহ্য ধর্ম সংস্কৃতি জাতীয়তা ও আমাদের রাস্তা, মুহাম্মদ আবদুর কাদির, মিমরা প্রকাশন, ঢাকা, ১৪০৮, পৃষ্ঠা-৩৪

৪৬. বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, ড. আহমদ শরীফ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১

৪৭. জোর্তিময় ঘোষ, বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-২৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িক পত্র, (৭ম খণ্ড), মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৭৬

৪৯. বরেন্দ্র অঞ্চলের সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, ড. ওয়াকিল আহমদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১২০৯-১২১০

৫০. Rovert H. Lowie: Premitive Society, London-1949, Chapter-10-11, উদ্ধৃতঃ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বসমাজ, পৃষ্ঠা-৫৬, উদ্ধৃতঃ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩১

৫১. Encyclopaedia of Social Sciences, 1959, Vol-6, Chapter-3, উদ্ধৃতঃ পূর্বোক্ত

৫২. উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িক পত্র, মুনতাসীর মামুন, অন্যান্য,ঢাকা,২০০০,পৃষ্ঠা-১৮

৫৩. নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা, ড. মু হাবিবুর রহমান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১০১

৫৪. সামাজিক কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন, রেজাউল করিম, রেডিয়েন্ট পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৫৬

৫৫. নৃবিজ্ঞানের রূপরেখা, ড. মু হাবিবুর রহমান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯৮

৫৬. বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), (৩য় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২

৫৭. বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩

৫৮. আনামা, ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-২৯, প্রবন্ধঃ ড. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সমাজে নবজাগরণ

৫৯. বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, ড. সুনীথানন্দ, বাংলাএকাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৩২৫

৬০. আত্মঅন্বেষা ঃ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৪৫

৬১. বুদ্ধ প্রণাম, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (সম্পা), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১১

৬২. বড়ুয়া জাতি, উমেশ চন্দ্র , মুৎসুদ্দি, চট্টগ্রাম, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা-১৮

৬৩. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ড. মনিকুন্তলা হালদার (দে), ১৯৯৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩০৯

৬৪. দেশ পত্রিকা, ৫৮ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৮৮

৬৫. অনোমা, ২০০১, পৃষ্ঠা-২০৮

৬৬. বাংলা পিডিয়া, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা -৪৩২

৬৭. বাঙালী বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ডি.পি.বড়ুয়া, পৃষ্ঠা-১০৪

৬৮. বাংলা পিডিয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪১

Dhaka University Institutional Repository

৬৯. বাংলা পিডিয়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৮

৭০. সচিত্র বৌদ্ধতীর্থ পরিক্রমা, ড. বরসম্বোধি, চট্টগ্রাম, ২০০২, পৃষ্ঠা-৬৫

৭১.বাংলা পিড়িয়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪২

৭২. অনোমা, ২০০৩, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৪০

৭৩. মজ্‌ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, বেণীমাধব বড়ুয়া (অনু), ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃষ্ঠা-ভূমিকা

৭৪. সংঘরাজ জ্যোতিঃপাল স্মারক, ২০০৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৭৯

৭৫. পূর্বোক্ত, বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম, পৃষ্ঠা-উৎসর্গ

৭৬. বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মে মহাস্থবিরদের অবদান, পৃষ্ঠা-৩৪

৭৭. বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের মহাস্থবির নিকায়দের অবদান, প্রিয়ানন্দ মহাথের ও এস ধর্মপাল মহাথের, অগ্রসার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ, ১৯৮০, চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-পরিশিষ্ট

৭৮. ইতিহাস, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১২ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, বৈশাখ চৈত্র, ১৩৮৫, পৃষ্ঠা-৫৭

৭৯. ইতিহাস পত্রিকা, ১২ বর্ষ ১ম ৩য় সংখ্যা, ১৩৮৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬০, প্রবন্ধঃ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কার আন্দোলন, আব্দুল মাবুদ খান

৮০. সংঘরাজ সারমিত্র মহাস্থবির জীবনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৩

৮১. বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও দর্শন, নীরু কুমার চাকমা, মিনার্ভা পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৫৯

৮২. পূর্বোক্ত, ইতিহাস পত্রিকা, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কার আন্দোলন, পৃষ্ঠা-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান

৮.১ উত্তরবঙ্গের ভৌগলিক ও ভুতাত্ত্বিক পরিচিতি
৮.২ আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
৮.৩ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতা
৮.৪ ওরাঁওদের আদিনিবাস ও ক্রমবিবর্তন ধারা
৮.৫ উত্তরবঙ্গের অন্তজ্য জাতিগোষ্ঠি
৮.৬ প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠি পরিচয়ঃ ওরাঁও
৮.৭ আদিবাসী ওরাঁওদের সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি
৮.৮ বাংলাদেশে ওরাঁও জাতিসত্তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট
৮.৯ আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের আত্মপ্রকাশ
৮.১০ ওরাঁও স ম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থান

৮.১ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচিতি

অবস্থান : প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চল বা বর্তমান রাজশাহী বিভাগ ২৩°-৩০" উত্তর অক্ষাংশ ও ২৬°-৩৮" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°-২১" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ৮৯°-৫৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা এ স্থানের সামান্য দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে গেছে। ৯০° পূর্বগোলার্ধের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত বিধায় ৮৮°-২' ও ৮৯°-৫৭' দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এ স্থানও পূর্বগোলার্ধের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত।

সীমানা : এ স্থানের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা সমূহ। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ণিয়া, ভারতের দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা দুটি ও মালদহ জেলা, দক্ষিণে ঢাকা ও খুলনা বিভাগ, পদ্মা নদীর ওপারে অবস্থিত ভারতের মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলাদ্বয় এবং বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ি জেলাদ্বয় এবং পূর্বে ঢাকা বিভাগ, ভারতের মেঘালয়, আসাম রাজ্য, ধুবড়ি জেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপারে অবস্থিত ভারতের তরা জেলা ও যমুনা নদীর ওপারে অবস্থিত বাংলাদেশের জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা দুটি অবস্থিত।

আয়তন ও লোকসংখ্যা : রাজশাহী বিভাগের আয়তন, ৩৪,৫১৩ বর্গ কিলোমিটার।বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এই পাঁচটি জেলা নিয়ে গঠিত বরেন্দ্রভূমি তথা রাজশাহী বিভাগের আয়তন ১৩,৩৬৯ বর্গমাইল ও ১৯৮১ সালে আদমশুমারী মতে, লোকসংখ্যা ২,১৮,৯৬৮৯১ জন এবং প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ১৬৩৭ জন। ২০০১ সালের হিসেবে জনসংখ্যা ২.৯৯.৯৫৫ জন এবং ২০০৪ সালের হিসেবে সর্বমোট জনসংখ্যা ৩,১৪,৭৭,৬০৬ জন, জন সংখ্যার ঘনত্ব ১২ জন। ধর্ম ভিত্তিক জনসংখ্যা বৌদ্ধদের সংখ্যা ০.২৩%।[১]

বাংলার ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ও গৌরবমণ্ডিত। বহু শতাব্দীর পুরাতন জনপদ বাংলাদেশের উত্তর ভূখণ্ড এই বরেন্দ্র অঞ্চল। উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্র) অত্যন্ত প্রাচীন ভূমি। প্রায় ৬০ কোটি বছর আগেকার সেই প্রাচীন আর্কিয়ান যুগে (Archian Era) এ ভূমির গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং এরও কোটি কোটি বৎসর পরে টারশিয়ারি (Tertiary Era) গণ্ডোয়ানা যুগে (Condwanas Era) সৃষ্ট কঠিন শিলা, কয়লা, চুনাপাথর, বেলেপাথর, সাদামাটি ইত্যাদি বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য বরেন্দ্র ভূমির অভ্যন্ত-রে পাওয়া যায়। মেসোজয়িক যুগের (Mesojoice Era) শেষ দিকে নিম্নভূমিতে অজস্র তলানি স্তূপীকৃত হয়ে বাঙলার সমগ্র অঞ্চলে স্থল ভাগের সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়। লালমাটিতে গঠিত বরেন্দ্র ভূমির অস্তিত্ব রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা অঞ্চলের সূচনা প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে বলে পণ্ডিত মহলের অভিমত। মাত্র ১০ হাজার বছর আগে হলোসিন যুগে এদেশের ভূমি গঠনের প্রক্রিয়া শেষ হয়। ইতিহাস যুগেও বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীনত্বের কৌলিনজ্য শ্লাঘার বিষয়। অন্তত আড়াই হাজার বছর আগেকার (গৌতম বুদ্ধের সময়ে) মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন বগুড়ার মহাস্থানগড়ে ২৫ ফুট মাটির নিচে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সোমপুর বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে এই বরেন্দ্র ভূমিতে পাহাড়পুর নামক স্থানে।[২]

অনেক প্রাচীন সভ্যতার উত্থান-পতনের পাদপীঠ এই উত্তরবঙ্গ। যুগে যুগে এ অঞ্চলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-ভাস্কর্য, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এতদঞ্চলে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানে এ অঞ্চলের মানুষের বর্ণময় জীবনধারা এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহু নিদর্শন ও ইতিহাসের ভিত্তি শুধু উত্তরবঙ্গই নয়; সমগ্র বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার; ক্ষেত্রেও অনন্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত হবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকে শুরু করে সমগ্র ব্রিটিশ আমলে এবং তার পরেও রাজশাহী বিভাগ তথা বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ইতিহাস সরকারী-বেসরকারী ইত্যাদি অনেকভাবে রচিত হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের বৌদ্ধ সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা ও ইতিহাস এ পর্যন্ত রচিত হয়নি।

বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্য আসলে তৈরি হয় স্থান-কাল-পাত্র ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাবে। একটি দেশের ভৌগোলিক পরিচয়ের মধ্যে দেশ, জাতি, সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি সমাজ ও জীবন প্রকৃতির বাস্তব অবস্থা সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ করা যায়।

বাংলার বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কালেকালে বিভিন্ন সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই বাংলাদেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ; বৌদ্ধ ইতিহাস বৈচিত্রময়। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে করতোয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত ৯২৮৮ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট উত্তরবঙ্গের পদ্মা- যমুনার দোয়াব অঞ্চলের মধ্যভাগ নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে বিশাল বরেন্দ্র ভূমি অবস্থিত। উত্তরাঞ্চল তথা রাজশাহী বিভাগের তিন চতুর্থাংশ এলাকা জুড়ে এই বরেন্দ্র ভূমি। প্রাচীনকাল থেকে এই এলাকা অনেক ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণে প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন এই বরেন্দ্র ভূমিতে বহু রাজবংশের (বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম) উত্থান-পতন ঘটেছে।

ভৌগোলিক দিক থেকে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের উত্তরে ভারতের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং দক্ষিণে পদ্মা নদী। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক চৌহদ্দির পরিচয় আরো স্পষ্ট করে বলা যায়। এর উত্তর-পশ্চিমে ভারত আর পূর্ব-দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও পদ্মা নদী।[৩] বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের

Dhaka University Institutional Repository

জেলাসমূহকে উত্তরবঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। (রাজশাহী, নবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় মোট ১৬টি জেলা নিয়ে রাজশাহী বিভাগ গঠিত)। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা ও রাজশাহী এই পাঁচটি জেলা নিয়ে প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমি তথা রাজশাহী বিভাগ গঠিত হয়। (প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৩)। অবিভক্ত বঙ্গে এর পরিধি ছিল অধিকতর বিস্তৃত এলাকা নিয়ে। তৎকালীন রাজশাহী বিভাগ এবং কুচবিহার রাজ্য ছিল উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত।[৪]

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং দার্জিলিং জেলা ভারতে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পুরাণ ইতিহাস ও বৈদিক যুগে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এ সর্বপ্রথম পুন্ড্রবর্ধন নাম পাওয়া যায়। পুন্ড্র দেশের রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্রবর্ধন।[৫] বগুড়া শহরের প্রায় দশ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত মহাস্থানগড়কেই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাচীন পৌন্ড্র বা পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন বলে ধারণা করেন। পুন্ড্রবর্ধনের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা প্রশাসনিক অঞ্চল ছিল বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র।[৬]

৮.২ আদিবাসীদের ওরাঁওদের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ওরাঁওদের দেহ বর্ণ কালো, নাক খ্যাঁদা ও চ্যাপ্টা, চুল প্রায় কোকঁড়ানো, মাথার খুলি গোলাকার এবং দেহ মাঝারি।[৭] আদিবাসী গবেষক আব্দুস সাত্তার বলেছেন, ওরাঁও আদিবাসীদের চেহারা কালো, নাক খ্যাঁদা ও চেপ্টা, চুল ক্রমশঃ কোকঁড়ানো, মাথারখুলি গোলাকার, ঠোঁট মোটা এবং দেহের উচ্চতা মাঝারী ধরনের।[৮] তবে বিশেষ করে ওরাঁও সমাজের মেয়েদের গঠন পুরুষের তুলনায় খর্বাকৃতি।

কোন দেশের তারাই আদিবাসী যারা সে দেশেরই প্রাচীন আদিবাসীদের আধুনিক উত্তরপুরুষ। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা গ্রন্থ মতে,

In modern times the term 'Aboriging' has been extended in signification and is used to indicate the inhabitants found in a country of its first discovery in contradiction to colonies or a new races, the time of whose introduction into the country is unknown.[৯]

আদিবাসী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আদিকাল থেকে বসবাসকারী। আদিবাসী শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে আদি অর্থ 'মূল' এবং বাসী অর্থ হলো অধিবাসী।

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসীরা স্ব স্ব দেশেরই মূল আদিবাসী এবং দেশ সৃষ্টির বা সূচনার প্রথম থেকেই স্থানীয় মাটির সঙ্গে তাদের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক সুগ্রথিত।[১০]

নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস মতে, বর্তমান উন্নতশীল যেকোন দেশের সুসভ্য মানুষ বা জাতি আদিম বাসিন্দাদেরই উত্তরপুরুষ। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন আজ একভাগ মানুষ উপজাতি বা আদিবাসী নামে নিন্দিত এবং বাদ বাকী মনুষ্য সমাজ ভদ্র বা সুসভ্য রূপে আত্মগর্বিত। এটার মূলতত্ত্ব কি তার ইতিহাস উচ্চতর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আদিবাসী বলতে এমন এক শ্রেণীর অধিবাসী বুঝায় যাদের পূর্ব পুরুষগণ অবশ্য সে দেশেরই আদিম বাসিন্দা ছিল। কাজেই আদিবাসী ও আদিম অধিবাসী কথা দুটির তাৎপর্য যে অভিন্নার্থক বা সমার্থক এটা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত আদিম দৃঢ়মূল জনসত্তা ও জীবনধারা এসব জনগোষ্ঠির জীবন ব্যবস্থায় একটানাভাবে আজও প্রবাহমান বলে তারা আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী নামে আখ্যায়িত।[১১] বর্তমানে ওরাঁওরা তফসিলী সম্প্রদায় (Scheduled Caste) হিসেবে পরিগণিত হয়। আদিবাসীরা এদেশের ভূমিজ সন্তান (Autochthones), স্বদেশজাত সন্তান।

নৃতত্ত্ববিদ Dr. J.H. Hutton তাঁর Censur Report of Bengal এ আদি অধিবাসী সম্বন্ধে বলেছেন, 'ক্রমবিবর্তন ও বিভিন্ন সময়ের বংশানুক্রমিক রক্তের মিশ্রণে এই সব আদিমানব নিজেদের আদিম অবস্থা হারিয়ে ফেলেছে।' কোন জাতির সঠিক পরিচয় নির্ণয়ে সে জাতির অতীত ইতিহাস অনেকটা সহায়ক। ইতিহাসের অভাবে সেই সব মানবগোষ্ঠির আকৃতি-প্রকৃতি, বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম, ভাব-ভাষা ইত্যাদির সাথে সম্যক পরিচয় কিংবা তাদের কালস্থায়ী পরিবেশের মূল উপলব্ধি না থাকলে সেই সব জাতি সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়।

'ওরাঁওদের আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা রোহিতাস দূর্গ হতে ছোটনাগপুর এসে মুণ্ডাদের বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে এবং পাড়হা, পাত্তি, পাঞ্চ ও খুটকাট্টি বা ভূইহার মুণ্ডারী সমাজ ব্যবস্থা ও শাসন প্রণালী গ্রহণ করে।'[১২] শরৎ চন্দ্র রায়, পি.দেহান এবং কর্ণেল ডাল্টনের মতে, ওরাঁও আদিবাসীর উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ ভারতের ডিকানে কংকা নদীর তীরে।[১৩] আদিবাসী ওরাঁওরা কুড়ুখ ভাষায় কথা বলে। এ ভাষা নেপালী ও পালি ভাষার সংমিশ্রণে গড়া। অন্যটি হলো বাংলা-হিন্দী-ইংরেজী মিশ্রিত সাদরী ভাষা। পূর্বে ওরাঁও আদিবাসীরা সর্বপ্রাণবাদ অর্থাৎ প্রকৃতি পূজারী, ভূমিজ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। বর্তমানে শারীরিক গঠন ও ভাষাগত বিচারে, নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে আদিবাসী ওরাঁওরা দ্রাবিড় ভাষার জনগোষ্ঠী।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট গবেষক ও নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, বাংলার অনেক প্রান্তিক ও আদিম জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যে প্রটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) উপ-নরগোষ্ঠির প্রলক্ষণ দেহ মাঝারী থেকে খর্বাকৃতির, গাত্রবর্ণ ঘনকালো, নাসামূল অবনমিত ও নাসা প্রান্ত প্রশস্ত, মাথার চুল কালো, কোঁকড়ানো, চোখের রং কালো, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতির, মাথার খুলি মাঝারি থেকে লম্বাটে হওয়ার দিকে লোক। পোদ জাতির দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এর খুবই সাদৃশ্য রয়েছে।[১৫]

বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বেশি আদিম জনজাতি বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী প্রটো-অস্ট্রালয়েড বৈশিষ্ট্য থাকলে এরা নেগ্রিটো বৈশিষ্ট্যে সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রাচীন পোদ বা পূঁড়া জনগোষ্ঠী বাংলার বৌদ্ধ জাতিসত্তার চিরায়ত আদি বাসিন্দা। উত্তরবঙ্গের ভূ-ভাগে এ পোদ বা পুন্ড্র জাতির অবস্থান ছিল। গৌরবোজ্জ্বল বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী পোদ জাতির নামানুসারে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুন্ড্রদের দেশ বা পোদদের দেশ নাম পুন্ড্রদের দেশ বা পোদদের দেশ (country of the pods) হিসেবে অভিহিত হয়।[১৬] এই অঞ্চলটি সেন রাজাদের আমলে বরেন্দ্রদেশ নামে পরিচিত হয়। আদি পোদ জাতি ও তাদের চিরন্তন জীবনধারা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেলেও তাদের কতিপয় অজ্ঞাত উত্তর পুরুষ বিংশ শতাব্দীতেও উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে স্ব-পরিচয়ে টিকে ছিল। এখনো বরেন্দ্র অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্তবর্তী মালদহ জেলা, চলন বিলের নিভৃত এলাকায় পুন্ডরি বা পুন্ড্রী বা পুড়া নামক একটি ক্ষুদ্র অথচ স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী রয়েছে।[১৭] এরা কি তবে আদি পুন্ড্র জাতির একটি ক্ষুদ্র ও বিস্তৃত অংশ। কালের প্রবাহে নানা পরিবেশ গত রূপান্তর, জীবনধারণ প্রণালী ও আহার্যবস্তুর পরিবর্তন পোদদের সহস্রবর্ষ পূর্বেকার আদিম বৈশিষ্ট্য বদলে গেলেও তাদের দেহাবয়বে প্রটো-অষ্ট্রালয়েড অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক প্রলক্ষণসমূহ পোদদের শরীরে বিদ্যমান।

বিরজা শংকর গুহ, এস.এন.বোস, মহলানবিশ, হার্বার্ট রিজলি, হাটন, ওয়াদ্দেল প্রমুখ যাঁরা বাংলার নানা প্রান্তির গোষ্ঠি, নিম্নবর্ণের লোকদের দেহ বৈশিষ্ট্যের নৃতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যা করেছেন।[১৮] তাঁদের মতামত বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে মৎস্যজীবি পোদসহ আরও কতিপয় আদিম ও প্রান্তিক মানবগোষ্ঠি রয়েছে যারা প্রটো-অস্ট্রালয়েড সাব রেসের অন্তর্ভূক্ত।[১৯] পরবর্তীকালে কোল, ভীল, মুণ্ডা, পোদ, শরব, সাঁওতাল, গারো, ওরাঁও প্রভৃতি উপজাতিগুলি আদি পূর্বপুরুষ ছিল। যাযাবর জীবনধারা ত্যাগ করে খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকের দিকে পোদ জাতি প্রথমে কৃষিজীবি, পরে মৎস্যজীবি হয়ে জীবন অতিবাহিত করে। পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম, ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে বুনোধান, আখ, কাপার্স প্রভৃতি দ্বারা পোদদের কৃষি সমাজে উত্তরণ ও সমৃদ্ধি লাভ ঘটে। পুন্ড্র বা পোদরা ছিলেন অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী। পোদ জাতি থেকে কৃষি কর্মের মূলযন্ত্র লাঙ্গল, ধান ভাঙ্গার উপকরণ ঢেঁকি, পান চাষের 'পানের বরজ' অস্ট্রিক শব্দের প্রচলন হয়। অনুরূপভাবে পুন্ড্রবর্ধনের প্রাচীন কৃষকেরা যে সমস্ত ফসলাদি চাষাবাদ করতো তার মধ্যে ধান, লাউ, কুমড়া, কলা, বেগুণ, পান, সুপারি প্রভৃতি শব্দও

অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্ভূক্ত। অধ্যাপক লেভির মতে, খোদ পুন্ড্র শব্দটিই (যার মূলে রয়েছে পোদ/পুঁড়া) অস্ট্রিক ভাষা থেকে সৃষ্ট।[২০]

প্রাচীন বাংলার আদি বৌদ্ধ অধিবাসীদের প্রধান পেশা ছিল কাপার্স চাষ। পুন্ড্র জাতিরা প্রচুর কাপার্স চাষ করতো। সে সময়ের কার্পাসিকা নামক এক প্রকার বিখ্যাত বস্ত্রবয়ন করা হত। এই ধারাবাহিকতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে। পঞ্চদশ শতকের চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান উল্লেখ করেন যে, এই জনপদে অন্তত দুই প্রকার উত্তম কার্পাস বস্ত্র তৈরি হত। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে রেশম উৎপাদন ও রেশম বয়নকারীদের কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীন পণ্ডিত কৌটিল্য পুন্ড্রিক রেশম বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাগীতে কাপার্স ও তুলা ধুনানোর বিতরণ আছে। প্রাগৈতিহাসিক কালে বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্রভূমি)। প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারে পরিপূর্ণ এই সুবিস্তৃত অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল বৈচিত্র্যময়।

নবম শতাব্দীর বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ, তন্ত্রিপাদ, শবর পাদের কতিপয় গীত থেকে বরেন্দ্র অঞ্চল ও তার আশপাশে শবরদের বসতির প্রকৃতি, কৃষিকর্মের ধরণ ও নৈমিত্তিক জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ধর্মদর্শন প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত এ সকল সিদ্ধাচার্যগণ উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের সোমাপুর বিহারের আশেপাশের কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন।[২১] সম্ভবত এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে উত্তরবঙ্গের (বরেন্দ্র অঞ্চলে) স্থায়ী মানব বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। নানা গোষ্ঠির (Ethnic group) মানুষ যুগযুগ ধরে বাস করতে গিয়ে গড়ে তোলে সমাজ ব্যবস্থা, বিকাশিত হতে থাকে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক রূপকাঠামো, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জীবনধারা; তৈরি করেছে একটি মিশ্র জনসমষ্টি। 'নৃতাত্ত্বিকদের মতে, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, পুণ্ড্র প্রভৃতি জাতি ছিল উত্তরবঙ্গের আদিম বাসিন্দা। ইতিহাসে এরাই অনার্য নামে পরিচিত। অনার্য অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অধ্যুষিত এই উত্তরবঙ্গেই সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন ঘটে।'[২২]

প্রাচীন আদিম জনগোষ্ঠী পুন্ড্র, কোল, শবর, মুণ্ডা, পোদ, ডোম, মাত্তরি, ওরাঁও, জয়াং, কোন, কোচ, মেচ, রাজবংশী প্রভৃতি উত্তর কালের ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, বিচিত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঘটনা প্রবাহ, বিপ্লব, বিপর্যয় ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি স্বকীয়তা হারিয়ে বাংলা তথা উত্তরবঙ্গে জনারণ্যে বিলীন হয়ে যায়। বর্তমান যেটুকু আর তা অত্যন্ত ক্ষীয়মান। জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে খ্রিষ্টপূর্ব থেকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনপদে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই অঞ্চল তথা বাংলার জনগঠনের ভিত্তিতে আদিম বৌদ্ধজনগোষ্ঠির রক্তধারা সিঞ্চিত। স্মারণীত কালের ধর্মবিশ্বাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও আচরণ প্রণালীতে যুগ-যুগান্ত ধরে আঁকড়ে ধরে রেখে উত্তরবঙ্গে অন্ত্যজ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরুষ বৈদিক, জৈন, হিন্দু, মুসলমান শাসন ও ধর্ম প্রভাবের পরেও একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সুদীর্ঘ যুগ

Dhaka University Institutional Repository

পরিক্রমায় উত্তরবঙ্গের কালজয়ী বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মদর্শনের মতাদর্শী আদিম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির বৌদ্ধিক ধর্মীয় আধ্যাত্মিক চেতনায় সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস এখনো সরব।

উত্তরবঙ্গের জাতিতাত্ত্বিক গঠন ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক ও চূড়ান্ত মিলন মিশ্রণ প্রক্রিয়া সূচিত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম বিজয়ের মধ্য দিয়ে।

ব্রাহ্মণবাদী সেন রাজাদের শাসনামলে বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের বৃহৎ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি ব্রাহ্মণ্যবাদী চাপ ও রাষ্ট্রীয় গ্রাসের মুখে সংখ্যাধিক বৌদ্ধ ধর্মান্তরিত ও সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণী বলে চিহ্নিত হয়। অন্ত্যজ শ্রেণীর বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীগুলো চিরায়ত অধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা লালন করছে বরাবর। বৌদ্ধ বিদ্বেষী সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী ভেদাভেদের যাঁতাকলে নিস্পৃষ্ট হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি। অন্যদিকে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী চাপের মুখে বৌদ্ধধর্মের পতন ও নিক্রমনের যুগে সাধারণ মানুষের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম মতে টিকে থাকা সমস্যা সঙ্কুল হয়ে পড়ে। তাই বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বীদের মধ্যে একটি শ্রেণী তান্ত্রিক সাধনা, গুহ্যসাধনা, মার্গসাধনা, সহজযান, বজ্রযান, নাথ, বাউল, সুফীবাদ প্রভৃতির দিকে চলে যায়। এভাবে উত্তরবঙ্গের গৌরবোজ্জ্বল বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পরিবর্তন মিশ্রণ ও ছড়িয়ে পড়ে বৌদ্ধধর্ম মত ও জনগোষ্ঠী তিরোহিত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য বৌদ্ধতান্ত্রিক ধারার অন্ত্যজ শ্রেণীর বৃহৎ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সেন রাজাদের পর ত্রয়োদশ শতকে মুসলিম বিজয়ের ফলে বাকীগুলো ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শাসন ব্যবস্থায় নানা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলাকার সুতিকাগার এ উত্তরবঙ্গ। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ও সভ্যতা, সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে অত্র জনপদের অনন্য ভূমিকা স্বীকার্য। সাহিত্য-সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনেও এ অঞ্চলের স্বর্ণাভ অবদান স্মরণযোগ্য।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২০০ বৎসর পূর্বে মৌর্য রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধন একটি বৃহৎ .প্রদেশ ছিল। পুন্ড্রনগর বা বর্তমান বগুড়ার মহাস্থান এই রাজত্বের রাজধানী ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে নানা প্রত্নবস্তু ও নির্দশন থেকে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রসহ পুন্ড্রনগর এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরাতন জনবসতি ছিল তা প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ বৎসর প্রাচীন। পরবর্তী গুপ্ত বংশের রাজত্বকালেও (৪০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ) উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্র অঞ্চল) উল্লেখযোগ্য জনপদ হিসেবে চিহ্নিত। বিখ্যাত বৌদ্ধ পাল রাজবংশের শাসনামলে (৭৫০ থেকে ১১৫০ খ্রিঃ) এ অঞ্চল বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এ অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসারতা লাভ করে। সেন বংশ ১০৯৫ থেকে ১২০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাসহ এই অঞ্চল শাসন করে। ১২০৪ সালে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়া ব্রাহ্মণ সেন রাজবংশীয় শাসনমাল এবং মুসলিম শাসন কালে (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিঃ) উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক বৌদ্ধ সভ্যতা, ঐতিহ্য, শিল্পসাহিত্য চর্চা কেন্দ্র সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাংলা চার কিংবা পাঁচ প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল এগুলো হলো বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা।[২৩] বাংলাদেশে মুসলমান শাসনমালে (১২০৪ থেকে ব্রিটিশ আগমন পর্যন্ত) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরীতে উত্তরবঙ্গকে কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে (১৭৬০ থেকে ১৮২০ পর্যন্ত) বাংলাসহ উত্তরবঙ্গ অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে শোষিত ও লুণ্ঠিত হয় তা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। জেমস রেণেল এর সার্ভে (১৭৬৪-৮১ খ্রি) হান্টার (১৮৭৫-৭৭) এবং পরবর্তীকালে কাটারের রিপোর্টে বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত উত্তরবঙ্গ বহু পাকা দালানের ধ্বংসস্তুপের বিবরণ পাওয়া যায়। অতীতের ইতিহাস সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ব্রিটিশ শাসনামলের গোড়ার দিকে বরেন্দ্র অঞ্চলে বনজঙ্গলে অবস্থাদি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যায়। নেলসনের (১৯২৩) বর্ণনা মতে, বরেন্দ্র অঞ্চল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, যেখানে মোঘল এবং ব্রিটিশরা বিভিন্ন ধরণের প্রাণী শিকার করত।[২৪]

খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৩২০ সালের পুরাতন পাথর খোদাই থেকে বারেন্দ্রী সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ সময়ের উত্তরবঙ্গের উন্নত ও সমৃদ্ধ অবস্থার নির্দশন পাওয়া যায় অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন যেমন বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কার, মৃৎপাত্র, মুদ্রা, বুদ্ধমূর্তি, বিহারের ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য উপকরণ থেকে। পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম ও কৃষ্টির প্রসার কালেও উত্তরবঙ্গ কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। এ অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ গোড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ সেন বংশের শাসনামলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পুণ্ড্রনগর সভ্যতা বিকাশের প্রায় হাজার বছর পরে বরেন্দ্র অঞ্চলের দক্ষিণ মধ্যাঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল সোমপুর (পাহাড়পুর) বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধধর্ম চর্চা, জ্ঞানানুশীলন এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সেকালে ব্যাপক পরিচিতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। 'মৌর্য শাসনামলে প্রাচীন বাংলার পুন্ড্রনগর সুবিখ্যাত ছিল। পুন্ড্রনগর ছিল রাজকীয় শষ্যাগার ও কোষাগার। বাংলাদেশের মহাস্থান গড়ে অশোকের ব্রাহ্মী শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। এতে এ অঞ্চল অশোকের সম্রাজ্যভূক্ত ছিল।[২৫] আবহমানকালে বরেন্দ্র ভূমির বিলুপ্ত ও বিস্তৃত প্রায় আদিম অধিবাসীর সার্বিক পরিচয় সম্পর্কে প্রচলিত নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন প্রলক্ষণ, পেশা, বসতি, ধর্মমত, সামাজিক জীবনধারা, ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হলো-

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বরেন্দ্র, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, মানবপ্রকৃতি, জীবনধারা, ধর্মদর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় সর্বাপ্রেক্ষা প্রাচীন বৈদিকগ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, আরণ্যক, মনুসংহিতা, মহাভারত, বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, জাতক, মিলিন্দ প্রশ্ন, বোধায়ন ধর্মসূত্র, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, দীপবংশ, মহাবংশ, বৌদ্ধগান ও দোহা, চর্যাগীতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে, টলেমির ভূগোল বিবরণ, কলহনের

Dhaka University Institutional Repository

রজতরঙ্গিনী, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারঙ্গ, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্র।[২৬] প্রখ্যাত বৈয়াকরণিক পানিনির রচনায়, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বাৎসায়নের কামসূত্র, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রী পণ্ডিত চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, গুপ্তযুগের বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, মেঘাস্থিনিসের ইন্ডিকা, প্রভৃতি গ্রন্থে।

দশম শতাব্দীর বরেন্দ্র অঞ্চলের অধিবাসী পাল রাজকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম এবং একাদশ শতকের কাশ্মিরী কবি কৃহন মিশ্রের রাজতরঙ্গিনী দ্বাদশ শতকের কাব্যধর্মী রচনা সুভাষিত রত্নকোষ, ত্রয়োদশ শতকের ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ এর তবকাৎ-ই-নাসিরী এবং ষোড়শ শতকের মোঘল দরবারি লেখক আবুল ফজলের আইন-ই-আকরবীতে এবং বহু প্রাচীন পুঁথিপত্র, রচনা, পৌরাণিক, শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক, গবেষক, পর্যটক ও ব্রিটিশ প্রশাসকের বিবরণীতে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বিভিন্ন তথ্য ও বর্ণনার সামগ্রিক পরিচয় প্রতিভাত হয়েছে।[২৭]

সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে উত্তরবঙ্গের (Field Observation) করে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বর্তমান নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক অবস্থা, পরিচয়, অনুসন্ধান ও বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের ধারাকে উন্মোচনের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ তথা বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার উদ্ভব ও আগমন ঘটেছে। একমাত্র বৌদ্ধধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ব্যাপক প্রচার প্রসারে দীর্ঘকাল ব্যাপি উত্তরবঙ্গে বিকশিত রূপ লাভ করেছিল। বুদ্ধের অহিংস, মানবতা ও শান্তির বাণী সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। উত্তরবঙ্গে চৌ-ধারায় বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম, খ্রিষ্টান) বর্তমান সময় পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বর্তমানে অতীত ঐতিহ্যে সমুজ্জল প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উত্তরসূরী আদিবাসী বৌদ্ধদের পুনর্জাগরণ সূচিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কালজয়ী বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন এই লক্ষ্যে সামনে যে বিভিন্ন প্রত্নবস্তু অনুসন্ধান সংগ্রহ, রচনা ও সংরক্ষণে উদ্যোগী হতে হবে। লামা তারানাথ তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন যে, রাজ দেবপাল ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বরেন্দ্র জয় করেছিলেন।[২৮] ত্রয়োদশ শতকের মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বরেন্দ্র অঞ্চলকে 'বারিনদাহ' বা 'বরিন্দ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ সময় এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত প্রচলিত ছিল।

৮.৩ উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতা

বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অঞ্চল উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র। আদিকালে উত্তরবঙ্গের নাম ছিল পুন্ডক। প্রাচীন উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র ও রাজধানী পুন্ড্রনগর, বাণগড়, কোটিবর্ষ, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, রাজধানী রামাবতিতে জগদ্দল মহাবিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার, মহাস্থানের ভাসু বিহার এবং অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ নগর ও শহরের

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান বরেন্দ্র জনপদে ছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় ও প্রাচীন পুন্ড্রনগর এক ও অভিন্ন বলে আজ প্রমাণিত। উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্র অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পুঁথিপত্র, তাম্রশাসন শিলালিপি, পোড়ামাটির ফলক,দেব-দেবীরমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে।

রাজশাহীর প্রাচীন নাম সোমপুর ও বরেন্দ্রভূমি। পাল আমলে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল। সোমপুর বিহার রাজা ধর্মপালের অমর কীর্তি। বরেন্দ্রভূমি একটি ঐতিহাসিক স্থান। বর+ইন্দ্র= বরেন্দ্র। এর অর্থ বরণ করা এবং ইন্দ্র অর্থ শ্রেষ্ঠ। পাল আমলে যিনি শৌর্যেবীর্যে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ, তাঁকে এ স্থানে বরণ করা হত। তাই এ স্থানের নাম বরেন্দ্রভূমি। পাল আমলে বহু বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ গোপাল, ধর্মপাল, মহীপাল প্রমুখ বহু রাজা বাংলা- ভারত শাসন করেছিলেন। উক্ত রাজাদের নামানুসারে এ স্থানের নাম রাজশাহী নামকরণ হয়েছে।[২৯] বৃহত্তর রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে বিদ্যমান সোমপুর বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অষ্টম শতাব্দীর পাল সম্রাট ধর্মপাল (আঃ ৭৮১-৮২১ খ্রিঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও স্থাপনাসমূহ প্রাচীন উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ সভ্যতা ও জনজীবনের দুর্লভ ও অকাট্য সাক্ষ্য হিসেবে অমূল্য উৎস।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ পর্যন্ত বাংলা তথা উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার জয় জয়কার। খ্রিষ্ট্রীয় প্রথম শতাব্দীতে যে বৌদ্ধ মহাযান মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকালের মধ্যে তার আরো কয়েকটি বিবর্তিত শাখার উদ্ভব হয়। যেমন-মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, তন্ত্রযান ও তার নির্বাচিত শাখাগুলির মধ্যে দেবদেবী ও তন্ত্রমন্ত্রের প্রাধান্য ছিল সর্বাধিক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে মহাযান বৌদ্ধ মতাবাদের অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্বের নানারূপের মূর্তি যেমন-মঞ্জুশ্রী, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর, পদ্মপানি এবং বৌদ্ধদেবী তারার বহু রূপের প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি পাওয়া গেছে। ভোজদেবের গোয়ালিয়র লিপিতে পাল রাজাদের বাঙালি বলা হয়েছে। তাদের আদিভূমি ছিল বরেন্দ্র। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বাংলার বিখ্যাত পাল বৌদ্ধ রাজবংশের জনকভূ বা পিতৃ ভুমি ছিল উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্র)। পাল রাজা এবং সমসাময়িক সকল রাজবংশ বৌদ্ধধর্মকে সক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বাংলার বৌদ্ধ রাজবংশগুলি ছিল মহাযানপন্থী। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার,বগুড়ার ভাসু বিহার ও মহাস্থানের প্রাচীন বিহারগুলিতে যেসব ভিক্ষু বাস করতেন তাদের জীবন বিনয় পিটকের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।

দিনাজপুরের অদূরে অবস্থিত দেবীকোট বিহারে বাস করতেন ভিক্ষুণী মেখলা। ইতিহাসের পাতায় এই একজন বাঙালি ভিক্ষুণীর নামই আমরা পাই।[৩০] গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা ও মানবতার বাণী এবং যিনি মুক্তি লাভের উপায় অষ্টমার্গ উত্তরবঙ্গের জনপদের বাঙালি হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো। জ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্মচর্চা ও বৌদ্ধ কেন্দ্রস্থল হিসেবে উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

বিহারগুলো কালের ইতিহাসে বাংলার এক গৌরবোজ্জল স্বাক্ষর বহন করে। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা ও বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান ছিল পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহার। এটি ছিল বৌদ্ধ পাল রাজা ধর্মপালের অমূল্য অবদান।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বহু তাম্রপট্রোলি পাওয়া গেছে বাংলায়। লেখমালার মধ্যে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে। এ লিপিটি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের একটি শিলাখন্ড লিপি। এটা মৌর্য সম্রাট অশোকের এদেশে অধিকার ও শাসন প্রতিষ্ঠার তথ্য প্রদান করে।[৩১] খ্রিষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতাব্দী হতে আরম্ভ করে খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে বাংলাদেশ সংক্রান্ত যে সমস্ত লিপি, লেখন, পট্রোলি, শিলালিপি, তম্রশাসন ও প্রশস্তি পাওয়া গেছে তার সংখ্যা অন্যূন একশত চৌত্রিশ।[৩২] সেন বংশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মী (বৌদ্ধ) এবং নিম্নবর্ণের লোকজন বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। রাজ পৃষ্ঠপোষকতাহীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ এই উত্তরবঙ্গ থেকে পূর্ববাংলা, সমতট, কামরূপ এবং নেপালে আশ্রয়গ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ ব্রহ্মদেশে চলে যায়। আর যারা এ অঞ্চলে অবস্থান করতে থাকে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলিম বিজয়কে আর্শীবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। রামাই পণ্ডিত তার শূন্যপুরাণে 'নিরঞ্জনের রুস্মা' অধ্যায়ে অতি সার্থক ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্মম নির্যাতনে কাহিনী ও বৌদ্ধদের উস্মা এবং তার সাথে মুসলিম আগমনকে স্বাগত জানানোর বর্ণনা তুলে ধরেছে।[৩৩] মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও মতাদর্শের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবী, পূজা-অর্চনা, আচার সংস্কৃতির সাঙ্গীকরণ ও সমন্বয় বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং ক্রমান্বয়ে পতন ঘটে। হিউয়েন সাঙ পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধদের কথা উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধযুগের পুণ্যভূমি উত্তরবঙ্গ। খ্রিষ্টপূর্ব কাল থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাল রাজ বংশ দেশজ, এর প্রথম নৃপতি গোপাল ' প্রকৃতি পুঞ্জ' বা জন সাধারণের দ্বারা মনোনীত।[৩৪]

পাল বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা গোপাল, উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র তথা বাংলায় একটানা ২৫ বছর রাজত্ব করেছেন। গোপালদেবের (৭৫০-৭৭৫ খ্রিঃ) নরপতি নির্বাচন সম্পর্কে খালিমপুর তাম্রশাসনে লেখা হয়েছে: 'মাৎস্য-ন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতি ভিলক্ষ্মাঃ করং গ্রাহিতঃ শ্রী গোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়া মনিস্তৎ সুত।'[৩৫] বাংলাদেশকে মাৎস্য ন্যায় বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার করেছেন। রাজা গোলাপের পিতাসহ দয়িতবিষ্ণুর আদিনিবাস উত্তরবঙ্গ বরেন্দ্রভূমিতে। পাল বংশীয় রাজাদের অধীনে বাংলার উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি প্রায় ৩৫০ বছর ছিল।

রাজা গোপাল যেমন জনমত পেয়ে রাজা হয়েছেন, তেমনি জনসমাদর ও শ্রদ্ধা পেয়ে দয়িতবিষ্ণু বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি দশ/বারটি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, আগমশাস্ত্র, গার্ন্ধবশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, বেদ-বেদান্ত সব বিষয়ে তিনি শিক্ষিত। উত্তরবঙ্গ জনপদ তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর পুত্র বপ্যট ছিলেন পণ্ডিত। পরবর্তীতে হয়েছিলেন যোদ্ধা। বপ্যটের পুত্র গোপাল রাজা হয়েছিলেন পৌন্ড্রবর্ধনের গৌড়বঙ্গের। আর এই গৌড়বঙ্গ হল বর্তমান উত্তরবঙ্গ। অনেকে উত্তরবঙ্গকে বরেন্দ্র বঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন। এখানকার বগুড়া, রাজশাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব, রংপুরের পশ্চিমের গৈরিকভূমি। একে পাল রাজাদের জনকভূঃ (পিতৃভুমি) বলা হয়। তার কেন্দ্র পৌণ্ড্রবর্ধনকে 'বসুধাশির' বা পৃথিবী শির বা শিরোমণি বলা হয়েছে। (রামচরিত) অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত মতে, ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি পাল রাজাদের শাসনাধীন ছিল। আবার এই ভূমিকেই মুসলিম ঐতিহাসিকরা বরিন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

পণ্ডিত এফ.জে. মনাহাম ১৯৯৪ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সাময়িকীতে বরেন্দ্রের সীমারেখার বর্ণনা দিয়েছেন ....This belt of land runs and west comprising western Bogra, South Western Rangpur, Southern Dinajpur and northern Rajshahi, but on the west the belt takes a turn South-ward and extends almost to the Ganges at Godagari, embracing the eastern portion of malda and part of western Rajshahi.[৩৭]

মহামানব গৌতম বুদ্ধের মতাদর্শের প্রধান দিক হল সাম্য, মৈত্রী, করুণা, মানবতা, সর্বজনীনতা, অহিংসা ও সততা, প্রাণী হত্যা, চুরি, অন্যায়, মিথ্যাকথা প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে বুদ্ধ সব সময় জনসাধারণকে সম্যক ব্যবসা ও কৃষি কাজের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। সে কারণে বৌদ্ধরা ছিল বণিক, ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবি। বাংলা নদীবহুল ও পলিমাটির দেশ, সে কারণে প্রাচীন বাংলা ছিল কৃষি কাজের উপযোগী অঞ্চল। বাংলার আদি অধিবাসীরা ছিল বৌদ্ধ। বৌদ্ধদের প্রধান ও অন্যতম পেশা ছিল কৃষি কাজ। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে কৃষি কাজের বহু উদাহরণ রয়েছে। প্রাচীনকালে বাংলায় ধান, আখ, সরিষা, কার্পাস, গম, যব প্রভৃতি উৎপন্ন হতো। বৌদ্ধযুগে ইক্ষু ও কার্পাস চাষ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাংলার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। ইংরেজ আমলে এর নাম দেওয়া হয় মসলিন। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ আছে, বাংলাদেশে খ্রীস্টের তিন চারশত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব বেশি হত।[৩৮] ইতিহাস মতে, পৌণ্ড্র, মগধ ও কর্ণসুবর্ণে রেশমের চাষ খুব ভাল হত।

'বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্রশিল্প সুখ্যাতি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চার ধরণের বস্ত্রের উল্লেখ আছে ক্ষোম, দুকুল, গাত্রোর্ণ ও কার্পাসিক। এ বস্ত্র তুলা ও সুতা বঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে তৈরী হত। বাংলার মসলিন প্রাচীন কালে বিশ্ববিখ্যাত ও অতি জনপ্রিয় ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক রচিত 'Periplus of the Erythren sea' বাংলাদেশের মসলিন ও আমদানির উল্লেখ আছে। এতে গেনজিটিক বা গঙ্গাজলীকে শ্রেষ্ঠ মসলিন বলে অভিহিত করা হয়েছে।'[৩৯] পুরাতত্ত্ববিদ টেলর পৌণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ

বা রংপুরকে রেশম বস্ত্রের (ক্ষোম ও পাত্রোর্ণ) এবং বঙ্গকে কার্পাস বস্ত্রের আদিস্থান বলে উল্লেখ করেছেন।[৪০] বাংলার আদি বৌদ্ধ জাতিরাই কার্পাস ও রেশম শিল্পের উন্নতি সাধন করে। বৌদ্ধ যুগে বাংলার বস্ত্র শিল্প বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে এবং চতুর্থ শতকের প্রথমার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত আমলে রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, পুন্ড্রবর্ধন ভূক্তির অর্ন্তভূক্ত। পুন্ড্রবর্ধন এ প্রদেশের রাজধানী। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে, গুপ্ত রাজবংশের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত মগধে রাজত্ব করতেন। কিন্তু চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং লিখেছেন, শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকট একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি বৌদ্ধ গ্রন্থের সূত্র অনুসরণে রমেশচন্দ্র মজুমদার ধারণা করেন, ইৎসিং এর মৃগস্থাপন বরেন্দ্র অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। তাঁর মতে ইৎসিং এর মিলি-কিয়া-সি-কিয়া-পো-নো এবং বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন স্তুপ এক এবং অভিন্ন।[৪১] মহারাজ শ্রীগুপ্ত বৌদ্ধধর্মের একজন পোষক ছিলেন নওগাঁর পাহাড়পুরে সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত তাম্রশাসন তার প্রমাণ।

৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে যুয়ান চুয়াঙ সমতট (Sa-Mo-ta-ch'a), কর্ণসুবর্ণ (Kie-lo-na-su-fa-la-na), তাম্রলিপ্তি ও পুন্ড্রবর্ধনে স্বচক্ষে বৌদ্ধধর্ম সাধনার স্থানগুলি দেখেছেন বলে বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায়, এক পুন্ড্রবর্ধনেই ছিল ২০টি বিহার, যেখানে মহাযান এবং হীনযানপন্থী তিন হাজারেরও অধিক ভিক্ষু বসবাস করত। এ বিহার ও সংঘারাম ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। যুয়ান চুয়াঙ সর্বাপেক্ষা বড় বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন, রাজধানী পুন্ড্রবধর্নের ২০ লি দূরে/তিন কিলোমিটার পশ্চিমে, যার নাম ছিল পো-সি-পো বিহার। সংঘারামটি প্রশস্ত ও উচ্চু প্রায় ৭০০ জন মহাযানী ভিক্ষুর আবাসস্থল।[৪২] ঐতিহাসিকগণ এটি মহাস্থানের ভাসু বিহারকে সনাক্ত করেছেন। এই বিহারের অনতিদূরেই ছিল অবলোকিতেশ্বরের একটি বিহার। চৈনিক পরিব্রাজকের এই বর্ণনা থেকে অনেকের ধারণা পুন্ড্রবর্ধনে বসবাসকারী অধিকাংশ ভিক্ষুশ্রমণই ছিলেন হীনযানপন্থী (স্থবিরবাদী)।[৪৩] উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে রাজশাহী জেলার বিহারৈল এ গুপ্ত আমলের দন্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। সমতটের পশ্চিমে দেড় হাজার লি আয়তনের সাগরতীরবর্তী তাম্রলিপিতে প্রায় দশটি সংঘারামে ১০০০ ভিক্ষু বাস করত।[৪৪]

গুপ্ত শাসনের পর মহাসামন্ত শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন গৌড়রাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে পুন্ড্রনগরী শশাঙ্কের রাজধানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শশাঙ্কই প্রথম বাঙালি রাজা, যিনি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন। যুয়ান চুয়াঙের বর্ণনানুযায়ী তিনি ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের অনতিকাল পরে মৃত্যুবরণ করেন সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং কজঙ্গল (Ka-Chw-Wen-Kilo) পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ (Kia-Mo-Lu-Po), সমতট, তাম্রলিপি এবং কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন বাংলা তথা উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধশিক্ষা দীক্ষা ও ঐতিহ্যের প্রসার ছিল। তিনি পুন্ড্রবর্ধনের বিশটি বিহারে তিন

Dhaka University Institutional Repository

হাজারের বেশি ভিক্ষু শ্রমণকে দেখেছিলেন। এসব বৌদ্ধ বিহারে ধর্মচর্চা, জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনা হতো পুরোদমে।

হরিষেণের 'বৃহৎ কথাকোষ' এ উল্লেখ আছে, প্রখ্যাত জৈনসুরী ভদ্রবাহু ছিলেন পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্মণ সন্তান। 'বিদ্যাবদান' এর একটি কাহিনী থেকে জানা যায়, সম্রাট অশোক পুন্ড্রবর্ধনের জৈন ধর্মাবলম্বী নিগ্রন্থদের অপরাধের দরুণ পাটলিপুত্রের ১৮০০০ আজীবিককে হত্যা করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত ও উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতাব্দীতে পুন্ড্রবর্ধন (Pun-na-fan-tan-na) জনপদে জৈনধর্মের যথেষ্ট প্রসার ছিল। জৈন 'কল্পসূত্র' গ্রন্থে অমলিপ্তিয়া, কোডিবর্সিয়া, পোংডবর্ধননীয়া এবং খববতিয়া নামে জৈন গোদাস গণীয় ভিক্ষুদের চারটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থের অনাথ পিন্ডকসুতা সুমাগধার কাহিনীতে বলা হয়েছে, বুদ্ধ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে পুন্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। জৈন গ্রন্থসূত্র মতে, জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও বরেন্দ্র ভূমিতে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। বিদ্যাবদানের কোটি কর্ণাবদানে উপালী বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'অন্ত বা সীমান্ত কোন স্থান এবং প্রত্যন্ত বা সীমান্তের বাইরে কোন স্থান? বুদ্ধ উত্তরে বলেছেন, হে উপালি, পূর্বদিকে পুন্ড্রবর্ধন নামক নগর এবং তার পূর্বদিকে পুন্ড্রক্ষো পর্বত অতঃপর প্রত্যন্ত।'[৪৫] 'পূর্বে নোপালী পুণ্ড্রবর্ধনং নাম নগরং তথ্য পূর্বেণ পুণ্ড্রকক্ষেৎ নাম পর্বতঃ ততঃ পরেণ প্রত্যন্ত')

মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে পুন্ড্রবর্ধনে বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মের বিরোধী ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছবগ্গীয় বা ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের কথা জানা যায়। উল্লেখ্য এই ষড়বর্গীয় সম্প্রদায় বুদ্ধের বিনয়শাসন স্বীকার করতেন না; তথাপি এই সময়ে পুন্ড্রবর্ধনে তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মৌর্যোত্তর যুগে পুন্ড্রবর্ধন জনপদের ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট। স্যার জন মার্শাল তাঁর Monument of Sanchi গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পুন্ড্রবর্ধন থেকে সাঁচীতে গিয়ে ধম্মদত্ত নামে এক মহিলা ভিক্ষুনী এবং ঈশানন্দন বা ইষিনন্দন নামের এক পুরুষ ভিক্ষু স্তূপের তোরণদ্বার নির্মাণের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করেছিলেন।[৪৬]

এই আমলে বিশেষ ভাবে পুণ্ড্রবর্ধনের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের আরো তথ্য পাওয়া যায়, তিব্বতী জনশ্রুতি এবং খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে নাগার্জুনীকোণ্ডায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে। তিব্বতী জনশ্রুতি মতে, নাগার্জুন এই সময়ে বাংলা এবং পুণ্ড্রবর্ধনে অনেকগুলি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। পুন্ড্রবর্ধনে শুঙ্গ আমলের মতো কুষাণ শাসনের তথ্যও অপ্রতুল। মহাস্থানে কনিষ্কের একটি সুবর্ণ মুদ্রা ছাড়াও কিছু মৃৎভান্ড ও মৃন্ময় মূর্তি উৎখননে পাওয়া গেছে।[৪৭] গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল (আঃ ৭৭৫-৮১০ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। পিতার ন্যায় ধর্মপালও পরমসৌগত অর্থাৎ বুদ্ধভক্ত ছিলেন, তাঁর উপাধি ছিল বিক্রমশীল। তিনি বিক্রমশীল বিহার এবং পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মচর্চার প্রাণকেন্দ্র সোমপুর বিহারকে

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার বলা হয়। এ বিহারে তিব্বত থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অধ্যয়ন করতে আসতেন বলে তারানাথ উল্লেখ করেছেন। ধর্মপাল নালন্দা মহাবিহারের সংস্কার ও সমৃদ্ধি এনেছিলেন। কথিত আছে মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র এই বিহারেই বসবাস করতেন। অতীশ দীপঙ্করও কিছু কাল এই বিহারে অবস্থা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে,দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মৌলিক ও অনূদিত সর্বমোট গ্রন্থ সংখ্যা ১৭৫টি।

উত্তরবঙ্গের অপর বৌদ্ধপীঠ জগদ্দল মহাবিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ছিলেন অবলোকতেশ্বর এবং অধিষ্টাত্রী দেবী ছিলেন মহাতারা। সোমপুর ও জগদ্দল বিহারে বসেই অতীশ দীপঙ্কর, পণ্ডিত শীলভদ্র, বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, অভয়াকর গুপ্ত, বোধিভদ্র, মোক্ষকর গুপ্ত, ধর্মাকর প্রমূখ আচার্য অনেকগুলো বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা ও তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের সোমপুর ও জগদ্দল বিহার ছাড়াও হলুদ বিহার, ভাসু বিহার এবং মহাস্থানের নিকট কয়েকটি বিহার অবস্থিত। সবগুলি বিহারই মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বৈপ্লবিক বিবর্তনের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। পালপর্বে বরেন্দ্র অঞ্চলে যেসব বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে তা মহাযান বজ্রযান তন্ত্রের।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের অসাধারণ অমূল্য অবদান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে 'বৌদ্ধ চর্যাপদ' বা 'বৌদ্ধ চর্যাগীতি' আবিষ্কার করে 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' নামে প্রকাশ করেন (১৯০৭ খ্রীঃ) এই বৌদ্ধ চর্যাপদ পাল আমলেই রচিত হয়েছিল। ভাষাবিদদের মতে বরেন্দ্র অঞ্চলের বারেন্দ্রী ভাষাই চর্যাপদের প্রাচীন ভাষা।[৪৮] চর্যাগীতির পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন সিদ্ধাচার্য কাহ্নপা। পণ্ডিতদের মতে, তিনি সোমপুর বিহারে বসেই দোহাকোষ ও তেরটি চর্যাগীতি ছাড়াও 'শ্রী হেবজ্র পঞ্জিকাযোগরত্নমালা' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও বিরুপা, লুইপা, বজ্রপা, শবরীপা, বীণাপা, সরহপা, জলন্ধরী (হাড়িপা), ধামপা, উধলীপা, অনঙ্গপা প্রভৃতির জন্মভূমি বা কর্মভূমি এবং সকলেই উত্তরবঙ্গের সোমপুর বিহারে, জগদ্দল মহাবিহার, বিহারৈল বিহার, দেবীকোট ও সীতাকোট বিহারের অধিবাসী ছিলেন।[৪৯] প্রাচীন চর্যাপদের ভাষালিপিকে অনেক পণ্ডিত নেওয়ারী বা নেপালী লিপি বলেছেন। কিন্তু শ্রী তারাপদ মুখোপাধ্যায় ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদের ভাষাই শুধু বাংলা নয়-তার লিপিও বাংলা।[৫০] বাংলা লিপির আদি জন্মভূমি উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে। বরেন্দ্র অঞ্চলের মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত একটি শিলালেখ (খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক)। শিলালেখটি প্রাচীন ব্রাহ্মী হরেফ উৎকীর্ণ। অনুমিত হয়, ব্রাহ্মী হরফের বিবর্তনেই বাংলা হরফের উদ্ভব।[৫১] উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতা, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যের দিক থেকে আজকের উত্তরবঙ্গের অনেকাংশে নিস্প্রভ, ধূসর এবং অজ্ঞাত বলে বিবেচিত হলেও আমরা যে, হিরন্ময় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সে কথা গবেষণার মাধ্যমে সার্বজনীনভাবে প্রকাশের দায়ভার গ্রহণের সময় এখনই। প্রাগৈতিহাসিক কালের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী অনেক উপাদান আজ আমাদের হাতের কাছে নেই। হিরন্ময় ঐতিহ্যের

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপকরণ খুজতে হয় ভিনদেশে চীন, জাপান, তিব্বত, নেপাল, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, মায়ানমার, কিংবা ইংল্যাণ্ডে। কালের বির্বতনে অনেক কিছুই আজ অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট।

প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাস ছিল বিস্তৃত ও ব্যাপক। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রাপ্ত বা বরেন্দ্র সম্পর্কিত শিলালিপি, তাম্রলিপি, স্তম্ভলেখ, সমসাময়িক উদ্বৃতি, পুঁথিপত্র এবং সমাজ বিবর্তনের নানা পর্যায়ে সংঘঠিত বিষয়াদি নিয়ে উত্তরবঙ্গের আদি বৌদ্ধদের আত্মপরিচয় সন্ধানের প্রচেষ্টা এবং সেই সাথে আমাদের শেকড় খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অভিপ্রেত। 'প্রাচীন বাংলার ব্যাকরণ প্রসিদ্ধি যাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞাও খ্যাতির উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে চান্দ ব্যাকরণ পদ্ধতির স্রষ্টা চন্দ্রগোমিন বা চন্দ্রগোমী অন্যতম। চান্দ ব্যাকরণ ও তার টীকা চন্দ্রগোমির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। সপ্তম শতক বা তার আগে চন্দ্রগোমী বা চন্দ্রগোমিন বিদ্যমান ছিলেন । বরেন্দ্র ছিল তাঁর জন্মস্থান।[৫২] চন্দ্রগোমী সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রিঃ) বৃহৎবঙ্গ থেকে ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ

'রাজশাহী জেলার ক্ষত্রিয় কূলে তার জন্ম '।

তিনি ব্যাকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সাহিত্য, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ও নানা কলায় পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক বজ্রযান সাধন সংক্রান্ত চবিশটি গ্রন্থ চন্দ্রগোমী রচনা করেন। তিনি কোন কারণে বরেন্দ্র ভূমি থেকে নির্বাসিত হয়ে চন্দ্রদ্বীপে যান এই দ্বীপ এখন তার নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ নামে খ্যাত হয়েছে।[৫৩] বাংলা সাহিত্যের আদিনিদর্শন চর্যাপদের সর্বাধিক সংখ্যক চর্যা লেখক কাহ্নুপাদ বাংলাদেশের বরেন্দ অঞ্চলের অধিবাসী। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, কাহ্নুপাদের জন্মস্থান ছিল সোমপুর। রাজশাহীর সোমপুর মহাবিহার ছিল তাঁর আজীন সাধনার পীঠস্থান।[৫৪] লামাতারানাথ (জন্ম ১৭৭৫ খ্রিঃ.) ও সুমফার সাক্ষ্য মতে, জেতারি নামে দু'জন বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন; উভয়েই বাঙালি। জ্যেষ্ঠ জেতারি বরেন্দ্র ভূমির সন্তান । তাঁর পিতা গর্ভপাদ জনৈক সামন্ত সনাতনের সভাসদ ছিলেন। জেতারি ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের আচার্য এবং শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষক। তাঁর লেখা অনেকগুলি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র ও সূত্রগ্রন্থ ছিল। দশম শতকের শেষ ভাগে জ্যেষ্ঠ জেতারি জীবিত ছিলেন।[৫৫]

রাজা রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারের দুজন স্বনামধন্য পণ্ডিত ছিলেন দানশীল ও বিভূতি চন্দ্র । বিভূতি চন্দ্র রাজপুত্র ছিলেন। কর্মভূমি জগদ্দল বিহার। তিনি একাধারে গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক ছিলেন। লুইপা ও অভয়াকর গুপ্তের কিছুগ্রন্থ অনুবাদ ও শান্তিদেবের রচিত বোধিচর্যাবততারের টীকা রচনা করেছিলেন বিভূতি চন্দ্র।[৫৬] ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের বারু ফকির নামে এক কৃষক জমি চাষ করার সময় মৌর্যযুগের যে শিলালিপি পেয়ে ছিলেন তা মহাস্থানগড়লিপি নামে পরিচিত। এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে

Dhaka University Institutional Repository

উৎকীর্ণ হয়েছে। ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ ছয় লাইনে বিস্তৃত অশোক অনুশাসন পত্রটির লিপিপাঠ।[৫৭] লিপিপাঠ নিম্নরূপঃ

নেন সবগীয়ানং গলদনস দুর্মদিন

মহামাতে সুলখিতে পুডনগলতে এতং নিবহিপয়িসতি।

সবগীয়ানং চ দিনে তথা ধানিয়ং নিবহিসতি।

দংগাতিয়ায়িকে দেবাতি য়ায়িকসি।

সুঅতিয়ায়িকাসিপি গংডকেহি ধানিয়িকেহি

এস কোঠাগালে কোসং ভরনীয়ে।[৫৮]

'এতদ্বারা সকল নাগরিকের কর গ্রহণকারী দুমদিন মহামাত্য সুরক্ষিত পুন্ড্রনগর থেকে এটি নির্বাহ করবেন। সকল দরিদ্রকে ধান দেয়া হল। তা দিয়ে অভাব দূর হবে। সুদিন এলে এই কোষাগারের কোষ যেন গণ্ডক মূদ্রা ও ধান দিয়ে পূরণ করা হয়।'

অভয়াকর গুপ্ত বিক্রমশীল বিহারের আচার্য ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ঝার খণ্ডের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে। মগধের বৌদ্ধ আচার্য শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের শিষ্য এবং রামপালের সমসাময়িক। শুভাকর কিছুকাল বরেন্দ্র অঞ্চলের জগদ্দল (নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানায়) বৌদ্ধ বিহারের অধিবাসী ছিলেন। কাপট্য বিহারের বাঙালি আচার্য প্রজ্ঞাবর্মন তন্ত্রশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে অনুবাদ ও টীকা রচনা করেছেন। তার গুরু বোধিভদ্র সোমপুর বিহারে বাস করতেন। বোধিভদ্র আট-দশটি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। জগদ্দল বিহারের আচার্য মোক্ষাকর গুপ্ত তর্কভাষা নামে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। দশম শতাব্দীর সিদ্ধাচার্য অদ্বয়বজ্র বা অবধুতীপা উত্তরবঙ্গের দেবীকোট বিহারে বাস করতেন। বজ্রযান বিষয়ে বহুগ্রন্থ রচনা করেন। পণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্রের একটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। তাঁর একুশটি রচনা অভয়ভদ্র সংগ্রহ নামে প্রকাশিত হয়।[৫৯]

উত্তরবঙ্গের গৌড়ের একাদশ শতাব্দীর গ্রন্থকার জ্ঞানশ্রী মিত্র। তিনি বিক্রমশীল বিহারের আচার্য ছিলেন। একদিকে শঙ্কর, ত্রিলোচন, বাচস্পতি, বিত্তোক প্রভৃতি হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রবিদ এবং অন্যদিকে বৌদ্ধাচার্য ধর্মোত্তরের (উদান বর্গের টীকা রচয়িতা) মত বিচার ও খণ্ডন করে তিনি নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কার্যকারণ ভাবসিদ্ধি। তিনি ধর্মকীর্তীর প্রমাণ বার্ত্তিকের ব্যাখ্যাকার ছিলেন।[৬০] উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ বিহারগুলির অবদান অপরিমেয়। বিশেষত অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশী শতাব্দী কাল সীমায় এ অঞ্চলের উজ্জ্বল স্থান ছিল বৌদ্ধ বিহারেরগুলি। দীর্ঘযুগ পরে আমরা অনেক বিহারের অস্তিতের সন্ধান পাইনা।[৬১]

কিছু কিছু বিহারের নাম থাকলেও অবস্থানের বিষয় জানা যায়না। তবুও বর্তমান বদলগাছি থানার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ধামইরহাট থানার জগদ্দল বিহার, বদলগাছির বিলাসবাড়ি ইউনিয়নের

Dhaka University Institutional Repository

হলুদ বিহার, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার সীতাকোট বিহার, বগুড়ার ভাসু বিহার, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার দেবীকোট বিহার এবং হারিয়ে যাওয়া অনেক বিহারে বৌদ্ধ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য- সংস্কৃতি, ধর্মনীতি এবং নানা শাস্ত্র কলার চর্চার সংবাদ আমরা পাই। আচার্য ও মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, কালপদ, জেতারি, অতীশ দীপঙ্কর, দানশীল, জ্ঞানশ্রী, বিভূতিচন্দ্র, শুভাকরগুপ্ত, বীর্যেন্দ্র ও আচার্য করুণা মিত্র, ধর্মকর কোন না কোন সময়, উত্তরবঙ্গের সুপ্রতিষ্ঠিত বিহারগুলোর আচার্য ও অধিবাসী ছিলেন।

বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাকর দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ । তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলের জগদ্দল বিহারের আচার্য ছিলেন।[৬২] তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতে প্রাণকেন্দ্র ছিল বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার জগদ্দল বিহার। এই বিহারে অবস্থান কালে বিদ্যাকর সুভাষিত রত্নকোষ নামে সংস্কৃত কবিতার একটি সংকলন করেছিলেন। একাদশ দ্বাদশ শতকের আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা ছিল সংকলনটির পাণ্ডুলিপি। সংকলনটিতে পঞ্চাশটি অধ্যায়ে মোট ১৭৩৮ টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

এতে কবির সংখ্যা ২৭৫ জন অধিকাংশ বাঙালি বৌদ্ধ। দ্বাদশ শতকে সেন আমলে এটি সংকলিত হয়েছে।[৬৩]

বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ ও সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে এ জনপদের অনন্য ভূমিকা স্বীকার্য। সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনেও এ অঞ্চলের স্বর্ণাভ অবদান স্মরণযোগ্য। উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিহার ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচনা করা সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল ব্যাপী উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও গৌরবগাথা এ অঞ্চলের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি বৈচিত্রতা দান করেছে। উত্তরবঙ্গে গৌরবোজ্জল বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাস সর্ম্পকে অনুসন্ধান ও গবেষণা অত্যাবশ্যক।

প্রাচীন কাল হতে বৌদ্ধদের সাহিত্যানুরাগ, ইতিহাস প্রীতি, অহিংসা, মানবতা ও শান্তি প্রিয়তা সর্বজন বিদিত। শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চা ও প্রসারে বৌদ্ধদের নানামুখী কালজয়ী অবদান ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধ ইতিহাস আজো রচিত হয়নি। বহু মুল্যবান তথ্য ও উপাদান কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ট পরিচয় মেলে না। বিভিন্ন ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বাঙালি বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী করার পরিকল্পনা করেন। আগে থেকেই মহাযানী বৌদ্ধদের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শে হিন্দুধর্ম বিরোধী উপাদান বহুলাংশে অনুপস্থিত ছিল বলে উত্তরবঙ্গের ব্যাপক সংখ্যাক বৌদ্ধদের স্বমতে আনার প্রক্রিয়ায় সেন আমলে এই পরিকল্পনার পক্ষে সহজতর হয়েছিল। সেনরা তান্ত্রিক মতের পোষকতা করতেন।[৬৪] দ্বাদশ শতকে বাঙালি হিন্দু শ্রীধর দাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কালে বরেন্দ্র অঞ্চল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সূতিকাগার ছিল। বরেন্দ্র প্রেক্ষিত আলোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করি যে, মৌর্য যুগে এখানে প্রাচ্য-মাগধী প্রাকৃত ভাষা বা মিশ্র প্রাকৃত ভাষা জনগণের বোধগম্য ছিল। গুপ্ত অধিকার কালে এ অঞ্চলে সংস্কৃতি ভাষার প্রচলন হয়। পাল আমলে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে স্থান লাভ করলেও তাতে মিশে গেছে নানা উপাদান। সেন আমলে পুনরুত্থান হয়েছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার। তবে পূর্ববর্তীকাল থেকে চলে আসা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত চর্চা ও ভাবধারা ছিন্ন হয়নি। রাজ দরবার এবং সাধারণ স্থানের চর্চার পাশাপাশি চলছে এ সময়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ, বর্জন, সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায় ভাষার নিত্য নতুন ধারা প্রযুক্ত হয়েছে।

পাল যুগের সাহিত্যের অনুসরণ পাল পরবর্তী সেন যুগেও ছিল সন্দেহ নেই। এর বহু প্রমাণ সাহিত্যকর্মে রয়েছে। কিন্তু সেন যুগের পর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা প্রায় নিঃশোষিত হয়ে গিয়েছিল বরেন্দ্র অঞ্চলে। তুর্কি আক্রমণের ফলে সহজ মতাবলম্বী বৌদ্ধদের এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের মতাদর্শের মিলন ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এসময় সুফিবাদের প্রভাব সমন্বিত হয়ে সাহিত্যে গুণগত মৌলিক পরিবর্তন সাধন হয়েছিল।

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দীতে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা স্তিমিত হয়ে যায়। পাল আমলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য চর্যাভাষা ততদিনে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতার কারণে অনুপযুক্ত বলে পরিগণিত হয়ে যায়। (প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য, প্রাচীনযুগ, সমর পাল, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৯৭) সেনরাজাদের রাজধানী ছিল এই উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমিতেই। রাজশাহী জেলার গোদাবাড়ি থানার পদ্মাতীরে বিজয়নগরই সেন রাজধানী বিজয়পুর।[৬৫]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম এবং চর্যাগীতির সর্বাধিক সংখ্যক চর্যা লেখক কাহ্নপা ধর্মপালদেবের রাজত্ব কালে নির্মিত (৭৭০-৮১০) সোমপুর বিহারে অবস্থান করতেন। .... পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সিল মোহরে উক্ত আছে;

শ্রী সোমপুর শ্রী ধর্মপালদেব মহাবিহারীযার্চ ভিক্ষু সংখ্যা'।[৬৬] এই ঐতিহাসিক সূত্রে বলা চলে নওগাঁস্থ পাহাড়পুর বিহারে বসেই কানুপা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, চযাশ্চর্য বিনিশ্চরে কানুপা, কৃষ্ণপাদ সোমপুর বিহারে অবস্থান করতেন। সোমপুর অধিবাসী কাহ্নপা সর্বাধিক সংখ্যক (১২টি) চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের কয়েকটি পদ এই উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলে রচিত।[৬৭]

চর্যাকাররা অন্ত্যজ লোকায়ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, বাগদি, কিরাত প্রভৃতি জাতি ছিল উত্তরবঙ্গের আদিম বাসিন্দা। ইতিহাসে এরাই অনার্য নামে পরিচিত।[৬৮] পাল চন্দ্র পর্বে বাংলার লোকভাষা ছিল মাগধী অপভ্রংশের গৌড় বঙ্গীয় রূপ। বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধাচার্যগণ লোকায়ত ভাষায় ধর্মের মর্মবাণী সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করতেন। এ জন্য তাঁরা মাগধী (পালি) ও শৌরসেনী অপভ্রংশ ব্যবহার করতেন। ক্রমান্বয়ে মাগধী ভাষা যা কাল প্রবাহে বাংলা ভাষায় রূপলাভ করে তার মাধ্যমে বৌদ্ধা চর্যাগণ ধর্মপ্রচার করতেন। কিন্তু সূক্ষ ও গভীর তত্ত্ব এই ভাষায় প্রকাশ করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। সে জন্য ঐ কালে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় বিদ্যসমাজ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন।[৬৯]

বাংলার প্রাচীন জনপদ ও বৌদ্ধ বিহার গুলো ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন চর্চার মূল কেন্দ্র। তৎকালীন নালন্দা ও বিক্রমশীলার জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার প্রভাব বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে ছিল এবং এ অঞ্চলের বৌদ্ধ অধিবাসীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন,'নালন্দা মহাবিহারের সঙ্গে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে বাংলাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং বাঙালার শিক্ষার্থী আচার্য ও রাজবংশ নালন্দা মহাবিহারের সংবধর্নের জন্য যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মতো নয়।[৭০]

পূর্বে বলা হয়েছে বিক্রমশীলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা ধর্মপাল, এবং বাঙালি শীল ভদ্র ছিলেন নালন্দার মহাচার্য এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য। আলোক সামান্য প্রতিভার অধিকারী এই সকল পন্ডিত যাঁদের খ্যাতি মহাকালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে আজো দেদীপ্যমান তাঁরা ছাড়া একালের আরো কয়েকজন বিদ্বান ব্যাক্তি হলেন ব্যাকরণ বিশারদ চন্দ্রগোমী তিনি অতি প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে ব্যাকরণ চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে। যাঁদের অবদানের জন্য বাংলাদেশের এই সুখ্যাতি চন্দ্রগোমীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এককালে কাশ্মির, নেপাল, তিব্বত ও সিংহলে এই ব্যাকরণ ব্যবহার করা হতো। চন্দ্রগোমী ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁর জন্মস্থান বরেন্দ্রী। ব্যাকরণ ছাড়াও তিনি সাহিত্য, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা এবং নানা কলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

দর্শন শাস্ত্র চর্চায় উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত পণ্ডিত গৌড়পদ অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন।

পুন্ড্রবর্ধনে রসায়নচর্যা নাগার্জুন (তিনি ১ম খ্রিষ্টাব্দের শূন্যবাদী নার্গাজুন নন) রসায়ন ও ধাতুর ওপর গবেষণা করে অসামান্য খ্যাতি অজর্ন করেছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাসের খ্যাতিমান বৌদ্ধ আচার্য জেতারী। তিনি ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের একজন খ্যাতনামা আচার্য ও শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের গুরু। তিনি দশ শতকের শেষার্ধে জীবিত ছিলেন; তাঁর বাসস্থান ছিল বরেন্দ্রভূমি।[৭১]

ইতিহাস ও ঐতিহ্য মতে, উত্তরবঙ্গের পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র ও গৌড় ছিল বৌদ্ধ প্রধান প্রাচীন জনপদ। এ অঞ্চলের বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামে আবাসিক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল যেগুলিতে আচার্য ও ভিক্ষু শ্রমণ উভয়ের সমবেত কর্মকান্ড ও পারস্পারিক সহযোগিতায় ধর্ম, দর্শন , সাহিত্য ও জ্ঞান-

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানের চর্চা পরিচালিত হতো। প্রাচীন কালে বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে একালে বিদ্যাচর্চা অনেকটা ব্যাক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল গুরুগৃহ।

বরেন্দ্রভূমির শিক্ষা-দীক্ষায় যে বিবরণ দেওয়া হলো তা অবশ্যই খন্ডিত, অসম্পূর্ণ এবং নানা ক্রটিতে পরিপূর্ণ। তবু আশা করি পাঠক সমাজের অনুধাবন করতে অসুবিধে হবে না যে, প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে চর্চায় সুদৃঢ় অতীত থেকে একাল অবধি এক অতি উজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী।

বরেন্দ্র বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন ভূখন্ডের নাম। স্থানীয় বাসিন্দারা একে বলে 'বারিন্দ'। পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমে মহানন্দা এবং দক্ষিণে পদ্ম নদী অবস্থিত।[৭২] গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী উচ্চ ভূমি প্রচীন কালে বরেন্দ্রনামে পরিচিত ছিল। বর্তমান উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চল। বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন কীর্তি গুলো আজো বাংলার গৌরবময় অতীতের অমূল্য নিদর্শন। খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক শতাব্দীর ঐতিহ্য ধারন করে আছে বৌদ্ধ সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন। যেমন-মহাস্থানগড়, বাসুবিহার, দিনাজপুরের সীতাকোট বিহার, নাওগাঁর ঐতিহাসিক পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, জগদ্দল মহাবিহার অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলের বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কীর্তি নিদর্শন আজো প্রতিনিয়ত আমাদের অতীতমুখী করে। "পূর্ব ভারতে যে দু'টি স্থানে ভাস্কর্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তার একটি মগধ অপরটি বরেন্দ্র নামে পরিচিত বাংলার প্রাচীন এক জনপদ। পূর্বী শিল্পধারার অন্যতম কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্রভূমির ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবিষ্কৃত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাক-পাল সময়কালে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ এবং গুপ্ত আমলেও এখানে ধ্রুপদী শিল্পকলার চর্চা হতো।[৭৩]

বরেন্দ্র অঞ্চলের কীর্তিগৌরব বিকাশতা শিল্প, ভাস্কর্য ও স্বকীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতকের পাল আমলে। বহুমাত্রিক কারণে বৌদ্ধ পালযুগে বরেন্দ্র অঞ্চলের উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও প্রসারতা লাভ করে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে গড়ে উঠা এই ভাস্কর্য শিল্পকলার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ধর্মপ্রচারোদ্দেশ্য উত্তরখন্ডে আসা তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ রচিত 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার' গ্রন্থে। লামা তারানাথ, বরেন্দ্রর দুই যশস্বী শিল্পী ধীমান এবং তাঁর পুত্র বীতপালের উল্লেখ করে লিখেছেন, এই পিতা-পুত্র তক্ষণ শিল্প, ধাতব শিল্প এবং চিত্রকলায় একটি বিশিষ্ট শিল্পগোষ্ঠির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।..... ঐ সময়ের সামগ্রিক শিল্পকলা সম্পর্কেই বলা হয় যে, শিল্পকর্মের সবটাই ছিল ধর্মাশ্রিত, ভাব কল্পনায় সংস্কৃত, অভিজাত ও উচ্চাকোটির পর্যায়ের। বরেন্দ্রভূমিতে[৭৪] নির্মিত বুদ্ধমূর্তি ও বিভিন্ন দেবদেবীর বিপুল সংখ্যক ভাস্কর্য সর্ম্পকে বলা হয়, এগুলি বঙ্গীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক নতুন প্রাণময়তা, কমনীয়তা, সজীবতা ও প্রাগাঢ় সংবেদনশীলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভাস্কর্য গুলির গঠনরীতি, অভিব্যক্তি, ভাবকল্পনা এবং কাঠামোগত বিন্যাসেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য।[৭৫] ভাস্কর্য শিল্পের এই যে প্রভাব,

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষভাবে তা ধরা পড়ে এখানকপার পোড়ামাটির ফলকে এবং সোমপুর (পাহাড়পুর) বিহারে রচিত কয়েকজন বৌদ্ধচার্যের চর্যাগানে।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের উত্তর বাংলায় সব ভূমিদানই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদেরই উদ্দেশ্যে। উত্তর বাংলায় ভূমি আদান প্রদানের সর্বমোট ২০টি তাম্রশাসনের (পঞ্চম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভূমিদান অংশ বিশ্লেষণ করলে তিনটি সিদ্ধান্ত করা সম্ভব: ১) একটি ছাড়া অন্য সবকয়টি তাম্রশাসনে ভূমিদান করা হয়েছে ব্রাহ্মণদের; এবং একটি (৪৭৮-৭৯) খ্রিস্টাব্দে বুধগুপ্তের পাহাড়পুর তাম্রশাসন শাসনে ভূমিদান করা হয়েছে জৈন অর্হতদের জন্য; ২) প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই খুব বেশী নয়; ৩) দেব-দেবীর মন্দির, রক্ষণাবেক্ষণ বা পূজাপার্বণ্য করার সুযোগ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই ভূমিদান।[৭৬]

গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত সময়ে তাম্রশাসনসমূহ বিশ্লেষণ করে ব্যারি মরিসন সমগ্র বাংলায় চারটি আঞ্চলিক সত্তার বিকাশের কথা বলেছেন, ভাগিরথী-হুগলী অঞ্চল (পশ্চিম বাংলা), বরেন্দ্র (উত্তরবাংলা), মধ্যবাংলা (গঙ্গা-মেঘনা), ও সমতট (মেঘনা পূর্ববর্তী এলাকা)। প্রত্যেকটি সত্তারই রাজনৈতিক কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রধান ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। গুপ্তযুগের এই কেন্দ্রের বিকাশই দিয়েছিল এই অঞ্চলের প্রশাসনিক এককের নাম-পুণ্ড্রবর্ধনভূক্তি। এই ভূক্তির অধীনে ছিল আরো দুটি কেন্দ্র, কোটিবর্ষ ও পঞ্চনগরী।[৭৭]

সম্রাট অশোকে শিলালিপিতে কয়েকটি বহু পূর্ববর্তী প্রদেশের অধিবাসী বৃন্দের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে পরিংদগণ অন্যতম, ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রাচীন বরেন্দ্র নামটি মৌর্যকালে মৌর্য সম্রাট অশোকের (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) শিলালিপির পরিংদ শব্দ থেকে পরবর্তীতে বরেন্দ্র নামের উদ্ভব। পণ্ডিতদের মতে, পরিংদ নামটি বরিনদ>বরিন্দ্র> বরেন্দ্র নামেরই নামান্তর।[৭৮] কারো কারো মতে, বারেন্দ্রী থেকে বরেন্দ্র কথাটির উৎপত্তি। মূলত সেনরাজাদের আমলে বরেন্দ্র দেশ নামে পরিচিত হয়। পাল যুগের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দশম শতাব্দীর দিকে বরেন্দ্র নামক জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকের পাল রাজ কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য গ্রন্থে প্রশস্তি আছে,

বসুধা শিরো বরেন্দ্রী মণ্ডল চুড়ামণির কুল স্থানম।

শ্রী পৌন্ড্রবর্ধন পুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্য ভব্বৃহতব্বটু।[৭৯] অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্ধন পুরের নিকটবর্তী বৃহব্বটু নামক পুণ্যভূমিতে কবির নিবাস, এ স্থান ধরণীর শ্রেষ্ঠ (শির) বরেন্দ্র মণ্ডলের চূড়ামণি।[৮০] আবার দক্ষিণে গঙ্গা আর পূর্বে করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকেই বরেন্দী নামে অভিহিত করা হয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে বরেন্দ্র এবং বর্তমান রাজশাহী বিভাগের পরিধি প্রায় অভিন্ন।[৮১] প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তার বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রীর 'ত্রিকান্তশেষ' অভিধানে বরেন্দ্রী ও পুন্ড্র অভিন্ন বলা হয়েছে। মিনহাজের তাবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে 'বারিন্দ্র (বরেন্দ্র) বলে লক্ষ্মৌতি রাজ্যের গঙ্গা পূর্ববর্তী এলাকাকেই নির্দেশ করা

হয়েছে।'[৮২] নীহার রঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) বলেন, ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি দক্ষিণী লিপিতে 'বরেন্দ্র দ্যুতি কারিণ' ও গৌড় চূড়ামণি নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদ্যদেবের কমৌলিপি, সিলিমপুর শিনালিপি, তপনদিঘি অভিলেখমালা[৮৩] এবং মাধাই নগর পট্টোলিতে বরেন্দ্রী পুন্ড্রবর্ধনভূমির অন্তর্গত ছিল। বর্তমান দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা প্রাচীন বরেন্দ্রী অঞ্চল।[৮৪]

পাল-সেন নৃপতির তাম্রলিপি সমূহ এবং মিনহাজের বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, সে সময়ে উত্তরবাংলা বরিন্দ্র অর্থাৎ বরেন্দ্র নাম খুবই সুপরিচিত ছিল। বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতায় পুন্ড্রদের পূর্বদেশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুন্ড্রজাতির আবাসস্থলই পুন্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মীশিলালিপিতে উল্লেখিত 'পুডনগল' (পুন্ড্রনগর) ও বগুড়ার মহাস্থান যে অভিন্ন এবং পুন্ড্রনগর যে পুন্ডদের আবাসস্থল পুন্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।[৮৫] খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকে প্রাচীন জনপদের কেন্দ্র ভূমিতে করতোয়া নদীর তীরে গড়ে উঠে পুন্ড্রনগর সভ্যতার কেন্দ্র। পুন্ড্রনগরকে কেন্দ্র করে উত্তরবাংলা মৌর্য শাসনভূক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে আর বিভিন্ন তাম্রলিপিতে এ অঞ্চল সেন গুপ্ত শাসনের অধীনে ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। গুপ্তপরবর্তী যুগে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক উত্তর ও পশ্চিম বাংলা এবং মগধকে কেন্দ্র করে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণ। ইতিহাস মতে ৭৩৯ অব্দে প্রাচীন গৌড়ের রাজধানী স্থাপিত হয়।[৮৬] 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের অধিবাসীদের অসুর বুলি ভাষা-ভাষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোল-মণ্ডা গোষ্ঠির অন্যতম প্রধান ভাষা অসুর বুলি। পুন্ড বা পৌন্ড্র শব্দটি অস্ট্রিক ভাষার দান হলে পুন্ড্রদেশের পুণ্ড্র জাতির প্রাচীনতা আসুর ছ' হাজার বছরের অধিক।

উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ গৌড় লক্ষ্মণাবর্তী এবং সে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলসহ সমগ্র অবিভক্ত বাঙ্গলার অধিপতি ছিলেন সেন বংশীর নৃপতি মহারাজা লক্ষ্মণ সেন। তিনি ১২০৪ কি ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সমরনায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কর্তৃক পরাজিত হয়ে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে বঙ্গে পলায়ন করেন এবং ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে মীনহাজ-ই-সিরাজ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে বলেন যে, গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল 'রাল' (রাঢ়) নামে পরিচিত ছিল এবং সে অঞ্চলেই ছিল লাখনোর নামক শহর এবং নদীর পূর্ববর্তী অঞ্চলে ছিল বরিন্দ্র বা বরেন্দ্র (বর্তমানে উত্তরবঙ্গ) নামক দেশ এবং সেখানে ছিল দেবীকোর্ট (অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার কোটিবর্ষ বা বাণগড়) নামক প্রাচীন নগর। সন্ধ্যাকরনন্দী বাসচরিত্র কাব্যে পালরাজাদের 'জনকভূ' বরেন্দ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এর দক্ষিণে ছিল গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া এবং পুণ্ড্রবর্ধনপুর ছিল বরন্দ্রের প্রধান নগর।[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

'পুণ্ড্র' শব্দটির উৎপত্তি ও অর্থের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই ভূ-ভাগের অতীত জনমানব এবং তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে (৪র্থ খ্রি. পূর্ব) পুন্ড্র নামক একটি জাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রাচীন বিবরণী মতে, পুন্ড্র নামক একটি বৃহৎ জাতি বা জনগোষ্ঠি বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করতো। আর. সি. মজুমদার বলেন, 'এরা প্রথমে একটি বড় জাতিগোষ্ঠী বা উপজাতি সমাজ হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে তারা একটি জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই পুন্ড্রজাতি প্রাচীন নানা গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।'

অনেকের মতে, পোদ জাতিগোষ্ঠীর নাম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পোদ>পুঁড়া>পৌন্ড্র>পুন্ড্র নাম। প্রাচীন শাস্ত্র ও পুঁথিপত্রে পুন্ড্র শব্দটি পুন্ড্রা, পৌন্ড্র, পৌন্ড্রিক, পৌন্ড্রিকা প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছে। পুন্ড্র নামক জনগোষ্ঠির বসতভূমি হিসেবে এই অঞ্চলের নাম হয় পুন্ড্রদেশ, পুন্ড্রবর্ধন, পুন্ড্রবর্ধনপুর, পোংডাবর্ধনীয়া, পুন্দনগর, পোদদের দেশ ইত্যাদি। বাংলাদেশের মানচিত্রে একটি কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য রয়েছে, আর তা হল চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল, ময়নামতির লালমাই অঞ্চল, মধুপুর গড় এবং বরেন্দ্রভূমি মোটামুটি একটি কৌণিক রেখায় অবস্থিত।

বাংলাদেশের উত্তরবেঙ্গর বরেন্দ্র অঞ্চল অতীতে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন মানচিত্রে বাংলার উত্তরবঙ্গের (বরেন্দ্র অঞ্চল) সঠিক অবস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ মুক্ত নন। গ্যাসস্টালডির (Gostaldi,১৫৬১) ও স্যানসনভি অ্যাবিভিল (Sonsond Abdeville, ১৬৬২) এর মানচিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গৌড় এর পূর্ব দিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের অবস্থান ছিল। পরবর্তীতে বোল্টস (Bolts) বাংলার ভৌগোলিক নদ-নদীর মানচিত্র প্রণয়ন করেন। ষোল শতকের পূর্বে যে সকল মানচিত্র পাওয়া যায়, তা সাধারণত পরিব্রাজক ও নাবিকদের তৈরিকৃত, যা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ এবং ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। বাংলার প্রথম মানচিত্র প্রণেতা ইংরেজ প্রকৌ. মেজর জেমস রেণেল। এরপর বুকানন হ্যামিল্টন এ মানচিত্র অনুসরণ করে বাংলার ভৌগোলিক দিক নির্ণয় করেন। পরবর্তী ১৮৬৩ সনে জেমস ফারগুসন (James Fergusson) নদ-নদীর একটি মানচিত্র তৈরি করেন।[৮৮] কালের বিবর্তনে নানা ভৌগোলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র অঞ্চল। পদ্মানদীর নিকটবর্তী বঙ্গের একটি প্রদেশভূমির নাম বরেন্দ্র ভূমি। বরেন্দ্র ভূমির রাজধানী ছিল 'গৌড়'।[৮৯]

ওরাঁওদের জীবন বা সমাজ ব্যবস্থা মূলত কৃষি ও প্রকৃতি নির্ভর, ওরাঁওদের জনগোষ্ঠির অধিকাংশ জনগণ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষি কাজই তাদের প্রধান পেশা। ওরাঁও পুরুষ ও মহিলা উভয়েই কর্মঠ ও পরিশ্রমী। আদিবাসী ওরাঁওদের জীবনে রয়েছে নানা উৎসব অনুষ্ঠান। চৈত্রমাসে সারাহুল উৎসব, ফাল্গুণ মাসে ফাগুয়া উৎসব, কার্তিক মাসে পশু উৎসব, অগ্রহায়ণ মাসে খারিয়ানী উৎসব, বৈশাখ মাসে নবান্ন উৎসব ভাদ্র মাসে কারাম উৎসব পালন করা হয়। কারাম ওরাঁওদের

Dhaka University Institutional Repository

সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। আদিবাসীরা স্বদেশজাত সন্তান। তবে ড.মুহাম্মদ আব্দুল জলিল বলেন, ওরাঁওরা বাংলাদেশের ভূমিজ সন্তান নয়।

৮.৪ ওরাঁওদের আদিনিবাস এবং ক্রমবিবর্তন ধারা

ওরাঁওদের আদিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, কেউ কেউ মনে করে দাক্ষিণাত্য থেকে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পি. দেকান, কর্ণেল ডাল্টন, ড. গ্রীগ নার্ড এবং ড. রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায় প্রমুখ বলেছেন, 'ওরাঁওদের আদিবাস দক্ষিণ ভারতের নর্দান (ডিকানে কংকা নদীর তীর) নদীর উপকূলে কর্ণাট প্রদেশ ছিল।' পরে কর্ণাট থেকে রোহিতাসগড়ে বসতিস্থাপন করে।[৯০] প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, হাঙ্গেরিয়া, মেসোপটোমিয়া এবং তার নিকটবর্তী স্থান হতে চেরো ও খেরোয়ার জাতির লোক উত্তর পশ্চিম দিকে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে। ইতিহাসে তারাই আর্য জাতি নামে পরিচিত।

আর্যগণ একের পর এক রোহিতাসগড় আক্রমন করে উরাঁওদের রোহিতাসগড় দূর্গ দখল করে। আর্যদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উরাঁওদের এক অংশ পালিয়ে গঙ্গা নদীর তীরে সান্তাল পরগণা; ভাগলপুর এবং পুরিয়ার নিকটবর্তী রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে বসতি স্থাপন করে। তারা মালের মালটং বা মালাপাহাড়িয় নামে আখ্যায়িত হয়। তাদের বড় অংশ রুকি এবং সরো গিরিপথ দিয়ে পালিয়ে ছোট নাগপুর আসে এবং মুণ্ডা জাতির সাথে বসতি স্থাপন করে।

ভারতের ছোট নাগপুর, উড়িষ্যা, রাজমহল প্রভৃতি স্থান হতে ওরাঁওগণ কখন এদেশে বসতিস্থাপন করে তার সঠিকভাবে বলা কঠিন। এ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদগণও প্রমাণিক কোন তথ্য ও সন তারিখ নির্ধারণ করতে পারেনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওরাঁওদের বাস। ১৮৭১ এবং ১৮৯১ সালের ভারতীয় আদমশুমারীতে বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলায় তাদের সংখ্যা সর্বাধিক। ওরাঁওরা স্মরণাতীতকাল থেকেই কৃষিজীবি। মহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পার যে কৃষি সভ্যতা অনুরূপভাবে এখানেও কুড়ুখ বা ওরাঁও লোকদের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ওরাঁওদের প্রধান ও অন্যতম ভিত্তি হলো কৃষিকাজ। তাদের সরলতা, দারিদ্রতা ও অশিক্ষার কারণে কৃষি জমি আত্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে এবং কৃষি নির্ভর ওরাঁওরা ক্রমশঃ ভূমিহীন হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ওরাঁওরা অত্যন্ত নিরীহ, সরল, পরিশ্রমী, সংগীতপ্রিয় ও সংস্কৃতির অনুরাগী। ওরাঁওদের প্রাচীন আদিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বৃহৎ জনসমাজের সাথে এখনো প্রবল। ওরাঁওরা দলবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ ভাবে থাকতে ভালবাসে। আদিবাসীরা বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বাংলাদেশে আদিবাসী ওরাঁও ২০টি গোত্রে বিভক্ত। যথা- টপ্য, তিরকী, মিনজী, তিগ্যা, কুজুর, লাকড়া, কিসপট্টা, এক্কা, বারা, কেরকেটা ইত্যাদি। এরা আবার বহু উপগোত্রে বিভক্ত।[৯১]

৮.৫ উত্তরবঙ্গের অন্তজ্য জাতিগোষ্ঠী

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে উত্তরবঙ্গে কখনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ও সম্প্রদায়িক উপলক্ষে একের পর এক বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর স্রোতধারা এসে পৌঁছেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এভাবে সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে নানা আদিম জাতি, উপজাতি, বর্ণশ্রেণী ও বিচিত্র নরগোষ্ঠির মানুষের সংমিশ্রণে গড়া উত্তরবঙ্গের চিরায়ত সমাজ ও সংস্কৃতি। উত্তরবঙ্গের জাতিতাত্ত্বিক গঠন ও প্রকৃতি সর্ব প্রথম প্রভাবিত ও রূপান্তরিক করেছে আর্যকরণ তথা বৈদিকীকরণ (Aryanization) প্রক্রিয়া। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর দিকে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। 'প্রকৃত পক্ষে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের সন্নিহিত জনপদসমূহ রাঢ়, কর্ণসুবর্ণ, কোটিবর্ষ, পুন্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলে লোকসমাজে বৈদিক ভাবধারা যতটুকু গৃহীত ও চর্চিত হতে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি জনমানসে স্থান করে নিয়েছিল জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস। লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদিঘিও সিলিমপুর প্রস্তরলিপি[৯২] সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত্র' কাব্যে বরেন্দ্রকে পাল রাজাদের জনকভূ বা পিতৃভূমি বলে আখ্যায়িত করেছেন। (রামচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দী, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯৩৯, পৃষ্ঠা-৩০) খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দী[৯৩] অথবা দশম শতাব্দী হতে বরেন্দ্র নামের সন্ধান পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গে বর্তমানে জনসমষ্টিকে দুটি ভাবে বিভক্ত করা যায়। একটি হলো হিন্দু-মুসলিম অধিবাসী এবং অপরটি হলো আদিবাসী। আদিবাসী জনগোষ্ঠী বলতে তাদেরকেই বোঝায় যারা প্রাচীন কাল হতে তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমিতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছে এবং যারা নিজেদের সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষায় রক্ষণশীল, যাদের নিজস্ব ভাষা, আচার-আচরণ, আলাদা দৈহিক গঠনসহ অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও সত্তা রয়েছে যা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে প্রভূত সহায়তা করে থাকে।

উত্তরবঙ্গে বর্তমানে সাঁওতাল, ওরাঁও, পাহাড়িয়া, মাহাতো, পাহান ও মাহালি আদিবাসী উল্লেখযোগ্য। W.W. Hunter তাঁর A Statistical Account of Bengal গ্রন্থে বলেছেন ব্রিটিশ প্রশাসনে

Dhaka University Institutional Repository

শেষের দিকে বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। তারপর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়া, ১৯৪৮ সালে নাচোল বিদ্রোহ, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক আদিবাসী স্থানান্তরিত ও ধর্মান্তরিত হয়। বর্তমানে আদিবাসীদের মধ্যে ওঁরাও গোত্রের সংখ্যাধিক আদিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এরা উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া ও রাজমহলে এখনো সংখ্যাধিক্য।

নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞানুসারে ওরাঁওদের প্রাক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত বলে অভিহিত করা হয়। কেননা এদের চেহারা কালো, নাক খ্যাঁদা ও চ্যাপ্টা, চুল প্রায় কোঁকড়ানো ও কালো, মাথারখুলি, গোলাকৃতি ও দৈহিক উচ্চতা মাঝারি। অনেকে আবার এদেরকে অস্টো-মঙ্গোলির বা প্রাচীন পোদ জনগোষ্ঠীর বংশধর মনে করেন। গ্রিয়ারসন এদেরকে মুণ্ডাদের অন্যতম শাখা বলে উল্লেখ করেছেন।[৯৪] আদিবাসী তথা উপজাতির সংস্কৃতি পুরামাত্রায় রক্ষণশীল ও সনাতনপন্থী। আদিবাসী ওরাঁও সম্প্রাদায় বিশটি গোত্রে বা টোটেমে বিভক্ত ঃ বান্ডো, বাড়া, বাঁড়োয়া, বাকলা, বেক, কেরকেটা, কিণ্ডু (বিণ্ডো), কিসপট্টা, কুজুর, এক্কা, তিগ্যা, তিরকী টপ্য, মিনজী, খাখা, খালকো, খেস, পান্না, লাকড়া, কিরপুতা ও গেঁধিয়ার প্রতিটি গোত্রের নামকরণ হয়েছে পশু, পাখি, মাছ, গাছপালা অথবা কোন বস্তুর নামানুসারে। কারো কারো মতে, ওরাঁওদের গোত্র সংখ্যা প্রায় ৪০টির অধিক।

আদিবাসী (ওরাঁও, পাহান) বৌদ্ধদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। কেননা আদমশুমারীর সময় নামের দিক থেকে অনেকেই আদিবাসীদেরকে হিন্দু ও প্রকৃতি পূজারী মনে করে গণনা করে থাকে। কিন্তু একটি গবেষণার ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে আদিবাসীদের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভিত্তিক একটি পরিসংখ্যানে আদিবাসী (ওরাঁও সংখ্যা ৭৫,০০০ (২৮.২%) মাহালি আদিবাসী ১৫,০০০ (৫.৭) পাহাড়িয়া ১০,৯১৬ (৪.১) সাওতাল ১,৬৫,০০০(৬২.০)। (উৎসঃ সংস্কৃতি প্রত্যয়, আদিবাসী, ১৯৯৫)

সহস্র বছর ধরে আদিবাসীরা এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে অন্যান্য প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর মতো এদের শেকড় অনেক গভীরে। তাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত স্বতন্ত্র জীবনপ্রণালী। ক্রমান্বয়ে আদিবাসী ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, জীবনবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে। আদিবাসী স্বদেশ জাত সন্তান। আদিবাসী শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আদিকাল থেকে বসবাসকারী। আদিবাসী শব্দটি সংস্কৃতজাত। আদি অর্থ মূল এবং বাসী অর্থ হলো অধিবাসী। এ দুয়ে সমন্বয়ে আদিবাসী। কারো কারো মতে আদিবাসী মানে আর্য বা সভ্য জাতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে যে সকল জনগোষ্ঠি আদিকাল থেকে বসবাস করে আসছে এবং আজও প্রাচীন মানুষের বংশধরা বহন করে চলছে ও তাদের স্বতন্ত্র সৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, আচার অনুষ্ঠান এখনো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তাদেরকেই আদিবাসী বলা হয়। ৭০ টি দেশে ৩৭ কোটি আদিবাসী রয়েছে। বাংলাদেশে মোট ৪৫টি, অন্য মতে ৩২টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান। উত্তরবঙ্গের ওরাঁও আদিবাসী অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

ওরাঁওদের নিবাস প্রধানত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে সীমিত। দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া, চাপাই নবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, বর্তমান উত্তরবঙ্গের ১২ টি জেলা। এছাড়া সিলেটের হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার এবং গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে ওরাঁওদের বসবাস। এসব অঞ্চলে ওরাঁওরা মূলত বিভিন্ন গোত্র পরিচয় ভেদে বসবাস করছে। এ গোত্রের শিরোনামগুলি সাধারণ পশু পাখি বা প্রকৃতির নামে। যেমনঃ কুজুর (এক জাতীয় লতা বৃক্ষ) এক্কা (এক প্রকার কচ্ছপ) মিনজী (এক ধরনের মাছ নাম), লাকড়া (বাঘ, একটি জন্তুর নাম), তিগ্যা (এক প্রজাতির বানর), বাড়োয়া (বন্য কুকুর), টপ্য (এক প্রকার পাখি), তিরকী (বাচ্চা ইদুর), খালকো (এক প্রকার মাছ)।[৯৪] উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন আধিবাসীদের আচার অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-অর্চনায় সমাজে এখনো প্রচলিত আছে।

ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিবাহ, পরিবার, আচার, আচরণ, মূল্যবোধ, পূজা পার্বণ ও উৎসব আদিবাসীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান দিক। আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও বাংলা ভাষায় কথা বলে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, সাঁওতালরা সাওতালি ভাষা এবং মুণ্ডাভাষী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। ওরাঁওরা কুড়ুখ ও সাদরী ভাষা ব্যবহার করলেও দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠির লোক, পাহাড়িয়ারা সাধারণত পাহাড়িয়া ভাষা এবং অস্ট্রো-এশীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোক। মাহালিরা মুণ্ডা ভাষাভাষী এবং আদি অস্ট্রোলয়েড জনগোষ্ঠীর লোক।

৮.৬ প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়: ওরাঁও

নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুসারে এদেরকে প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিহিত করা যায়। কেননা এদের চেহারা কালো, নাক খ্যাঁদা ও চ্যাপ্টা, চুল প্রায়শ কোকড়ানো, মাথার খুলি গোলাকৃতি এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরণের। এসব লক্ষ্য করেই স্যার রিজলী উল্লেখ করেছেন, No signs of Mongolian affinities can be detected in the relative positions of the nasal and malar bonex, and average naso-malar index for a hundred Oraons measured on the system recommended by Mr. Oldfield Thomas omes to 113.6.

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদদের মতে, ওরাঁও আদিবাসীরা আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Austroloid) গোষ্ঠিভূক্ত বলে অভিহিত করেছেন। শ্রী পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'আদিবাসী ওরাঁও সম্প্রদায় দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত।'[৯৫] ওরাঁওরা মূলত কোন জাতির অন্তর্ভূক্ত তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। ড. গ্রীয়ারসন এদেরকে মুণ্ডাদের অন্যতম শাখা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, ওরাঁওরা

Dhaka University Institutional Repository

রাজমহল বা উড়িষ্যার মালপাহাড়িয়াদের অন্তর্ভূক্ত জাতি।' নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা ওরাঁওরা প্রাক-দ্রাবিড়ীর গোষ্ঠির লোক এদের দৈহিক গঠন তার যথার্থ প্রমাণ। সাধারণত ওরাঁওদের গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপটা, ঠোঁট মোটা, মাথার খুলি গোলাকৃতি, চুল প্রায় কোকঁড়ানো, দেহের উচ্চতা মাঝারী ধরণের। বিশেষ করে ওরাঁও সমাজের মেয়েদের গঠন পুরুষের অপেক্ষা খর্বাকৃতি। কারণ তাদের দৈহিক গঠন, চেহারাগত সাদৃশ্য এবং ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। অপর পক্ষে Dr. Hahn ব্যাখ্যা করেছেন, Uraon as the tootem of one of septs into which the Kurukhs are divided. এ কারণে ওরাঁওদের কুড়ুখও বলা হয়। কাজেই বলা যাচেছ যে, এ ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিদরাও স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি।

আদমশুমারী গণনায় অনেক ওরাঁও আদিবাসী বৌদ্ধ হিন্দু হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অনেক সময় প্রকৃতি পূজারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু মাত্র ওরাঁও নয়, অনুরূপ ইচ্ছানুগ বৃত্তি অনেক আদিবাসী বৌদ্ধদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মুরং উল্লেখযোগ্য। কখনো তাদের দেখা যাচ্ছে হিন্দু ভাবাপন্ন; মুঘল আমলে মুসলিম প্রধান্যের সময় তাদের সংস্কৃতিতে দেখা গেছে মুসলিম প্রভাব আবার কখনো খ্রিস্টান ধর্মানুশাসনের পুরোপুরি অনুসারী।

আদিবাসী সমাজ চিরকালই সরল প্রকৃতির। কাজেই যখন যে ধর্মের প্রাধান্য ও সহায়তা তারা লক্ষ্য করেছে তার ছায়াতলেই এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য যে প্রাচীন অবস্থায় বা সমাজের নীচুস্তরে কেউ কোনদিন আটকে থাকতে চায়না। কোন জাতিই তার প্রাচীন অবস্থায় আটকে থাকতে চায়না বরং বলা চলে থাকা উচিত নয়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সবাই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের অনুসারী। মুসলমানদের মধ্যেও যে অনুরূপ প্রবৃত্তির উন্মোষ বর্তমান নেই, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ওরাঁওরা জড়োপাসক বা প্রকৃতি পূজারী। যুগের কালপরিক্রমায় হিন্দুধর্মের প্রাধান্য তাদের মধ্যে বর্তমান। ওরাঁওদের ভগবানের নাম ধার্মেস। ধার্মেস এর নামে তারা সাদা মোরগ ও সাদাপাঠা ছাগল বলী দেয়। তারা পরকালে বিশ্বাস করে। মৃতব্যক্তির আত্মাকে তারা 'পাচোয়া আলাস' বলে। জগতের কর্মফল ওরাঁও অনুসারে এসব আত্মা সুখ বা শান্তি পায়। এ মতে ধার্মেস পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান (Supreme Being) এবং তার ইচ্ছায়ই সব কিছু ঘটে থাকে। তাই সার্বিকভাবে তুলনীয় হলোঃ

i) The whole religion of the mandans consists in the belief of one great spirit presiding over their destinies, or in the nature of a good genius.[৯৮]

ii) The Muria have a belief, which is probaby very old, in a supreme being Whom they call variously mahapurub, Ispurul and Bhagaban.[৯৯] ধার্মেস ছাড়াও ওরাঁও সমাজে গ্রামদেবতা, গার্হস্থদেবতা, ফসলাদি সংরক্ষণের দেবতা, অরণ্যদেবতা,

Dhaka University Institutional Repository

রোগজরার দেবতা প্রভৃতি উচ্চাসান সংরক্ষিত রয়েছে। তাছাড়া হিন্দু দেবতা ও পূজা অর্চনার প্রতিও তারা শ্রদ্ধাবান। নিজেদের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানের জন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রীতিতে এই সব দেবতার পূজা করে থাকে। "আধুনিক সভ্যতার আলোক এখনো অনেক আদিবাসীর দোর-গোড়ায় পৌঁছেনি বটে, কিন্তু তাদের জীবনের বৈচিত্র্যের গতি অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষিত সমাজকেও হার মানায়। অনেক আদিবাসীই নিরক্ষর বটে, তবে তারা অশিক্ষিত (Uncultured) নয়।

আদিবাসী বৌদ্ধদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেককে মুগ্ধ করে। এদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাকথন, শটতা, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি সামাজিক জঘন্যতম কাজ দেখা যায়না। ওরাঁওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহুগুণে গুণান্বিত। তবে ওরাঁও সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ এখনো জীবনাচরণের দিক থেকে আদিস্তরে রয়ে গেছে।

৮.৭ আদিবাসী ওরাঁদের সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতি

আদিবাসীদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত। অধিকাংশ পরিবারই যৌথ পরিবার। পরিবারই আদিবাসীদের প্রধান আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান। জন্ম ও বিবাহ সূত্র এবং স্বগোত্রের লোকজনকে আদিবাসীরা জ্ঞাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন। দলবদ্ধভাবে ক্রিয়াকর্ম ও স্বীকৃত জ্ঞাতি সম্পর্কে প্রাধান্য আদিবাসীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 'ওরাঁও' 'পুরখা' পিতৃপুরুষগণ পড়ালেখা জানতেন না। প্রাচীনকালে তারা ৬৩টি গোতার বা গোষ্ঠির সমন্বয়ে সমাজ গঠন করেছিল। ওরাঁওরা চাঁদ দেখে আঙ্গুলির সাহায্যে গুণে গুণে বর্ষপুঞ্জিকা গণনায় ফাল্গুণ মাস হলো বছরের শেষ মাস। ফাগুয়া উৎসবের পর থেকে নতুন বছর গণনা শুরু হয়'। আদিবাসীদের আলাদাভাবে কোন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। আদিবাসীদের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। তুলনামূলক ভাবে ওরাঁও আদিবাসীর মধ্যে শিক্ষার হার বেশি। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না। ক্রমে আদিবাসীরা ভূমিহীন ও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। ফলে শিক্ষা দীক্ষায় তারা অগ্রসর হতে পারছেনা।

আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের নিজস্ব লিখিত কোন গ্রন্থ নেই। এদের নিজস্ব ভাষা আছে। ওরাঁওরা কুড়ুখ ভাষায় কথা বলে। ভাষাটি নেপালী ও পালি ভাষার সংমিশ্রনে গড়া ভাষা বলে মনে হয়। তার পাশাপাশি তারা সাদরী ভাষায়ও কথা বলে। সাঁওতালদের মতো অনেক আদিবাসী খ্রীস্টান মিশনারীর প্রচেষ্টায় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করছে। ধর্মান্তরিত হয়ে যে তারা সুখী হতে পেরেছে এমন কথা জোর গলায় বলা যায় না। ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের মনের খেদ ও দুরবস্থার বহু বর্ণনা আজ লোকমুখে বিদ্যমান। ওরাঁও সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ কাঠামো রয়েছে, একে পাঞ্চপাহাড় বা দিঘরী বলে।

সমাজ ব্যবস্থায় ওরাঁওগণ সমাজ পরিচালনার জন্য জনগণের মধ্য থেকে একজন দেওয়ানি অর্থাৎ গ্রাম্য প্রধান নিযুক্ত করে থাকে এবং তাকে 'মাহাতো' উপাধিতে ভূষিত করে। মাহাতো গ্রামবাসীদের

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তায় গ্রামের সমস্যা সমাধান ও উন্নতি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করে। উপরন্তু বাইশ গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় দিঘরী কমিটি, সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা। এটি সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। মাহাতো বিচার সালিশের কোন সমস্যা সমাধান করতে না পারলে দিঘরী সে দায়িত্ব পালন করে থাকে। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন গ্রামীন নীতির কারণে আদিবাসীদের এ সমাজ কাঠামোগুলি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে।

ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে আদিবাসী ওরাঁওরা প্রকৃতির পূজারী। ওরাঁওদের সৃষ্টিকর্তা ধার্মেস (ভগবান) অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। দীর্ঘ শতাব্দীকাল ধরে তারা বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও প্রতিপালন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নৃতাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরবঙ্গের সমগ্র জনগোষ্ঠি বৌদ্ধধর্মানুসারী ছিলেন। কালের ইতিহাসে শাসক ও ধর্মমতাদর্শ পরিবর্তিত হয়ে বৌদ্ধরা অন্ত্যজ শ্রেণীর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ শাসনমালে বৌদ্ধরা নিহ্নিত ও ধর্মান্তরিত হয়ে যায়।

ড. আহমদ শরীফ বলেন, 'এ অঞ্চলের বাসিন্দরা 'বঙ্গবগদশ্চের (বঙ্গাবগধাশ্চের পাদা) জাতি বলে উল্লেখ রয়েছে ঐতরেয় আরণ্যাকে। কোন কোন বিদ্বান মনে করেন 'বগধ' আসলে পরবর্তীকালের মগধ এরই আদি বা বিকতরূপ; আর চের (ইরপাদ) এখান কার ওরাঁও মুণ্ডার জ্ঞাতি। কোন কোন পণ্ডিত 'বগধ' আধুনিক উত্তরবঙ্গের 'বাগদী' নির্দেশক বলেন।[১০০] উত্তরবঙ্গের ওরাঁও, মুণ্ডা, শবর প্রভৃতি স্বল্প সংকর, আদি অস্ট্রাল বা ভেড্ডিড। আদিবাসীরা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে খুব আনন্দ করে। সারা বৎসর বিভিন্ন পার্বণ ও সামাজিক উৎসব এবং অনুষ্ঠান আদিবাসীরা যথাযথ মর্যাদা, ভাব ও গম্ভীর ও আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। আদিবাসীরা ব্যক্তি চেতনায় বিমুখ কিন্তু সংঘচেতনায় অগ্রগামী।

আদিবাসীরা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। উচ্চাভিলাষ নেই বললেই চলে। তারা চিরকালই সহজ সরল এবং দায়িত্বশীল। ওরাঁওদের গোত্রগুলো পরস্পরের প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ খুব প্রবল। আদিবাসী মাত্রই সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয়। ওরাঁওরাও এর ব্যতিক্রম নয়। ওরাঁওদের বিবাহ উৎসব, পূজা-পার্বণ সব কিছুতেই নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ওরাঁও মেয়ে-পুরুষ সবারই শরীরে উলকি চিহ্ন আঁকে। (বর্তমানে তেমন প্রচলিত নেই) ওরাঁদের উলকি চিহ্নগুলোতে সাপ, পাখি, সূর্য, বৃত্ত, ড্রাগন ইত্যাদি প্রতীকধর্মী বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য আদিবাসীর মধ্যেও উলকি চিহ্নের প্রচলন রয়েছে। পদ্ধতিটি যে আদিবাসীদের প্রাচীনতম নিদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাক-বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকসংগীত কীর্তন ওরাঁওদের সঙ্গীতধারার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থের মন্তব্য থেকে জানা যায়, ওরাঁও জাতির এই সঙ্গীতাংশ হতে ক্রমেক্রমে এদেশে বিশেষ কোন অঞ্চলের সমগ্র সঙ্গীতের উপরই কীর্তন কথাটি প্রযোজ্য হয়। ওরাঁওগণ দ্রাবিড় ভাষী, অতএব কীর্তন কথাটি সঙ্গীত অর্থে-ওরাঁওদিগের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত।[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

ওরাঁওদের নিজস্ব রীতিনীতি বা প্রথা অনুযায়ী বিয়ে হয়। এদের বিয়েতে কোন যৌতুক প্রথা নেই। ওরাঁও সমাজ ব্যবস্থায় কেবল মাঘ মাসেই বিয়ের হয় প্রচলন থাকলেও অন্যান্য সময়েও বর্তমান বিয়ে হয়। ওরাঁওদের মধ্যে গোত্র বিভাগ রয়েছে। স্বগোত্রের বিবাহ (বেঞ্জা) এদের মধ্যে নিষিদ্ধ। তবে (একই গোত্রের মধ্যে ভূইয়াঁর (গোত্র বা বংশের জাত চিহ্ন) ভিন্ন হলে বিবাহ করা যায়) শুধু বিয়ের ব্যাপারেই নয় অন্যান্য ব্যাপারেও বিশেষ কতগুলো ধর্মীয় বাধা নিষেধ (Taboo) রয়েছে।[১০২]

খাদ্যাভ্যাস

আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতের পরেই মাছ, মাংস, শাক-সবজি আদিবাসীদের অন্যতম খাদ্য। ওরাঁও আদিবাসীরা কৃষি কর্মের উপর নির্ভরশীল। বনের পশুপাখি, নানা রকম ফলমূল তাদের প্রিয় খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। তারা আদিতে ছিল মাংসাহারি। বর্তমানে তাদের পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে রয়েছে ডিম। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ওরাঁও, পাহাড়িয়া, পাহান আদিবাসীরা বৌদ্ধদের মতো ধর্মীয় কারণে গরু ও মহিষের মাংসা খায়না। অকারণে প্রাণী হত্যা করে না। কচ্ছপ আদিবাসীদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। মাংস হিসেবে মুরগি, শূকর ও ছাগল আদিবাসীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওরাঁওরা প্রচণ্ড রকম অতিথি পরায়ণ, অতীব বিনয়ী। আদিবাসী সমাজের অতিথি আপ্যায়নে বিশেষ বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানের খাদ্য তালিকার প্রথম গুরুত্ব পায় পচানী বা হাড়িয়া (এক প্রকার নেশা জাতীয় খাদ্য)। এগুলো তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে। তবে আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধরা বৌদ্ধধর্মের নিয়মনীতি ও আদর্শের কারণে নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিহার করেছে এবং আদর্শ জীবন যাপনে সাফল্য অর্জন করেছে।

পোষাক

আদি ওরাঁও বৌদ্ধ নারীপুরুষ বর্তমানে প্রাচীন আদিম পোশাকের পরিবর্তে বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধদের মতো আধুনিক পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে থাকে।

অলঙ্কার

আদিবাসী ওরাঁও রমণীরা সাধারণত সৌন্দর্য প্রিয়। ওরাঁও সমাজ দারিদ্র্যের কারণে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও স্বর্ণালঙ্কার পরিধানের সৌভাগ্য খুব কম রমণীর হয়ে থাকে। অধিকাংশ মেয়েই রৌপ্যালঙ্কর পরিধান করে। ওরাঁওরা অলঙ্কার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধদের মতো রীতি অনুসরণ করে।

আদিবাসী ওরাঁও অত্যন্ত সংগীত ও নৃত্যগীত প্রিয়। প্রত্যেক পূজা পার্বণ ও বিবাহ উৎসবসহ নানা অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীতের আয়োজন হয়ে থাকে। তারা নৃত্যগীতে ঢোল,

Dhaka University Institutional Repository

মৃদঙ্গ, মাদল, বাঁশী, তাল, নাগারা, খঞ্জনী, ঘুঙুর, কাসা, ব্যবহার করে থাকে। অতি সম্প্রতি স্থান বিশেষে হারমনিয়ামের ব্যবহারও শুরু হয়েছে।

ওরাঁওদের আহার্য ও পানীয়ের মধ্যে ভাত ও মদ (হাড়িয়া) প্রধান। আদিবাসী গোত্রভেদে বিশেষ করে বৌদ্ধদের মদ্য পানে বাধা নিষেধ রয়েছে। আদিবাসী বৌদ্ধরা সচেতন; কুসংস্কার ও অশ্লীলতা দূর করার প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধ। বৌদ্ধদের মতো ওরাঁও আদিবাসীদের মৃতদেহ আগুনে পোড়ানো হয়। চিতা সাজিয়ে ওরাঁওদের শবদাহ করা হয়। শবদাহের সময় মুখে আগুন দেওয়ার ভার অর্পিত হয় বড় ছেলের উপর। যদি ছেলে না থাকে তবে এ কাজটি সম্পন্ন হয় পিতা কিংবা ভাই কিংবা পরিবারে অন্য কোন পুরুষ ব্যক্তি মাধ্যমে। কোন ক্রমেই স্ত্রী বা মেয়েরা মুখে আগুন দেওয়ার অধিকার পায়না। এমনকি তারা শ্মশানে পর্যন্ত যেতে পারে না।

"বর্তমানে আদিবাসী সমাজ অধিক সংস্কার প্রিয়। অনেক প্রাচীন রীতিনীতি, পূজা-অর্চনা ও জীবনবোধের নানা বিষয়ে তারা পরিবর্তনে বিশ্বাসী। এখনো ক্ষেত্র বিশেষে আদিবাসীদের মধ্যে, ঝাড়, ফুকও, তন্ত্র-মন্ত্র, অতিপ্রাকৃত, কুসংস্কার ও প্রকৃতি পূজারী জড়োপাসক। ওরাঁওদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা যে বিভিন্নভাবে প্রবাহিত তা পূজা-পার্বণ, ব্রত অনুষ্ঠান ও টোটেম বিশ্বাস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করলে আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের জীবনধারায় আসল রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। আধুনিক সভ্যতার প্রতিফলন তাদের মধ্যে কতটা ঘটেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আদিবাসীগণ শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত সমাজের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর এবং এ ব্যাপারে তারা অনেকটা সফলকামও হয়েছে। এর মূলে রয়েছে উন্নত সমাজ ও ধর্মভূক্ত হওয়ার জন্যে তাদের আন্তরিকতা এবং উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের বাস্তব ও সক্রিয় প্রচেষ্টা।

ওরাঁওরা মূলত প্রকৃতি পূজারী। তবে তারা 'ধামের্স' (ভগবান) একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মের সান্নিধ্যে এসে ওরাঁওরা প্রকৃতির পূজার রীতির অনুকরণ করেন। এদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। আদিবাসী ওরাঁওদের এক গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না। সমাজরীতিতে শুধু মাঘ মাসেই বিবাহ হয়ে থাকে। ব্রিটিশ আমল হতে খৃস্টান মিশনারী বাংলাদেশে খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে শুরু থেকে বাংলাদেশী বৌদ্ধ এবং আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করছে। বিশেষ করে তারা অনগ্রসর বৌদ্ধ জনপদে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার আশ্রয়ে বৌদ্ধদের খৃস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করাচ্ছে। তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের উন্নয়নের নামে প্রলোভিত করছে। তারা প্রতিষ্ঠা করছে মিশনারীর ও চার্চ।

Dhaka University Institutional Repository

ওরাঁওদের ধর্মান্তরের ফলে ধর্ম ও জাতিসত্তার প্রশ্নে বিভেদ সৃষ্টি করছে। খ্রিষ্টান পাড়া, মিশন পাড়া নামকরণ করে নিজেদের সীমানা নির্ধারণ করে নিজ ধর্মের দলে সামিল করার নীরব অভিযান চালাচ্ছে অনবরত, সর্বত্র। আর্থ-সামাজিক কারণে অতি সম্প্রতি আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের আহ্বানে সর্বপ্রথম ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও কয়েকজন সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের মুক্তির অগ্রপথিক হিসেবে আবির্ভূত হন। খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। তারা তাদের প্রাচীন ধর্মদর্শন বৌদ্ধধর্মে পুনরুজ্জীবিত। উল্লেখ যে, ওরাঁওদের সামগ্রিক জীবন প্রণালী ও ধর্মীয় আচারবিধি গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম ও নীতিশিক্ষার সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে তারা খুব সহজেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের সোনালী ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ। গত দশকের মাঝামাঝিতে শুরু হওয়া এই ধর্মীয় জাগরণ ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এখন উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, জয়পুর হাট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও নওগাঁ জেলার পাঁচ-সাতটি থানার আদিবাসী ওরাঁও অধ্যুষিত এলাকায় বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্য বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। এসব বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অবস্থান করে দায়ক-দায়িকা ধর্মীয় শিক্ষা ও চর্চায় উৎসাহিত করছে। দৈনন্দিন পূজা অর্চনায় নয়, ধর্মীয়সভা, সেমিনারে আদিবাসীদের অংশগ্রহণও আশাতীত। আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধধর্মীর জ্ঞান, নিয়ম কানুন সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত নয়। আদিবাসী ওরাঁও প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্মানুসারী ছিলেন। সপ্তম ও অষ্টম শতকের নির্মিত উত্তরবঙ্গের বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন- পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, জগদ্দল মহাবিহার, সীতাকোট বিহারসহ অন্যান্য বিহারের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত সকল আদিবাসীরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। কালের ইতিহাসে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে দীর্ঘ দিন অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক হিসেবে অবহেলিত, নির্যাতিত, বর্ণ বৈষম্য ও ধর্মীয় শাসক শ্রেণীর কারণে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়।

বর্তমান তাদের পূর্ব ধর্মমত বৌদ্ধধর্মের সান্নিধ্যে ফিরে এসেছেন। এজন্য ওরাঁওসহ উত্তরবঙ্গে অন্যান্য আদিবাসীরা 'বিস্মৃত বৌদ্ধ / আদি বৌদ্ধ' বলে অভিহিত।[১০৩]

হিন্দু ধর্মের শ্রেণী বিভাজন ও খৃস্টান ধর্মের সাথে নীতিগত আদর্শের পার্থক্যের কারণে এতকাল পর আদিবাসী ওঁরাওদের সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা ও শান্তির স্বপক্ষে প্রচারিত প্রাচীন মতবাদ বৌদ্ধধর্মে উজ্জীবিত হয়েছেন; সংগঠিত হচ্ছেন সুপ্রাচীন

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধরা বাংলার বৌদ্ধ ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়: বৌদ্ধধর্মের পুর্ণজাগরণের স্বর্ণালী আভা। আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধ দীর্ঘকাল প্রকৃতি পূজারী হয়ে ব্যাপৃত থাকার পর পূর্ব ধর্মমত বৌদ্ধধর্মের শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার ধর্মে পুনর্জীবন লাভ, অতীতের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়া, পূর্ণজীবনবোধ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণ সর্বোপরি মানুষ হিসেবে পূর্ণমর্যাদায় বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা লাভ করেছে।

উত্তরবঙ্গের অর্ধশতাধিক ছেলেমেয়ে এখন দক্ষিণবঙ্গের বিহার, অনাথালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (পাহাড়তলী অনাথালয়, অগ্রসার অনাথালয়, ধর্মরাজির বৌদ্ধ মহাবিহার, ঢাকা আর্ন্তজাতিক বৌদ্ধ বিহার, নবশালবন বৌদ্ধ বিহার, বুদ্ধিস্ট ফাউন্ডেশন) থেকে বৃত্তি ও সহায়তায় লেখাপড়া করছে। উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক বৌদ্ধ দাতা ব্যক্তি ও ধর্মীয়, সামাজিক সংগঠন বিভিন্নভাবে ভূমিকা ও সহযোগিতা করে যাচ্ছে।[১০৪]

উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাচীন পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ এক প্রাচীন জনপদ। বরেন্দ্র অঞ্চলের বিশ্বসংস্কৃতির নির্দশন পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, জগদ্দল বিহার, সীতাকোট বিহার, হলুদ বিহার ও গয়েশপুর বিহার সর্বজন বিদিত। এছাড়াও বগুড়ার পুণ্ড্রবর্ধন বিহার, ভাসুবিহার, স্থাপত্যকীর্তির এক অনন্য নিদর্শন। এখানকার ঐতিহ্য সংস্কৃতি, রাস্তাঘাট, গ্রাম-নগর, বাস্তুভিটা-পুকুরঘাট, প্রত্নবস্তু নিদর্শন এবং দৈনন্দিন জীবনাচার বৌদ্ধিক ও বৌদ্ধধর্মের সাথে একান্তভাবে সম্পৃক্ত এবং ধর্মীয় রীতি প্রথা যুথবদ্ধ বহিপ্রকাশ। এ অঞ্চলের বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহ বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। দেশী বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্টকারী বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শনগুলো আজ অবহেলিত। প্রাচীন বৌদ্ধশিল্প সংস্কৃতি ও পুরাকীর্তির ঐতিহ্যমণ্ডিত এসব জনপদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধ কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কালের ইতিহাসে প্রায় বিস্মৃত; মৃত প্রায়। সেই সব অতীতের চির গৌরবকে সংরক্ষণ ও জাগরণ করার প্রত্যয়ে আজ নবধারায় বিকশিত পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করেছে বুদ্ধের কালজয়ী অপ্রমেয় সাম্য-মৈত্রীর বাণী। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধধর্ম উত্তরোত্তর প্রসারিত হচ্ছে । তাই বুদ্ধের শিক্ষা, নীতি আদর্শ সেখানকার মানুষ সানন্দে গ্রহণ করেছে। কারণ বৌদ্ধধর্ম শুধু মাত্র একটি ধর্মমত নয়; ইহা একটি জীবন দর্শন, জীবন পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। বৌদ্ধধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে সুন্দর আদর্শ জীবন প্রণালী, নিজে বাঁচা এবং অন্যাদের সুখে বাঁচতে দেওয়ার উত্তমপন্থা।

বর্তমানে সদাশয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা, দাতা বৌদ্ধ ব্যক্তি, সংগঠন এবং শ্রীমৎ শীলভদ্র ভিক্ষুর সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর জনগোষ্ঠির মধ্যে গড়ে উঠছে অনেক ছোট বড় বৌদ্ধ বিহার। ইতোমধ্যে প্রায় ১৫টি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরো প্রায় ১০টির মতো বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ কাজ প্রকল্পাধীন রয়েছে। উদীয়মান স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়ার পরিকল্পনা ও নক্শায় বৌদ্ধ বিহারগুলি নির্মিত হচ্ছে। বর্তমানে শীলভদ্র ভিক্ষুর উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধদের উন্নয়নকাজে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এসব বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে প্রথমত আত্মজ্ঞান প্রদীপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রভাতী বিদ্যালয় এবং পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশীলন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যাবোধ গঠন। উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ জাগরণ ছিল এতদিন স্বপ্ন ও কল্পনা বিলাস। বর্তমানে এতদ্ অঞ্চলের আদিবাসি জনগণ প্রাচীন মতার্দশ বৌদ্ধিক জাগরণে সামিল হয়েছে। নিজেদের একান্ত উপলব্ধি ও বিশ্বাসবোধ থেকেই এই অগ্রযাত্রা। সামষ্টিক বৌদ্ধ জনগণের সমন্বিত উদ্যোগে, কোন দল, কুল, নিকায় বা সাংগঠনিক অভিন্নতায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন হৃত বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও বৌদ্ধ জাগরণের বিকাশমান ধারাকে সমুন্নত, বেগবান ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐক্য ও সমন্বিত প্রচেষ্টা একান্তই অপরিহার্য।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের আধুনিকীকরণ সময়ের প্রেক্ষিত মাত্র। সম্প্রদায়ের আধুনিকীকরণ বলতে আদিম বা সনাতন সম্প্রদায় থেকে আধুনিক সম্প্রদায় গঠনের অভিমুখে অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়। আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক গতিশীলতা, শিক্ষাবিস্তার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ধর্ম বিশ্বাসের মূল্যবোধ বৃদ্ধি, ঐক্য সংহতি দৃঢ় করা, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন, জাতিসত্তা ও ঐতিহ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আধুনিকীকরণের গুরুত্ব, পরিধি, সর্বোপরি পদক্ষেপে আদিবাসি সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি আনয়নে সম্ভব।

সম্প্রদায় আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে, সামাজিক সংগঠন পুনরুদ্ধার ও বলিষ্ঠকরণ, শিক্ষা প্রসার, ভূমি সংরক্ষণ, ভাষা ও সংস্কৃতিরক্ষা, সংহতি প্রতিষ্ঠা, দক্ষতাভিত্তিক পেশা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইতেমধ্যে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বৌদ্ধদের মধ্যে সেতুবন্ধন সূচনা হয়েছে। সু-সমৃদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃতি, পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশের উত্তর জনপদ তথা উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে এবং এতদ্ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মহান ব্রতে গঠন করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন ও উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষদ-চট্টগ্রাম।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ গান্দু টপ্য, ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি বাবুল সিংহ, সাধারণ সম্পাদক বিরশা মিনজি, প্রধান ধর্মীয় উপদেষ্টা ও

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়কারী শ্রীমৎ শীলভদ্র ভিক্ষু। বিশেষ করে সার্বিক যোগাযোগ, সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা, আদেশ উপদেশ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিক উন্নয়নে মহান সংঘ পুরুষ শ্রীমৎ শীলভদ্র ভিক্ষু নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশী বৌদ্ধদের অতীত ইতিহাসের এক ঋদ্ধ জনপদ বৌদ্ধ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক মহাবিহার, যা আজ শুধুই ইতিহাস। কালের সাক্ষী হিসেবে এসব বৌদ্ধ বিহার আমাদের অতীত স্মরণ করিয়ে দেয়।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের, আত্মপরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। সুখের বিষয় যে, উত্তরবঙ্গে বর্তমানে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষুসংঘ বর্ষাবাস যাপন করে আসছেন। সেখানে দৈনন্দিন বিহারে ধর্মচর্চা হচ্ছে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিণী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনমাস ভিক্ষুসংঘের পরিশুদ্ধ ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে আত্মদর্শনে তৎপর হন। বৌদ্ধ জনগণও মনের পাপ পরিহার করে দান শীল ভাবনার অনুশীলন করেন। উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারগুলোতে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বুদ্ধপূজা, পূজা-অর্চনা, প্রবারণা পূর্ণিমা ও শুভ কঠিন চীবর দান, বৌদ্ধ বিহারে ধর্মীয় সভা ও আদিবাসী ধর্মীয় মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি ২৭ অক্টোবর ২০০৫ আদিবাসী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ধর্মদাস-কুঠিপাড়া কমিউনিটি সেন্টার। এই সেন্টার পরিচালনার সভাপতি মনিরাম পাহান ও সাধারণ সম্পাদক মিঠু পাহান। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধদের উন্নয়ন ও কল্যাণে মূলত তিনটি অঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সমাজ সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ কাজ করে যাচ্ছেন। সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা ঢাকা অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ থের, সৌগত সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, কুমিল্লা অঞ্চলের আলীশ্বর শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহারের শ্রীমৎ জিনানন্দ ভিক্ষু, চট্টগ্রাম অঞ্চলে উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বৌদ্ধ কল্যাণ পরিষদের সভাপতি শ্রীমৎ শীলরক্ষিত মহাস্থবির, সহ-সভাপতি শ্রীমৎ শাসনানন্দ মহাস্থবির, প্রধান সমন্বয়কারী ড. সংঘপ্রিয় থের, অর্থ সম্পাদক শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন থের এবং সম্পাদক বাবু স্বপন কুমার বড়ুয়া।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গ আদিবাসী বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনে ব্যবস্থাপনায় নিম্নে প্রদত্ত বৌদ্ধ বিহারগুলোর সার্বিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে ঃ

বিহারের নাম	গ্রাম	উপজেলা	জেলা
ভয়ালপুর বিশ্বনাথ বৌদ্ধ বিহার	ভয়ালপুর	বদলগাছি	নওগাঁ
বারকান্দ্রী সুকুমার সিংহ বৌদ্ধ বিহার	বারকান্দ্রী	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
সাহাপুর মহাদেব বৌদ্ধ বিহার	সাহাপুর	পীরগঞ্জ	রংপুর
আমোদপুর তপোবন বৌদ্ধ বিহার	আমোদপুর	পীরগঞ্জ	রংপুর
চাঁনপুর জেতবন বৌদ্ধ বিহার	চাঁদপুর	মিঠাপুকুর	রংপুর
কনকচৈত্য বৌদ্ধ বিহার	সোমনারায়ন	পীরগাছা	রংপুর
সংঘরাজ ধর্মানন্দ বৌদ্ধ বিহার	ধর্মদাস-কুঠিবাড়ী	রংপুর সদর	রংপুর
কেন্দ্রীয় বেনুবন বৌদ্ধ বিহার	মিঠাপুকুর	মিঠাপুকুর	রংপুর
হিরোয়োশি জে.এস.ফুকুই বৌদ্ধ বিহার	শেখপাড়া	রংপুর সদর	রংপুর
কুড়াপাড়া নব শালবন বৌদ্ধ বিহার	কুড়াপাড়া	বদরগঞ্জ	রংপুর
কচুয়া মধুবন বৌদ্ধ বিহার	কচুয়া	বদরগঞ্জ	রংপুর
রাজবাড়ী বৌদ্ধ বিহার	দঃ পাঁচপুকুরিয়া	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
হরিরামপুর আনন্দ বৌদ্ধ বিহার	ছাতনীপাড়া	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
জগন্নাথপুর তক্ষশীলা বৌদ্ধ বিহার	জগন্নাথপুর মাঝাপাড়া	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাও
টিম্পুটিগ্যা বৌদ্ধ বিহার	বহবল দিঘী	বিরল	দিনাজপুর
উত্তর চকবেনী সংঘবাজ জ্যোতিপাল তক্ষশীল বৌদ্ধ বিহার	উত্তর চকবেনী	বদলগাছি	নওগাঁ
গয়েশপুর বৌদ্ধ বিহার	গয়েশপুর	বদলগাছি	নওগাঁ
পূর্ব সেনপাড়া শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহার	পূর্বসেনপাড়া	বদলগাছি	নওগাঁ
ভয়ালগড় সামন্তভদ্র বৌদ্ধ বিহার	বড়হালা	কালিয়াকৈর	গাজীপুর

৮.৮ বাংলাদেশে ওরাঁও জাতিসত্তার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ওরাঁও একটি ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠি। বাংলাদেশের ৪৫টি আদিবাসী ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে ওরাঁও তাদের মধ্যে একটি। উত্তরবঙ্গে রাজশাহী বিভাগের প্রায় সবকটি জেলা, বৃহত্তর সিলেট এবং গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে রয়েছে এদের বসবাস। পরিসংখ্যান মতে, আনুমানিক এক লক্ষের অধিক ওরাঁও জাতিসত্তা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে রয়েছে।[১০৫] ওরাঁও সম্পর্কে জানতে হলে ওয়েভ সাইড www.joharadivasi com.দেখুন। **বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আদিবাসীরা অবস্থান করে। এদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষের মতো।** উল্লেখ যে, পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতা উত্তরকালের বাংলাদেশের আদমশুমারীগুলোতে ওরাঁওদের স্বতন্ত্রভাবে গণনা করা হয়নি। অতি সম্প্রতি 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন' নামক একটি বেসরকারী সংস্থা ওরাঁওদের ওপর একটি জরিপ সম্পন্ন করেছে। এই জরিপটি অতি নির্ভরশীল। কারণ এটি সম্পন্ন হয়েছে ওরাঁও সমাজের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা। এ প্রসঙ্গে জরিপের একটি উত্তরবঙ্গের **প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো (H.R.D.F এর প্রকাশিত প্রতিবেদন)**[১০৬]

ক্রমিক নং	জেলা	পরিবারের সংখ্যা	পুরুষ	নারী	মোট সংখ্যা
১	পঞ্চগড়	৪১	১০২	১০০	২০২
২	ঠাকুরগাঁও	৩২৬	৬৬৩	৫৮২	১২৪৫
৩	দিনাজপুর	১৫৭৪	৩২৩৯	৩০২০	৬২৫৯
৪	রংপুর	২৯৩২	৫৯৩০	৪৭৩৫	১১৬৬৫
৫	সিরাজগঞ্জ	১৩১২	২৪৫০	২৩৬৪	৪৮১৪
৬	নাটোর	৮২৫	১৬১৬	১৪৭৫	৩০৯১
৭	বগুড়া	১০১	১৮৬	১৮৫	৩৭১
৮	জয়পুর হাট	১৩৪৭	২৮১৪	২৭০৪	৫৫১৮
৯	চাঁপাইনবাব গঞ্জ	১৩৪৮	২৭৭৩	২৬৩১	৫৪০৪
১০	রাজশাহী	২৬৪৭	৫৯৯৫	৫২২৩	১১২১৮
১১	নওগাঁ	৮২৮৯	১৬১৯৯	১৫৬৩৫	৩১৮৩৪
১২	গাইবান্ধা	১৪	২৭	২৯	৫৬
১৩	গাজীপুর	২৯	৬৪	৩৯	১০৩
১৪	হবিগঞ্জ	৪১৫	৯৪৩	৮৮৮	১৮৩১
১৫	মৌলভী বাজার	৩০৫	৭৬৪	৬৬৬	১৪৩০
	মোট	২১৫০৫	৪৩৭৬৫	৪১২৭৬	৮৫০৪১

এ প্রতিবেদন থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশী ওরাঁও জনগোষ্ঠির বাস নওগাঁ জেলায়, থানার দিক থেকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী, রংপুরের মিঠাপুকুর, নওগাঁর পত্নীতলা, নিয়ামতপুর ও পোরশার স্থান শীর্ষে। উক্ত থানাসমূহের ওরাঁওদের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৬৬৩৮, ৬৬১৫, ৬৫১১, ৬২৬২ ও ৬২৬০।[১০৭]

'উপমহাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম শীর্ষস্থান উত্তরবঙ্গের বিস্তৃর্ণ বরেন্দ্র অঞ্চলের পুণ্ড্রবর্ধন নগরে মহাস্থানগড় মৌর্য, চন্দ্র, পাল বৌদ্ধ রাজাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। সপ্তম-অষ্টম শতকে উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠা অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার,

সভ্যতা ও ঐতিহ্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিকপট পরিবর্তনের ফলে এতদঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ, বৌদ্ধধর্মের নীতি আদর্শ এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি চিহ্ন বিলীন হয়ে যায়নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওরাঁওসহ অন্যান্য সম্প্রদায় নিজেদেরকে বৌদ্ধধর্মের অনুযায়ী হিসেবে আত্ম পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে।' সুদীর্ঘকাল থেকে উত্তরবঙ্গের অনেক আদিবাসী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি বসবাস করে আসছে। বতর্মানে বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন এসব আদিবাসী বৌদ্ধ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ধর্ম বিশ্বাস ও ঐতিহ্য হারিয়ে বিস্মৃত/প্রচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত হলেও ভগবান বুদ্ধের প্রতি রয়েছে তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা।[১০৮] তাদের ভাষায় তারা বুদ্ধের ভক্ত ও পূজা করে থাকেন। বৃহস্পতিবারকে মনে করেন গুরুবার। তাই প্রতি বৃহস্পতিবারে সকাল দশটায় পূজা ও সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। তাদের প্রার্থনার বিশেষ মাহাত্ম্য বুদ্ধের গুণমহিমা ও বোধিজ্ঞান ভাবনা।[১০৯] আদিবাসী ওরাঁও একটা বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয় যে, তাদের পালি ভাষায় উচ্চারণগত কোন ভুল নেই। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। তার হেতু হলো আদিবাসীরা আদি থেকে সদ্ধর্মী অর্থাৎ বৌদ্ধ ছিলেন। ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য যে, উত্তরবঙ্গের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভবে থাকা আদিবাসীরা প্রকৃত পক্ষে আদি সদ্ধর্মী বা বুদ্ধের প্রকৃত অনুসারী। উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত এলাকায় আদিবসীদের বসবাস তাদের কাছকাছি কোন না কোন ভগ্ন পুরানো স্তূপ, চৈত্য, কিংবা পুরানো আবিস্কৃত বৌদ্ধ বিহার রয়েছে। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশে অসংখ্য আদিবাসী গ্রাম রয়েছে। কিন্তু আদিবাসী খৃস্টান ও হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হলেও এখনো বেশীর ভাগ আদিবাসী তাদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস সদ্ধর্মে রয়ে গেছে। আদিবাসীরা 'টানা' ধর্ম বলে যে বিশ্বাস সেটা মূলত সদ্ধর্ম চর্চা। তাদের 'টানা' ধর্মের প্রার্থনা বুদ্ধের গুণ মহিমা ও ভর্জনা করা।

বাঙালি বৌদ্ধদের সোনালী অতীত এখানে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ উত্তরবঙ্গে যে সকল বৌদ্ধ ঐতিহ্য, সভ্যতা ও পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এখানো বিভিন্ন বিহার, স্তূপ, ঢিবি, প্রত্নবস্তু যত্রতত্র দৃষ্ট হয়। এসব অঞ্চলে পুরাকীর্তির ইতিহাস সমৃদ্ধতা বেশিরভাই বৌদ্ধদের। ইহা কোন ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠির জন্য নয় বরং ইতিহাসের সুবর্ণ অতীতকে তার সঠিক মূল্যায়নের স্বার্থেই দরকার তার আপন মহিমায় প্রকাশ করা। কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মের মানুষের শ্রেণী বিন্যাসকে প্রাধান্য না দিয়ে অতীতের সঠিক ঐতিহ্য তুলে ধরাই হোক

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধ আমাদের পুরাকীর্তির অমূল্য তথ্য। যার ফলশ্রুতিতে একটি দেশ বা জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওরাঁও সমাজে প্রচলিত লোককাহিনীগুলো বৌদ্ধগ্রন্থ জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনীর অনুরূপ। এদের সমাজে প্রচলিত লোককাহিনী প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মূল্যবান সংগ্রহ। এই লোককথা ও কাহিনীগুলো বিশেষত নীতিমূলক ও শিক্ষণীয়। ওঁরাও সমাজ জীবনের চিরস্থায়ী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নির্দেশন তাদের লোকসঙ্গীত। ওরাঁও লোকসঙ্গীত তাদের জীবনের সার্বিক চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে জীবন ও সমাজের বিচিত্র দিক প্রতিচলিত হয়েছে। ব্যক্তিমানস থেকে সমাজ মানসে ব্যাপ্ত: লোকসমাজ কর্তৃক গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে অনুসৃত বিশ্বাসেরই নামান্তর লোকবিশ্বাস। ওরাঁওরা আজো সংখ্যাধিক লোক নিরক্ষর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আজন্ম বিশ্বাস-সংস্কার আচ্ছন্ন তাদের সমাজ ব্যবস্থা। এছাড়া ওঝা-কবিরাজ, বাণ-ঠোণা ও বশীকরণ বিষয়ক মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাব এখনো সমাজ জীবনে বিদ্যমান। তবে আদিবাসী ওরাঁও সম্প্রদায় বর্তমান বৌদ্ধ ধর্মানুসারে ধর্মীয় ও সামাজিককর্ম বৌদ্ধ নিয়মনীতি ও বিধি বিধান মতে সম্পাদন করে থাকে। বর্তমানে ওরাঁও বৌদ্ধরা আদর্শ বৌদ্ধক জীবন যাপন করে থাকেন। ওরাঁও আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আছে। এদের মধ্যে কুড়ুখ ও সাদরী ভাষা প্রচলিত। ওরাঁও আদিবাসী কুড়ুখ ভাষায় কথা বলে। ভাষা তাত্ত্বিকদিক থেকে কুড়ুখ ভাষা দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্ভূক্ত।

পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের মতই ওরাঁও সমাজ ও সংস্কৃতি আজ নানা রকম বিবর্তনের সম্মুখীন। আধুনিক সভ্যতা, বিদেশী শিক্ষা এবং নানা ধর্মের মত প্রসারের চাপে ওরাঁও ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জীবনাচার আজ বিলুপ্তির পথে। এ সম্প্রদায়ের বৈচিত্র বহুল ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করা ও সংস্কার করার কোন উদ্যোগ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। প্রাচীন ওরাঁও কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে বর্তমান ওরাঁও সমাজ অনেক দূরে সরে গেছে। অন্যান্য আদিবাসী থেকে উত্তরবঙ্গের ওরাঁও সম্প্রদায় তুলনামূলকভাবে অশিক্ষিত ও অনগ্রসর।

প্রতিটি মানব জাতির একটি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থাকে তেমিন কুড়ুখ জাতিরও নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে। ওরাঁওদের উৎপত্তি, আদিবাস, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা এবং বর্ণাঢ্য আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। 'কর্ণেল ডাল্টন বলেন, 'দ্রাবিড়' ভাষায় কুড়ুখ শব্দের অর্থ হলো মানুষ'। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাদের প্রগৌতিহাসিক রাজা কাড়াক এর নামানুসারে কুড়ুখ নামের উৎপত্তি। ডা. হান লিখেছেন, 'ওরগোড়া' শব্দের অপভ্রংশ 'ওরাঁও'। ওরগোড়া শব্দের অর্থ বাজপাখী।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৯ আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধদের আত্মপ্রকাশ

১৯৯৪ সালে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধদের আত্মপরিচয় ঘটে। রংপুর থেকে ১৯৯৪ সালে হরিরাম মিনজী ও দিনো মিনজী নামে দুজন আদিবাসী ওরাঁও সর্বপ্রথম ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে এসে বৌদ্ধ হিসেবে পরিচয় দেয়। আদিবাসী ওরাঁও জনগোষ্ঠি প্রাচীনকাল থেকে বৌদ্ধ। কালের বিবর্তনে তারা বৌদ্ধধর্ম দশর্নকে হারিয়ে বর্তমানে বিস্মৃত বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত। ক্ষেত্রে বিশেষে প্রকৃতি পূজা এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা জানে তারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং আদম শুমারিতেও তারা সনাতন হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত।

১৯৯৪ সালে প্রকৌশলী জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ওরাঁও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে রংপুরে সাক্ষাৎ করে কথা বলেন। সড়ক ও জনপদ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়ার মতামতের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি মনুলাল বড়ুয়া, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. দিব্যেন্দু বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, ন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইয়ূথ ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া এবং সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার বড়ুয়াসহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের আন্তরিক সহযোগিতার ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারে ভারপ্রাপ্ত বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ থের, উত্তরবঙ্গের যান। এতে ছিলেন ঢাকা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু, সৌগত সম্পাদক ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, কুমিল্লা জেলার লাকসাম আলীশ্বর শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ জিনানন্দ ভিক্ষু। এ সময় রংপুর, দিনাজপুরসহ মিঠাপুকুর, চিতলীপাড়া, বৈরাতি, পাহাড়পুর, শাহপাড়া, আমানপুর, নওপুকুর বালাপাড়া, লাটকৃষ্টপুর, কাইনিপাড়া, ধর্মতলা, তিতলীপাড়া, কৃষ্টপুর দুলহাপুর ইত্যাদি গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং আদিবাসী ওরাঁওদের, বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ, বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদান করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা করেন তৎকালীন সড়ক ও জনপদ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌ. জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া। পরবর্তীতে প্রকৌ. জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া বুদ্ধানন্দ থের, জিনানন্দ ভিক্ষু, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, উত্তর কুমার বড়ুয়া, এসপি চৌধুরীসহ সমাজের সর্বস্তরের বৌদ্ধদের সাহায্য সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গে ১৯৯৫ সালে সর্বপ্রথম রংপুর মিঠাপুকুরে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। নামকরণ করা হয় বেণুবন বৌদ্ধ বিহার। এটি উত্তরবঙ্গের প্রথম ও কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার। বিহার প্রতিষ্ঠায়

Dhaka University Institutional Repository

মিঠাপুকুর ও তিতলী গ্রামের আদিবাসীগণের উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্যোগ ও অবদান স্মরণীয়।

মিঠাপুকুর আদিবাসীদের মধ্যে তখন দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি হল মঠাপুকুর আদিবাসী বৌদ্ধ কল্যাণ সমিতি এবং অন্যটি মিঠাপুকুর আদিবাসী বৌদ্ধ যুব সংঘ। সর্বপ্রথম এ দুটি সংগঠনের মাধ্যমে আদিবাসী বৌদ্ধরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৯৫ সালে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হলে অত্র গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে মিঠাপুকুর বেণুবন বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা পরিষদ নামে আরো একটি কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ থের সভাপতি এবং মাস্টার ইলিয়াস খালকোকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

বেণুবন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য গান্দু টপ্য ওরাঁও, পিতা মৃত চারু ওরাঁও ও মাতা সুমি ওরাঁও নামে একজন ধর্মপ্রাণ দায়ক সাড়ে তের শতক জমি দান করেন। কক্সবাজার জেলার উখিয়ার পাতাবাড়ী আনন্দভবন বিহার এর অধ্যক্ষ শ্রীমৎ রেবত প্রিয় মহাথের একটি বড় বুদ্ধমূর্তি বেণুবন বিহারে দান করেন। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার-ঢাকা থেকে একটি ছোট বুদ্ধমূর্তি প্রদান করা হয়।

মিঠাপুকুর বেণুবন বিহার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ থের বিহারাধ্যক্ষ ছিলেন। ২০ জানুয়ারী ১৯৯৬ সালে ভারপ্রাপ্ত বিহারাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়মিত অবস্থান করেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ঢেমশা গ্রামের শ্রীমৎ প্রজ্ঞাসার স্থবির। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস যাপন করেন কুমিল্লার লাকসাম নূরপুর গ্রামের আর্যমিত্র ভিক্ষু। পরবর্তী বেণুবন বিহারে প্রতিষ্ঠিত প্রভাতী বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার উপকরণ ও দুজন শিক্ষকের বেতন ১৯৯৬ সালে বাবু উত্তম কুমার বড়ুয়া প্রদান করতেন।[১১০]

প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাসের পীঠভূমি উত্তরবঙ্গের সুদীর্ঘকাল নিভৃত, বিস্মৃত প্রায়, প্রচ্ছন্ন জীবন যাপনকারী আদিবাসী বৌদ্ধদের মাঝে মহাকারুণিক বুদ্ধের বাণীকে প্রচার প্রসার ও প্রদীপ্ত করার মানসে সর্ব প্রথম যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে প্রকৌ. জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, শ্রীমৎ বুদ্ধানন্দ থের, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, ভিক্ষু জিনানন্দ থের, উত্তম কুমার বড়ুয়া, এস.পি. চৌধুরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন ভিক্ষু শীলভদ্র, স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ু য়াসহ চট্টগ্রামের শ্রীমৎ শীলরক্ষিত মহাস্থবির, শ্রীমৎ শাসনানন্দ মহাস্থবির, ড. সংঘ

প্রিয় থের, শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন থের, সম্যক সম্পাদক স্বপন কুমার বড়ুয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

৮.১০ ওরাঁও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান

ওরাঁও জাতিসত্তা সমুন্নত সাংস্কৃতিক ঐক্য চেতনায়। তাদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্য সংস্কৃতি অনুসরণ ও প্রতিবিম্বিত করে সুপ্রাচীন ধারা। প্রধান প্রধান পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পার্বণিক অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন হয় আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহের মাধ্যমে। জীবনচার, সামাজিক কার্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ সর্বক্ষেত্রে সাদৃশ্যের পরিচয়। দৈনন্দিন সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিচিত্র প্রবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে সংযোজিত হয় নতুন মাত্র। ওরাঁওরা অত্যন্ত সংস্কৃতি প্রিয়। ওরাঁওদের বহুমাত্রিক জীবনে রয়েছে নানা উৎসব অনুষ্ঠান। বিভিন্ন পূজা- পাবর্ণ ও উৎসবে ওরাঁওরা বেশ আনন্দ উল্লাস করার ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের ঐতিহ্যগত জীবন প্রণালী এবং নিজস্ব সংস্কৃতিতে অনেক আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। এ অনুষ্ঠান গুলো তারা মহাসমারোহে পালন করে। উৎসবগুলোতে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে নারী পুরুষ সকলে নাচ গান করে থাকে। এদের প্রতিটি অুনষ্ঠান জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত। ব্যক্তি পরিবার সমাজের কল্যাণ, শিকারে সাফল্য ও ফসল উৎপাদন উন্নয়ন চিন্তাই এসব উৎসবের বিশেষ উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রতিটি উৎসব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবের।

ওরাঁও সমাজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের ক্ষেত্রে উৎসব ও অনুষ্ঠানের বিচিত্র জীবনধারা, লোকজীবন ও লোকসাহিত্য পরিচয় অপরিহার্য। ওরাঁও সমাজের উৎসব ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানগুলো মূলত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

যথাঃ ১) পারিবারিক ও ২) সামাজিক পার্বণিক।[১১১]

এক: পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান

ওরাঁওদের পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে জন্ম বিবাহ মৃত্যু কেন্দ্রিক আচারনুষ্ঠান প্রধান। এগুলোই মূলত নিত্য পারিবারিক অনুষ্ঠান। তাদের এই পারিবারিক ক্রিয়া কর্মের অনুষ্ঠান গুলোকে আদি প্রথার নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। জন্ম

উত্তরবঙ্গের ওরাঁওদের প্রথাসিদ্ধ নিয়ম হলো নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন কিছু বাজিয়ে সমাজের মানুষকে তা অবগত করা হয়। তারা নবজাতের মুখে সর্বপ্রথম দিয়ে থাকে ছাগীদুগ্ধ। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে সর্বাগ্রে পান করতে দেওয়া হয় হলুদ মিশ্রিত ঈষৎ উষ্ণ পানি। এ ছাড়াও খাদ্য হিসেবে দেওয়া হয় মাছ, মাংস ও নিরামিষান্ন। প্রসূতি ও শিশুর মস্তকের কাছে দা, হাঁস, তীর জাতীয় এ ধরণের অস্ত্র রাখার, রীতি প্রচলিত রয়েছে। নবজাতকের মস্তকের কেশ কর্তন করানো হয় সাধারণত তিন, পাঁচ, সাত অথবা নবম দিবসে। শিশুর নামকরণ করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ভাবে। সাধারণত শিশুর বয়সের পঞ্চম বা নবম দিনেই অনুষ্ঠান করার প্রথা প্রচলিত। পিতার-পূর্ব পুরুষের বংশের নামের সাদৃশ্যে শিশুর নাম রাখা হয়। বর্তমান শিক্ষিত ওরাঁও সমাজে বহু আদি বিশ্বাস সংস্কারে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

২। বিবাহ

মানব জীবনের একটি অপরিহার্য পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন বিবাহ। বৌদ্ধদের মতো বিবাহ আদিবাসী সমাজে ধর্ম শাস্ত্রনিষ্ঠ নয়; শাস্ত্রীর ধর্মের মতো বিবাহ তাদের জীবনের ক্ষেত্রেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ে হয় নিজেদের রীতিনীতিতে। তবে ওরাঁও সমাজের বিবাহ পদ্ধতির সবটাই লোকাচার ও দেশাচার নির্ভর। তাদের সমাজে বর্তমানে দু'ধরনের বিবাহের প্রচলন রয়েছে। চুক্তিবদ্ধ বিবাহ ও প্রেম ঘটিত বিবাহ। তবে তাদের অধিকাংশ বিবাহ সম্পন্ন হয় চুক্তিবদ্ধ পদ্ধতিতে।[১১২]

বৌদ্ধদের বিবাহ রীতির মতো ওরাঁও সমাজে চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে কোন বিবাহ হয় না। ওরাঁওদের মধ্যে সমগোত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ওরাঁও সমাজের প্রাক বৈবাহিক প্রথম অনুষ্ঠানের নাম 'কুটমেত' প্রাক বৈবাহিক দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের নাম 'বড়িপাড়া' এবং প্রাক বৈবাহিক তৃতীয় অনুষ্ঠান হল 'মাড়োয়া'। এসব অনুষ্ঠানে তাদের প্রাচীন প্রথানুসারে হয়ে থাকে। এদের বিবাহে বৌদ্ধদের মতো সমাজের নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। বরকনের যাত্রা, মঙ্গল ঘট বা কাঁড়সা ভাড়া'য় উলুধ্বনি প্রচলিত। বিবাহ মন্ডপে বর কনেকে তিন, পাঁচ অথবা সাত বার প্রদক্ষিণ করতে হয়। ওরাঁও সমাজে বধু বরণ পদ্ধতি বৌদ্ধধর্মীয় নিয়মানুসারে হয়ে থাকে। এদের মধ্যে যৌতুকপণ প্রথা নেই। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ কদাচিৎ ঘটে থাকে।[১১২]

৩। মৃত্যু

জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যুতে। মৃত্যু চিরন্তন এবং শাশ্বত। আদিবাসী ওরাঁও সমাজে শাস্ত্রাচারের বিধি-বিধান নেই। তবে তারা বৌদ্ধধর্মের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এ কারণে তারা পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে মৃতলোকদের সৎকারের জন্য বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র বা প্রার্থনা রয়েছে। ওরাঁওরা মৃতদেহকে দাহ করে থাকে। সম্প্রতি আর্থিক সমস্যার কারণে দাহ করার আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে। বৌদ্ধধর্মী বিধান মতে, তারা মৃত ব্যক্তিকে সর্ব প্রথমে জ্যেষ্ঠ সন্তান দাহ বা সমাহিত করে থাকে। পাঁচ, সাত বা চৌদ্দ দিনে মৃত ব্যক্তির স্মরণে শ্রাদ্ধ বা পিন্ডিদান করে থাকে। উক্ত দিনে মৃত ব্যক্তির সন্তানরা মস্তক মুণ্ডন করে।[১১৩]

দুই: পার্বণিক উৎসব অনুষ্ঠানঃ

ওরাঁও সমাজে পার্বণিক উৎসবগুলোর মধ্যে প্রধান মূলত চারটি। যথা:

(১) ফাগুয়া (২) কারাম (৩) সারহুল ও (৪) সোহরাই।

১) ফাগুয়া

ফাগুয়া আদিবাসী ওরাঁওদের নববর্ষের উৎসব। বাংলা নববর্ষের নাম আদিবাসী ওরাঁও সমাজে 'ফাগুয়া' উৎসব নামে পরিচিত। এ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুণী পূর্ণিমায়। প্রকৃত পক্ষে ফাগুয়া ওরাঁওদের জাতীয় উৎসব বিশেষ।

ফাগুয়া উৎসব ফাল্গুণী পূর্ণিমার রাত থেকে শুরু হয়। ফাল্গুণ মাসে হয় বলে এর নাম ফাগুয়া উৎসব। এটি ওরাঁও সম্প্রদায়ের শুভদিনের একটি মাঙ্গলিক আনন্দঘন উৎসব। এর মূললক্ষ্য হলো পারিবারিক কল্যাণ, শুভ ও নতুনকে আহ্বান, পুরাতনকে বিদায়, গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, নবজাত সন্তানের কল্যাণ কামনা, নবগৃহে প্রবেশ, গুরুত্বপায় এবং এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক শিকার যাত্রা। এ উৎসবের দিন রাতের বেলা বিশেষ এক প্রকার গাছের ডাল মাটিতে পোঁতা হয় এবং অবিবাহিত যুবকরা পোঁতা ডালে খর দিয়ে আগুণ ধরে দেয়।

ফাগুয়া উৎসবের প্রথমেই পাহান বা পুরোহিত শিমুল, ভেরেন্ডা ও জিগা গাছের তিনটি শাখা পূঁজার জন্য নির্ধারিত স্থানে পুঁতে রাখে। এ পর্যায়ে পাহান একটি জীবিত মোরগকে খড়ে রেখে দেয় মূলত একজন পুরোহিত এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। এই অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হয় এক কলস হাড়িয়া, একটি কুলো, আতপ চাল, একটি মুরগীর ডিম, ধূপ, সিদুঁর, পানি, তিনটি তেলের পিঠা এবং তিনটি কাঁঠাল পাতা।[১১৪] পূঁজো উৎসর্গিত হয় অতি বিনয়ের সঙ্গে। এরপর শুরু হয় পূঁজার

Dhaka University Institutional Repository

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর থেকে চলে নানা প্রকারে পিঠা খাওয়ার ধূম এবং হাড়িয়া পনের মত্ততা।

২) সারহুল

এই পার্বণ সাধারণত চৈত্র মাসে উদ্‌যাপন করা হয়। ফাগুয়া শেষে সারহুলের বার্তা। চৈত্রমাসের চন্দ্রোদয়ের পর কোন এক দিনে সারহুল উৎসব হয়ে থাকে। এটি পারিবারিক উৎসব নয়; সামাজিক পার্বণিক উৎসব। (প্রাগুক্ত, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, পৃষ্ঠা-৬৮) এ পাবর্ণের সময় প্রতিটি ওরাঁও পরিবার পূর্বপুরুষের আত্মীয়কে স্মরণ করে পূজা অর্চনা করে থাকে। এ উৎসবের অন্যতম আর্কষণ হলো হাড়িয়া পানের জন্য হাড়িয়া প্রস্তুতের মহাসমারোহ। এ অনুষ্ঠানটির মূললক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো বৃষ্টির দেবতাকে আহ্বান করা। ফসলের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি সমাজের সার্বিক কল্যাণ কামনা। এছাড়াও সারহুল পার্বণের মূল তাৎপর্য হলো সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিয়ে। আবার ওরাঁও সম্প্রদায় সন্তান লাভ বা জমিকে উর্বরা শক্তির উত্তরাধিকারী করার আশায় সারহুল উৎসব প্রতিপালন করে থাকে। এদের ভাষায় সারহুলকে বলা হয় খাদদি বা খেকেল বেঞ্জা। বাংলাতে থাকে বোঝানো হয় পৃথিবীর বিবাহ।[১১৫] অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে গ্রামের নির্দিষ্ট একজন পাহান বা পুরোহিত। তাকে সহযোগিত করে দু'জন নারী-পুরুষ। পুরোহিতকে পূর্ব সন্ধ্যা হতে উপবাস থাকতে হয়। পূঁজোর জন্য কুলো, সিঁদুর, ধূপ, আতপ চাল, পুষ্প বিশিষ্ট শালের শাখা, ধূপপাত্র ও একটি লাল মোরগ।

৩) কারাম

কারাম উৎসব ওরাঁদের একটি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক পার্বণিক উৎসব। ওরাঁওদের সংস্কৃতিতে কারাম পূজা ওতপোতভাবে জড়িত। এটি মূলত তাদের সমাজের বাৎসরিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরব। সাধারণ ভাদ্র মাসে এ উৎসব পালন করা হয়। বিশেষ করে কারাম উৎসবটি সম্পন্ন হয় ভাদ্র-একাদশীতে বর্ষাকালে। কারাম পরব ভাদ্র মাসে 'ভাদই পরব' পালনের সামাজিক রীতি।[১১৬] এ কারণে উত্তরবঙ্গের ওরাঁওরা অনুষ্ঠানটি কারাম পরব, ভাদই পরব ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। কারাম পরবের অর্থ 'বৃক্ষের পূঁজা উপলক্ষে উৎসব'। অর্থাৎ কারাম বৃক্ষের পূজা।[১১৭] এই উৎসবকে কেন্দ্র করে উরাঁও সমাজের কিশোর- কিশোরী, যুবক-যুবতী, নর-নারী সকলে হয়ে উঠে নৃত্যগীত, সঙ্গীত মুখর ও পানাহারে মত্ত। এ সময় অবিবাহিত

যুবক-যুবতীরা উপবাস পালন করে থাকে। এ কারাম পরব উরাঁওদের একটি আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক তাৎপর্যময় অনুষ্ঠান। এতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুভূতির স্বরূপ এবং নৈতিক চরিত্রের বিশেষত্বের দিকটি রূপায়িত হয়ে থাকে। সাধারণত ভাদ্র একাদশী রজনীতে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলেও তার প্রস্তুতি চলে পূর্ব রজনীর শেষ প্রহর থেকে। পূজোঁর সাথে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নাচগান এবং কাহিনী পালাগান হয়ে থাকে। কারাম উৎসবকে মিলন ও আনন্দের উৎসব বলা হয়।

এ উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে ওরাঁও যবুক-যবতীরা গহীন অরণ্য থেকে করম বা কদম্ব বৃক্ষের শাখা কেটে এনে আখড়ায় স্থাপন করে। অতপর এটিকে কেন্দ্র করে নৃত্য ও গীত পরিবেশন করতে থাকে। সাধারণত অবিবাহিত যুবক-যবতীরাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। অনুষ্ঠান শেষে নৃত্যগীতের মাধ্যমে সেই করম বৃক্ষের শাখা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।[১১৮] প্রকৃতপক্ষে এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয় ও ধর্মীয় অনুভূতির স্বরূপ প্রকাশ পায়। এ উৎসবে পূজারী ধান, দূর্বা, পুষ্প, সিঁদুর, ধূপ, পানি এবং দুধ কলা উৎসর্গ করে কারাম বৃক্ষের নাদমূলে প্রণাম জানায়। এসময় আদিম সমাজের প্রাচীন জড়োপাসকের মতো ধর্মের আরাধানায় মন্ত্র উচ্চারণ করে থাকে।

৪) সোহরাই

ভাদ্রের ভাদোই তথা কারাম পরবের আমেশ শেষ হতে না হতেই সোহরাই অনুষ্ঠানের আগমনী বার্তা। এ উৎসব প্রধানত কার্তিক মাসে হয়ে থাকে। সোহরাই অর্থ গোয়াল পূজা, গবাদী পশুর কল্যাণ কামনা করা। বর্ষাস্নাত শ্রাবণ ভাদ্র-আশ্বিনের অবসর যাপনের পর কার্তিকে পুনরায় নবোদ্যমে চাষাবাদ শুরুর প্রাক্কালে চাষের প্রধান উপকরনাদির প্রতি যত্ন নেওয়া এর অন্যতম উদ্দেশ্যে। এটি প্রকৃতপক্ষে পরিবারকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার বার্ষিক আয়োজন বিশেষ। সোহরাই উৎসব চলে তিনদিন। কার্তিকের অমাবশ্যার পূর্বদিন থেকেই গৃহ, গৃহের আঙ্গিণা, গোশালা, প্রতিটি আঙ্গণকে লেপে মুছে পরিষ্কার পরিছন্ন করা হয়। এ অনুষ্ঠানের পূঁজোপকরণের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফুল, তুলসী পাতা, পাচঁ-সাতটি কাঁঠাল পাতা , ধানের গোছা, দূর্বা, আতপ চাল, পাচঁটি তেলপিঠা ধূপাধার, অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত দিয়াইর, সিঁদুর পানি ভর্তি ঘট, হাড়িয়া বা পচানি, একটা ধারালো হাত দা এবং নিখুঁত দেহের লাল রঙের একটি মোরগ ও একটি মুরগী। প্রতিটি উপকরণে থাকে সিঁদুরের ফোটা। পুরোহিত ও পূজারীর মাধ্যমে পূজা সম্পন্ন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৪ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ২০০২

২. বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, প্রধান পৃষ্ঠপোষক খান শাহাবউদ্দিন, উপদেষ্টা সম্পাদক আবুল কালাম মোঃ যাকারিয়া, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃষ্ঠা- উপদেষ্টা সম্পাদকের নিবেদন

৩. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪১

৪. Jadunath Sarker (Ed), History of Bengal, Vol-II, Dahaka University, Dhaka, 1948, P-2.

৫. **রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, আদিপর্ব, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৩৫২, পৃষ্ঠা-৭**

৬. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য ওরাঁও, ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৯

৭. রংপুর জেলার ইতিহাস, প্রকাশনায়, মোয়াজ্জেম হোসেন, জেলা প্রশাসক রংপুর, বাংলাদেশ, ২০০০ পৃষ্ঠা-১০২)

৮. আব্দুস সাত্তার, অরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃষ্ঠা-৩১৬

৯. Encyclopaedia Britanica, Vol.-1, P-67.

১০. দিনাজপুরের আদিবাসী, মেহরাব আলী, ২০০২, দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-২৬

১১. দিনাজপুরের আদিবাসী, মেহরাব আলী, দিনাজপুর, ২০০২, পৃষ্ঠা-২৭

১২. আদিবাসী (উরাঁও) ভাষা ডিক্শনারী ও কিছু তথ্য, বৈদ্যনাথ টপ্য, দীপ্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৩৫

১৩. পূর্ণাবিল্লী, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৮

১৪. পূর্ণাবিল্লী, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বড়দিন নববর্ষ ও কারাম উৎসব, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ১/গোপাল হালদার রচনা সমগ্র-২, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫

১৫. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১০১

১৬. Henry Frowde, Imperial Garetteer of India, Vol-VIII, 1908, P.256

১৭. Nurul Islam Khan, CSP, District Gazetter-Pabna GOB, Dhaka, 1978, P-65, W.W. Hunter, A statistical Account of Bengla (District Rajshahi maldah, Bogra, reprint, Delhi, 1974, P.45.

১৮. Ibid, R.C. majumder, 1965, P-113

১৯. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১০২

Dhaka University Institutional Repository

২০. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১০৩

২১. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১১১

২২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৩৪

২৩. Archaeological Survey of India vol. xv, A. Cunningham, Calcutta, 1882, P.145-146

২৪. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৫১

২৫. ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ), এ কে এম শাহনাওয়াজ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৬১-১৮৬

২৬. বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব, নীহার রঞ্জন রায়, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪৯৩

২৭. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৯৯

২৮. Archaeological Survey of India vol. xv, A. Cunningham, Calcutta, 1882, P. 40

২৯. বাংলাদেশের গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার, সুনীতি রঞ্জন বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-১৭

৩০. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৫৬

৩১. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৩৩

৩২. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৭৫

৩৩. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস পৃষ্ঠা-১৮৭/রামইপণ্ডিত, শূন্যপুরাণ, সম্পাদনা নগেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪ পৃষ্ঠা-১৪

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ও মোগল সংস্কৃতি, কামাল উদ্দিন হোসেন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩৭

৩৫. Epigraphia Indica, vol. IV, p. 243

৩৬. বরেন্দ্র আমার বরেন্দ্র, মমতাজ উদ্দীন আহমেদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, ১৯৯৮, রাজশাহী, পৃষ্ঠা-১২৯-৪০ ।

৩৭. F.J.Monaham, Varendra, Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1914, PP. 97-98.

৩৮. প্রাগুক্ত, ড. অতুল সুর, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা-১১০

৩৯. বাংলাদেশের সন্ধানে, মোবাশ্বের আলী, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-১৫০

৪০. প্রাগুক্ত, বাংলাদেশের সন্ধানে, পৃষ্ঠা -১৫৪

৪১. প্রাগুপ্ত, প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির পরিচয়, সাইফুদ্দীন চৌধুরী, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৫৩০

৪২. হিউয়েন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ভারত, যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (অনু.) বারিদ বরণ ঘোষ (সং, সম্পা), শরৎ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৭২

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. প্রাগুপ্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৫৩২

৪৪. হিউয়েন সাঙের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ভারত, যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (অনু), বারিদ বরণ ঘোষ (সং, সম্পা) শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৭২-৭৩

৪৫. Divayavadana, cowell and Neil (Ed.) Cambridge, 1886, P.21,

৪৬. Monument of Sanchi (Text), John Marshall, Delhi (reprint), 1982, P. 358

৪৭. মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর, নাজিমুদ্দীন আহমেদ, প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর, ঢাকা, ২য় সং, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৪

৪৮. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র ভূমি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব, মুহাম্মদ আবু তালিব, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৩৬

৪৯. সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আদিপর্ব, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৬১

৫০. ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, চর্যাগীতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬

৫১. মুহম্মদ আবু তালিব, উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সাধনা, রাজশাহী, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৪৭৩

৫২. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৯১

৫৩. ভিক্ষু সুনীথানন্দ, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২৭৮

৫৪. চর্যাপদ, শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের, চট্টগ্রাম , ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১৫

৫৫. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, কলকাতা, ১৪০০, পৃষ্ঠা-১১৬

৫৬. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা- ৮৮৯

৫৭. Epigraphica of India, Vol.xxi, P-83

৫৮. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা-৫

৫৯. সংসদ, বাঙালি চরিতাবিধান, কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২

৬০. প্রাগুক্ত, সংসদ, বাঙালী চরিতাবিধান, পৃষ্ঠা-১৮১

৬১. আ.কা.মো. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-২৭

৬২. Shahanara Husain, Same Historical Aspects of the Subhasitaratna kusa, Journal of the varender Research Museum, Rajshahi, 1974, Vol.-3, P-1

৬৩. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৯৪

৬৪. P. Lakshminarasiah, The Encyclopaedia of Bengal, Behar and Orissa, Madras, 1924-25, P-147

৬৫. Nanigopal majumdar, Inscription of Bengal, Vol-III, The Varendra Reserch Society, Rajshahi, 1929, P-42

৬৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ১ম খন্ড, নতুন সংস্করণ, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা-১০৯, মুহম্মদ মজির উদ্দিন, রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক, রাজশাহী পরিচিতি, বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা-১৩৩

৬৮. মুহম্মদ আবদুল জলিল, লোক সাহিত্যের নানা দিক, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৮০

৬৯. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলে শিক্ষার পটভূমি, আমানুল্লাহ আহমদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১১১৪

৭০. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব) সংক্ষেপিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃষ্ঠা-৩৫৮-৫৯

৭১. প্রাগুক্ত, বাঙালীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৩৫৮-৩৫৯

৭২. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৮, প্রবন্ধঃ বরেন্দ্রী, ড. এম আলতাফ হোসেন

৭৩. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩২, প্রবন্ধঃ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ড. মু. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

৭৪. **বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর** ঃ বাংলাদেশের প্রথম এবং বাংলার প্রাচীনতম জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। বরেন্দ্র অঞ্চলের পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই ১৯১০ সালে ইতিহাসানুরাগী কৃতবিদ্য তিন বাঙালি দিঘপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ম ইতিহাসবেত্তা ও আইনজীবি অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ উদ্যোগে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয় (The Guardian, Rajshahi University, Abul Hashem (ed.), 2001, pg-113) উদ্যোক্তরা উপলব্ধি করেছিলেন, একটি জাতির যুগের পর যুগ সভ্যতায়, ধর্মে-কর্মে, সমাজনীতি প্রভৃতিতে কতটা উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এবং তার বিপর্যয়ই কিভারে সাধিত হয়েছিল অবিসংবাদিত রূপে একমাত্র ইতিহাসই পারে তার সাক্ষ্যদান করতে। এই তিন মনীষী বিশেষ করে বঙ্গীয় শিল্পকলায় উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির সভাপতি হন কুমার শরৎকুমার রায় এবং অধ্যক্ষ ও সম্পাদক হন যথাক্রমে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রমাপ্রসাদ চন্দ।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষে কুমার শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রমাপ্রসাদ চন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামকমল সিংহ ও কলকাতা জাদুঘরের রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত হয় অনুসন্ধানী দল। রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে বেশ কিছু দুস্পাপ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগ্রহ করেন। কালক্রমে এটি অচিরকালেই বঙ্গীয় শিল্পকলার সমৃদ্ধ ভান্ডার হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিত লাভ করে। (সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩৩, প্রবন্ধঃ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ড. মু. সাইফুদ্দীন চৌধুরী) বরেন্দ্র জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, বৈষ্ণব মূর্তিসহ নানা দেবদেবীর মূর্তি, ধাতব ভাস্কর্য, মৃন্ময়মূর্তি, মৃৎভাণ্ড, শিলালিপি, তাম্রশাসন, হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি। জাদুঘরের প্রত্ননিদর্শনের সংখ্যা আট হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অষ্ট সাহাস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতার দুলভ সংগ্রহসহ হস্তলিখিত পুঁথির সংখ্যাও সাড়ে চার হাজারের মতো

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এবং জাদুঘরে সংগৃহীত প্রত্নসম্পদ বাংলার অমূল্য নিদর্শন। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের সাবেক পরিচালক ড. মু. সাইফুদ্দীন চৌধুরী এবং বর্তমান ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ যাকারিয়া

বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর ঢাকার শাহবাগে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১০২টি জাদুঘর রয়েছে। বৌদ্ধ ইতিহাসে ঐতিহ্য ভাস্কর্য শিল্প ও জাতিতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের জন্য কুমিল্লার ময়নামতি জাদুঘর এবং চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর প্রসিদ্ধ।

৭৫. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩২, প্রবন্ধঃ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ড. মু. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

৭৬. Politcal Centers and Cututral Region in Early Bengal, B.M, Morrison, P. 1009-114. উদ্ধৃত, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আব্দুল মমিন চৌধুরী, বর্ণায়ন, ঢাকা; ২০০২, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬

৭৭. বাংলার প্রাচীন ইতিতাসও সংস্কৃতি ও আবদুল মমিন চৌধুরী, বর্ণায়ন, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭

৭৮. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যদ, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-২০৬/প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮

৭৯. The Rama Charitam of Sandhyakra Nandin, The Vrandra Research Society, Rajshahi, 1939, P. 153

৮০. প্রাগুক্ত, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮

৮১. **উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড.মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৯**

৮২. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আব্দুল মমিন চৌধুরী, বর্ণায়ন, ২০০২, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫১

৮৩. Inscription of Bengal, Vol-III, P-99

৮৪. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৩, পৃষ্ঠা-১১৬

৮৫. **প্রাগুক্ত, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা-৫২**

৮৬. সাহিত্যের পথে, ড. মাযহারুল ইসলাম, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৮

৮৭. তবকাৎ-ই-নাসিরী (১ম খণ্ড), মীনহাজ-ই-সিরাজ, অনুবাদ আ.কা,মো. যাকারিয়া, ১৯৬৩, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯

৮৮. Geography of Bangladesh, Haroun Rashid, The University Press Limited, 1991, Dhaka, Rivers of the Bengal Delta, S.C. Majumder, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941

৮৯. বরেন্দ্র আমার বরেন্দ্র, মমতাজ উদ্দীন আহমেদ, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, ১৯৯৮, রাজশাহী, পৃষ্ঠা-১২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৯০. আদিবাসী (উরাঁও) ভাষা ডিক্শনারী ও কিছু তথ্য, বৈদ্যনাথ টপা, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-৯

৯১. দিনাজপুরের ইতিহাস, মেহরাব আলী, ২০০২, দিনাজপুর, পৃষ্ঠা-১৫> নৃতাত্ত্বিকভাবে ওরাঁওরা প্রাক-দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠির লোক> প্রাগুক্ত, অরণ্য, জনপদে, পৃষ্ঠা-৪১৯

৯২. প্রাগুপ্ত, বাঙালীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৪৫, History of Bengal, R.C. Majumder, P-20

৯৩. Archaeological Survey of India, vol-xv, A. Cunningham, Calcutta, 1882, P.P-40, 116

৯৪. G.A. Grierson Languastic Survey of India, vol. V, 1906, New Dheli, India, P. 40

৯৫. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড. মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪৪

৯৬. সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,১ম খণ্ড, শ্রী পরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৫১

৯৭. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড.মোঃ আব্দুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪৩

৯৮. J.G Frazer, Tootemism and Exogamy, vol.-III, London, P.- 400

৯৯. Verrier Elwin, The muria and Their Ghotul, Oxford University Press, London, 1994, P.-180.

১০০. বাঙালির চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা, আহমদ শরীফ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৮৭ পৃষ্ঠা-৫-৬

১০১. আব্দুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩৩

১০২. আব্দুস সাত্তার, আরণ্য জনপদে, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩৪০/ Descriptive Ethopology of Bengal, E.T. Colonel Dolton, 1872, London, P. 254

১০৩. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধ, প্রবন্ধঃ স্বপন এক্কা, সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদ, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৭

১০৪. ময়নামতি, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৫, প্রবন্ধ: উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধধর্মের জাগরণ, স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়া

১০৫. পূণ্যবিত্রী. ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-২৫

১০৬. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড.মুহম্মদ আবদুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৪২

১০৭. প্রাগুক্ত, অরণ্য জনপদে, আবদুস সাত্তার, পৃষ্ঠা-৪১৯

১০৮. রংপরের আদিবাসী ও প্রাসঙ্গিক কথা, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, স্মরণিকা, উখিয়া আনন্দ ভবন বিহার, কক্সবাজার, ১৯৯৫

১০৯. উত্তরবঙ্গের আদিবাসী উরাঁও প্রকৃতভাবে আদি বৌদ্ধ, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, সৌগত, ১০ম ২০০৫,পৃষ্ঠা-৪২

Dhaka University Institutional Repository

১১০. স্মরণিকা, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২৭-২৮, প্রবন্ধ: উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধঃ সংক্ষিপ্ত ঘটনা ও পরিচয়, বুদ্ধানন্দ থের

১১১. প্রাগুক্ত, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য: ওরাঁও, পৃষ্ঠা-৫১

১১২. প্রাগুক্ত, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল, পৃষ্ঠা-৫৪

১১৩. পূর্ণাবিল্লী, ১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১, বক্তব্য ও মন্তব্যঃ অর্পা কুজুর

১১৪. আদিবাসী ওরাঁও ভাষা ডিক্‌শনারী ও কিছুতথ্য, বৈদ্যনাথ টপ্য, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ২৫

১১৫. Uraon Religion and Customs, P. Dehon, London, p-139/ উদ্ধৃত, অরণ্য জনপদে, আবদুস সাত্তার, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩২০

১১৬. উত্তরবঙ্গে লোকজীবন ও লোকসাহিত্যঃ ওরাঁও, ড. মোঃ আব্দুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৭২

১১৭. আদিবাসী (উরাঁও) ভাষা ডিকশনারী ও কিছুতথ্য, বৈদ্যনাথ টপ্য, ঢাকা, ২০০৪, পৃষ্ঠ-২৮

১১৮. অরণ্য জনপদে, অবদুস সাত্তার, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩২০

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ঈশান চন্দ্র ঘোষ, জাতক (১-৬ খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৪

২. নির্মল চন্দ্র ঘোষ, ভারত শিল্প, কে.এল.এম.ফার্মা, কলিকাতা, ১৯৭৩

৩. সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, শাক্যমুণি চরিত্র ও নির্বাণতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৮০৪

৪. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রচনাবলী (৩য় খণ্ড), (সম্পাঃ), ইস্টার্ণ ট্রেডিং কো., কলিকাতা, ১৩৫২

৫. সুকোমল চৌধুরী, বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৮০

৬. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম, মজুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩০৮

৭. বিমল চন্দ্র দত্ত, বৌদ্ধ ভারত, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইনঃ অফ রিসার্চ এণ্ড কালচার, কলিকাতা, ১৯৭৩

৮. ড. আশা দাশ, বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৯৬৯

৯. নলীনিনাথ দাশ গুপ্ত, বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম, এ মুখার্জী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৫৫

১০. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, ফার্মা কে এল এম, কলিকাতা, ১৯৬৬

১১. বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৭৯

১২. দীনেশ চন্দ্র সরকার, পাল পূর্বযুগের বংশানুচরিত, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৫

১৩. দীনেশ চন্দ্র সরকার, পাল সেন যুগের বংশানুচরিত, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮২

১৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধ ধর্ম, পূর্বাশা লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৫৫

১৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরানো বাংলায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩৫৮, (২য় সং) ১৯৫৯

১৬. মনীন্দ্র ভূষণ গুপ্ত, শিল্প ভারত ও বর্হিভারত, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৫

১৭. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ভারত শিল্পের কথা, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯

১৮. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৭৪

১৯. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, মহাবর্গ, যোগেন্দ্র রূপসী বাংলা ত্রিপিটক ট্রাস্ট বোর্ড, কলিকাতা, ১৯৩৭

২০. সাধনানন্দ মহাথের, সুত্ত নিপাত, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৭

২১. রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির, মহাপরিনির্বাণ সূত্র (অনুবাদ), চট্টগ্রাম, ১৯৪৯

২২. শীলভদ্র ভিক্ষু, দীর্ঘ নিকায় (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা

২৩. শীলভদ্র ভিক্ষু, সুত্ত নিপাত, কলিকাতা, ১৩৯২

২৪. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, মধ্যম নিকায়, ২য় ভাগ (অনুবাদ), রাজেন্দ্র সিরিজ-১, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৫৬

২৫. বিধুশেখর (শাস্ত্রী) ভট্টাচার্য, ভিক্ষু পাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষ, মালদহ, ১৩২১

২৬. ড. বেণী মাধব বড়ুয়া, মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা,

Dhaka University Institutional Repository

২৭. দেবপ্রসাদ ঘোষ, ভারতীয় শিল্পধারা, প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৬

২৮. সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, কলকাতা, ১৯৯৫

২৯. অশোক মিত্র, ভারতের চিত্রকলা, কলিকাতা, ১৩৬৩

৩০. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ললিত বিস্তর, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা, ১৯৯৯

৩১. ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, মধ্যম নিকায় (৩য় খণ্ড), ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৩

৩২. ড. কানাইলাল হাজরা, আদিবুদ্ধ, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৩

৩৩. রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড), মনমোহন প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৯

৩৪. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ধর্মপাল, কলিকাতা, ১৯৮২

৩৫. ভগবতানুজ বন্দোপাধ্যায়, ধর্মের ভবিষ্যৎ, এলাহিও পাবলিকার্স লি., কলকাতা ১৯৯৫

৩৬. নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালির ইতিহাস, আদিপর্ব, বুক এম্পোরিয়াম, কলিকাতা, ১৩৫৭

৩৭. ধর্মাধার মহাস্থবির, মিলিন্দ প্রশ্ন (অনুবাদ), কলিকাতা, ১৯৮৭

৩৮. ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭৪

৩৯. বিমলা চরণ লাহা, বৌদ্ধ যুগের ভূ-গোল, কলিকাতা, ১৩৩৫

৪০. শ্রীধর চন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৪১

৪১. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৫১/১৯৫২

৪২. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৬২

৪৩. ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ (১ম ভাগ), ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট, কলিকাতা, ১৯৩৬

৪৪. ড. বেণী মাধব বড়ুয়া, বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, কলিকাতা, ১৯২২

৪৫. সরসী কুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৮

৪৬. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বৌদ্ধ দর্শন, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৬

৪৭. ড.মনি কুন্তলা হালদার দে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৯৬

৪৮. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭

৪৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, কলিকাতা, ১৯৯৫

৫০. ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০০১

৫১. অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীনযুগ), শ্রীধরা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৫

৫২. আবদুল হক চৌধুরী, প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

৫৩. অশোক কুমার দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার, ঢাকা, ১৯৯৩

৫৫. অলকা চট্টোপাধ্যায়, অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান, কলিকাতা, ১৯৮২

৫৬. ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫

৫৭. ড. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভাস্কর্য, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, ১৯৯৯

৫৮. রুবী বড়ুয়া / বিপ্রদাস বড়ুয়া, গৌতম বুদ্ধ: দেশকাল ও জীবন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭

৫৯. ড. সুকোমল বড়ুয়া, পালি ছন্দ ও অলংকার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০০

৬০ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও বেরত প্রিয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ধর্মপদ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৬১. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্ত বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০২

৬২. ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩

৬৩. সত্যপ্রিয় মহাথের, চুল্লবর্গ (বিনয় পিটকে তৃতীয় খণ্ড), অনুবাদ, বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, ২০০৩

৬৪. পালি-বাংলা অভিধান, (প্রথম খন্ড) (অ থেকে ন পর্যন্ত), বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০১

৬৫. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৪১,১৩৪২

৬৬. বিপ্রদাশবড়ুয়া ও ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া (সম্পা), বৌদ্ধ রঞ্জিকা, নীলকমল দাস রচিত, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

৬৭. ফুলচন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, চট্টগ্রাম, ১৮৭৩

৬৮. সুমন চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারত, কলিকাতা, ১৯৮৪

৬৯. বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, নালন্দা নিবাস, চট্টগ্রাম, ১৯৪০

৭০. উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, বড়ুয়া জাতি, চট্টগ্রাম, ১৯৫৯

৭১. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮০

৭২. পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রামের ইতিহাস, চট্টগ্রাম, ১৯৯০

৭৩. ডা. রামচন্দ্র বড়ুয়া, চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস, চট্টগ্রাম, ১৯০৫

৭৪. বিরাজ মোহন দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯৬৯

৭৫. ড. রামেশ্বর শর্মা, সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খন্ড), কলিকাতা, ১৯৮৩

৭৬. শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, পালি প্রকাশিকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮২

৭৭. শীলাচার শাস্ত্রী ভিক্ষু, মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, চট্টগ্রাম, ১৯৭৮

৭৮. শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, ময়নামতির ইতিকথা, সম্বোধি সোসাইটি কুমিল্লা, ১৯৬৯

৭৯. ধর্মতিলক স্থবির, সদ্ধর্ম রত্নাকর, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৩৬

৮০. মাহবুব আলম, চট্টগ্রামের ইতিহাস, মায়ালোক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫

৮১. ড. নাজিমুদ্দীন আহমদ, মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর, প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ, ঢাকা, ১৯৭৯

৮২. ড. করুণানন্দ ভিক্ষু, পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪

৮৩. ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য়), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪-৮৬

৮৪. জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, আত্মঅন্বেষা: বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯

৮৫. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, সম্রাট অশোক (সংকলন), প্রকাশক: বটনকুমার বড়ুয়া, ঢাকা, ২০০২

৮৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিষয়:বৌদ্ধধর্ম, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদনায়), কলিকাতা, ২০০২

৮৭. আলী ইমাম, প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ বিহার, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬

৮৮. অমূল্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৫৬

৮৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বৌদ্ধগান ও দোহা, (২য় সংস্করণ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৯৫১

৯০. সুশান্ত কুমার সরকার, পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সমীক্ষা, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮২

৯১. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, সদ্ধর্ম রত্নমালা, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভা, কলিকাতা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৯২. অধ্যাপিকা সুফিয়া খান (অনুবাদ), প্রফেসর পিয়ার বেছানে, এম.এ. ডি লিট, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৭

৯৩. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৮

৯৪. ড. সুকোমল চৌধুরী, মহামানব বুদ্ধের জীবন ও বাণী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা, ২০০০

৯৫. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা, চর্যাগীতিকা, (সম্পাদনায়), স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার ঢাকা, ১৯৯৫

৯৬. ড. সাধন চন্দ্র সরকার, বৌদ্ধ শিল্পকলা ও স্থাপত্য, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর প্রকাশনী, কলিকাতা

৯৭. সুদর্শন বড়ুয়া, ত্রিপিটক পরিচিতি (১ম ও ২য়), চট্টগ্রাম, ১৯৯৬

৯৮. এম. দেলওয়ার হোসেন, ইতিহাসতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬

৯৯. মং বা অং(মং বা), রাখাইন জাতিসত্তা ও বাংলাদেশ, প্রকাশক উ খিং নু (নু শাং), চট্টগ্রাম, ২০০৫

১০০. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৯০

১০১ . শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯২

১০২ . ড. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৬, ৩য় সং, ২০০১

১০৩ . সফল আলী আকন্দ, বাঙালীর আত্মপরিচয়, রাজশাহী, ১৯৯১

১০৪ . অশোক চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী, পাল অভিলেখ সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯২

১০৫ . আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ঢাকা, ২০০২

১০৬ . কাজী মোহাম্মদ মিছের, রাজশাহীর ইতিহাস, রাজশাহী, ১৯৬৫

১০৭ . রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীনযুগ), দে'জ প্রকাশন, কলিকাতা, ২০০২

১০৮ . ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড), সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৩৮৯

১০৯ . বীরেন্দ্র নাথ বসু ঠাকুর, পূর্ববঙ্গে পাল রাজাগণ, ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯১৩

১১০. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, জুন মুদ্রণ, ১৯৯৩

১১১ . নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতা ১৩২১ বঙ্গাব্দ

১১২ . কমল মজুমদার, বাঙালির ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮৩

১১৩ . শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস (রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত), ২য় খন্ড, কলকাতা. ১৯৮৭

১১৪ . সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বাঙালীর ইতিহাস (সংক্ষিপ্ত), কলকাতা, ১৯৬০

১১৫ . ড. অতুল সুর, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলকাতা, ১৯৭৭, জিজ্ঞাসা, (২য় সং) কলিকাতা, ১৯৭৯

১১৬ . মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯

১১৭ . আবুল মোমেন, বাংলা ও বাঙালির কথা, ঢাকা, ১৯৯২

১১৮ . অসীম রায়, বঙ্গবৃত্তান্ত, কলকাতা, ১৯৮৮

১১৯ . সৈয়দ আমীরুল ইসলাম, বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস, প্যাপিরাস, ঢাকা, ১৪০২/ ১৯৯৬

১২০ . অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, নয়া প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৯

১২১ . আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সাইফুর রশীদ, নৃবিজ্ঞান, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৫

১২২ . ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮৩

১২৩ . আহমদ কবীর ও আবুল হাসনাত, আহমদ শরীফ রচনাবলী (সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

১২৪ . ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৮৭

১২৫ . অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা,

১২৬ . অশোক কুমার দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার, ২য় খণ্ড, সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজেস, ঢাকা, ১৯৯৩

১২৭ . আ.কা.মো. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ঢাকা, ১৯৯৮

১২৮. সুগত চাকমা, বাংলাদেশের উপজাতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫

১২৯. অশোক কুমার দেওয়ান, চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার, ১ম খণ্ড, তিলোত্তমা মুদ্রণালয়, ১৯৯১

১৩০. ভক্তগাংশ মে, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ, ফিরমা কলম প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৯৬

১৩১. সুগত চাকমা, পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি, ঢাকা, ১৯৯৩

১৩২. লাল সাহেব, বিচিত্র উপজাতির জীবন ও পাবর্ত্য চট্টগ্রামে সমস্যা, ইউসুফ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৪

১৩৩. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৫

১৩৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম......৭ম), কলকাতা, ১৯৯২,

১৩৫. গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০০,

১৩৬. আলী ইমাম, বাংলা নামে দেশ, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৭

১৩৭. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০

১৩৮. মো. মোশারফ হোসেন, প্রত্নতত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮

১৩৯. ড. সুকুমার সেন, বঙ্গ ভূমিকা, কলকাতা, ১৯৪৭.পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমী, কলিকাতা, ১৯৯৯

১৪০. ওয়াকিল আহমদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৪, গতিধারা, ঢাকা, ২০০১

১৪১. ড.দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দাশ গুপ্ত এ্যান্ড কো. লি., (৭ম সং), কলিকাতা, ১৯৪১

১৪২. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, বাংলা অলঙ্কার, মডার্ণ বুক এজেন্সী, প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৯

১৪৩. গোপাল হালদার, বাঙালির সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৬৩

১৪৪. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,(৭ সং) কলিকাতা, ১৯৬২

১৪৫. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, বিশ্ব সভ্যতা (প্রাচীন যুগ), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬

১৪৬. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, বিশ্ব সভ্যতা (মধ্যযুগ), প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৭

১৪৭. সৈয়দ আলী আহসান, চর্যাগীতিকা প্রসঙ্গ, মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৩

১৪৮. শরিফ উদ্দিন আহমেদ, দিনাজপুর ইতিহাস ও ঐতিহ্য, (সম্পাদক) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৬

১৪৯. কাজী মোহাম্মদ মিছের, বগুড়ার ইতিকাহিনী, বগুড়া, ১৯৫৭

১৫০. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, সদ্ধর্মের পুনরুত্থান, কলিকাতা, ১৯৮৯

১৫১. মুহঃ মমতাজুর রহমান, সভাপতি, আ.কা.মো. যাকারিয়া, উপদেষ্টা সম্পাদক, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, বরেন্দ্র অঞ্চলের গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, বিভাগীয় কমিশানারের কার্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯৮

১৫২. কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৯৩

১৫৩. মজুমদার রমেশ চন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), কলকাতা, ১৩৫২

১৫৪. নীরুকুমার চাকমা, বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও দর্শন, মিনার্ভ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫. মীনহাজ-ই-সিরাজ (অনুবাদ ও সম্পাদনা আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া), তবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৩

১৫৬. ড. এ.কে.এম ইয়াকুব আলী, বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

১৫৭. ড. শরীফ উদ্দিন আহম্মেদ, সিলেটঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯

১৫৮. ড. নজরুল ইসলাম, বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, ১৪০১

১৫৯. বৌদ্ধ ভারত, বারিদ বরণ ঘোষ (সম্পা), শরৎ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা, ১৯৮৮

১৬০. ড. এম.এম. রফিকুল ইসলাম, প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসঃ সেনযুগ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০১

১৬১. ড. মুস্তাফা নুর উল ইসলাম (সম্পাদিত), আবহমান বাংলা, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯

১৬২. ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৩৬৩

১৬৩. ড. আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৩

১৬৪. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯৮

১৬৫. শ্রী শান্তি কুসুম দাশ গুপ্ত, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৮

১৬৬. সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ, জাতক সমগ্র, কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ১৯৯৫

১৬৭. যতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ (আদি মধ্য যুগ), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৯

১৬৮. ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (১ম খণ্ড) স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮

১৬৯. আবুল মোমেন, বাংলা ও বাঙালির কথা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

১৭০. ড. মোঃ হাননান (সম্পা), সহস্রাব্দের বাংলাদেশ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

১৭১. ড. অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৮

১৭২. ড. সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), বাংলা পিডিয়া (১ম থেকে ১০ম খণ্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

১৭৩. ড. আহমদ শরীফ, বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

১৭৪. ড. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, (১ম খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০

১৭৫. অধ্যাপক কে. আলী, পাক ভারত ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৭০

১৭৬. ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ, চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৯১

১৭৭. মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরান বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০০

১৭৮. মহেন্দ্র চন্দ্র রায়, বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ, (২য় সং), কলিকাতা, ১৯১৫

১৭৯. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, রূপা এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৯১

১৮০. রমা প্রসাদ চন্দ, গৌড় রাজমালা, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

১৮১. রমা প্রসাদ চন্দ্র, ইতিহাসে বাঙ্গালী, কে.পি. বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮১

১৮২. গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা), ইতিহাসে অনুসন্ধান, কে. পি বাগচী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৮৯

১৮৩. আবদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৮

১৮৪. শ্রীভুদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৮

১৮৫. অমূল্য চন্দ্র সেন, অশোক লিপি, ইন্ডিয়ান পাবলিকেটিং সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৫৩

১৮৬. ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৯৮

১৮৭. বিপ্রদাশ বড়ুয়া, বাংলাদেশের বিহার ও প্রত্নসম্পদ, নবযুগ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

১৮৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব (১২০৪-১৩৩৮), সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৮

১৮৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬), খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ঢাকা, ২০০০

১৯০. কাবেদুল ইসলাম, প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠি, উত্তরণ, ঢাকা, ২০০৪

১৯১. ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের ইতিহাস, চট্টগ্রাম, ১৯৮১

১৯২. ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৮

১৯৩. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভোলগা থেকে গঙ্গা, চিরায়ত প্রকাশন প্রা.লি., কলকাতা, ২০০১

১৯৪. ড. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, জ্যোৎস্নালোক, কলকাতা, ১৯৯০

১৯৫. ড. অতুল সুর, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯০

১৯৬. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, জেনারেল, কলকাতা, ১৩৮৪

১৯৭. পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া, হস্তসার বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ, বুদ্ধিস্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, ৩য় সং, ২০০৪

১৯৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল জলিল, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী লোকজীবন ও লোকসাহিত্য: ওরাঁও, ঢাকা, ১৯৯৯

১৯৯. দীনেশ চন্দ্র সরকার, শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮২

২০০. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৯৭

২০১. শ্রী মুরারি মোহন সেন, ভাষার ইতিহাস (১ম পর্ব), এম. ব্যানার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৯৮

২০২. ড. সাধন চন্দ্র সরকার, বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৭

২০৩. ক্ষিতি মোহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলিকাতা, ১৯৬১

২০৪. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন কাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত), অধুনা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩

২০৫. ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১), জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০২

২০৬. ড. মোঃ মুহিব উল্যাহ সিদ্দিকী (সম্পাদিত), আরাকানের মুসলমান ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আরাকান হিসটরিক্যাল সোসাইটি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২০০০

২০৭. সুকুমার সেন, প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, কলিকাতা, ১৩৫৫

২০৮. সুকুমার সেন, মধ্য যুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, কলিকাতা, ১৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

২০৯. ড. মোহাম্মদ হান্নান, কারা বাঙালি কেন বাঙালি, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৮

২১০. ড. অজয় রায়, আদি বাঙালি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৭

২১১. রেজিয়া রহমান, বং থেকে বাংলা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

২১২. খন্দকার মাহমুদুল হাসান, ভারতীয় উপমহাদেশের সভ্যতা ও প্রত্নতত্ত্ব, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০২

২১৩. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৪

২১৪. মোঃ আইয়ুব খান, বাংলার ইতিহাস (১৭৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত), মৌসুমী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

২১৫. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৯৮

২১৬. সন্ধ্যাকর নন্দী, রামচরিত, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯৯১

২১৭. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৯৮৪

২১৮. কালীপ্রসন্ন সেন, শ্রী রাজমালা, কলকাতা, ১৯২৬-৩৬

২১৯. রাজা ভুবন মোহন রায়, চাকমা রাজবংশের ইতিহাস, চট্টগ্রাম, ১৯১৯

২২০. সতীশ চন্দ্র ঘোষ, চাকমা জাতিঃ জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

২২১. সুগত চাকমা, চাকমা পরিচিতি, বরগাঙ পাবলিকেশন, রাঙ্গামাটি, ১৯৮৩

২২২. যোগেশ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতি, শান্তিঘোষ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫

২২৩. সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৪

২২৪. বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা ও অন্যান্য, তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি, নিও কনসেপ্ট লিমিটেড, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫

২২৫. মুস্তাফা মজিদ, পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৯

২২৬. সুগত চাকমা, বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ২০০২

২২৭. মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), আদিবাসী রাখাইন, দেশ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

২২৮. মুস্তাফা মজিদ (সম্পা), মারমা জাতিসত্তা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪

২২৯. বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা), পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

২৩০. দীপক বড়ুয়া সৃজন, হাজার বছরের বাঙালি বৌদ্ধ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮

২৩১. আতিকুর রহমান, গবেষণা কর্ম: পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, ২০০০

২৩২. মোঃ মোশারফ হোসেন ও মোঃ মাহবুবুল হক, নিভৃতে নিবাসী, মৌ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

২৩৩. আবদুস সাত্তার, আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৮

২৩৪. আবদুস সাত্তার, অরণ্য জনপদে, জলি বুকস্, ঢাকা, ১৯৬৬

২৩৫. অরুন বিকাশ বড়ুয়া, বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চট্টগ্রামের বড়ুয়া সম্প্রদায়, চট্টগ্রাম, ১৯৮৯

২৩৬. ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া (অনু), গন্ধবংস, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫

২৩৭. আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা), চর্যাগীতিকা, ঢা. বি., ঢাকা ১৯৮৬

২৩৮. শ্রী চারুচন্দ্র বসু, অশোক ও অশোক অনুশাসন, সিটি বুক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩১৮

২৩৯. ড. রংগলাল সেন, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩

২৪০. প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তী, নাথধর্ম ও সাহিত্য, আলিমপুর দুয়ার, কলিকাতা, ১৩৬৬

২৪১. মনীন্দ্রমোহন বসু (সম্পা), সহজিয়া সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩২

২৪২. সাধন কমল চৌধুরী, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিকাশ, করুণা প্রকাশনা, কলকাতা, ২০০২

২৪৩. ডি.পি বড়ুয়া, বাঙালি বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬

২৪৪. চারুচন্দ্র বসু, ধর্মপদ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯০৪

জার্ণাল ও পত্র-পত্রিকা :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, বাংলা বিভাগের সাহিত্য পত্রিকা, দর্শন বিভাগের দর্শন পত্রিকা, ইতিহাস পরিষদের ইতিহাস পত্রিকা, ইতিহাস সমিতির পত্রিকা,এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণাল, বাংলা একাডেমী জার্ণাল, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পত্র-পত্রিকা, বঙ্গীয় শিল্পকলা জার্ণাল, ভারতবর্ষ পত্রিকা, বিভিন্ন বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository

SELECTED BIBLIOGRAPHY

1. A. M. Chowdhury, Dynastic History of Bengal, ASP, Dhaka, 1967.
2. B. M. Mourison, Settle, Lalmai, A Cultural Center of Early Bengal, London, 1974.
3. K. Sri Dharmmananda, What Buddhists Believe, Taiwan, 1998.
4. Sir Herbert Hope Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, 1891.
5. B. C. Sen, Some Historical Aspects of the Inscription of Bengal, University of Calcutta, Calcutta, 1942.
6. Jadunath Sarker (ed), History of Bengal (Vol. I, II), Dhaka University, Dhaka, 1948.
7. D. K. Chakrabarti, Ancient Bangladesh, The University Press Limited (UPL), Dhaka, 1992/2003.
8. Dr. Shamsul Din Ahamed, Inscription of Bengal, Varendra Research Museum, Rajshahi, 1960.
9. Dr. Prabodh Chandra Bagchi, Pre-Aryan and Pre Dravidian, (Trans), Asian Educational Services, India, 1993.
10. Dr. Dilip Kumar Chakabarti, Ancient Bangladesh: A study of the Archaeological Sources, UPL. Bangladesh, 1992.
11. Binayendra Nath Chaudhury, Buddhist Centres in Ancient India, Sanskrit College, Calcutta, 1982.
12. Dr. Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Rupa & Co., New Delhi, 2002.
13. Dr. Nalinaksha Dutt, Early Monastic Buddhism, Firma KLM., Calcutta, 1971.
14. Kalikinkar Dutta (ed), The History of Bengal, Vol. 1, Dacca University, 1963.
15. Dr. Puspa Niyogi Jijnsa, Buddhism in Ancient Bengal, Calcutta, 1980.
16. Dr. Hemchandra Ray Chaudhuri, Political History of Ancient India: From the Accession of Parikstut to the Extinction of the Gupta Dynasty, Oxford University Press, 1996.
17. Dr. Bani Ray Chaudhuri, The Political History of Bengal to the Rise of the Pala Dynasty, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, 1990.
18. Dr. Deviprasad Chattopadyaya, History of Buddhism in India, Lama Taranatha, Motilal Banarsidass, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

19. Dr. Romila Thapar, Asoka and the Decline of the Mauryan, Oxford University Press, Delhi, 1992.

20. J. Takakusu, A Record of Buddhist Religion I-tsing, Translated, Oxford, London, 1896.

21. Samuel Beal, Travels of Hiouen Thsang, Translated, Vol-IV, Calcutta, 1931.

22. A. N. Chaudhury, Dynastic History of Bengal, Dhaka 1907.

23. G. A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol-I, Delhi, 1968.

24. V. A. Smith, The Early History of India, London, 1957.

25. B. Chattapadhyaya, Taranaths History of Buddhism in India, K. P. Bagchi and Co., Calcutta, 1980.

26. Sukumar Dutt, Early Buddhist Monachism, Asian Publication House, Bombay, 1960.

27. A. Berridole Keith, A History of Sanskrit Literature, Oxford University Press, London, 1953.

28. B. C. Law, History of Pali Literature, Vols. I & II, Kegan Pal, Trench, Trubner and Co. Ltd., London, 1933.

29. G. P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylong, M. D. Gunasena and Co. Ltd., Colombo, 1958.

30. Maurice Winternety, A History of India Literature, Vols I, II, University of Calcutta, 1929.

31. Max Muller, Willams and Norgate, A History of Ancient Sanskrit Literature, London, 1980.

32. G. K. Nariman, Literary History of Sanskrit Buddhist, Indological Book House, Varanasi, 1973.

33. T. H. Lewin, The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein, Calcutta, 1869.

34. P. Arthur Phayre, History of Bruma, London, 1883.

35. H. H. Risely, The Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, 1891.

36. R.H.S. Hutchinson, Chittagong Hill Tracts District Gazetteer, Allahabad, Reprinted in 1978, Delhi, 1909.

37. R.H.S. Hutchinson, An Account of Chittagong Hill Tracts, Calcutta, 1906.

38. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, London, 1976.

39. G. A. Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.-I, Part-1. Calcutta, 1927.

40. E. T. Dalton, Tribal History of Eastern India, Calcutta, 1872.

41. Professor Fredrick W. Bunce, An Encyclopaedia of Buddhist, Vol-I.II., New Delhi, 1998.

Dhaka University Institutional Repository

42 Abulmam GE. Enamul Hoque, Excavation at Mainamati: An Exploratory Study, University Press Limited, 2000.

43. H. Hackmann, Buddhism as Religion: its historical development and its present condition, London, Probsthain, 1910.

44. Geory Siegmund, Buddhism and Christianity, The University of Alabama Press, USA, 1980.

45. D.S. Lopez, The Christ and the Bodhisattva, Sri Satguru Pub. Delhi, 1992.

46. Kshanika Saha, Buddhism and Buddhist literature in Central Asia, Culcatta, 1970.

47. Buddhism in East Asia, Bombay, 1966

48. Pandey. G. C, Studies in the Origin of Buddhism, Allahabad, 1957.

49. Krester, Brgan De, Man in Buddhism and Christanity, YMCA, 1968.Narada Thera, The Dhammapada, WOE Series, John Murray, London, 1954.

50. Samual Weiser, Nyanponika Thera, The Heart of Buddhist Meditation, New York, 1979.

51. Narada Thera, The Buddha and his Teaching., BPS, Kandy, 1964.

52. T. W. Rhys Davids, Buddhist Meditation in the southern School, Constant Lounsbery cosmic law in Ancient Thought, P.T.S., London, 1999.

53. Cassirer, Buddhism its Essence and Development, London, 1953.

54. B. Bhattacharyya, Elements of Buddhist Iconography, Calcutta, 1968.

55. Edward Conze, Buddhist Scriptures, Penguin 1959.

56. Christmas Humpheys, The Buddhist Way of life, Allen & Unwin, 1969.

57. Sir Edwin Arnold, The Light of Asia, Routledge & Kegan Paul, 1971.

58. Aung Tha Oo U, Theravada Buddhism and its Buddhist Sangha Council, RBAR Vol. I, Rangoon, 1977.

59. M. Anesaki, Buddhist Art, New York, 1915.

60. Early Indian Sculpture, Vol., Ludwig Bachhofer Pegasus press, New York, 1929.

61. A.C.Banerjee, Buddhism in India and Abroad, Calcutta, 1973.

62. P.V. Bapat (e.d), 2500 Years of Buddhism, Delhi, 1959.

63. Beni Madhab Barua, Gaya and Buddha Gaya. Vol 12, Calcutta, 1931 & 1934.

64. Munshiram Manoharlal, Elements of Buddhist Iconography (reprint) Delhi, 1998 (First ed: 1935)

65. M. A. Canney, Encyclopaedia of Religions, London, 1932.

66. K. N. Diskshit, Excavations at Paharpur, Annual Report of the Archaeology Survey of India, 1930-34, Delhi, 1936.

Dhaka University Institutional Repository

67. Debiprasad Chattopadhyay, Taranatha's History of Buddhiam (Ed) Translated from the Tibetan by Lama Chimpa and Alaka Chattopadhyoy, Simla, India Institute of Advance Study, 1970.

68. A. K. Coomarswamy, Elements of Buddhist Iconography, Cambridge, Mass, 1935.

69. A. K. Comarswamy, The Origin of the Buddha Image, Delhi, 1972.

70. A. H. Dani, Buddhist Sculpture in East Pakistan, Karachi, 1959,

71. A H. Dani, Pre-History and Proto-History of Eastern India, Calcutta, 1960.

72. S. N. Dasgupta, Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature, University of Calcutta, 1946.

73. S. N. Dasgupta, An Introduction to Tantric Buddhism, University of Calcutta, Calcutta, 1950.

74. Dr. Nalinaksa Datta, Early Monastic Buddhism, Vols. 2, Calcutta Oriental Series, Calcutta, 1941 & 1945.

75. N. Dutta, Aspects of Mahayana Buddhism and its Relation to Hinayana, London, 1930/1957

76. Sukuar Dutta, The Buddha and Five after Centuries, London, 1930.

77. Sukumar Dutta, Buddhist Monks and Monasteries of India, London, 1962.

78. Sir Charls Eliot, Hinduism and Buddhism, Vols.3, Delhi, India, 1988.

79. Fa-Hien, Translated by James Legge, A Records of the Buddhist Kingdoms, Delhi, India, 1972. Munshiram, 1998.

80. A. Foucher, Translated by L. A. Thomas and F. W. Thomas, The Beginnings of Buddhist Art and other Essays in India and Centeral Asian Archaeology, London, 1927.

81. J. C. French & Bhagwant Shai, The Art of the Pala Empire of Bengal, New Delhi, India 1993.

82. O. C. Ganguly, The Antiquity of Buddha Image, The cult of the Buddha, OZ, 1938.

83. Sushan L. Huntington, The pala-sena School of Sculpture, Ledin, 1984.

84. Lalmani Joshi, Studies in Buddhistic Culture of India during the 7th & 8th centuries A. D., Delhi India, 1967.

85. H. Kern, Manual of Indian Buddhism, Delhi, India, 1976.

86. F. A. Khan, Mainamati: Recent Archaeological Discoveries in East Pakistan, Karachi, 1955.

87. M. H. Kramrish, Excavation at Nalanda, Annual Report of the Archaeological survey of India, 1930-34, Delhi, India, 1936.

88. Dr. N. J. Krom, The life of Buddha on the Stupa of Borobudur, The Hague, 1926.

89. N.G. Majumdar, Inscriptions of Bengal, Vol.-III, Rajshahi, 1922.

90. R. C. Majumdar, History of Bengal, Vol.-I, (ed), Dacca University, 1973.

91. G. P. Malalasekara, Encyclopaedia of Buddhism, (ed) all vol. & parts, publication Division Govt.of Srilanka, Colombo, 1965.

92. J. H Marshal, Buddhist Art of Gandhara, Cambridge, 1960.

93. J. H. Marshal, Taxila, 3 Vols, Cambridge, 1951.

94. Debala, Mitra, Buddhist Monuments, Sahitya Smsad, Calcutta, 1971.

95. R. L. Mitra, The Sanskrit Buddhist literature of Nepal, Calcutta, 1882.

96. H. Oldenberg, Buddha, His life, His Doctaine, His order, London, 1888.

97. Debjani Paul, The Art of Nalanda, New Delhi, 1995.

98. E. A Reed, Primitive Buddhism, Chicago, 1896.

99. T.W. Rhys Davids, Early Buddhism, London, 1908.

100. W. W. Rockhill, The life of the Buddha, London. 1907.

101. S. K. Saraswati, Early Sculpture of Bengal, Calcutta, 1962.

102. Haraprasha Shastri, Buddhists in Bengala, The Dacca Review, Vol-II, No.7, Dacca, 1922.

103. Haraprasha Shastri, Discovery of living Buddhism in Bengal, Calcutta.

104. Swarup Shanti, 5000 years of Arts and Crafts in India and Pakistan, Bombay, 1968,

105. B. P. Sinha, Dynastic History of magadha, Delhi, 1977,

106. T. D. Suzuki, The Buddha in Mahayana Buddhism Exstern Buddhist, Vol-1&2, July, 1921.

107. Edward J. Thomas, The History of Buddhist Thought, London, 1953.

108. Edward J. Thomas, The life of the Buddha as legend and History, London, 1949.

109. J. Ph. Vogel, Buddhist Art in India, Ceylon and Java, Oxford, 1936.

110. T. W. Rhys Davids, Buddhist India, Banarsidass, Delhi, India, 1981, 1997.

111. G.P Malalasekhera, The Pali literature of Ceylon, The Royal Asiatic Society of Britain, London, 1928.

112. M. M. Ali, An Outline of ancient Indo Pak History, Dhaka, 1960.

113. R. G. Basak, The History of North-Eastern India, Calcutta, 1934.

114. S. P. Chatterji, Bengal in Maps, Calcutta, 1949.

115. C. Stewart. History of Bengal, 2nd ed, D. U, 1913.

116. N. K. Bhattasali, Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures of the Dacca Museum, Dacca Museum, Dhaka, 1929.

117. Gauriswar Bhattacharya, Essays on Buddhist, Hindu, Jaina Iconography & Epigraphy, ICSBA, Dhaka, 2000.

Dhaka University Institutional Repository

118. Dr. Ranesh Chandra Majumder, The History of Bengal, vol. 1, Calcutta, 1963.

119. P.L Vaiday, Divyavedana, Amasterdom, 1970.

120. P. L. Vaiday, Avadana Kalpalat by Ksmendra, Bihar, 1959.

121. S. Beal, Buddhist Western Records of the World, Vol.-I, II, London,

122. A. Egakua Moyedam, A History of the Formation of Original Texts. Tokyo, 1964.

123. Md.Mosharraf Hossain & Md. Shafiqul Alam, Paharpur (The world Cultural Heritage), Department of Archaeology, Dhaka, 2004.

124. Dr. Binayandranath Ch., Buddhist Centres in Ancient India, Calcutta, 1982.

125. Rabindra Bijoy Barua, The Theravada Sangha, Dhaka, 1978.

126. Dr. Sukomal Chowdury, Contemporary Buddhism in Bangladesh, Calcutta. 1982.

127. Sujit Mukhapadhyaya, Asokavadana, Delhi, 1963.

128. S. Datt, Buddhist Monks and monasteries of India, London, 1962.

129. V. A. Smirt, The early History of India, Oxford, 1924.

130. A. H. Dani, Mainamati Copper plates, Pakistan Archaeology, Karachi, 1963.

131. Joshi, Studies in Buddhistic Culture of India, Delhi, 1967.

132. Mukharji & Maiti, Corpus of Bengal, Inscription Bearing on History and Civilization of Bengal, Calcutta, 1967.

133. Kanailal Hazza, Pali Language and Literature, Vol- I, II, D. K. Print World (P.) Ltd, New Delhi, India, 1985.

134. William Geiger, Poli Literature and Language, Oriental Books Reprint Corporation Book Publishers, 10-B. Subhash Marg Delhi, India, 1968.

135. Chittagong District Gazetteer (ed), L.SS. Malley, Calcutta, 1908.

136. Buddhism in Pakistan, A Pakistani Buddhist, Karachi, 1969.

137. H. L. Barua, An Exposition of Theravada Buddhism in Bangladesh (ed), Chittagong, 1984

138. Arvind Sharma, Philosophy of Religion (A Buddhist Perspective), Delhi Oxford University Press, Calcutta, 1995.

139. Abdul Momin Chowdhury, Dynastic History of Bengal, Dhaka, 1967.

140. Dr. A. K. Sur, History and Culture of Bengal, Best Books, Calcutta, 1992.

141. Bengal In 1756-1757, Vol. I, II, III, S.C. Hill, Manas Publications, Delhi, 1985.

142. Pramode Lal Paul, The Early History of Bengal, Indian Research Institute, Calcutta, 1939.

143. Stella kramrisch, Pala and Sena Sculpture, The Buddhism of Tibet or Lamaism, L. Austine Waddell, W. H. Allen & Co. Ltd., London, 1895.

Dhaka University Institutional Repository

144. I-Tsing, Translated By J.Takakusu, A Record of Buddhist Religion, The Clexendon press, Oxford, London, 1896.

145. Bu-ston, History of Buddhism. Translation by E. Older Miller, Heidelberg, 1932

146. C. Elliot, Hidusim and Buddhism, Edward Arnold & Co. London, 1921.

147. S.S. SHASHI, E ditor in chief, Encyclopaedia INDICA, (India, Nepal, Barma, Pakistan, Bangladesh) Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi, India, 1996.

148. Md. Shahidullah, Buddhist Mystic Songs, Bengali Academy, Dhaka, 1966.

149. R. C. Majumder and Others, An Advance History of India, London, 1928.

150. J. Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics (Ed), Vol-IX, 1917,

151. Shahanara Hussain, Everyday life in the pala Empire, Asiatic Society of Pakistan, 1968.

152. Raj Kumar, Survery of Ancient India, Anmol Publications Pvt. Ltd. New Delhi, India First Edition, 1999.

153. K. L. Hazra, Studies on Pali Commentaries, Calcutta, 1992.

154. Beals Ralph & Harry Huijer & Alan R. Beasl, An Introduction to Anthropology, Macmillan publicashing Co. Inc. New York, 1977.

155. Applied anthropology, margaret mead, gould and kolb (ed.), Tabistock publishers, London, 1964.

156. kroeber, Anthropology, Indian Reprint, 1972

157. Nesturkh, The Races of Mankind, London, 1966

Tripitak Pali Text Books

1. Bhikkhu Silobhadra, Sutta Nipata, (ed) & Trans., Mahabodhi Society of India, Calcutta.

2. Bhikkhu J. Kasyap.,Anguttara Nikaya, Vols-I-V, (ed)., Nalanda Deva Nagari Pali Series, Bihar, 1960.

3. P. Stinthal, Udana, (ed), Pali Texts Society, London, 1902.

4. P. Mahathera & Jyotipali Mahathera, Udana, (ed) & Trans. Buddhist Mission Press. Rangoon, 1930.

5. T. W. Rhys Davids & J. E. Carpenter, Digha Nikaya, Vols, I-III, (ed), Pali Texts Society, London, 1889-1910.

6. V. Fausboll, Jataka, Vols I-VI, (ed), Pali Texts Society, London 1877, 1897.

7. Bhikkhu. J. Kasyop, Majjhim Nikaya, Vols, I-III, (ed), Nava Nalonda Publication, Series, Bihar, 1958.

8. J. Minayeff, Petavatthu, (ed), Pali Texts Society, London, 1886.

Dhaka University Institutional Repository

9. H. Oldenberg and R. Pischel, Theragatha, (ed), Pali Texts Society, London, 1883.

10. E. R. Crooneratone, Vimana Vathu, (ed), Pali Texts Society, London, 1886.

11. Dharma Ratna Mahathera, Mahapariririrvana Suttam, (ed) & Trans., Rajanagar, Chittagong, 1941.

12. Mrs. T. W. Rhys Davids, The book of the Kindred Saying, Vol. II., PTS, 1917 & 1922.

13. T. W. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, Translated from the pali of the Digha Nikaya, Part-I, II, London: Henry Frowde / Oxford University Press, 1910.

14. S. Radhakrishnan, The Dhammapada, Madras Oxford University Press, Delhi, 1984.

15. Dharmader Mahastabir, Milindapanha, Calcutta, 1987.

Pali Atthakatha

1. Dhammakitti, Dhammapada Atthakatha, (ed) H. C. Narman, Pali Texts Society, London, 1909.

2. Dhammapada Atthakatha (ed), Pakistan Buddha Pracarsangha, Cattagram.

3. Bhikku Dhamma Rakkhita, Jatakatthakatha (Arathmabhaga) (ed), Bharatiya Jnanapit, Varanasi, Kasi, 1951.

4. V. Trancher, Milindapanha (ed), Pali Texts Society, London, 1980.

5. Helmersmith, Paramatthajyotika, Vol. I (Khudakapatha Commentary) Vol. II, (Sutta Nipata Commentary) (ed), 1915, 1916-1918.

6. E. Hardy, Paramatthajyotika (ed), Pali Texts Society, London,1895.

Pali-English-Bangla Dictionary

1. R.C. Childers, Dictionary of Pali Language, London.

2. Nyanatilok Thera, A Buddhist Dictionary, BPS, Kandy, 1950

3. T. W. Rhys Davids & William, Stede, Pali-English Dictionary, Lujac & Co. Ltd. London, 1966

4. G. P. Malalasekara. Dictionary of Pali Proper Names, Vol- I & II, Delhi, India, 1980.

Journal

1. Journal of Bengal Art. Vol-4, Editor, Enamul Haque, The International Center for study of Bengal Art, Dhaka, Bangladesh. 1999
2. Journal of Bengal Art. Vol-1, Editor, Enamul Haque, The International Center for study of Bengal Art, Dhaka, Bangladesh, 1996
3. Journal of Bengal Art. Vol-8, Editor, Enamul Haque, The International Center for study of Bengal Art, Dhaka, Bangladesh. 2003.
4. S. C. Kak. Bharhut Sculptures in the Allahabad Museum, Journal of the Uttar pradesh Historical Society, Vol. XVIII, 1991.
5. S.N. Chakravarti, The Origin of the Buddha Image, Jurnal of the United Provinces Historical Society, vol., XVI (II), PTS, 1943.
6. V. S. Agrawala, Buddha and Bodhisattva Images in the Mathura museum, Journal of the United Provinces Historical Society, Vol. 21. PTS. I&2, 1984.
7. R. Kimura, A Historical Study of the terms Mahayana and Hinayana and the origin of Mahayana Buddhism, University of Calcutta, Journal of the Department of letters, Vol XI, 1924.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট
আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চারুবালা বড়ুয়া	(১৯১০)	কবিয়াল ফণী বড়ুয়া	(১৯১৫)	[illegible] বড়ুয়া	(১৯২০)
[illegible] বড়ুয়া	(১৮০২)	ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া	([illegible])	ডা. [illegible] বড়ুয়া	([illegible])
এস. কে চৌধুরী	(১৯৩৬)	[illegible] সুকুমার বড়ুয়া	([illegible])	[illegible] বড়ুয়া	(১৯৫১)
[illegible] চন্দ্র বড়ুয়া	(১৯৪৮)	কমরেড দিলীপ বড়ুয়া	(১৯৪৯)	সুহাস বড়ুয়া	(১৯৫৪)

বৌদ্ধ সমাজের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিবর্গ

মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের | প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া | কবিয়াল ফণী বড়ুয়া | প্রতিভা মুৎসুদ্দি

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধদের প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকা

৩০৮৫৮৩

বৌদ্ধ পত্রিকা।

মাসিক পত্র।

শ্রীবিপিন চন্দ্র বড়ুয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ম ভাগ। ২৪৪৯ বুদ্ধাব্দ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১২৬৭ মগাব্দ।

আশ্বিন ১৩১২।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জাতীয় পুনরুন্নতি ...	/০	৫। ব্রহ্মবাসীর পত্র ...	৮৬
২। ধম্মপদ ...	৭৭	৬। বালের তারা ...	৮৮
৩। ব্রহ্মজাল সুত্র ...	৭৯	৭। নাগ্রোধ মৃগ জাতক ...	৮৯
৪। জগজ্জ্যোতি ...	৮১	৮। ভগবানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ...	৯২
৫। সুমঙ্গল ...	৮৪	৯। সংবাদ ও পত্রাদি ...	৯৩

চট্টগ্রাম, গোবিন্দ যন্ত্রে
প্রিণ্টার— শ্রীহরেন্দ্র কুমার ভদ্র দ্বারা মুদ্রিত।
চট্টগ্রাম অনাথবাজার বৌদ্ধবিহার ভবন হইতে
প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্রতিসংখ্যা ৵০ তিন আনা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খনন কার্য্যের ফলে প্রাপ্ত
বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কতিপয় চিত্র

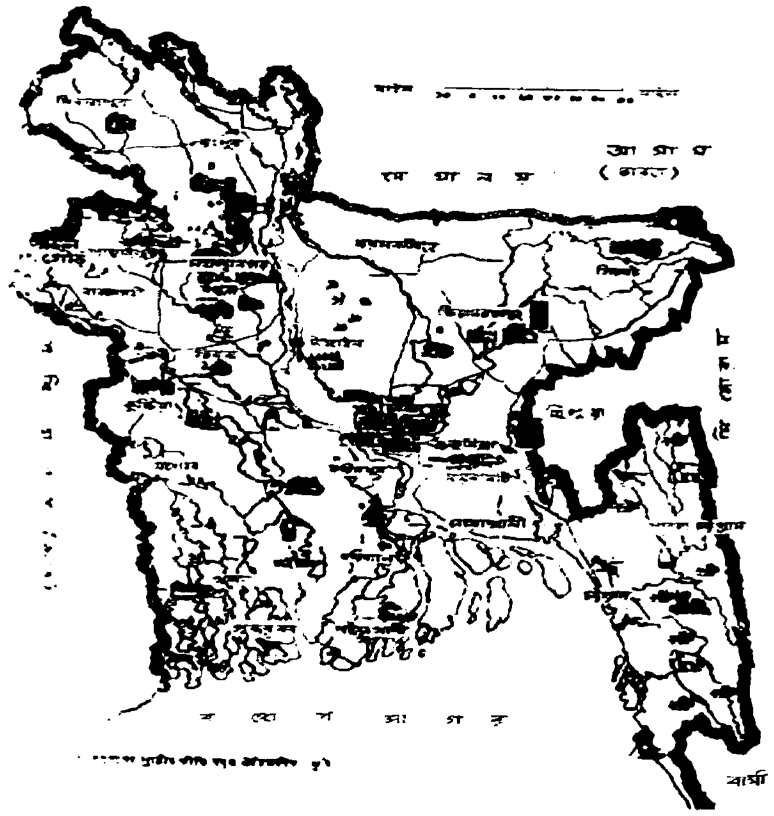

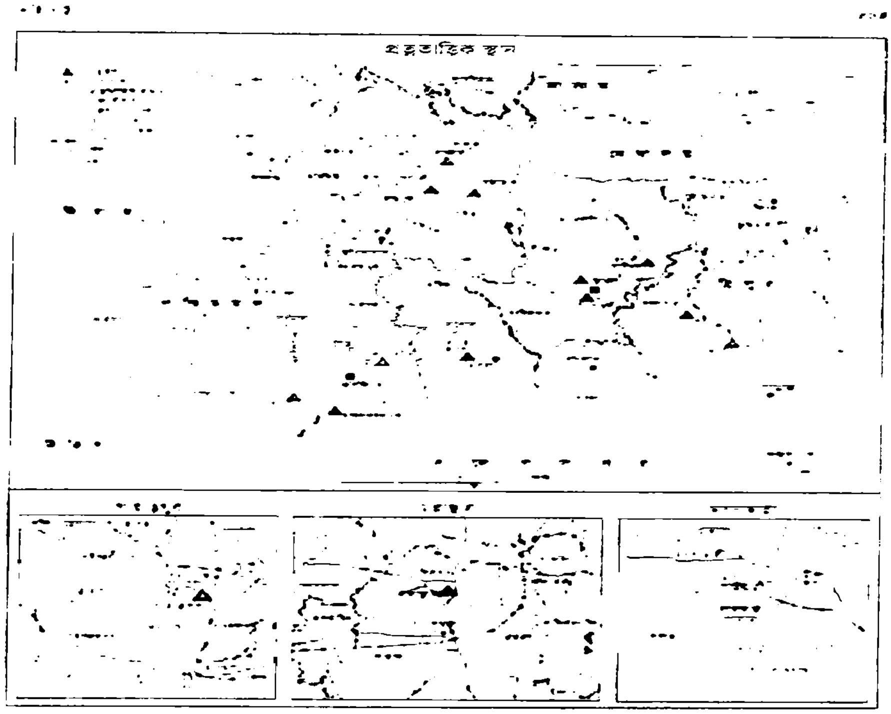

Dhaka University Institutional Repository

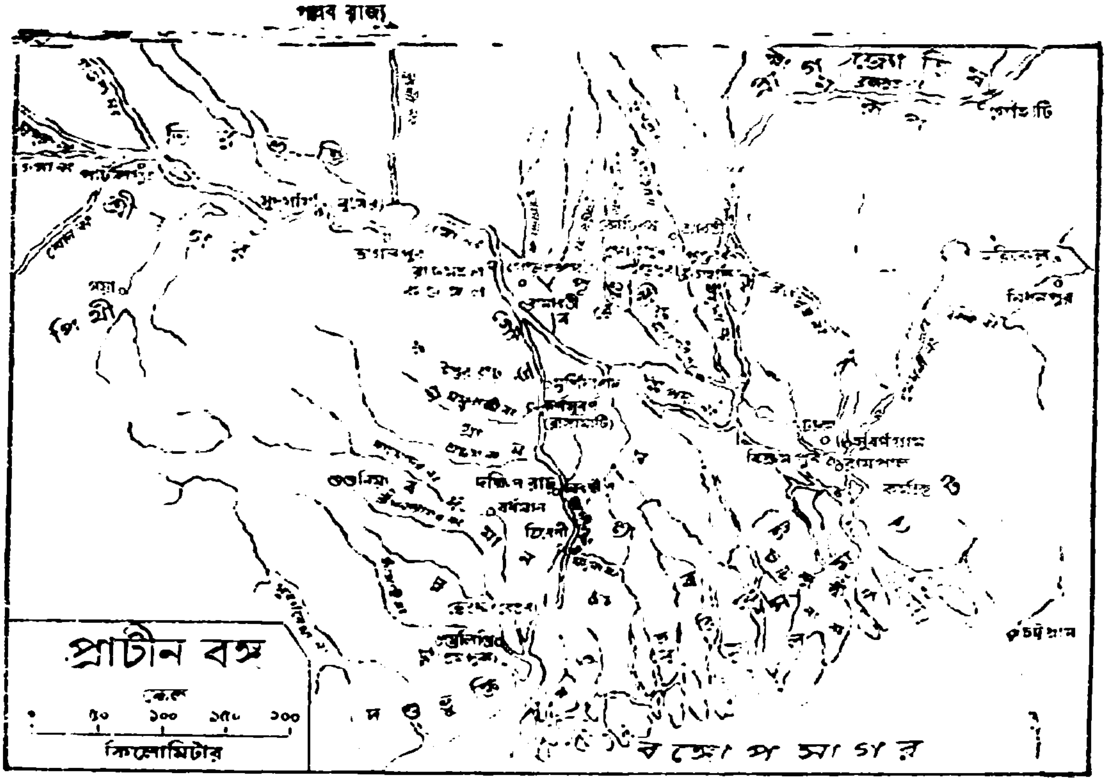

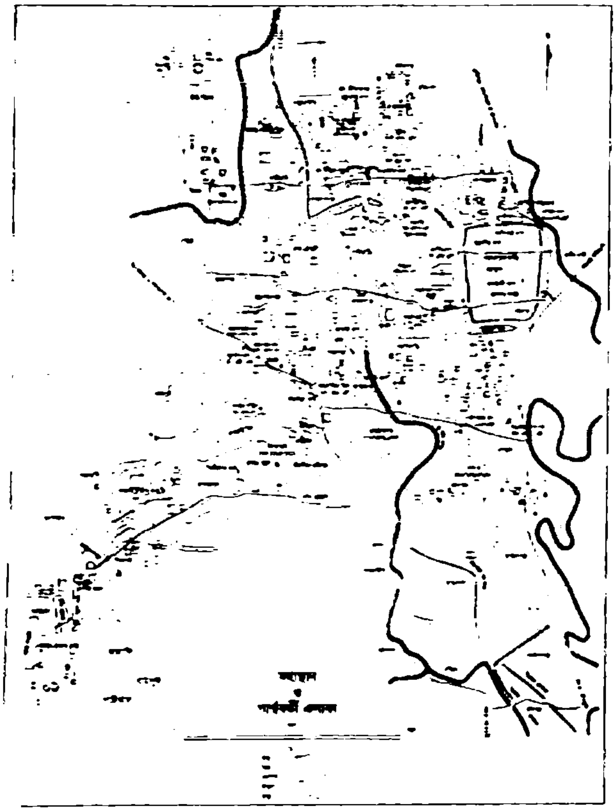

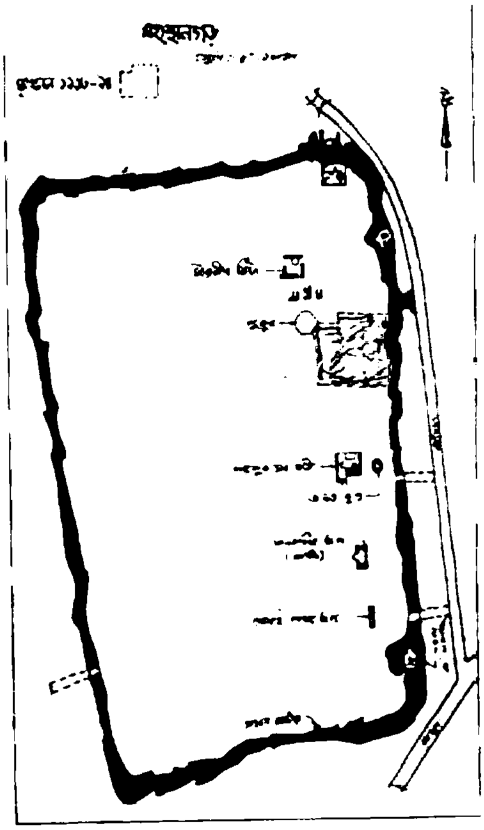

Dhaka University Institutional Repository

PLATE NO. I

বিক্রমশীলা বিহারের ধ্বংসাবশেষ

a. General view of the Central Shrine, Salban Vihara, Comilla.

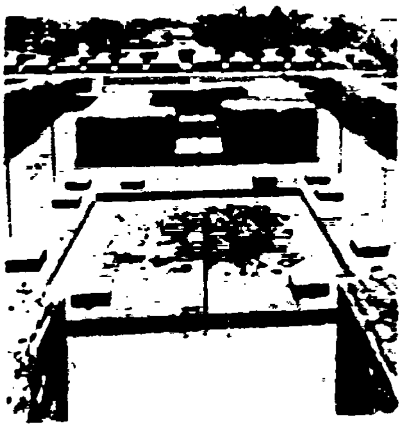

b. Close view of the Central Shrine, Salban Vihara, Comilla.

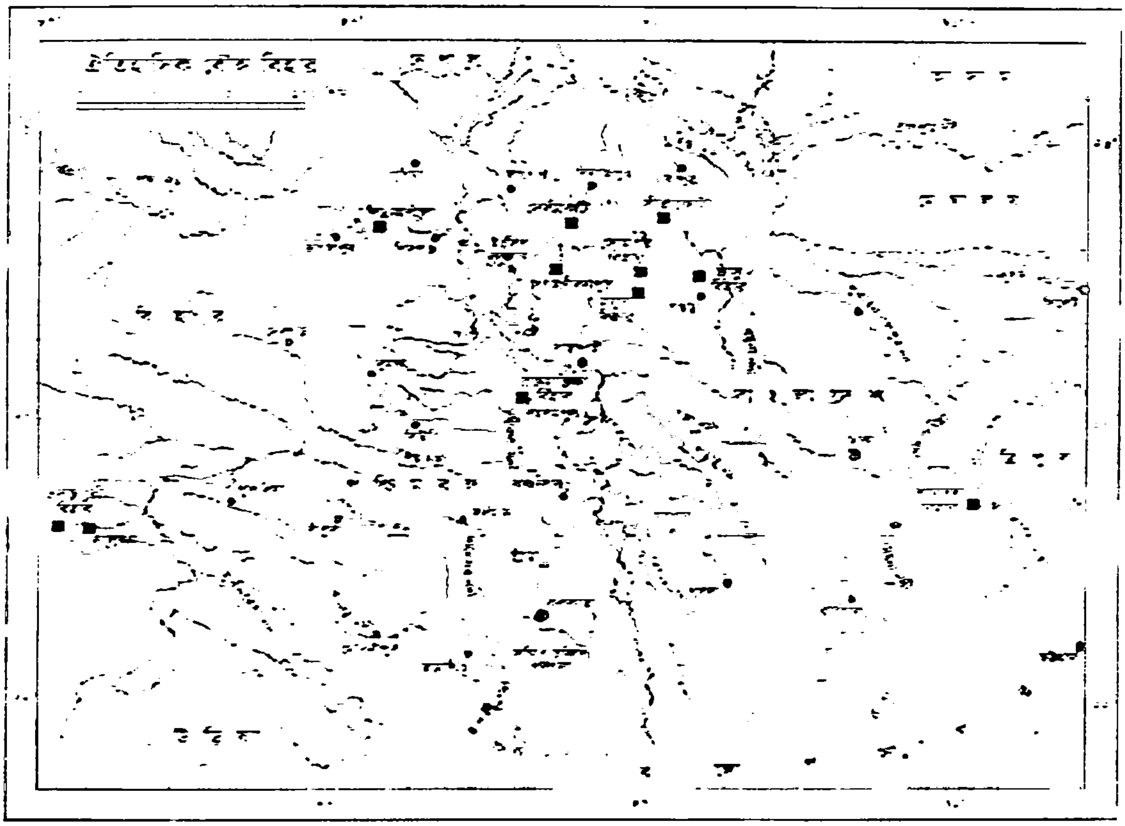

Dhaka University Institutional Repository

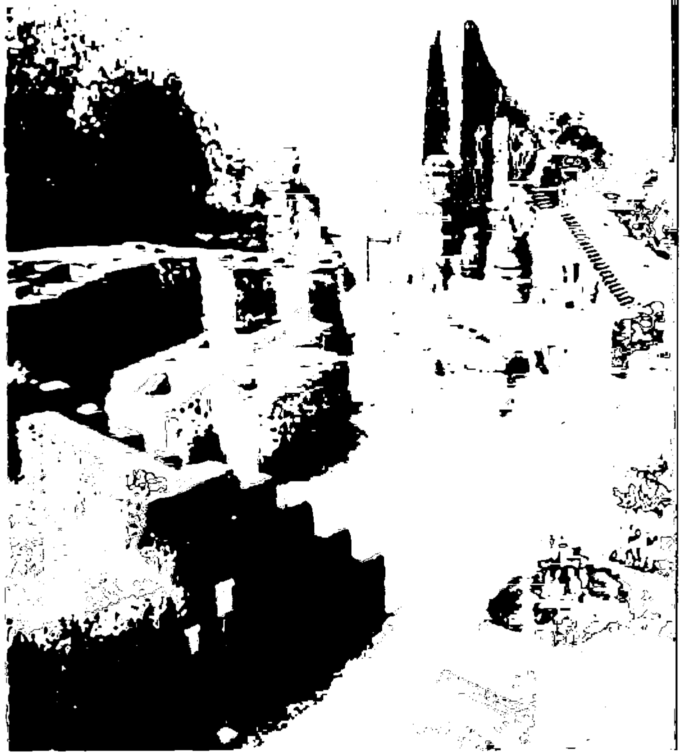

নালন্দা বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়

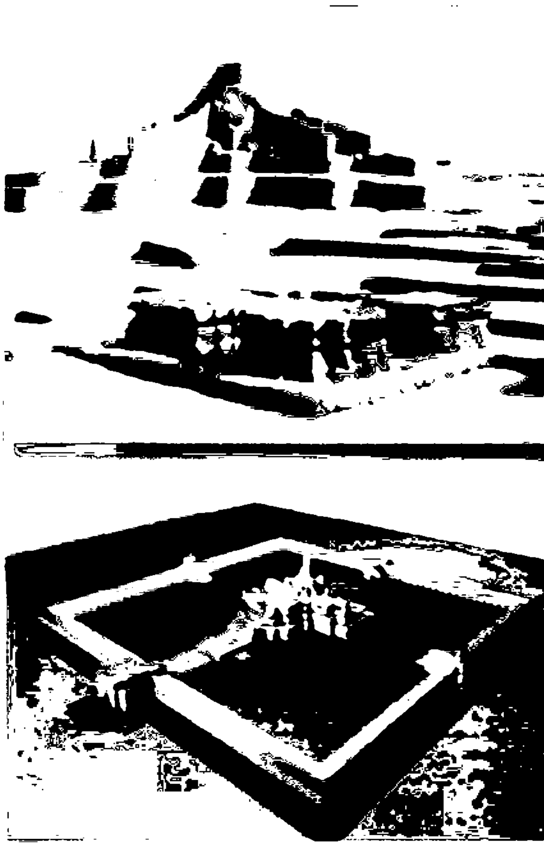

পাহাড়পুর সোমপুর বিহার ও নকসা

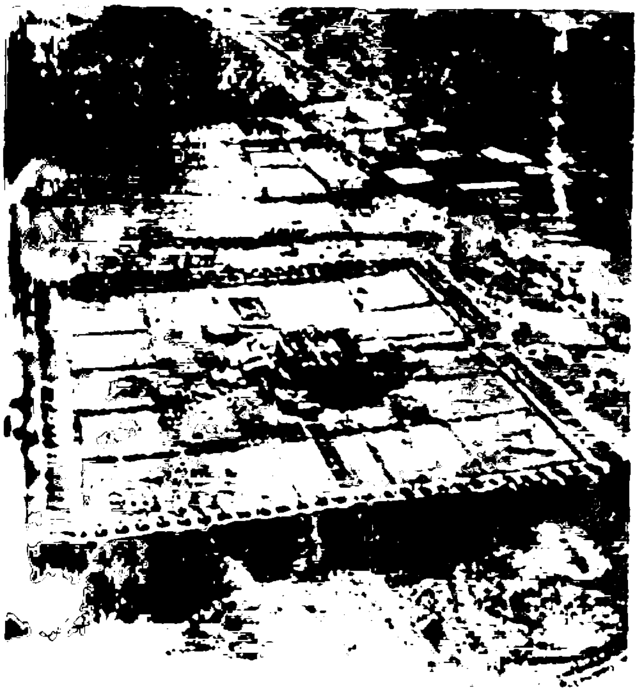

শালবনবিহারের এরিয়াল দৃশ্য, ময়নামতি, কুমিল্লা

মহাস্থানগড়—বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

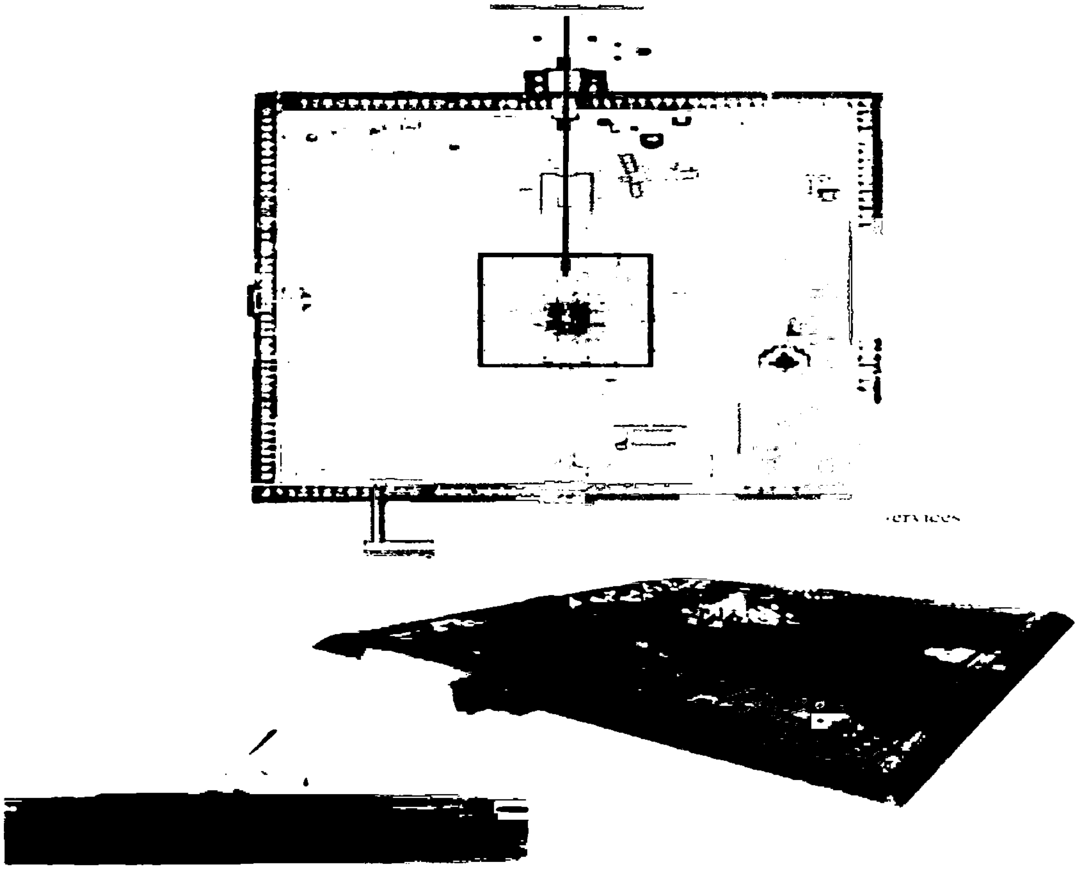

পাহাড়পুর বিহারের নকসা

পাহাড়পুর বিহারের কক্ষ ও ওয়াল

Dhaka University Institutional Repository

Pl.14.1. The site virtually constructed and existing sites

Dhaka University Institutional Repository

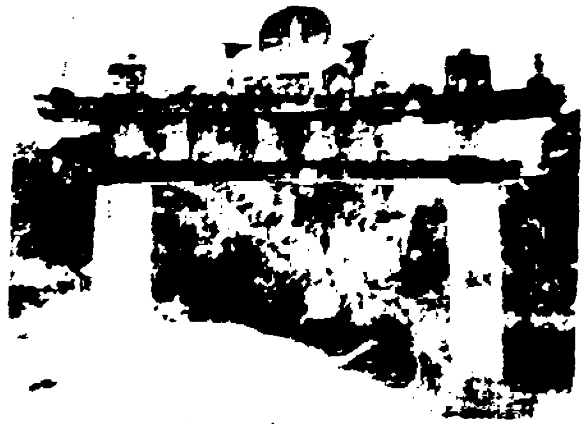

তোরণ, [illegible]।

তোরণ, শান্তিধাম [illegible], হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

পাহাড়পুর সোমপুর বিহারে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির মস্তক

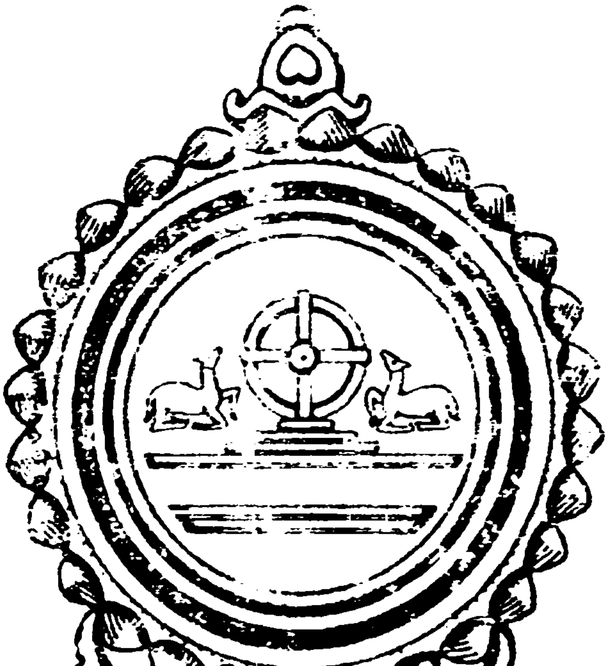

ময়নামতিতে প্রাপ্ত ধর্মচক্র প্রতীক

Dhaka University Institutional Repository

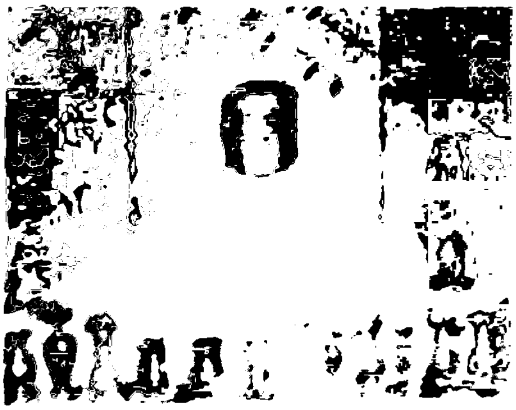

[illegible]

[illegible]

The statue of Buddha. Donated by Captain Hirum Cox at the Central Temple, Cox's Bazar (Photo : [illegible] Das)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

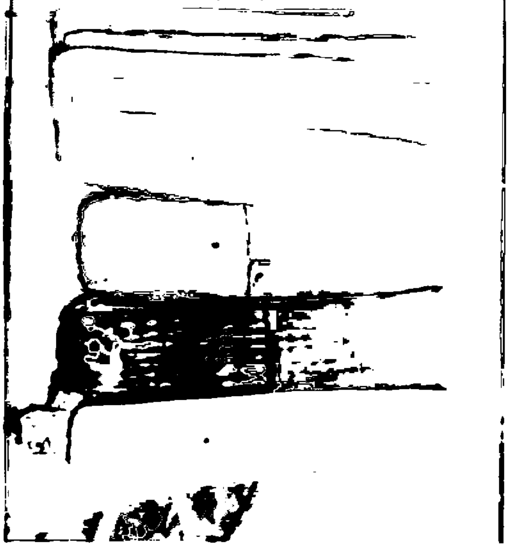

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী অগগমেধা বৌদ্ধ বিহার, রামু

Women in Rakhaine Traditional Dress in Kathin Chibar Ceremony, Cox's Bazar

Dha[illegible] Institutional Repository

[illegible]

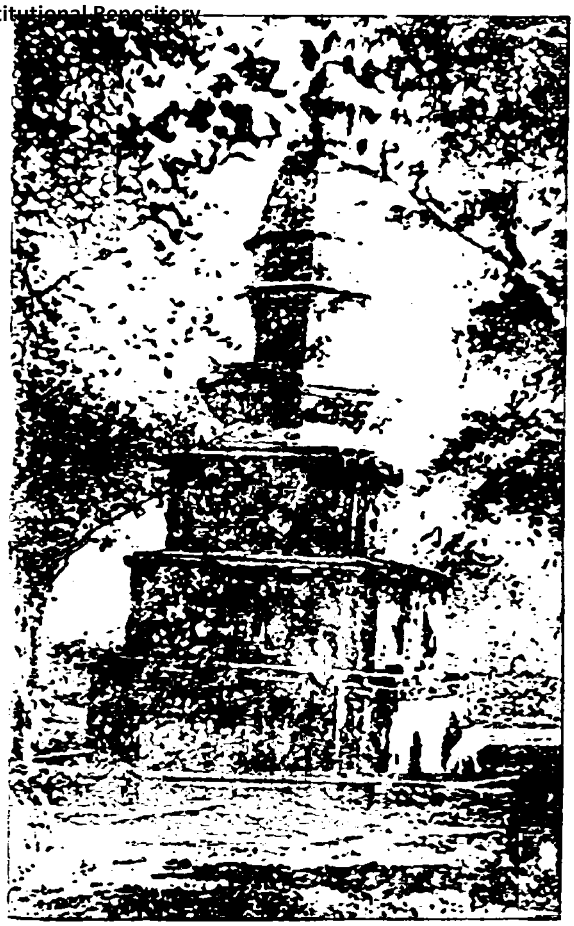

চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান-উল্লিখিত বুদ্ধদেবের উপদেশ স্থানে [illegible])
অবস্থিত দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন "জো" [illegible] মহ-ইয়া [illegible] বা [illegible]
[illegible] প্রসিদ্ধ।

মহামুনি বৌদ্ধ বিহার, পাহাড়তলী

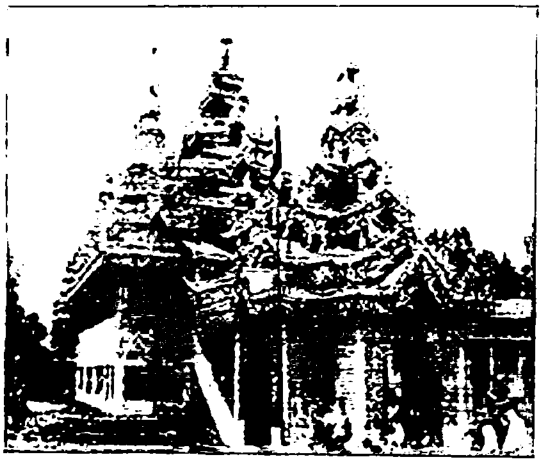

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহার

মহাস্থান ব্রাহ্মী শিলালিপি (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক)

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম

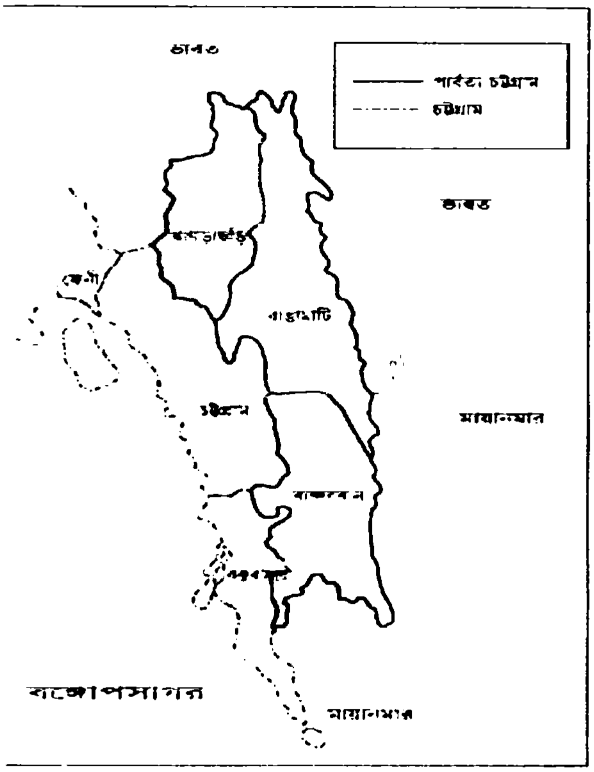

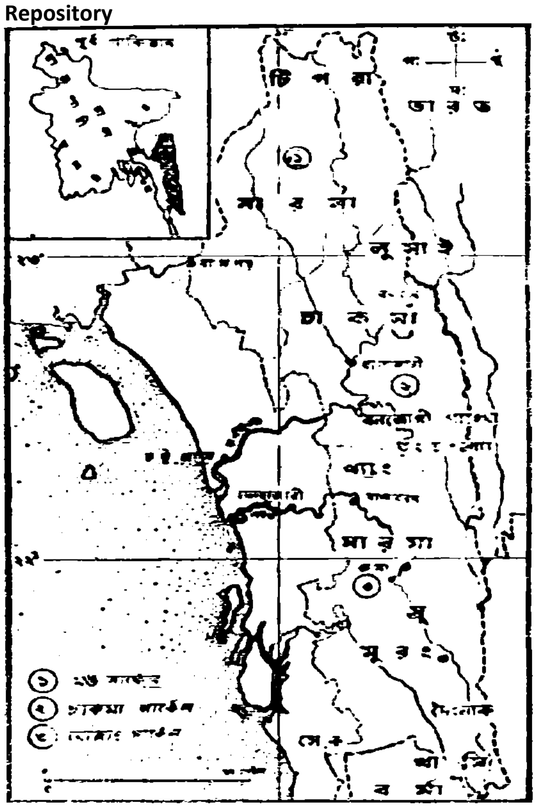

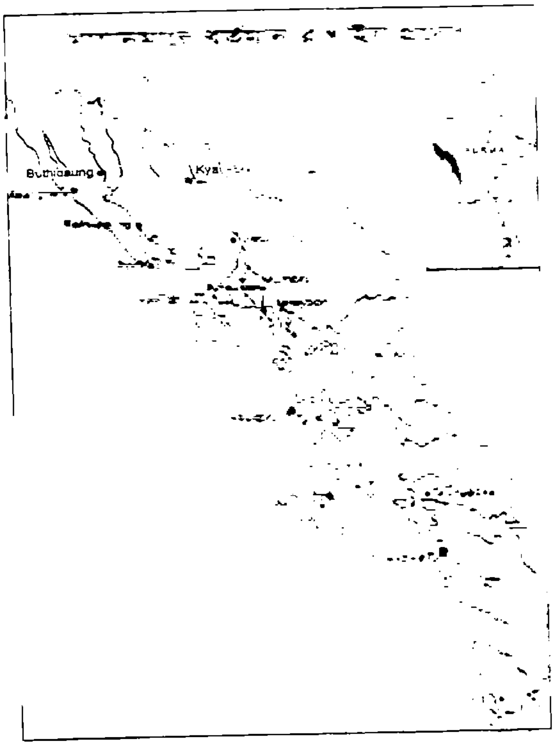

পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার মানচিত্র

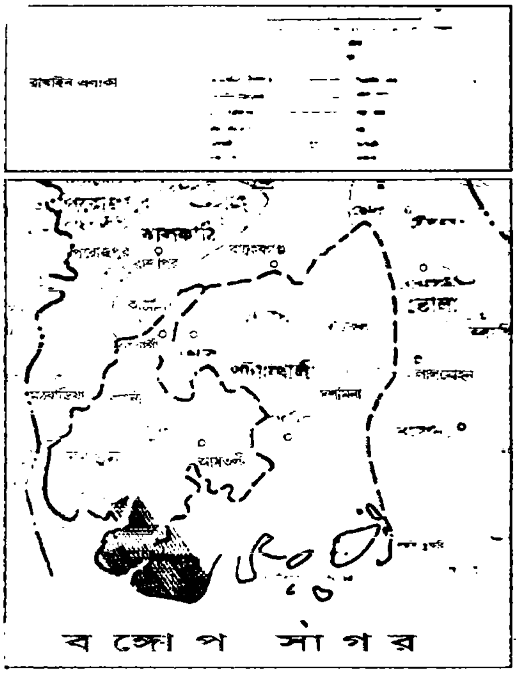

Dhaka University Institutional Repository

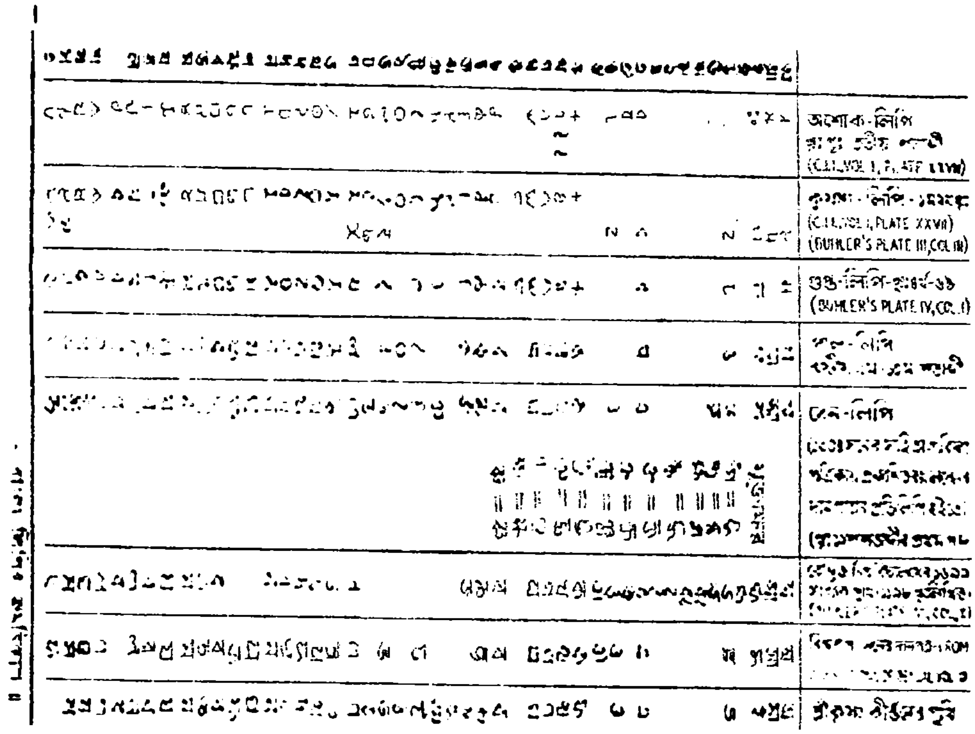

পালি বর্ণমালা

বাংলা পালি বর্ণ	রোমান পালি বর্ণ	রোমান পালি বর্ণ	উচ্চারণ	বাংলা পালি বর্ণ	রোমান পালি বর্ণ	রোমান পালি বর্ণ	উচ্চারণ
স্বরবর্ণ							
অ	A	a	অ	উ	Ū	ū	উ
আ	Ā	ā	আ	ঊ	U	u	ঊ
ই	I	i	ই	এ	E	e	এ
ঈ	Ī	ī	ঈ	ও	O	o	ও
ব্যঞ্জনবর্ণ							
ক	K	k	কা	জ	J	j	জা
খ	KH	kh	খা	ঝ	JH	jh	ঝা
গ	G	g	গা	ঞ	Ñ	ñ	ঞা
ঘ	GH	gh	ঘা	ট	Ṭ	ṭ	টা
ঙ	Ṅ	ṅ	ঙা	ঠ	ṬH	ṭh	ঠা
চ	C	c	চা	ড	Ḍ	ḍ	ডা
ছ	CH	ch	ছা	ঢ	ḌH	ḍh	ঢা

পালি বর্ণমালা

ণ	Ṇ	ṇ	ণা	ম	M	m	মা
ত	T	t	তা	য	Y	y	য্যা
থ	TH	th	থা	র	R	r	রা
দ	D	d	দা	ল	L	l	লা
ধ	DH	dh	ধা	ব	V	v	ওয়া
ন	N	n	না	স	S	s	সা
প	P	p	পা	হ	H	h	হা
ফ	PH	ph	ফা	ল	Ḷ	ḷ	ক্লা
ব	B	b	বা	অং	AṂ	aṃ	আং
ভ	BH	bh	ভা				

Dhaka University Institutional Repository

অবে সেনী মহা কোপে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য জত সভা জনে॥

কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমানে।
এক চড়ে দন্ত ভাঙ্গি করে খানে খানে॥

অবে সভে উঠি হয়া নিবারণ কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেরে চলিল॥

সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়াণ॥

[illegible]

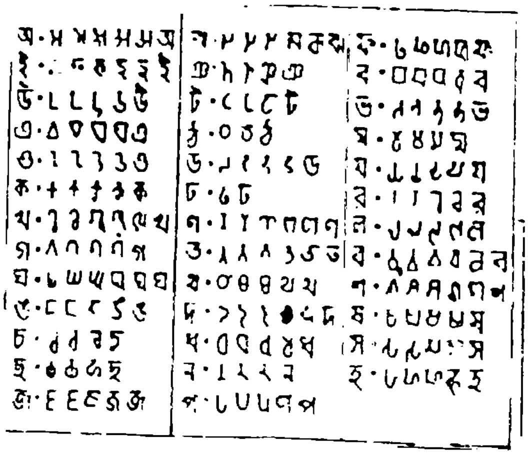

ব্রাহ্মী থেকে বাংলা বর্ণমালার রূপান্তর চিত্র

ম্রো উপজাতি / আদিবাসীর বর্ণমালা :

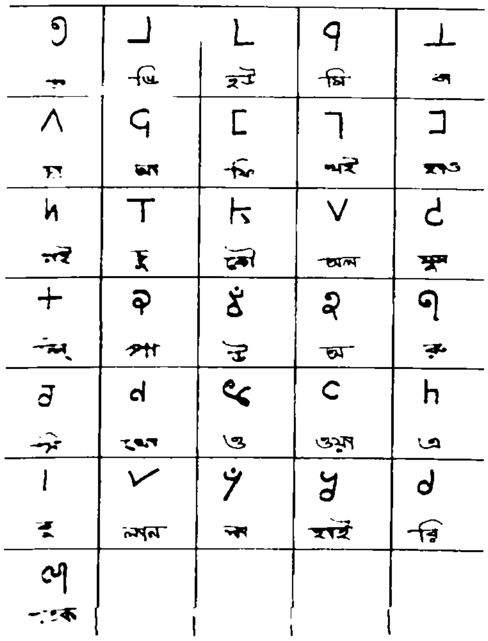

চাকমা উপজাতি / আদিবাসীর বর্ণমালাঃ
তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতিদের ও ব্যবহৃত।

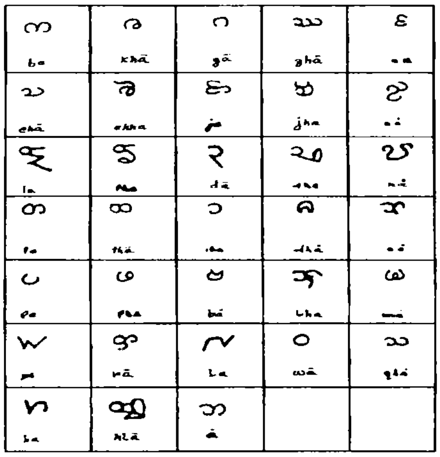

চাকমা বর্ণমালার প্রথম প্রকাশকাল ১৯০৩ খৃঃ।
বিখ্যাত ভাষাবিদ Dr. G. A. Grierson কে
প্রেরিত চাকমা বর্ণমালার নমুনা [প্রাপ্ত তথ্য মতে]।

খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ হতে ৩২ অব্দের অশোক শিলা
লিপিতে ব্যবহৃত উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মী হরফ থেকে
ছয়টি ধাপে পরিবর্তিত হয়ে পঞ্চদশ হতে
অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিম্নরূপ আকার হয়েছে [প্রাপ্ত তথ্য মতে]।
মার্মা ও চাক উপজাতিদের বর্ণমালা ও সংখ্যাঃ

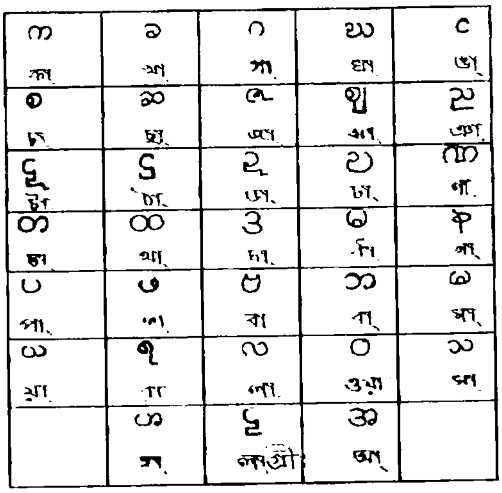

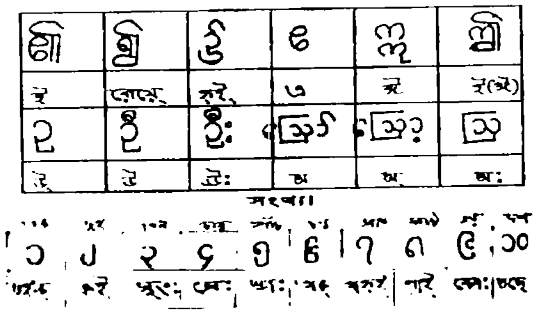

Dhaka University Institutional Repository

আদিবাসী উপজাতি রমণী নিজস্ব পোশাক পরিহিত ঐতিহ্যে

Religious Profession of Novice Hood Ceremony, Moheshkhali.

[illegible] দোকানে বেচাকেনা

[illegible] : [illegible]

[illegible] দোকান

[illegible] : [illegible]

A [illegible] Burmese Market [illegible] at Cox's Bazar

Dhaka University Institutional Repository

জুমের ধান কাটছেন মারমা নারী

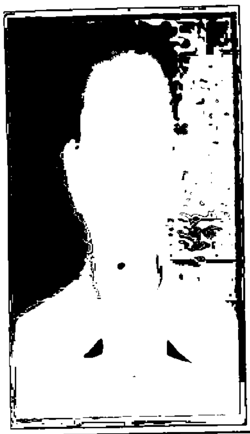

বুদ্ধদেব ধর্ম ও হরফ প্রবর্তন ইরা ম্রো
মেনলে ম্রো

Dhaka University Institutional Repository

Part view of Rakhaing Orchestra Program, Mahathindoghree complex, Cov's Bazar.

The Buddha Purnima Ceremony at Cox's Bazar organized by R.W.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

বারকান্দি টিম্পুটিগা বৌদ্ধ বিহারের ভূমিদাতা

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধদের সংগে ভিক্ষুগণ

নির্মাণাধীন সুকুমার বৌদ্ধ বিহার

মিঠাপুকুর বৌদ্ধ বিহারে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন

কাপুরা : পূজার আনুষ্ঠানিকতা

কাপুরা : ঘটস্থাপন

কাপুরা : আনুষ্ঠানিক শিকার যাত্রা

সারহুল : পূজা প্রস্তুতি

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাই অনুষ্ঠানে পদযাত্রা

দিনাজপুর বিরল থানার বহবল দিঘী বৌদ্ধ বিহারে প্রার্থনারত আদিবাসী বৌদ্ধ

ঠাকুরগাঁও সদরে [illegible] বৌদ্ধ বিহারের ভূমি দাতা লক্ষ উড়াও এর সাথে ভিক্ষু শীলভদ্র ও ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়

সাংগ্রাইং এর অন্যতম অনুষ্ঠান বৌদ্ধ মূর্তি স্নানের শোভাযাত্রা আলোকচিত্র : [illegible]

বৌদ্ধ মূর্তি স্নানের শোভাযাত্রার প্রস্তুতি [illegible] অপেক্ষায় মারমা মেয়েরা আলোকচিত্র : মুস্তাফা [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

কারাম উৎসব : গীতবাদ্যরত নারীপুরুষ

ওরাওঁ রমণী

কারাম উৎসব : পূজানুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন

প্রাচীন পোষাকে ওরাওঁ পুরুষ

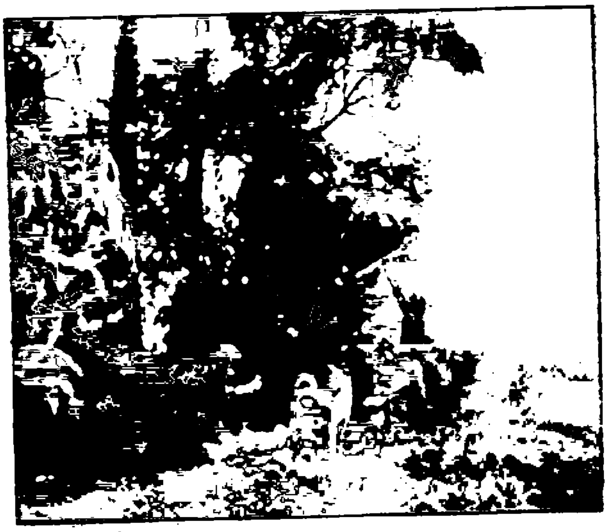

শিকাররত ওরাওঁ পুরুষ

হাড়িয়া পানরত ওরাওঁ কবিরাজ